॥ স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য ॥

শ্রী তুষার কান্তি ঘোষ এম.এ.; বি.টি.

১৯৯৬

ডক্টর প্রদ্যোত ঘোষের অধীনে
উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য প্রদত্ত

॥ সূচীপত্র ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় : স্বদেশী আন্দোলনের উন্মেষ ॥ জাতীয় জীবনে ও সাহিত্যে ॥ ক্ষেত্র সঙ্গীত ও কাব্য ॥

তৃতীয় অধ্যায় : নাট্য রচনা ও স্বদেশী যুগ

চতুর্থ অধ্যায় : ছোট গল্পের ক্ষেত্রে স্বদেশী যুগ

পঞ্চম অধ্যায় : বাংলা কথা সাহিত্য ও স্বদেশী আন্দোলন

ষষ্ঠ অধ্যায় : স্বদেশী যুগ ও সমকালীন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের রচিত সাহিত্য

সপ্তম অধ্যায় : স্বদেশী যুগ ও সাময়িক পত্র

অষ্টম অধ্যায় : স্বদেশী আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য

নবম অধ্যায় : স্বদেশী যুগের সাহিত্যে আদর্শ প্রেরণা ও জীবন বোধ

* * * * *

।। নিবেদন ।।

\- - - - - -

প্রত্যেক দেশের ইতিহাসে থাকে এক যুগ সন্ধিক্ষণ । সময়'এর প্রবাহে যারা আবদ্ধ থাকেন তাঁদের পক্ষে সেই যুগ সন্ধিক্ষণ বোঝা সম্ভব হয় না । কিন্তু যুগের বিচার যুগান্তিক্রমেই জানা যায় । বাংলার বঙ্গভঙ্গ - স্বদেশী আন্দোলনের যুগটা ছিল এক কথায় সাহিত্য সৃষ্টির যুগ, স্বদেশ বোধের যুগ । জীবনকে নিজের ভাবনার সংকীর্ণ গন্ডী হতে বার করে দেশহিতে সমাজ হিতে উৎসর্গ করার যুগ । এই যুগের এক বলিষ্ঠ আদর্শ চেতনা ছিল । এই আদর্শ চেতনা যেমন একদিকে সাহিত্য সৃষ্টি করেছিল তেমনি সাহিত্যের ভাবনায় জীবন বিসর্জনের দৃষ্টি কোন সাহিত্যের পৃষ্ঠা হতে জীবন পৃষ্ঠায় লিখিত হয়েছিল । প্রখ্যাত বিপ্লবী নলিনী কিশোর গুহ অনুভব করেছিলেন " জাতীয় আন্দোলনের কর্মী ও আন্দোলনের চারণ হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছেন । কোথাও বিপ্লবীদের এক পা আগে আসিয়া সাহিত্যিক পথ দেখাইতেছেন , আবার কোথাও বা বিপ্লবীদের জীবন দানের তপস্যা , দেশজননীকে ভালবাসার শ্রেষ্ঠ মূল্যদানের মহিমা সাহিত্যিককে প্রেরণা দিতেছে , বিপ্লবীদের জীবন সাহিত্য সৃষ্টির উপাদান হইয়া উঠিতেছে । "

উইল ডুরান্ট বলেছিলেন , 'It was in 1905, then that the Indian Revolutionbegan" উইল ডুরান্ট এর অভিমত সর্বাংশে সত্য । কারণ স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ বিনয় কুমার সরকার বলছেন , " বাঙালীর বাচ্চা আমি , – বাঙালীর চোখে দুনিয়া দেখি । আমার কাছে ১৯০৫ হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসর । ঐ সময় শুরু হয় গৌরবময় বঙ্গ বিপ্লব । এ একটা খাঁটি যুগান্তর । "

এই বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী যুগে সবচাইতে বড় ফসল ফলেছিল মানুষের মনোভাবনায় । হৃদ-ভূমি কর্ষণ করে আদর্শ ভাবনার ফসল ফলানোর প্রয়োজন ছিল । এই ফসল ফলল

সাহিত্যের ক্ষেত্রে । "The whole atmosphere of Bengal was surcharged with a new literary currents, which galvanied the whole country⁶."

এই সাহিত্যের প্রবাহে বেশ কিছু নতুন ধারণার সন্ধান পেলাম যা আমাকে এই বিষয়ে গবেষণায় প্রবৃত্ত করল । (১) বাংলা সাহিত্য এক নতুন খাতে প্রবাহিত হলো । (২) এই সাহিত্য গড়ে উঠল ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতা থেকে, কিন্তু সাহিত্যে রইলো সার্বজনীন , বিশ্বজনীন ও চিরন্তন উপাদান । (৩) দেশপ্রেম ছিল এই সাহিত্যের আকর । (৪) প্রেরণা ছিল ভারতের প্রাচীন গৌরবময় ইতিহাস । (৫) বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ফলে বা বিপ্লবের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ভাবে গড়ে উঠেছে সাহিত্য, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের মত নিঃবিচ্ছিন্ন সাহিত্য কোন আন্দোলনকে নিয়ে এমন ব্যাপক ভাবে সৃষ্টি হয় নি । (৬) এই সাহিত্যে ছিল জীবন বোধ বা আদর্শবোধ , ফলে এই সাহিত্যের প্রেরণা শুধু জীর্ণ শুষ্ক পৃষ্ঠায় আবদ্ধ থাকেনি । ফাঁসীর দড়ি বা কারাগারের শত অত্যাচারে এই সাহিত্য ছিল স্বদেশ ভক্তদের প্রেরণার বস্তু । (৭) সাহিত্যের একটি দিক ছিল প্রচার ধর্মী । যদিও নীতিগত বা বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম সমাজ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হতে দূরে সরে দাঁড়িয়েছিল তবুও মুসলমান সমাজের এক বিশাল অংশের মনোভাবনা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ছিল । তাঁরা রচনা করেছিলেন সেইরূপ সাহিত্য । মুসলমানদের আরেক বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন শ্রেনীর মনোভাবনাও তাঁদের রচিত গ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছিল । (৮) এই ভাবনা ছাড়াও এই যুগের সাহিত্যে হিন্দু মুসলমান ঐক্যের কামনার কথা প্রকাশিত হয় । (৯) এই সাহিত্য বাংলার তথা ভারতের শিল্প , সংস্কৃতি অর্থনৈতিক অবস্থার বিকাশকে প্রভাবিত করেছিল । (১০) ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্য বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী যুগের ভাবনায় ও প্রেরণায় রচিত হয় । এই ভাবনা সূচীপত্রে নিহিত আছে ।

এই সব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই আমার গবেষণা শুরু হয় । এই কাজে প্রধান প্রেরণা দাতা আমার পথ নির্দ্দেশক (guide) ড: প্রদ্যোৎ ঘোষ । তাঁর কাছে যখন যেভাব সাহায্য চেয়েছি অকৃপণ ও অকুণ্ঠ চিত্তে উদার হৃদয় নিয়ে সাহায্য করেছেন । অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন আরও বহু ব্যক্তি । যাঁর ঋণ ভুলতে পারব না

তিনি ডঃ বরুণ চক্রবর্তী।

যে সব গ্রন্থাগার হতে সাহায্য লাভ করেছি তাদের মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার, মালদহ জেলা গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বৃক্ষানন্দ পাঠাগার, ও আমার নিজের বিদ্যালয় ললিত মোহন শ্যাম মোহিনী উচ্চ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারের কর্মীদের সদা হাসি মুখ আমায় কাজে প্রেরণা দিয়েছে। জাতীয় অভিলেখাগার কলকাতা হতে প্রচুর সাহায্য পেয়েছি।

বহু দুষ্প্রাপ্য অধুনা প্রায় লুপ্ত পুস্তকরাজি সংগ্রহ করে দিয়েছেন আমার শুভাকাঙ্খী শ্রী প্রমথেশ পাল। তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। বন্ধুবর বিনয় ঘোষ বিভিন্ন পত্রিকা ও পুস্তক দিয়ে সাহায্য করেছেন।

বিভিন্ন সূচী নির্ঘণ্ট ও সংযোজন তালিকা প্রস্তুত করতে সাহায্য করেছে আমার স্নেহের ছাত্রী সাশ্বতী দাস ও বিজেতা সাহা।

যাঁর সজাগ মনোবৃত্তি ও দৃষ্টি সতত গবেষণার কাজে আমাকে নিয়োজিত রেখেছিল তিনি আমার জননী।

বিশাল কাজ। দৃষ্টিভঙ্গীও পৃথক। তবুও নিজস্ব ভাবনায় দেশ ভাবনাকে খুঁজেছি কিংবা দেশভাবনা নিজের ভাবনায় মিশে গিয়ে আমাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। এতে যদি সার্থক হই, সফল হই তবে কৃতিত্ব মঙ্গলময়, করুণাময় ঈশ্বরের।

মুদ্রনে প্রমাদ থেকে গেছে, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থী।

১লা বৈশাখ
শুভ নববর্ষ
১৪০০

শ্রী তুষার কান্তি ঘোষ

নব জাগরণের প্রকৃতি ও বাংলা

ভারতবর্ষের ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী এক অতি উজ্জ্বল সময় প্রবাহের স্রোতস্বিনী স্বরূপা । দেশ জননী তখন বিট্রিশ শক্তি দ্বারা আবদধা । পরাধীনতা মানুষের মনে আনে স্বাধীনতার বাসনা । এই দাসত্ব মনোবৃত্তি হতে উত্থিত হয় জীবনের অন্য সকল মহত্তর চিত্ত বৃত্তির বীজ-প্রাণ ।

এই শতাব্দীতে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই সহজ সত্য ঘটনাই ঘটেছিল ।
"The most powerful effect and enduring result of the British rule in India is the intellectual development of the people on the entirely new line, and the consequent changes in their political, social, religious, and economic out look." ১

এই সময়েই মধ্য যুগের অন্ধ বিশ্বাসের আবর্তের পথ হতে আধুনিক যুগে রূপান্তর ঘটেছিল ভারতের । ভারতবর্ষের প্রায় সমগ্র অংশ পরাধীনতার বেড়াজালে আবদধ ছিল । দেশীয় রাজাদের ক্ষমতা ছিল সীমিত । ভারতবর্ষের ইংরাজ শাসণের সূত্রপাত ঘটেছিল বাংলাদেশে । বাংলা দেশে বৃটিশ রাজত্বের সূচনার একটি বড় ফল ঘটেছিল - বাংলার মানসিকতা তথা মনস্বিতায় বিশাল পরিবর্তন ।

" The process of development followed more or less in the same line everywhere, but it is easier to trace it from begining to end more minutily and definitely in Bengal than in other province. ২

বাংলা তখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক তীর্থক্ষেত্র । বাংলা ভারতের রাজনৈতিক গুরু । যে আদর্শবাদের চেতনা দিয়ে বাংলা ভারতবর্ষকে প্রভাবান্বিত করেছিল তার সুন্দর ব্যাখ্যা পাই স্যার যদুনাথ সরকারের ভাষায়,

If Pericleam Athens was the school of Hellas, the eye of Greece, mother of arts and eloquence, that was Bengal to the west of India under British rule, but with a borrowed light which it had made its own with marvellous canning. In this new Bengal originated every good & great thing of the modern world that passed to the other provinces of India. New literary types, reform of the language, social reconstruction, political inspirations, religious movements and even changes in manners that originated in Bengal, passed like ripples from a central eddey, accross provincial barriers, to the furthest conners of India." ৩

ভারতবর্ষের সমগ্র পরিবেশ তখন বাংলার নিজস্ব চিন্তাধারা, মননশীলতার ঔদার্য, ধর্মীয় প্রবণতা, উদার প্রাণবন্ত রূপ, শিক্ষার পরিবেশ সম্পর্কে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী, সাহিত্য কীর্তির প্রোথিতযশা লেখকবৃন্দের মনোভাবনা, ও অর্থ সামাজিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাসের ভূমিকা, সংস্কারবাদী আন্দোলনের নব নব ঢেউ, গণচেতনার অভিব্যক্তির প্রদত্ত আলোকে উচ্ছ্বসিত ভারতবর্ষও আপন সত্তাকে খুঁজে পেতে নিতে সাহায্য করছিল আপনার ভাবনায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর এই নব জাগরণের মধ্যেই লুকিয়েছিল ভারতীয় সাধনার ভবিষ্যত। রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক সকল বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশের প্রারম্ভ বিন্দু ছিল এই শতাব্দী।

'রেনেসাস' শব্দটির সাথে আমরা ইউরোপীয় ইতিহাসে ইটালির উজ্জ্বলতম দিকের কথা ভেবে ভারতীয় রেনেসাসের কথা অনেকের ধারণা মতো এই ক্ষেত্রে প্রযুক্ত করি। সুশোভন সরকারের মত লেখক মন্তব্য করেছেন - " The impact of British rule, bourgeois economy and modern western culture was felt first in Bengal & produced an awakening known usually as the Bengal Renaissance. For about a Centurry, Bengal's

conscious awarness of the changing modern world was more developed than and ahead of that of the rest of India'. The role played by Bengal in modern awakening of India is thus comparable to the position occupied by Italy in the story of the European Renaissance". ৪

বাংলার এই জাগরণের প্রকৃতি বিচারের প্রশ্ন নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরেই গবেষকদের মধ্যে বিতর্ক চলে আসছে। বহু গবেষকই এই জাগরণের ইতিবাচক দিকটি প্রকাশিত করেছেন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই। কিন্তু কিছু মনস্বিতা এই ব্যাঞ্জনায় ভিন্ন সুর লক্ষ্য করেছেন। " অষ্টাদশ শতকের শেষ দশক গুলোতে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাক দশক গুলোতে বাংলা দেশে যা সংঘটিত হয়েছিল তা হল, গুনগত বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র প্রাচ্যের একটি সভ্যতার উপর পাশ্চাত্যের একটি গতিশীল সভ্যতার অভিঘাত, ঐ প্রাচ্য সভ্যতাটিকে যদি মৃত না-ও বলা যায় বলতেই হয় জড় ও গতিহারা। এই অভিঘাত ছিল আগ্রাসনের, সামরিক বিজয়ের অবশ্যম্ভাবী অচ্ছেদ্য ফল ~~ফল~~শ্রুতি। পরিশেষে, তা এমন এক অভাবনীয় সাড়া জাগিয়ে তোলে এমন এক আশ্চর্য্য গতি ও প্রগতির পথ খুলিয়ে দেয় যা নাকি প্রাচ্য সমাজের রূপান্তরের নিয়ম, নিস্তব্ধ প্রশান্ত জীবন পদ্ধতি, কোন দিক থেকেই চিহ্নিত বা অবধারিত ছিল না। .... এই সমাজেই পাশ্চাত্যের আগ্রাসনের ফলে অকস্মাৎ তার চিরস্থির ঐতিহ্যের আশ্রয় থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়, জীবনের নিরুপদ্রব প্রবাহ বিঘ্নিত হয়। মানবিক ভুবন হয় বিপর্যস্ত। এই আবর্তে এবং শ্বেতচর্মী আগন্তুকের আধিপত্যের নিরন্তর সচেতনতা থেকে আসে অনিবার্য সাড়া, যা রেনেসাঁস অভিধায় আখ্যাত।" ৫

ইউরোপীয় নবজাগরণের সূত্রপাত চতুর্দশ শতাব্দীতে। ক্ষেত্র ইটালি। শিক্ষা দীক্ষা সংস্কৃতি, ভাবনা ও চিন্তায় ইতালি তখনও ইউরোপের মধ্যে অগ্রগণ্য। তাই সেখানেই জাগরণের অনুকূল পরিবেশ দেখা গিয়েছিল। এই জাগরণের স্বরূপ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে সিমন্ডস বলছেন - " By the term Renaissance, or new birth, is indicated a natural movement, not to be explained by this or that characteristic, but to be accepted as an effort

humanity for which at length the time had come and in the onward progress of which we still participate ....
It is the history of the attainment of self conscious freedom to the human spirit manifested in the European races. It is no more a political mutation, no new fashion of art, no restoration of classical standard of taste. The arts and the inventions, the knowledge and the books, which suddenly became vital at the time of the Renaissance, had long been neglected on the shores of the Dead Sea, which we call the middle Ages. It was not their discovery which the Renaissance, but it was the intellectual energy, the spontaneous outburst of inteligence, which enabled mankind at the moment to make use of them. The force then generated still continued, vital and expansive in the spirit of the modern world." ৬

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার জাগরণও এক রেনেসাঁস। প্রত্যেক দেশের চিন্তার চেতনায় রূপ অনুসারে নবজাগরণেরও একটি স্বতন্ত্র অভিব্যক্তির গতিপথ আছে। তাই আমাদের বঙ্গের এই জাগরণের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী আছে, আছে নিজস্ব সুষমা। বাঙালীর জাতীয় মানসের এক বিশিষ্ট্য চরিত্র অনুযায়ী এক অপূর্ব সুন্দর স্বতন্ত্র রসমূর্তি পরিগ্রহ করে বাংলার সমাজ, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, চিন্তা ও চৈতন্যের পরিপ্রেক্ষিতে এর আত্ম প্রকাশ ঘটেছিল এবং সেই দৃষ্টিকোন থেকে এই জাগরণের বিশ্লেষণই শ্রেয়।

ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে বাংলার সামাজিকও অর্থনৈতিক পরিবর্তন

এই নবজাগরণের মূলে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল , কিন্তু প্রতীচ্যের ভাব ও চিন্তাধারার প্রভাব ছিল অধিক মাত্রায় প্রখর । ধর্ম সাহিত্য , শিক্ষা , সমাজ ও রাজনীতি এক কথায় জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে এবং সর্বস্তরে ভাবুক কল্পনা বিলাসী ও ভক্তি প্রবণ বাঙালীর চরিত্রানুসারে তার মানস লোকে ভাবাদর্শের যে নূতন বন্যা উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল , তার তুলনায় বাস্তব জীবনের পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র । সুশীল গুপ্তের মতে " এই পরিবর্তনও অনেক বিষয়ে যতটা ব্যক্তি ও আদর্শগত ততটা সমাজগত নহে । " ৭

মানুষ যতই বুদ্ধিজীবী যুক্তিবাদী হোক না কেন , প্রাচীন ঐতিহ্য ও প্রাধিকারীর উপরে তার আছে এক দুর্নিবার আকর্ষন , শ্রদ্ধা ও মোহ । মানুষ চায় তার আবিষ্কার বিচার ও যুক্তিকে প্রাচীন ঐতিহ্যের দৃষ্টিকোন হতে সমীক্ষা করতে । অতীতের নানা উত্থান পতন ও ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে এক অম্লান সুস্থির জীবন ভাব ও আদর্শের সন্ধান করা তার জন্মগত বাসনা । আর এই জন্যই ইউরোপের জাগরণের সময়ে ক্লাসিকাল যুগের সাহিত্য শিক্ষা ও জীবনের অনুসন্ধানের মূল্যবোধের খোঁজে তারা ওতপ্রোত ভাবে নিয়োজিত ছিল । ঠিক এই সময়েও বাংলায় দেখা দিয়েছিল এই তীব্র অনুসন্ধানী মনোবৃত্তি । বাংলার নবজাগরণ ছিল পাশ্চাত্যের মোহ আবদ্ধ সাংস্কৃতির আদর্শ বোধের তরঙ্গায়িত ধারায় নিজস্ব প্রাচীন ঐতিহ্যের চেতনার প্রাণ সম্পদ গুলোকে খুঁজে বার করে চৈতন্যের আনন্দলোকে দীপ্যমান হওয়া । এতে ছিল প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধা । অন্ধ তামসিক পূর্ণ মনোভাবনা নয় । গতিশীল সমাজ জীবনের প্রয়োজনে পরিশীলিত মনোবৃত্তি ।

তাই আধুনিক শিক্ষায় অনুরাগী ব্যক্তির মুখেও এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই " In the broad family of peoples which constitute India, the recognition of the distinctiveness of the Bengalis

has been in modern times largely bound up with the appreciation of this flowering of social, religious, literary and political activities in Bengal. And today when disintegration threatens every aspect of our life, it is more necessary than ever to recall our past heritage, to go over again the struggles and achievements which had built up a proud tradition, now in danger of being forgotten".

নব জাগরণের কাল খণ্ডে রামমোহন ও তাঁর সঙ্গীগণ

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা যখন নব জাগরণে উদ্দীপ্ত হচ্ছিল, তার সুবর্ণময় শহর কেন্দ্রিক পটভূমি রচনা করেছিল কলিকাতা। ১৬৯০ সালের প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা ও রামমোহনের ১৮১৫ সালে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস এই দুই সময়ের ব্যবধানে কলিকাতা ছিল সম্পূর্ণ ভাবে ভিন্ন নগরী।

কলিকাতার নগর জীবনে তখন একদিকে প্রবল পশ্চিমী হাওয়া। পাশ্চাত্য দর্শনের ঝলকে কলিকাতা উদ্বেল। ভোগবাদী জীবনচর্চার এমন সহজ লব্ধ উপকরণের প্রাচুর্য শুধু বাংলায় কেন ভারতবর্ষের অন্যত্র কোথাও ছিল না। ইন্দ্রিয় সংবেদ্য জীবনের প্রয়োজনীয় সব সম্ভারই কলিকাতায় বর্তমান ছিল। আবার কলকাতায় ছিল প্রগতিশীল ও সর্বাধুনিক ইউরোপীয় চিন্তার কেন্দ্রস্থল। অপর পক্ষে এখানেই ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলনের আবেদন প্রথম উচ্চারিত হয়েছে।

প্রথমে রামমোহন, পরে বিদ্যাসাগর সমাজ জীবনে গতি সঞ্চার করতে সমর্থ

হয়েছিলেন । ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নির্বাধ কেন্দ্র , বুদ্ধিমার্গীয় ঘাত - সংঘাত ইত্যাদি আলোড়নের অন্তরালে কলিকাতাতেই ছিল ধনসম্পদের আভিজাত্য ও চিন্তা মননের আভিজাত্য ।

রামমোহন এই কলকাতায় স্থায়ী ভাবে আসন পাতলেন ১৮১৫ সালে। ১৮৩৩ এ তাঁর মৃত্যু । উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে এই কাল খন্ড রামমোহনের যুগ । ঐ সময়ে কলিকাতা তাঁর চিন্তা , মনন , কর্মে ও ব্যক্তিত্ব বোধের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল ।

রামমোহনের কালেই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দুই ভিন্ন ধর্মী সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংঘাত হতে উদ্ভূত সামাজিক আবর্তের কলেবর এক নতুন রূপ ধারণ করে । ইংরেজ রাজপুরুষ পরিব্রাজক শিক্ষক পাদ্রী প্রভৃতির মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের যুক্তি ধর্মী মনন বোধ ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে ভারতীয় মনকে প্রবল ভাবে নাড়া দেয় । আর ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে ওদের শ্রেয়োবাদ প্রাচ্যের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে তোলে ।

এর শুভ পরিনতি হয়েছে বাংলার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বিন্দুর দ্রুত বিচলনে । ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল থেকেই কলকাতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামোয় মুখ্য ভূমিকার আসনে স্থিত ছিল । তা ছাড়া সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা , এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা এবং এর মাধ্যমে ঐশ্বর্যশীল সংস্কৃত সাহিত্যের পুনরুজ্জীবনের কার্য্যক্রম গ্রহণ , ইংরেজ ভাষাবিদদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন এই সকল যুগান্তকারী ঘটনায় কলকাতার সাংস্কৃতিক মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় । এই পর্ব বা কাল খন্ডে বাংলার জাগরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যুগধর্মকে আকন্ঠ পান করার প্রবণতা ; আধুনিকতার কাল স্রোতে অবগাহন করার এক দুর্দমনীয় আগ্রহ । যুক্তির পরীক্ষায় , বিজ্ঞানের পরীক্ষায় যা সিদ্ধ শুধু তাকেই গ্রহণ করার আকাঙ্খা । এই যুগ ধর্মের কষ্টি পাথরে তাঁরা প্রচলিত সামন্ত তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিটি অনুশাসনকে যাচাই করায় আগ্রহী ছিল । অন্ধ বিশ্বাস আর কুসংস্কারের প্রতি তারা প্রচন্ড আঘাত

হানতে চাইলেন । এই সময়েই রামমোহন কলকাতায় এলেন ।

Miss Collect রামমোহন সম্পর্কে এই সময় লিখেছেন "He was now in the Prime of manhood. A majestic man, nearly six feet in height and remarkable for his dignity of bearing and grace of manner, as will as for his handsome countenance and sparking eyes. Thick clouds of ignorance and supertition hung over All the land, the native Bengali public had few books and no news propers. Idolatry was universal, and was often a most revolting character ; polygomey and infantacide were widely prevalent and the lot of Bengali world was too often a tissue of ceaseless oppressions and misseries, while as the crowaing horror the flames of the Suttee was lighted with almost in credible frequency even is the immediate vicinity of Calcutta. He did not however, confine his activity to use or two subjects. His alert and eager mind ranged with keen interest over the whole field of contemporary life, and on almost every branch there of the left the previous of his individuality. Alike religion, politics, literature & philosophy his labours, will be found among the earlist and most effective in history of native Indian reform". ৯

রামমোহনের জন্ম শত বার্ষিকী উপলক্ষে ভাষণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে ভারতের আধুনিক যুগের উদ্গাতা বলে উল্লেখ করেছেন । "Rammohan was the only person in his time, in the whole world of man, to

realize completely the significance of the Modern Age of India. ১০

রামমোহন ছিলেন মানবতার পূজারী কিন্তু সেই মানবিকতা খণ্ডিত নয় । দেশের জাতির সংকীর্ণ সীমা রেখায় আবদ্ধ নয় । মানবতাকে তিনি তাঁর সমগ্রতায় বিশ্বব্যাপী পরিসরে অবলোকন করেছেন । তাই মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক অচলায়তকে ভেদ করে ইউরোপে নতুন ভাব ধারার দূর্বার জয়যাত্রা তাকে অভিভূত করেছে ।

ইউরোপের দুই যুগান্তকারী আন্দোলন - আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ও ফরাসী বিপ্লব তাঁর মনকে ভীষণ ভাবে প্রভাবিত করেছিল । মানব স্বাধীনতার উৎস - ভূমি ইউরোপের ভাষা সাহিত্য দর্শন গভীর ভাবে অনুশীলন করার আর ইউরোপের এই জ্ঞান দীপ্তিকে হৃদয়ে গ্রহণ করার আকাঙ্খা তাঁর প্রবল ছিল । রামমোহন ইউরোপকে খ্রীষ্টীয় সভ্যতার ভিত্তিভূমি হিসেবে না দেখে তিনি দেখেছিলেন এর বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিকে ।

ইউরোপের এক নতুন মুক্ত মনের চিন্তার জনক যাঁরা — বেকন , নিউটন , টম পেইন , হিউম , বেন্থাম , লক , ভলতেয়ার — এঁদের চিন্তাধারার প্রভাব তাঁর উপর ছিল । পাশ্চাত্যের এই যুক্তিবাদী প্রগতিশীল চিন্তা ধারায় অবগাহন করেই রামমোহন এদেশের পুঞ্জীভূত কুসংস্কার , মধ্যযুগীয় অন্ধ অনুশাসন , জাতিভেদ , কৌলীন্য প্রথা , নারী নির্যাতন , সতীদাহর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত করলেন । আবার বিশ্বের রাজনৈতিক প্রাঙ্গণে যখন অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে , স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিজয় ঘোষিত হয়েছে , তাতে তিনি আনন্দিত হয়েছেন , সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নির্দয় বেড়াজালে যখন কোন মুক্ত আবদ্ধ তখন তিনি হোন ব্যথিত । বিশ্বের সঙ্গে এই আত্মীয় বোধ — রবীন্দ্রনাথ তাকেই আধুনিক মনের বড় বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকার

করেছেন । সেই দৃষ্টি কোনের জন্যই উনিশ শতকের প্রথম পর্বে ফ্রান্স , স্পেন ,নেপলস , পর্তুগাল , ইতালি , জার্মানী প্রভৃতি দেশে যেখানেই গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠেছিল রামমোহন তাদেরই শ্রদ্ধা জানিয়েছেন । ১৮৩০ এর ফরাসী বিপ্লবের সাফল্যকে তিনি স্বাধীনতার আদর্শের সাফল্য বলে মনে করেছেন ।

রামমোহন যুক্তিবাদী সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । তাঁর একেশ্বর বাদের মধ্যে লৌকিক কল্যাণ চিন্তাই মুখ্য ছিল । তিনি বলতেন জাতির উন্নতি করতে হলে প্রত্যক্ষ বা বাস্তবকে স্বীকার করতে মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধির আরাধনা করতে হবে শক্তির সঞ্চয় করতে হবে । জাতির প্রতি তাঁর তীব্র ভালবাসা তাঁকে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে প্রেরণা দিয়েছিল । সামাজিক অন্যায় অবিচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রামমোহনের একক সংগ্রাম দেশবাসীর মনে এক দৃঢ় আত্ম প্রত্যয় গড়ে তুলেছিল । ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় সংবাদ পত্রের উপর নানা প্রকার নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলে রামমোহন তাঁর ফারসি পত্রিকা ' মিরাত উলআকবর ' বন্ধ করে দেন এবং এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন " হৃদয়ের অজস্র রক্ত বিন্দুর বিনিময়ে যে মর্যাদা অর্জন করেছ সামান্য খুদ কুঁড়োর আশায় তুমি তা একজন মূঢ়ের দয়ার নিকট বিকিয়ে দিও না ।" ইংরেজ শাসনতন্ত্রে ইংরেজ নির্ভরতার দিনে এ এক নতুন কন্ঠ স্বর । আর এই স্বাধীনতা প্রেমিক কন্ঠই একদিন ঘোষণা করেছিল " স্বাধীনতার শত্রু এবং স্বৈরাচারের মিত্ররা শেষ পর্যান্ত কোনদিন জয়লাভ করেনি , করবে নাও কখনও ।" রামমোহন ব্রিটিশ শাসনকে চিরন্তন বলে মনে করেননি । " অসংখ্য অভিনব পরিবর্তনের আবর্তে তিনি স্থৈর্য্য হারাননি , কারণ তার সংস্কৃতির মূল ছিল দেশের মাটিতে প্রোথিত ।" ১১

রামমোহনের মৃত্যুর পর যে ব্রাহ্ম সমাজ প্রভাব বিস্তার করেছিল রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজের সাথে তার যথেষ্ট পার্থক্য আছে । রামমোহন চির জীবনের সকল সাধনার সম্পদ তাঁর ব্রাহ্মোপসনা । এই ব্রাহ্মোপসনাকে তিনি সমাজে এক সুসংবৃত রূপ দিয়েছিলেন ।

নতুন চিন্তাধারায় ভাবনায় সম্পৃক্ত হয়ে রামমোহন মধ্যযুগীয় ধ্যান ধারণার গ্রন্থি গুলোর উপর আঘাত হানলেন। বেদান্ত বাদের অনুশীলন তাকে প্রেরণা দিয়েছিল ভারতীয় সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করায়। তাই তিনি জাতি ভেদ প্রথার বিরোধিতা করেছেন। ১৮২৭'এ তিনি 'বজ্রসূচী' অনুবাদ করেন যে গ্রন্থ বর্ণভেদে ব্যবহার তার তীব্র সমালোচনা করেছেন। ১৮২৮' এ তিনি এক চিঠিতে বললেন জাতিভেদ প্রথা জনগণকে তার দেশাত্ম বোধ হতে দূরে করে রাখছেসেইজন্য ধর্মীয় সংস্কারের আশু প্রয়োজন যার মাধ্যমে মানুষ রাজনৈতিক চিন্তার প্রসারতা ও সামাজিক সুবিধা পাবে। তিনি ব্রিটিশ রাজত্বের পর স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখতেন। তিনি অনুভব করেছিলেন ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় মধ্যবিত্ত শ্রেনীর উদ্ভব ঘটেছে। একদিন এই মধ্যবিত্ত শ্রেনীই ভারতের মুক্তি আন্দোলনের পথ দেখাবে। "Again & again there fitted across his vision the prospect of a free India, after a period of the British tutelage, and he expressed this view is an interview with Frenchman, Jacquemont, is a discussion with standford Merton in a letter on 18 August 1828 to crowford. He felt that English rule was creating a middle class in India which would lead a popular movement of Emancipation".[১৩] (On the Bengal Renaissance- Susobhan Sarkar P-20)

১৮৩৩' এ রাম মোহনের মৃত্যু ঘটল। গোড়া পন্থীদের তীব্র আক্রমণ সত্ত্বেও রামমোহন রেখে গেলেন এক উদার নৈতিক পরিমন্ডলে স্বাধীন চিন্তাধারা। সমাজ তথা দেশবাসীকে জীবন্ত অনুভূতির উপর স্থাপন করলেন। শিক্ষা, সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের পথ ধরেই যে স্বাধীনতার আন্দোলনের ক্ষেত্র ভূমি প্রতিষ্ঠা করবে, এই দৃপ্ত মানুষটি নিজের জীবন দিয়ে এই সহজ সত্যকে প্রকাশিত করেছেন। তাই রামমোহনের অনুপস্থিতি তাঁর দীপ্ত আদর্শ বোধের প্রাজ্জ্বল প্রবাহ এক দিকে যেমন দেশবাসীকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তেমন ভাবে অন্যদিকে রেখে গিয়েছিল তারই আদর্শ বোধে উদ্দীপ্ত উত্তর সূরীর দল, যাঁরা রামমোহনকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। রামমোহনের

অবদান – তিনি ভারতীয় মানসিকতায় মুক্ত প্রবাহ এনে দিয়েছিলেন তাই পরবর্তীতে বাংলার তথা ভারতের মাটিতে অত্যন্ত স্বচ্ছ ভাবে নিজেকে বিকাশ করার সুযোগ পেয়েছিল ভারতবাসী ।

রামমোহন বাংলা সাহিত্য প্রসার করলেন । ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের সাথে ও দেশীয় পন্ডিতদের সাথে তাঁর তর্ক বিতর্ক বাংলা গদ্যের বিকাশ ঘটাল । চিন্তার প্রাঞ্জল সাবলীলতার মতো তার ভাষা ছিল সহজ ও ঋজু । ভারতীয় চেতনার মানসিকতা ভাষার মাধ্যমেই প্রকাশ করলেন । এ যেন এক মুক্ত মনের প্রতিষ্ঠা ভূমির সৃষ্টি হল তাঁর সাহিত্যবাদ থেকে । এই মুক্ত মনই পরবর্তীতে জন্ম দিল জাতীয়তাবাদের ।

রামমোহন চলে গেলেন ১৮৩৩' এ । তাঁর অনুগামীরা ছিলেন দ্বারকা নাথ ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, কৃষ্ণ মোহন মজুমদার, ব্রজ মোহন মজুমদার, কালীনাথ মুন্সী, চন্দ্রশেখর দেব, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, নন্দকিশোর বসু, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি । রামমোহন প্রবর্তিত নব সংস্কার আন্দোলনে তদানীন্তন সমাজ ব্যবস্থা ও অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সঙ্গী ছিলেন এঁরা । ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ না করে বরং এই শাসনের আওতায় থেকে স্বাধিকার অর্জন করা, সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা, সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে অন্তরায় সামন্ততান্ত্রিক কু - শাসন গুলো পরিহার করা এই ছিল রামমোহনীয় অনুগামীদের মানসিক চিন্তা ।

ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী

এই রামমোহনীয় যুগে দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজ গঠনের আহ্বান জানিয়েছিল এক দল অতি উৎসাহী যুবক বৃন্দ । ' ইয়ং বেঙ্গল ' বলে তারা খ্যাত । হেনরী লুইস ভিভিয়ান ডিরোজিও ছিল এদের নেতা । ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে সতের বৎসর বয়সে সর্ব -

সংস্কার মুক্ত যুক্তিবাদী , দার্শনিক , স্বাধীন চিন্তার উপাসক ডিরোজিও হিন্দু কলেজে শিক্ষক রূপে যোগ দেন । ডিরোজিও বাংলার সামাজিক ভিত্তিকে প্রচন্ড ভাবে নাড়া দিয়েছিলেন। শাসন সামাজিক সংস্কার থেকে আরম্ভ করে , স্বদেশ প্রীতি ব্যক্তি স্বাধীনতা, স্ত্রী শিক্ষা , ঈশ্বরের অস্তিত্ব , প্রতিমা পূজা , পুরোহিত সম্প্রদায় , পাপপুণ্য , অদৃষ্টবাদ ইত্যাদি সর্ব বিষয়েই স্বাধীন যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সর্ব প্রকার সংস্কার মুক্ত প্রাঞ্জল দৃষ্টি ধারায় তিনি ছাত্রদের উৎসাহিত করেছেন ।

হিন্দু কলেজের এই শিক্ষা গুরু ডিরোজিওকে পেইন , হিউম , গিবন প্রভৃতির চিন্তাধারা তাঁকে সংশয় বাদী করে তুলেছিল । তিনি রামমোহনের আস্তিকতার গন্ডীকে নির্দিষ্ট বলে মেনে নিতে পারেননি । তিনি বলতেন আস্তিকতা , নাস্তিকতা বিচার সাপেক্ষ ।

তিনি স্বাধীনতার মন্ত্রে তরুণ ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করেছেন । অর্থনৈতিক থেকে আরম্ভ করে সকল প্রকার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য তরুণ সমাজকে উৎসাহিত করেছেন আর অন্য দিকে ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষের পরাধীনতার জ্বালা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন । দেশ প্রেমের চেতনা , পরাধীন ভারতের বেদনা আর বৈভবময় স্বাধীন ভারতের কামণায় তাঁর মানসিকতার এক অপূর্ব উত্তরণ ঘটেছে । তাঁরই লেখা - 'The Harp of India','To India my Native Land, Independance' প্রভৃতি কবিতায় তাঁর চিন্তার মর্মবাণী গ্রথিত আছে ।

'To India my Native Land ' কবিতায় শৃঙ্খলিত ভারতের প্রতি কবির কি অপূর্ব মমত্ব বোধ জাগরিত হয়েছে —

My country, in they day of glory past
A beautious halo circled round thy brow,
And Worshipped as a diety those waste
Where is that glory, where that reverence now ?

Independence কবিতায় তাঁর বিদ্রোহী আত্মা বলদর্পী ইংরাজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে । তিনি জানতেন শক্তির কবল থেকে একদিন স্বাধীনতার প্রদীপ জ্বলবেই ।

'Look on that lamp which seems to glide
Like a spirit O'er the stream
Casting upon the darkened tide
Its own myxterious beams'.

ইউরোপীয় সমাজের পক্ষ হতে সম মর্যাদার দাবিকরে সেই সময়ে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল , ডিরোজিও ছিলেন তার পুরোভাগে । কারণ তিনি বলেছিলেন —
' I love my country and I love justice, be therefore,
I ought to be here'.

ডিরোজিওর বস্তুবাদী ভাবধারা , প্রগতিশীল জীবন দর্শন , দেশ প্রেমের ভাবনা হিন্দু কলেজে ইংরেজ ও দেশীয় কর্তৃপক্ষের একাংশ পছন্দ করেননি । কারণ তাঁরা শুধু দেশীয় সামন্ততান্ত্রিক অনুশাসনের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেননি । তাঁরা খ্রীষ্টান পাদরীদের গোঁড়ামি ও সহ্য করতেন না । পাদরী ডাফতাই এঁদের উপর বিরক্ত হয়ে লিখেছেন " এঁদের মতে খ্রীষ্ট ধর্ম হল কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখতে এক উন্নততর চেষ্টা মাত্র । তাদের চোখে পাদরীরা ছিলেন ধূর্ত দুশমন অথবা অশিক্ষিত গোঁড়ার দল । তারা পাদরীদের ইউরোপের ব্রাহ্মণ বলে ঠাট্টা করতেন । " ১৪ ফলে তিনি বিতাড়িত হয়েছিলেন হিন্দু কলেজ থেকে ।

ডিরোজিও নিজে ছিলেন ইউরোপের বস্তুবাদী জীবন দর্শনে বিশ্বাসী । অষ্টাদশ

শতাব্দীর বিপ্লবী ইউরোপের হিউম পুরোহিততন্ত্র, রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রকে আঘাত করেছিলেন। হিউমের আদর্শে দীক্ষিত ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ও যুক্তিবাদকে আশ্রয় করে ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। এই নব্য গোষ্ঠীর কাছে টম - পেইন' এর 'Age of Reason' বিশেষ আদৃত ছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ও ফরাসী বিপ্লবকে পেইন' এর চিন্তাধারা বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। প্রচলিত ধর্মব্যবস্থা যা ছিল স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের সহায়ক তার বিরুদ্ধেও পেইনের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল। পেইন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দ্বিধাহীন নির্লজ্জ শোষণকে মেনে নেননি। তিনি মন্তব্য করছেন - "For the domestic happiness of British the peace of the world, I wish she had not a foot of land but what is circums_cribed within her own island. Extent of dominion has been her ruin and instead of civilizing others has brutalized herself." এ হচ্ছে তাঁর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা।

তাই এদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে Bengal Spectator। বৈষম্য মূলক কালা কানুনের বিরোধিতা এঁরাই করেছেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার আইনের অগনতান্ত্রিক ধারাগুলোর এঁরা সমালোচনায় সমালোচিত করেছেন। এই ডিরোজিয়ানরা ডিরোজিওর পরও আন্দোলন চালিয়ে গেছেন, এঁদের মধ্যে ছিলেন রাম গোপাল ঘোষ, রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, দক্ষিণা রঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

এই যুগে দক্ষিণা রঞ্জন বলেছেন "ভারতের দারিদ্র্যের কারণ তার পরাধীনতা"। ১৫ রাম গোপাল ঘোষ বলেছেন "আমাদের মতো দেশে এবং আমাদের মতো সরকারের অধীনে ভারত বাসীর যোগ্যতা ও মৌলিকতা যে যথাযোগ্য পুরস্কার পাবেনা – এ তো জানা কথা। আমাদের দেশ স্বাধীন নয়। তাছাড়া আমাদের সরকারও দেশের জনমতের প্রতিনিধিত্ব করে না।" ১৬

কিন্তু এই ডিরোজিওদের হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা , সমাজের আচার পদধতির প্রতি বিতৃষ্ণা , ভাবনা ও কার্য্য কলাপে উগ্রতা বোধের জন্য তাদের এই নব্য বঙ্গ আন্দোলন ক্রমে স্তিমিত হয়ে এল । এই আন্দোলন সমাজ মুখী হলো না ।

ফলে " ডিরোজিওর বহু শিষ্য স্থৈর্য্য হারিয়েছিলেন এবং ঝুঁকে পড়েছিলেন বিপ্লবী ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেনীর রোমান্টিক ব্যক্তিবাদের দিকে , হিউমের সংশয় বাদের দিকে , রুশো ও পেইনের সাম্য ভাবনার দিকে । হিন্দু শাস্ত্র তাঁদের চোখে অযৌক্তিক ও যুগ ধর্ম বিরোধী , হিন্দু দেব দেবী অধঃপতিত অতীতের প্রতীক , হিন্দু নীতি ও আচার — অমানবিক ও অবাস্তব । ডিরোজিওর ব্যক্তিগত নীতির ভিত্তি (ধর্ম ও দর্শন) গুরু বা শিষ্য কারুরই দ্বন্দ্ব দোলাচল , পরিবার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার বিপরীত টানে পর্যুদস্ত , দেশের রাজনীতিতে অবহেলিত ও অর্থনীতিতে অসংজ্ঞেয় , বিদ্রোহী এই তরুণের দল মূল্যহীনতার প্রতিক্রিয়ায় , বিচ্ছিন্নতা বোধের দুঃখে আশ্রয় নিলেন পশ্চিমের বাহ্যিক অনুকরণে । " ১৭

"The flutter caused in Bengal society by the Derozians was, however, is the perspective of history something ephemeral and unsubtantial. They failed to develop my movement outside their own charmed circle and the circle it self could hardly keep any significant form". ১৮

এত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তখনকার ঐতিহাসিক অবস্থার পরিবেশে ইয়ং বেঙ্গল জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক চেতনার ধারার আকাশে এক ঝলক চোখ ধাঁধানো বিদ্যুৎ শিখা — যা মুহূর্তে আলোকিত করে ম্লান হয়ে যায় শুধু রেখে যায় তার আলোড়ন টুকু । এটাই বা মানসিক চিন্তাধারার বিবর্তনে কম কিসের ?

বিদ্যাসাগর ও তাঁর সংস্কার ক্ষেত্র

" আলবিয়নের মোহিনী কণ্ঠে মুগ্ধ ঘর ছাড়া তরুণের দল একদিন প্রবীন হল । আপন ঘরে ফিরতে চাইল । তারা দেখল মফস্বলের দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান বিদ্যাসাগর , সংস্কৃত শিক্ষিত বিদ্যাসাগর , শুধু অজেয় পৌরুষ ও অক্ষয় দ্বারা ঐতিহ্যকে কত সার্থক ভাবে আধুনিকী করণেকাজে লাগিয়ে ছিলেন । " ১১

রামমোহন ও ডিরোজিও পন্থীরা যখন ইংরাজী ভাষার মুখ্য প্রবক্তা , বিদ্যাসাগর তখন নিরবে মাতৃভাষার সাধনার অঙ্গনে সবাইকে আহ্বান করছেন । এখানেই তাঁর বিবেক, কালচেতনা ও ব্যবহারিক বুদ্ধির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় । যদিও তিনি ইংরাজী চর্চাকে ছাত্রদের মানস পরিমন্ডল পরিশুদ্ধ করার হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করতে চেয়েছেন তবুও তাঁর ব্যবহারিক বোধ তাঁকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত করেছিল যে ইংরাজীকে দূরবর্তী পল্লীর প্রান্তে নিয়ে যাওয়া এক অবাস্তব প্রস্তাব । আছাড়া পাশ্চাত্যের যুক্তি - বাদী মনন ও মূল্য বোধের বাহন বা মাধ্যম ইংরাজী হতে পারেনা । হবে মাতৃভাষা ।

এই দৃষ্টি কোন থেকেই তাঁর অন্তকরণে প্রতিভাত হয়েছিল শিক্ষা বিস্তারের আগ্রহ । তাই তিনি বাংলা স্কুল খোলার জন্য অত্যাধিক আকুতি দেখিয়েছিলেন । সরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যম ও প্রচন্ড শ্রম সহিষ্ণুতা যুক্ত হয়ে বিভিন্ন জেলায় বাংলা মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় । এর পাশা পাশি ছিল তাঁর স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচীর রূপায়ন । বিদ্যাসাগর চেয়ে ছিলেন শিক্ষার মাধ্যমেই অচল সমাজে গতি সঞ্চার করতে । বিদ্যাসাগরের এই শিক্ষা বিস্তারের কার্যকলাপে পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথও মুগ্ধ হয়ে অনুভব করেছিলেন — মনের চলাচল যত বড় হয় দেশের পরিধিও তত বড় ।

বিদ্যাসাগরের জীবনের বড় বৈশিষ্ট্য মানবতা । প্রবাহমান সমাজে প্রচুর সমস্যা । সেই সমস্যা গুলো যুক্তি বিচারে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যখন মানুষ সেই

সমাজের সাথে আত্মগত হয়ে যায় । এর পরেই আসে কালের মানুষকে সৃষ্টির ঐশ্বর্য্যে মন্ডিত করা । সংবেদনশীল মানুষ একেই জীবনের ধ্রুব সত্য বলে গণ্য করে । তাই যেখানেই তিনি ছিলেন সর্বত্রই মানবকল্যাণের জন্য সেবা করে গেছেন । জাতিধর্ম বর্ণ স্ত্রী পুরুষ নির্বিচারে তাঁর সেবার কাজ চালিয়ে গেছেন । ১৮৬৮ সালে বর্ধমানে মুসলমান বস্তিতে তাঁর সেবা কার্য্যের কথা স্মরণীয় । তখনকার দিনে জাতি বর্ণ ও বর্ণ বিদ্বিষ্ট সমাজে জাত খোয়াবার তোয়াক্কা না করে মানবতার সেবায় অগ্রসর হওয়া একটা নতুন মানবিক দৃষ্টি কোণের ইঙ্গিত বহন করে ।

স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের কার্য্যক্রম এবং হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের জন্য দেশ ব্যাপী আন্দোলনের সংগঠন এসবের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্যও সেই মানব স্বীকৃতি । ভারতীয় অধ্যাত্ম চিন্তায় যদিও সমস্ত মানুষকেই অমৃতের সন্তান বলে ঘোষণা করা হয়েছে তথাপি প্রত্যক্ষ সমাজ গঠনে কার্য্যত মানুষের মধ্যে অনেক অসঙ্গতি রেখে দিয়েছে । বিদ্যা - সাগরের মধ্যে যে মানবিক বোধের উদ্বোধন দেখা যায় তা পাশ্চাত্যের দেহাত্ম বাদী মানবতার ফলশ্রুতি । বিদ্যাসাগর ছিলেন কর্মবাদী । তাই তিনি তাঁর জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সংগ্রাম করেছেন কর্মের মধ্য দিয়েই । বিধবা বিবাহের আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি শত শত বৎসরের অবক্ষয়িত ভারতীয় সমাজ ব্যাবস্থার অবশিষ্ট মূল্য বোধটুকুকে বাঁচিয়ে রাখার দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা করেছিলেন । এই বিবাহ পদ্ধতি রূপায়ণে বিশ্বের সকল সমাজের গতিপ্রকৃতি তাঁর কাছে এসে ধরা দিয়েছিল । তিনি বিশ্বের সামাজিক বিবর্তন সম্পর্কে সদা জাগ্রত ছিলেন । তাই এই ভারতবর্ষের মাটিতে বিশ্ব জনীন অনুভূতি নিয়ে গড়ে তুলে ছিলেন সাধনার ক্ষেত্র এবং সাধনার উপজীব্য বিষয় বস্তু ছিল মানুষ ।

রমেশচন্দ্র দত্ত ঠিকই মন্তব্য করেছেন " একদিকে স্বার্থপরতা , জড়তা , মূর্খতা , অন্য দিকে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর । একদিকে বিধবাদের উপরে সমাজের অত্যাচার , পুরুষের হৃদয় শূন্যতা , নির্জীব জাতির নিশ্চলতা, অন্যদিকে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর । একদিকে শত শত বৎসরের কুসংস্কার ও কুরীতির ফল , অন্য দিকে ঈশ্বর চন্দ্র

বিদ্যাসাগর। একদিকে নির্জীব, নিশ্চল, তেজোহীন বর্ণ সমাজ অন্য দিকে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর।"

তাঁর সময়ে যখন ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী বিদ্রোহে কলরব মুখর হয়ে শুধু নিজেদের চিন্তা ও বুদ্ধির মার্গে আবদ্ধ করেছিলেন, ঈশ্বর চন্দ্র সেখানে নিজের কর্মশক্তির প্রেরণায় নতুন সমাজ রচনার চেষ্টা করেছেন। নব্য বঙ্গের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ যখন অবক্ষয়ের পথ প্রশস্ত করছিল তখন তিনি চারিত্রিক দৃঢ়তা শুদ্ধ ও সংযত জীবন নিয়ে সৃষ্টির কাজকে নির্মল ও প্রোজ্জ্বল করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন।

তাঁর উচ্চশিক্ষাক্রমে, প্রাধান্য পেয়েছিল ইংরাজী ভাষা, অঙ্ক, বিজ্ঞান, অর্থ-নীতি ও ইতিহাস। স্ত্রীলোক সহ জনসাধারণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার পক্ষ নিয়ে তিনি লড়াই চালিয়ে ছিলেন সরকারের সঙ্গে এবং শুধু কর্মোন্নতি নয়, প্রাপ্ত পদ মর্যাদা বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করেন নি। মধুসূদনের করুণ পরিণতির মতো কর্তৃপক্ষের চাপে বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ মধ্যবিত্ত সহযোগিতার নীতিতে বড় ফাটল ধরিয়েছিল। তবুও নিজের প্রশস্ত স্কন্ধে তিনি তুলে নিয়েছিলেন অসমাপ্ত জনশিক্ষা, স্ত্রী শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের দুরূহ ভার। স্বাবলম্বনই স্বরাজের প্রথম সোপান সে কথা দেখিয়ে গেছেন এই বীর ব্রাহ্মণ। তাঁর একক ও সর্বস্ব পণ সংগ্রাম জাতীয়তাবাদকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নাই। ২০

" ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থাকে যতটা যুগোপযোগী করা সম্ভব, পাশ্চাত্যের ন্যায় শাস্ত্রাদি থেকে পাওয়া সার্বজনীন মানবিক আদর্শে যতটা উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব, আধুনিক দৃষ্টিতে যতটা সমৃদ্ধ করা সম্ভব, বিদ্যাসাগরের ধ্যান ধারণা সেই লক্ষ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তিনিযে নৈতিক মূল্যমানের কাঠামো নির্মাণ করেছিলেন, বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে তাও ঐ শাসন কাঠামোর সঙ্গেই একাত্ম। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে সীমাকে চিহ্নিত করতে পারাই আসল কথা নয়, সীমার মধ্যে বিচরণশীল থেকেও

কোন কর্ম ও ব্যক্তিত্ব সীমাকে লঙ্ঘন করে এবং কালান্তরের পথ দেখায় , তাকে জানাই ও ইতিহাসকে তার প্রবহমানতা ও সৃষ্টিশীলতা মধ্যে আবিষ্কার করা সেই বিচারে বিদ্যাসাগর আধুনিক বাংলার অন্যতম স্থপতি , যাঁর আর্বিভাব না ঘটলে সংস্কৃতির রূপান্তর ও নবায়ণ ব্যহত হত । " ২১

অক্ষয় দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ

রামমোহনের ভাবনা ও ইয়ং বেঙ্গল দলের উদ্দীপনা শিক্ষিত সমাজে এক জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধান ধর্মী আলোড়নের সৃষ্টি করল । রামমোহন প্রবর্তিত ব্রাহ্ম সমাজের মঞ্চ শুধুমাত্র ধর্মীয় সংস্কারের পথকে আঁকড়ে থাকল না । সমাজকে প্রগতি ও আধুনিকতার পথে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হলো ।

ব্রাহ্ম আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর । এবং ব্রাহ্ম সমাজের গঠনের কাজে তার প্রধান সহচর ছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত । একই মার্গের যাত্রী হলেও তাদের দৃষ্টি কোন ও প্রবনতা ছিল ভিন্ন । দেবেন্দ্র নাথ ছিলেন অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন আর অক্ষয় কুমার ছিলেন বস্তুবাদী ও তার্কিক ।

এই দুই বিপরীত মুখী প্রবণতা সমস্যার সৃষ্টি করল । ক্রমশ দেবেন্দ্র নাথের ভাবপ্রবণ ভক্তিবাদী ভাবধারা এবং , অক্ষয় কুমারের বস্তুবাদী - যুক্তিবাদী ভাব - ধারার মধ্যে পার্থক্য নিয়ে ব্রাহ্ম সমাজের অভ্যন্তরে এক দারুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো । অক্ষয় কুমার প্লেটো , এ্যরিস্টটল , বেকন , লক , কোঁতে লাপলাস , স্পেন্সার প্রভৃতি চিন্তাধারার মাধ্যমে তিনি অনুপ্রাণিত ছিলেন । বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক মনোভাব প্রচারে অক্ষয় কুমার সমসাময়িকদের মধ্যে অগ্রনী ছিলেন ।

আধুনিক দৃষ্টি থেকে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের পুনর্বিচার হওয়া প্রয়োজন তিনি এই মত পোষণ করতেন। বেদ, উপনিষদ, মনু সংহিতা প্রভৃতি মন্থন করে, এই কথাই তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে বিধবা বিবাহ অসবর্ণ বিবাহ, প্রেম ঘটিত বিবাহ নারী পুরুষের দুইয়ের পক্ষেই বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদি প্রত্যেকটিই "বেদোক্ত ও মনু সংহিতা প্রোক্ত ধর্ম ব্যবহার।"

ধর্ম সম্পর্কেও অক্ষয় কুমারের মতের পরিবর্তন ঘটেছিল। শেষ জীবনে তিনি ব্রাহ্ম আন্দোলনের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন। "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারে তিনি মনে করেছিলেন যে, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে কাজ করাটাই ধর্ম, না করাই অধর্ম।" ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণে তার প্রার্থনার এক গনিতানুযায়ী সমীকরণ করে দেখান হয়েছে —
পরিশ্রম = শস্য, প্রার্থনা + পরিশ্রম = শস্য, অতএব প্রার্থনা = 0 । ২২

পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের স্বরূপ তিনি ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। এই শাসনে মনুষ্যত্বের অবমাননা সম্পর্কে তিনি সজাগ ছিলেন। তিনি এই শাসনের কুফল সম্পর্কে মন্তব্য করছেন "তোমার অধিকারে আমাদের স্বাস্থ্যক্ষয়, বলক্ষয় ও ধর্মক্ষয় ঘটিতেছে। তুমি অধিক বিতরণ কি সংহরণ করিতেছ, কে বলিতে পারে? তুমি শিক্ষা দান করিতে গিয়া স্বাস্থ্য হরণ করিতেছ, অর্থোপার্জনের বিবিধ পথ প্রস্তুত করিতে গিয়া শ্রমাতিশয় ও তাহার বিষময় ফলপুঞ্জ উৎপাদন করিতেছ। বাণিজ্য বৃত্তি প্রসারণ করিতে গিয়া অশেষ দোষকর দুর্মূল্যতা দোষ ও তৎসহ কৃত অধর্ম বংশের বৃদ্ধি করিতেছ।" ২৩

অবশ্য ইংরাজী শিক্ষা ভারতের মানুষের মধ্যে যে ঐক্য ভাব জাগিয়ে তুলেছে তিনি সে বিষয়ে সজাগ ছিলেন। তাঁরই বক্তব্য "এই ঐক্য সংস্থায়ী হইলে কোন দুঃখ না মোচন হইতে পারে?" ইংরাজ সাম্রাজ্যে ইংলন্ডের কৃপাদৃষ্টি তিনি

চেয়েছিলেন " ইংলন্ড, তোমার দয়া প্রকাশ ব্যতিরেকে আর আমাদের ভরসা নাই।" ২৪

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সামাজিক জাগরণ বহু ব্যক্তিকে প্রভাবিত করেছিল। বহু মনীষী নিজস্ব কর্ম ক্ষমতার স্বরূপে এই নব জাগরণে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। সেই সময় বাংলার বুকে সেই রূপ প্রবাহই ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ।

এ যুগের বৈশিষ্ট্য ও মূল্যায়ন

অষ্টাদশ শতকের মাঝা মাঝি সময় হতেই ইংরেজ শক্তি এদেশে তাদের বানিজ্যিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তার করে ধীরে ধীরে শাসন ব্যবস্থাও নিজেদের হাতে তুলে নেয়। ভারতবর্ষীয় সমাজের সৃষ্টি ধর্মী প্রবণতা প্রায় লুপ্ত হলো। আমাদের সমাজের সে এক অধঃপতনের যুগ। শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম, অন্ধ কুসংস্কার এবং রাজনৈতিক জগতে বিভিন্নতা বিদেশী শক্তির পক্ষে ভারতবর্ষ এত সহজে দখল সম্ভব হয়েছিল।

হিন্দু ধর্মে কুসংস্কার প্রগতির পথ রুদ্ধ করেছিল। সমাজ ছিল অন্ধ শাসনে বদ্ধ। শিক্ষা ছিল সংকীর্ণ পরিধিতে আবদ্ধ। ধর্মে ছিল যুক্তিহীনতার ক্রিয়া কান্ড। তাই ইংরেজ শাসন শুধু মাত্র রাজনৈতিক সত্তায় হস্তক্ষেপ করেনি, সাম্রাজ্যের তাগিদে সর্ব ব্যাপারে ছিল তাদের হস্ত প্রসারণ।

এই পরিবেশে জন্ম নিল সংস্কার বাদীর দল। ইংরেজ তার বণিক বৃত্তির দৃষ্টি কোন নিয়ে বিচার করতে চাইলে সবকিছু। তবুও তার মধ্য হতে দেশীয় মনীষীরা এক নব জাগ্রত ভারতকে বের করে আনতে চাইলেন এই অন্ধকারের আবর্ত হতে। এই সব মনীষীদের মধ্যে যারা সর্বভাবে সক্রিয় ছিলেন তাঁদের কয়েকজনের কথা পূর্বে উল্লিখিত হলো ।

রামমোহনের একেশ্বর বাদ প্রচার করার পিছনে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। তিনি মনে করতেন যে এই ভেদাভেদের ফলে দেশ জাতি রাজনৈতিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং দেশ প্রেমের অভাব ঘটেছে। তাই তিনি ব্রাহ্ম আন্দোলনের মাধ্যমে একেশ্বর বাদের প্রচার দিয়ে দেশের বিভিন্ন বর্ণ ও সম্প্রদায় কে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। রামমোহন যদিও বৃটিশ রাজত্বে ভারতীয় মনীষা বিকাশের সম্ভাবনাকে সুদৃষ্টিতে দেখতেন তবুও ইংরেজ কর্তৃপক্ষের অন্যায় কাজের সমালোচনায় তাঁর মধ্যে এক বিদ্রোহী সত্তার প্রকাশ দেখা যেত। তাই ১৮২৩ সালের সংবাদ দমনের আইন (Press Ordinance) কিংবা ১৮২৭ সালে বৈষম্য মূলক জুরী আইন (Jury Art) তিনি বিরোধিতা করেছেন। ইংলেন্ডে বসেই তিনি কৃষক শ্রেনীর দুরবস্থার দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি সরকারী চাকুরীতে অধিক পরিমাণে ভারতীয় নিয়োগের কথা বলেছেন। বিচার ব্যবস্থাকে প্রশাসনিক ব্যবস্থা হতে পৃথক করার দাবী তিনিই তোল করেছেন।

শুধু রামমোহন কেন নব্য বঙ্গীয়রাও রাজনৈতিক কার্য্য কলাপ চালিয়ে গেছেন। সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা, জুরী প্রথার মাধ্যমে বিচার, স্বদেশ ও বিদেশে ভারতীয় কুলী মজুরদের দুরবস্থা দূর করার জন্য তারা যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন।

নব্য বঙ্গীয়রা সব হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিল। ইংরাজী শিক্ষার সংস্পর্শে এসে তাঁদের মধ্যে মুক্ত চিন্তাধারা বিকাশ লাভ করেছিল। ডিরোজিও জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে স্বাধীনতার উপাসক ছিলেন। তিনি অতি সহজেই ছাত্রদের অন্তরে স্বাধীনতার আকাঙ্খা জাগাতে পারতেন এবং তাদের দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করতেন। এবং এই সময়েই স্বদেশ প্রিয়তা হতে রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্খা জন্ম লাভ করে।

ডিরোজিও শিষ্যদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রভৃতির দ্বারা

বাংলার ইতিহাসে এই কাল খণ্ডের প্রভাব এক নতুন ঐতিহ্যের পথের সন্ধান দিল। সুদীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায় বাঙালী যশস্বী, মনীষীরা এই নব জাগরণের ধারাকে সঞ্জীবিত করলেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ সাম্রাজ্য বাদের প্রসার ঘটল। সাথে সাথে বিস্তৃত হলো পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতি, দর্শন ও অর্থনীতির স্বরূপ। বাঙালী মানসিকতা প্রাথমিক ভাবে সেই নতুন পরিবেশ গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করল। কিন্তু পরবর্তীতে বাঙালী তাকেই আত্মস্থ করে নতুন জীবনের মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলো। তাই এ যুগ চেতনায় ধ্বনিত হলো একটি অমোঘ মন্ত্র 'মুক্তি'। মুক্তি অন্ধ বিশ্বাস হতে, মুক্তি অশিক্ষার বাতাবরণ হতে, মুক্তি ধর্মীয় অনুশাসনের বেড়াজাল হতে, মুক্তি সমাজের অবক্ষয়িত পুরনো ভ্রান্ত ধারণা হতে। এই মুক্ত চিন্তা মানুষের মনে সৃষ্টি করল শাস্ত্র, পুঁথি, পাঁজিকে নির্মোহ দৃষ্টি দিয়ে সেই সব বিশ্বাসের পূর্ণ মূল্যায়ন করার। এঁরাই জীবনের গতিশীলতাকে স্বীকৃতি দিলেন। বিশ্বকে আপন করে নেওয়ার তাগিদ হতে জন্ম নিল শিক্ষা গ্রহণের তীব্র বাসনা। বিদ্যাসাগরও অধ্যয়নের মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তি ও চিত্তবৃত্তির উন্মেষে বিজ্ঞান চেতনার অভিষেক ঘটালেন।

ব্যক্তিকে জীবনবোধের মূল্য দিয়ে বিচার করে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বোধের জাগরণের উন্মেষ ঘটাল। ব্যক্তি চিন্তাকে আশ্রয় করে সামাজিক চিন্তার ক্ষেত্র প্রসারিত হলো। জাতীয় জীবনে গতি সঞ্চার করে দেশাত্ম বোধের সৃষ্টি করল। শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে সমাজে অবহেলিত নারী জাতির মুক্তি আকাঙ্খা প্রবলতর হলো। নারীর প্রতি নবরূপে জন্ম নিল শ্রদ্ধা বোধ। সামাজিক উন্নতি সাধনে নারীর সাহচর্য্য অনুভূত হলো। অন্ধ বিশ্বাস বা কুসংস্কারের পরিবর্তে স্থান করে নিল যুক্তি ও বিচার বোধের নির্মল স্রোত। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে সংগ্রামশীল মনোবৃত্তির সূচনা ঘটল। সভা সমিতি গঠনের মাধ্যমে রাজনৈতিক কার্যকলাপ গৃহীত হলো। এই বাসনাই পরবর্তীতে জন্ম দিল স্বাদেশিকতা বোধ ও স্বাজাত্য শাসনের অঙ্কুর। শিক্ষা প্রসারণের মানসিকতা

মুদ্রা যন্ত্র আবিষ্কার ও সংবাদ পত্রের জন্ম দিল । সংবাদ পত্র একদিকে যেমন সাহিত্য সৃষ্টির মানসিকতা তৈরী করল অন্য দিকে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মানসিক ভাবনাকে জাগ্রত করল ।

এই শতকের ভাবনা বিশ্লেষণ মুখী ছিল । " বাঙালী নব জীবন বোধকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইল । তারই ফলে , যে মানুষকে সব সময় ধর্ম দিয়ে, সমাজ দিয়ে, অনুশাসন দিয়ে বন্দী করে রাখা হতো সে মানুষকে বন্দীমুক্ত করার প্রয়াস শুরু হলো । নতুন চেতনার উন্মেষে বাঙালীর মধ্যে সংস্কার বাসনা জেগে উঠল । বাঙালী মন ও মনন প্রাচীন চিন্তাকে তাই আর হুবহু গ্রহণ করতে সম্মত হল না । দীর্ঘদিন যে সমস্ত প্রথা বা নিয়মে জীবন নিয়ন্ত্রিত এবং জীবনের চলা নির্ধারিত হতো বর্তমানের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে সেগুলির পরিবর্তন বা সংস্কারের প্রয়াস জাগল । বাস্তব জীবনে সত্য প্রতিষ্ঠার উপযোগিতা বাঙালী জীবনে গভীর ভাবেই অনুভূত হলো । ২৬

বাঙালীর জীবন ও সংস্কৃতি হতে মধ্য যুগের বিদায় ঘটল । ভৌগোলিক সংকীর্ণতার অবসান ঘটল । ইউরোপের ঝড়ের হাওয়া আমাদের রুদ্ধ দ্বারে প্রবল আঘাত হানল । দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরের বহু উত্থান পতনের পর উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতে বাঙালীর সাহিত্য ও জীবনের নববিকাশ ঘটল । " সে রেনেসাঁসের অর্থ — মানব মহিমা - বুদ্ধিদীপ্ত বাস্তব চেতনার প্রাধান্য । মধ্য যুগীয় ধর্মৈষণা , আবেগ ব্যাকুলতা , মাথুর ভাব সম্মেলন , চন্ডী মনসা ধর্ম ঠাকুরের নিরাপদ নির্ভর ছায়াতল ছাড়িয়া মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক বাঙালী আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসা — কল্লোলিত লবনাক্ত সিন্ধুতীরে নিক্ষিপ্ত হইল , জগৎ ও জীবনকে আত্ম প্রত্যয় স্নিগ্ধ বুদ্ধির ভূকেন্দ্র হইতে চিনিয়া লইবার চেষ্টা করিল । ইহাই বাঙালীর নব্য রেনেসাঁস । ২৭

"Such a Renaissance has not been anywhere else in the World history........On our hopelessly decadent society, the rational progressive spirit of Europe struck with resistless force"."

সিপাহী বিদ্রোহ ও সমাজ মানস

১৮৫৭ সাল। ভারতে এক বিদ্রোহের ঝড় বয়ে গেল। ইংরেজরা বলল "সিপাহী বিদ্রোহ"। কিছু কালের জন্য উত্তর ভারতের সামগ্রিক চিত্র বদলে গেল। দেখা গেল এক কালান্তর। ব্যারাকপুর থেকে মীরাট, কানপুর থেকে লক্ষ্ণৌ, বেরিলী থেকে দিল্লীর মনোভাবমাধুর্যতিক্ত বিরূপ তিক্ত অভিজ্ঞতায় ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে অবিশ্বাসের এক রক্ত রঞ্জিম প্রাচীরের বিভেদ স্থাপন করল।

১৭৫৭ হতে ১৮৫৭ পর্যন্ত সুদীর্ঘ একশত বছরের ইতিহাস ব্রিটিশ শোষনের ইতিহাস। 'হিন্দু পেট্রিয়টে' হরিশচন্দ্র লিখছেন 'The disease secured to have disappeared, when its symptoms broke out afresh and in their indications showed that it was neither fat of oxen not the dread proselytism but a deep rooted case of estrangement that led to these mutinous that break.' ২৮

সিপাহী বিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সরাসরি আঘাত। তাদের শাসনকে অস্বীকার করা এবং এর মধ্যেই ছিল বিদ্রোহের বীজ নিহিত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে সরাসরি বিদ্রোহ এবং স্বাধীনতার দাবি প্রথম রেখেছিল হিন্দু পেট্রিয়ট এবং সেটা ১৮৫৮ সালেই। বিশিষ্ট ইংরেজ প্রাবন্ধিক পি. লোভেট তাঁর 'জার্ণালিজম ইন ইন্ডিয়া' গ্রন্থে লিখেছেন — ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের সময় থেকেই নাকি ভারতবর্ষে প্রকৃত সাংবাদিকতার সূচনা হয়। বুঝতে অসুবিধে হয় না, প্রকৃত গণ সংগ্রামকে চিরদিনই এরা কিছুটা আতঙ্কিত হয়ে ছোট করে দেখার চেষ্টা করেছেন।'

১৮৫৭ সালের ঐতিহাসিক অভ্যুত্থান তখনকার নিস্তব্ধ ভারতে এক নব জীবনের আলোড়ন এনে দিয়েছিল । অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলেও এর [illegible] গেল এক আদর্শ বোধ যা হতে জন্ম নিল বহু বিদ্রোহের মহীরুহ ।

সিপাহী বিদ্রোহের আগুন নিভতে না নিভতে বাংলা দেশের সর্বত্র তথা বিহারের কিছু কিছু অংশ নীল বিদ্রোহের উত্তপ্ত আগুনে ঝলসে উঠল । নীলচাষ ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে তুলল ও কৃষকের জীবনে নিয়ে এল এক দুর্বিষহ ও সর্বনাশা অভিশাপ । পাদরী লং নীল বিদ্রোহের কারণ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন (১) জিনিস পত্রের মূল্য বৃদ্ধি, (২) শ্রমের মূল্য বৃদ্ধি, (৩) আধুনিক রাজনৈতিক ঘটনাবলী সঞ্জাত রাজনৈতিক উত্তেজনা, (৪) কৃষকদের প্রতি শিক্ষিত মধ্য বিত্তদের সহানুভূতি । রাজনৈতিক ঘটনা বলতে ১৮৫৭ এর জাতীয় অভ্যুত্থানের প্রসঙ্গ এসে পড়েছে । ঐ নীল বিদ্রোহ

" The tyranny of the planters provoked a real mass upsurge amongst the cultivators which even the Royal Institute of International Affairs has noted" a landmark in the history of nationalism".

নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও সংঘবদ্ধ । ১৮৫৯ সালে কৃষ্ণনগরের গ্রামাঞ্চলে নীল বিদ্রোহের প্রথম সূচনা হয় । ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহের আগুন নদীয়া, যশোহর, রাজশাহী, পাবনা, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে জ্বলে ওঠে । প্রায় ৫০ লক্ষ কৃষক এই বিদ্রোহে যোগ দেয় । উত্তরবঙ্গে এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন ওয়াহাবী নেতা রফিক মন্ডল । অন্যান্য নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন নদীয়ার বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস এবং জয়রামপুরের রামরতন মল্লিক যাঁকে বাংলার নানা সাহেব বলা হতো ।

নীল বিদ্রোহে শিক্ষিত বাঙালী সমাজ সমর্থন জানাতে দ্বিধা করেন নি । ১৮৬০

খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্র ' নীলদর্পন ' রচনা করেন । এই নাটকে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের এক ভয়ঙ্কর চিত্র তিনি তুলে ধরেছিলেন । এই নীলদর্পনের ইংরাজী অনুবাদ করেন মধুসূদন দত্ত । জেমস রেভারেন্ড লং এর প্রকাশনা করেন । উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে এই অত্যাচারের কাহিনী ইংরেজদের নিকট পেঁাছে দেওয়া । এই অপরাধে লং এর এক মাসের কারাগার ও এক হাজার টাকা জরিমানা হয় । কালি - প্রসন্ন সিংহ তৎক্ষনাৎ সেই টকা জমা দেন । এই সংবাদ প্রকাশিত হলে বাংলায় এক অভূত পূর্ব উত্তেজনার সৃষ্টি হয় । সেই সময় বড় লার্ট ছিলেন লর্ড ক্যানিং , তিনিও স্বীকার করেছেন "The indigo rebellion caused him more anxiety than he had felt since the days of Delhi".
জনসমক্ষে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী নিয়মিত ভাবে তুলে ধরেছিলেন হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।

১৮৫৭ এর পর ভারতে জাতীয়তাবাদী ধারার গতি প্রবলতর হতে লাগল । ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে ঘটল ব্যাপক পরিবর্তন । কর্মহীন এই মধ্যবিত্ত শ্রেনীর মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসন্তোষ সৃষ্টি করল । বৃটিশ শাসনের প্রকোপ যত ঘনীভূত হতে থাকল ততই তীব্র হলো মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে জাতীয় আন্দোলনে সংযুক্ত হওয়ার অনুভূতি । এই মধ্যবিত্ত শ্রেনী আন্দোলনের জন্য একটি মাধ্যমের অনুসন্ধান করতে লাগল ।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময় ইংরেজ দের নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে এক গভীর প্রতিক্রিয়ারসৃষ্টি করল । বিদ্রোহ চলা কালীন সময়ে মাত্র তিন দিনে ৬ হাজার ভারতবাসীকে ফাঁসির কাঠে ঝোলানো হয়েছিল । ইংরেজ শাসনের নগ্ন চরিত্র ভারতবাসীর কাছে উন্মোচিত হলো । ব্রিটিশ শাসনের যে ' সত্য স্বরূপ ' তা এত বর্বর ও নিষ্ঠুর ভারতবাসী মাত্রেই তা বুঝতে পারলো । এর ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেনীর মধ্যে জাতীয়তা বাদের স্ফুরন দেখা দিল । ইংরেজ শাসনের প্রতি যে মোহাবেশ ছিল তা কেটে গেল । প্রতিবাদ ও সমালোচনার ঢেউ গর্জে উঠতে

শুরু করল বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে । সাম্রাজ্যবাদীদের ঘৃন্য স্বরূপ প্রকটিত হতে লাগল । তাই নিজ দেশের অবহেলিত কৃষক সমাজের প্রতি ও মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে এক আত্মীয়তা ও আত্ম সচেতনতার সৃষ্টি করল । তাদের মনের মধ্যে এক বিপুল জিজ্ঞাসা নিয়ে এই নির্যাতিত নিপীড়িত কৃষক শ্রেনীর পাশে দাঁড়াবার আকাঙ্খা তীব্র হলো । পরাধীনতার গ্লানি হতে জন্ম নিল স্বাধীনতার আকাঙ্খা । এই মনোভাবের প্রকাশ ঘটল জাতীয় চেতনার সকল ক্ষেত্রে — সাহিত্যে, বিজ্ঞানে শিল্পে । এই পরিবেশ নব জাতীয়তাবাদের জন্ম দিল । এবং এই জাতীয়তা বাদের ধারাকে পুষ্ট করল আর অনুষঙ্গ বিষয় সমূহ ।

সাহিত্য ও স্বাদেশিকতা বোধ

সিপাহী বিদ্রোহ সমাপ্ত হলো । কিন্তু এর ফল ছিল সুদূর প্রসারী । সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী সময়ে বাংলার বুকে স্বদেশ চেতনার প্রবাহ বয়ে গেল । যে স্বাদেশিকতার স্রোতস্বিনী ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছিল ফল্গুধারার মতো, এবার এই প্রবাহে এল তীব্র জলধারা, স্বদেশ প্রাণতার মন্ত্রে অভিষিক্ত সেই প্রবাহ । বাংলায় আবির্ভাব হলো ব্যাপক ভাবে সাহিত্য কীর্তির প্রোথিত যশা সম্ভ্রান্ত লেখক সমূহের । স্বাদেশিকতায় আদর্শ বোধ, সাহিত্যের মূল্য বোধ, জীবন- সাধনার বিষয় বস্তুকে এঁরা সাহিত্যের প্রাঙ্গনে উপহার দিলেন । মানবিক গুন ও সাহিত্যের গুনে সমৃদ্ধ এই বাংলার জগতে দিকপাল রূপে আবির্ভূত হলেন কবি মধুসূদন, নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, ঔপন্যাসিক বঙ্কিম চন্দ্র । The post ~~Missionary~~ Mutiny era in the history of Bengal was marked in the next place by a magnificent out ~~blush~~ burst of creative activity in literature." ২৭

এই যুগে বাংলা কাব্যেও আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটল । প্রাচীন আদর্শের শেষ

কবি ও নতুন আদর্শের প্রথম কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত । তিনি ছিলেন যুগ সন্ধির কবি । তাঁর কাব্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল দেশাত্মবোধ । তিনি কাব্যকে লৌকিক জীবনের ক্ষেত্র হতে মুক্তি দিলেন । ঈশ্বর গুপ্ত প্রবর্তিত আধুনিক মননের বিকাশ ক্ষেত্র প্রকাশিত হলো, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে ।

বঙ্কিম চন্দ্র ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, " মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রাম গোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাংলা দেশে দেশ - বাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যেতে পারে । ঈশ্বর গুপ্তের দেশ বাৎসল্য তাহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্বগামী । ঈশ্বর গুপ্তের দেশ বাৎসল্য তাঁহাদের মত ফলপ্রদ না হইয়াও তাঁহাদের অপেক্ষা তীব্র ও বিশুদ্ধ । "

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসীগণে
প্রেম পূর্ণ নয়ন মেলিয়া ।
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ।

বঙ্কিম চন্দ্রের এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য নয় । ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় দেশ প্রেমের আকুতি ছিল, ছিল স্বাদেশিকতা বোধ, কিন্তু ইংরেজ আনুগত্য তার কবিতায় বহু ছত্রে ধ্বনিত হয়েছে । ইংরেজ এরবিরুদ্ধে যারা যুদ্ধে নামে তারা শত্রু । নানা সাহেব, ঝাঁসির রাণীর প্রতি তিনি নির্লজ্জ ভাষায় আক্রমণ করেছেন । তাই তিনি ছিলেন যুগ সন্ধির কবি কারণ দ্বৈত সত্তাই তাঁকে সেই মর্য্যাদা দান করেছে ।

বাংলা সাহিত্যে দেশ প্রেমের বা জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত দেখা দিয়েছিল মধ্যযুগের সাহিত্য মন্ডলের বিকাশ ক্ষেত্রে । বাংলার নিজস্ব আকৃতি, সামাজিক মূল্যবোধ, স্থানিক প্রীতি মধ্যযুগের কাব্য কথায় ছিল এক প্রাণ বন্ত আবেগ ।

নরহরি কবিরাজ মন্তব্য করেছেন " বাংলায় ন্যাশানালিটি গঠণের প্রক্রিয়াটি পরিপুষ্ট হতে থাকে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে জাগরণ দেখা দেয় তার মধ্য থেকে । এই সময়ে উপোরক্ত ধর্ম প্রচারকদের লেখা ও ভাষণকে কেন্দ্র করে ধর্মাশ্রয়ী এক ধরণের সাহিত্য গড়ে উঠেছিল । কবীর নানক ও চৈতন্য ভক্তদের পদাবলীতে জনতার কাছে সহজ বোধ্য ভাষায় প্রচারের মাধ্যমে এক সর্বজন বোধ্য অসাম্প্রদায়িক জনপ্রিয় সাহিত্য গড়ে উঠতে থাকে ।

বিদগ্ধ সাহিত্য রসিকরা কখনও রাজসভা থেকে কখনও জনসভা থেকে যে সাহিত্য রচনা করতেন তাও ছিল বাঙালী মাত্রেরই সম্পদ । কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম, দৌলত কাজী, আলাওল, ভারত চন্দ্র, রাম প্রসাদ নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য গুণে পৃথক হলেও তাঁরা প্রত্যেকে ছিলেন বাঙালী কবি ।

রাজার মেয়ে বিদ্যা, ব্যাধের মেয়ে ফুল্লরা, অভাব গ্রস্ত গ্রাম্য কবি – সমাজের স্তর ভেদে জীবন প্রবাহে তাদের বহু পার্থক্য সত্তেও তারা এক জায়গায় এক – তারা সবাই বাঙালী ।

" ভারত চন্দ্রের কাব্য রসেও এই বাঙালী মন রয়েছে সঞ্চারিত । গঙ্গা বিধৌত বাংলার সেই প্রেম গাথা অনুরণিত বিদ্যার কণ্ঠে ' হায় বিধি সে কি দেশ গঙ্গা নাই যেথা ' । মোট কথা সাহিত্যে, সঙ্গীতে পালা অভিনয়ে বাঙালী এক ভাষায় কথা বলতে শুরু করে, এক ধরণের আবেগ প্রকাশ করতে থাকে, এক ধরণের রুচির পরিচয় দিতে থাকে । " ৩০

এই সাহিত্য ভাবনা পরবর্তীতে আরও সমৃদ্ধ হয়েছে । বাংলা নিজস্ব সংস্কৃতি ভারতীয় ভাবধারার সাথে ঘটেছে ভাব সম্মিলন । উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বাংলার সাহিত্য সম্পদে বিকশিত হয়েছে ভারত ভাবনা তথা জাতীয়তাবাদের প্রচন্ড স্রোত ।

অবশ্য এই সময়টা ছিল শিক্ষিত বাঙালীর মানসিক বিকাশের যুগ। এই যুগ চেতনায় জন্মে ছিল স্বাজাত্য গর্ব ও জাতীয়তাবোধ। শিক্ষিত বাঙালীর আত্ম সম্মান বোধ জন্ম দিয়েছিল সমাজ সংস্কারের। আর্থিক ও সামাজিক প্রতিপত্তি পূর্বের চেয়ে দৃঢ়তর হওয়ার জন্য স্বাভাবিক ভাবে স্বাজাত্য বোধের চেতনা ধীরে ধীরে জাগ্রত হচ্ছিল তেমনি ভাবে শিক্ষিত বাঙালী সমাজ বিদেশী শক্তি ইংরেজের নিকট চাকুরীজীবী রূপে উপযুক্ত সম্মান পায়নি। এবং এই বঞ্চনা বোধ হতে জন্ম নিল দেশকে ভালবাসার স্বপ্ন। সুকুমার সেন' এর ভাষায় " চাকুরী পরায়ণ শিক্ষিত বাঙালী উপযুক্ত সম্মান পায় নাই, সেই ক্ষোভেই ' ন্যাশনাল ' আন্দোলনে ঢেউ তুলিয়াছিল।" ৩১

এই জাতীয়তাবোধের ভাবনা আরও তীব্রতর হলো যখন বিদেশী শাসনের অন্যায় অবিচার কর্মের তীব্র দাবানল দেশবাসীর বুকের মধ্যে দহনের সৃষ্টি করেছিল। বিদেশী শাসক বর্গের সেই অত্যাচার যা জনসাধারণ নীরবে সহ্য করছিল তা আর চাপা রইল না। তার বাহঃ প্রকাশ ঘটল সাহিত্যের দর্পনে। শাসক বর্গের বিরুদ্ধে নালিশ রূপে যেমন আবির্ভাব হলো, সাহিত্যের প্রাঙ্গণে তেমনি কোথায় বিদ্রোহ বাণীর ঝলক দেখা দিল বিদ্যুৎ প্রভার মতো।

সুকুমার সেন বলছেন " সাহিত্যে জাতায়তাবোধের প্রথম প্রকাশ দেশের অতীত ইতিহাসের দোলায় দেশ প্রেমের লালন, দ্বিতীয় প্রকাশ জনসাধারণের স্বাধীনতা হীনতার প্রতি সচেতনতা, তৃতীয় প্রকাশ ভারতবর্ষের অখণ্ডত্ব অনুভূতি, চতুর্থ প্রকাশ শাসন কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অনুপ্রায় শাসিতের বল প্রয়োগ চালনা।" ৩২

মধুসূদন

পাশ্চাত্য ভাবধারার অভিঘাতে পাশ্চাত্যের অনুকরণ প্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে এক সর্বজনীন মুক্তি চেতনায় যখন বাঙালী মানস উদ্বেল মধুসূদনের আবির্ভাব তখনই। দুর্জয়

পৌরুষত্ব ও দুর্ধর্ষ শক্তি মত্ততা নিয়ে দু:সাধ্য সাধনের ব্রতী অবিচল ছিলেন তিনি। যদিও তখন গদ্য ভাষার সৃষ্টি হয়েছে সেই গদ্য তখন প্রয়োজনের মাধ্যমে বিতর্ক ও বিচারের হাতিয়ার যা রস সৃষ্টির শৈলী উপকরণ হয়ে উঠেনি। ধর্মীয় বিষয় থেকে মুক্ত করে কবিতা রচনা করলেন ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়। তাঁদের কবিতায় সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহের ধারা এল, ঐতিহাসিক বিষয় বস্তু প্রধান্য পেল। তাঁরা দীর্ঘ আখ্যায়িকার চমৎকারিত্ব, ও উদ্দীপনা মূলক বীর রস সৃষ্টি করে কাব্যের মধ্যে নব যুগের ক্রিয়াময় উত্তেজনা এবং আবেগ রঞ্জিত দেশাত্ম বোধ সঞ্চার করলেন।

কিন্তু মধুসূদন কাব্যে রূপ রীতি ও প্রকাশ ভঙ্গীতে আনলেন মুক্তি। তীব্র স্রোতস্বিনীর মতো তিনি পুরনো গতি পথের উপর ভাঙ্গন সৃষ্টি করে দুই তীরকেই প্লাবিত করলেন বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে। মেঘনাদ বধ কাব্যে তাঁর ব্যক্তিত্বের একটি বিশিষ্ট রূপ প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সেই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনুভব করে বলছেন — " মেঘনাদ বধ কাব্যে কেবল ছন্দোবদ্ধ ও রচনা প্রনালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙ্গিয়াছেন এবং রাম - রাবণের সম্বন্ধে অনেকদিন হইতে আমাদের মনে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে স্পর্ধা পূর্বক তাহারও শাসন ভাঙ্গিয়াছেন। এই কাব্যে রাম লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ ইন্দ্রবিৎ বড় হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্ম ভীরুতা সর্বদাই কোনটা ভালো ও কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্ম ভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ, দৈন্য, আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবি হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতস্ফূর্ত শক্তির প্রচন্ডলীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন "।

এই মানুষযে দেশের পরাধীনতায় ব্যথিত হবেন এ তো স্বাভাবিক। পরাধীনতার প্রতি তাঁর আক্ষেপ ছিল আবেগ সম্ভূত —

" আমরা দুর্বল, ক্ষীন, কুখ্যাত জগতে
পরাধীন, হা বিধাত: আবদ্ধ শৃঙ্খলে ? "

যদিও এই কবিই তাঁর Extemporary Song's লিখেছিলেন —

And, Oh, I sigh for Albion's sand
As if she were my native land'.

অথচ এই কবিই দেশের পরাধীনতায় আক্ষেপ করেছেন —

কে না লোভে, ফনিনীর কুন্তলে যে মণি
ভূপতিত তারা রূপে, নিশাকালে জ্বলে
কিন্তু কৃতান্তের দূত বিষ দন্তে গণি,
কে করে সাহস তারে কেড়ে নিতে বলে ?
হায় লো ভারত ভূমি ।

কবি মাতৃভূমির অতীত গৌরবকে স্মরণ করেছেন বারবার,

শুন গো ভারত ভূমি, কত নিদ্রা যাবে তুমি
আর নিদ্রা উচিৎ না হয়
উঠ ত্যজ ঘুম ঘোর হইল, হইল ভোর
দিন কর প্রাচীতে উদয় ।

দেশের প্রতি মাইকেলের আত্মীয়তা বোধ ছিল গভীর । জীবনের বহু ট্র্যাজেডীর মাঝেও মধুসূদনের মানসিকতার ঐশ্বর্য্য বিন্দু দেশের মাটিতেই প্রোথিত ছিল । তাই গর্ব করেই তিনি বলেছিলেন, " আমি শুদ্ধ বাঙালী নহি, আমি বাঙ্গাল, আমার বাটি যশোহর । " ৩৩

দীনবন্ধু মিত্র

এই সময় আরেক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সাহিত্যের আকাশে প্রতিভাত হয়েছিল তিনি

দীনবন্ধু মিত্র। চাকুরী সূত্রে গ্রাম গঞ্জে ভ্রমণের তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি অনুভব করেছিলেন নীল চাষীদের ওপর ইংরেজদের অত্যাচারের স্বরূপ। নীল বিদ্রোহ যখন বিস্ফোরিত তখনই তিনি লিখলেন 'নীল দর্পন'। 'নীল দর্পন' শুধু সাহিত্যের গুণে সার্থক নাটক নয়, এ যেন সমাজ জীবনের বাস্তব চরিত্র। বঙ্কিম চন্দ্র এই নাটক সম্পর্কে মন্তব্য করছেন, " এই যে প্রজা পীড়ন যেমন তিনি জানিয়ে ছিলেন এমন আর কেহ জানিতেন না। তাঁহার স্বাভাবিক সহানুভূতির বলে সেই পীড়িত প্রজা দিগের দুঃখ তাহার হৃদয়ে আপনার ভোগ্য দুঃখের ন্যায় প্রতীয়মান হইল, কাজেই হৃদয়ের উৎস কবিকে লেখনী মুখে নিঃসৃত করিতে হইল।" এই বঙ্কিম চন্দ্রই 'নীল দর্পন'কে বাঙালীর Uncle Tom's Cabin বলেছেন। রেভারেন্ড লং সাহেব মাইকেল মধুসূদনের দ্বারা এই নীল দর্পনের ইংরাজী অনুবাদ করিয়েছিলেন। এই অপরাধে লঙের কারাবাস ও জরিমানা হয়। অনুবাদটা ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়েছিল। ফলও হয়েছিল তীব্র। বাংলা দেশে ইংরাজ বিরোধী আন্দোলন নীল আন্দোলন দিয়েই শুরু হয়েছিল এবং এই আন্দোলনকে উত্তপ্ত করার জন্য 'নীল দর্পন' এর প্রভাব ছিল সক্রিয়। তাই বাংলার সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ইতিহাসে এই নাটকের গুরুত্ব অপরিসীম।

বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিম চন্দ্রের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্য তথা দেশাত্মবোধ জাগরণের ইতিহাসে এক দুর্লভ স্মরণীয় ঘটনা। একদিকে তাঁর লেখনীর মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য রূপী বৃক্ষ পুষ্প মেলবে ফুলে ও ফলে যেমন সমৃদ্ধ হলো অন্যদিকে বাংলাদেশ পেল জাতীয়তাবাদের উদ্বেল মন্ত্র। এই মন্ত্রের ঝংকারে ভারতবর্ষও ঝংকৃত হলো দেশাত্মবোধের চেতনায়।

Bankim Chandra's imagination was stirred by thoughts of Nationalism all through his literary career, his mind was espically occupied with the problem of National independence,national unity and happiness of the nation as a whole". ৩৪

বঙ্কিম চন্দ্র সাহিত্যের ক্ষেত্র হতে নিজের ও ভাবনাদর্শের কথা ব্যক্ত করেছেন। বঙ্কিমের সময় ভারতবর্ষের মানসিকতারও রূপান্তর ঘটতে শুরু করেছিল। ইউরোপ সম্পর্কে মানুষের মোহের ভাব কাটতে শুরু করেছে। একদিন যে ইউরোপ ' সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার পৃষ্ঠভূমি বলে ঘোষিত হত বঙ্কিম সেই ইউরোপের প্রকৃতিগত পরিবর্তন অনুভব করেছিলেন। ইউরোপের আজ উগ্র যুদ্ধপ্রিয়তা, আক্রমনশীল জাতীয়তাবাদ ও উপনিবেশবাদের আড়ালে সাম্রাজ্যবাদ বঙ্কিমের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। তিনি লিখছেন " ইউরোপীয় Patriotism ধর্মের তাৎপর্য এই যে, পর সমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। "

বঙ্কিম ইউরোপের প্রগতিশীল চিন্তাধারা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি। বরং ইতালি ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের যুদ্ধ বিরোধী, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। ' বঙ্গ দর্শনে ' ভারত একতা ' নামে এক প্রবন্ধে তিনি ইতালি ও অন্যান্য দেশের জাতীয় আন্দোলনের আদর্শটি অনুসরণর জন্য ভারতবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। তিনি ইউরোপের চিন্তাধারার সাথে বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন। মিলের চিন্তাধারার বিরুদ্ধে তিনি বলেছিলেন " আত্ম সুখের বৃদ্ধি বা জনপ্রিয়তা লিপ্সা নয়, মানুষের প্রতি নিস্বার্থ ভালবাসাই প্রকৃত হিত কর্মের ভিত্তি হতে পারে। তিনি মনে করতেন তৃপ্তি পাবার জন্য আমরা ভালবাসিনা, ভালবাসি বলেই তৃপ্তি পাই। সকল প্রাণীর মধ্যে পরমাত্মা বিরাজমান, তথা আত্ম পর কোন ভেদ নেই

বলে অন্যের সুখ বিধানেই আমার সুখ। " ভারতীয়রা পার্থিব সম্পদের জন্য পাশ্চাত্যের মোহরাশিতে যে ভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ছে তাতে তিনি বেদনা অনুভব করতেন। তিনি পরিহাসের সুরে বলছে " হর হর বম বম। বাহ্য সম্পদের পূজা কর। এ পূজার তাম্র শ্মশ্রু ধারী ইংরেজ নামে পুরোহিত,এডাম স্মিথ পুরাণ এবং মিলতন্ত্র হইতে এ পূজার মন্ত্র পড়িতে হয় .... শিক্ষা এবং উৎসাহ ইহাতে নৈবেদ্য এবং হৃদয় হইতে ছাগবলি। এ পূজার ফল ইহলোকে এবং পরলোকে অনন্ত নরক। " অগুস্ত কোঁৎ এর ভাবনা " ভালবাসাই আমাদের জীবনাদর্শ, শৃঙ্খলা জীবনের ভিত্তিভূমি, আর প্রগতি একমাত্র অনিষ্ট। " বঙ্কিম চন্দ্র এ ভাবনায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু বঙ্কিম বিশ্বাস করতেন এই সকলের নিয়ন্তক ঈশ্বর যিনি মানুষের সাথে মানুষের সংহতি স্থাপন করছেন।

বঙ্কিম চন্দ্র মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন দেশের মাটিতে। তিনি ভারতের অসহায় পরিবেশে হিন্দু আদর্শের পুনরুজ্জীবনের কথা বললেন। এই আন্দোলন কোন সংকীর্ণ মনোভাবের আন্দোলন ছিল না। হিন্দুর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বঙ্কিম বললেন -- " যে লোক কেবল জাতি মারিতেই ব্যস্ত, তাহার গলায় গোছা করা পৈতা, কপালে কপাল জোড়া ফোঁটা, মাথায় টিকি এবং গায়ে নামাবলী, মুখে হরিনাম থাকিলেও তাহাকে হিন্দু বলিব না। " তেমনি বৈষ্ণব সম্পর্কে বলছেন, ' যখন সর্বত্র সমান জ্ঞান, সকলকে আত্মবৎ জ্ঞানই বৈষ্ণব ধর্ম, তখন এ হিন্দু ও মুসলমান, এ ছোট জাত ও বড় জাতি এইরূপ ভেদ জ্ঞান করিতে নাই। যে এরূপ ভেদজ্ঞান করে সে বৈষ্ণব নহে। "

দেশীয় ভাবনার মধ্যে জাতীয়তাবাদের বীজের অন্বেষণ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চেতনার সঙ্গে মিশ্রিত জাতীয়তাবাদের জাগরণ ছিল বঙ্কিম চিন্তার বৈশিষ্ট্য। ধর্মে দেশ ভক্তির স্থান নির্নয় করে দেশ ভক্তি ধারণা সম্পর্কে বঙ্কিম এক অসাধারণ অবদান রেখেছেন। বিপিন পালের ভাষায় ' বঙ্কিম ছিলেন নতুন দেশ ভক্তির

জনক ।' 'আনন্দমঠ' ও 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র এই স্বদেশ প্রেমেরই প্রকাশ । সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ঘটনাকে বঙ্কিমই সর্বপ্রথম ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মর্যাদা দিতে সক্ষম হলেন । দেশ জননীকে দেবী দুর্গার সাথে বরণীয় করে তাঁকে উপাস্য করে গড়ে তোলার ভাবনায় বঙ্কিম অনন্য । " কমলা কান্তের মুখ দিয়ে তিনি অক্ষম উপরোধের হীন সারমেয় নীতি ছেড়ে দিয়ে চরমপন্থীদের বৃষ তুল্য বিক্রম প্রকাশের উপদেশ দিয়েছিলেন । তিনি তাদের সামনে দেশ মাতৃকার যে চিত্র তুলে ধরেছিলেন তাতে মায়ের দ্বি- সপ্ত কোটি ভুজে ধৃত ছিল — ভিক্ষা ভান্ড নয়, খর করবাল । ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে যে নতুন প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটেছিল তার কাছে কংগ্রেসের 'বাবু' সদস্যদের দীর্ঘ ভাষণ, বাংলার আইন পরিষদে বিতর্ক বা প্রশ্ন উত্থাপন করে সরকারী কাজকর্মে বাধাদানের ছেলেখেলা বা কলকাতা কর্পোরেশনের বিচিত্র কৌতুক সৃষ্টি করে পৌর শাসনের কর্মসূচী পন্ড করে দেওয়ার প্রতিভা অবজ্ঞার বিষয় হয়ে উঠেছিল । এদের হৃদয়ে বঙ্গ জননীর প্রতি নিখাদ ভালবাসা, তাঁর অসামান্য মহিমার বিশুদ্ধ ভক্তি বঙ্কিমচন্দ্রই সঞ্চারিত করে দিয়েছিলন, তিনিই তাদের দীক্ষিত করেছিলেন 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রে । ৩৫

বঙ্কিম চন্দ্র অনুভব করেছিলেন ভারতের দুর্দশার মূলকারণ মুক্তির জন্য এদেশের মানুষের নিস্পৃহতা ও হিন্দু সমাজের অনৈক্য । তাই 'আনন্দমঠ' এ সত্যানন্দ সন্তানদের উদ্দেশ্যে যে উদ্দাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন তাতে সকলেই আসুরিক ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের উন্মাদনা জাগাবার ডাকই শুনেছিলেন । বঙ্কিম চন্দ্রের আনন্দমঠ ছিল জাতীয়তাবাদ জাগরণের গীতা । কিন্তু নিখিল সুর বলছেন — " আনন্দমঠ জাতীয়তার গীতা নয়, বর্ণ পরিচয় । বর্ণ পরিচয়ের জ্ঞান যেমন সমস্ত গ্রন্থ পাঠে সাহায্য করে তেমনি 'আনন্দমঠ' দেশকে দিয়েছিল জাতি প্রতিষ্ঠার ভাবনা ও প্রেরণা । " ৩৬

বঙ্কিম চন্দ্র চেয়েছিলেন সকল বন্ধন থেকে জাতির মুক্তি । শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের

মধ্য দিয়ে ঐক্য বদ্ধ ভারতবর্ষের এক সুমহান স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন । সেই কারণে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর ধর্মানুভূতির কেন্দ্রে স্থাপন করতে দ্বিধা করেন নি । অরবিন্দ বলছেন- " এক অটল স্থৈর্য্য এবং নিবিড় প্রশান্তিকে দেবতার লক্ষণ বলে বর্ণনা করেছিলন এপিকিউরাস । যে সব মুষ্টিমেয় মানুষ অবিচলিত ভাবে জীবনের স্বাদ গ্রহণ করেছেন, উপলব্ধি করেছেন তার সামগ্রিতা – তাঁরাই এই দৈব ঐশ্বর্য্যে ভূষিত হয়ে থাকেন । বঙ্কিম চন্দ্র সেই বিরল পুরুষদেরই অন্যতম । ৩৭

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

ভারতের জাতীয় জীবনের এক যুগসন্ধিক্ষণের দেশ ব্রতী মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় । তিনি ছিলেন জন্মগত শিক্ষাব্রতী । শিক্ষার মধ্য দিয়ে দেশ প্রেমের চেতনা বিস্তার করা ছিল তাঁর জীবনের প্রধান ধর্ম । তিনি বলতেন " পরাধীন জাতির শিক্ষকের প্রধান কার্য্য আত্ম গৌরবের রক্ষা সাধন । জন্মগত দেশ প্রেমী রূপে তিনি বলতেন " বড় হইয়াছি মাতৃভূমির গৌরব, সম্মান, মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারি এবং দেশের কোন কাজে লাগিতে পারি, তাহা হইলে আমার জীবন সার্থক ভাবিব । " ৩৮

সাহিত্যে ছিল ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জাতীয়তাবাদ প্রচারের প্রাণবন্ত প্রবাহ । তাঁর রচিত ' সফল স্বপ্ন ', ' অঙ্গুরী বিনিময় ', ' স্বপ্ন লব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস ', ' পুষ্পাঞ্জলি ' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর জাতীয় চেতনার ও স্বদেশ ভক্তির উজ্জ্বল রত্ন । এই গ্রন্থ সমূহের মধ্য দিয়ে তিনি জাতীয়তার ভাব প্রচার করার চেষ্টা করেছিলেন । ' স্বপ্ন লব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে ' ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহারাষ্ট্রের নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় ঐক্য ও অভ্যুদয়ের বিবরণ দিয়েছেন । ' পুষ্পাঞ্জলি ' গ্রন্থে ভারতের সকল তীর্থক্ষেত্র ভ্রমণের মাধ্যমে তিনি ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত জাতীয়তাবোধকেই

অপূর্ব ভাবে প্রকাশ করেছেন । ঋষি মার্কণ্ডেয়কে ব্যাসদেব প্রশ্ন করলেন ' ইনি কোন দেবী ' ? মার্কণ্ডেয় প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ব্যাসদেবকে নিয়ে তীর্থ ভ্রমণে বের হলেন । কুরুক্ষেত্র হতে দ্বারাবতী ও কন্যাকুমারিকা হতে কামাখ্যা অবধি তীর্থ দর্শন শেষে মার্কণ্ডেয় বলছেন " এক্ষণে তোমার ধ্যান প্রাপ্ত দেবীমূর্তির দর্শন প্রাপ্ত হইলে । অর্থাৎ ভারতবর্ষ অধিভারতী দেবীর ভৌতিক মূর্তি । তীর্থ দর্শনে তাঁহার পরিক্রমা করা হয় । " ভারতভূমিকে দেবী রূপে কল্পনা করা বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে দেখা যায়নি । এই ভাবনায় বঙ্কিম চন্দ্র প্রভাবিত হয়েছিলেন । ভূদেব রচিত " অঙ্গুরীয় বিনিময় " গ্রন্থ দেশপ্রেমের বন্যায় প্লাবিত । এক স্থানে তিনি শিবাজীর মুখ দিয়ে প্রকাশ করছেন — " জানিস না , গর্ভধারিণী মাতা , আর পয়স্বিনী গো এবং সর্বদ্রব্য প্রসবা জন্মভূমি — এই তিন সমান , যে জন্মভূমির অপকার করিতে পারে সে গো বধ এবং মাতৃহত্যাও করিতে পারে । " ' স্বপ্ন লব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস ' এ তিনি হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের কথা বলে জাতীয়তাবাদের একই ধারায় উভয়কে দাঁড় করিয়েছেন । " ভারতবর্ষ যদিও হিন্দু জাতীয় দিগেরই যথার্থ মাতৃভূমি , যদিও হিন্দুরাই তাহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন , তথাপি মুসলমানেরাও আর ইহার পর নহেন , ইনি উঁহাদিগকেও আপন বক্ষে ধারণ করিয়া বহুকাল প্রতিপালিত করিয়া আসিয়াছেন । অতএব মুসলমানেরাও ইহার পালিত সন্তান । ..... এক্ষণে সকলকে সম্মিলিত হইয়া মাতৃদেবীর সেবার ভার গ্রহণ করিতে হইবে । " ৩৯

হেমচন্দ্র

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের নবজাগরণের চারণ কবি ছিলেন হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় । তাঁর ছাত্র জীবন হতেই তিনি অনুভব করেন পরাধীনতার তীব্র বেদনা । ' বীরবাহু ' কাব্য গ্রন্থে তাঁর স্বদেশভক্তির দৃঢ় ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে ।

" এবে সেই দেশ মান্যা ভারত বক্ষেতে, ম্লেচ্ছকুল পদে দলে
লক্ষতরী ভাসাইব ম্লেচ্ছ দেশ মজাইব
বাণিজ্য করিব ছারখার।
তোর সিংহাসন পাত ম্লেচ্ছকুল ভস্মসাৎ
প্রেয়সীরে করিব উদ্ধার। "

জন্মভূমির পরাধীনতায় ক্ষেদের সাথে তিনি বলছেন ' মাগো ওমা, জন্মভূমি। আরও কত কাল তুমি। এ বয়সে পরাধীনা হয়ে কাল যাপিবে। ' ভারত বিলাপে ' ফুটে উঠেছে ব্রিটিশ বিরোধী সুর।

আগে ছিল রাণী — ধরা রাজধানী,
স্মরণে যেন গো, যাক সে কাহিনী,
এবে সে কিঙ্করী হয়েছে দুখিনী,
বলিয়ে দম্ভ করোনা গরিমা।
তোমারোত বুকে কতশত বার —
রিপু পদাঘাত করেছে প্রহার,
কালেতে না জানি কি হবে আবার
এই কথা সদা করিও ধ্যান। "

' ভারত সঙ্গীত ' হেমচন্দ্রের সব চাইতে প্রেরণা প্রদানকারী কবিতা। ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করছেন, " ভারত সঙ্গীতের দ্বারা জাতীয় আন্দোলনের পরিপুষ্টি সাধন হইয়াছে। ' বীর বাহু ' তে যে সুরের সূত্রপাত ' ভারত সঙ্গীত ' এ তাহারই পরিণতি। দেশ প্রেমের এমন উচ্ছ্বাস পূর্ণ ও উত্তেজনাময় প্রকাশ খুব কম বাঙালা কবিতায় আছে। "

" হয়েছে শ্মশান এ ভারত ভূমি ,
কারে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি আমি ,
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি ,
আর কি ভারত সজীব আছে ?

জপ , তপ আর যোগ আরাধনা ,
পূজা , হোম , যাগ প্রতিমা - অর্চনা ,
এ সকলে এবে কিছুই হবে না ,
তূনীর কৃপাণে করবে পূজা ।

বাজরে শিঙা বাজ এই রবে ,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে ,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে ,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে ,
ভারত কি শুধু ঘুমায়ে রবে ?

এই ' ভারত সঙ্গীত ' প্রকাশিত হওয়ার পর হেমচন্দ্রকে ইংরেজদের বিষ নজরে পড়তে হয়েছিল । হেমচন্দ্র ভবিষ্যৎ ভারতের এক উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখেছিলেন । " ফের এ ভারতবাসী । জ্ঞানের তরঙ্গে ভাসি । হাসিবে অপূর্ব হাসি লভিয়া জীবন । " জগদীশ চন্দ্রের ভগিনী লাবণ্য প্রভা সরকার বলেছেন ' গীতি কবিতায় তিনি তাঁর নির্ভিক , স্বদেশ প্রেমে অনুপ্রাণিত হৃদয়ের যে তীব্র জ্বালা প্রকাশ করিয়াছেন , তাহা আগ্নেয় গিরির অগ্নি স্রোতের মত আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে । "

নবীন চন্দ্র সেন

নবীনচন্দ্রের কাব্য রচনার মূল প্রেরণা স্রোত ছিল স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ ।

সকল প্রকার অন্যায় অবিচার ও অত্যাচার থেকে জাতির মুক্তি লাভই ছিল তাঁর কাছে একান্ত কাম্য। তাঁর কাব্য গ্রন্থ 'অবকাশ রঞ্জিনী' তে তিনি লিখেছেন —

" ভারতের ইতিহাস শোকের সাগর
কেন পড়িলাম ? আহা কেন পাইলাম
আপনার পরিচয় ? আর্য্য বংশ কীর্তি যে —
কেন দেখিলাম আহা, কেন জন্মিলাম
স্বাধীন বংশেতে মোরা, অধীন পামর ? "

'স্বায়ংচিন্তা কবিতায় স্বদেশের ভাগ্য বিপর্যয়ে বিষাদগ্রস্ত কবি খেদোক্তি করছেন —

" স্বদেশের রাজনীতি, শাসন প্রণালী,
কেবা রাজা, কিবা জাতি, কোথায় বসতি
কেমনে ভারতে পশি, দাসত্বে করিল মসি
আর্য্য - সূত - বীর্যভানু, পতঙ্গ যেমতি
ডুম্বিল যবন লক্ষ্মী কি অনল জ্বালি। "

ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নবীন চন্দ্রের দেশ ভাবনার সম্পর্কে পরিপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ সমূহের আলোচনা প্রসঙ্গে বলছেন " দেশের প্রতি সুগভীর ভালবাসায় তাঁর হৃদয় ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ, পরাধীনতার বেদনা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করতেন। বহু কবিতায় তিনি দেশের দুঃখ দুর্দশায় অশ্রুপাত করিয়াছেন। এই দেশ প্রীতির প্রেরণায় তাঁহার অন্তরের অন্তস্থল হইতে যে কবিতার স্রোত তরুণ বয়সেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছিল, পরিণত যৌবনে তাহাই দুকূল প্লাবী হইয়া তাঁহাকে 'পলাশীর যুদ্ধ' রচনায় প্রণোদিত করে। "

পলাশীর ঐতিহাসিক প্রান্তর দেখে কবি বেদনা মথিত হৃদয়ে লিখছেন —

" এই কি পলাশী ক্ষেত্র ? এই সে প্রাঙ্গন ?
যেই খানে মোগলের মুকুট রতন
খসিয়া পড়িল আহা, পলাশীর রণে,

যেইখানে চিররুচি স্বাধীনতা ধন
হারাইলে অবহেলে পাপাত্মা যবনে ?
দুর্বল বাঙালী আজি, মানস নয়নে,
দেখিবে সে রণক্ষেত্র ?

ভারতের গৌরবময় অতীতের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী পথের সন্ধানে তিনি সন্ধান করে ফিরেছেন। এইজন্য 'মহাভারত' এর আকরহতে 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস' নামে তিনটি কাব্য রচনা করলেন। "নবীনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের কর্ম কান্ডের মধ্যে দেখতে পেলেন খন্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতে অখন্ড ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের বিপুল প্রয়াস।" ৪০ এই আদর্শের পথ অনুসরণ করে তিনি তাঁর কাব্য প্রকাশ করলেন —

" ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য করি সম্মিলিত
এই শৈল প্রাচীরের মধ্যে পুনঃ ভূমে
এক মহারাজ্য, প্রভু, হয় না স্থাপিতে
এক ধর্ম, এক জাতি, এক সিংহাসন ? "

সাহিত্যে নবীন চন্দ্রের দেশ ভাবনা ও দেশ ভক্তির প্রাবল্য বঙ্কিম চন্দ্রকে মোহিত করেছিল। বঙ্কিম চন্দ্র মন্তব্য করেছেন, "নবীন বাবুরও যখন স্বদেশ বাৎসল্য স্রোত উদ্বেলিত হয়, তখন তিনি রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না, সে ও গৈরিক নিঃস্রাবের ন্যায়। যদি উচ্চৈঃস্বরে রোদন, যদি আন্তরিক মর্মভেদী কাতরোক্তি, যদি ভয় শূন্য তেজো ময় সত্য প্রিয়তা, যদি দুর্বাসা প্রার্থিত ক্রোধ, দেশ - বাৎসল্যের লক্ষণ হয় — তবে সেই দেশ বাৎসল্য নবীন বাবুর।" ৪১

রঙ্গলাল

ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যের মূল সুর ছিল স্বদেশ

প্রেম । এই স্বদেশ প্রেম তাঁকে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্খায় উদ্দীপ্ত করেছিল । ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন " পদ্মিনী উপাখ্যান কাব্যে শিক্ষিত বাঙালী আপনার চিত্তের এক গূঢ় অনুভূতিকে মূর্ত দেখিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিল । " কাব্যটি প্রথম হতে শেষ অবধি দেশাত্মবোধের উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ । কাব্যের বিষয় মুসলমান কর্তৃক চিতোর আক্রান্ত হলেও কবির মনের সামনে পরিস্ফুট ছিল ব্রিটিশ শৃঙ্খলে বাঁধা পরাধীন ভারতবর্ষ ।

" মানসে করেন চিন্তা কোথায় সেদিন।
যেদিন ভারত ভূমি ছিলেন স্বাধীন ।।
অসংখ্য বীরের যিনি জন্ম প্রদায়িনী ।
কত শত দেশে রাজবিধি বিধায়িনী ।।

তাই চিতোরের স্বাধীনতা রক্ষার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা রক্ষা উজ্বল আকাঙ্খা প্রকাশিত হয়েছে ।"চল যবে সমর কবির প্রান পণে । রাখিব জাতীয় ধর্ম রুধির তর্পনে । কুল ধর্ম রাখিতে জীবন যদি যায় । জীবনের সার্থকতা , ক্ষতি কিবা তায় ? "

স্বাধীনতার মাহাত্ম্য বর্ণনায় কবির রচনা অপরূপ ভাষা ও বাণী প্রকাশ করল —

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে
কে পরিবে পায় ?
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে
নরকের প্রায় ।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ সুখ তায় হে
স্বর্গ সুখ তায় ।

সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে
বাহুবল তার ।
আত্ম নাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে
দেশের উদ্ধার ।।

সুকুমার সেন বলছেন -- " রঙ্গলালের কাব্যের দ্বারা নিশিখিনীর মৌন যবনিকা অপসারণের প্রথম সঙ্কেত ধ্বনিত হইয়াছিল বলিয়া আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট্য মূল্য আছে । " রঙ্গলাল বীর রস ভাবাত্মক দেশ প্রেমের কবিতা রচনায় যে আবেগের সঞ্চার করেছিলেন জাতির জীবনে সেই দেশ প্রেম দুকূল ধরে প্লাবিত হয়েছিল , এবং পরাধীনতার মর্ম জ্বালা তিনি জাতিকে অনুভব করতে শিখিয়ে ছিলেন । বাংলার বহু কবি জাতীয় স্রোতে দেশ প্রেমের বন্যার ধারায় অবগাহন করেছিলেন এবং তাঁর কাছে অনুপ্রাণিতও হয়েছিলেন ।

ব্রাহ্ম আন্দোলন

" বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে দ্বিতীয় সৃজনী শক্তি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর । বলিতে গেলে সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী তাহারই জীবন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত । দেবেন্দ্র নাথ দ্বারকা নাথ ঠাকুরের পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন রাম মোহনেরই মানস পুত্র, তাঁহার চিন্তা ভাবনার উত্তর সার্থক । " ৪১ রাম মোহন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'ব্রাহ্ম সমাজ' । শিক্ষিত ব্যক্তিদের উপর ব্রাহ্ম সমাজের প্রচন্ড প্রভাব ছিল । দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের পরিযত্নে ব্রাহ্ম আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল ' তত্ত্ববোধিনী সভা ', ' তত্ত্ব বোধিনী পাঠশালা ', ' তত্ত্ব বোধিনী পত্রিকা ' । স্বদেশের কল্যাণের জন্য দেবেন্দ্র নাথ রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন । তিনি ১৮৫১ সালে ' বৃটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ' এর প্রতিষ্ঠা হলে তার

সম্পাদক নিযুক্ত হোন। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের জীবনে ধর্মের সঙ্গে দেশ প্রীতি এক হয়ে গিয়েছিল। মহর্ষি নিজে প্রার্থনা করতেন " হে পরাত্মন, আমাদের এই বঙ্গ ভূমিকে উজ্জ্বল কর। তোমার এই সকল দুর্বল সন্তানের প্রতি কৃপা দৃষ্টি প্রদান কর। এই হীন পরাধীন দেশের কেহই সহায় নাই। ইহা নানা ক্লেষ, নানা বিপত্তিতে দিন দিন আবৃত হইতেছে — দিন রাত্রি ইহার ক্রন্দন ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। তুমি এ দেশকে উদ্ধার কর। "

দেবেন্দ্রনাথের রক্ষণশীল মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হয় কেশব চন্দ্র সেনের কণ্ঠে। পৌত্তলিকতার সাথে সংশ্রব ত্যাগ, নারী স্বাধীনতা, মদ্য পান নিবারণ, দাক্ষিণ্য, স্ত্রী শিক্ষা ও সুলভ সাহিত্যের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। পরে কেশব চন্দ্রের সাথে নব্য ব্রাহ্মবাদীদের মতভেদ হয়। তারা তখন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ নামে এক নতুন দল প্রতিষ্ঠা করলেন। এই নবীন দলের নেতা ছিলেন দুর্গা মোহন দাস, আনন্দ মোহন বসু, দ্বারকা নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি। এই নব্য দল 'Brahama Public Opinion' এ নিজেদের আদর্শ ব্যাখ্যা করে বললেন – " Brahmonism elevates people not only spiritually but socially, intellectually, physically and politically.. Boldly and fearlessly we hope to teach and practise reforms".

এই নব্য দলের দ্বারকা নাথের হৃদয় ছিল স্বাদেশিকতায় পরিপূর্ণ। তিনি গাইলেন ——

' না জাগিলে ভারত ললনা
এ ভারত আর জাগে না জাগে না। '

শিবনাথ শাস্ত্রী বিশ্বাস করতেন স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত করার জন্য মধ্যবিত্ত শ্রমিক শ্রেনীকে দেশপ্রেমের প্রবাহে যুক্তকরতে হবে। তিনি সেই বাণী শোনালেন,

উঠ জাগো শ্রমজীবী ভাই,
উপস্থিত যুগান্তর
চলাচল নারী নর
ঘুমাবার আর বেলা নাই
উঠ জাগো ডাকিতেছি ভাই।

কেশব চন্দ্রের দেশভক্তি ও আন্তর্জাতিত্ব ভাব এক সাথে মিশে গিয়েছিল। তাঁর রচিত ভারতের প্রতি ইংলয়ন্ডের কর্তব্য অভিভাষণটি ভারতের ইংরেজ শাসক সুনজরে দেখেননি। তারা এই বক্তৃতা আবৃত্তি করতে দেশবাসীকে নিষেধ করলেন শাস্তির ভয় দেখিয়ে। কেশবচন্দ্র ইংরেজদের এই হীনমন্যতা দেখে ঘোষণা করলেন "যদি ইংলন্ড স্থির করে থাকে যে ইংরেজ ভারতের জনগণের স্বার্থে নয়, শুধু ম্যাঞ্চেষ্টার ও ইংলন্ডের বণিক সমাজের স্বার্থেই ভারত শাসন করবে, তাহলে আমি বলি, এই মুহূর্তেই বৃটিশ শাসন নিপাত যাক।" বিপিন চন্দ্র পাল সত্যই মন্তব্য করেছেন "আমাদের বর্তমান স্বাদেশিকতার হরিদ্বারে কেশব চন্দ্রকে দেখতে পাই।"

হিন্দু মেলা বা জাতীয় মেলা

১৮৬৭ সালে 'হিন্দু মেলা নামে' এক ভাবোদ্দীপক দেশাত্মবোধ জাগরণের একটি উৎসব শুরু হয়। ব্রাহ্ম সমাজের কিছু ব্যক্তির সাথে রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর, মনমোহন ঘোষ প্রভৃতি ব্যক্তির প্রচেষ্টা ছিল। গগনেন্দ্র নাথ ছিলেন এই মেলার সম্পাদক। এই মেলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলছেন বৎসরের শেষে হিন্দু জাতিকে একত্রিত করা। তিনি আরও বলছেন "আমাদরে এই মিলন সাধারণ ধর্ম কর্মের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য, ভারত ভূমির জন্য।" ভারতবাসীকে সকল দিকে আত্ম নির্ভর করানো এই মেলার আরেক উদ্দেশ্য ছিল।

হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১২ ই এপ্রিল চৈত্র সংক্রান্তির দিন। স্থান ছিল আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়ার ডানকিন সাহেবের বাগান বাড়ী। প্রতি বছর মেলাতে স্বদেশী শিল্পের প্রদর্শনী খোলা হত। এবং নানা প্রকার ব্যায়াম ও প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত ছিল। জাতীয় ভাবমূলক ও দেশাত্ম বোধ সম্পন্ন কবিতা প্রবন্ধ প্রভৃতি পাঠ করা হতো। এই হিন্দু মেলা বা জাতীয় মেলা সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী মন্তব্য করেছেন " কেশব চন্দ্রের বক্তৃতা, দীনবন্ধুর নাটক, বঙ্কিম চন্দ্রের উপন্যাস, বিদ্যাভূষণের সোম প্রকাশ, মহেন্দ্রলাল সরকারের হোমিওপ্যাথি, এই সকলের মধ্যে শিক্ষিত দলের মনে যেমন নব ভাব আনিয়া দিতেছিল, তেমনি আর এক কার্য্যের আয়োজন হইয়া নব আকাঙ্খার উদয় করিয়াছিল, তাহা নব গোপাল মিত্র মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ' জাতীয় মেলা ' ও প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা এবং দেশের সকল বিভাগের ও সকল শ্রেনীর নেতৃবৃন্দের তাহার সহিত যোগ। বঙ্গ সমাজের ইতিবৃত্তে ইহা একটি প্রধান ঘটনা, কারণ সেই যে বাঙালীর মনে জাতীয় উন্নতির স্পৃহা জাগিয়াছিল তাহা আর নিদ্রিত হয় নাই।" ৪৩

এই মেলাতেই সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুরের ' মিলে সবে ভারত সন্তান ' গীত হয়। " হোক ভারতের জয়। জয় ভারতের জয়। গাও ভারতের জয়। কি ভয় কি ভয়। গাও ভারতের জয়। " এই গান সম্পর্কে বঙ্কিম চন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন " এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক। হিমালয় কন্দরে প্রতিধ্বনিত হোক। গঙ্গা যমুনা, সিন্ধু, নর্মদা, গোদাবরী তটে, বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মারিত হউক। পূর্ব পশ্চিমে সাগরের গম্ভীর গর্জনে মন্ত্রীভূত হউক। এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয় যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক। "

এই 'হিন্দু মেলা' কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ' জাতীয় বিদ্যালয় '। এ ছাড়া সঙ্গীত চর্চা, ব্যায়াম, অশ্বারোহন, বন্দুক চালনা, চিত্রাঙ্কন, কারিগরি, জরিপ, বিজ্ঞানাদি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৮৭৪ এ নব গোপাল মিত্র নিজেই এই

মেলার সম্পাদক হন। জাতীয় ভাবনার দ্বারা তিনি এতই প্রভাবিত ছিলেন যে প্রায় সকল সংস্থার পূর্বে জাতীয় শব্দ তাঁর দ্বারা যুক্ত হতো। তিনি এর জন্য 'ন্যাশনাল নব গোপাল মিত্র' নামে পরিচিত হলেন। নব গোপাল মিত্রের এই স্বদেশী ভাবনা পরবর্তীতে খ্যাত বিপ্লবী চেতনায় গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করতে প্রেরণা জুগিয়েছিল।

এই 'জাতীয় মেলা'র অন্যতম প্রাণ পুরুষ ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। তিনি 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী' বা 'গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা' স্থাপনে এদেশে জাতীয়তাবাদ উন্মেষের পক্ষে একটি বিশাল পদক্ষেপ। এই সভার কার্য্য বিবরণীতে উল্লিখিত ছিল Prospectus of a society for the promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal.

রাজনারায়ণের সকল কাজের সকল চিন্তার প্রেরণা ছিল স্বদেশ প্রেম। এই স্বদেশের প্রতি চিত্ত বৃত্তির উন্মেষ দেখেই রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, "দেশের সমস্ত খর্বতা দীনতা অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলিতে থাকিত, তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সঙ্গে হাত নাড়িয়া আমাদের সঙ্গে মিলিয়া তিনি গান ধরিতেন —

" এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন
এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।"

এই ভগবদ্ভক্তচির বালকেটির তেজঃপ্রদীপ্ত হাস্য মধুর জীবন, রোগে, শোকে অপরিম্লান তাঁহার পবিত্র নবীনতা আমাদের দেশের স্মৃতি ভাণ্ডারে সমাদরের সহিত রক্ষা করিবার সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই।"

এই মানুষই বিশ্বাস করতেন "ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যের মধ্যে স্বদেশের উপকার সর্বাপেক্ষা প্রধান। 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী'। .... ভারতবর্ষ আমাদিগের জন্মভূমি, ভারতবর্ষের উপকার সাধনে আমরা প্রাণপণে যত্ন করিব।"

একথা সত্য যে তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা ও ভাবনা দেশ প্রেমের জোয়ার এনেছিল । তাঁকে অনেকে 'grandfather of Indian Nationalism' বলে উল্লেখ করেছেন । ভাবনার দিক দিয়ে হয়তো এই উপাধি যোগ্য স্থানেই বর্ষিত হয়েছে ।

শুধু মাত্র কাব্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয় এই হিন্দু মেলার প্রবর্তন থেকে উদ্দীপিত হয়েছিল অর্থনৈতিক পরাধীনতার বিরুদ্ধে সচেতনতা বোধ । জীবন-ভাবনার সেই মন্ত্র উদ্ভাষিত হলো মনো মোহন বসুর আক্ষেপ মূলক কবিতায় —

তাঁতি কর্মকার, করে হাহাকার
সূতা জাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার —
দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাকো আর,
হলো দেশের কি দুর্দিন । ....
ছুঁই, সূতা পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে,
দীয়াশলাই কাটী, তাও আসে পোতে —
প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে শুতে যেতে,
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন ।

আরেক মন মোহন ঘোষ এই হিন্দু মেলার অধিবেশনে সুস্পষ্ট চেতনার বক্তব্য রাখলেন, " সারল্য আর নির্মৎসরতা আমাদের মূলধন । তদ্বিষয়ে ঐক্য নামা মহাবীজ ক্রয় করিতে আসিয়াছি । সেই বীজ স্বদেশ ক্ষেত্রে রোপিত হইয়া সমুচিত যত্ন বারি এবং উপযুক্ত উৎসাহ তাপ প্রাপ্ত হইলেই একটি মনোহর বৃক্ষ উৎপাদন করিবেক । এত মনোহর হইবে যে যখন জাতি গৌরব রূপ তাহার নব পত্রাবলীর মধ্যে অতি শুভ্র সৌভাগ্য পুষ্প বিকশিত হইবে, তখন তাহার শোভা ও সৌরভে ভারত ভূমি আমোদিত হইতে থাকিবে । তাহার ফলের নাম করিতে এক্ষণে সাহস হয় না, অপর দেশের লোকেরা তাহাকে 'স্বাধীনতা' নাম দিয়া তাহার অমৃত স্বাদ ভোগ করিয়া থাকে । "

পরবর্তীতে যে স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ বাংলা হতে ভারতবর্ষের প্রান্ত দেশে আছরে পড়েছিল, তার মূল স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল হিন্দু মেলার প্রাঙ্গন হতে। " ভারতের জাতীয়তাবাদের উদ্গাতা রাজনারায়ণ বসুর প্রেরণায় উদ্দীপ্ত ন্যাশনাল নব গোপাল মিত্র ১৮৭৬ সাল থেকেই স্বদেশী প্রচারে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।" ' মুখার্জীস ম্যাগাজিনে ' স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে দীর্ঘ ও মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছিলেন ভোলানাথ চন্দ্র। তিনি মন্তব্য করেছিলেন " আমাদের সক্রিয় সহযোগিতাই ম্যানচেষ্টারের শ্রীবৃদ্ধির কারণ, আর তা বন্ধ করে দিলে বিদেশী শিল্পের অধঃপতন অনিবার্য্য। "

জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম

: জাতীয় রাজনৈতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠার পটভূমি :

রাজা রাম মোহনের প্রচেষ্টা ও কার্যকলাপ হতে ১৮৮৫ সাল ভারত ইতিহাসের পথে এক নব প্রেরণার স্রোতধারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গতিতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। কোম্পানীর শাসনের হয়েছে অবসান। ১৮৫৭ এর মহা বিদ্রোহের পর বৃটিশ শাসন আরও দৃঢ় বদ্ধ হয়েছে। ইংরেজ শাসনের সাম্রাজ্যবাদী স্বরূপ যত নগ্ন হতে শুরু করেছে জাতীয়তা বাদী আন্দোলন হয়েছে তত প্রখর। জাতীয়তাবাদী নেতৃ বৃন্দের প্রভাবে ভারতে স্বদেশ প্রেমের তথা জাতীয়তাবাদের ভূমি উর্বরা হয়েছে। জাতীয়তাবাদের এই চৈতন্যের স্বরূপে প্রথম সর্বাপেক্ষা উদ্ভাসিত হয়েছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী।

ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশক হতে বাংলায় রাজনৈতিক চেতনা দ্রুত বিস্তার লাভ করছিল। এবং এই চেতনার মাধ্যমে শাসন তান্ত্রিক সংস্কার প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সভা সমিতি ও সংবাদ পত্রের মাধ্যমে জনমত সংগঠিত করার কাজ চলতে থাকে। সংবাদ পত্রে রাজনৈতিক চেতনা উন্মেষের সাথে সাথে গড়ে উঠে রাজনৈতিক সংঘ বা প্রতিষ্ঠান।

নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন তথা স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনাত্মক মনোভাবের জন্য প্রয়োজন ছিল রাজনৈতিক সংগঠনের। এই জন্য এই দশকে বহু সমিতি গড়ে উঠেছিল। বস্তুতপক্ষে উনবিংশ শতকের তৃতীয় দশক ছিল 'Age of Associations'

ভারতীয় জীবন ও মননের অন্যান্য বহু ক্ষেত্রের মত রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য নিয়ম তান্ত্রিক আন্দোলনের উপযোগিতার পথও দেখান রামমোহনই প্রায়। ১৮৩৮ সালে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের চেষ্টায় জমিদার সমিতি গঠিত হয় (Land Holidies Society) জমিদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য মূলতঃ এই সমিতি গঠিত হয়েছিল। কিন্তু এই সমিতির সমাবেশ থেকেই দ্বারকানাথ ঠাকুর অনুভব করেছিলেন "The time would soon come when his young friends, the Hindu Collegians would organise themselves into a compact band of patriots for the assertion of their political rights and their grievances". ৪৪

পরবর্তীতে ১৮৪৩ সালে থমসন নিজের প্রচেষ্টায় বাংলার যুব সম্প্রদায়কে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত করার জন্য গড়ে তোলেন Bengal British India Society ১৮৫৩ সালে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সনদ পাওয়ার সময় হলো। সাথে সাথে জোরদার হয়ে গড়ে উঠল রাজনৈতিক আন্দোলন। ১৮৫২ সালে গড়ে উঠল সর্বভারতীয় সংগঠন রূপে 'British India Association. এই সংগঠনের পটভূমি থেকে প্যারীচাঁদ মিত্র, রাম গোপাল ঘোষ সমস্ত চাকুরীর দরজা ভারতীয়দের খুলে দেওয়ার জন্য ও সুষ্ঠু অর্থনীতির প্রবর্তনের দাবী জানালেন। ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে শিশির কুমার ঘোষ, কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গড়ে তুললেন 'Indian League' (১৮৭৫)। পরের বছর গড়ে উঠল সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের Indian Association বা ভারত সভা। জাতীয় কংগ্রেসের আবির্ভাবের আগে ভারত সভাই

ছিল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য জাতীয়তা বাদী সংস্থা। সুরেন্দ্রনাথ ভারত সভা গঠনের চারটি মুখ্য উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন (১) দেশে জনমত গঠন (২) এক রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে ভারতের বিভিন্ন অংশের অধিবাসীদের মধ্যে ঐক্যকে সুদৃঢ় করা (৩) হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন ও (৪) সকল আন্দোলনে জনগণের সক্রিয় সমর্থন অর্জন। এই ভারত সভার মধ্য হতে শুরু হলো I.C.S পরীক্ষায় বয়স কমানোর বিরুদ্ধে আন্দোলন।

"The agitation was the means, the reising of the maximum limit of age for the open compêtative examination and the holding of samultaneous examinations were among the ends, but underlying conceptions and the true aim and purpose of the civil service Agitation, was the awakening of a spirit of unity and solidarity among the people of Indian." ৪৫

সীমাবদ্ধ এই আন্দোলনের সূত্র ধরেই সম্ভব হলো ভারতবাসীর মধ্যে এক রাজনৈতিক ঐক্য। সারা ভারতবর্ষ তাঁর নেতৃত্বের ছত্র ছায়ায় এল। ইংরেজ রাজত্বের না হলেও ইংরেজ অবিচারের বিরুদ্ধে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে তারা একত্র হলো।

"For the first time under British rule, India.... had been bought upon the same platfrom for a common and united effort. Thus was it demonstrated, by an object lesson of impresive significance. That whatever might be own differences in respect of race and language or social and religions institutions the people of India could combine and unite for the attainment of their common political ends". ৪৬

লর্ড রিপণের আমলে ইলবার্ট বিল বিতর্ককে কেন্দ্র করে সুরেন্দ্রনাথের আন্দোলন ভারতীয়দের রাজনৈতিক চেতনাকে আরও উদ্দীপ্ত করল। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের বিভেদই

যে ব্রিটিশ শাসনের মূল প্রকৃতি ভারতীয়দের বুঝতে দেরী হলো না। "The Ilbert Bill greately helped the cause of Indian Political advance." ৪৭

১৮৮৩ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দ মোহন বসুর পরিচালনায় ভারত - সভা প্রথম জাতীয় সম্মেলন (Indian National Conference) আহ্বান করেন কলকাতায়। বাংলার বাইরের বিভিন্ন স্থানের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন। রামতনু লাহিড়ী সভাপতিত্ব করেন। এই সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হয় ১৮৮৫ সালে কলকাতায়। ঠিক একই সময়ে বম্বেতে বসল উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ নিয়ে R.C.Majumder মন্তব্য করেছেন,
'A new era in the political life of India began with the foundation of Indian National Congress towards the very end of the year 1885. For more than twenty years after that it completely, dominated the political life of India and gave a shape and form to the ideas of administrative and constitutaional reforms which formed the Chief planks in the political programme". ৪৮

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে ভারতে জেগেছিল সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক কর্ম প্রবাহ। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা এই কর্ম প্রবাহের আনুষাঙ্গিক অঙ্গ। এই প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ইতিহাস সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গী প্রচলিত আছে। History of Indian National Congress এর লেখক সীতারামাইয়া বলছেন "It is

shrouded in mystery as to who originated the idea of all India Congress". ৪৯

এক সময় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন এ. সি. মজুমদার। তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে ১৮৮৩ সালে কলিকাতায় জাতীয় সম্মেলনের আদর্শ থেকেই দুই বছর পরে জাতীয় কংগ্রেসের পরিকল্পনা করা হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এই জাতীয় সম্মেলনের অধিবেশনের সমাপ্তি দিনের পর কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে বোম্বাই'এ। এই কংগ্রেসের সম্মেলনের উদ্যোক্তারা সুরেন্দ্রনাথের সাথে যোগাযোগ রেখেছিলেন। জাতীয় সম্মেলনের আদর্শই ছিল জাতীয় কংগ্রেসের অভিপ্রায়।

অনেকে অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম (Allan Octavian Hume) নামে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস থেকে সদ্য অবসর প্রাপ্ত ইংরেজ কর্মচারী কেই ভারতীয় কংগ্রেসের প্রকৃত উদ্যোক্তা বলে মনে করেন। তবে ভারতীয় দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদীদের আদর্শের দ্বারা হিউম মোটেই অনুপ্রাণিত ছিলেন না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। সে সময় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ ও বিপ্লবী মনোভাবের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। এই কারণে হিউম বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্কটই অনুভব করেন এবং ভারতীয়দের অসন্তোষ প্রশমিত করার প্রয়োজন অনুভব করেন। তিনি তাঁর এক মেমোরেন্ডামে উল্লেখ করছেন "The evidence convinced me at the time about fifteen months I think before Lord Lytton left-that we were in imminent danger of a terrible out break. I was shown seven large volumes(Corresponding to a certain more of dividing the country excluding

Burma, Assam and some minor tracts) containing a vast number of entires. English abstracts or translation — longer or shorter - of vernacular reports of communications of one kind or another, all arranged according to districts, sub-districts, sub-divisions and the cities, towns and villages included in these.... It was considered also that everywhere the small bands would begin do coalesce into large ones like drops of water on a leaf, that all the bad characters in the country would join and the very soon after the bands obtained formidable propertions a certain small number of the educated classes, at the time desperately, perhaps unreasonably, bitter against the government would join the movement assume here & there the lead give that - break cohesion and direct it as a National revolt". ৫০

হিউম এই পরিবেশে নিজের ভূমিকা স্পষ্ট করেই উল্লেখ করলেন "A safety valve for the escape of great and growing forces generated by our own action, was urgently needed & no more efficious safety valve than our Congress Movement could possibly he devised". ৫১

১৮৮৩ সালে হিউম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের উদ্দেশ্যে একটা খোলা পত্র, প্রকাশ করে তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক উৎকর্ষ লাভের জন্য উপদেশ দেন। তিনি এই বিষয়ে সরকারের সমর্থনের জন্যও আবেদন করেন। ফল স্বরূপ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হলো। রজণীপাম দত্ত অভিমত প্রকাশ করেছেন যে বড়লাট ডাফরিনের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র ও বৃটিশ পক্ষপাতিত্বের ফলশ্রুতি হলো

জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। হিউম এই ভাবে বিপ্লবকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। ড. সুমিত সরকার এই প্রসঙ্গে বলছেন, " ভারতের নেতৃবৃন্দ অনেক আগেই এক সর্ব-ভারতীয় রাজনৈতিক সংস্থা গঠনে ব্রতী হয়েছিলেন। হিউম সেই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছিলেন মাত্র।"

(Something like a national organisation had been in the aim for quite sometime. Hume only took advantage of an already created atmosphere".) ৩২

এই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠীর মন্তব্য " হিউমকে জাতীয় কংগ্রেসের জনক আখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁর ভারত প্রীতি, সংগঠন প্রতিভা, লিবারেল দল ও বড়লাটদের সঙ্গে হৃদ্যতা বিস্মৃত না হয়েও বলা যায়, তিন প্রেসিডে-ন্সিতে, বিশেষ করে বাংলায়, রাজনৈতিক চেতনা যে ভাবে অগ্রসর হচ্ছিল এবং রিপনের শাসন সংস্কারের ফলে আশায় ও ইলবার্ট বিলে পরাজয়ের ফলে হতাশায় যে ভাবে উদ্দীপিত হয়েছিল তাতে হিউম না থাকলেও কোন না কোন সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হতো। হয়তো তার কেন্দ্র হত কলকাতা, কর্তা সুরেন্দ্রনাথ। বাংলা দলকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা প্রথমেই বিভেদের বীজ রোপন করতে পারত কিন্তু সুরেন্দ্র-নাথের বিচক্ষণতার ফলে তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। ১৮৮৬ সালে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন কলকাতায় বলে এবং সুরেন্দ্রনাথ সদলে যোগ দেওয়ায় কংগ্রেস সত্যই জাতীয় কংগ্রেসে পরিণত হয়। ৩৩ বোম্বের গোকুল দাস তেজপাল হলে ১৮৮৫তে ডিসেম্বরে ২৭ এর অধিবেশন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গঠিত হলে সেদিন তার বিপ্লবী চরিত্র ছিল না। এই আন্দোলনাত্মক কার্যাসূচীর তীব্রতা ও উত্তেজনার জন্য কংগ্রেসকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল বঙ্গভঙ্গের কাল অবধি।

রামকৃষ্ণ - বিবেকানন্দ আন্দোলনের পৃষ্ঠভূমি ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ সীমা। রাজনৈতিক সংগঠনের ক্ষেত্র প্রস্তুত। সংঘর্ষ

শূন্য। বিপ্লবী সত্তা তখনই তীব্র ভাবে জাগেনি। সমাজ স্থবির। পরাধীনতায় বিস্মৃত জাতি আত্ম সচেতন হারা। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী মৃত্যুর ছায়া এঁকে দিয়ে যায় ভারতের ক্ষুদ্র কুটির পর্যন্ত তাদের বিভীষিকাময় আলপনা। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের বেড়াজালে রাজনৈতিক কার্যকলাপ দেশ প্রেমের স্রোতস্বিনী প্রায় লুপ্ত প্রাণা। এই সময়ই চেতনার চাবুক হাতে নিয়ে ভারতের মাটিতে বিবেকানন্দের আবির্ভাব। তেজো - দীপ্ত এই সন্ন্যাসীর দুটি রূপ। বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছেন — I have a message to the West". ভারতবর্ষ এখনও শিক্ষাগুরু। ভারতের পরাধীনতায় বিচলিত সন্ন্যাসী বিদেশকে কষাঘাত হেনেছেন। আবার দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে কষাঘাত করেছেন দেশের মানুষকে। নতুন ভাবে এক চৈতন্যময় জাতিকে জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরই চেতনায় ভারত এই শতাব্দীতে প্রথম শিখেছে জেগে ওঠার মানস ব্রতে। "A new spirit has arisen in the land. The long sleep of Mother India has ended and she is waking up. Who is responsible for it ? The responsibility and credit are alike the Swamijee's". ৫৪

তরুণ বিবেকানন্দ যখন প্রখর তাপে জীবন যুদ্ধে উদ্বেল তখনই আশ্রয় পেয়েছিলেন রামকৃষ্ণের স্নেহ ছায়ায়।। " দক্ষিনেশ্বরের এই আলোক সামান্য সাধকের সান্নিধ্যে থেকেও দীর্ঘ ছ বছর বিবেকানন্দ তাঁর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র অটুট রাখার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু একটু একটু করে ভেঙে গিয়েছিল তাঁর সমস্ত প্রতিরোধ। অবশেষে আত্ম সমর্পনের মধ্যেই বিবেকানন্দ লাভ করলেন পরম প্রশান্তি।" ৫৫

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে এক বিশাল দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বিচার, বিবেক ও আদর্শের মাধ্যমে নরের মধ্যে নারায়ণকে জাগ্রত করা। কিন্তু রামকৃষ্ণের দেহ - ত্যাগের পর বিবেকানন্দ দেখলেন আসমুদ্র হিমাচল অবধি তাঁর আদর্শের শিব

নিপীড়িত, নির্যাতিত, পরাধীনতার গ্লানিতে শোষিত জীবের মধ্যে মৃত্যুর বেদনায় কাতরতা অনুভব করছে। বিচলিত বিবেকানন্দ ঝলসে উঠলেন।

শিকাগোর মহা সম্মেলনে দাঁড়িয়ে তিনি জগৎবাসীকে শোনালেন হিন্দু ধর্মের অমৃত কথা, ভারত বাণীর মর্ম। উপস্থাপিত করলেন বেদান্তকে নতুনভাবে, রামকৃষ্ণ কথামৃত পরিবেশন করলেন, বিশ্বকে আবার জ্ঞানের আলোকে নিয়ে এলেন।
"He (Ramkrishna) thus represents the peculiar mission of India in the World and forms the very fountainhead of Indian Nationalism. Everyone of India's national upheavals was led by a saint & patriot in the past. What Vasistha and Viswamitra were to the Ramayana period, what Vyasa was to the Mahabharata age, what Vidyaranya was to the Vidyanagaram upheaval and what Ramdas and Tukaram were to the Mahratta rising - that Ramkrishna is to the India of today.... Ramkrishna was the final expression to that principle which Rammohan dimly foreshadowed and Dayananda eloquently recognised, and his great mission was continued and handed down to us by his far-famed disciple, Swami Vivekananda". ৫৬

এই বিবেকানন্দই দেশবাসীর কাছে কি প্রচার করলেন? দেশবাসীরা "যে একই সঙ্গে বিদেশীর পদানত ও ষড়রিপুর ক্রীতদাস। ক্ষিধের জ্বালার সঙ্গে আধ্যাত্মিক অতৃপ্তিতে কাতর জাতিভেদের লাঞ্ছনা এবং সাম্রাজ্যবাদের নিপীড়ন তাদের শতধা বিভক্ত করে রেখেছে। ভারতবর্ষের অসীম সৌভাগ্য যে প্রচারকের আত্মতুষ্টি ও এক দেশদর্শিতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন বিবেকানন্দ।"

বিবেকানন্দ আমেরিকা ও ইংলন্ডে উদ্ধত, পরস্বলোভী, বিষয়াসক্ত, মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে ভারতের সংস্কৃতির মহনীয়তা, উদারতা অসামান্য দক্ষতায় তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু স্বদেশে ফিরেই ভারতবর্ষের নিষ্ক্রিয়তা, মানসিক ও দৈহিক জড়তা, নৈতিক সাহসের অভাব ও ভেদাভেদ জ্ঞানের ওপর বারবার তিনি চেতনার কষাঘাত করে গেছেন।

স্বাধীনতা বিবেকানন্দের জীবন সঙ্গীত। "স্বাধীনতাই উন্নতির প্রথম শর্ত। যেমন মানুষের চিন্তা করিবার ও কথা বলিবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তেমনি তাহার আহার পোষাক বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা প্রয়োজন"। তিনি যুবকদের উদ্দেশ্য করে আরও বলছেন "পরাধীন জাতির ধর্ম নেই। তোদের এক মাত্র ধর্ম মানুষের শক্তি লাভ করে পরস্বাপহারীকে তাড়িয়ে দেওয়া।" যে দেশপ্রেম বঙ্কিমচন্দ্রের সময় ছিল কাব্যিক কল্পনা, বিবেকানন্দের ভাবধারায় পুষ্ট হয়ে তা লাভ করল এক সম্পূর্ণ চৈতন্য সত্তা। ভারতবর্ষের সমাজকে তিনি ভেবেছেন "আমার শৈশবের শিশু শয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারানসী।" বিবেকানন্দের অভয় উক্তি "মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চন্ডাল ভারতবাসী, আমার ভাই। ..... ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত।" বিবেকানন্দের এই স্বদেশ প্রেম এক তীব্র আকুতির বহিঃপ্রকাশ। আর. জি. প্রধান তার India's struggle for Swaraj গ্রন্থে বলেছেন 'Swami Vivekananda might be called the father of M modern Indian Nationalism, he largely created it and also ~~ax~~ embodied in his own life it highist and noblest elements'.

অরবিন্দ বলেছেন, "বিবেকানন্দই আমাদের জাতীয় জীবনের গঠন কর্তা। তিনি ইহার প্রধান নেতা।" ভগিনী নিবেদিতা তার গুরুদেব সম্পর্কে সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন "সে সময় আমার প্রায় প্রতি প্রত্যহই তাঁহার সঙ্গে দেখা হইত। ...

ভারতের চিন্তা তাঁহার নিকট শ্বাস প্রশ্বাস স্বরূপ ছিল । যে মুহূর্তেআমি তাঁহার সহিত ভারতবর্ষে পদার্পন করিলাম, সেই মুহূর্ত হইতে তাঁহার মৃত্যুদিন পর্যন্ত আমি আমার গুরুদেবের মধ্যে আর এক অগ্নির দহন জ্বালা লক্ষ্য করিয়াছি, সে কোন তত্ব, কোন আধ্যাত্মিক সত্যের উপাসনা বা উন্মাদনা নয় — দেশ ও জাতির দুর্দশা নিবারণের প্রানান্ত প্রয়াস ও তাহার নিষ্ফলতার জন্য মর্মান্তিক যাতনা ভোগ ।" ৫৮

"The queen of his adoration was his motherland.' India was his day £ dream, India was his mightmare'. ৫৯

সেই জন্য ভারতের সাধনা তাঁর কাছে ছিল শ্রেষ্ঠ তাই তিনি বলেছিলেন " আগামী পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া তোমরা কেবল মাত্র স্বর্গাদপী গরীয়সী জননী জন্ম ভূমির আরাধনা কর। অন্যান্য অকেজো দেবতা গনকে এই কয় বর্ষ ভুলিলেও কোন ক্ষতি নাই।" এবং এই দেশজননীর প্রতি স্বাদেশিকতার টানে, জনভূমির প্রতি সন্তানের ভালোবাসার টানে বিবেকানন্দ ঘোষনা করলেন " তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত ।"

তাই বোধহয় " Vivekananda's religion and his patriotism stemmed from the same impalse-desire to attain freedom from boadage, from foreign rule as well as from selfishness or sensuatity, because both are an ineubses on the spirit." ৬০

ভারতবর্ষের পথ প্রান্তর এই মহা সন্ন্যাসীর অক্লান্ত পরিশ্রমে জাতীয়তাবাদ ও দেশ প্রেমের সঙ্কারে বিমুগ্ধ হলো । ভারতবর্ষের দীনতা দূর করে দীপ্ত জাতি রূপে আত্মাভিমান ভারতবাসীকে সংগ্রামী করে তুলেছিল । তাই বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলন কিংবা বিপ্লবী আন্দোলনের সময় স্বামীজীই ছিলেন প্রেরণার উৎস ।

সংবাদ পত্র ও জাতীয়তাবাদের স্ফুরণ

"Bengal occupies a unique position in the history of Indian journalism. It is the birth place of both the first English and the first vernacular news paper in India. It is will known that most of the important socio-religions, educational & political movements of the last century one of which evelved modern. India, first emanated from this part of the country. The story of this historic transformation is inter woven with the history of the Bengali press". ৬১

বাংলা সাহিত্যের প্রশস্ত আঙিনায় সাময়িক পত্র রূপে প্রথম আবির্ভাব হিকির 'বেঙ্গল গেজেট' ইংরাজী ভাষায় লিখিত পত্রিকা। এই পত্রিকার স্বরূপ সম্পর্কে পত্রিকায় বলা হয়েছে "a weekly political and commercial paper open to all parties but influenced by none'(No X VIII, April, 1780

স্বাধীন সত্তার জন্য লড়াই করেহিকি জেলে গেলেন। পত্রিকা বন্ধ হয়েগেল। রমেশ চন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করলেন হিকি "enunciated the noble principle of the liberty of press" for which the Indians had to struggle up to the termination of the British rule in India. ৬২

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আর কিছু সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়। তবে সেগুলো ছিল ক্ষণভঙ্গুর। বাংলা দেশে সাময়িক পত্রের সূচনা হয় ১৮১৮ সালে। শ্রীরামপুরের

মিশনারী সম্প্রদায় ১৮১৮ সালে প্রকাশ করেন ' দিগ দর্শন ', ' সমাচার দর্পন ' । এই পত্রিকায় হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে ও সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিরূপ সমালোচনা করা হত । এর প্রতিরোধ কল্পে রাম মোহন রায় ও ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর প্রচেষ্টায়প্রবর্তিত হয় ১৮২১ সালে ' সম্বাদ্ কৌমুদী ' । সমাচার দর্পন সমকালীন দলিল রূপে মূল্যবান। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা গদ্যের জন্ম, হিন্দু কলেজে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন, রাম মোহনের সতীদাহ প্রথা নিরোধের প্রয়াস এবং তার ফলে হিন্দু সমাজের চাঞ্চল্য, ধর্ম সভা স্থাপন করে হিন্দু সমাজকে বাঁচাবার চেষ্টা, এবং তার ফলে সামাজিক দলাদলি, ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বহুবিধ সামাজিকঘটনায় বাঙালীর পুরনো আদর্শ যখন ভেঙে যাচ্ছিল তখন সমাচার দর্পনের মতো পত্রিকাই ঃ সব ঘটনাকে প্রতিফলিত করেছে । কিন্তু ঐ পর্যন্ত । এ পত্রিকা কোনো সমাজ সাহিত্য বা ধর্মের গঠন মূলক কোন আদর্শ দেয়নি । একদিকে এটা যেমন খ্রীষ্টান মিশনারীদের বিস্ময়কর নিরপেক্ষতার পরিচায়ক, আর এক দিকে তেমনি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সেকালের নিঃশব্দ বিপ্লবের স্মৃতি বহ । " ৬৩

এর কয়েক বৎসর পর ১৮২২ সালে প্রকাশিত হলো ' সমাচার চন্দ্রিকা ' । সম্পাদক ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । রক্ষণশীলদের ধর্মসভার মুখপত্র ছিল এই পত্রিকা । ' সমাচার চন্দ্রিকা ' য় প্রকাশিত হয়েছিল ' বাবুর উপাখ্যান ' নামে এক নকশা । যা হতে বাংলা উপন্যাসের সূচনা । বোধহয় এটিই এই পত্রিকার বিশিষ্টতা ।

" আব্রু কে বা - সদ খুনই জিগর দস্ত দিহদ্
বা - উমেদি - ই কেরম - এ, খাজা, বা দরবান মা ফরোশ ।

এই ফার্সী বয়েতের অর্থ হলো যে সম্মান হৃদয়ের শতবিন্দু রক্তের বিনিময়ে কেনা, তাকে কোন অনুগ্রহ বা কৃপা লাভের আশায় দারোয়ানের কাছে যেন বিক্রি করোনা ।

এই বয়েতের উদ্ধৃত করে রাম মোহন রায় ১৮২৩ সালের সরকারী প্রেস আইনের প্রতিবাদে তাঁর ফার্সী পত্রিকা ' মীরাৎ উল আখবার' বন্ধ করে দেন । প্রতিবাদ ইংলন্ডের রাজার কাছেও পৌঁছে দেওয়া হয় । আধুনিক যুগের ভারতে স্বদেশ চিন্তার সূত্রপাত হয় , এই সময় থেকে ।" ৬৪ এই রাম মোহনই ' ক্যালকাটা জার্ণাল ' পত্রিকার স্বাধীনচেতা ইংরেজ সম্পাদক সিল্ক বাকিংহামকে নেপালবাসীদের পরাধীনতায় ব্যথিত হয়ে লিখেছিলেন — "Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be, ultimately successful".

স্বাধীনতার শত্রু ও স্বৈরাচারের মিত্র ইংরেজ শাসকরা সেদিন রাম মোহনের মুখে এই কথা শুনে শঙ্কিত হয়েছিল । তখন বাংলায় সাময়িক পত্রের জোয়ার আসেনি । কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হত মাত্র । স্বদেশ চিন্তাই হোক বা নব অভ্যুদয়ের চিন্তাই হোক তাও ভালভাবে পরিস্ফুট হয় নি, তাতেই বৃটিশ শাসক অনুভব করেছিল তাদের স্বার্থ হানির সম্ভাবনা । ১৮২৩ সালে কড়া প্রেস আইন জারী করা হলো । তার প্রতিবাদ ধ্বনিত হলো রাম মোনের পত্রিকার প্রকাশ বন্ধের মাধ্যমে ।

এই সময় বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেনীর উদ্ভব ঘটেছে । ঠিক সেই সময় প্রকাশিত হলো নীল রতন হালদার সম্পাদিত ' বঙ্গদূত ' (১৮২৯) । এই ' বঙ্গদূত ' এর মতে এদেশের সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেনীর উৎপত্তি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে যুগান্তকারী । একবার যখন ঐতিহাসিক কারণের সমাবেশে মধ্যবিত্ত সমাজ শ্রেনীবদ্ধ হয়েছে , তখন অসংখ্য উপকারও তার ফলে অবশ্য দেখা দিবে । সামাজিক উপকার ছাড়াও আরও একটি সুফল ফলবে মধ্যবিত্তের আবির্ভাবে । সেই সুফলটি হল — " স্বাধীনতাও অদূরে সেই শ্রেনী প্রাপ্তা হইবেক । " এ দেশের নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেনী স্বদেশ চিন্তা ও স্বাদেশিকতা বোধের ও মোহ্বেষে যে বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে ' বঙ্গদূত ' পত্রিকায় তারই আভাস পাওয়া যায় । তা ছাড়া অভিনব

ভঙ্গীতে 'বঙ্গদূত' এর মধ্যবিত্ত বন্দনা থেকে এ কথাও পরিষ্কার বোঝা যায় যে বাংলা সাময়িক পত্রে স্বদেশ চিন্তার পরিপোষণে ও পরিবেশনে এই মধ্যবিত্তের ভূমিকাই হবে প্রধান ।

১৮৩১ এ প্রকাশিত হলো 'সংবাদ প্রভাকর' । যে সময় 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশিত হলো সেই সময় বাংলায় চলছে নব্য বেঙ্গলদের প্রবল আন্দোলন । তাঁর ছাত্ররা নানা রকম সভা সমিতি করে বাংলার মানুষকে অসহিষ্ণুতার বাতাবরণে উত্তপ্ত করে চলেছে । এদের 'হাতে লক, হিউম, বার্কলে, টম পেইনের বই, মুখে ইংরেজী বুলি আর 'ডাউন উইথ হিন্দুইজম - স্বদেশীইজম' ধ্বনি ।' এই সময় ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর পত্রিকায় এই তরুণ দলের সমালোচনায় পত্রিকা পূর্ণ করে ফেলেছেন । ১৮৪০ 'Christian observer' পত্রিকা সংবাদ প্রভাকর সম্পর্কে মন্তব্য করছেন "The Prabhakar must be noticed as one of the better issues from the Native Press. Its earlier numbers contain much well managed and biting satire which its very later ones give to the public the moral essays and addresses delivered in the Tattwabodhini Sabha".

ঈশ্বর গুপ্ত সজ্ঞানে কোন আদর্শ প্রচার করেননি, কিন্তু বাংলায় রেনেসাঁস নামক যে ঐতিহাসিক পট পরিবর্তন ঘটেছিল উনিশ শতকে, সংবাদ প্রভাকরই তা প্রতিফলিত করেছিল । ৬৫ ঈশ্বর গুপ্ত সংবাদ প্রভাকরের মাধ্যমে এক লেখক গোষ্ঠীর সৃষ্টি করেছিলেন । এঁরা হলেন অক্ষয় কুমার দত্ত, দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, রঙ্গলাল ও মনো মোহন বসু । ঈশ্বর গুপ্তের বড় অবদান মাতৃ ভাষার জন্য প্রীতি জাগ্রত করা ।

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর পত্রিকা

'জ্ঞানান্বেষণ' প্রকাশিত হলো ১৮৩১ এ , এই পত্রিকার ভাবনার কথা পরিব্যক্ত হলো।
"The Jnanannesan while urging on the Indians to depend upon their own industry and economy asserted that the Indians should also be allowed to share in their own government, for unless this be done, the Hindus will scarely be great as a Nation. ....According to the Jnanannesan the spread of education had another aspect as well. It was an act of noblest patriotism. On the past of an Indian and benevolence on the past of a foreigner do help the diffusion of knowledge. True to the spirit of the young Bengal movement as its peak, the Jnanannesan delighted in denouning the old institution and practices of the Hindus and pleading for progressive out look". ৬৬

১৮৪৩ সালে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় একটি নির্দিষ্ট অবয়ব পাওয়া যায়। 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র মুখপত্র ছিল এই পত্রিকা। দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর এই পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর আত্ম জীবনীতে খিচ্ছেন "ইহার উদ্দেশ্য, আমাদের সমুদয় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব ও বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম বিদ্যার প্রচার। উপনিষদকেই আমরা বেদান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতাম।" তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ভাব গাম্ভীর্য রচনা বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগে গদ্যের আদর্শ তৈরী করেছিল। বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত উচ্চ শিক্ষিত মনীষীরা এই পত্রিকায় লিখতেন। সমকালীন সমাজ নিয়ে লেখা প্রকাশিত হলেও তবুও এই পত্রিকার লেখা সাংবাদিক ধর্মী ছিল না। যুক্তি বদ্ধ চিন্তা, মৌলিক তথ্য সন্ধান এবং সুপরিচ্ছন্ন পরিবেশনের ফলে এসব লেখার মূল্য ছিল অবিসংবাদিত।

বঙ্গ দর্শনের পূর্বে আরও কয়েকটি পত্রিকা সম্পাদিত হয়েছিল । ' বিবিধার্থ সংগ্রহ ' (১৮৫১), ও ' রহস্য সন্দর্ভ (১৮৬৩) পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় । এছাড়া দ্বারকা নাথ বিদ্যাভূষণের ' সোম প্রকাশ ' (১৮৫৮) , যোগেন্দ্র নাথ ঘোষের ' অবোধ বন্ধু ' (১৮৬০) , বিহারীলাল চক্রবর্তীর , ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত হলো প্যারী চাঁদ মিত্রের ' মাসিক পত্রিকা ' । ' সোম প্রকাশ ' এ প্রথম রাজনীতির কথা আরম্ভ হলো । ' মাসিক পত্রিকা ' প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস ' আলালের ঘরের দুলাল ' ।

১৮৭২ সালে ' বঙ্গ দর্শন ' এর আবির্ভাব একটি বড় ঘটনা । রবীন্দ্র নাথের ভাষায় ' সমাগত রাজবদ্দুত ধ্বনি। বঙ্কিম চন্দ্র এই বঙ্গ দর্শনের মধ্য দিয়ে জাতির জন্য এক মূল্যবোধ তৈরী করে দিয়েছিলেন । বঙ্গ দর্শনের ভাষায় ও দৃষ্টি ভঙ্গিতে একটা ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিবাদী চিন্তা, ইতিহাস প্রীতি , স্বদেশানুরাগ গদ্য সাহিত্যের স্পষ্ট অভিব্যক্তি ছিল বঙ্গ দর্শনের বৈশিষ্ট্য । বঙ্কিমের মানসিকতা ছিল বাঙালী সমাজকে মানব ধর্মে উজ্জীবিত করা । তাঁর চিন্তায় উদার নীতির সঙ্গে স্বদেশ স্বধর্মানুরাগের মিশ্রন ঘটেছে । স্বদেশ ও স্বধর্মকে তিনি ভালবাসতে শিখিয়েছেন । যুক্তিবাদী মন নিয়ে অন্ধতাকে তিনি দূর করাতে শেখাচ্ছেন । ইতিহাস , দর্শন , সাহিত্য মানব শাখারবিভিন্ন বিষয়কে তিনি এই বঙ্গ দর্শনের পাতায় পাতায় সমুজ্জ্বল আলোকে উপস্থাপিত করলেন । রামদাস সেন, রমেশ চন্দ্র দত্ত , রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এই ' বঙ্গ দর্শন ' ।

এর পর সাময়িক পত্রের ইতিহাসে ' ভারতী ' এক দীর্ঘজীবী পত্রিকা । ১৮৭৭ এ প্রকাশিত হয় । ১৯২৩ অবধি এ পত্রিকা সগৌরবে অধিষ্ঠান করেছিল । ' ভারতী ' র বিশেষত্ব ছিল গল্প , উপন্যাস ও কবিতা রচনায় । রবীন্দ্রনাথের যৌবনের কবিতা ওগদ্য রচনা ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছিল । ১২৯২ সালে ঠাকুর বাড়ী হতে প্রকাশিত হয়েছিল ' বালক ' পত্রিকা । সম্পাদিকা ছিলেন সত্যেন্দ্র নাথ

ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদা নন্দিনী দেবী। পরে ভারতী ও বালক এক সাথে মিশে যায়। উনিশ শতকে জোড়া সাকোঁর ঠাকুর পরিবার বাঙালী অভিজাত সংস্কৃতির আশ্রয় স্থল হয়ে উঠেছিল। বাংলা সাহিত্যে ভারতী যুগ বাঙলার এক সাহিত্যের আদর্শকে বুঝিয়েছে, যেমন বুঝিয়েছে বঙ্গ দর্শনে বঙ্কিমী যুগ। ১৮৯১ এ প্রকাশিত হলো ' সাধনা '। সম্পাদক দ্বিজেন্দ্র নাথের পুত্র সুধীন্দ্র নাথ। পরে রবীন্দ্রনাথ হোন এর সম্পাদক। ভারতীতে রবীন্দ্রনাথ অন্য লেখকদের মধ্যেএকজন ছিলেন। ' সাধনা 'তে তিনি ছিলেন একক।

সাহিত্যে পত্রিকার ক্ষেত্র যেমন একদিকে প্রসারিত হয়েছে, ১৮৫৭ সালে ' জাতীয় বিদ্রোহের ' পর শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে বিজাতীয় ভাব মিশ্রিত কৃত্রিম জাতীয়তার অন্তঃসার শূন্য স্বরূপটি ধরা পড়েছে। এবং এর কয়েক বৎসরের মধ্যেই স্বদেশ চিন্তার ভিত্তি প্রস্তর স্বদেশের উপর স্থাপন করার আগ্রহ দেখা দিয়েছে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে। বিদ্রোহের ফলে স্থাপিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়, আধুনিক শিক্ষার প্রসার বেড়েছে, শিক্ষিতদের সংখ্যা বেড়েছে, তাদের মানসিকতা তেমনি হয়েছে প্রশস্ত। স্বদেশ চিন্তার কাজে তারা আত্ম নিয়োগ করেছে। তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকায় এই স্বদেশ চিন্তার কথা পরিব্যক্ত হয়েছে — " যাঁহারা এই কথা হৃদয়ের সহিত বলিতে পারেন ' জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী ' জননী এবংজন্মভূমি স্বর্গহইতেও গরীয়সী, তাঁহাদেরই যথার্থ মাতৃভক্তি, তাঁহাদেরই যথার্থ দেশানুরাগ। অতএব স্বদেশের প্রতি সামান্য অনুরাগ থাকিলেই যে দেশানুরাগ হয় তাহা নহে, স্বদেশের প্রতি বিশেষঅনুরাগই চাই। সেই বিশেষ অনুরাগই দেশানুরাগ শব্দের বাচ্য। " ৬৭ এই সময় আরও কয়েকটি সমাচার পত্র প্রকাশিত হয়েছিল যেমন সুলভ সমাচার – ১৮৭০, আনন্দ বাজার পত্রিকা সপ্তাহিক ১৮৭৮, বঙ্গবাসী ১৮৮১, সঞ্জীবনী ১৮৮৩।

বাংলা সাময়িক পত্রের গোপন রিপোর্টে (১৮৭০ – ১৯০০) দেখা যাচ্ছে

' বঙ্গবাসী ' পত্রিকার প্রচার ছিল ২০,০০০ কপি , ' বঙ্গনিবাসী ' ৮০০০ কপি , ' সময় ' ৮০০০ কপি , ' হিতবাদী ' ৩০০০ কপি , দ্বি- সাপ্তাহিক ' বঙ্গমিত্র ' ৪০০০ কপি , মাসিক ' ভারত শ্রমজীবী ' ৪০০০ কপি । ৬৮

এই সব সাময়িক পত্রে ধ্বনিত হতো স্বদেশ ভাবনা ও স্বদেশের সমস্যা মূলক ভাবনার সুর । সুস্থ স্বদেশ প্রেমের বিকাশ ঘটাতে এই সাময়িক পত্রের দান ছিল সুমহান । বিংশ শতাব্দীর কালে প্রবেশ করা মাত্রই এই পত্রিকা গুলো গর্জে উঠল বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে । পত্রিকা গুলোর স্বাদেশিকতা দেশের অখন্ডতাকে রক্ষা করতে স্বদেশ ভাবনার অংশীদার হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জাতীয়তাবাদের তরঙ্গে ।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম জাগরণ

ভারতে মুসলিম রাজত্ব চলেছে দীর্ঘকাল ধরে । মোঘল যুগের অবসান কালে ভারতে ঘটেছে ইংরেজ সাম্রাজ্যের সূত্রপাত । ভারতে মুসলমান সমাজ ইংরেজদের প্রথমে ভালো চোখে দেখেনি । ভারতে নবজাগরণের পাশা পাশি মুসলিম সমাজ তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছে । হুমায়ূন কবির বলছেন "Woven into the intricate pattern of Indian life, the Muslims have yet maintained their individuality. They have contributed to the symphony of Indian life and yet retained a different timbre that can be clearly recognised." ৬৯

ইংরেজ রাজত্ব কালে ইংরেজ বিরোধিতা মুসলমানদের ইংরাজী শিক্ষার পথ হতে দূরে ঠেলে রেখেছিল । ১৮১৭ এ হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হিন্দুদের যেমন শিক্ষার

ক্ষেত্রে প্রচন্ড সাড়া জাগিয়েছিল মুসলমান সমাজে সেই সাড়া তার প্রায় পঞ্চাশ বৎসরেও জাগেনি। ১৮৬০ সালে যখন ৯ জন হিন্দু এম. এ পাশ করে সেখানে মুসলমানের সংখ্যা শূন্য। সেই সালে ৪১ জন হিন্দু বি. এ পাশ করেছিল সেখানে মুসলমান ছিল ১। আইনের ক্ষেত্রে ১৭ জনই ছিল হিন্দু। এমন কি সকল চিকিৎসা বিদ্যা সহ স্নাতক সকলেই হিন্দু। ১৮৫৮ সাল হতে ১৮৭৮ অবধি কেবল মাত্র ৫৭ জন মুসলমান স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উপাধি গ্রহন করেছিল যেখানে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল ৩, ১০০। ৭০

দ্বাদশ জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি আর. এম. সয়ানী তাঁর সভাপতির ভাষণে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন "By a stroke of misfortune, the Musalmans had to abdicate their position and descended to the level of their Hindu fellow country men. Mean while the noble policy of the new rulers of the country introduced English Education into the country. The learning of an entirely unknown and foreign language, Of course, required hard application and industry. The Hindus were accustomed to this, as even under the Mussalman rule, they had practicals to master a foreign tongue and so easily took to the new education. But the Musalmans had not yet become accustomed of this sort of thing, and were moreover, not then in a mood to learn, much less to learn anything that required hard work and application....The result was that so far as education was concerned, the Musalmans who were once superior do the Hindus now actually became their inferiors". তিনি আরও অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন —— "the political out look of the two communities was very different from the begining, English Education was the mainspring of all political evolutions of the Hindus, it is therefore hardly a matter of

surprise that the Muslim who lagged so far behind the Hindus in this respect, would fail to keep pace with them. The other circumstances also powerfully operated in the same direction, with the result that the two great communities, though subject to the foreign rule, suffering from the remedies or reforms could not present a united front in politics to meet on a common political platform. ৭২

রাজনৈতিক দিক দিয়ে হিন্দু মুসলমানের পার্থক্য সুস্পষ্ট ভাবে দেখা দিয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলায় ফরাজী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হাজী শরিওতুল্লা ও দুঁদু মিঞা। ফরাজীরা ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষকে ভাবতেন 'দার - উল - হারব' শত্রুদের দেশ। এই আন্দোলন মূলত হিন্দু জমিদার, নীলকর সাহেব ও বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ছিল। এই আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ (নোয়া মিয়া) তাঁর অর্থনৈতিক লক্ষ্য থেকে একে মুসলমানের ধর্মীয় সংস্কারের আন্দোলনে আবদ্ধ করে দেন। ফলে ফরাজী আন্দোলন সবিরাম ভাবে আরও কিছুকাল চললেও তার ঐক্যবদ্ধ কৃষক আন্দোলনের চরিত্রটা হারিয়ে গিয়ে বাঙালী মুসলমান সমাজের ছোট একটা দলের নিছক ইসলাম ধর্মের সংস্কারের আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। রাজনৈতিক জগতে মুসলমানদের নেতৃত্বে আর এক আন্দোলন দানা বাঁধে সেই আন্দোলন ওয়াহাবী। এর নেতা ছিলেন রায় বেরিলীর সৈয়দ আমেদ (১৭৮২ - ১৮৩১)। তাঁর বিশ্বাস ছিল ইংরাজদের জন্য ভারত

'দার - উল - হারব'। তাদের বিতাড়িত না করা পর্যন্ত ভারত 'দার - উল - ইসলামে' পরিণত হতে পারে না । এই আন্দোলন যেমন পাঞ্জাবে বিস্তারিত হয়েছিল তেমনি তিতুমীরের নেতৃত্বে বাংলায় এই আন্দোলন বিস্তৃত হয় । যদিও ধর্ম সংস্কারের আন্দোলন রূপে এর প্রারম্ভ কিন্তু সৈয়দ আহম্মদের পর কোথাও এই আন্দোলন কোথাও রাজনৈতিক, কোথাও সাম্প্রদায়িক , কোথাও শ্রেনী সংগ্রামের রূপ গ্রহণ করে । কেয়ামউদ্দিন তাঁর গ্রন্থ 'The Wahabir Movement ' এ বলেছেন যে প্রথম দিকে ওয়াহাবী আন্দোলন সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন হিসাবে শুরু হলেও পরে তা রাজনৈতিক রূপ নেয় । তিনি এই আন্দোলনকে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন রূপে স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে দাবী জানিয়েছেন । এই ওয়াহাবীদের সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে 'But still the fact remained that all their proclamation were issued in the name and interest of Islam, and their appeals were only to muslim. The sympathy and support of the Hindus were never asked for and it could hardly be done without violating the basic doctrines of the movement which sought to eradicate from India all power and inluence that than Islam". ৭১

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল মুসলমানরা সেই সব প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেনি । তাই 'Landholders Society, Bengal British India Society কিম্বা British Indian Association 'এ মুসলিম সদস্য প্রায়ই ছিল না । মুসলমান সমাজ রাজনৈতিক দিক দিয়ে তৎপর হওয়ার সাথে সাথেই তাদের মধ্যেও প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রবণতা দেখা দিল । ১৮৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো মহমেডান এসোসিয়েসন (Muhammadan Association) । ১৮৬৩ সালে আবদুল লতিফ কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করলেন 'Muhammadan Literary Society । উদ্দেশ্য ছিল Promoting the wall being and bringing about the political regeneration of the Indian Muslims'.

ভারতবর্ষে অন্যান্য প্রদেশের চাইতে বাংলায় মুসলমানদের শিক্ষিতের হার বেশী ছিল। ১৮৮১ - ৮২ এর একটি রিপোর্ট অনুযায়ী তাদের কলেজের ছাত্র ছিল বাংলায় - ১০৬, মাদ্রাজে - ৩০, বোম্বাই-এ - ৭, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে - ২৯, অযোধ্যা - ৭, পাঞ্জাবে - ১০। উচ্চবিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বাংলায় - ৩, ৮৩১, মাদ্রাজে - ১৭৭, বোম্বাই - ১১৮, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ - ৬৯৭ এবং পাঞ্জাবে - ৯১। ১৮৫৮ - ১৮৯৩ সালের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাশ করা স্নাতকের সংখ্যা - ২৯৩, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় - ২৯, বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় - ৩০, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় - ১০২, এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় - ১০২ মুসলমান। ৭৩

এই দিক দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মুসলমান সমাজের বাংলায় অন্য প্রদেশের চাইতে অধিক প্রগতি ঘটেছিল। মুসলমান সমাজের তিনটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কলিকাতায়। "It may be held, therefore, that the Bengal Muslims took up the cause of their community before Syed Ahmed, and anticipated, in some respects, the Aligarh Movement minus its extreme communal attitude". ৭৪

স্যার সৈয়দ আহম্মদ আলিগড় আন্দোলনকে প্রসারিত করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অনুন্নত ও অনগ্রসর মুসলিম সম্প্রদায় সাফল্য লাভ করতে পারবে না এবং যতদিন পর্যন্ত মুসলমান সম্প্রদায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় উন্নত না হয়ে উঠছে ততদিন রাষ্ট্রের সব সুযোগ সুবিধা হিন্দুদের একচেটিয়া থাকবে। তিনি ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে প্রগতির যথার্থ সোপান বলে মনে করতেন। সেই জন্য তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি

বিস্তারে উদ্যোগী হন । তাঁরই প্রচেষ্টায় গঠিত হয় Scientific Society ও Committee for Advancement of Learning । অক্সফোর্ড ও কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে তিনি আলিগড়ে ' অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ ' প্রতিষ্ঠা করেন । এছাড়া ' তাহজিব উল আখলাক ' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করেন । সৈয়দ আহম্মদের এই সব প্রচেষ্টায় মুসলিম সমাজে এক জাগরণ দেখা দেয় ।

প্রথম দিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দুদের সাহায্য করার চেষ্টা করলেও পরে আলিগড় অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ থিওডোর বেক এর প্রভাবে মুসলিম সমাজকে তিনি হিন্দুদের প্রভাব থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন । স্যর সৈয়দ আহম্মদ তাঁর মনোভাবনা প্রকাশ করেছেন "In a country like India where homogeanity does not exist in any case of their fields (Nationality, religion, ways of living, customs, mowes, culture and historical tradition), the introduction of representative government cannot produce any benefial results. is can only result in interfering with and prosperity of the land.... The aims and objects of the Indian National Congress are based upon an ignorance of history and present day realities, they do not take into consideration that India is inhabited by different nationalities.....I consider the experiment of Indian National Congress wants to make fraught with danger and suffering for all the nationalities of India, specially for the Muslims". ৭৫ সেই জন্যই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 'Educational Congress', United Patriotic Association এবং Muhhamedun Oriental Defence Association গঠিত হয় ।

সৈয়দ আহম্মদ মুসলমান সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন করে তুলতে চেয়েছিলেন , কিন্তু মুসলমান সমাজকে সামগ্রিক ভাবে কংগ্রেসী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেন নি । " উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দুরা স্বদেশ প্রীতি ও স্বধর্ম প্রীতির মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি । মুসলমানরা আবার স্বদেশ প্রীতি ও স্বধর্ম প্রীতিকে এমন ভাবে বিচ্ছিন্ন করেছেন যে , ধর্ম প্রীতির আতিশয্যে দেশকে তারা স্বদেশ বলে ভাবেন নি । ভারতবর্ষের বাসিন্দা হয়েও ভারতের বৃহত্তর ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে অন্য নিজেদের ঐতিহ্যের সন্ধান করেছেন আরব , ইরাণ ও তুরস্কে । ভারতের জাতীয় আন্দোলনের উন্মেষ কালে এই ভাবে হিন্দু মুসলমান একই ঐতিহ্যের গৌরবে অংশ গ্রহণ করতে অক্ষম হওয়ায় তা ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেনীর মধ্যে সাম্প্রদায়ি - কতার বিকাশে সহায়ক হয় । ৭৬

অথচ হিন্দু মুসলমান এক যোগে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করেছেন । ' সোম প্রকাশ ' এর পাতায় (২১ শে জানুয়ারী , ১৮৬৭) সম্পাদক লিখছেন " সারা ভারত ব্যাপী জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে হলে তাতে যাতে আলিগড়ের সৈয়দ আহম্মদের দল যোগ দেন সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে । " নবগোপাল মিত্রের ন্যাশনাল পেপার (১১ আগষ্ট , ১৮৭১) মন্তব্য প্রকাশ করেছে " আমরা চাই ভারতেশ্বরীর ভারতীয় প্রজাদের দুটি প্রধান অংশ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন রকমের মনো মালিন্য না হয় । " অমৃত বাজার পত্রিকায় (২০ শে অক্টোবার , ১৮৭০) প্রকাশিত হয়েছে " মুসলমান হিন্দুর মধ্যে সদ্ভাব ও একতা এখন দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক । " ৭৭

এই মিশ্র সামাজিক ক্রিয়া কলাপের ও রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বিধা চিন্তার চরম সুযোগ গ্রহণ করে ইংরেজরা চাইল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করতে । ইংরেজ সরকারের সাম্প্রদায়িক বিভেদ নীতির প্রথম অমোঘ অস্ত্র হাললেন -- সেই অস্ত্র বঙ্গভঙ্গ ।

প্রস্তাবনা ।। উল্লেখপঞ্জী

১ । British paramountry and Indian Renaissance, Bharatiya Bidyabhavan, Vol-2, Page 1.

২ । পূর্বোক্ত — পৃঃ - ১

৩ । History of Bengal, Dacca, Vol 1 Page 498

৪ । On the Bengal Renaissance PP. - 13

৫ । রেনেসাঁস ও সমাজ মানস — অরবিন্দ পোদ্দার , পৃঃ — ৪

৬ । John Addington Symonds - A short History of the Renaissance in Italy - P - 3

৭ । উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নব জাগরণ — সুশীল কুমার গুপ্ত

৮ । On the Bengal Renaissance - Susobhan Sarkar P - 13

৯ । Quoted in M Jamuna Nag's Raja Rammohan Roy , P- 26

১০ । The Father of Modern India P 4

১১। অমলেশ ত্রিপাঠী — ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব — পৃ : ১১

১২। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ — শিবনাথ শাস্ত্রী — পৃ : ৬৩

১৩। Susovan Sarkar - On the Bengal Renaissance Page - 20

১৪। History of Native Education in Bengal/Article in Calcutta Review.

১৫। স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা — নরহরি কবিরাজ — পৃ : ৯২

১৬। পূর্বোক্ত

১৭। ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরম পন্থী পর্ব — পৃ : ১২

১৮। On the Bengal Renaissance, P - 30

১৯। ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরম পন্থী পর্ব — পৃ : ১২

২০। পূর্বোক্ত — পৃ : ১৩

২১। রেনেসাঁস ও সমাজ মানস — পৃ : ৫৩

২২। অক্ষয় চরিত — নকুড় চন্দ্র বিশ্বাস — পৃ : ৩৯

২৩ । অক্ষয় কুমার দত্ত — ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় উপক্রমনিকা
পৃ : — ১২৯ - ৩১

২৪ । পূর্বোক্ত — পৃ : — ১০১

২৫ । On the Bengal Renaissance, Page - 36

২৬ । উনিশ শতক : নব জাগরণ ও বাংলা উপন্যাস — ডঃ বদরুল হাসান
পৃ : — ৪

২৭ । আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত — ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২৮ । মহা বিপ্লব ও বাংলা সংবাদ পত্রের জন্মান্তর — রথীন চক্রবর্তী — পৃ : ১১

২৯ । On the Bengal Renaissance - P - 70

৩০ । স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা — পৃ : ১৮

৩১ । বাংলার ইতিহাস , দ্বিতীয় খন্ড — সুকুমার সেন — পৃ : ২১৬

৩২ । পূর্বোক্ত

৩৩ । স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা — পৃ : ১০২

৩৪ । Swami Vivekananda and Indian Nationalism - S.C. Sengupta
P - 24

৩৫ । ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব — পৃ : ২৮

৩৬ । ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পৃষ্ঠভূমি — পৃ : ১২১

৩৭ । ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব — পৃ : ২০

৩৮ । জাতীয়তার মন্ত্রগুরু যাঁরা — প্রিয়নাথ জানা — পৃ : ৬২

৩৯ । পূর্বোক্ত — পৃ : ৬৪

৪০ । উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য — ত্রিপুরা শংকর সেনশাস্ত্রী —

৪১ । জাতীয়তার মন্ত্র গুরু যাঁরা — পৃ : ১০৬

৪১ (ক) । জাতীয়তার মন্ত্র গুরু যাঁরা — পৃ : ৪২

৪২ । ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া — প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় — পৃ : ৪১

৪৩ । রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ — পৃ : ১৮৯

৪৪ । British Paramountry and Indian Renaissance(Vol-2)
P - 446-447

৪৫ । A Nation in Making - S.N. Banerjee

৪৬ । পূর্বোক্ত

৪৭ । History of Freedom Movement , Page - 371

৪৮ । British Paramountry and Indian Renaissance, Vol-
P -524.

৪৯ । History of Indian National Congress P- 512

৫০ । Allan Octavian Hume, Father of Indian National Congress -
Sir William Wedderburn Page -80-81,
Indian To-day R.P.Dutta - Page 313-314.

৫১ । Allan Octovian Hume P - 77

৫২ । Modern India - Sumit Sarkar Page - 89

৫৩ । স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস — অমলেশ ত্রিপাঠী
পৃ : ৪১ - ৪২

৫৪ । P.G. Rama Iyer, India's Debt to Swami Vivekananda(1908)
সূত্র - বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ - ষষ্ঠ খন্ড - পৃ : ৬০

৫৫ । ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরম পন্থী পর্ব - পৃ : ০২

৫৬ । Mysore Times - March 8, 1921 সূত্র - প্রবুদ্ধ ভারত মে, ১৯১১

৫৭ । ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরম পন্থী পর্ব - পৃ : ০৪

৫৮ । বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ — মোহিত লাল মজুমদার — পৃ: ৯০

৫৯ । চিন্তা নায়ক বিবেকানন্দ — পৃ: ২৬০

৬০ । Swami Vivekananda and Indian Nationalism. P - 72

৬১ । The Bengal Press - Samarjit Chakraborty, Preface Cal - 1976

৬২ । History of Freedom Movement Vol- 1 Page.

৬৩ । ঊনবিংশ শতাব্দীর সম্পাদক ও সাহিত্য পত্র — ভবতোষ দত্ত
দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৭ — পৃ: ২৪

৬৪ । বাংলা সাময়িক পত্রে স্বদেশ চিন্তা — বিনয় ঘোষ, দেশ, ১১।৫।১৯৬৩

৬৫ । ঊনবিংশ শতাব্দীর সম্পাদক ও সাহিত্য পত্র, দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৭

৬৬ । The Bengal Press P - 64-65

৬৭ । বাংলা সাময়িক পত্রে স্বদেশ চিন্তা — পৃ: ৫৫

৬৮ । বাংলা সাময়িক পত্রে স্বদেশ চিন্তা দেশ, ১১.৫.১৯৬৩

৬৯ । Muslim Politics - Humayun Kabir Calcutta, 1969 P-1

৭০ । The British Paramountacy and Indian Renaissance
Vol - II, P -295

৭১ । পূর্বোক্ত — পৃ : ২৯৭

৭২ । পূর্বোক্ত — পৃ : ২৯৭

৭৩ । History of Political thought, B.B. Majumder
Calcutta , 1934, P-395.

৭৪ । The British Paramountacy and Indian Renaissance Vol-2,
Page - 234.

৭৫ । Syed Ahmad Khan, Akhri Madamin P - 46-50
Source of Indian Tradition P -746-7

৭৬ । ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন — বদরুদ্দীন উমর , কলিকাতা , ১৯৮৪ , পৃ : ৪১

৭৭ । রশীদ আল ফারুকী – মুসলিম মানস : সংঘাত ও প্রতিক্রিয়া ,
কলকাতা , ১৯৮১ , পৃ : ভূমিকা

।। প্রথম অধ্যায় ।।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের একটি পর্যায়

বঙ্গভঙ্গ — স্বদেশী আন্দোলন

* * * * *

প্রথম অধ্যায়

১৮৮৫ – ১৮৯৪ কংগ্রেসের প্রকৃতি

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে লাগল। জাতীয় কংগ্রেসের যতই সমালোচনা হোক না কেন এই আন্দোলনের পৃষ্ঠভূমি তে ছিল কংগ্রেস। কংগ্রেস তখন ছিল সকল জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের একটি "জাতীয়স্থান" National Platform। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কংগ্রেসে যোগদান কংগ্রেসের চরিত্রকে পাল্টে দিয়েছিল। ম্যালেসন নামে এক ঐতিহাসিক বলছেন "গোলযোগ প্রবন বাঙালীদের যোগদানের ফলে কংগ্রেসের চরিত্র বদলে যায়।" ১

এই যুগের কংগ্রেস নেতারা বিশ্বাস করতেন যে ইংলন্ড গণতান্ত্রিক দেশ। ইংলন্ডের রাজনৈতিক সচেতন মানুষ নিশ্চয়ই ভারতীয়দের গণতান্ত্রিক অধিকার ও দাবীগুলির প্রতি যথাযোগ্য মানবিক সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করবেন। এই সময় কংগ্রেস ভারতে বৃটিশ বিরোধী প্রচারের সাথে সাথে ইংলন্ডেও জনমত গঠনের চেষ্টা করেন। দাদা ভাই নৌরজী জীবনের অধিকাংশ সময় ইংলন্ডে অতিবাহিত করেন। ইংলন্ডবাসীর দৃষ্টিকোন ভারতীয়দের পক্ষে নিয়ে আসাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্যোগ। কংগ্রেসের আদি যুগের নেতারা সুস্পষ্টভাবে ইংরেজ সরকারের সাথে সংঘাত এড়িয়ে চলতেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল আবেদন নিবেদন বা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে দাবী আদায় করা। এঁদের মডারেট বা নরম পন্থী বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এই নরম পন্থী নেতৃবৃন্দ কখনও দাবীর জন্য সংঘাতের পথে যেতে প্রস্তুত হন নি।

তাঁদের বিশ্বাস ছিল ইংলন্ডে কর্তাব্যক্তিদের কাছে তাঁদের দাবী ঠিকমত তুলে ধরলেই তাঁদের অভিষ্ট সিদ্ধিলাভ করবে ।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যসোসিয়েসন এর যুগ হতে কংগ্রেস এগিয়ে এলেও তাদের আবেদনের সুর বা আন্দোলন পদ্ধতিগত দিকের কোন পরিবর্তন হয় নি । চরম পন্থী নেতৃবৃন্দ একে ভিক্ষুকের রাজনীতি বলতেন (Mendicant Policy) । বঙ্কিম চন্দ্র কমলাকান্তের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন " জয় রাধে ভিক্ষা দাও গো ইহাই আমাদের পলিটিক্স । " এই রূপ কুকুর জাতীয় রাজনীতির অবসান ঘটিয়ে তিনি চেয়েছিলেন ' বৃষ ' জাতীয় রাজনীতি ।

এই নরম পন্থী নেতৃবৃন্দরা ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন । ইংরাজী সভ্যতার প্রতি তাদের ব্যক্তিগত মোহ ছিল । তাঁরা অনেকেই মনে করতেন যে ভারতে ব্রিটিশ শাসন ছিল এক ঐশ্বরিক অবদান । তাঁরা স্বীকার করতেন ইংরাজ শাসনে ভারতের অনেক উন্নতি হয়েছে । ইংরেজ ভারত ছেড়ে গেলে ভারতীয়রা ভীষণ বিপদে পড়বে । তাঁরা ভারতীয়রা পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসন লাভ করার যোগ্য হয়নি । ইংলন্ডের অধীনে থেকেই ভারত এই যোগ্যতা অর্জন করবে । এ ছাড়া বিভিন্ন শ্রেনীর জন্য বিচ্ছিন্ন ভাবে তারা দাবী জানাতেন । সমগ্র ভারতবর্ষের দাবীর কথা বা দাবীর দিক দিয়ে সর্বভারতীয় ঐক্য গড়ার প্রবণতার অভাব ছিল । ডঃ সুমিত সরকার , এই যুগের কংগ্রেসের নেতাদের ' খন্ডকালীন রাজনীতিক ' বলে বর্ণনা করেছেন । সারা বৎসর ধারা বাহিক ভাবে কংগ্রেসের কোন কর্মসূচী ছিল না । তাই কেউ কেউ একে ' তিন দিনের তামাসা ' বলতেন ।

মডারেট নেতারা ইংরেজ শাসনের কুফল সম্পর্কে সচেতন ছিলেন । এঁরা বিশ্বাস করতেন ভারতবাসীর মধ্যে দেশাত্মবোধের উন্মেষ ঘটলেই ব্রিটিশ শাসন আপনা থেকেই ভেঙে পড়বে । এইজন্য জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করাই ছিল তাঁদের কাজ ।

কংগ্রেস সেই অবধি কোন সক্রিয় আন্দোলনাত্মক ভূমিকা গ্রহণ না করলেও কংগ্রেস নিজেকে জনসাধারণের প্রতিনিধি বলে বিবেচনা করতে শুরু করেছিলেন। গোপাল কৃষ্ণ গোখলে প্রমুখ নরম পন্থী নেতাদের এই জাতীয় ভিক্ষা সুলভ মনাবৃত্তিতে বিরক্ত হয়েই জন্ম নিয়েছিল চরম পন্থী দলের। তবে এই চরম পন্থী দল ১৯০৭ অবধি কংগ্রেসের মধ্য হতেই এই চরম পন্থার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এই দুই গোষ্ঠীর মতভেদের প্রাবল্যের সময় ভারতের ভাইসরয় হয়ে এলেন লর্ড কার্জন। যাঁর উপস্থিতি ভারতের জাতীয় আন্দোলনে এক বিস্ফোরণ ঘটালো।

লর্ড কার্জনের আগমন ও বঙ্গ বিভাগ

লর্ড কার্জন ভারতে এলেন ১৮৯৮ সালে। ভারতবর্ষে তখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জোয়ার চলছে। কার্জন ছিলেন স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন শাসক। একচ্ছত্র সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তির সাধক ছিলেন তিনি। লর্ড কার্জন ~~লর্ড কার্জন~~ এদেশে প্রথম পদক্ষেপেই ঘোষণা করলেন যে তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য হলো শান্তিপূর্ণ ভাবে কংগ্রেসের মৃত্যু সুনিশ্চিত করা "assisting Congress to a Peaceful demise". ইংরাজী শিক্ষিত ভারতীয় মনীষীদের তিনি ভাল চোখে দেখেন নি। তিনি চেয়েছিলেন এই জাতীয়তাবাদী বাঙালী নেতৃবৃন্দকে তাঁর আয়ত্বাধীনে আনতে। বাংলা সেদিন জাতীয় জাগরণের তীর্থক্ষেত্র। কলকাতা এই জাগরণের হৃদস্পন্দন। তিনি বাঙালীদের প্রথম আঘাত হানলেন ১৮৯৯ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে। শিক্ষা ব্যবস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারী আওতার মধ্যে আনলেন বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯০৪ এর মাধ্যমে ও শেষ আঘাত হলো বঙ্গভঙ্গ।

লর্ড কার্জনের মধ্যেই শুধু নয় এই বাংলার নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের প্রচারক বাঙালী মনীষীগণের সম্পর্কে বহু ইংরেজের ধারণা ভাল ছিল না। বহু ইংরেজ

অফিসার বাঙালীদের ভাল চোখে দেখতেন না । ১৮৫৭ এর বিদ্রোহের যাঁরা বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের সকলকেই ইংরেজরা পুরস্কৃত করেছিলেন । কিন্তু বাংলার দাবী ছিল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা ইংলন্ড ও ভারতবর্ষে দুই স্থানে এক সাথে হোক । সে অনুরোধ পালিত হয়নি । বরং সলসবেরী কর্তৃক সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বয়স কমিয়ে ২১ থেকে ১৯ এ আনা হয় । কিন্তু , ট্রেভিলিয়ান বাঙালীদের মিথুক ভাবতেন । স্ট্রেচি বলতেন ' কোনও গুরুত্বপূর্ণ পদ বা ক্ষমতা , বিশেষ করে জেলা শাসকের পদটি যেন কখনো কোন বাঙালীকে না দেওয়া হয় । এমন কি ডাফরিন মনে করতেন কংগ্রেসের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের অনুগামীরা অধিকতর ' হিংস্র ও অভদ্রদের উপদল ' । সুরেন্দ্রনাথের দলকে আয়র্ল্যান্ডের হোমরুল পন্থীদের সাথে তুলনা করেছিলেন এবং ডাফরিন এই দলের মধ্যে দেখেছিলেন ' bastard disloyality' ।

এই সময় ভারত সচিব ব্রডরিক কে লেখা এক চিঠিতে কার্জন লিখছেন — " বাঙালীরা নিজেদের একটা মহাজাতি মনে করে এবং তারা এমন একটা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে যখন দেশ থেকে ইংরেজরা বিতাড়িত হয়েছে এবং জনৈক ' বাবু ' কলকাতার লাট প্রাসাদে অধিষ্ঠিত । এই সুখ স্বপ্নের প্রতিকূল যে কোনও ব্যবস্থা তারা নিশ্চয়ই ভীষণ ভাবে অপছন্দ করবে । আমরা যদি দুর্বলতা বশত তাদের হট্টগোলের কাছে নতি স্বীকার করি তবে কোন দিনই আর বাংলার আয়তন হ্রাস বা বাংলার ব্যবচ্ছেদ সম্ভব হবে না । (এ পরিকল্পনা গ্রহণ না করলে) আপনি ভারতবর্ষের পূর্ব সীমান্তে এমন একটি শক্তিকে সংহত ও সুদৃঢ় করবেন যা এখনই প্রচন্ড এবং অদূর ভবিষ্যতে যা সুনিশ্চিত ভাবে ক্রম বর্ধমান অশান্তির উৎস হয়ে উঠবে ।" ৩

লর্ড কার্জনের পূর্বেই প্রদেশ গুলোর কাঠামো গত পরিবর্তনের চেষ্টা চলছিল । ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত বাংলা প্রেসিডেন্সী ছিল সর্ব বৃহৎ প্রদেশ । বাংলা, বিহার , ছোট নাগপুর , উড়িষ্যা ও আসাম ছিল এ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভূক্ত । এই

প্রদেশের লোক সংখ্যা ছিল প্রায় ৮ কোটি। ১৮৬৭ সালে বড়লাট লর্ড লরেন্স উড়িষ্যা ও আসামকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করার সুপারিশ করেন। ১৮৭৪ সালে বাংলা থেকে আসাম বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে গঠন করা হয়। অবশেষে এন্ডু ফ্রেজার বাংলার গভর্নর হয়ে আসেন ১৯০১ সালে। তিনি ১৯০৩ সালে বঙ্গ বিভাগের একটা খসড়া রচনা করেন। ফ্রেজার এ প্রস্তাবে পূর্ব বঙ্গের চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ও ময়মন সিংহকে আসামের সাথে যুক্ত করে বাংলা প্রেসিডেন্সীর আয়তন হ্রাস করার প্রস্তাব দেন। কার্জন প্রস্তাবটি সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করলে বড়লাটের কার্য্য নির্বাহক পরিষদ সরকারী ভাবে ১৯০৩ সালে অনুমোদন করেন। পরে লন্ডন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাবটি অনুমোদনের জন্য পাঠান হয়। বলা হয় শাসনতান্ত্রিক সুবিধার জন্য এই বঙ্গচ্ছেদের প্রয়োজন এবং পুনর্গঠিত প্রদেশটি 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে পরিচিত হবে। সেই সঙ্গে ছোট নাগপুর বিভাগটিকেও বাংলা প্রেসিডেন্সী থেকে বিচ্ছিন্ন করে নবপ্রদেশের সংযুক্ত করা হবে বলে জানান হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের সেক্রেটারী হার্বার্ট রিজলী বাংলার সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে লিখিলেন,

"It is not unlikely that the proposal which is here put forward may meet with keen criticism & perhaps in parts with strenuous opposition. ৪

সত্যই এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে গর্জে উঠল সারা দেশ। ইন্ডিয়ন মিরর (১৩ ডিসেম্বর), অমৃত বাজার পত্রিকা (১৪ই ডিসেম্বর) বেঙ্গলী ইন্ডিয়ান এম্পায়ার (১৩ই ডিসেম্বর), হিন্দু পেট্রিয়ট, চারু মিহির (১৩ই ডি), জ্যোতি, সঞ্জিবনী, ট্রিবিউন (১৭ই ডি., ইংলিস ম্যান (২৩শে ডিসেম্বর), প্রতিনিধি (২৬শে ডিসেম্বর) জ্বালাময়ী প্রবন্ধ লিখল।

১৯০৪, ১৬ই জানুয়ারীতে 'ট্রিবিউন' লিখল যে বঙ্গচ্ছেদ কারও উপকারে

আসবে না । উপরন্তু লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবে । মানসিক উত্তেজনার তো কথাই নেই । সুতরাং গভর্মেন্ট এর এই পরিকল্পনা যে কার্য্য ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে না , একথা মনে করা যেতে পারে ।

বিদেশী পত্রিকা ' ইংলিস ম্যান ' ১৯০৪ জানুয়ারী ২০এ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে প্রতিবাদ জানালো " বাংলার অধিবাসীর কাছে বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থা যে মহা আপত্তিকর , সে কথা বেশী লিখে কাউকে বোঝাবার প্রয়োজন নেই । অতি উচ্চ , অতি কোমল , সকল পর্দ্দায় , সকল খাদে ধিক্কার ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল । কেবল ভাব জগতে নয় ব্যবহারিক বুদ্ধির বিচারে এ পরিকল্পনা কোনো রকমেই গ্রহণ যোগ্য নয় । কেবল বড় বড় সম্প্রদায় নয় , একই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রতিরোধের চেষ্টা হচ্ছে । ভাবের জগৎ থেকে যে প্রবল ঘৃনা প্রকাশ , তাতে যারা এ আন্দোলন শুরু করেছেন তাঁরাও এর রূপ দেখে বিস্মিত হয়ে উঠেছেন । গভর্ণমেন্টের সমর্থনে অতি ক্ষীন একটা শব্দও শোনা যায় নি । এর যদি সামান্য সম্ভাবনাও থাকতো , সেটা বাঙালী জাতির কর্ণভেদী তীব্র নিনাদের কাছে নীরব বা শব্দলেশ হীন হয়ে পড়তো । সামান্য বিচারেই নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে সাধারণ নির্বিরোধ বাঙালীকে বিক্ষুব্ধ করে তোলবার এক প্রকৃষ্ট পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে , একটা সমগ্র প্রদেশকে রুখে দাঁড়াবার জন্য সর্বাপেক্ষা ত্বরিৎ এবং সহজ উপায় আবিষ্কার করা হয়েছে । "

দি ইণ্ডিয়ান ডেইলী নিউজ (The Indian Daily News) পত্রিকা ১৯০৪ জানুয়ারী ২৯ তারিখে বক্রোক্তি করে লিখল " পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলী মনে করতো যে , ভারত সরকার অতি দ্রুত আমূল পরিবর্তনের প্রতীক । ব্যাপার দেখে মনে হয় জনমতের বিপক্ষে অহেতুক এতবড় পরিবর্তন সাধন করতে গেলে যে অশান্তি ও সংঘাত বাধবার সম্ভাবনা বহন করছে , তাতে ভারত সরকারের ' র‍্যাডিক্যাল ' বা দ্রুত আমূল পরিবর্তনের লক্ষণই বর্তমান ।

সেই সময় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন হেনরী কটন । তিনি সরকারের কাছে হিন্দীভাষী বিহার ও ওড়িয়াভাষী উড়িষ্যাকে পৃথক করে শাসনতান্ত্রিক সমাধানের একটা যুক্তি সঙ্গত পন্থা নেওয়ার কথা বললেন । বাংলার বিশাল আয়তন, শাসন কার্য্যের অসুবিধা , এটাই ছিল ইংরেজের প্রধান যুক্তি । ১৯০৩ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে রিজেলের পরিকল্পনাকে জঘন্য আখ্যা দেওয়া হলো । বলা হল এই পরিকল্পনা ভারতের ঐক্যে আঘাত হানতে উদ্যত হয়েছে ।

১৯০৪ এ কংগ্রেসের অধিবেশন বসল বোম্বাই - এ । "সভাপতির আসন হইতে বঙ্গভঙ্গের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন কটন সাহেব । লর্ড কার্জনের যুক্তি খন্ডন করিলেন । বাঙালী সন্তুষ্ট হইল । কটন সাহেব বাঙালীর প্রশংসা করিলেন । তিনি বলিলেন বাঙালীরা পেশোয়ার হইতে চট্টগ্রাম লোকমত সৃষ্টি করেন এবং পরিচালিত করেন । বঙ্গভঙ্গের দ্বারা বাঙালী জাতির ঐক্য নষ্ট করিবার যে চেষ্টা , ইহাকে তিনি নিন্দা করিলেন এবং দু হাজার সভায় বাঙালী যে এই বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করিয়াছে তাহাকে উপেক্ষা করা অত্যন্ত কড়া কথায় নিন্দা করিলেন । " ৫

প্রতিবাদ ক্রমশ বলবান হয়ে উঠছে দেখে কার্জন এদিকে বেড়িয়ে পড়ছেন ১৯০৮ এর ফেব্রুয়ারীতে পূর্ববঙ্গ ভ্রমনে । কার্জন সাহেব অতিথি হলেন ময়মন সিংহের জমিদার সূর্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরীর । সূর্যকান্ত বাবু দৃঢ় কন্ঠে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করলেন । প্রত্যাখ্যাত হয়ে ঢাকার নবাব ও চট্টগ্রামের সেরাজুল ইসলামের মতো গন্যমান্য রহিসদের সমর্থনে কার্জন রিজলে পরিকল্পনার একটি রূপ দেওয়ার চেষ্টা করলেন । বঙ্গভঙ্গ উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি মুসলিম সংখ্যা পরিপুষ্ট জনসভাকে সম্বোধিত করে বললেন " পূর্ববঙ্গের মুসলিম জনগণ , প্রাচীন সুলতান ও সুবেদারদের আমল থেকেই রাজনৈতিক ঐক্য বঞ্চিত , সে ঐক্য তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে । " ৬

অন্নদা শঙ্কর রায় লিখছেন " কার্জনের মাথায় ছিল তিন রকম ভাবনা । বোম্বাই , মাদ্রাজ , বেঙ্গল , উত্তর পশ্চিম প্রদেশ , মধ্যপ্রদেশ ও আসাম সব কটাই হিন্দু প্রধান । মুসলিম প্রধান বলতে একমাত্র পাঞ্জাব । তিনি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সৃষ্টি করলেন পাঞ্জাব থেকে কতক অংশ নিয়ে । দ্বিতীয় মুসলিম প্রধান হলো সেটা । তাতে আর একটা উদ্দেশ্য সাধন হলো । সম্ভবত রুশ আক্রমণের হাত থেকে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার সুব্যবস্থা । এরপর সম্ভব পর চিনা আক্রমণের হাত থেকে ভারতের উত্তর পূর্ব সীমান্ত রক্ষার সুবন্দোবস্তের জন্য আরও একটি প্রদেশ গঠনের প্রয়োজন । সেই সঙ্গে আরও এক মুসলিম প্রধান প্রদেশের আবশ্যকতা । সেই সঙ্গে সমুদ্র তটবর্তী জেলাগুলির উপর প্রশাসনিক প্রয়োজন । (এক কথায় বেঙ্গল থেকে একাংশ কেটে নিয়ে তার সঙ্গে অসম জোড়া দিয়ে পূর্ববঙ্গ ও অসম নামে এই অভিনব প্রদেশ সৃষ্টি । পদ্মা নদীই দুই দেশের বিভাজন রেখা ।)

লর্ড কার্জন মনের কথা মনে চেপে রেখে কলকাতায় কাকপক্ষীকে জানতে না দিয়ে ঢাকায় গিয়ে নবাব সলিমুল্লা বাহাদুরের আহসান মঞ্জিলে গৃহ - অতিথি হলেন । দুজনে মিলে শলা - পরামর্শ করে এই স্থির হলো যে পদ্মা পারে একটি মুসলমান প্রধান প্রদেশ গঠন করা হবে । তার রাজধানী হবে ঢাকা । বড়লাট আমাদের ইতিহাস জানতেন না । নবাব বাহাদুরও না । তিনি ছিলেন কাশ্মীরী মুসলমান । উর্দু ভাষী ।" ৭

বাংলাকে ভাগ করার চূড়ান্ত প্রস্তাব রচনা করলেন লর্ড কার্জন । সেই প্রস্তাব ইংলন্ডে পাঠানো হয় ২রা ফেব্রুয়ারী , ১৯০৫ । ভারত সচিব ব্রডরিক নিজেও বঙ্গভঙ্গের অসারতার কথা স্বীকার করেছিলেন । তিনি মন্তব্য করেছিলেন " ৪ কোটি ১৫ লক্ষ মানুষের এক বৃহৎ এবং মোটামুটি সুসংহত এক মানব গোষ্ঠী , কলকাতা যাদের সাংস্কৃতিক , রাজনৈতিক ও বানিজ্যিক জীবনের পীঠস্থান , তারা নিজ গোষ্ঠীর পাঁচ ভাগের তিন ভাগ বহু দূরে অবস্থিত এক রাজধানীতে , নতুন এক

শাসন ব্যবস্থার অধীনে চলে যাচ্ছে দেখে আপত্তি জানাচ্ছে । নিজেদের বহু প্রাচীন ঐতিহাসিক যোগ সূত্র ছিঁড়ে যাওয়ার এবং জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হওয়ার আশংকায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে । এতে আমি বিন্দুমাত্র অবাক হইনি । " ৮ এই মন্তব্য করেও তিনি লর্ড কার্জনের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন ।

১৬ই অক্টোবার, ১৯০৫ বাংলা দেশ বিভক্ত হলো । বাংলা হতে পনেরটি জেলা চলে গেল । বাংলার জনসংখ্যা হলো ৫ কোটি ৪০ লক্ষ । ৪ কোটি হিন্দু এবং ৯০ লক্ষ মুসলমান । পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের জনসংখ্যা হলো ৩ কোটি ১০ লক্ষ । ১ কোটি ৮০ লক্ষ মুসলমান, ১ কোটি ২০ লক্ষ হিন্দু ।

প্রতিবাদের উত্তাল তরঙ্গ

বঙ্গভঙ্গ জাতির স্বাভিমানের মর্মস্থলে আঘাত করল । কোন অজানা এক যাদু মন্ত্রে জেগে উঠল সারা দেশ । কৃষ্ণ কুমার মিত্র তাঁর ' সঞ্জীবনী ' তে সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখলেন " লর্ড কার্জন বঙ্গ দেশকে দ্বিতীয় আয়র্ল্যাণ্ড করিবেন । বঙ্গদেশ চিরদিন রাজ ভক্ত, বাঙালী চিরদিন নিরীহ, শান্তশিষ্ট ও আইন অনুগত কিন্তু লর্ড কার্জন যে বিষম শেল বাঙালীর প্রাণে বিদ্ধ করিয়াছেন, তাহার যাতনায় বাঙালী দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়াছে । বঙ্গদেশে মহা অসন্তোষের সঞ্চার হইয়াছে । লর্ড কার্জন বাঙালীর আন্দোলন উপেক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু এই উপেক্ষার ফল শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন ।"

' সন্ধ্যা ' লিখল — সরকারের আসল উদ্দেশ্য হলো বাঙালীকে ধ্বংস করা এবং তাকে ইউরোপীয়ানদের মোসাহেব বানানো । ' চারু মিহির ' লিখেছিল " বাংলা

ভাষা - তাথি একটা সমগ্র জাতির ঐক্যমতকে অগ্রাহ্য করে কার্জন একটা কথাই জানাতে চান যে ইংরেজ শুধু অস্ত্রের জোরেই ভারত শাসন চালিয়ে যাবার অধিকার বজায় রাখবে এখন থেকে। " এমনকি এ্যাংলো ইন্ডিয়ান পত্রিকা ইংলিস ম্যান , স্টেটসম্যান , পায়ওনীয়ার , ' দি ক্যাপিটাল ' প্রভৃতি পত্রিকাও প্রতিবাদে মুখরিত হলো।
' টাইমস ' পত্রিকার অনুবাদ বের হলো ' সঞ্জীবনী ' তে — " প্রথমে মনে হয়েছিল এ বুঝি অভিশাপ , সর্বনাশ। সে ভুল ভাঙতে লাগল। ক্রমশ আর দুর্ভাগ্য বলে মনে হয় না। দেশকে দু - ভাগ করার চক্রান্ত এ যেন শাপে বর। অভিশাপ নিতে চলেছে আশীর্বাদের রূপ। মার খেয়ে জেগে উঠেছে মরা।" রামানন্দের ' প্রবাসী ' তে একই অভিব্যক্তি — " লর্ড কার্জনের মত খারাপ শাসন কর্তার আগমন অনেকে ভারতের দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করেন। আমি ঠিক তাহা মনে করিতে পারিতেছি না। অত্যাচারী অনিষ্টকারী রাজা ব্যক্তিরেকে কোথায় কবে প্রজাদের স্থায়ী মঙ্গল , স্থায়ী স্বাধীনতা লাভ ঘটিয়াছে।

..... অনেকদিনের পুরাতন সম্বন্ধ , সম্ভব এবং তজ্জনিত মনোভাবের ও মায়া মমতার (Old Association) দোহাই দিয়া (অবশ্য সত্য কারণ ইহা নয়) দার্জিলিং কে বর্তের ছোটলাটে অধীনে রাখিতেছেন , কিন্তু পূর্ব ও উত্তর বাংলাকে এসকল কারণ সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেছেন। তর্ক যুক্তিতে গভর্নমেন্টের হার হইয়াছে। তবুও গভর্নমেন্ট নিজের গোঁ ছাড়িবেন না। ... এই রূপ এক গোঁয়োমীর গূঢ় কারণ আছে। সে গূঢ় কারণ প্রকাশ্য সরকারী কাগজে নাই। হয়তো বা গোপনীয় কাগজে। যেমন নানা শুভ ইচ্ছা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের কারণ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল , কিন্তু আসল কারণ উচ্চশিক্ষা যথা সম্ভব বন্ধ করিবার ইচ্ছা। তজ্জনই লর্ড কার্জন একটি গোপনীয় মন্তব্যে লিখিয়াছিলেন " I have always thought that Dr. Gooroodas Banerjee held a brief for his unworthy client, the Bengali Student, when it is our desire politely to suppres". ৯

কার্জনের ভাষায় বাঙালী ছাত্রেরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে অযোগ্য , অপদার্থ । তাই প্রয়োজন তাদের সে সুযোগ কেড়ে নেওয়া । " ৯

বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তে ইংরেজ অটল , দেশের মানুষ সেই সম্পর্কে অবহিত হয়ে গেছিলেন । তবুও আশা ছিল দুর্বার প্রতিরোধে সেই সিদ্ধান্ত যদি বাতিল হয় । বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবের পর হতেই দেশে শুরু হয়েছে প্রতিবাদ । গঙ্গা পদ্মা সেই প্রতিবাদে কল্লোলিত হয়েছে । সংগঠিত প্রতিবাদ ধ্বনিত হলো ৭ই আগষ্ট , ১৯০৫ সাল ।

কলকাতার দোকান পাট সব স্তব্ধ,বন্ধ । শোকে যেন সমগ্র রাজধানী স্তব্ধ হয়েছে । মানুষের বুক ঠেলে জেগে উঠেছে তীব্র আলোড়ন । বিকেলে কলকাতার টাউন হলে জনসভা । এক ঐতিহাসিক সমাবেশ । সারা দেশের নেতারা উপস্থিত । উপস্থিত সাধারণ গরীব মানুষ হতে ছাত্র সমাজ । শচীন্দ্র বসু তাঁর " স্মৃতি তর্পন " এ লিখছেন " ৭ই আগষ্ট টাউন হলে যে বিরাট সভার অধিবেশন হয় , তাহা দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা । বাঙালী যে এরূপ বিপুল জনতাকে সংযত এবং সংহত করিয়া শ্রেনীবদ্ধ ভাবে চালাইয়া লইয়া যাইতে পারে এ বিশ্বাস পূর্বে অনেকেরই ছিল না । আমাদিগেরও যে organisation করিবার ক্ষমতা আছে আমরা এই দিনই তাহার প্রথম আভাস পাইলাম । "

সেদিনের সভায় গৃহীত হলো চারটি প্রস্তাব । প্রথম , বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং এই আইন প্রত্যাহারের অনুরোধ । প্রস্তাবক মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী , সমর্থক শ্রী আশুতোষ চৌধুরী ও রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী । দ্বিতীয় , বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে যে অভাবনীয় স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন শুরু হয়েছে তার প্রতি সমর্থন । তৃতীয় , যতদিন না এই বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব প্রত্যাহার করা

হচ্ছে ব্রিটিশ জাত দ্রব্যাদির ব্যবহার নিষিদ্ধ। অর্থাৎ বয়কট। বিলাতী বর্জন। ভারতবাসীর প্রতি বৃটিশ সরকারের অবজ্ঞার প্রতি চরম আঘাত। প্রস্তাবক নরেন্দ্রনাথ সেন। চতুর্থ প্রস্তাব এই আন্দোলন থামবে না। যতদিন না দাবী মেনে নিচ্ছে ব্রিটিশ সরকার।

মতিলাল রায় 'স্বদেশী যুগের স্মৃতিতে' বর্ণনা করছেন সেই স্বদেশী জীবন ধারার বাণী "একদিন ৭ই আগষ্ট প্রভাতে রাজধানীর পথে পথে বৃহৎ রক্তাক্ষরে ঘোষণা পত্র আঁটিয়া দেওয়া হইল, ৭ই আগষ্টের বিরাট জনসভায় ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের জন্য দলে দলে লোক সমবেত হওয়ার আহ্বান — সেদিন বিধাতার ডাকের মতো, তাহা বাঙালীর অন্তঃস্থলে নূতন আশার ফুলঝুরি ফুটাইয়া তুলিয়া ছিল। সেই উৎসাহের আগুন স্পর্শ করে নাই, এমন লোক ছিল না। আবাল বৃদ্ধ বনিতার অবচেতনার স্তরে অপমানের কশাঘাত বুঝি বড় নির্মম রূপেই বাজিয়াছিল এবং তাহার প্রতিশোধ কামনায় অন্তরে বৃশ্চিক জ্বালার মতো তীব্র অনুভূতি সেদিন জাতিকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। সে মহা সমারোহ ব্যাপার! সেদিন জাতির বৈশিষ্ট, স্বাতন্ত্র্য তীব্র বাঙালীর সুপ্ত বীর্য নতুন রূপ লইয়া দেখা দিয়াছিল। কাতারে কাতারে রাজপথের উপর দিয়া হরিদ্রা বর্ণ রঞ্জিত উষ্ণীষ মাথায়, স্কুল কলেজের অসংখ্য ছাত্র সেদিন গভীর নিনাদে 'বন্দেমাতরম' শব্দে জগতের হৃৎকম্প উপস্থিত করিয়া ছিল। তেমন শোভা যাত্রা বোধহয় আর হইবে না। .... কল্পনা কাহিনী নহে, সত্যই রুগ্ন যে সেও লাঠি হাতে পথের ধারে এই অপূর্ব জাগরণ চিত্র দর্শনে উৎসাহে আত্মহারা হইয়াছিল, মুমূর্ষুর নয়নে আশার বিদ্যুৎ খেলিয়াছিল।" ১০

এই সভা জনচিত্ত আলোড়িত করেছিল। বাংলা তথা সারা দেশ জাগ্রত চিত্তে বরণ করেছিল এই প্রস্তাব। 'বন্দেমাতরম' তার ভাষায় এই দিনটির কথা প্রকাশ করে লিখছে, "The 7th of August was the birthday of Indian Nationalism, and Indian Nationalism means two things, the self concntration to the gospel of National freedom and practice of Independence. Boycott is the practice of

Independence, when therefore, we declared the boycott on the 7th of August, it was no more economical revolt we were instituting, but the practice of Independence, for the attempt to be separate and self sufficient economically must being with the attempt to be free in every other function of a Nation's life, for these functions are nuturally inter dependent. August 7th therefore, is a day when Indian Nationalism was born when India discovered to her soul her own freedom, when we set out feet irrevocably to the only path to unity, the only path to self realization on that day the foundation stone of Indian Nationality was born". ১১

রবীন্দ্রনাথ এসে দাঁড়ালেন আন্দোলনের পুরোভূমিতে। তাঁর কন্ঠে যেন বরাভয় মন্ত্র। " বিচ্ছেদের চেষ্টাতেই আমাদের ঐক্যানুভূতি দ্বিগুন করিয়া তুলিবে। পূর্বে জড় ভাবে আমরা একত্র ছিলাম। এখন সচেতন ভাবে আমরা একত্র হইব। বাহিরের শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া প্রতিকার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে। " জীবন পন করে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথ বললেন বঙ্গভঙ্গ 'A national disaster' সেই সাথে সতর্ক বানী করলেন " আজ আমরা এমন এক আন্দোলনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছি, বেগের তীব্রতায় ও বোধের ব্যাপকতায় যা একদিন এই প্রদেশে সৃষ্টি করবে এক অলঙ্ঘনীয় ইতিহাস, এই সত্য ঘোষণায় এক বিন্দু অতি কথনের স্থান নেই। "

এই দৃঢ়চেতা বাগ্মী সগর্বে ঘোষণা করলেন "I will unsettle the settled fact".

দেশবাসীর স্বপ্ন ব্যর্থ হয়নি । ব্যর্থ হয়নি তাদের প্রতিজ্ঞা । দেশবাসীও বুকের পাঁজরে যেন সাহসের বজ্রানল জ্বালিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আন্দোলনে । আগুন ছড়িয়ে পড়ল গ্রাম গ্রামান্তরে । প্রাসাদ হতে কুটিরে । স্বদেশীজাগরণের মন্ত্রে সবাই বিভোর হলো । দেশকে আরও জাগাতে হবে । কবিরা লিখলেন গান । প্রাবন্ধিকেরা লিখলেন প্রবন্ধ । ঔপন্যাসিক লিখলেন উপন্যাস । নাট্যকার লিখলেন নাটক । শিল্পীরা আঁকিতে বসলেন ছবি । স্বদেশী সমাজ , শিল্প , সাহিত্যের রচনার ঢেউ বয়ে গেল ।

উইল ডুরাণ্ট বললেন " ১৯০৫ সালেতেই ভারতবর্ষের বিপ্লবের শুরু । " ১৩ চিন্তাবিদ বিনয় সরকারের ভাষায় " বাঙালীর বাচ্চা আমি , বাঙালীর চোখে দুনিয়া দেখি । আমার কাছে ১৯০৫ হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসর । এটা একটা খাঁটি যুগান্তর । " ১৪ দেশবন্ধু এই স্বদেশী আন্দোলনে উপলব্ধি করেছিলেন মর্মে মর্মে । তিনি বললেন " প্রাণের যে বন্যা , সে তা অঙ্ক শাস্ত্র মানে না , সে যে সকল মাপকাঠি ভাসাইয়া লইয়া যায় । স্বদেশী আন্দোলন একটা ঝড়ের মত বহিয়া গিয়াছিল , একটা প্রবল বন্যায় আমাদের ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল , প্রাণ যখন জাগে তখন তো হিসাব করিয়া জাগে না । মানুষ যখন জন্মায় সে তো হিসাব করিয়া জন্মায় না , জন্মাইয়া পারে না বলিয়া জন্মায় । .... এই যে মহাবন্যার কথা বলিলাম , তাহাতে আমরা ভাসিয়া ডুবিয়া বাঁচিয়া আছি । বাঙলার যে জীবন্ত প্রাণ , তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি । বাঙ্লার প্রাণে প্রাণে আবহমান যে সত্তা ও সাধনার স্রোত , তাহাতে অবগাহন করিয়াছি । " ১৫

ভারতের বিপ্লব সাধনার সাথে যিনি একান্ত ভাবে যুক্ত সেই নিবেদিতা লিখলেন " এই স্বদেশী আন্দোলনের প্রেরণায় সমাজ চিত্ত , ধর্ম , সংস্কৃতি , সাহিত্য ,

বিজ্ঞান , দর্শন , শিল্পকলা প্রভৃতি বাঙালীর জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে সহস্র দল কমলের মতো ফুটিয়া উঠিয়াছে । ইহা আমাদের জীবনের সর্ব প্রান্তরে নব স্রোতধারা সৃষ্টি করিয়াছে ।"

"এই আন্দোলন ভারতবর্ষকে তাহার আত্মোপলব্ধির আদর্শ দিয়াছে । বাংলা দেশের অগ্নি সাধকেরা ইংরেজের অধীনতা হইতে মুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতার যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন , যে আদর্শ নিজেদের মধ্যে পাইয়াছেন , যে ভাবে তাঁহারা দু:সাহসিক অভিযানে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং আপনাদের বহ্নি পাঞ্জর জ্বালাইয়া অন্ধকারময় পথে অগ্রসর হইবার জন্য যে মশাল রচনা করিয়াছেন , তাহা একটি ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে । স্বদেশী আন্দোলন ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে বাংলার একক সাধনা ।" ১৬

স্বদেশী আন্দোলন জন্ম দিল নতুন সাধনার । দেশের যা কিছু মহৎ যা সুন্দর তাকে নতুন করে চেনবার তাগিদ দেখা দিল । জীবনের ধর্ম কর্ম হতে ব্যবসা বানিজ্য সব কিছুতেই স্বাদেশিক ভাবনার বহিপ্রকাশ ঘটল । নব জাগ্রত দেশপ্রেম তীব্রভাবে আত্ম প্রকাশ করল এই আন্দোলনের বীজ প্রাণ থেকে । এরই প্রভাব পড়ল সাহিত্যে । সাহিত্যে ধরা দিল সকল ভাবনা । সাহিত্যের উজ্জ্বল পর্নে চিরতরে বাঁধা রইলো এই আন্দোলনের ইতিহাস । আন্দোলনের ক্ষেত্র হতে যে সোনালী ফসল ফলানো হলো তা হলো এ যুগের সাহিত্য ।

রমেশচন্দ্র মজুমদার বলছেন " বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী আন্দোলনের দুইটি বিশিষ্ট অবদান জাতীয়তার জাগরণ ও বঙ্গ সাহিত্যে তাহার প্রতিক্রিয়া । এই দুইটিই পরস্পর পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়ছে । স্বদেশী আন্দোলনে বাঙালীর চিত্তে যে নতুন জাতীয় জীবনের স্পন্দন জাগাইয়াছিল তাহার অপরূপ প্রকাশ পাইয়ছিল বাংলা কবিতা , সঙ্গীত , নাটক ও যাত্রাগানে — আবার এই গুলি জাতীয় জীবনে

দেশ বোধাত্মক ভাবের প্রবল বন্যাও আনিয়াছিল ।" ১৭

এই আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ সুরেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন

" The Swadeshi movement gave an impetus do all our activities, literary, political and industrial, Literature felt the full impact of the rising tide of National sentiment which bodied itself foth im prase and verse". ১৮ [illegible]

"The literature of that age, graced as it was by the presence of a veritable galaxy of distinguished Bengali Writers- including the very greater of them all was deeply influenced as is will known by the political upsurge. ১৯

স্বদেশী আন্দোলন হতে জাত বাংলা সাহিত্যের সেই পথ পরিক্রমা পরবর্তী অধ্যায় হতে শুরু হলো ।

* * * * * * * * * * * *

স্বদেশী আন্দোলন — দর্শন ও ভাবনা

বঙ্গভঙ্গ মানুষের প্রাণে জ্বালিয়ে ছিল এক তীব্র বেদনাবোধের আগুন । প্রস্তাব পেশ করার সময় হতে বাংলায় শুরু হয়েছিল আন্দোলনের ঢেউ । প্রতিবাদ ও মিছিলে সমগ্র বাংলার নগর প্রান্তর কম্পিত হয়েছিল । কিন্তু যতই বেদনাহত প্রাণ হোক না কেন একদিন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ঢেউ এর গতি স্বাভাবিক ভাবেই রুদ্ধ হয়ে যায় বা স্তিমিত হয়ে আসে । তাই সভা , সমিতি , মিছিল , প্রতিবাদ করে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন চলাকালীন সময়ে এক নতুন আন্দোলনের রূপ দেখা দিল । তার নাম ' বয়কট ' , বিদেশী দ্রব্য বর্জন কর । সমগ্র বাঙালী সমাজ এই বয়কটের ভাবনায় ভারতের রাজনীতিকে দুর্বার করে তুলেছিল । বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী যুগের বহু পূর্বে শোনা গিয়েছিল এই বয়কটের ভাবনা । ১৯০৫ সালের ১০ই নভেম্বর ধর্মানন্দ ভারতী অমৃত বাজার পত্রিকায় এক পত্র লেখেন । সেই পত্রে তিনি জানিয়েছিলেন দ্বিতীয় পেশোয়া বাজীরাও এর শাসন কালে সপ্তশৃঙ্গ পর্বতে বসবাস কারী গুরুপদ স্বামী , তিনি বলেছিলেন বিদেশী পণ্যের চাপে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে । তার প্রতিকার কল্পে তিনি ইংরেজ , ফরাসী , ওলন্দাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশের পণ্য বর্জনের পরামর্শ দিয়েছিলেন । তিনি হয়তো সেদিন ছিলেন ' সন্ন্যাসী একা যাত্রী ' । কিন্তু তাঁর কথার প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে ।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কালে বয়কটের প্রস্তাব উত্থাপক ছিলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র । ' সঞ্জীবনী ' পত্রিকায় ১৯০৫ এর ১৩ই জুলাই- এ সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হলো " বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হইলে বাঙালীর চিরাশৌচ হইবে । যতদিন ছিন্ন অঙ্গ পুনরায় একত্র না হয় ততদিন বাঙালী শোক চিহ্ন ধারণ করিবে । বাঙালী আমোদ প্রমোদ পায়ে ঠেলিয়া সমস্ত বঙ্গ এক করিবার মহা সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে । যতদিন সাধনা সিদ্ধ

না হইবে , তপশ্চর্য্যা করিবে । জাতীয় অশৌচের সময় সমস্ত বাঙালী বিদেশী দ্রব্য স্পর্শ করা মহাপাতক মনে করিবে । আরেক স্থানে লিখিয়াছেন গভর্ণমেন্টের মতিগতি যে রূপ গ্রহণ করিয়াছে , তাহাতে বাঙালীর পক্ষে ইংলন্ডের পণ্য সর্বতোভাবে বর্জন করাই যোগ্য প্রত্যুত্তর । তাহাছাড়া সরকারী বড় কর্মচারী ও সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা বর্জন করিতে হইবে । "

বিদেশী পণ্য বর্জনের নির্দেশ এসেছিল প্রথম দিকটায় ১৮৯৪ সালে যখন আমদানী শুল্ক পুনঃসন্নিবিষ্ট হয় এবং ভারতীয় যে শ্রেনীর বস্ত্র ল্যাঙ্কাশায়ারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল , তার ওপর 'উৎপাদন শুল্ক' বসানো হয় । ১৮৯৬ তে ভারতে উৎপাদিত তুলাজাত সকল প্রকার দ্রব্যের বস্ত্রই উৎপাদন শুল্কের আওতায় ফেলা হয় । ম্যাঞ্চেস্টারের সঙ্গে যে মোটা ধুতির কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই , তাকেও রেহাই দেওয়া হয় নি । রমেশ চন্দ্র দত্ত (Economic History of India in the victorian Age, Fifth Edition P 543)) এই ব্যবস্থার উপর কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করেন । বলা বাহুল্য তাঁর কথার মধ্য দিয়ে সকল চিন্তাশীল ভারতবাসীর মনের কথা প্রকাশ পেয়েছিল । ১৮৯১ থেকে বঙ্গবাসী একাদিক্রমে বয়কট প্রচার করে চলেছে । " ২০

অরবিন্দ এই প্রসঙ্গে বলছেন " ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংলন্ডের অর্থনৈতিক ও বানিজ্যিক সম্পর্কের যে লজ্জাকর ছবি রমেশ চন্দ্র দত্তের ' ইকনমিক হিস্ট্রী 'তে উদঘাটিত হয়েছে তার সহায়তা ছাড়া বয়কট নামক অস্ত্র প্রয়োগের জন্য জনসাধারণের মানসিক প্রস্তুতি এতো সহজে গড়ে উঠতো না । এই একটি ক্ষেত্রে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে রমেশ চন্দ্র শুধু ইতিহাস রচনা করেন নি , তা সৃষ্টিও করেছেন । " ২১

' ডন সোসাইটি 'র সতীশ মুখোপাধ্যায় বয়কট সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করলেন

" সরকার সমগ্র বাঙালী জাতির অভিমতকে সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষা ও বয়কট করেছে , সরকারী বয়কটের পাল্টা জবাব হিসেবে জাতি গ্রহণ করেছে আর এক ধরণের বয়কট । তত্ত্বের দিক থেকে বয়কট মতবাদ যতই হিংসাত্মক মনে হোক না কেন , আমাদের পক্ষে এই বিশেষ অবস্থায় বয়কট দর্শন হল জাতির আহত আত্ম মর্য্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করার তীব্র আকাঙ্খা ছাড়া আর কিছু না । " ২২

সুরেন্দ্রনাথ বয়কটকে বঙ্গভঙ্গের অবিচারের প্রতি প্রতিক্রিয়া বলে ভেবেছিলেন , " বয়কটই জাতির নব জাগ্রত মুক্তি আন্দোলনের শেষ কথা নয় । বয়কট হলো একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা — এটা একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় মাত্র । এর একটাই লক্ষ্য হলো বাংলার অভিযোগের প্রতি ব্রিটিশ জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা । বঙ্গভঙ্গ রদ করে ঐ অভিযোগ দূর করা হলে বয়কটও প্রত্যাহৃত হবে । " বয়কট সম্পর্কে ভিন্ন সুরে কথা বললেন লাজপত রায় । তিনি লিখলেন " স্বীকার করি ব্রিটিশের জনমতের ক্ষমতা আছে আমাদের অভিযোগ দূর করার , কিন্তু পকেটে টান না পড়লে ভারতীয়দের প্রতি অবিচারের দিকে তাদের দৃষ্টি কি আকর্ষিত হবে ? আত্মিক ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামানোর অভ্যেস ইংরেজদের কোন দিনই নেই । সুতরাং নৈতিকতা , সুবিচার , ঔচিত্য - অনুচিতের প্রশ্নতুলে তাদের কাছে আবেদন করাঅরণ্যে রোদন করারই সামিল হবে । ইংরেজরা অত্যন্ত আত্ম সচেতন , স্বাবলম্বী , অহঙ্কার তাদের রক্তে , আর সে জন্যই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে আত্মসম্মানবোধ ও আত্ম নির্ভরতার প্রকাশ দেখলে তারা খুশীই হয় ।" ২৩

তিলক , বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দ বয়কটের মধ্য দিয়ে দুটো উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ার কথা চিন্তা করতেন । ম্যাঞ্চেস্টারের উপর চাপ দিয়ে ব্রিটিশ শক্তিকে প্রভাবিত করা ও ব্রিটিশ দ্রব্যের প্রতি যে মোহ বা মায়া বোধ তা দূর করা । চরম পন্থীরা আশা করতেন বয়কটই দেশ বাসীকে স্বরাজের জন্য প্রয়োজনীয় ত্যাগ

স্বীকারে উদ্দীপিত করবে। বয়কটই দেশকে দিলো একদিকে স্বাভিমানের আত্ম দর্শন, অন্য দিকে তুলে দিল লড়াই করার অমোঘ অস্ত্র। বাংলায় বিপ্লববাদের পটভূমি তৈরী হওয়ার জন্য বয়কট সিদ্ধান্ত জরুরী ছিল। এই বয়কট আন্দোলনকে উপলক্ষ করে শাসন যন্ত্রের সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধের ক্ষেত্র বিস্তার লাভ করেছে। রাজদ্বারে দন্ড, পরস্পরের প্রতি আক্রমণ ও সংঘর্ষের বিস্তার লাভ করেছে। কালিচরণ ঘোষ বলছেন "বয়কট আমাদের রণভেরী, ধর্মযুদ্ধের শঙ্খনাদ, শত্রুর প্রতি শর নিক্ষেপ নির্দেশের সঙ্কেত। ২৪ সুরেন্দ্র নাথও অনুভব করেছেন 'Our Industrial helplessness was attracting attention is an increasing measure, and it was readily percived that the boycott would be double edged weapon, industrial and p political in its scope and character".

বয়কট কিন্তু শুধুমাত্র বিলাতী বস্ত্র বর্জনেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। জীবনের সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য বর্জনে এর প্রভাব পড়েছিল। স্বাজাত্য বোধ যখন এক জাতির জীবনে ফল্গুধারার মতো প্রবহমান হয় তখন জীবনের আনুষঙ্গিক দ্রব্য তুচ্ছ বলে মনে হয়। বয়কট সেই ভাবনার জন্মদায়িনী। বিদেশী দ্রব্য বর্জনকে ঘিরে এক স্বাভিমান বোধ সেদিন ঘিরে ধরেছিল সমগ্র জাতিকে। এক নিদারুণ বেদনা অথবা এক উদগ্র রণ সংগ্রামের প্রেরণা জাতির মনে দানা বেঁধে ছিল। এই ভাবনা ঘিরে গড়ে উঠেছিল সাহিত্য চেতনা। প্রকাশ ভঙ্গী ছিল গান বা কবিতা। স্বদেশী পণ্যের লোপ পাওয়ার জন্য বেদনা বোধ, পরবর্তীতে বর্জনের জন্য মনকে গড়ে তোলা এবং শেষ পর্যায়ে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ বা লড়াই করার সঙ্কল্প গ্রহণ করা ছিল এই সাহিত্য ভাবনার ফসল।

বয়কট আন্দোলন তখন শুরু হয় নি। তবে ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেন কালি প্রসন্ন কাব্যবিশারদ —

(ভাইসব) দেখ চেয়ে বাজার ছেয়ে
আসতেছে মাল বিদেশ হতে
আমাদের বেচা কেনা পাওনা দেনা ,
অভাব মোচন পরের হাতে
আমাদের পিতল কাঁসা ছিল খাসা
কাজ চালাতাম কলার পাতে
এখন এনামেলে মাথা খেলে
কলাই করার ব্যবসাতে ।

দেশীয় শিল্পে চলছিল তখন অভাব বোধ । দেশের শিল্প পণ্যের বাজার তখন ধুঁকছে । সেই বেদনাশ্রিত তীব্র কথন প্রকাশিত হয়েছে মনো মোহন বসুর প্রাঞ্জল ভাষায় —

অতুল , ধন রত্ন দেশে ছিল ,
যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল ।
কেমনে হরিল কেহ নাহি জানিল ,
এমনি কৈল দৃষ্টিহীন ।

তাঁতি কর্মকার করে হাহাকার ,
সুতা যাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার
দেশী বস্ত্র বিকায় নাক আর
হল দেশের কি দুর্দিন ।

* * * * *

ছুঁচ সুতা পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে
দিয়াশালাই কাঠি তাও আসে পোতে
প্রদীপটি জ্বালিতে খেতে শুতে যেতে
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন ।

বিদেশী দ্রব্যের প্রতি সহজাত আকর্ষন কমতে শুরু করেছে। এখন চায় দেশীয় পণ্য, স্বদেশী দ্রব্য গ্রহনের জন্য আবেদন। এই স্বদেশী দ্রব্যের প্রতি আকর্ষন বাড়াবার জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা । কাব্য বিশারদ ভিক্ষে চাইছেন —

" এই ভিক্ষা চাই সদনে তোমার ,
স্বদেশের বস্ত্র কর ব্যবহার ,
বিদেশীর কিছু করো না গ্রহণ ,
যদি তুল্য তার দেশে পাওয়া যায় ।"

দেশ যখন বিদেশী শিকল তারে পিষ্ট , জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের যখন বাঁচার তাগিদে জীবিত থাকার প্রয়োজন আছে, তখন শুধু মাত্র দুঃখ প্রকাশে সমস্যা দূরীভূত হবে না। গ্রহণ করতে হবে প্রতিজ্ঞা। শপথ বাক্য নিয়ে জাগাতে হবে দেশকে সর্ব প্রকার জড়তা ও ক্লীবতা থেকে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন " পরের ভূষণ পরের বসন , পরের অশন " ত্যাগ করার জন্য। এবং প্রতিজ্ঞা পালা হলো এবার শুরু —

" নব বৎসরে করিলাম পণ
লব স্বদেশের দীক্ষা ।"

স্বর্ণ কুমারী দেবী স্বনির্ভরতার উপর জোর দিলেন। এই স্ব-নির্ভরতার শিক্ষা গ্রহণ করতেই হবে। " না লব বিদেশী পণ্য " তার চাইতে " পরিচ্ছন্ন দেশী সাজ "। এতেই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব।

" এই আমাদের ধর্ম্ম , এই জীবনের কর্ম্ম ,
এই অস্ত্র এই বর্ম্ম আমাদের মুক্তির পথ ।"

কবি জ্ঞানেন্দ্র মোহন সেনগুপ্তের প্রতিজ্ঞা —

" আজি ভারতের প্রতি জনে জনে বিদেশের কিছু কিনিব না কেহ
এ দেশের জিনিস যদি পাই "

বিজয় চন্দ্র মজুমদার ভিক্ষে করা থেকে দূরে থাকতে আহ্বান জানালেন —

" যাব না , আর যাব না ভিক্ষে নিতে
পরের দোরে
যা আছে অশন বসন তাই খাব
তাই থাকব পরে । "

সাহিত্যের গান সেদিন জীবনের সর্বস্তরে পৌঁছে ছিল । যেন প্রত্যেকেই নিজ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এই মহতীকার্য্যে কিছু করার ব্রত নিয়ে । কোন একজন অপরিজ্ঞাত মহিলা কবি অবধি গান গাইলেন —

" মোটা দেশী বস্ত্রে অঙ্গ আচ্ছাদিয়া ,
বাঙালিনী বেশে করিব পণ ,
লুপ্ত কীর্তি যার করিতে উদ্ধার
সঁপিব সকলে পরাণ মন । "
নব অনুরাগে এস তবে বোন
প্রতিজ্ঞা করিব সকলে আজ
ছুঁইব না আর বিলাতী বিলাস
পরিব না আর বিদেশী সাজ ।। "

সতীশ মুখোপাধ্যায় গর্জে উঠলেন —

" নগরে নগরে জ্বালারে আগুন ,
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ ,
বিদেশী বানিজ্যে কর পদাঘাত ,
মায়ের দুর্দশা ঘুচারে ভাই । "

শত বৎসরের সাধনা যেন পূর্ণ হয় । দুর্বলতা কাপুরুষতাকে বিসর্জন দিতে হবে । মায়ের সাধনায় মুক্তির পথ । সেই মায়ের কাছে বিজয় চন্দ্র মজুমদারের প্রার্থনা —

" প্রেম ডোরে তব দৃঢ় করি আজি
রাখ বাঙালীরে বাঁধি মা ।
পদতলে দলি বিলাতী বিলাস
তব ব্রত যেন সাধি মা । "

কালিচরণ ঘোষ এই আন্দোলনের উপর মন্তব্য করেছেন " নিতান্ত ভোগ - বিলাসী , দেশের স্বার্থ রক্ষায় পরাঙ্মুখ , সরকারী কৃপাপুষ্ট স্বার্থান্বেষী বাঙালী ছাড়া আর সকলে এই বয়কট আন্দোলনে সাড়া দিয়েছিল । মারামারি নয় , খুন - খারাপি নয় , বিদেশী পণ্য পরিহার করার প্রতিজ্ঞা ও প্রচেষ্টা ইংরেজ বনিক তথা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মাথা ঘুরিয়ে ছেড়েছিল । ... 'বজ্র সমুৎকীর্ণ' ছিদ্র পথে যেমন মনির মধ্যে সূত্রের প্রবেশ সম্ভব হয় , সেই ভাবে বয়কট - সাহায্যে বাঙালী বিদেশী চক্রব্যুহের রন্ধ্র আবিষ্কার করে অভিমন্যুর মত সংগ্রাম করেছে , আর বিদেশী কৌরবকুল ভিতর থেকে শক্তিহীন হয়ে যুদ্ধান্তে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে । .... বয়কট যে সংগ্রাম ঘোষণা করে , তারই উপর কেবল বিপ্লব আন্দোলন নয় , সমস্ত মুক্তি যুদ্ধ সেইভিতের উপরেই গড়ে উঠেছে । " ২৬

বয়কট আন্দোলনের দিকটি ছিল নেতিবাচক (Nagative approach) । বিদেশী দ্রব্য বর্জন করার ভাবনাই পরিব্যাপ্ত ছিল এই আন্দোলনে । তবে কোন দ্রব্য

ব্যবহার করা হবে জীবন যাপনের প্রয়োজনে ? উত্তর ছিল সহজ — স্বদেশী দ্রব্য । তাই বয়কট আন্দোলনের পাশাপাশি চলল স্বদেশী আন্দোলন । তাই স্বদেশী আন্দোলন হলো জাতীয় সৃজনতার আন্দোলন । বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন যেন একই করাতের দুটো ধার । একটিতে কাটছে বৈদেশিক শোষণের ভার আর একটায় কাটছে জাতীয় স্থবিরতার ঘোর ।

"The ideal of, and the agitation for, Swadeshi are in reality nearly as old as the rising national consciousness itself. Arising spontaneously and mostly is an un organised and isolated matter, the swadeshi movement had gathered widespread support in its early years not from the recognised public associations of the period but from the vernacular & from the local efforts of innumerable 'faceless'men".

স্বদেশী আন্দোলনের উপর সমীক্ষা করতে গিয়ে বিপিন চন্দ্র বলছেন —
The Swadeshi movement stood for the encouragement of the use of Indian made manufactures and the non-purchase, rejection, or even boycott of foreign goods". ২৭

এই স্বদেশীর কথা শোনা গিয়েছিল ১৮৪৯ সালে গোপাল রাও দেশমুখের লিখিত ' প্রভাকর ' পত্রিকার পৃষ্ঠায় । ভারতের জাতীয়তা বাদের প্রাণ পুরুষ রাজনারায়ণ বসুর দ্বারা উৎসাহিত হয়ে নবগোপাল মিত্র ১৮৬৭ সাল হতেই স্বদেশীর গানে মুখর ছিলেন । এই স্বদেশীর প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন মহারাষ্ট্রের মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে ও জি. ভি. যোশী (সার্বজনিক কাকা) এবং বাসুদেব ফাড়কে ।

১৮৭৩ থেকে ১৮৭৬ এর মধ্যে বাংলার ভোলানাথ চন্দ্র ' মুখার্জীস ম্যাগাজিনে' এক প্রবন্ধ লেখেন "A voice for the commerce and Manufacture of India".

এই প্রবন্ধে তিনি দেশের মানুষকে স্বদেশী প্রেমিক হতে আবেদন জানালেন বিদেশী দ্রব্য বর্জন করে । তিনি লিখলেন, 'What the folly of yesterday has undone, may be replaced by the wisdom of today. Without using any physical force without incurring any disloyality and without praying for any legislature succour, it lies quite in our power to regain our lost position. Nought but our active sympathy has helped the cause of Manchester. The contrary of that sympathy is sure to produce a contrary effect. It would be no crime for us to take the only but most effectual weapon of moral hostility, left us in the last extremity. Let us make use of this potent weapon by resolving to non - consume the goods of England and the countervailing tendency of such a resolution will put its right all matters that have gone wrong". ২৮

ভোলানাথ চন্দ ' বয়কট ' শব্দের বদলে তিনি ব্যবহার করেছেন Moral hostility বা নৈতিক শত্রুতা ।

ব্যক্তি বিশেষের চিন্তাধারা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয় ১৮৯০ সাল থেকে বিভিন্ন সভা সমিতির অধিবেশনে । ১৮৯৪ এ বিষয় উত্থাপন করেন লালা মুরলীধর জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে । ১৮৯৭ এ রবীন্দ্রনাথ পত্তন করেন ' স্বদেশী ভান্ডার ' । ১৯০৩ এ সরলা দেবী গড়ে তোলেন ' লক্ষীর ভান্ডার ' । ' ডন সোসাইটি ' ও ১৯০৩ এ স্বদেশী বিপনির ভার গ্রহণ করেছিল ।

রবীন্দ্রনাথ বয়কটের প্রতি সমর্থন না দিলেও স্বদেশীকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলছেন ' বয়কট দুর্বলের প্রয়াস নহে , ইহা দুর্বলের কলহ। ' অথচ স্বদেশীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আত্মশক্তি উদ্বোধনের বিপুল এক সম্ভাবনা দেখেছিলেন। এই আত্ম - শক্তি তাঁর কাছে শুধু আত্ম নির্ভরতার নামান্তরই ছিল না , এর মধ্যে আধ্যাত্মিকতার কিছু স্পর্শ তিনি অনুভব করেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল " স্বদেশী আহ্বান জাতির সুপ্ত চেতনার দ্বারে আঘাত করবে , আর এই চেতনা জাগ্রত হলে তাঁতি শুধু কাজ পাবে না , অনাথ শুধুই ত্রাণ এবং নিরক্ষর শিক্ষার আলো , তা ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের, জমিদার ও কৃষকের , হিন্দু মুসলমানের , ভোক্তা ও উৎপাদকের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটাবে। পরিণামে হিতৈষণা যুক্ত হবে ঐক্যের সঙ্গে আর বিদেশী শাসনকে আক্রমণ না করেও দেশবাসীর পক্ষে সম্ভব হবে জনগণের জন্য , জনগণের দ্বারা , এক সমান্তরাল গণ শাসন প্রতিষ্ঠা। " ২৯ রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করছেন " গড়িয়া তুলিবার , বাঁধিয়া তুলিবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যাহাদের মধ্যে সজীব ভাবে বিদ্যমান , ভাঙনের আঘাত তাহাদের সেই জীবন ধর্ম তাহাদের সৃজনী শক্তিকেই যথেষ্ট সচেতন করিয়া তোলে। এইরূপ সৃষ্টিকে নতুনবলে উত্তেজিত করে বলিয়াই প্রলয়ের গৌরব। নতুবা ভাঙন , নির্বিচার বিপ্লব কোনমতেই কল্যাণকর হইতে পারে না। " ৩০

রবীন্দ্রনাথ ১৯০৪ এর জুলাইয়ে ' স্বদেশী - সমাজ ' প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই জনসভার সভাপতি ছিলেন রমেশ চন্দ্র দত্ত। পরে এই স্বদেশী ভাবনা লক্ষ লক্ষ হৃদয়ের মধ্যে চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিল। আচার্য্য বিনয় কুমার সরকার বলছেন " যুবক বাংলা রবির মুখে স্বদেশী সমাজ শুনে নয়া দুনিয়ার সন্ধান পেয়েছিল। গৌরবময় বঙ্গ বিপ্লবের অন্যতম সূত্রপাত এই বক্তৃতায়। ৩১

অরবিন্দ ও বিপিন চন্দ্রের ভাবনা ছিল বয়কটের পরিধিকে ব্যাপকতর গন্ডীতে

নিয়ে যাওয়া । এঁরা বিশ্বাস করতেন যে দেশবাসীর কর্তব্য সংঘবদ্ধ হয়ে এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকা যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইংরেজদের ব্যবসা বানিজ্যের প্রসার ঘটাতে পারে অথবা যার সুযোগ নিয়ে ইংরেজ আমলাশাহী ভারতবর্ষে শোষণের কাজ চালিয়ে যেতে পারে । প্রধানত চারটি ক্ষেত্রেই তারা এই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কথা ভেবেছিলেন — অর্থনীতি , শিক্ষা , বিচার ব্যবস্থা ও প্রশাসন । বিপিন চন্দ্রের ভাবনা ছিল যে একটা জাতি যখন অপরের উপর আধিপত্য স্থাপন করে তখন সর্বক্ষেত্রেই বিজয়ী পক্ষ পদানতের অর্থনৈতিক , রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবন অবিচার অনাচারে ভরে তোলে আর তখন বয়কটই হয়ে উঠে শৃঙ্খলিতের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের মূর্ত প্রকাশ । ৩২ " ব্রিটিশ শাসনের অস্তিত্বের মূলে আঘাত হানলে তার 'প্রেস্টিজ' ছিন্ন হয়ে যাবে — আর এই প্রেস্টিজই ইংরেজদের সামরিক শক্তির চেয়ে অনেক বেশী পরাক্রান্ত । বয়কট এবং স্বদেশীর ফলে জাতীয় শিল্পের সংরক্ষণই শুধু হবে না , এই দৃষ্টিভঙ্গীই রক্ষা করবে জাতীয় পৌরুষ , জাগিয়ে তুলবে স্বদেশের মুক্তি সংগ্রামের জন্য আত্মত্যাগের বাসনা । বয়কট তাই চরম পন্থীদের কাছে শুধু পরিহারের কেবল মাত্র বর্জনের , একটা নঞর্থক মাধ্যম হয়ে থাকেনি । প্রয়োজন ভিত্তিক অর্থনীতির বাস্তব প্রয়োগের সংকীর্ণ সীমানা ছেড়ে তা বের হয়ে এসেছিল , ন্যায় ধর্মের বর্মাচ্ছাদিত হয়ে জাতীয় শক্তির সেনাপতিত্ব করতে । " ৩৩

স্বদেশী আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ । এই আন্দোলনের ভাবনা ও অভিজ্ঞতা দুটোই তিনি বিশ্লেষণ করেছেন বড় সুন্দর ভাবে । " স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ আমাদের গৃহাঙ্গণেও গিয়ে পৌছল । মহিলাদের হৃদয়ও তা জয় করে ফেলল । মহিলাদের মধ্যে উৎসাহের মাত্রা পুরুষদের চেয়েও বেশী দেখা দিল । স্বদেশী ! স্বদেশী ! স্বদেশী ভাব আকাশ বাতাস ছেয়ে ফেলল ।

" আমার জীবনে আমি বিপ্লব দেখিনি । কল্পনা করেও ধারণা করতে পারছি না , এর স্বরূপ কি রকম । কিন্তু 'স্বদেশী'আন্দোলনের প্রবল বন্যার মধ্যে আমার মনে

হয় যেন আমি বিপ্লবী আন্দোলন দেখা দেওয়ার পূর্বে গণ - চেতনার মধ্যে যে বিরাট পরিবর্তন ও প্রবল উত্তেজনা দেখা দেয় তার কিছুটা ধারণা করতে পেরেছি । সেও এক অদভুত বিস্ময়কর পরিস্থিতি । বৃদ্ধ - যুবা , ধনী - দরিদ্র , শিক্ষিত - অশিক্ষিত সকলেই সেই উত্তেজনায় হেলতে দুলতে লাগল , ছটফট করতে লাগল । এমন কি , যেন কি এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাব আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ল । কোন যুক্তি নেই , বিচার বিবেচনার বালাই নেই , কেবল একটি মাত্র প্রবল শক্তিশালী আবেগ গোটা সমাজের হৃদয়কে আন্দোলিত করে তুলল । জীবনের সব কিছুকেই যে সেই আবেগের দিকে টেনে নিয়ে গেল ।....

"স্বদেশী আন্দোলনটি বঙ্গভঙ্গ রদের আলোড়ণের সঙ্গে সৃষ্ট হয় নি । বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলন যে জাতীয় জাগরণের সৃষ্টি করেছে , স্বদেশী আন্দোলন তারই সমকালীন । মানুষের মন এমন কোন নিঃছিদ্র বিচ্ছিন্ন সংকীর্ণ কুঠরী নয় যার মধ্যে জলও প্রবেশ করতে পারে না । এটা একটা সজীব যান্ত্রিক গঠন । তাই যখনই এর কোন দিকে কোন নতুন অনুভূতি দেখা দেয় , তখনই তা সমস্ত যন্ত্রটাকেই স্পর্শ করে এবং সেই অনুভূতি মানুষের সমস্ত কাজের ভিতর দিয়েই প্রকাশ পায় । .... সমাজ সংস্কার , শিল্পের পুনরুজ্জীবন , নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সবকিছুই আমাদের জাতীয় জাগরণের পিছনে পিছনে চলে এসেছে । আর তার মূলে আছে আমাদের নেতাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ । এই ভাবে আরেক বার এই সত্য প্রমাণিত হলো যে সমস্ত সংস্কার মূলক কাজ একটি আর একটির সঙ্গে যুক্ত , একে অন্যের উপর নির্ভরশীল এবং তা পরস্পরের উপর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটায় এবং পারস্পরিক কার্য্য সম্পর্কের মধ্য দিয়ে একে অন্যকে শক্তিশালী করে তোলে ।" ৩৪

"In view of such potentialities Swadeshism was regarded by Surendranath as of Divine origin and he claimed that the Swadeshi leaders are humble instruments in the hands of Divine Providence walking under the illumination of his Holy spirit. He believed that men working under such a

a conviction and fortified by such a belief with we'll dare all & do all". ৩৫

এই স্বদেশী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলার প্রান্তর অতিক্রম করে অন্য সকল প্রদেশেও। জাতির জীবনে এই আন্দোলন এনে ছিল সৃজনী প্রতিভা। স্বদেশী আন্দোলনের স্বরূপ ধরা পড়ল সর্বত্র। স্বদেশী সেদিন শুধু ভাবাবেগ নয়, শুধু উচ্ছ্বাস নয়, স্বদেশী শুধু অশ্রুপাত নয়। স্বদেশী বিশাল সৃষ্টির উদ্যম। সমাজ জাগরণের মন্ত্র। শিল্পে আত্মনির্ভরতার দৃঢ় সুনিশ্চয়। সাহিত্যে সোনার ফসল ফলানোর শুভক্ষণ।

* * * * *

প্রথম অধ্যায়

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের একটি পর্যায়

১ । ভারতে মুক্তি সংগ্রামে চরম পন্থী পর্ব — পৃ ৯৭

২ । Curzon's speech quoted in 'Revolt of 1905 in Bengal'P-71

৩ । Curzon Papers সূত্র-ভারতে মুক্তি সংগ্রামে — পৃ : ১০৩

৪ । Riseley's letter

৫ । বঙ্গভঙ্গ — সমুদ্র গুপ্ত , পৃ : ৩১ - ৩২

৬ । Parliamentary Papers, 18 Feb, 1904 সূত্র-ভারতে মুক্তি সংগ্রামে...— পৃ : ১০৩

৭ । দেশ , সংখ্যা ২৯শে জানুয়ারী , ১৯৯৪ , প্রবন্ধ — স্বাধীন বাংলার রাজধানী

৮ । ডেসপ্যাচ , নং - ৭৫ পাবলিক , সূত্র — ভারতে মুক্তি সংগ্রামে — পৃ : ১০৭

৯। বঙ্গভঙ্গ — পৃ : ৪১

১০। জাগরণ ও বিস্ফোরণ — কালিচরণ ঘোষ — পৃ : ১২০

১১। পূর্বোক্ত

১২। A Nation in Making P —

১৩। The case of India P — 123

১৪। বঙ্গভঙ্গ — সমুদ্র গুপ্ত — পৃ : ৪৩

১৫। পূর্বোক্ত — পৃ : ৪৩

১৬। পূর্বোক্ত — পৃ : ৪৩ - ৪৪

১৭। বাংলা দেশের ইতিহাস, চতুর্থ খন্ড পৃ : - ৭৮

১৮। A Nation in Making P — 207

১৯। The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908 P-7

২০। জাগরণ ও বিস্ফোরণ — পৃ : ১২১

২১। অরবিন্দ — বঙ্কিম তিলক দয়ানন্দ — পৃ : ২৬৭

২২। বঙ্গভঙ্গ — পৃ: ৪৭

২৩। ভারতে মুক্তি সংগ্রামে — পৃ: ১১৪

২৪। জাগরণ ও বিস্ফারণ — পৃ: ১২৩

২৫। A Nation in Making P - 190

২৬। জাগরণ ও বিস্ফারণ — পৃ: ১০৮

২৭। The Rise and growth of Economic Nationalism in India P - 122

২৮। পূর্বোক্ত — পৃ: ১২৬

২৯। স্বদেশী সমাজ

৩০। পূর্বোক্ত

৩১। বঙ্গভঙ্গ — পৃ: ৯৫

৩২। বিপিন পাল — বয়কট, স্বদেশী, এ্যান্ড স্বরাজ পৃ: ২১৯

৩৩। ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরম পন্থী পর্ব — পৃ: ১১৭

০৪ । A Nation is Making অনুবাদ , রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের আত্মকথা — পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ , কলকাতা ২৯৮৯ , পৃ : ২৫৫ - ৭

০৫ । History of Freedom Movement II P-118

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

স্বদেশী আন্দোলনের উন্মেষ। জাতীয় জীবন ও সাহিত্যে

ক্ষেত্র। সংগীত ও কাব্য

স্বদেশী আন্দোলন ও সাহিত্য চেতনা

সাহিত্য মানুষের মনোভূমি কর্ষণের সোনালী ফসল । মানব জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবিই সাহিত্য । সমাজ জীবন সাহিত্যিকের মনে যে অনুভূতির সঞ্চার করে সাহিত্য সেই অনুভূতিরই প্রকাশ । মানুষের সঙ্গে মানুষের , অতীতের সঙ্গে বর্তমানের , দূরের সঙ্গে নিকটের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগ সাধন ঘটে একমাত্র সাহিত্যে । সাহিত্যে যেন থাকে এক মিলনের ভাব — হয়তো এরই নাম সাহিত্য । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন " এই সাহিত্য সাহিত্যের প্রধান উপাদান , সে বিচ্ছিন্নকে এক করে এবং যেখানে ঐক্য সেখানে আপনি প্রতিষ্ঠা ভূমি স্থাপন করে । "

স্বদেশী আন্দোলন এক ঐতিহাসিক ঘটনা । ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এর স্থান । স্বদেশী আন্দোলন কালীন বা স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে সকল রচনাকার রচনা নিবন্ধ করেছেন তা হচ্ছে সাহিত্যের বস্তু । স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে যে সাহিত্য গড়ে উঠেছিল , তা গড়ে উঠার জন্য মানুষের মনোভাবনায় ঘটেছিল এক অন্তর স্পর্শী ফল্গুধারা । এই সাহিত্যের মূলে ছিল স্বদেশ চেতনা ।

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ছিল এক প্রাণ কাঁপানো আবেদন । সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাগুলো পল্লবিত হয় , প্রস্ফুটিত হয় যখন মানুষের হৃদয় কোন ডাকে বা আহ্বানে সাড়া দেয় । বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলনের যুগটাই ছিল চিত্তবৃত্তির বহিঃপ্রকাশের যুগ । উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যদেশ থেকে যে স্বাধীনতা বোধ জাগ্রত হয়েছিল তা তীব্রভাবে আঘাত পেল বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তে । বঙ্গভঙ্গের পূর্বে জাতির জীবনে এত অবমাননাকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নি । ১৯০৫ এর বিস্ফোরণের মানসিকতা দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী ধরে লালিত হয়ে এসেছিল মানুষের মনোভূমিতে ।

ইংরেজ আমলের শত অত্যাচারের ধকল সত্বেও বাংলা বিভাগের আন্দোলনে সমগ্র সমাজ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সাড়া দিল। এতদিনের অত্যাচার নিপীড়ন আর মানুষের বুকে চাপা রইলো না। এই বিক্ষুব্ধ দেশপ্রেম এর প্রকাশ ভঙ্গী আপনার অভিপ্রায়ে পথ খুঁজে নিতে চাইছিল। এই পথই হলো সাহিত্যের। সাহিত্যের পৃষ্ঠায় সেই বিক্ষুব্ধ ভাবনা বোধ এসে অভিমান রূপে সঞ্চিত হলো।

সাহিত্য যে শুধু নিজের হৃদয় ভাবনাকে প্রকাশ করল তা নয়, এই ভাবনার অংশীদার রূপে সমাজের সকল মানুষকে জাতীয় জাগরণের অংশীদার রূপে পেতে চাইলেন এই যুগের সাহিত্যকারেরা। সাধারণ মানুষের মনেও বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলনে তীব্রভাবে দোলা দিয়ে যাক এই সংকল্পে সকলের উপযোগী সকল ধারায় সাহিত্য তার গতি পথ নিয়ে প্রবাহিত হলো। স্বাধীনতা হীনতার প্রতি সচেতনতা, দেশব্যাপী জাগরণের প্রতি বিমুখতা থেকে আন্দোলন মুখী সমাজ গড়ার প্রয়োজন তখন খুবই জরুরী হয়ে পড়েছিল। আর সেই চিন্তনে গড়ে উঠল সার্বজনীন সাহিত্য। এই স্বদেশ প্রীতির আঙিনায় দাঁড়িয়ে এমন কি গ্রাম বাংলার পৌরাণিক কল্পকথা বা রাজ-পুত্র - রাজকন্যার, রাক্ষস - খোক্কসের গল্পের মধ্যে স্বদেশী ভাব খুঁজে কিছু সাহিত্যিক তাই শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ঘটালেন স্বদেশ ভাব।

বাংলা ভাগকে কেন্দ্র করে যে জাগরণ এসেছিল সেই জাগরণ শুধুমাত্র বাংলা দেশেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। সারা ভারতে ঘটেছিল এর প্রতিক্রিয়া। স্বাভাবিক ভাবে সাহিত্যের ভাবনায় বঙ্গ জননী মুহূর্তে ভারত জননীতে রূপান্তরিত হলো। অখন্ড দেশ চেতনা জন্ম নিল এই সাহিত্য হতে। যদিওবঙ্গভঙ্গ একটি প্রদেশ গত সিদ্ধান্ত ছিল তবুও এই আন্দোলনাত্মক পটভূমি থেকে জাতীয় চেতনার এক অখন্ড সংস্করণ দেখা দিল স্বদেশী সাহিত্যে।

দেশ যে বিপন্ন , দেশের অভ্যন্তরে ইংরেজ রাজত্ব গোলামীর কারখানা স্থাপন করেছে , এই অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে । বঙ্গভঙ্গ রদ করা জাতির জীবনে এক সংকল্প হয়ে দাঁড়াল । সুতরাং ইংরেজ বিরোধিতার কঠোর বাস্তব ভূমিতে রচিত হলো এই সাহিত্য । শাসকের বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে লড়তে হবে । তাই এই সাহিত্য হলো আদর্শবোধ সম্পন্ন বা উদ্দেশ্য মুখী ।

স্বদেশী আন্দোলন জাগরণ এনেছিল সমাজে । সমাজের মানুষের মধ্যে ঘটেছিল এর প্রতিক্রিয়া । মানুষ যখন সমাজে একা থাকে তখন তার সাথে বৈপরীত্যের লক্ষণ দেখা দেওয়া স্বাভাবিক । " মানুষ যখন সত্যকার একলা , ইতিহাস তাকে ছুঁতে পারেনা । একক মানুষের অস্তিত্ব আছে , ইতিহাস নেই । মানুষ সামাজিক হলে পরেই ইতিহাস হয় । সামাজিক মানুষও জীবনে যখন নিঃসঙ্গ তখন সে ইতিহাসের বাইরে । বক্তব্য এই নয় যে সময়ের হিসাবে কোন একদিন অনেক গুলি নিঃসঙ্গ মানুষ কোন একটি চুক্তি সম্পন্ন করে সমাজ ও রাষ্ট্র তৈরী করে , তারপর সে ইতিহাস হয় । বক্তব্য এই যে , নিঃসঙ্গ মানুষ ও সামাজিক মানুষ আবহমান কাল পরস্পরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট , ইতিহাস শুধু সামাজিক মানুষের জীবন ব্যাখ্যা । " ১

স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস যেমন রাষ্ট্রিক সামাজিক ইতিহাস , তাই তার অবয়বে সাহিত্য গড়ে উঠেছে । স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি জীবন হয়েছে ভীষণ ভাবে আলোড়িত । এই ব্যক্তি জীবন বোধ সাহিত্যের আদর্শের আদলে গড়ে উঠেছে । এখানে সাহিত্য ও জীবন একাকার হয়ে মিশে গেছে ।

বিশ্বের ইতিহাসের চরম উত্তেজনা পূর্ণ ঘটনাগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ঐতিহাসিক ঘটনার তদানীন্তন কালে যে অস্থিরতা সমাজ জীবনে বা রাষ্ট্রিক জীবনকে আলোড়িত করেছিল সেই মুহূর্ত বা ঘটনাবলীকে নিয়ে তৎক্ষনাৎ সাহিত্য

রচিত হয়নি । যেমন ফরাসী বিপ্লব — ইউরোপের ইতিহাসে এক দিক কাঁপানো বিপ্লব । পৃথিবীর বহু পুরনো ধ্যান ধারণার প্রাচীর ভেঙে দেয় এই গণ বিদ্রোহ । মিশেল কারিয়ের বলছেন " বোধহয় সেই টালমাটাল সময় মহান সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে উপযুক্ত ছিল না । হয়ত সাহিত্য সৃষ্টির অবকাশ ছিল না , রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের মধ্যেই মনন , মেধা পেয়েছিল তার যথেষ্ট খোরাক । বা এও সম্ভব যে সাহিত্য সৃষ্টির কাজের টেবিলের শান্ত পরিবেশ দাবি করে । যাই হোক , ১৭৮৯ এর প্রতা জেনেরো (ফরাসী দেশের আঁলয়াঁ রেজিম - এর চিরাচরিত প্রজাদের সভা) ১৭৯৯ সালের নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সামরিক ক্যু পর্যন্ত , নতুন ফ্রান্স প্রসবের চেষ্টায় এই দশ বছর ফরাসী দেশ কোন উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি করেনি । " ২

বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলন চলাকালীন সময়ে বাংলা সাহিত্য এক প্রচন্ড গতি লাভ করে । এই আন্দোলন মুখী সমাজে নিত্য নতুন ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে কবিতা গান প্রবন্ধ ইত্যাদি । প্রতিক্রিয়া পরিব্যক্ত হওয়া মাত্র স্বদেশী সাহিত্যের বহু ক্ষেত্রে স্ফুরণ ঘটেছে । কবিতায় , গানে , ছড়ায় , ব্যঙ্গ কবিতায় , নাটকে , উপন্যাসে এই সাহিত্য ভাবনা ছড়িয়ে পড়েছে । অন্য এক ধারা গড়ে তুলেছিল এক বিশিষ্ট যুগ সাহিত্য ।

স্বদেশী গীত

ইংরেজ শাসনাধীনে আমাদের মনে যে ভাবধারা বেশী পরিমাণে জাগ্রত হয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম ও শ্রেষ্ঠ ভাবধারা ছিল জাতীয়তাবাদ বা দেশ প্রেম । রবীন্দ্রনাথ Nationalism সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন 'India has never had a real sense of nationalism. Even though from childhood I had been taught that idolatry of the Nation is almost better than reverence for God and humanity. I believe I have out-

-growin that teaching, and it is my convinction that my country men will truly gain their India by fighting against the education which teaches them a country is greater than the ideals of humanity."

বিশ্বমানবিকতার উপরে জাতীয়তাবাদের জয়লাভে হয়তো ঋষি কবি দুঃখ প্রকাশ করেছেন কিন্তু এই জাতীয়তাবোধ বাংলা তথা ভারতকে আত্ম প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল । রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে দেশ প্রেমের আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন " স্বাদেশিক ঐক্যের মাহাত্ম্য আমরা ইংরেজদের কাছ থেকে শিখেছি । জেনেছি এর শক্তি এর গৌরব । দেখেছি এই সম্পর্কে এদের প্রেম , আত্মত্যাগ , জনহিত ব্রত । ইংরেজের দৃষ্টান্ত আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছে । অধিকার করেছে আমাদের সাহিত্যকে । " ৩

বাংলা দেশ মূলক কবিতায় সর্বত্রই স্বদেশকে জননী বলে বন্দনা করা হয়েছে । কবিরা মাতৃ রূপে জন্মভূমির ধ্যান করেছেন এবং কবিতায় এই জননীরই স্তুতি গান করেছেন । স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এই দেশ বন্দনা গীতি বা কবিতা ব্যাপক ভাবে প্রচলন ঘটে ।

কবিতা বা গান মানুষের হৃদয়ের সহজাত ভাবাবেগ । সমগ্র দেশে যখন জাতীয় সঙ্কটের এক ঘূর্ণাবত চলে কবিদের অন্তকরণ সেই যুগে এক ভাবাবেগে পরিচালিত হয় । হৃদ - ভাবাবেগের সহজ লভ্য ফসল হল গীত বা কবিতা । দেশকে মাতৃরূপে কল্পনা করে এই সব গীত রচিত হয়েছিল স্বদেশী যুগে । স্বদেশী যুগের

ভাবাদর্শকে সর্বত্র পেঁাছে দেওয়ার তাগিদে রচিত হয়েছিল এই সকল কবিতা ও গান। গান সুর ধর্মী। সুর মানুষকে সহজেই আকৃষ্ট করে। এবং এই সুরের সাথে সুর মিলিয়ে মানুষও অনুভব করে সেই ভাবাদর্শ। তাই স্বদেশী গীত বাংলার কোমল শ্যামল প্রান্তরে দ্রুত প্রভাবিত হয়েছিল।

"শিক্ষার উত্তরোত্তর বিস্তার, ইতিহাস জ্ঞান, সামাজিক আন্দোলন, সাময়িক পত্রের সুপ্রসার, দেশে নীল বিদ্রোহ ও উপর্যুপরি দুর্ভিক্ষ, ইংরেজ শাসকের পীড়ণ ও শাসনতন্ত্র হইতে ভারতীয়দের দূরে রাখার প্রয়াস, সংবাদ পত্রের কন্ঠরোধ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে এক জাতীয়তাবোধ ও ভাতৃত্ববোধের অভ্যুদয় ও ক্রম প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছিল। বলা বাহুল্য বাঙালী সেদিন অবশিষ্ট ভারতকে পথ দেখিয়েছিল।"[৪]

এই যুগে দেশ প্রেমের কবিতা ও গানের কয়েকটি শ্রেনী বিভাগ করা যেতে পারে।

১) কবিরা বঙ্গভূমিকে মাতৃরূপে বন্দনা করেছেন। নিত্যকৃষ্ণ বসুর 'বঙ্গলক্ষ্মী', দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার দেশ' ইত্যাদি।

২) সেদিনের বাঙালী কবি দেশ মাতাকে কেবল বাংলা দেশের সীমায় আবদ্ধ করেন নি। বাংলার সাথে ভারত অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভারত মাতা রূপে পূজিত হয়েছেন। এই স্বদেশ ভক্তি প্রাদেশিকতার ঊর্দ্ধে ছিল। রবীন্দ্রনাথ, অতুল প্রসাদ, সত্যেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্র লাল রায়, কালিপ্রসন্ন, যোগীন্দ্র নাথ সরকার, জ্ঞানেন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত সকলেই এই পথের পথিক ছিলেন।

৩) এ যুগে রচিত আরেক ধরণের কবিতায় স্বদেশ ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায় সেই সকল কবিতা বিলাপ প্রধান। বোধ হয় পরাধীন মোহবদ্ধ নিশ্চেষ্ট হতমান

ভারতবাসীকে পুনঃ জাগ্রত করার জন্যই অতীত গৌরবের বর্ণোজ্জ্বল চিত্র অঙ্কন করা হয়েছিল এবং বর্তমান দুরবস্থার পটভূমিতে করা হয়েছে বিলাপ সাধন। হেমচন্দ্রের ' ভারত বিলাপ ' কালিপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের ' সেই তো রয়েছ মা ' ইত্যাদি ।

৪) আরেক শ্রেনীর কবিতা হচ্ছে উৎসাহ ও প্রেরণাদায়ক। দেশ মাতৃকার সেবায় জীবন বলিদান করার সঙ্কল্প এই সব কবিতায় তুলে ধরা হয়েছে। কালিপ্রসন্নের যায় যেন জীবন চলে ' , ' স্বদেশের বুলি ' , রজনীকান্ত সেনের ' মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় ' , গিরীন্দ্র মোহিনী দাসীর ' ঋণ শোধ ' , বিজয় মজুমদারের ' আহ্বান ' , স্বর্ণ কুমারী দেবীর ' শত কন্ঠে কর গান ' , অতুল প্রসাদের ' বল বল বল সবে ' , ' হওধরমেতে বীর ' ইত্যাদি ।

৫) আর এক শ্রেনীর কবিতায় মাতৃভূমির চিন্ময়ী রূপটি ধরা পড়েছে ধ্যান গম্ভীর পুজায়। এখানে জন্মভূমির শাশ্বত রূপটি বড় পবিত্র ও সুন্দর। রজনীকান্ত সেনের ' ব্যাকুলতা ' , গোবিন্দ দাসের ' জন্মভূমি ' , মন্যো মোহন বসুর ' জন্মভূমি ', দ্বিজেন্দ্র লালের ' প্রতিমা কি দিয়ে পূজিব ' , ' কাঁদে কি স্নেহময়ী ' , সরলা দেবীর ' জয় যুগ আলোকময় ' , কামিনী কুমার ভট্টাচার্য্যের ' জননী ' ইত্যাদি ।

৬) এক শ্রেনীর কবিতায় প্রতিফলিত হতো মাতৃভাষার সেবা দেশ সেবার পথ। দ্বিজেন্দ্রলালের ' বঙ্গভাষা ' , অতুল প্রসাদ সেনের ' বাংলা ভাষা ' ইত্যাদি ।

৭) পরাধীনতার বেদনা কতখানি জ্বালা দিতে পারে সেই সব শ্রেনীর কবিতাও লিখিত হয়েছিল এই যুগে। গোবিন্দ দাসের ' স্বদেশ ' , কামিনী কুমার রায়ের ' শাসন সংযত কর ' ইত্যাদি ।

এই সকল কবিতা সুরারোপিত হয়ে বাংলার প্রান্তরে প্রান্তরে সংগীতের মূর্চ্ছনায় দেশকে জাগ্রত করেছিল। এই সকল কবিদের আহ্বান ব্যর্থ হয়নি। স্বদেশী আন্দোলনের দিনে রাখী বন্ধনের মাধ্যমে সেদিন বাংলা দেশকে জাগ্রত করা হয়েছিল। তাই অসংখ্য স্বদেশী গান ও কবিতা রচিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বলছেন " মনে রাখিতে হইবে আজ স্বদেশের স্বাদেশীয়তা আমাদের কাছে যে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। ইহা

রাজার কোনো প্রসাদ বা অপ্রসাদে নির্ভর করে না , কোন আইন পাশ হউক বা না হউক বিলাতের লোক আমাদের করুণোক্তিতে কর্ণপাত করুক বা না করুক , আমার স্বদেশ , আমার চিরন্তন স্বদেশ , আমার পিতৃ পিতামহের স্বদেশ , আমার সন্তান সন্ততির স্বদেশ , আমার প্রাণদাতা , শক্তিদাতা , সম্পদদাতা স্বদেশ । কোনো মিথ্যা আশ্বাসে ভুলিও না । কাহারও মুখের কথায় ইহাকে বিকাইতে পারিব না , একবার যে হস্তে ইহার স্পর্শ উপলব্ধি করিয়াছি , সেই হস্তকে ভিক্ষাপাত্র বহনে আর নিযুক্ত করিব না , সে হস্ত মাতৃসেবার জন্য সম্পূর্ণ ভাবে উৎসর্গ করিলাম । আজ আমরা প্রস্তুত হইয়াছি যে পথ কঠিন , যে পথ কন্টক সঙ্কুল সেই পথে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি । আজ যাত্রারম্ভে এখনও মেঘের গর্জন শোনা যায় নাই বলিয়া , সমস্তটাকে যেন খেলো বলিয়া মনে না করি । যদি বিদ্যুৎ চকিত হইতে থাকে , বজ্র ধ্বনিত হইয়া উঠে , তবে তোমরা ফিরিও না , ফিরিয়ো না , দুর্যোগের রক্তচক্ষুকে ভয় করিয়া তোমাদের পৌরুষকে জগৎ সমক্ষে অপমানিত করিও না । " ৫
বোধহয় রবীন্দ্রনাথের এই বরাভয় মন্ত্রে বাংলাদেশ দীক্ষিত হয়েছিল , এই যেন মহা ওঙ্কার ধ্বনি সৃষ্টি করে স্বাদেশিকতার জাগ্রত দেবতার অভিষেক করেছিল । দেশপ্রেমের গান কবিতা ছিল তার নৈবেদ্য ও পূজোপচার ।

রবীন্দ্রনাথ ও স্বদেশী গান

স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১ - ১৯৪১) । জন্ম সিদ্ধ কবির কৈশোর হতেই হৃদয়ে জন্মে ছিল দেশপ্রেমের ফল্গুধারা । ঠাকুর - বাড়ীর পরিবেশ ছিল জাতীয় জাগরণের স্বর্ণভূমি । রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা বোধের জন্ম হয়েছিল ' হিন্দু মেলা ' য় । এই হিন্দু মেলার স্মৃতি চারণ করতে গিয়ে

কবি বলছেন " আমাদের বাড়ীর সাহায্যে ' হিন্দুমেলা ' বলিয়া একটি মেলা সৃষ্ট হইয়ছিল । নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কর্মকর্তা রূপে নিয়োজিত ছিলেন । ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা এই প্রথম হয় । মেজদাদা এই সময় বিখ্যাত জাতীয় সংগীত ' মিলে সবে ভারত সন্তান ' রচনা করেছিলেন । এই মেলায় দেশের স্তব গান গীত , দেশানুরাগের কবিতা পঠিত , দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুনীলোক পুরস্কৃত হতো । " ৬

এই 'হিন্দুমেলার' নবম অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ উপহার নিয়ে উপস্থিত হলেন । যে কবিতা তিনি এই মেলার জন্য উপস্থিত করেছিলেন তবিষয়তে স্বাদেশিকতার বীজ তাঁর হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়েছিল ।

' ভারত কঙ্কাল আর কি এখন
পাইবে হায় রে নূতন জীবন
ভারতের রসে আগুন জ্বালিয়া
আর কি কখনো দিবেরে জ্যোতি । ....
তা যদি না হয় তবে আর কেন
হাসিবি ভারত , হাসিবিরে পুনঃ
সেদিনের কথা জাগে স্মৃতিপটে
ভাসেনা নয়ন বিষাদ জলে । '

ভারতবর্ষের দুর্দিনে দিল্লীতে যখন ১৮৭৭ সালে দরবার বসে, আত্ম সম্মান বিসর্জন কারী নৃপতিবর্গ যখন ইংরেজের গুনগানে মুখর তখন কবি কবিতা লিখলেন —

ব্রিটিশ রাজের মহিমা গাহিয়া
ভূপগণ ঐ আসিছে ধাইয়া ।

হায় রে হতভাগ্য ভারত ভূমি
কণ্ঠে এই তোর কলঙ্কের হার
পরিবারে আজে করি অলংকার
গৌরবে মাতিয়া উঠেছে সবে
তাই কঁাপিতেছে তোর বক্ষ আজি
ব্রিটিশ রাজের বিজয় রবে
ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা ,
যে গায় গাক আমরা গাব না ,
আমরা গাব না হরষ গান ,
এসো গো আমরা যে কজন আছি ,
আমরা ধরিব আরেক তান ।

শ্রী যোগেশচন্দ্র বাগল 'জাতীয়তার নবমন্ত্র' এতে মন্তব্য করেছেন "যখন দেখিলাম যে বঙ্গের একটি সুকুমার মতি শিশু ভারতের জন্য এরূপ রোদন করিতেছে, যখন দেখিলাম যে তাহার কোমল হৃদয় পর্যন্ত ভারতের অধঃপতনে ব্যথিত হইয়াছে , তখন আশাতে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইল । তখন ইচ্ছা হইল রবীন্দ্রনাথের গলা ধরিয়া কঁাদিতে কঁাদিতে বলি — আয় ভাই আমরা গাইব অন্য গান । একজন সুপরিচিত কবিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন , তিনি দ্রবিত হৃদয়ে বলিলেন ," যখন এই কবি প্রস্ফুটিত কুসুমে পরিণত হইবে , তখন দুঃখিনী বঙ্গের একটি অমূল্য রত্ন লাভ হইবে ।"

যখন স্বাদেশিক চিন্তায় রবীন্দ্রনাথের মনোভূমি যৌবনের দৃপ্ত শক্তিতে উর্বরা সেই সময় ঘটল বঙ্গভঙ্গ । রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের কেন্দ্রভূমিতে এসে দঁাড়ালেন । ১৯০৫ এ ১৬ই অক্টোবার বঙ্গভঙ্গের সরকারী আদেশ কার্যকরী হলে রবীন্দ্রনাথ এই

দিনটিকে স্মরণ করে রাখার জন্য মিলনের প্রতীক রাখী বন্ধনের প্রস্তাব দিলেন। তিনি 'বঙ্গ দর্শন' পত্রিকায় লিখলেন " আগামী ৩০শে আশ্বিন (১৩১২) বাংলা দেশ আইনের দ্বারা বিভক্ত হইবে। কিন্তু ঈশ্বর যে বাঙালীকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই তাহাই বিশেষ রূপে স্মরণ ও প্রচার করিবার জন্য সেই দিনটিকে আমরা বাঙালীর রাখী বন্ধনের দিন করিয়া পরস্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণের সূত্র বাঁধিয়া দিব। রাখী বন্ধনের মন্ত্রটি এই 'ভাই ভাই এক ঠাঁই'।" বঙ্গ বিভাগকে কেন্দ্র করে যে ব্যাপক আন্দোলন জেগে উঠে, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার পুরোভাগে। রবীন্দ্রনাথের অবদান সম্পর্কে ডঃ রাধাকুমুদ মুখার্জী লিখেছেন "The leadership of this revolt was soon assumed by Rabindranath Tagore who festered in and kept up its fire by his great literacy creation of national songs, a unique poetry of patriotism. These patriotic poems he composed and came to set to music with Ajit Chakraborty every evening in the hall of the Metropolitan Institution where the Dawn Society was located." ৭

বাঙালীর কাছে দেশ সেদিন সত্যই মাতৃরূপে উদ্ভাসিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই মহাযজ্ঞের পুরোহিত হয়ে শক্তিমন্ত্রোচ্চারণ করে দেশ মাতার বন্দনা করেছিলেন। প্রভাত মুখোপাধ্যায় বলছেন " স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীত গুলো ছিল তাহাদের রণ সঙ্গীত তুল্য। " ডঃ দিলীপ মজুমদার বলছেন " রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ সঙ্গীতগুলি অধিকাংশই বাউল সুরে বাঁধা। দেশাত্মবোধ উদ্দীপনের জন্য তিনি স্বদেশ প্রিয় পরিচিত সুরেরই আশ্রয় নিয়েছিলেন। " ৮

রবীন্দ্র সঙ্গীতের গবেষক সুপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন " রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীতের তথা স্বাদেশিকতার উল্লেখযোগ্য অধ্যায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমি।

১৯০৫ সালেই স্বদেশী সংগীতের চূড়ান্ত বিকাশ দেখা যায়। এই গানগুলি কেবল জনপ্রিয় নয়, দেশ প্রেমের সাময়িক আবেদন নিবেদনের গন্ডি ছাড়িয়ে গানগুলির কাব্যমূল্য সর্বদেশের সর্বকালের।

১। এবার তোর মরা গাঙে।

২। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে।

৩। আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি।

৪। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মা।

৫। এখন আর দেরী নয়, ধর গো তোরা হাতে হাতে ধর গো।

৬। আপনি অবশ হলে বল দিবি কারে।

৭। বাংলার মাটি বাংলার জল।

৮। বিধির বিধান কাটবে তুমি এমন শক্তিমান।

৯। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।

১০। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা।

১১। নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে মন হবেই হবে।

১২। বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি বারে বারে হেলিস না ভাই।

১৩। আমি ভয় করব না।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উত্তেজনা উম্মাদনার পরে কবি যে সব স্বদেশী সংগীত রচনা করেন তার বেশির ভাগই কোন না কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে রচিত। তবে এ গানগুলির আবেদন এক্ষেত্রেও সার্বজনীন ও সর্বকালের।

১) এ ভারতে রাখো ১৯০৮

২) ও আমার দেশের মাটি ১৯০৮

৩) জননী তোমার করুণ চরণখানি ১৯০৮

৪) আমরা পথে পথে যাব সারে সারে ১৯০৮

৫) হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে ১৯০৯

৬) জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ১৯১১ ৯

" ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার অপূর্ব সঙ্গীত ও কবিতায় স্বদেশী আন্দোলন কে যে মর্যাদা দিয়াছেন ও উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন বিশ্ব সাহিত্যে তাহার কোন তুলনা আমার জানা নাই " এ মন্তব্য রমেশ চন্দ্র মজুমদারের। প্রত্যক্ষদর্শী যুবা বয়সের এই ঐতিহাসিক স্বদেশী আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথের দেশাত্ম বোধক সঙ্গীত গুলো কি ভাবে দেশবাসীর হৃদ স্পন্দনে সাড়া জাগাত তা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। বঙ্গভূমি যেন দেশ জননীরূপে আবির্ভূতা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছেন কবির চেতনায়।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কবি। তিনি ছিলেন ' রসতীর্থ পথের পথিক '। এই মানুষের স্বদেশ চেতনার একটি বিশেষ দৃষ্টি কোন ছিল। " এক সার্বলৌকিক অখন্ড প্রেম চেতনায় রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ চিন্তা গঠিত। চিন্তা ও অনুভূতির বর্ণাঢ্য তুলিতে কবি দেশজননীর যে হিরন্ময়ী রূপ ধ্যান করেছেন — তার মধ্যে আমরা দেশজননী ও বিশ্বদেবকে পার্বতী পরমেশ্বরের যুগল মূর্তি প্রত্যক্ষ করলাম।" ১০

রবীন্দ্রনাথ যে স্বদেশ মূর্তি প্রত্যক্ষ করলেন —

হে বিশ্বদেব , মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজি কি বেশে
দেখিনু তোমারে পূর্ব গগনে
দেখিনু তোমারে স্বদেশে
হৃদয় খুলিয়া চাহিনু বাহিরে
হেরিনু আজিকে নিমেষে
মিলে গেছ ওগো বিশ্ব দেবতা
মোর সনাতন স্বদেশে । (উৎসর্গ - ১৬)

তাই কবি অনুভব করেন —

ধেনু চরা তোমার মাঠে , পারে যাবার খেয়া ঘাটে
সারাদিন পাখি ডাকা ছায়ায় ঢাকা তোমার পল্লী বাটে
তোমার ধানে ভরা আঙিনাতে জীবনের দিন কাটে
মরি হায় হায় রে —
ওমা আমার যে ভাই তারা সবাই , ওমা তোমার রাখাল
তোমার চাষি ।

কখনও বা জন্মভূমির কোমলরূপে অনুভব করেন রৌদ্র মূর্তি রূপ —

ডান হাতে তোর খড়্গ জলে , বাঁ হাত করে শঙ্কা হরণ ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি , ললাট নেত্র আগুন বরণ ।
তোমার মুক্ত কেশের পুঞ্জ মেঘে লুকায় অশনি ,
তোমার আঁচল ঝলে আকাশতলে রৌদ্র বসনী ।

দেশ জননীর চরণতলে ভক্তি প্রণত চিত্তে কবি প্রণাম করছেন —

ও আমার দেশের মাটি , তোমার পরে ঠেকাই মাথা ।
তোমাতে বিশ্বময়ীর , তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা ।।
তুমি মিলেছ মোর দেহের সনে
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে
তোমার ঐ শ্যামল বরণ কোমল মূর্তি মর্মে গাঁথা ।।

স্বদেশী আন্দোলনে এসেছিল দেশ প্রেমের জোয়ার । সেই প্লাবন বয়ে গিয়েছিল সমগ্র দেশে । কবি গাইলেন —

এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে ' জয় মা' বলে ভাসা তরী ।
ঘাটে বাঁধা দিন গেল রে , মুখ দেখাবি কেমন করে —
ওরে , দে খুলে দে , পাল তুলে দে , যা হয় হবে বাঁচি মরি ।।

স্বদেশী আন্দোলনের ঐক্য মন্ত্রে সবাই এসেছে একই ক্ষেত্রে । বেঁধেছে সবাই পরস্পরকে —

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে
কত দিনের সাধন ফলে মিলেছি আজ দলে দলে —
আজ ঘরের ছেলে সবাই মিলে , দেখা দিয়ে আয়রে মাকে ।

স্বদেশী আন্দোলনের যাত্রা পথ সহজ নয় । ক্ষুর ধার পথে চলতে হবে । দুর্গম পথ । ফিরবার তো উপায় নেই ।

আমাদের যাত্রা হল শুরু , এখন , ওগো কর্ণধার ।
তোমারে করি নমস্কার ।
এখন বাতাস ছুটুক তুফান উঠুক ফিরব না গো আর
আমরা নিয়েছি দাঁড় , তুলেছি পাল , তুমি এখন ধরগো
হাল , ওগো কর্ণধার
মোদের মরণ বাঁচন ঢেউয়ের নাচন , ভাবনা কী বা তার ।

দেশ প্রেমের আহ্বান যখন শুনেছি তখন ভয় কিসের ? বাঙালী তো ভীরু নয় । মৃত্যু চিন্তা তুচ্ছ —

আমি ভয় করব না , ভয় করব না ।
দু বেলা মরার আগে মরব না তাই মরব না । ....
ধর্ম আমার মাথায় রেখে
চলব সিধে রাস্তা দেখে
বিপদ যদি এসে পড়ে , ঘরের কোণে মরব না ।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ব্যাপক প্রবাহ জাতীয় জীবনকে যখন মথিত করেছে এরই মধ্যে জেগে উঠেছে চরম পন্থী আন্দোলন বা বিপ্লবী আন্দোলন । ইংরেজের অত্যাচারে জর্জরিত দেশ । মৃত্যু পাগল দামাল ছেলেরা শিখেছে জীবন বিসর্জণ দিতে দেশহিতে । আত্মত্যাগী-কে কে কবে শাস্তি দিতে পেরেছে ?

" ...... বন্ধন শৃঙ্খল তার
চরণ বন্দনা করি করে নমস্কার —
কারাগার করে অভ্যর্থনা । রুষ্ট রাহু
বিধাতার সূর্য্য পানে বাড়াইয়া বাহু
আপনি বিলুপ্ত হয় মুহূর্তের পরে
ছায়ার মতন । "

" কবি বললেন শাস্তি তারই জন্য যে দুর্বল ভীরু । যে অন্যায়কে কোন দিন অন্যায় বলেনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে । আপনার মনুষ্যত্ব বিধিদত্ত নিত্য অধিকার যে ভয়ে লোভে অস্বীকার করে , দুর্গতির অহংকার করে , দেশের দুর্দশা লয়ে যার ব্যবসায় এবং ' অন্ন যার অকল্যাণ মাতৃরক্ত প্রায় ' শাস্তি তো তারই জন্য —

সেই ভীরু নতশির চির শাস্তি তারে
রাজকারা বাহিরিতে নিত্য কারাগারে ।।

কবি মাভৈঃ মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন ' নমস্কার ' কবিতায় । কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল ' বঙ্গদর্শন ' ভাদ্র , ১৩১৪ এর সংখ্যায় —

দুঃখ কিছু নয় —
ক্ষত মিথ্যা , ক্ষতি মিথ্যা , মিথ্যা সর্বভয় ।
কোথা মিথ্যা রাজা , কোথা রাজদন্ড তার ?
কোথা মৃত্যু অন্যায়ের কোথা অত্যাচার ।
ওরে ভীরু , ওরে মূঢ় , তোলো তোলো শির ।
আমি আছি , তুমি আছ , সত্য আছে স্থির ।

বিপ্লবী পন্থায় রবীন্দ্র দর্শনের প্রেক্ষাপট চিত্রিত করতে গিয়ে গুনময় মান্না বলছেন " কিংসফোর্ড যদি ক্ষুদিরামের দিকে পিস্তল উঁচিয়ে ধরতেন , তাহলে রবীন্দ্রনাথ সেই সাহসী বীরকে বুক পেতে দেবার পরামর্শ দিতেন । — ' লক্ষ পরাণে শংকা না জানে না রাখে কাহারো ঋণ , জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনা হীন , আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারই লাগি তাড়াতাড়ি , উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই , নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই । '

অস্তিত্ব নিঃসঙ্গ একক , শ্রেয়ো দর্শনের আলোকে এবং প্রামাণ্য অস্তিত্ব হয়ে উঠার জন্য তা হয়ে দাঁড়ায় — ' যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে , তোরে আপন জনে ছাড়বে তোরে , তা বলে ভাবনা করা চলবে না ' — এ সব কথা বিপ্লব পন্থীকে উদ্দীপ্ত করে তুলত । বিপ্লবীর পথ কী রকম তার একটা নিখুঁত চিত্রও এঁকে দিয়েছিলেন কবি —

" ঘরে মঙ্গল শঙ্খ নাহি তোর তরে
নাহেরে সন্ধ্যার দীপালোক
নহে প্রেয়সীর অশ্রু চোখ ।
পথে পথে অপেক্ষিছে কাল বৈশাখীর আশীর্বাদ ,
শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ ।
পথে পথে কন্টকের অভ্যর্থনা
পথে পথে গুপ্ত সর্প গূঢ় ফনা ।
নিন্দা দিবে জয় শঙ্খনাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ । " (বলাকা)

"এই রাবীন্দ্রিক আদর্শ , ত্যাগ বলিষ্ঠতা দুঃখবরণ ও আত্মোৎসর্গ যার মূল কথা — তা কিন্তু কেবল বিপ্লববাদীদেরই তা নয় .... যে কোনো শ্রেয়োবাদে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তির পক্ষেও সর্বদা শিরোধার্য্য । " ১১

" পরাধীনতার যন্ত্রনা কবিকে দগ্ধ করেছে , বেদনাহত করেছে নিঃসন্দেহে , কিন্তু সেই বেদনা যখন সাহিত্যে রূপ নিয়েছে তখন তা সাময়িক ঘটনা প্রবাহের সংকীর্ণ গন্ডি থেকে মুক্ত , চিরকালের পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত মানবাত্মার বেদনা । ..... রাজনীতিতে তিনি ছিলেন দ্রষ্টা এবং ঋষি । সর্বপ্রকার বন্ধন মুক্তির কথা যেমন তাঁর কাব্যে গানে নাটকে প্রবন্ধে সর্বত্রই ধরা পড়েছে , দেশ প্রেমেও

সেই বন্ধন মুক্তির আনন্দ ঘোষিত। শুধু পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্তি নয়, আচার বিচারের মরুবালুরাশি থেকে মানবাত্মার জয়গান তার স্বদেশ সংগীতের অন্যতম কথা।" ১২

বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলন আর রবীন্দ্রনাথ যেন এক অন্যের পরিপূরক। এই যুগসন্ধিক্ষণের আন্দোলনে তাঁর অসামান্য প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে অমলেশ ত্রিপাঠী বলছেন " এই নতুন জাতীয়তাবাদী ভাব প্রবাহের কবির ভূমিকা নিলেন রবীন্দ্রনাথ। যে দেশ এবং জাতিকে দ্বিখণ্ডিত করা হচ্ছে তার আশ্চর্য্য সুন্দর মহিময় রূপ উদঘাটন করে তিনি উদ্দীপিত করলেন বঙ্গ বিরোধী আন্দোলন। তাঁর স্বদেশ বন্দনার গান এবং কবিতার প্রতিটি ছত্রে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল স্মৃতি মুখরিত, আবেগ তপ্ত, তীব্র এক ভালবাসা যা দেশ মাতৃকার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সর্বস্ব ত্যাগের আহ্বান পৌঁছে দিল প্রতিটি বাঙালীর হৃদয়ে। একজন বিদেশী শ্রমিক নেতা র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড, এই সময়কার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে 'ডেইলি ক্রনিকল' পত্রিকায় লিখেছিলেন — কি ভাবে দেশ বন্দনা ও মাতৃ পূজার মধ্য দিয়ে বাংলা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করেছে। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীতগুলির কথা যার সুর, তিনি লিখেছিলেন, —'আমাদের অজানা, যার সঙ্গে আমাদের গানের কোনও মিল নেই, তবুও সেগুলি, সারাদিন অনুক্ষণ আমাদের কানে অনুরণিত হতে থাকে।' ১৩ এজরা পাউন্ডের মন্তব্য অনুসারে " গান গেয়েই ঠাকুর বাঙালীদের মহাজাতিতে পরিণত করলেন।"

।। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ।। (১৮৬৩ - ১৯১৩)

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্বদেশী যুগে বলিষ্ঠ কবি। কবি লালিত হয়েছিলেন পিতা কার্ত্তিকেয় চন্দ্রের সংগীত সাধনার জগতে। বারো হতে সতের বয়স পর্য্যন্ত তিনি যে

গানগুলো রচনা করেছিলেন সে গুলি 'আর্য্যগাথা' (১ম ভাগ)'এ সংকলিত হয়। আর্য্যগাথার প্রকাশ ১৮৮২ সালে। পরাধীন ভারতে কবির হৃদয় দেশ প্রেমের চেতনায় উদ্বেল। আর্য্যগাথা কোন প্রেম সঙ্গীতের সংকলন নয়। কবি নিজেই বলছেন, যতদিন ভারতের দুঃখদৈন্য ও হীনতা দূর না হয় ততদিন ভারতবাসীর মুখে প্রেম-সঙ্গীত মানায় না। তিনি গাইছেন "রেখে দেও রেখে দেও প্রেমগীত স্বরে কেন ও কুহক আর ভারত ভিতর রে।" এই একটি ভাবনায় কবি দেশ ধর্মকে কি ভাবে হৃদয়ে সন্নিবেশ ঘটিয়েছিলেন তা সহজেই বোঝা যায়। 'আর্যগাথা' গ্রন্থের ভূমিকায় কবি লিখছেন "যাঁহারা এক মাত্র মনুষ্য-প্রেমগীতকেই গীত মনে করেন 'আর্যগাথা' তাঁহাদিগের জন্য রচিত হয় নাই এবং তাঁহাদের আদর প্রত্যাশা করে না। .... যদি কাহারও অধঃপতিত হতভাগিনী দুঃখিনী মাতৃভূমির নিমিত্ত নেত্র প্রান্ত কখন সিক্ত হইয়া থাকে 'আর্যগাথা' তাঁহারই আদর চাহে। আদর পায়, আবার নূতন গীত শুনাইবে।" ১৪

'আর্যগাথা'র উদ্বোধন শীর্ষক সঙ্গীতে কবি গাইলেন —

গাইব প্রমত্ত হয়ে আইস সঙ্গীত মোর
ঘুমায়েছে আর্য্য জাতি ভাঙ্গিব সে ঘুম ঘোর।
জাতীয় অমৃত গানে ঢালিব আর্যের কানে
উঠিবে অর্বুদ প্রাণ ঘোর নিদ্রা পরিহরি

'স্বদেশ স্তোত্র' কবিতায় কবি গাইলেন —

'স্বদেশ আমার? নাহি করি দরশন
তোমা সম রম্য ভূমি নয়ন রঞ্জন।'

তাঁর উদ্বেলিত হৃদয় কিশোর অভিমান সুলভ দেশভক্তির গানে তদানীন্তন বাংলার মানুষ অভিভূত হয়েগেছিল। 'বীনা বাজিবে কি আর', 'কাঁদিবে কি স্নেহময়ী', 'জানি না জননী কেন', 'জন্মভূমি কেন মা তোমারি', 'ভারত মাতা', 'জ্বালাও ভারত', 'চাহি অতৃপ্ত নয়নে তোর মুখ পানে' ইত্যাদি কবিতায় স্বদেশানুরাগের ভাবে বিহ্বল।

" কি দুখে কহ গো মাত সহ এত অপমান
দেখিয়ে তোমার দুখ, কাঁদে যে আমার প্রাণ। "

" জ্বালায় ভারত হৃদে উৎসাহ অনল
ফেলিবে না শোকে আর নয়নের জল। "

" যে স্থানে আজ কর বিচরণ
পবিত্র সে দেশ পুন্যময় স্থান
ছিল এ একদা দেবলীলা ভূমি
করোনা করোনা তার অপমান। "

" আজ আয় আয় ভাই সব মিলে
সাধিতে স্বদেশ হিত আয়রে সকলে। "

" আয় ভারত সন্তান হয়ে এক প্রাণ
কত আর দুখে একা গাবি ভাই দুখ গান। "

" কাঁদরে কাঁদরে আর্য কাঁদ অবিরল
শুকাবে জীবন নদী, শুকাবে না আঁখিজল। "

" সেই আনন্দ সেই প্রীতি
আসে সেই সুখ স্মৃতি ,
করিতেছে উপহাস দুখ আর্য্য অভাগায়
লয়ে যাও লয়ে যাও
সাগরে ডুবায়ে দেও
হা সজ্যোতি স্বাধীনতা — হা তামস কারাগার
কোন সে স্বর্গীয় দশ্য দেখাওরে আরবার । "

কবিতাগুলি সুর আরোপিত নয় । এই সব কবিতায় পরাধীন জন্মভূমির দুঃখ দুর্দশায় আছে গ্লানি বোধ । হৃদয়ের অন্তর্নিহিত বেদনায় স্বদেশ ভক্তি প্রাঞ্জল হয়ে পরিস্ফুট হয়েছে ।

১৯০৫ এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তীব্র হলো । দ্বিজেন্দ্রলালের দেশ ভাবনা আরও প্রদীপ্ত হলো এই যুগে । " রাজসেবা যখন ছিল অধিকাংশ বাঙালীর ধর্ম , রাজ - রোষকে উপেক্ষা করে হাকিমি পদে অধিষ্ঠিত থেকেও তিনি উদাত্ত কন্ঠে বাঙালিকে উজ্জীবন মন্ত্র শুনিয়েছিলেন । " ১৫ কবি বিলেতে গিয়েছিলেন সংস্কার মুক্ত মন নিয়ে । তিনি ভারত ও ইংল্যান্ডকে দেখেছেন । ভারতবর্ষ ছিল তাঁর অন্তরের সাধনার পীঠস্থান । ইংল্যান্ডেও নিজের দেশের কথা চিন্তা করে বলছেন "O dear Bharat!— my beautiful maiden, O Sweet Ind ? Once the queen of the world"

" আর্য্যগাথায় পুষ্পরাজি পূর্ণ বনস্থলিতে এক বিরহী কোকিল অশান্ত কুহু - ধ্বনির মধ্য দিয়ে যেন ব্যাকুল ভাবে তার প্রিয়াকে আহ্বান করে চলেছে । প্রণয়ের বিচিত্র পুষ্প অর্ঘ্য তারই উদ্দেশে তিনি একটির পর একটি গানে নিবেদন করে চলেছেন । " ১৬ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় সেই প্রিয়ার বেদনা মথিত অঙ্গ বিচ্ছেদে

কবি যেন প্রচন্ড উদ্বেল হয়ে উঠলেন । কখনও সেই প্রিয়ার অপূর্ব রূপবর্ণনায় , কখনও জাতিকে গর্জে উঠার আহ্বান জনিত আচরণে , কখনও বা যুদ্ধং দেহি সমর সঙ্গীত রচনার মানসিকতায় । দেশ প্রেমের প্রগাঢ় বলিষ্ঠতা তাঁর চরিত্রে এত দৃঢ় ছিল যে তাৎক্ষনিক অনুরোধে অনায়াস কাব্য রচনার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ ।

দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনী রচয়িতা দেবকুমার চৌধুরী লিখছেন , " সেদিন ১৬ই অক্টোবার , ৩০শে আশ্বিন , বাঙালীর সেই চিরস্মরণীয় অরন্ধন ও রাখী বন্ধনের পুণ্যাহ । সকাল বেলায় সাড়ে নটা কি দশটা বাজিয়াছে , এমন সময় কুন্তলীনের হেম মোহন বাবু (এইচ বোস) মহাশয় হঠাৎ দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে আসিয়া বলিলেন ' আজ সকালে গোলদীঘিতে একটা প্রকান্ড সভা হবে । সেখানকার জন্য একটা গান লিখে দিন । এখনি চাই । ছাপতে হবে । ' বসু মহাশয়কে বিদায় দিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল তদদন্ডেই আমার সম্মুখে বসিয়া অনধিক দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে একটি আশ্চর্য্য রকমের উৎকৃষ্ট অগ্নিগর্ভ গান যেন খেলার ছলে রচনা করিয়া ফেলিলেন । " ১৭

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে দ্বিজেন্দ্রলালের যে সকল গান দেশবাসীকে স্বদেশ - ভক্তিতে অনুপ্রাণিত করেছিল নিম্নের গানগুলি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ।

১ । বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ

২ । ওরে আমার সাধের বীনা

৩ । যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ

৪ । ভারত আমার ভারত আমার যেখানে মানব মেলিল নেত্র

৫ । একবার গাল ভরা মা ডাকে

৬ । বাজ ভেরী আজ উচ্চ নিনাদে উড়ুক পতাকা মৃত্যু আঁকা

৭ । তুমি তো মা সেই , তুমি তো মা সেই , চির গরীয়সী ধন্য অয়ি মা

৮ । আনন্দময়ী বসুন্ধরা , চির অভিরামা তরুণী শ্যামা

৯ । আজি গো তোমার চরণে জননী আনিয়া অর্ঘ করি মা দান

১০ । মেবার পাহাড় মেবার পাহাড় যুঝেছিল যেথা প্রতাপ বীর

১১ । জাগো জাগো পুরনারী , জিনিয়া সমর আসিছে অমর

১২ । ভেঙে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর , ছিঁড়ে গেছে মোর বীনার তার

১৩ । যেথা গিয়েছেন তিনি সমরে , আনিতে গৌরব জয়জিনি

১৪ । ধন ধান্যে পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা

১৫ । কিসের শোক করিস রে ভাই , আবার তোরা মানুষ হ

১৬ । ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রে গাও উচ্চে রণজয় গাথা

স্বদেশী আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন । স্বদেশী আন্দোলনের শোভাযাত্রায় প্রাণের আবেগে তিনি স্বরচিত স্বদেশী সংগীত গাইতেন । রাখী বন্ধনের দিন বিকেলের জনসভায় তিনি যোগ দিয়েছিলেন । রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ঐ সভায় 'স্বদেশী' ব্রতের সংকল্প গ্রহণ করা হয় । তিনি এই প্রসঙ্গে তাঁর বন্ধুকে লিখছেন " আজ নবজীবনের উন্মাদনায় আমরা আত্মহারা ও তন্ময় হইয়া গিয়াছি । বাংলার জীবনে আজ একি অপূর্ব অমৃতের আস্বাদ । যাহা স্বপ্নের অগোচর , কল্পনার অতীত ছিল , আজ সেই বিচিত্র স্বর্গীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া জীবন আমার ধন্য , সার্থক হইল । প্রাণ আমার স্নিগ্ধ শীতল হইয়া জুড়াইয়া গেল । " ১৮

স্বদেশী আন্দোলনে দেশ জেগে উঠেছে দেখে দ্বিজেন্দ্রলাল যথেষ্ট উদ্দীপিত

হয়েছিলেন । কিন্তু স্বদেশ প্রেম যাতে মানুষের মনে অন্তঃসার শূন্য বুলিতে পরিণত না হয় , সে বিষয়ে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে তিনি বলেছিলেন " স্বাভাবিক মনের আবেগে যদি আমার মাকে ' মা ' বলিয়া পূজা না করি , যদি পরের দ্বারা আহুত না হইলে আমরা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া মাকে মর্য্যাদা দিতে না চাই , যদি অকৃত্রিম ভক্তি ও ভালবাসার টানেই মার দৈন্য ক্লেশ দূর করিতে না পারি , তবে তো ভয় হয় — বুঝিবা আমাদের পূজা আন্তরিক নহে । " ১৯

একবার বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা পড়ে অত্যন্ত মোহিত হয়েছিলেন । তাঁর কন্ঠে তাঁরই রচিত ' মেবার পাহাড় ' গান শুনে বলেছিলেন " আপনার এই গানে আমরা কবিত্ব উপভোগ করতে পারি , কিন্তু যদি মেবারের লোক হতেম তাহলে আমার প্রাণ দিয়ে আগুন ছুটিত । তাই আপনাকে অনুরোধ করি , আপনি এমন একটি গান লিখুন যাতে বাংলার বিষয় ও ঘটনা — বাঙালীর বিষয় ও ঘটনা থাকে । " জগদীশ চন্দ্রের অনুরোধে দ্বিজেন্দ্র লাল রচনা করলেন তাঁর বিখ্যাত মাতৃ বন্দনার মহান সঙ্গীত ' আমার দেশ ' ।

বঙ্গ আমার , জননী আমার , ধাত্রি আমার , আমার দেশ
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন , কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ ।

কেন গো মা তোর ধুলায় আসন কেন গো মা তোর মলিন বেশ
সপ্ত কোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে আমার দেশ ।

কিসের দুঃখ , কিসের দৈন্য , কিসের লজ্জা , কিসের ক্লেশ
সপ্ত কোটি মিলিত কন্ঠে ডাকে যখন আমার দেশ ।

আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য , মানুষ আমরা নহি তো মেষ
দেবি আমার , সাধনা আমার , স্বর্গ আমার , আমার দেশ । "

কবি নিজেও এই গান গাইতেন প্রাণ দিয়ে । একবার লোকেন্দ্র পালিত দ্বিজেন্দ্র লালের মুখে এই গান শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায় । তিনি কবির হাত ধরে বললেন ' আহা কি অপূর্ব , কি সুন্দর , ভাই দ্বিজু আমি আজ পর্যন্ত জীবনে যত জাতীয় সঙ্গীত শুনেছি এটি তার মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম ও মহত্তম । '

দ্বিজেন্দ্র লালের মন ভারতের গৌরব স্মৃতি অনুধ্যানে মগ্ন । ' একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয় ' অথবা ' আর্য্য ঋষির অনাদি গভীর উঠিল যেখানে বেদের স্তোত্রসত্র ' অথবা ' সদ্য স্নান সিক্ত বসনা চিকুর সিন্ধু শীকর লিপ্ত ' কিম্বা ' এখন তোমার গগন সুনীল উজল তপন তারক চন্দ্র ' প্রভৃতি অংশ শৌর্য্য বীর্য মণ্ডিত ভারতবর্ষের ধ্যান মগ্ন রূপটি কবির চিত্তে একান্ত প্রত্যাশা জাগায় —

" চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই মহা আদর্শ
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে , রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ । "

তাঁর ভারত বন্দনা মূলক কবিতাগুলি ভাবনায় ও ছন্দে সুললিত —

" যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী , ভারতবর্ষ
উঠিল বিশ্বে সেকি কলরব , সেকি মা ভক্তি সেকি মা হর্ষ
সেদিন তোমার প্রভায় ধরায় প্রভাত হইল গভীর রাত্রি
বন্দিল সবে জয় মা জননী , জগত্তারিনি , জগদ্ধাত্রি
ধন্য হইল ধরনী তোমার চরণ কমল করিয়া স্পর্শ
গাইল জয় মা জগন্মোহিনী , জগজ্জননি , ভারতবর্ষ । "

অন্যত্র —

' ভারত আমার , ভারত আমার , কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী ,
কর্ম জ্ঞানের তুমি মা জননী , ধর্ম ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী । '

স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীকে উদ্দেশ্য করে লিখলেন —

" তুমি তো মা সেই তুমি ত মা সেই চির গরীয়সী ধন্যা অয়ি মা ,
আমরা শুধুই হয়েছি মা হীন , হারায়েছি সব বিভব গরিমা
তুমি ত মা আছ তেমতি উচ্চ , আমরা শুধুই হয়েছি তুচ্ছ ,
তোমারি অঙ্কে লভিয়া জনম , জানিনা কিপাপে এ তাপ সহিমা । "

কল্যাণময়ী ভারতের স্বরূপ বানী বিধৃত কবি সেই যুগে যে গান গাইলেন দীর্ঘ কাল অতিক্রম আজও জাতীয় জীবনে সেই সঙ্গীত স্বদেশ ভাবনার সুর তুলে চলে আপনার নির্মোহ গতিতে —

" ধন ধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা
ওসে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ , স্মৃতি দিয়ে ঘেরা
এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে নাক তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি । "

দ্বিজেন্দ্রলালের সংগীত গুলো রোম্যান্টিক ধর্মী । স্বদেশ যাঁর চিন্তনে , স্বদেশ যাঁর মননে , স্বদেশ যাঁর স্বপনে তিনি তো রোম্যান্টিক হবেনই । ভাবনা তাঁর দেশাত্মবোধ সম্পন্ন উদ্বেলিত হৃদয়কে বহু জায়গায় যেন ছাড়িয়ে গেছে ।

' পর্বতে প্রান্তরে নগরে গ্রামে
জাগ্রত ভারত ব্রহ্মের নামে
পুন্যে বীর্যে অভয়ে অমৃতে , হইবে পলকে সজ্জিত হে । '

কিংবা —

" ধূলি শয্যা ছাড়ি ওঠো ওঠো সব
মানবের সাথে যোগ দিতে হবে
তা যদি না পারো চেয়ে দেখো তবে
ওই আসে রসাতল ভাই
আগে চল আগে চল ভাই । "

কবি গভীর ভাবে আকাঙ্খা করছেন —

' হে ভারত চির দুঃখ শয়ন বিলীনা
নীতি ধর্মময় দীপন মন্ত্রে
জীবিত কর সঞ্জীবন মন্ত্রে
জাগিবে রাতুল চরণ তলে
যত লুপ্ত পুরাতন গরিমা । '

তাঁর গানে ছন্দ লালিত্য ছিল অপূর্ব —

' তুষার হীরক মুকুট পরা
জলধি নীলে বক্ষো নিমগ্না সূর্য্যোমাতা বন্দে ।

' প্রভাতে অরুণ ছটা সায়াহ্নে অম্বরে
সুরঞ্জিত মেঘমালা শান্ত রবি করে
নিশীথে সুধাংশুকর তারামাখা নীলাম্বর
কে ভুলিবে কে ভুলিবে থাকিতে জীবন । '

' উপরে পবন প্রবল স্বননে
শূন্যে গরজে অবিশ্রান্ত
লুটায়ে পড়েছে পিক কলরব
চুম্বি তোমার চরণ প্রান্তে । '

" দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী সংগীতের বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে সমকালীন জাতীয় চেতনার ভাবধারায় । এ যুগে কবি , শিল্পী, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক সকলেই স্বাজাত্যবোধের দ্বারা গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন । উনিশ শতকের নবজাগৃতির প্রবাহে দ্বিজেন্দ্রলাল পূর্ণরূপেই স্নাত ছিলেন । এই সব গানগুলির অন্তর্লীন আবেদন আজো আমাদের নাড়া দেয় । .... দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গানের সাহিত্য মূল্য নিরূপনে এ কথা বলতেই হয় প্রধানত অতীত ভারতের গৌরব গাথার বর্ণনায় কবি-ভাবনা সীমাবদ্ধ । তবে স্বদেশী গানের যথার্থ মূল্যায়ন নির্ভর করছে কথা ও সুরের যুগপৎ মিলনে । কেননা দেশ প্রেমের উদাত্ত আহ্বান সুরের ছন্দে মানব চিত্তে গভীর প্রভাব বিস্তার করে । শুধু কাব্যের বিচারে এই সব সঙ্গীতের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুভব হয় না । বঙ্গবাসী একদা এইসব গান কন্ঠে তুলে নিয়েছিল , সুরের উদ্দীপনা মূলক আবেদনের জন্যই । " ২০

দেশাত্ম বোধক গান রচনায় ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল বিদেশী সুর গ্রহণ করেছিলেন Military Marching বা যাকে সমর সঙ্গীত বলা হয় । দেশ প্রেমের

উম্মাদনায় দেশভক্ত সন্তানদের দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলার গান। বীরত্বের ভাব এই গানে তীব্র —

ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রে, গাও উচ্চে রণজয়গাথা
রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্মে, শোন ঐ ডাকে ভারত মাতা।
সাজ সাজ সকলে রণ সাজে শুন ঘনঘন রণ ভেরী বাজে
চল সমরে দিব জীবন ঢালি, জয় মা ভারত জয় মা কালী।
সাজে শয়ন কি হীন বিলাসে, শত্রু বিদগ্ধ যখন পুরবল্লী
অরাতি চরণ বিচিহ্নিত বক্ষে, সাজে প্রেয়সীর ভুজবল্লী
কোষ নিবদ্ধ করে তরবারী, যখন বিলাঞ্ছিত ভারত নারী!

দ্বিজেন্দ্রলালের দেশ প্রেমমূলক গানে একদিন বাংলা দেশের মানুষ উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। পরাধীনা দেশমাতৃকার বেদনায় আহত সন্তানের বেদনা যেমন তাঁর গানে প্রকাশিত হয়েছে তেমনি ভাবে ভারতবর্ষের আচার বিচারের সংকীর্ণতায় ধর্মান্ধতায় লুপ্ত গরিমার শৌর্য্য প্রকাশ করে মানুষের হারিয়ে যাওয়ার আত্মার শক্তি ভারতবর্ষের সৌভাগ্য আকাশে পুন প্রদীপ্ত সূর্য্যের মতো প্রোজ্বল করার তীব্র আকুতিতে লীন হয়ে গেছে তাঁর স্বদেশী গান। একদিকে যেমন স্বদেশ প্রেম জাগ্রত করেছেন অন্যদিকে ভারতবর্ষের মানুষের মনের সঙ্কীর্ণতা, কু- সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ, দেশ প্রেমের নামে ভন্ডামি, নবযুগের বিলাসের প্রতি অকারণ মোহ কবির অন্তরকে ব্যথিত করেছে। এই বেদনাবোধ হতেই জন্ম নিয়েছে কবির হাসির গান। বাংলার মানুষ তাঁর হাসির গানে চমৎকৃত হয়েছে, কখন রসের সাগরে সিনান করেছে, কখনও বা তীব্র কশাঘাতে হয়েছে জর্জরিত। কল্কি অবতারে কবি বলছেন —

" ছেড়ে দলাদলি কর গলাগলি
ছেড়ে রেশারেশি কর মেশামেশি
ছেড়ে ঢাকাঢাকি কর মাখামাখি
আর সবাইকে বল বা
নইলে জীবনটা কিছুই না ।"

কবির বোধহয় এই ছিল জীবনাদর্শ । হাস্যরসের আড়ালে ভণ্ডামিকে প্রকাশিত করে দেশকে গড়তে চেয়েছিলেন । রবীন্দ্রনাথ বলছেন " সাময়িক পত্রে মধ্যে মধ্যে আষাঢ়ে রচয়িতার এমন সকল কবিতা বাহির হইয়াছে , যাহাতে হাস্য এবং অশ্রু রেখা , কৌতুক এবং কল্পনা , উপরিতলের ফেনপুঞ্জ এবং নিম্নতলের গভীরতা একত্র প্রকাশ পাইয়াছে । তাহাই তাঁহার কবিত্বের যথার্থ পরিচয় । তিনি যে সকল বাঙালীকে হাসাইবার জন্য আসেন নাই সেই সঙ্গে তাহাদিগকে যে ভাবাইবেন এবং মাতাইবেন এমন আশ্বাস দিয়াছেন । " ২১

' আমরা বিলাত ফেরৎ ক-ভাই ' , ' নতুন কিছু করো একটা , নতুন কিছু করো ' , ' কটি নরকুল কামিনী ' , ' চম্পটির দল আমরা সবে ' প্রভৃতি গানে সমাজ হয়েছে কশাঘাতে জর্জরিত । নন্দলালের মত স্বদেশ প্রেমিক (?) দেশের কুলাঙ্গার সে কথা তিনি বোঝাতে ভুলেননি ।

কবির আন্দোলনে যোগদান বা ইংরাজ শাসন ব্যবস্থার সমালোচনা স্বাভাবিক ভাবেই রাজপুরুষেরা পছন্দ করেন নি । তাঁকে প্রায় শাস্তি স্বরূপ বদলি করা হতো । তিনি নিজেই লিখছেন " ক্রমাগত transfer (বদলি) আমাকে যথার্থই যেন অস্থির করে তুলেছে । এত বদলি করছে কেন জান ? আমার বিশ্বাস স্বদেশী

আন্দোলনে যোগদান , আর ঐ প্রতাপ সিংহ নাটকই তার মূল । কিন্তু কি বুদ্ধি , এমনি একটু হয়রান করলেই বুঝি আমি অমনি আমার সব মত ও বিশ্বাস কে বর্জন করব ? " ২২

রবীন্দ্রগীতির প্লাবনে বাংলা যখন প্লাবিত তখনই দ্বিজেন্দ্রলাল নিজের প্রতিভায় গানে বাংলাকে মাতিয়ে রেখেছিলেন । ' সাহিত্য ' সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বলছেন , " দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু কবি নন , হাস্যরস সমুজ্জল মধুর গানের রচয়িতা নন , তিনি আমাদের জাতীয়তার পুরোহিত । তিনি বাঙালীর পথ পদর্শক । তিনি স্বদেশী তন্ত্রের কবি । তিনি একনিষ্ঠ ভগীরথের মত বাঙালীর হিমাচলে অধিষ্ঠিত দেশাত্মবোধ - মহাদেবের জটাজট হইতে দেশভক্তি ভাগীরথীর পবিত্র প্রবাহ আনিয়া কোটি কোটি ভারত সন্তানের জীবন মুক্তির সাধন করিয়া দিয়াছেন । এ ঋন জাতি কি কখনও শোধ করিতে পারে । "

!! রজনী কান্ত সেন !! (১৮৬৫ - ১৯১০)

স্বদেশী আন্দোলনের ভাবনাদর্শকে একটি মাত্র গানেই যিনি বাংলার হিয়াকে মথিত করেছিলেন তিনি রজনী কান্ত সেন ।

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই
দীন - দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই ।
ঐ মোটা সুতোর সঙ্গে , মায়ের
অপার স্নেহ দেখতে পাই

আমরা এমনি পাষাণ তাই ফেলে ঐ
পরের দ্বারে ভিক্ষা চাই।

রজনী কান্তের এই গান যেন দেশবাসীর 'সঙ্কল্প'। সেই সঙ্কল্পই যেন দেশবাসী করছে —

" আয় রে আমরা মায়ের নামে
এই প্রতিজ্ঞা করব ভাই
পরের জিনিস কিনব না, যদি
মায়ের ঘরের জিনিস পাই।"

স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ তখন ছড়িয়ে পড়েছে। গানটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই বাংলার হৃদয় জয় করে নিল। ভারতবর্ষ পত্রিকার সম্পাদক জলধর সেন এই গানটি রচনার পরিবেশ ব্যাখ্যা করে বলছেন — 'একদিন মধ্যাহ্নে একটার সময় আমি 'বসুমতী' অফিসে বসিয়া আছি, এমন সময় রজনী এবং রাজশাহীর খ্যাতনামা আমার পরম শ্রদ্ধেয় হরকুমার সরকার মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান অক্ষয় কুমার সরকার অফিসে আসিয়া উপস্থিত। রজনী সেই দিনই দার্জিলিং মেলে বেলা এগারটার সময় কলিকাতায় পৌঁছিয়া অক্ষয় কুমারের মেসে উঠিয়াছিল। মেসের ছেলেরা তখন তাঁহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে, একটা গান বাঁধিয়া দিতে হইবে। গানের নামে রজনী পাগল। তখনই গান লিখিতে বসিয়াছে। গানের একটা অন্তরা লিখিয়াই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। সকলেই গানের জন্য উৎসুক। সে বলিল, এই তো গান হইয়াছে, চল জনদার ওখানে যাই। একদিকে গান কম্পোজ হউক, আর একদিকে লেখা হউক। .... সত্য সত্যই কম্পোজ আরম্ভ করিতে না করিতেই গান শেষ হইয়া গেল। আমরা দুজনে তখন সুর দিলাম। গান ছাপা আরম্ভ হইল। .... সন্ধ্যার সময় আমি সুকবি শ্রীযুত প্রমথ নাথ রায়চৌধুরী মহাশয়ের বিডন স্ট্রীটের বাড়ীর ওপরের বারান্দায় প্রমথবাবু ও আরও কয়েকজন বন্ধুর সহিত

উপবিষ্ট আছি এমন সময় দূরে গানের শব্দ শুনিতে পাইলাম । গানের দল ক্রমে নিকটবর্তী হইল । তখন আমরা শুনিলাম , ছেলেরা গাইতেছে ' মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই ' । এই রজনী কান্তের সেই গান — আমি যাহা কয়েক ঘন্টা আগে ছাপিয়া দিয়াছিলাম । গান শুনিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিয়াছিল । তাহার পর ঘাটে , মাঠে , পথে , নৌকায় দেশ বিদেশে কতজনের মুখে শুনিয়াছি ' মায়ের দেওয়া..... ' । " ২৩

প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুরেশ চন্দ্র সমাজপতির ভাষায় " কান্তকবির 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' নামক প্রাণপূর্ণ স্বদেশী সঙ্গীত সাহিত্যের ভালে পবিত্র তিলকের ন্যায় চিরদিন বিরাজ করিবে । বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত এই গান গীত হইয়াছে । ইহা সফল গান । যে সকল গান ক্ষুদ্র প্রাণ প্রজাতির ন্যায় কিয়ৎকাল ফুল - বাগানে প্রাতঃসূর্য্যের মৃদু কিরণ উপভোগ করিয়া মধ্যাহ্নে পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া যায় , ইহা সে শ্রেণীর অন্তর্গত নহে । যে গান দেব বাণীর ন্যায় আদেশ করে এবং ভবিষ্যৎ বাণীর মত সফল হয় , ইহা সেই শ্রেণীর গান । ইহাতে মিনতির অশ্রু আছে — নিয়তির বিধান আছে । সে অশ্রু পুরুষের অশ্রু — বিলাসিনীর নহে । সে আদেশ যাহার কর্ণ গোচর হইয়াছে , তাহাকেই পাগল হইতে হইয়াছে । স্বদেশী যুগের বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের ' আমার দেশ ' ভিন্ন আর কোন গান ব্যাপ্ত , সৌভাগ্য ও সফলতার এমন চরিতার্থ হয় নাই , তাহা আমরা মুক্ত কন্ঠে নির্দেশ করি । " ২৪

কবি নিজেই বলছেন " আমি ' মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ের ' কবি বলে তারা আমাকে ভালবাসে । " ১৯০৫ এর স্বদেশী আন্দোলনে এই গানটির বিপুল সমাদর দেখে মনে হয়েছিল এই গান যেন জাতীয় মন্ত্র , স্বাদেশীকতার সঙ্কল্প বাক্য রূপে চিহ্নিত হয়েছিল ।

জন্ম ১৮৬৫ তে। মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সেই কবির তিরোধান। পিতা গুরুপ্রসাদ ছিলেন কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ। বাড়ীর পরিবেশ ছিল সঙ্গীতময় গীতি ছন্দের সুললিত সুরের পৌরাণিক পরিমন্ডলে ঢাকা। রজনী কান্তের দেশ প্রেমের চেতনা বঙ্গভঙ্গীয় যুগ চেতনার অভিব্যক্তির সাথে সমাহিত। যুগটাই ছিল সাহিত্য প্রবন ব্যক্তিদের স্বাদেশিক মন্ত্র উজ্জীবিত জন্মভূমির গৌরব গাথা উদ্গাতার যুগ। ভারতবর্ষের অতীত স্মৃতি চারণা ও গৌরব গানে কবি অন্তর অভিষিক্ত। পরাধীন জাতি দেশের সত্যকার পরিচয় দিতে তিনি আগ্রহী।

'পর পদতল — লেহন পটু স্বজন বন্ধু যারা
দৈন্য দুঃখ আনিল গৃহে এমন লক্ষ্মী ছাড়া।'

এই বিষাদ গ্রস্ততা তাকে চিরকাল স্বাজাত্য বোধের অভিমানে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। কবির এই অভিমান পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর কবিতা - গানে —

'ধূর্জটি বাঞ্ছিত হিমাদ্রী মন্ডিত, সিন্ধু গোদাবরী মাল্য বিলম্বিত
অলিকুল গুঞ্জিত সরসিজ সিঞ্চিত। (বানী, ভারতভূমি)

'পীযুষ সিঞ্চিত, সমীর চঞ্চল, কাঞ্চল অঞ্চল দোলেরে
সংশয় নিরসন, ধী স্মৃতি বিতরণ, চরণে জনমন ভোলেরে'

'জয় জয় জন্মভূমি জননী,
যার স্তন্য সুধাময় শোণিত ধমনী
কীর্তি গীত, স্তম্ভিত, অবনত
মুগ্ধ লুব্ধ এই সুবিপুল ধরণী'
(বানী, জন্মভূমি)

' দক্ষিণে সুবিশাল জলধি , চুম্বে চরণতল নিরবধি
মধ্যে পূত জাহ্নবী জলধৌত শ্যামল ক্ষেত্র সংঘ । '

(বানী , বঙ্গমাতা)

' হে ভারত চির দুঃখ শয়ন বিলীনা
নীতি ধর্মময় দীপক মন্ত্রে
জীবিত কর সঞ্জীবনী মন্ত্রে
জাগিবে রাতুল চরণতলে , যত পুরাতন লুপ্ত গরিমা । '

(বানী , উদ্বোধন)

' ওই নীল সিন্ধু জল চির গর্বিত চঞ্চল
তীব্র আবেগে করিছে প্রহত , বধির দুয়ার তোর
বলে জাগ জাগ নতুবা ডুবে যা , অতল গর্ভে মোর

(শেষদান , উত্তিষ্ঠত)

' লক্ষ পুরাতন - সন্ধি সমর - ইতিহাস - বিমিশ্রিত এ বিপুল নীর
দীনে দান কত করিনু অকাতরে , সম্পদ লয়ে গর্বিত নৃপতির । '

(বানী , সিন্ধু সঙ্গীত)

কান্তকবি দেশপ্রেমের আবেগ বড় সহজ । বড় সাবলীল । তাঁর জীবন যাত্রার মতো চির সহজ সরল তাঁর দেশ প্রেম । চির গরীয়সী জন্মভূমি গৌরব গাথায় তাঁর হৃদয় পরিপূর্ণ । কিছু গান স্বদেশী ইতিহাসে স্মরণীয় তাঁর আবেগ ধর্মী সারল্য বোধের জন্য ।

' আমরা নেহাৎ গরীব আমরা নেহাৎ ছোট
তবু আজি সাত কোটি ভাই জেগে ওঠো ।

(বানী , আমরা)

' তাই ভালো মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত
মায়ের ঘরের ঘি - সৈন্ধব , মোর বাগানের কলার পাত । '
(বানী , তাই ভালো)

' আয় ছুটে ভাই হিন্দু মুসলমান
ওই দেখ মার ঝরছে দু নয়ান । '
(বানী , মিলন)

কবি বহুদিন থেকেই জাতীয়তাবাদের গান গেয়ে আসছিলেন । যখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হলো দেশবাসীর মনে ভয়ের ভাবকে দূরীভূত করার জন্য তিনি গাইলেন —

' আর কিসের শঙ্কা , বাজাও ডঙ্কা
প্রেমের গঙ্গা বোক ,
মায়েরি রাজ্যে মায়েরি কার্য্যে
ফুটেছে আজ যে চোখ । '

বঙ্গভঙ্গ কালীন সময়ে ইংরেজ সরকার বাংলার নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদকে কন্ঠ রোধ করতে চেয়েছিলেন । ' বন্দেমাতরম ' বলা হলো নিষিদ্ধ । এই ঘোষণা করা আইনত অপরাধ । সুরেন্দ্র নাথ সময়টির পরিবেশ তুলে ধরেছেন সুন্দর ভাবে ।

"The months followed the 16th October, 1905, were months of great excitement and unrest. The policy of the government especially that of East Bengal under Sri Bampfylde Fuller,

added do the tension of the situation... The partition was followed by a policy of repression which added to the difficulties of the Government and the complexites of the situation. The cry of Bandemataram, as I have already observed was forbidden in the public streets and public meetings in the public places were prohibited"."[২৫]

ফুলারের এই আইনের বিরুদ্ধে স্বদেশ প্রাণ কবি 'ফুলার করলে হুকুমজারি' গানটি রচনা করেন। কবি গাইলেন —

'ফুলার করলে হুকুম জারি
মা বলে যে ডাকবে রে তার শাস্তি হবে ভারি !'

'মা বলে ভাই ডাকলে মাকে
ধরবে টিপে গলা
তবে কি ভাই বাংলা হতে
উঠবে রে মা বলা।'

কবির কেদোক্তি —

'আর কি ভারতে আছে সে যন্ত্র
আর কি আছে সে মোহন মন্ত্র
আর কি আছে সে মধুর কন্ঠ
আর কি আছে সে প্রাণ।'

অথচ কবি জানতেন —

' কোন দেশেতে আছে চিতোর
পানিপথ আর হলদিঘাট
কোন দেশেতে বনে বনে
করত ঋষি বেদপাঠ ? '

' ধনী ছিলি যে সব ধনে
স্বপ্ন বলে হয় রে মনে
তোরা কি সেই পূজ্য জাতি
জন্ম তোদের সে অন্বয়ে ? '

" রজনী কান্তের স্বভাব বৈশিষ্ট্যে স্বদেশ প্রেমের গানগুলি কেবল মাত্র উত্তেজনা ও উম্মাদনা প্রকাশ নয় , কবির অন্তরের মিনতি ও অনুনয়ের কারুণ্য অনুভব করা যায় প্রতিটি ছত্রে । রজনী কান্ত ব্যক্তি জীবনে অত্যন্ত শান্ত নিরুত্তাপ চরিত্রের মানুষ । তাই তাঁর দেশ প্রেমের গান গুলিতে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে যত না নির্ঘোষিত অনুরোধের সজল মিনতি তার থেকে বেশী প্রকাশিত । .... রজনী কান্তের দেশ প্রেম দৃপ্ত রোষ বহ্নিতে ফেটে পড়েনি , অন্তরের শুদ্ধ অনুভূতি নিরতিশয় ক্ষোভে , আত্মগ্লানিতে মর্মান্তিক না হয়ে অনুরোধে ও মিনতির কারুণ্যে মর্মস্পর্শী হয়েছে । এখানেই সমকালীন দেশাত্মবোধক সংগীত রচয়িতাদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য । " ২৬

ভবতোষ দত্ত কান্ত কবির সম্পর্কে বলছেন , " রজনী কান্তের স্বদেশ বিষয়ক গানে এমনই ব্যক্তিগত সুরের চেয়ে ফুটে উঠেছে সর্বজনীন স্বদেশ অনুভূতি ।

তিনি আমাদের জীবন তন্ত্রীর ঠিক তন্ত্রীটিতে ঘা দিয়ে ঠিক সুরটিকে বাজিয়ে তুলেছিলেন। স্বদেশ কাব্যের কথা নয়, ইতিহাসের রোমান্স নয়, সম্ভ্রমের বস্তু নয়, স্বদেশ আমাদের দীন জননী রূপে একান্ত আপনার হয়ে দেখা দিলেন। এই জন্যই রজনী কান্তের স্বাদেশিক সুরটি এত মর্মস্পর্শী।" ২৭

রথীন্দ্র নাথ রায় বলছেন " রজনীকান্ত স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় দেশ প্রেমের গান লিখেছিলেন, কিন্তু সেখানেও কোন উত্তেজনার উগ্রতা ছিল না।" তিনি সহজ সরল সত্যটিকে আত্ম বিস্মৃত ভারতবাসীর চিত্তলোকে উদ্ভাসিত করতে চেয়েছেন। এই শ্রেনীর স্বদেশী গান রচনায় প্রকৃত পক্ষে রজনী কান্ত সার্থক। এখানেই তাঁর স্বদেশানুরাগ আপন মহিমায় দীপ্যমান।" ২৮

সহজ অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত কবির স্বভাবজ ধর্মছিল দেশ প্রেম। দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎ কুমারকে কবি তাঁর 'অমৃত' নামক কবিতার বই উপহার দিবার সময় লিখলেন —

" ধর দীন উপহার, এই মোর শেষ,
কুমার করুণানিধে, দেখো র'ল দেশ।"

দেশ রজনী কান্তের শোনিতে প্রবাহিত। দেশ তাঁকে ভোলে নি।

॥ অতুল প্রসাদ সেন ॥ (১৮৭১ - ১৯৩৪)

অতুল প্রসাদের জন্ম ১৮৭১ এ ঢাকা শহরে। পিতা ডঃ রমাপ্রসাদ সেন। দেশপ্রেমের আবিলতা ছিল তাঁর হৃদয়ে, আর কন্ঠে ছিল ঈশ্বর ভক্তির প্রাণ সংগীত।

এই কবিই শিশু বয়সে প্রার্থনা করেছিলেন ' তোমারি উদ্যানে , তোমারি যতনে উঠিল কুসুম ফুটিয়া । ' কবির জীবন ছিল সংঘাত ময় । এই অস্থির জীবনে ' প্রেম প্রকৃতি ঈশ্বর ' এই তিন সত্যে বিশ্বাসী গীতি কবি আপন অন্তরের দুর্বার আবেগ , অস্থির ব্যাকুলতাকে প্রকাশ করার মাধ্যম খুঁজে পেলেন গানে ।

স্বভাবে ছিলেন অত্যন্ত সরল । তাঁর সৃষ্ট সঙ্গীতগুলো ছিল উচ্চ শ্রেণীর । রবীন্দ্র নাথের অমর সৃষ্টিতে বাংলা যখন মুগ্ধ তখনই অতুল প্রসাদ বাঙালীর হৃদয় গভীর ভাবে জয় করলেন । রবীন্দ্রনাথ বলতেন ' অতুল অতুলনীয় ' স্নেহের পরশে ' পরিশেষ ' কাব্যগ্রন্থ তিনি অতুল প্রসাদকে উপহার দেন । তাঁর গ্রন্থের শীর্ষক পত্রে তিনি লিখেছেন —

' বঙ্গের দিগন্ত ছেয়ে বানীর বাদল
বহে যায় শত স্রোতে রস বন্যাবেগে
আজি পূর্ব বায়ে
বঙ্গের অম্বর হতে দিক দিগন্তরে
সহস্র বর্ষন ধারা গিয়াছে ছড়ায়ে
প্রাণের আনন্দ বেগে পশ্চিমে উত্তরে
দিল বঙ্গ বীনাপাণি অতুল প্রসাদ
তব জাগরণী গানে নিত্য আর্শীবাদ । '

অতুল প্রসাদ যখন গীতি কবিতার জগতে একান্ত তখন বাংলার পথ প্রান্তর দেশ প্রেমের জোয়ারে উদ্বেল । পরাধীন ভারতের বেদনা কবির চিত্তে বেজেছিল । বেদনায় পীড়িত হয়েছিল কবির রোমান্টিক ভাবনা । স্বদেশ গীত যা তিনি লিখেছেন স্বল্প , কিন্তু তার মাধুরীর শেষ তানগুলো এখনও ধ্বনিত হয় বড় শান্ত ও

মনোরম সুরে । গান গুলো বড় মর্মস্পর্শী —

১ । বলো বলো বলো সবে

২ । উঠ গো ভারত লক্ষ্মী

৩ । হও ধরমেতে ধীর

৪ । মোদের গরব মোদের আশা

৫ । দেখ মা এবার দুয়ার খুলে

৬ । কত কাল রবে নিয়ে যশ বিভব অন্বেষণে

৭ । মোরে কে ডাকে — আয় রে বাছা আয়

৮ । কঠিন শাসনে করো মা শাসিত

৯ । জাগো জাগো জাগো এবে

১০ । ভারত ভানু কোথায় লুকালে

১১ । খাঁচার গান গাইব না আর খাঁচায় বসে

১২ । নূতন বরষ নূতন হরষ

১৩ । পরের শিকল ভাঙিস পরে

১৪ । ভাইকে ছুঁলে পদতলে

অতুল প্রসাদের 'জাগরণী' সঙ্গীত গুলি যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য পূর্ণ । দেশ বাসীর কাছে এ যেন মন্ত্র স্বরূপ । অতুল প্রসাদের গান গুলি কোন উত্তেজনা সৃষ্টি করে না বরং দেশ মাতৃকার প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধায় মস্তক অবনমিত করায় । স্বদেশ সেবায় সংকল্পে জনচিত্তকে করে উদ্বোধিত । তার গানগুলি দেশভক্তি আশা আকাঙ্খার

প্রতিফলন। সুরগুলি এমন অপূর্ব যেন ভারতের আবহমান কালের জন্য তৈরী। দেশ জননীকে উজ্জ্বল করার বাসনা তাঁর হৃদয়ে —

" উঠ গো ভারত লক্ষ্মী, উঠ আদি জগৎ জন পূজ্যা
দুঃখ দৈন্য সব নাশি, কর দূরিত ভারত লজ্জা।
ছাড় গো ছাড় সুখ শয্যা, কর সজ্জা
পুন কমল কনক ধন ধান্যে।

কাণ্ডারী নাহিক কমলা, দুঃখ লাঞ্ছিত ভারতবর্ষে
শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী, কাল সাগর কম্পন দর্শে।
তোমার অভয় পদ স্পর্শে, নব হর্ষে
পুনঃ চলিবে তরণী শুভ লক্ষ্যে।"

এই গানে আছে যাদু। জাগে শিহরণ। সুদীর্ঘ কালের পরাধীনতা জাতিকে স্থবির করে তুলেছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন জাতীয় জীবনে কবি স্বদেশবাসীকে মন্ত্র পড়ালেন —

" বল বল বল সবে, শত বীনা বেনু রবে
ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্মে মহান হবে, কর্মে মহান হবে।
নব দিন মনি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে।"

স্বাধীন ভারত শুধু কাম্য নয় কবির কাছে। ভারতবাসীকে হতে হবে অপূর্ব গুণ রাশি সম্পন্ন সার্থক মানুষ —

' হও ধরমেতে ধীর হও করমেতে বীর

হও উন্নত শির - নাহি ভয়

ভুলি ভেদা ভেদ জ্ঞান হও সবে আগুয়ান

সাথে আছে ভগবান হবে জয় । '

কবির মন অতীত ভারতের স্বপ্নচারী । ভারতের গৌরব ছিল , শৌর্য্য বীর্য্য ছিল । ছিল মহান ইতিহাস । আজ বিষণ্ন কবি সেই ভারতকে অনুসন্ধান করে চলেছেন —

' ভারত ভানু কোথায় লুকালে

পুনঃ উদিত কবে পূরব ভালে

হায় রে বিধাতা , সে দেব কান্তি

কালের গর্ভে কেন ডুবালে ?

আছে অযোধ্যা - কোথা সে রাঘব

আছে কুরুক্ষেত্র - কোথা সে পান্ডব

আছে নবদ্বীপ - কোথা সে ভক্তি

আছে তপোবন - কোথা সে তপোধন

কোথা সে কালা কালিন্দী কূলে

কোথা সে জাতি যাহারে বিশ্ব

পূজিত কালের প্রভাত কালে ?

কবি অনুভব করেছিলেন জাতি ভেদ প্রথা পরাধীনতার মূল কারণ । শত শতাব্দীর এই প্রথাকে নিচিহ্ন করে দিতে হবে , তবেই দেশের মুক্তি —

' জাতির গলায় জাতের ফাঁস

ধর্ম করছে সর্বনাশ

নিজের পায়ে পরলি পাশ

দাসত্ব ঘোঁচেনা না তাই । '

জাতিভেদের মিথ্যা অভিমান দূর করে দেশ গড়তে হবে । কবি মানসিক ভাবে ক্ষুদ্র চিন্তার অনেক উর্দ্ধে ছিলেন —

' এসেছি মা শপথ করে
ঘরের বিবাদ মিটাব ঘরে
যাব না আর পরের কাছে
ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ হলে । '

' জাতিকূল অভিমান দ্বেষ নিন্দা ভেদ জ্ঞান
ভারতে আনিল মরণ । '

অন্যত্র —

' দেশ মাতার আর বিশ্ব মাতার
ম্লেচ্ছ কাফের এক পরিবার
নয় তুরস্ক নয়কো তাতার
জন্ম মৃত্যু এই যে ঠাঁই ।

' মোদের গরব মোদের আশা ' যেন বাংলার প্রাণের সঙ্গীত । " প্রবাসী বাঙালী কবি বাংলা দেশের জল মাটি আকাশ বাতাসকে স্মরণ করে যে বিখ্যাত গানটি রচনা করেন , তা প্রবাসী কবির দেশ প্রীতিকে স্মরণ করায় — ' আছে কই এমন ভাষা , এমন দুঃখ ক্লান্তি নাশা ' – এ গান আপন মনে নির্জনে বসে কণ্ঠে তুলে নেওয়া যায় , কেননা এর ছত্রে ছত্রে রয়েছে দেশের মাটির প্রতি নিগূঢ় আকর্ষন । " ২৯

" এই গানের লোকায়ত সুরে ও বানী বিগ্রহে , বঙ্গ ভাষার প্রতি শ্বাশ্বত

বাঙালীর উষ্ণ নিবিড় অনুরাগে একটি আশ্চর্য্য মহিমা প্রকাশ পেয়েছে। "

স্বদেশী যুগে যে সব কবিদের গান মাতিয়ে রাখত বাংলা দেশকে সেই ভূমিকা স্মরণ করে বলা হয়েছে "The National songs comprosed during the period, by Dwijendralal Roy, Rabindra Nath Tagore, Sarala Devi, Mr. A.P. Sen, and the late Rajani Kanta Sen smote on the heart of the people as a giant sharp, awakening out of it a strom and a tumult such as had never been known through the long centuries of her political serfdom." ৩১

অতুল প্রসাদ সত্যিই দেশের কবি, অনবদ্য তাঁর দান। " অতুল প্রসাদের স্বদেশী গান কণ্ঠে নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া যায় না, কিন্তু এ গান দেশ ও জাতির মানস ভূমি গঠনের বীজ মন্ত্র। এখানেই তার স্বদেশী গানের মূল্যায়ন। তিনি স্বদেশী গানের ক্ষেত্রে পুরোপুরি বাঙালী। বাংলা দেশের সমাজ ভাবনা, বাঙালীর জাতিভেদের সর্বনাশা রূপ, বাংলা দেশের প্রকৃতি অনুক্ষণ তাঁর ভাবনা চিন্তায়। ' ভারত জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন' নেবে এ বিশ্বাস তাঁর ছিল ঠিকই, কিন্তু বাঙালীর গর্ব, বাঙালীর আশা আকাঙ্খার নিহিত বাণীকে আশ্রয় করেই তিনি জগৎ সভায় যেতে চেয়েছেন। " ৩২

রবীন্দ্র নাথ সত্যই বলেছেন " তব জাগরণী গানে নিত্য আশীর্বাদ। "

॥ বিজয় চন্দ্র মজুমদার ॥ (১৮৬১ - ১৯৩২)

বিজয় চন্দ্র মজুমদার ' বঙ্গবাণী' পত্রিকার সাথে প্রথম হতে শেষ অবধি

যুক্ত ছিলেন । তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায় বঙ্গবাণীকে সমৃদ্ধ করেছিল । তিনি রবীন্দ্র নাথের সমসাময়িক ছিলেন । তাঁদের মূল পদবী ছিল মৈত্র । বাদশাহী আমলে খেতাব পেয়েছিলেন মজুমদার । নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্বর সাথে পালি , ওড়িয়া , সংস্কৃত ও উর্দু ভাষায় তিনি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন । তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব , ভাষাতত্ত্ব এবং ভারতীয় ভাষা সমূহের বাংলা ওড়িয়া পালি বিভাগে অধ্যাপনা করেছিলেন ।

বিজয় চন্দ্র ছিলেন পুরোপুরি স্বদেশী । দেশের পরাধীনতায় অন্তর্বেদনা তিনি অনুভব করতেন অহরহ । দেশকালের তৎকালীন পরিস্থিতি তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল । পরাধীনতার অমোঘ আঁধারে দীর্ঘদিন দেশজননী ছিল তন্দ্রাচ্ছন্ন । এ বেদনা তিনি বুকে অনুভব করতেন । তাই কবি ' উদ্বোধন ' এর মন্ত্র দিয়ে তাঁর আকুতি প্রকাশ করছেন ---

জাগো জাগো ভারত মাতা ।
চরণ তলে তব অভিনব উৎসব
করিব রচিব নব গাথা
অগনন জনগণ ধাত্রি ।
অকথিত মহিমা অশেষ গরিমা
অনন্ত সম্পদ দাত্রি ।
মঙ্গল যুত তব কীর্তি
তব গুণ গৌরব তব যশ সৌরভ
ব্যাপিল বিশাল পৃথ্বী ।

বিজয় চন্দ্র কবি খ্যাতি লাভ করেন বঙ্গভঙ্গের পূর্বেই । তাঁর প্রসিদ্ধ ' বঙ্গমঙ্গল ' কাব্য তাঁকে দেশবাসীর কাছে পরিচিত করে তোলে । ' বঙ্গ-মঙ্গল ' একটি খন্ড কাব্য ।

প্রকাশিত হয় বঙ্গদর্শনে । কাব্য রচনার পিছনে এক পটভূমিকা আছে । লর্ড কার্জন ক্ষমতা লাভের পর 'কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি এ্যাক্ট' এর মাধ্যমে বাংলার মানুষের হাত থেকে স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার কেড়ে নিলেন । প্রতিবাদ উঠল বাংলা জুড়ে । লর্ড কার্জন দমলেন না । বরং পরবর্তী আঘাত দিলেন 'ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি এ্যাক্ট' রচনা করে । ১৯০১ শিমলার শৈল চূড়ায় বসল গোপন বৈঠক । শিক্ষাই বাঙালী জাতির স্বাদেশিকতার উৎস । তাই শিক্ষার সংস্কারের নামে করতে চাইলেন সংকার । এই বৈঠকের পরেই তৈরী হলো বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন । প্রথমে কোন হিন্দু প্রতিনিধির স্থান হলো না । পরে বাধ্য হয়ে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে অন্তর্ভূত করা হলো । কিন্তু তা সত্ত্বেও কমিশনের সিদ্ধান্ত হলো শিক্ষা ব্যবস্থাকে সরকারী দখলে আনা এবং সার্বজনীন শিক্ষাকে সংকুচিত করার অপচেষ্টা । এর পরেই চলল বঙ্গভঙ্গের চক্রান্ত ।

" ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের দু বছর আগেই অর্থাৎ ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনাটি তৈরী করেছিলেন এবং এই সময় থেকেই এ ব্যাপারে সরকারী জেদ অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠে । অপর দিকে দেশবাসীর প্রতিবাদ কণ্ঠও ক্রমশ চারায় উঠতে থাকে । বিজয় চন্দ্রের এই ব্যঙ্গ রচনাটি এই সময়েই লেখা । " ৩৩

" ব্যঙ্গ কবিতায় কবি বিজয় চন্দ্র মজুমদার সিদ্ধহস্ত , কলম তো নয় যেন শাঁখের করাত । আসতে যেতে কাটে । 'বঙ্গমঙ্গল' তাঁর একটি খন্ড কাব্য । বিষয় বঙ্গভঙ্গ । তারই প্রথম পর্ব (সর্গ) 'মন্ত্রনায়' শিক্ষা সংকোচনে কার্জনী চক্রান্তের বিরুদ্ধে কঠিন কষাঘাত । " ৩৪

" অর্জন করিতে যশ কর্জন সুজন
কেমনো গর্জন করি হেলায়ে তর্জনি

আদেশিল সাধুশীল সচিব প্রধান
রিজলি রে * ১ রিজলিউশন লিখিবারে —
বর্ণিব সে স্বর্ণ কীর্তি । এ অর্ণবে বায়
কি রূপে উড়ুপে চড়ি পারি পার হতে ?
তুমি যদি , হে ভারতী নাহি ধর হাল ?
খাটুনিও নাহি বেশী পার্টুনীর কাজে ।
থাকিলেও ক্ষতি কি বা ? কার্য্যহীন তুমি
হবেই তো অচিরাৎ নতুন বিধানে । *২
আগে থেকে দাঁড় টানা শিখে রাখা ভাল
পার কর বীনাপানি কাব্য কালাপানি ।

---

* ১ । "In the opinion of the Govt. of India, Risely wrote to the Government of Bengalthe time has come when the relief of the Bengal Government must be regarded as an administrative necessity of the first order. And that relief can be afforded not as has been suggested......by organic changes in the form of the Govt. but only be actual transference of territory (Home P[illegible](A) DEC,1903 No. 155, From H.H.Risely).

* ২ । 'The Indian Universities Act,1904, by which Curzon intended to Universities and even private colleges under Government control and vigilance, and also to retard the growth of higher and scientific education among the natives of India'.(Revolt of 1905 in Bengal, Binay Jiban Ghosh P.)

হিমালয়ের সিমলার তুঙ্গ শৃঙ্গ যথা —
নির্জনে মার্জন করে পর্জন্য আপনি ,
কর্জন বসিয়া তথা কনক আসনে
ভাষেণ অমৃত বানী বানী বিড়ম্বিনী
সম্ভাষি সচিবে , মিত্রে , পাত্রে , কোতোয়ালে ।
বিদায়িতে ভারতীরে মারুতির রথে
পূর্ণ আজি আয়োজন , চূর্ণ করি আন্দোলন ।
হে পাত্র , পড়িয়া শাস্ত্র গাত্র দাহ কারো
নাহি হবে , রবে সবে নীরবে জগতে ।

ছল ধরা বাগে ধরা ছিল প্রপীড়িত
লুপ্ত হবে তাহা গুপ্ত বিধির প্রচারে ,
ওহে মিত্র নেত্র আজি উৎফুল্ল উল্লাসে ।
শান্তির কুলীশ দিব পুলিশের হাতে
আটো চাল কোতয়াল শ্রীঅঙ্গ মন্ডিয়া ।
সচিব , রচিব আমি অন্য নব বিধি
ঠান্ডা করি দেশ , তুমি পান্ডা হও তার ।
শুনি সে অমৃত বানী জয়ধ্বনি করি
উঠিল সচিব বৃন্দ , বন্দী গাহে গান ।

(বন্দীর গান)

করিয়ে দরবার জেরবার
করেছ বাজাগণে ।
বাহিরে নাম ছাপা (ধামা চাপা)
পুলিশ কমিশনে

ইউনিভারসিটি বরষটি
অস্ত না যেতে যেতে
করিয়ে ভারতীর মতিস্থির
কুলোর বাতাসেতে।
গুপ্ত বিল খুলি বিলকুলই
মহিমা জারি হলো।
প্রভুর জয়গানে এক তানে
সকলে হরি বলো।

'বঙ্গ-মঙ্গলে'র দ্বিতীয় সর্গ, 'উদ্যোগ' এ সদ্য প্রচারিত বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তের বিদ্বেষ বিদ্রূপের যেন বিস্ফোরন —

মধু মাখা ইতিবৃত্ত, প্রত্নতত্ত্বে জারি
করিলে সচিব তুমি, বাঁচিল বাঙালী
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সে ছিল তিন দেশ
এক সঙ্গে বঙ্গে তার শাসন গর্হিত।
বিশেষ বঙ্গের লোক বড় কথা কয়
ঝালা ফালা করি কর্ণ। জ্বালা দূর হবে,
কথা বন্ধ কর যদি কবন্ধ করিয়া।
উদ্ধারিয়া কথা গুলি হস্তে লয়ে ছুরি
দক্ষ সার্জনের মতো দাঁড়াল কর্জন,
কহিল সচিব তবে যুক্ত করযুগে —
ছুরি হেরি ডরি প্রাণে যদি ওঠে কাঁদি,
কিম্বা যদি ধড় হতে স্বশ্রুতিতে মাথা

শঙ্কা হয় প্রাণে তার ? কি হইবে প্রভু ?
বর্ষি রসনায় লক্ষ ভৎর্সনা বচন
কহেন শেতাঙ্গ পতি : " অঙ্গচ্ছেদ অতি
সোজা কথা , মজা ওতে আছে বহুবিধ ।
উহাতে চিত্র কার করা ভাব প্রবণতা ।
বৈজ্ঞানিক জাতি মোরা শিখাব এবার
থাকে প্রাণ ধড় মুন্ড বিভক্ত করিলে ।
যতটুকু যাবে কাটা ঠিক ততখানি
এনে দিব অন্য দেহ হইতে কাটিয়া ,
সবগুলো হবে তাজা সমান সমান ।
বঙ্গ হতে কাট বঙ্গ , প্রত্যঙ্গ ত সেটা ।
কলিঙ্গ কিষ্কিন্ধ্যা জুড়ি উৎকলের সাথে
কর নব দেহ সৃষ্টি । ভাষার একতা
অত্যন্ত আশ্চর্য্য রূপে হইবে সাধিত । "
তথাস্তু বলিয়া সবে শির করি নত
রত হইল নব বিধি করিতে প্রচার ।
হুঙ্কারে মেদিনী ফাটে । উঠিল রোদন
বুদ্ধিহীন বঙ্গ মুখে অঙ্গচ্ছেদ ভয়ে ।

(রোদন ধ্বনি)

মাথাটা কাটা গেলে
বাঁচির জানি খাঁটে
শোভিত নব ডালে
দেহটা দিলে ছাঁটি ।

মঙ্গল হবে খাসা

বিশেষ আছে জানা

জঙ্গলে পাবে বাসা

অঙ্গের দুটো ডানা ।

অবোধ মোরা ওগো

কাঁদিয়া মরি তবু

বঙ্গটা বঙ্গে রাখো

করুণা করি প্রভু ।

১৯০৫ এর মে মাসে ইংলন্ডের কাগজ 'Standard' এ প্রকাশিত হলো বঙ্গভঙ্গ মন্জুর হয়েছে । জাতির জীবনে এ অন্ধকার নিশা , সমস্ত উদবেগ উৎকন্ঠার অবসান ঘটিয়ে ব্রিটিশ সিংহের দৃঢ় সিদ্ধান্ত । বিজয় চন্দ্রের 'বঙ্গ - মঙ্গলের তৃতীয় সর্গ । তূনক ছন্দে গাঁথা , 'সিদ্ধি' অধ্যায় । প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়বদ্ধ কার্জনের বহুমুখী কার্যকলাপের অপূর্ব প্রকাশ ।

অস্ত্র - হস্ত লার্ট , মস্ত বঙ্গ অঙ্গ ছেদিবে ।

সাধ্য কার আজি তার ন্যায্য কার্য্য রোধিবে ?

মন্ত্র পূত লাট দূত দেশ দেশ ধাইল ,

ভেদ মন্ত্র বেদ তন্ত্র কন্ঠ তার গাইল ।।

হর্ষ নেত্র পাত্র মিত্র লম্ফ ঝম্প ঝাঁপিল ।

ঘোর রোল গন্ডগোল , বঙ্গ খন্ড কাঁপিল ।

রাজ্য খন্ড লন্ডভন্ড হইল তার দু:খ কি ?

খন্ড শূন্য জেদ পূর্ণ রৈল লাট বাক্যটি ।

দেব সর্ব লার্ট গর্ব হেরি পুষ্প বর্ষিল ,

বঙ্গ মুন্ড দেহ পিন্ড ছাড়ি ভূমি পশিল

স্তব্ধ বঙ্গ , কর্ম সাঙ্গ , লাট ঘাড় নাড়িল

তূনকের ছন্দ ঢের বর্ণনায় বাড়িল ।

মাথাটা গেল যবে দ্যাখে সবে

দেহটা ঠান্ডা ।

কেহ বা ভাবে মনে সংগোপনে

গেছে বা প্রাণটা ।

উড়ের মাথা জুড়ে দিল ধড়ে

তবুও নড়ে না ।

আসাম দিল খাসা লম্বা নাসা

শ্বাস যে পড়ে না ।

টিপিয়া নাড়ী তার ফেরেজার

কহেন লাটকে —

" আবার দেহটিতে পার দিতে

মাথাটা আটকে ?

কহেন লাট যে সে কড়া তাঘে

কোরো না বিজ্ বিজ্

জুড়িয়া দিলে মাথা রবে কোথা

আমার Prestige । * ৩

---

* ৩ । When the Secretary of the States' Council at the last moment put forward the idea that relief could be given by sitting up autonomous commissionerships for Choto-Nagpur and Orissa on the Sind model - a diluted version of Cotton's plan - the Viceroy was furious. If his partition was rejected at this eleventh hour, Curzon Warned, 'the prestige of the Govt. of India will the seriously weakened". (Curzon collection MSS Eur F III/175 Telegram to Viceroy to Secretary of State 2 W.5. 1905.

খন্ড হল বঙ্গ দেশ
খন্ড কাব্য হল শেষ
বঙ্গের মঙ্গল আজি করিল কর্জন ।
শ্রী বঙ্গ - মঙ্গল গায় বঙ্গ বাসীজন ।।

বিজয় চন্দ্রের ' প্রার্থনা ' ও ' নবজীবন ' কবিতা দুটিতে মাতৃ সেবার প্রতি আকুলতা আছে । দেশ জননী যখন বিপন্না তখন সন্তানের এক মাত্র ধর্ম হলো দেশ জননীর জন্য আত্মোৎসর্গ করা । তাই কবি বলছেন —

দেবী ,
জীবন তুচ্ছ করিতে শিখাও , জীবন করিব ধন্য
সকলের আগে সেবিতে চরণ
সকলের আগে লভিতে মরণ
সেবক বর্গ মাঝারে আমারে করগো অগ্রগণ্য ।
জয় পরাজয় মান অপমান
না গনিয়া মান হব আগুয়ান
অরির প্রহারে বক্ষেতে ক্ষত লভিব তোমারি জন্য
শুনি পুরাকালে হইল যখনি
বীরের শোণিতে সিক্ত অবনী
কে পারে গণিতে - সে শোনিতে কত জনমিল বীর সৈন্য ।
আজিকে আমার রুধির ধারায় —
তোমার চরণ তলের ধরায়
দেখি জাগে কিনা লভিয়া শক্তি নবীন ভক্ত অন্য ।

দেশ জননীর সাধনা করা সহজ নয় । দেশ প্রাণদের গড়ে তুলতে হবে জীবন বোধ । তপস্যার পথ ধরে সন্তান লাভ করবে চারিত্রিক মহনীয়তা ও ক্ষাত্রধর্ম । নিজের জীবনকে শুভ্র ফুলের মতো পবিত্র করে জীবন দান করার মধ্যেই নিহিত আছে মঙ্গল সাধনা । সেই সাধনায় গড়ে উঠবে নব জীবন । কবি গাইছেন —

আসিয়াছি আমি জাগিয়া প্রভাতে
প্রবেশিতে নব জগত সভাতে
শুভ্র পুন্য বসন অঙ্গে
পরিয়ে দে মা ।
কর্মের পথ রুধিয়া আমার
দাঁড়ায়ে উচ্চ জড়তা পাহাড়
ঠেলিয়া চরণে সে বাধা ভীষণ
সরিয়ে দে মা ,
আছে তার পরে নিরাশা সাগর
তরিয়ে দে মা ।
সময়ের পথে হইব যাত্রী
দেহ গো শস্ত্র জগত - ধাত্রী
প্রীতির বর্মে অটুট কর্মে
গড়িয়ে দে মা ।
তূনেতে আমার শর সাধনার
ভরিয়ে দে মা ।

বঙ্গ বিভাগ যেদিন দেশ দরদী প্রতিটি প্রাণে চরম আঘাত হেনেছিল , এই অন্তর্বেদনা বোধ হতেই বহু সাহিত্যকারের লেখনী হতে প্রবাহিত হয়েছিল সঙ্গীত ,

কবিতা বা সাহিত্যের অন্যান্য ধারার স্রোতস্বিনী। বিজয় চন্দ্র ছিলেন সরল ও সাধাসিধে। দেশ প্রেমে ভরা অন্তর বঙ্গ বিভাগকে মেনে নিতে পারল না। সেই সময় তিনি বহু কবিতা লিখলেন একদিকে প্রাণবন্ত উজ্জ্বল দেশাত্মবোধের কবিতা অন্য দিকে রাজনৈতিক ঘটনা বা জাতীয় দোষ ভিত্তিক ব্যঙ্গ কবিতা ।

'আয় আজি আয় মরিবি কে ?', 'এ জগতে যদি বাঁচিবি', 'মনের কথা'য় আছে তাঁর দেশ মুক্তির জন্য বীরত্বে ভরা মনের অভিব্যক্তি —

মড়ার মতন না লভি মরণ
সাধকের মত মরিবি কে ?
আয় আজি আয় মরিবি কে ?
অসুর নিধনে কিসের তরাস ?
পশুর নিনাদে তোরা কি ডরাস ?
না গনি বিজন কানন ভীষণ
বিষম বিপদ বরিবি কে ?
নিষ্ঠুর অরি সংহার করি
বীরের মতন মরিবি কে ?
আয় আজি আয় মরিবি কে ?

এ জগতে শুধু আত্ম প্রচারের উপর বাঁচা যায় না। মিথ্যা গরিমা নিয়ে আস্ফালন করে লাভ নেই। এ সব ক্ষণ ভঙ্গুর। জীবনে যদি বাঁচতে হয় তবে কবি বলছেন —

কর্মের পর নির্ভর কর
এ জগতে যদি বাঁচিবি।
সহি চরণ দলন বীরতা
করি রোদনে রোদনে ধীরতা
কাজ কি রে ভীরু বড়াইয়ে ?

সহে ভীষণ তাড়ণ মানুষে ?
হলে পাষাণ পীড়ন সানুসে
দেয় অগ্নির কনা ছড়ায়ে
মায়ের আশিস লভি সে পারিস
শূর সম যদি রাজিবি ।
মায়ের উপর নির্ভর কর
এ জগতে যদি বাঁচিবি ।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে পুলিশি দমন প্রক্রিয়া ছিল কঠোর । সরকারী অত্যাচারের মাত্রা উঠেছিল তীব্র । সার্কুলারের পর সার্কুলার দিয়ে সন্ত্রস্ত করে তোলা হচ্ছিল আন্দোলনকারীদের । পুলিশের রেগুলেশন লাঠির ঘায়ে মাথা ফাটাও আন্দোলনকারীদের । চলত সম্মুখ সংঘর্ষ । কবি এই সংঘর্ষ হতে পিছপা নন । বরং ইংরেজদের সাথে সংঘর্ষে কতখানি সাহস আছে এ স্বদেশীদের নিকট তিনিও দেখতে চান —

হবে পরীক্ষা তোমার দীক্ষা
অগ্নি মন্ত্রে কিনা ?
তৃণ বলি তোরে গরবে হেলায়
দলিতেছে অরি চরন তলায় ,
পোড়াতে অরিরে পুড়িয়ে মারিতে
পারিবি কি না ?
দগ্ধ ভস্মে গ্রাসিতে বিশ্বে
পারিবি কি না ?
লভ গো মৃত্যু জিনিতে শত্রু
যে করে তোমারে ঘৃণা
তব পরীক্ষা তোমার দীক্ষা
অগ্নি মন্ত্রে কি না ?

(২)

ভীষণ কান্তি আসিছে মরণ
মহা অরণ্যে করি বিচরণ
কৃষ্ণ হস্তে শানিত অস্ত্র
ধরিবি কি না ?

(৩)

ধেয়ে আয় যারা মরিতে পারিস
শ্মশানের ধূমে বিলাইতে বিষ
মরণ আদেশ দিতেছে স্বদেশ
পালিবি কিনা ?

বিজয় চন্দ্র আরেকটি ঘটনাকে উল্লেখ করে কবিতা লিখেছেন । ফুলারের সাথে 'রাস্টিকেট' নিয়ে বিশ্ববিদ্যালযের সঙ্গে বিরোধ বাধলে বড়লাট মিন্টো ফুলারকে সমর্থন করেন নি । ফুলার পদত্যাগ করেন । মিন্টো কর্তৃক পদত্যাগ গৃহীত হয় । বিজয় চন্দ্র এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে লেখেন ' লাট বিদায় ' ।

" ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ বিভাগের পর পূর্ববঙ্গের ছোট লাট ব্যামফিলড ফুলারের অকথ্য নির্যাতনে দেশবাসী অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে । ফুলারের এই অত্যাচারের প্রবণতাকে তদানীন্তন বড়লাট মিন্টো , এমন কি ভারত সচিব লর্ড মলিও সমর্থন করতে পারেন নি । ফলে ফুলার সাহেবকে পদত্যাগ করে এ দেশ থেকে বিদায় নিতে হয় । " ৩৫
লাট বিদায় কবিতাটির দুটো ভাগ , গুনস্তুতি ও এড্রেশ ।

' গুনস্তুতি '

- - - - - - - - -

চতুর্বর্ণের মধ্যে দেখি প্রথমটির দৈন্য
চতুর্বর্গের মধ্যে ভবে দ্বিতীয়টি ধন্য
চতুর্বেদের তৃতীয়টি সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ
চতুর্যুগের চতুর্থটি ফুরাচ্ছেনা শীঘ্র ।
চারিদিক ভেবে ঠিক কত্তে নারি তাই
চতুর জনের চারি নীতির কোনটি মোরা চাই ।
শমনীতে সমতল তিব্বতে পর্বত ,
দানের পুন্যে উড়ে গেল দেশের সম্পদ
ভেদ নীতিতে করে খেদ মুর্খগুলো বঙ্গে ।
দন্ড নীতির গন্ডোগোলে জঙ্গী লাটের সঙ্গে ।
কে যে বড় কে যে ছোট কেমন করে বুঝি
উনিশ বিশ নাহি মানি , তুল্য রূপে পূজি ।
চার নীতির উপরেতে ত্রিনিটির খেলা
রাইট হ্যান্ডে উপযুক্ত লেফটে নেই চেলা ।
যেরে যার সাথে সাথে গৃহ হিতকারী
শ্রীকৃষ্ণ , গোবিন্দ নিজে গুপ্ত বেশধারী ।
বীরদর্পে বড় কর্তা সিংহ নাদ নাদি
বলে গেলেন নিদেন কথা হিদেন মিথ্যাবাদী * ৪
পবিত্র আত্মার ঘুঘু ডিটেয় করি পেশ
উদ্ধারেন ছোট কর্তা আমাদের দেশ ।
গুপ্ত দেবের ভাষাতত্ত্বে কূল নাহি পাই
শালি গিরামের শোয়া বসা দুঃখ কিছুই নাই ।

- -

* ৪ । The highest ideal of Truth is to a large extent a Western conception .. Undoubtely truth took a high place in the

place in the moral codes of the west before it had been similarly honoured in the East........we may prove it by the common innuendo that lurks in the words' oriental diplomacy' by which is meant something rather tortuous and hypen subtle".(Speech of Lord Curzon at the Calcutta University convocation held on the 11th February 1905, quoted in বাংলা দেশের ইতিহাস , চতুর্থ খন্ড , রমেশ চন্দ্র মজুমদার , পৃ : ২০

দ্বিতীয় অংশ ' এডরেশ '

কর্তা তুমি চল্লে ঘরে নেহাল করি দেশ ,
রচি তব কীর্তি কল্প কাব্যে এডরেশ ।
জর্দী বেটার সঙ্গে বুঝি কর্ম হল ঠান্ডা ,
নইলে সবাই বুঝতো তুমি কত বড় বান্দা ।
গরগরিয়ে রাগের চোটে ইস্তাফাটি পেশ ,
রইল কিন্তু আস্ত সেই কেশীনরের কেশ ।
জবর দস্তের সঙ্গে নাহি উঠতে পার এঁটে ,
নরম কাঠের ছুতোর তুমি , গেলে বঙ্গ কেটে ।
কলেজ বয়ের ভয়ে তোমার ইস্তাহারের ধূম ,
রজনীতে কদিন ভায়া হয়নি তোমার ঘুম ?

দেশের টানে ইংরেজকে মানুষ গালাগালি করতো । সব দোষ তাদের । অথচ নিজের অপদার্থতার দিকে একবারও নজর দিতে চাইতো না । নিজেকে বঞ্চনা করার

এই ভাবনায় কবি লিখলেন ' ঠিক বলেছ ' ।

তোমরা কর শ্রমের বড়াই
আমরা যে বাবু
তুমি চাহ কত্তে লড়াই
আমি তাহে কাবু ।
জানিস যখন ছিলি বনে
করল এই জাতে কি ?
ধনী হয়ে মোদের ধনে
লড়বি মোদের সাথে কি ?
আছে প্রাচীন ঘিয়ের ভাঁড়
নাই থাকুক তাতে ঘি
খাচ্ছি এখন ভাতের মাড়
দেখবি পরে পাতে কি ?
শাস্ত্রগুলো করি জড়ো
ভাবলে কথা ন্যায্য
বুঝবি মোরা কত বড়
ঠিক বলেছ , হেঁহো ।

বাঙালীর গৌরব ছিল । জাতীয়তার আন্দোলনে বাঙালী ছিল অগ্রণী । গোখলে বলেছিলেন , what Bengal thinks to day, India thinks to-morrow কিন্তু সত্যই সব বাঙালীকি সেই স্তরে পৌঁছেছিল । কথা সর্বস্ব বাঙালীর হৃদয় কত দীন ছিল সেই চিত্র কবির অন্তরে ফুটে উঠেছিল —

মনের কথা বল্লে খুলে লোকে বলবে পাগল
আমিই কোন কবে রেয়াৎ
তবে কিনা সামনে নেহাৎ
যাতা কথা বলতে নাহি খুলে মুখের আগল।
কালো কুর্তি লাগায় বোটন
দেহের মাংস করি মাটন,
ভ্যা ভ্যা চেপে হালুম ডাকে তবু উঁচাই খা বোল।
অমি মোদের খ্যাতি রটে
হলেও গ্রাম্য সিংহ বটে
পিঠের দাগ ঢেকে পিটি আত্ম যশের মাদল।
পরের দড়ায় পাকে ভ্রমি
লাটিম সম ঘুর্ণোন্নতি
হচ্ছে বটে কিন্তু খটে জাগছে শক্তি আসল
খুঁজি বটে গর্ত বাসা
আত্মশক্তি আছে খাসা
বিপত্তিতে মাচার তলে খোকার মায়ের আঁচল।

বিজয় চন্দ্র ছিলেন সেই যুগের বাস্তব চরিত্র। " তিনি ছিলেন খাঁটি স্বদেশী। 'স্বদেশী পোষাক, ভারত পতাকা,' স্বদেশী গানটি ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। ভারতীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে তিনি আমন্ত্রিত হয়ে ১৯০৮ এ লন্ডনের মহাধর্ম সম্মেলনে যোগ দেন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'এবার তোরা মানুষ হ' গানটি তাঁর খুব প্রিয় ছিল। অতিরিক্ত পড়ার জন্য তিনি অকালে ১৯১৪ সালে অন্ধ হয়ে যান। তবে অন্ধত্ব তাঁকে ম্লান করতে পারেনি বরং এনে দিয়েছিল অন্তর্দৃষ্টি।" এই অন্তর্দৃষ্টিতে দেশের, স্বদেশ জননীর বিভবময় রূপ ধরা পড়েছিল বিজয় চন্দ্রের কবিতায়।

।। গোবিন্দ চন্দ্র দাস (১৮৫৫ – ১৯১৮) ।।

জাতীয়তাবাদের পল্লী কবি ছিলেন গোবিন্দ চন্দ্র দাস। দুঃখ ছিল তাঁর জীবনের ভূষণ, কারণ ছিল দারিদ্র্য। সেই দারিদ্র্যই অভিমানের তেজে দেশাত্মবোধকে হৃদয়ানলে পরিণত করেছিল। যেন তিনি ছিলেন স্বদেশ প্রেমের 'দধিচী'। বাল্য-কাল হতেই গড়ে উঠেছিল তাঁর জীবনের অপূর্ব কবিত্ব শক্তি। এই কবিত্ব শক্তিই তাঁর লেখনী মূলে দেশের গান শুনিয়ে জাতিকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল।

'নব্য ভারতে'র সম্পাদক ছিলেন দেবী প্রসন্ন। পূর্ব বাংলার কবি গোবিন্দ দাস কলকাতায় দেবী প্রসন্নের সাহায্য লাভ করেছিলেন। তিনি 'নব্য ভারতে' কবিতা লিখতেন। তাঁর বিখ্যাত কবিতাগুলো হলো 'বৃদ্ধ পেলে কই', 'নববর্ষ' বাঁশী, 'আমরা হরিহর', 'স্বদেশ ও হিন্দু মুসলমান'।

কবি ১৮৫৫র ১৬ই জানুয়ারী ঢাকা জেলার ভাওয়ালের অন্তর্গত জয়দেবপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। এই গ্রাম ছিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলা নিকেতন। এই প্রকৃতি প্রেমই তাঁকে সহজাত দেশ প্রেমের জাগরণে সাহায্য করেছিল। তিনি জন্মভূমির প্রতি তাঁর প্রীতির কথা স্মরণ করছেন —

" শত স্বর্গ শত কাশী, তার চেয়ে ভালবাসি,
অই যে অরণ্য পূর্ণা জননী আমার,
শত গঙ্গা হতে ভাই, পুন্যতোয়া ও চিলাই,
কত ঘাট ওর তীর মনি কর্ণিকায়।
জননী দুহিতা নারী, যত কিছু সে আমারি
সে আমার যাগ যজ্ঞ, সে আমার ধ্যান

তাহারে ভুলিব কিসে , সে আছে শোনিতে মিশে
স্বপনে ও দেখি তার সে চারু বয়ান ।

দারিদ্র পীড়িত কবি উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষালাভ করতে পারেন নি । তাই পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব তাঁর উপর ছিল না । দারিদ্রের জন্য তিনি জয়দেবপুর ছেড়ে ময়মনসিংহ গিয়ে রায়চৌধুরী রাজভবনে চাকুরী নেন । এই সময় জাতীয় জীবনের নানা গৌরব কাহিনীর অবলম্বনে বহু প্রেরণা দায়ক দেশাত্মবোধক কবিতা রচনা করেন । সংসারের তীব্র যন্ত্রনা তাঁকে ম্লান করেনি , তাই তিনি লিখেছিলেন —

ধৈর্য ধর ধৈর্য ধর , বাঁধ বাঁধ বুক
শত দিকে শত দুঃখ আসুক আসুক ।
এ সংসার কর্মশালা
জ্বলন্ত কালান্ত জ্বালা
কলঙ্ক দহিতে হবে যাবে যতটুকু ।

তাঁর জীবন ছিল সরল ও অনাড়ম্বর । বিলাসিতাকে তিনি ঘৃণা করতেন । তিনি বলতেন "বিলাসিতায় মানুষের নৈতিক চরিত্র অবনত , — জাতীয় জীবন ক্ষীণ ও বিপন্ন এবং দেশের দৈন্যদশা চরমে উপস্থিত হয় । সর্বোপরি বিলাসিতা কর্মশক্তি বিনষ্ট করে — দাসত্বের শৃঙ্খল সুদৃঢ় করে সামাজিক জীবনে জড়তা আনয়ন করে । ফলে জাতীয় শক্তি ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে যাইতে থাকে ।" ৩৭

দেবী সরস্বতীকে লক্ষ্য করে কবি গাইছেন —

দেবী
কি কাজে তোমারে পূজি ? বিফল কেবল ,
সঞ্জীবনী শক্তিহীনা ফেলে দাও তব বীনা

ত্যজ বিলাসিনী বেশ — ভূষণ কমল ।
একেই ভারতে হায়   নিত্য অধঃপাতে যায় ,
নিপাতে বিলাস শিক্ষা আরো হলাহল ।

যন্ত্রনার একশেষ   এত কষ্ট এত ক্লেশ
এখানে বিলাস বেশ? নাহি প্রয়োজন ,
ভারত নয়ন জলে ভাসিছে এখন ।

গোবিন্দ দাস স্বাভিমানী ছিলেন । ভাওয়ালের অপদার্থ এক রাজা তাঁকে মিথ্যা কারণে নির্বাসন দন্ড দেন । তিনি এর প্রতিবাদে ' মগের মুলুক ' কাব্য রচনা করেন । তিনি জনগণের কাছে প্রকৃত বিচার চাইছেন —

' দরিদ্র দুর্বল আমি এই কি কারণ ?
করিয়াছে জন্মশোধ প্রিয় দেশ ছাড়া
প্রবঞ্চিত করিয়াছে পিতৃধনে যারা
তোমরা বিচার কর — কে হয় তাহারা । '

আত্ম বিস্মৃত পরাধীন জাতির চৈতন্য ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় কবি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন । মৃতপ্রায় , দুর্বল চিত্ত বাঙালীকে কষাঘাত করেছেন তাঁর ' স্বদেশ ' কবিতায় —

স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ কারে এ দেশ তোমার নয় —
এই যমুনা গঙ্গা নদী , তোমার ইচ্ছা হত যদি
পরের পণ্যে , গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয় ?
গোলকুন্ডা হীরার খনি , বর্মা ভরা চুনি মনি ,
সাগর সেঁচে মুক্তা বেছে পরের কেন লয় ?
স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ কারে , এ দেশ তোমার নয় ।

এই যে ক্ষেতে শস্য ভরা , তোমার এ নয় একটি ছড়া
তোমার হলে তাদের দেশে চালান কেন হয় ?
তুমি পাওনা একটি মুষ্টি , মরছে তোমার সপ্তগোষ্ঠী ,
তাদের কেমন কান্তি পুষ্টি — জগৎ ভরা জয় ।
তুমি কেবল চাষের মালিক , গ্রাসের মালিক নয় ।

*　　*　　*　　*

স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে , এ দেশ তোদের নয় ,
সোনার বাঙ্গাঁলা সেট্রি তুমি হীরার ভারত বল্লে তুমি ,
ভারত তোমার আসবে কোলে , এই কি মনে লয় ?
' সোনা ' ' যাদু ' মিষ্টি ভাষে , ছেলে মেয়ে কোলে আসে
স্বরাজ তাহে নারাজ , চাহে কাজের পরিচয় ,
কবির কথায় তুষ্ট নহে ' ভবি ' মহাশয় ।

*　　*　　*　　*

স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে এ দেশ তোদের নয়
কহ সে শিল্প , কই সে কৃষি , কই সে যজ্ঞ - কই সে ঋষি ,
কই সে পুন্য তপোবন ব্রহ্ম বিদ্যালয় ?
কোথায় বা ব্রহ্মচর্য , অসীম স্থৈর্য্য , অসীম ধৈর্য্য
কই বা উগ্র সে তপস্যা --- ইন্দ্রে লাগে ভয় ?
প্রতিজনের প্রতি বক্ষে , কোটি কোটি , লক্ষে লক্ষে
কই সে তাদের দেশ ভক্তির দুর্গ সমুদয় ,
বিশ্বগ্রাসী অগ্নি সিন্ধু , কই সে বুকের রক্ত বিন্দু
স্পর্শ থাকুক দর্শনে তার শত্রু কুল ক্ষয় ।

লোহার চেয়ে মহাশক্ত — ভক্ত বীরের মাংস রক্ত
তাদের বুকে অস্থি দিয়া বজ্র তৈয়ার হয়
ব্রহ্মাবর্তে প্রথম আসি , তাই তো তারা দৈত্য নাশি
পুন্য ভূমি ভারত ভূমি প্রথম করে জয় ।
তাদের ' স্বদেশ ' ভারত ছিল তোদের স্বদেশ নয় ।

দেশহিতে আত্ম বলিদান এতো স্বর্গ প্রাপ্তির সম্মান । দেশ প্রাণ যাঁরা তাঁদের কাছে মৃত্যু এক সহজ চলার পথ । মৃত্যু তো একদিন এসে গ্রাস করে নিবে । তাই বীরের মৃত্যু বরণই শ্রেষ্ঠ । ' নববর্ষ ' কবিতায় কবির সেই বলিষ্ঠ কন্ঠস্বর শোনা গেছে —

' মরতে হবে মরব , তাহে ক্ষতি কিছু নাই
পচা মরণ দিও না আর তাজা মরণ চাই ।
মানুষ আমি মরব নাকি অন্ধ কারাগারে
কাপুরুষ পাতকীর মত চরণ প্রহারে ?
ব্যোমের মত বক্ষ চাহি দিগ দিগন্ত খোলা
জ্বলন্ত জ্যোতিষ্কের মত চাই সে গুলি গোলা
কালান্ত তার তেজের ছটা জ্বলন্ত প্রলয়
মৃত্যু মারা মৃত্যু চাহি জীবন জ্যোর্তিময় ।

আয় রে আমরা তিরিশ কোটি
ভাই ভগিনী সবাই জুটি
লভি আজ সে নতুন শক্তি - নূতন কলেবর ।
আয় রে আমরা আগাগোড়া ,
ভাঙা ভারত লাগাই জোড়া
আয় রে পূজি মায়ের চরণ , মায়ে দিবেন বর ।

পল্লী বাংলার পল্লী কবির এই প্রার্থনা সঙ্কট কালীন সময়ে বাংলার প্রান্তরে প্রান্তরে বাউল গীতিকারদের মতো সকলের মুখে মুখে গীত হত । স্বভাব কবির এই সব গান দেশবাসীর দেশ প্রেমকে তীব্রতর করে তুলেছিল ।

॥ অমৃত লাল বসু (১৮৫৩ - ১৯২৯) ॥

' বঙ্গে আজি যাহা ধার্য্য ,
সমগ্র ভারত — গ্রাহ্য
হবে কল্য প্রতি পাল্য , বলেছে গোখলে ।
দেশ বলে কাঁদাকাঁদি
কাজ দল বাঁধা বাঁধি
কাঁদে পড়ে হা বাঙ্গলা কি ঠকান ঠকলে ।

এ কবিতা অমৃতলাল বসুর । দেশকে ভালবাসার গৌরবে যেমন তিনি গৌরবান্বিত , দেশের অন্যায় অবিচারের প্রতি তেমনি ছিলেন খড়্গ হস্ত । বহুমুখী ছিল তাঁর প্রতিভা । একদিকে নাট্যকার , কবি , প্রহসন রচয়িতা অন্যদিকে ভাব গম্ভীর প্রবন্ধের প্রবক্তা । হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অমৃতলাল সম্পর্কে লিখেছেন, ' আমার মনে হয় আমাদের দেশে যে সকল প্রতিভাশালী লেখক জন্মিয়াছেন , তাঁহাদের মধ্যে শ্রী যুক্ত বাবু অমৃত লাল বসু সর্বশ্রেষ্ঠ । তিনি যত বই লিখিয়াছেন , যতদিন বঙ্গভাষা টিকিবে ততদিন সবগুলি টিকিবে কিনা বলিতে পারি না , তবে অনেকগুলি টিকিবে সেটি নিশ্চয় । ..... আশ্চর্য্য অমৃত বাবুর ক্ষমতা । " ৩৮

তাঁর জীবনীকার অরুণ কুমার মিত্রের ভাষায় " তাঁহার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা

এবং দেশের দেশের রাজনৈতিক অবস্থার সুগভীর পর্যবেক্ষণ তাঁহার স্বাদেশিকতাকে অপর সকলের দেশ হিতৈষণা হইতে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট রূপ দান করে। তিনি অত্যন্ত আন্তরিক ভাবেই দেশ প্রেমিক ছিলেন এবং দেশ ব্যাপী আন্দোলনের সময় নিষ্ক্রিয় থাকেন নাই। দেশের অতি প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক দুর্গতি - দুর্দশার সমাধান প্রয়াসই তাঁহার নিকট দেশ সেবার বড় আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হইত। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় সুরেন্দ্রনাথের সহযোগী রূপে তিনি বক্তৃতা করিয়াছেন, গান লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতায় ও গানে ভাবোচ্ছাস অপেক্ষা অতি বাস্তব সমস্যা গুলিরই প্রতি ইঙ্গিত আছে।

তাঁহার দেশ প্রেম বা স্বাদেশিকতা বঙ্গদেশকে অবলম্বন করিয়া বিকশিত হইয়াছিল। তিনি 'নবজীবন' নাট্যে ভারত মাতার ইঙ্গিত দিলেও রাজনীতি ক্ষেত্রে বঙ্গ জননীকেই অধিক চিনিতেন। তিনি স্বজাতি বলিতে ভারতবাসী অপেক্ষা বাঙালীকেই বুঝিতেন বেশী।" ৩৯ অমৃত লালের নিজের ভাষায় "সারা ভারতবর্ষটা এক করে আঁকড়ে ধরবার মত প্রশস্ত বক্ষস্থল আমার নেই, তাই আমার সমস্ত ভালবাসাটা, চির জীবন ধরে বাঙালার নামে — বাঙালীর নামে উৎসর্গ করে দিয়ে রেখেছি।" ৪০

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তিনি বিলাতী বর্জনের কথা বলতেন। এই সময়ই তিনি রচনা করেন এই গানটি 'ওরা জোর করে দেয় দিক না বঙ্গ বলিদান'। কতকগুলি কবিতায় ইংরাজের অপশাসন ও আমাদের জাতীয় জীবনে তার সর্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া পরিব্যক্ত হয়েছে। এই শ্রেনীর একটি কবিতা 'প্রোক্লেমেশন'। ভারত সুশাসনের এবং ভারতীয়দের সব রকম স্বার্থ রক্ষার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ যে 'রাজঘোষণা' (প্রোক্লেমেশান) ইংলন্ডের রাজা সপ্তম এডোয়ার্ড ইংলন্ড হতে প্রেরণ করেছিলেন তা যে শুধুমাত্র শব্দের আড়ম্বরে পরিপূর্ণ, ইংরেজের শাসন পদধতি হতে সেটা স্পষ্ট জানা যায়। কবিতাটি বঙ্গভঙ্গের পূর্বেই লেখা পরে আবার ভারতীর জৈষ্ঠের সংখ্যায় ১৩১২ সালে প্রথম প্রকাশিত

হয়। এই প্রোক্লামেশান আমাদের পরাধীন বিড়ম্বিত জীবনে যে কত বড় পরিহাস তা পরবর্তী কালে প্রতি পদক্ষেপে অনুভূত হয়েছিল। অমৃত লাল ব্যঙ্গ ভরে তিক্ত মনে লিখেছেন 'পরছি গায়ে প্রসাদী ম্যাগনা কোর্তা, বলছি মুখে ম্যাগনা কার্টা।' প্রোক্লামেশানের অন্তসার শূন্যতা সম্পর্কে কবি সম্পূর্ণ রূপে অবহিত —

বিনয়ে শুধাও গিয়া সিংহাসন তলে।
মহাসভা সভ্য সেই ইংরাজের দলে।।
প্রথমে বলেন রাণী যে সব বচন।
সম্রাজ্ঞী রূপেতে পরে করান স্মরণ।।
সু পুত্র সম্রাট হয়ে দিয়াছেন রায়।
অক্ষরে অক্ষরে যাহা রহিবে বজায়।।
সেই সব বচনের প্রকৃত কি অর্থ।
হবে কি রক্ষিত তাহা কখনো যথার্থ।।
কখনো দেবেনা হাত ধর্মেতে প্রজার।
এ কেমন কথা শুনি মুখেতে রাজার।।
'ডিফেন্ডার অব দি ফেথ' যাহার উপাধি।
কোন লাজে সে হইবে ধর্মেতে বিবাদী।।
জাতি ধর্ম বর্ণ ভেদ না করি বিচার।
বিদ্যার কৌশলে পদ বাড়িবে প্রজার।।
বহুদিন হতে মনে আছে এক ধাঁধা।
এ কথাটি কে কাহারে বলিতেছে দাদা।।
আরো নানা কথা আছে সেই ঘোষণায়।
তন্ন তন্ন মানে বুঝে এস সমুদয়।।
তাৎপর্য্যটি একবার হয়ে গেলে ধার্য্য।
কোন কার্য্য ভবিষ্যতে হবে না আশ্চর্য্য।।

পরে তিনিই অনুভব করেছিলেন জাতির চিরাগত সাধন ও সংস্কার এবং তথা চরিত্র নিহিত যে ধর্ম জ্ঞান তার উপরেই স্বরাজ প্রতিষ্ঠা না হলে এ জাতি আত্ম-ভ্রষ্ট হবে। 'বাল্যের বেসাতি' কবিতায় কবি লিখছেন —

'স্বদেশ স্বদেশ স্বরাজ স্বরাজ যতই মুখে ফুটছে।
দিশি খাদ্য দিশি বাদ্য দিশি গদ্য ততই শিকেয় উঠছে।।
হারমনিয়ম নিয়ম এখন হয়েছে হরিনামে।
গুমর করে কুমোর গড়ে দেবী বিবিঠামে।।
ইউনিটি ইউনিটি করে ভিরকুটী করি মুখে।
বিদ্বেষের উদ্দেশ্যে আগুন লকলকাচ্ছে বুকে।।

'সঙের ছড়া'য় বিদ্রুপ করে বলছেন —

আর্য বলি হিন্দু বলি বলি আমরা সনাতন,
বলি আর্য্য কীর্তি কাশী গয়া মথুর বৃন্দাবন,
কিন্তু প্রেতের নৃত্য তীর্থে চলে
মনকে বোঝাই কলিকাল।
সাহেব সাজো মোগল সাজো সাজো ইন্ডিয়ান
বাঙালী নামের করো নাক গয়ায় পিন্ডিদান,
রাখো বাংলার পাল পার্বন খেলা ধুলো
নিজের জেতের ভাতের থাল —
ভারাটে কোটার চেয়ে অনেক ভাল বাস্তু ভিটের খড়ের চাল।।

পরবর্তীতে বাংলায় দলাদলি দেখে 'বন্দেমাতরম' এর আদর্শ ভ্রষ্টদের চেতনা চাবুকে

আঘাত করেছেন ' নব বন্দেমাতরম ' কবিতায় —

" নাহি বিদ্যা নাহি ধর্ম , নাহি হৃদি নাহি মর্ম ,
কেবল সকল কন্ঠে কলহ কল্লোল গাজে ।
বাহুতে নাই মা শক্তি , হৃদয়ে কই মা ভক্তি ,
প্রাণ ত দেখিনা মা কাহারও শরীরে । "

বঙ্গভঙ্গের সময় তার আগুন ঝরা কবিতা ' ওরা জোর করে দেয় দিক না বঙ্গ বলিদান ' —

ওরা জোর করে দেয় দিক না বঙ্গ বলিদান ।
আমরা নব অন্তরঙ্গ , এক অঙ্গে মনের সঙ্গে মিশিয়ে প্রাণ ।।
আমরা জাত বাঙালী প্রেম কাঙালী —
ভাবছিস তোরা মন ভাঙালি ,
তা নয় , জ্বালিয়ে আগুন করে দ্বিগুন বাড়িয়ে দিলি প্রাণের টান ।
আমাদের চোখ ফিরেছে মায়ের কুড়েতে ,
বিদেশী চিনির চেয়ে দেশের গুড়েতে ,
আবার কর্কচেতে হয়েছে রুচি , চাইনে তোদের লবণ দান ।।
আমাদের জাতের সঙ্গে তাঁত বজায় থাক ,
নাই বা দেখাই সাঁজের জাঁক ,
তোদের এই চক চকান মধুর চাকে করবো না আর বিষপান ।
তোদের কাচের বাসন কাচের চুড়ি ,
ফেলবে ভেঙে মেরে থুড়ি ,
করে দেবতা সাক্ষী ঘরের লক্ষ্মী শাঁখার আবার রাখবো মান ।।
তোদের শাপে হল আশীর্বাদ ,
দৃঢ় হল মনের বাঁধ ,
এই বিসংবাদে বঙ্গভেদে , আমরা হলুম আবার তেজীয়ান ।
পেয়ে মর্মে আঘাত , কর্মে হাত বাকি্য ছেড়ে দেবে বুদ্ধিমান ।

কবি অন্তিমে নিজের জীবন সম্পর্কে বলেছেন = " I am an old man, an old one who at the age of fifteen carried under the leadership of Naba Gopal Mitra a flag blazened with the then new world National. Every one leaning his head at the sound of that world is my kin".
সত্যিই দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত সকল মানুষই ছিল তাঁর আত্মীয় ।

॥ কার্তিক চন্দ্র দাশগুপ্ত (১৮৮৪ - ১৯৬৩) ॥

পূর্ব বাংলার কবি । বাড়ী ছিল বরিশাল । শিশুদের জন্যই ছিল তাঁর সাহিত্য রচনা । কিন্তু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কবিকে উদ্বেল করে তুলেছিল । তাঁর কবিতায় ছিল বিদ্রোহের সুর । চড়া বিদ্রোহের সুরে বাঁধা কবিতাগুলোতে যেন কাজী নজরুল ইসলামের কন্ঠ স্বর শোনা গেছে । নজরুল পরবর্তীতে এই বিদ্রোহাত্মক ভাবনায় কবিতা লিখেছেন । স্বদেশী আন্দোলনের যুগে নব্যভারত , সন্ধ্যা , নবশক্তি , নায়ক ও সুপ্রভা প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হতো । তাঁর কিছু কবিতা বিখ্যাত । তাঁর কাব্য গ্রন্থ ' আমার দেশ ' (১৯০৬) , এবং ' পূজা ' প্রকাশিত হয় ১৯০৭ সালে ।

' আমাদেশ দেশ ' গ্রন্থে ' মাতৃপূজা ' নামে এক কবিতায় বিদ্রোহাত্মক ভাবনা প্রকাশ করেছেন —

বিশ্বময়ীর মায়ের পূজা মায়ে দিবেন বর
এ পূজায় চাই মুন্ড ডালি , আয়রে নারী নর ।
নেত্র আপন দিয়া পায়ে , দাশরথি পূজল মায়ে
আমরা তো ভাই তিরিশ কোটি তারই বংশ ধর
রক্ত জলে বিশ্বময়ীর চরণ রক্ত কর ।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কালে শাক্ত মতের প্রাবল্য দেখা দেয় গানে ও কবিতায় । আরাধ্যা দেবী কালি কিম্বা দুর্গাকে দেশ জননী রূপে কল্পনা করে তাঁর পায়ে জীবন বিসর্জন দেওয়ার মধ্যে যে ত্যাগ সেই ত্যাগেই বিপ্লবী বা স্বদেশীদের উদ্বুদ্ধ করার প্রেরণা ছিল এই কবিতার মধ্যে ।

কার্তিক চন্দ্র 'দেশের আশা আছে' কবিতায় জরাজীর্ণ ভারতে আবার আশার আলো দেখেছেন । সকল অন্ধকারের অবসানেই আসে আলোর চেতনা । অন্ধকার মানুষের সারা জীবনের সাথী নয় , তেমনি দেশেরও । এই অসহায় অবস্থা কেটে যাবে —

দেশের আশা আছে রে ভাই , দেশের আশা আছে
মরলে মানুষ আবার হয়
ভাঁটার পরে জোয়ার বয়
নতুন ডাল গজিয়ে উঠে , দেখছি মরা গাছে ,
দেশের আশা আছে রে ভাই দেশের আশা আছে ।

বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলনের পরেই এসেছিল বিপ্লবী আন্দোলন । স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিভূ ছিল বাংলার বালক , কিশোর , ছাত্র সমাজ । তাই ইংরেজদের রোশ ছিল এদের প্রতি তীব্র । কারণে অকারণে চলত এই বালক শিশুদের উপর অত্যাচার । এই অত্যাচারে কবি নিজে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন । 'ওদের শিশুর রক্ত চাই' কবিতায় (১৩১৩) কবি বলছেন —

ওরা শিশুর রক্ত চায় গো , ওরা শিশুর রক্ত চায় ।
পরীক্ষা আজ বিষম অতি
ও মোর দেশের পদ্মাবতি
ছেলের বলির সমারোহে আয় , মা ছুটে আয় ।
কান্না কাটি রাখ মা দূরে
ও সব হবে অন্তপুরে

রণাঙ্গনে মাতঙ্গিনীর বেশ তুলে দে গায় ,
ওরা শিশুর রক্ত চায় গো , ওরা শিশুর রক্ত চায় ,
ওরা শিশুর রক্ত চায় গো , ওরা শিশুর রক্ত চায় ।
একটি ছেলে দিবি বলি
উঠবে শত মৃত্যু ঠেলি
দেখব এবার কত খেয়ে তৃপ্তি ওরা পায় ।
জানিস তো মা আগাগোড়া
রক্ত বীজের বংশ মোরা
রক্ত ফুটে লক্ষ হব ধ্বংস সাধনায়
ওরা কত রক্ত চাই গো , দেখব কত রক্ত চায় ।

কবি কার্তিক চন্দ্রের কবিতা সেই সময় সন্ধ্যা ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রশংসিত হয়েছিল ।

॥ সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত (১৮৮২ - ১৯২২) ॥

সমসাময়িক ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে তিনি স্বদেশ গীতি রচনা করেন । সত্যেন্দ্র নাথের প্রকৃতিই ছিল যা কিছু মহৎ ও শ্রেয় তার পূজা করা ।"স্বদেশ ভাবনা তাঁর অন্তকরণে ছিল প্রবল । বর্তমানের যাহা কিছু অধর্ম ও অসত্য , যাহা কিছু ভীরুতা ও জড়তা যাহা কিছু ক্ষুদ্রতা ও মূঢ়তা ছিল তাহাকেই কঠিন ধিক্কার দিতে ও বিদ্রুপ করিতে গিয়া তাঁহার বানী বেদনার জ্বালায় বিষাক্ত হইয়া উঠিত । আবার অতীত ও বর্তমানে যাহা কিছু মহান ও সুন্দর ভবিষ্যতে যাহা কিছু মহান ও সুন্দর হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছেন , তাহাই তাঁহার মর্ম স্পর্শ করিত এবং তাঁহার বন্দনা গানে তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িতেন । " ৪২

বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তে বিচলিত কবি লিখছেন ' সন্ধিক্ষণ ' কাব্য । কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯০৫ । মোট পৃষ্ঠা — ১৩ । স্বদেশী আন্দোলনের যুগে স্বদেশ প্রেমে অনুপ্রাণিত হয়ে ' সন্ধিক্ষণ ' লিখিত হয় । সন্ধিক্ষণের উৎসর্গ পৃষ্ঠায় কবি লিখেছেন —

' যাঁহারা আদর্শ আজি বঙ্গে একতার
তাহাদেরই তরে এই ক্ষুদ্র উপহার । '

কবি স্বদেশী আন্দোলনের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন । কার্জনের বঙ্গ বিভাগে উদ্বেল সারা দেশ । সুরেন্দ্র নাথের ভাষায় 'Lord Curzon has divided our province, he has sought to bring about the disintegration of our race, and to destroy the solidarity of our popular opinion. Has he succeeded in this novel endeavour? He has built better than he know, he has laid broad and deep the foundation of our national life, he has stimulated these forces which contribute to the up building of nations, he has made us a nation, and the most re-actionary of the Indian Vice-roys will go down do posterity as the Architect of the Indian National life.' ৪৩

সুরেন্দ্র নাথের এই বক্তব্য সেদিনের আন্দোলনের এই সংহত রূপের বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল । সত্যেন্দ্র নাথের ' সন্ধিক্ষণ ' এই দেশ কালের বৈশিষ্ট্যেই প্রকাশিত হলো । কবি বলছেন —

এত দিনে , এত দিনে বুঝেছে বাঙালী
দেহে তার আজো আছে প্রাণ ,
এ জগতে যোগ্য যাঁরা তাঁহাদেরি মাঝে
আমরাও করে নিব স্থান ।

যে খুশি টিটকারী দিক
অন্তরে বুঝেছি ঠিক
এ কেবল নহেক হুজুগ ,
সন্ধিক্ষণ আজি বঙ্গে , এল নবযুগ ।

পথে ঘাটে দেখ চেয়ে অন্দরের বাহিরে
দেশহিতে বিলাস বর্জন ,
বিরাট সহস্র শীর্ষ উঠেছে জাগিয়া
লক্ষ মুখে এক দৃঢ় পণ ।
যেথা যে বাঙালী আছে ,
প্রাণে প্রাণে মিলিয়াছে ,
শুভ লগ্ন পেয়েছে বাঙালী
মনে হয় আর মোরা রব না কাঙালী ।

এ বড় আশার দিন -- পণ্য স্বদেশের
সবে তুলে লয়েছে মাথায় ,
এবার পরীক্ষা হবে প্রতিজ্ঞার কা
ভগবান হউক সহায় ।
ভুলেছিনু মনুষ্যত্ব
বিলাস ব্যসনে মত্ত
ভুলেছিনু পৌরুষের স্বাদ
কে জাগালে সে পৌরুষ ? কিসের আহ্লাদ ?

এ বড় সঙ্কট কাল - পনের রক্ষণ
আমাদের ভ্রম পদে পদে ,
সতর্ক জাগ্রত যেন রহি সর্বক্ষণ ,
নাহি ডুবি কলঙ্কের হ্রদে ।
স্মরি স্বদেশের দুখ --

মাতা - পত্নী - কন্যা - মুখ —
নিত্য প্রাতে উচ্চারিব পণ —
বাঁচাব দেশের শিল্প — দেশের জীবন ।

অর্থের সম্বন্ধ হতে কত উচ্চতর
মনুষ্যত্ব - দেশহিত ব্রত
স্বার্থ সাথে স্বদেশের বিরোধ যেথায়
স্বদেশেরি পায়ে হব নত ।
এ কথা না ভুলে রই
আমি শুধু তুমি নই
দেশের মাঝারে একজন ,
দেশের দশের শুভে কল্যাণ আপন ।

স্বার্থান্ধ স্বদেশ দ্রোহী জান নাকি হায়
জান নাকি আত্মদ্রোহী তুমি ,
পুত্র - পৌত্র অন্নাভাবে মরিবে , এখনো
প্রসারিয়া লও কর্ম ভূমি ।
কারে কর পরিহাস ?
নিজ স্ত্রীর লজ্জা বাস
তাও নহে আয়ত্ত অধীন
সত্য তুমি অতি দীন — অতি দীন ।

কবি স্বদেশ ব্রতে দীক্ষিত যুবক ও শিক্ষক দলের স্বদেশী আন্দোলনের কর্তব্যে প্রাণপাত করতে দেখেছেন । সেই অপূর্ব দশ্য তার ' সন্ধিক্ষণ ' কাব্যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল —

পাঠশালে ছাত্র করে বিদেশী বর্জন ,

চমৎকার , দৃশ্য চমৎকার ।

বিলাস - বর্জনে হের তরুণী ছাত্রীরা

অগ্রগামী আজি সবাকার ।

বল রাজপুতানারে —

বেণী বিসর্জিতে পারে

বঙ্গ নারী তাঁদেরি মতন ,

অন্তরে সে বীরাঙ্গনা শৌর্যে ভরা মন ।

শিক্ষক শিখান আজি বালকে যুবকে

হইবারে দেশের সেবক

যত ধনী মহাজন পন বদ্ধ সবে ,

ঊর্ধ্ব শিখা উৎসাহ পাবক ,

মহা প্রাণ সমুদার

কত শ্লাঘ্য জমিদার

লয়েছেন দেশ হিতব্রত

মুক্ত কোষ সবে , প্রাচ্য রাজাদেরি মত ।

কনা কনা স্বর্ণ ছিল মৃত্তিকার মাঝে

ধুলিপারা ধুলি মাঝে হারা ,

আজি কোন অনির্দিষ্ট ভূগর্ভের তাপে

গলে মিশে হল স্বর্ণ ধারা

হার গড়ি সে কাঞ্চনে

এস সবে , সযতনে —

পরাইব দেশের গলায়

জননি , জন্মভূমি , সাজাব তোমায় ।

বাহিরের ঝড় এসে ভাঙে যদি ঘর —
কোথা থাকে পুত্র পরিবার
অন্তরের প্রবল হাওয়া উঠিয়াছে যদি
নত হও সম্মুখে তাহার ।
স্বদেশ তোমার পানে
কাতর নয়নে চেয়ে আছে
আশা করে মাতৃভূমি প্রত্যেকের কাছে ।

কবি এই বঙ্গভঙ্গের কালকে সমাগত ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল অধ্যায় রূপে অনুভব করেছেন এবং দেশবাসীর নিকট আশাও করেছেন সেই ভাবনায় ।

সুবেশ রাখাল বেশ সকলি ভুলিয়া ,
ধন্য হও স্বদেশের কাজে ,
প্রতিজ্ঞা রাখিয়া স্থির স্থানুর মতন
মান্য হও জগতের মাঝে
আত্মতেজে করি ভর
কর্মে হও অগ্রসর
মূর্খে শুধু বলে এ ' হুজুগ '
বঙ্গ ইতিহাসে হের এল স্বর্ণ যুগ ।

ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন " সত্যেন্দ্র নাথের কবি মানসের বহিঃ প্রকাশ স্বদেশ প্রীতিতে ও জ্ঞান বিজ্ঞান প্রিয়তায় । সদা উৎসুক দেশ চেতনায় ও সমাজ চেতনায় তাঁহার কবি কর্ম প্রায় সর্বদা উদ্ভাসিত । " 'বেনু ও বীনা' (১৯০৬)

কাব্যটির মধ্যে ' বঙ্গ জননী ' কবিতায় যেন রুদ্র রূপে ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে অসুর বিনাশিনী মাতৃরূপে বঙ্গ জননীকে সাজতে বলছেন —

' ত্রিশূল তুলে নে মা আবার রূপে জ্যোতি পরকাশি ,
ভয় ভাবনা ভাসিয়ে দিয়ে হাস মা আবার তেমনি হাসি ।
চরণ তলে সপ্তকোটি সন্তানে তোর মাগে রে
বাঘেরে তোর জাগিয়ে দে মা , রাগিয়ে দে মা নাগেরে ,
সোনার কাঠি , রূপার কাঠি — ছুঁইয়ে আবার দাও গো তুমি ,
গৌরবিনী মূর্তি ধর — শ্যামাঙ্গিনী বঙ্গভূমি ।

দার্শনিক কবি সত্যই অনুভব করেছিলেন বঙ্গভঙ্গ এক নতুন যুগের সৃষ্টি করেছিল ! ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ সব চাইতে শ্রেষ্ঠ কীর্তি স্তম্ভ । সত্যেন্দ্র নাথের কল্পনার ' স্বর্ণযুগ 'কে দেখে বিশ্বের দার্শনিক ও ঐতিহাসিক উইল ডুরান্ট বললেন, "It was in 1905, then, that the Indian revolution began".

।। সরলা দেবী (১৮৭২ - ১৯৪০) ।।

সরলা দেবী ছিলেন রবীন্দ্র নাথের ভগিনী স্বর্ণ কুমারী দেবীর কন্যা । বঙ্গভঙ্গের প্রবল আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ ' ভারতীর ' সম্পাদকের পদ হতে পদত্যাগ করেন । দায়িত্ব নিলেন সরলা দেবী । ' ভারতী ' ছিল ঠাকুর বাড়ীর নিজস্ব পত্রিকা । এর পরিমন্ডল ও পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ ভাবে ঠাকুর বাড়ী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত । বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভারতী যুগ বলতে বিশেষ সাহিত্যাদর্শকেই

বুঝিয়েছে । এই ভারতী ছিল বাঙালীর কল্পনা ও চিন্তার ধারক । সরলা দেবী সেই ধারাকে অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করেন । সরলা দেবীর বোন হিরন্ময়ী দেবীও 'ভারতীর' সম্পাদনা করেছেন ।

সংগীত চিত্ত ভাবনার উৎকর্ষের ফসল । সরলা দেবী নিজে ভাল সংগীত করতেন । তাই সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে তিনি কবিতা রচনা করেন । ১৯০১ সালে কলকাতায় সরলা দেবী কংগ্রেসের অধিবেশনে ' অতীত গৌরব কাহিনী মম বানি , গাহ আজি হিন্দুস্থান ' গানটি করেন । এই গানটি ভারতীতে প্রকাশিত হয় । অধিবেশনে গানটি কোরাস রূপে গীত হয়েছিল । এই গানের মধ্য দিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষের এক অপূর্ব ছবি ফুটে উঠেছে --

অতীত গৌরব কাহিনী মম বানি , গাহ আজি হিন্দুস্থান ,
মহা সভা উন্মাদিনী মম বানি , গাহ আজি হিন্দুস্থান ,
কর বিক্রম - বিভব - যশঃ সৌরভ পূরিত সেই নাম গান ,
বঙ্গ , বিহার , উৎকল , মাদ্রাজ , মারাঠ ,
গুর্জর , পাঞ্জাব , রাজপুতান ।
হিন্দু , পার্সি , জৈন , ইসাই , শিখ , মুসলমান ,
গাও সকল কন্ঠে সকল ভাষে নমো হিন্দুস্থান ।

ভারত জননী ছিল তাঁর স্বপ্নের দেশ , সাধনার দেশ । ব্যক্তিগত জীবনে সেই স্বদেশ চেতনার বানী তিনি ছড়িয়ে দিতে চাইতেন । তাই সরলা দেবীকে দেখা গেছে কংগ্রেসের অধিবেশনে দেশাত্মবোধক সংগীত গাইতে । ' ভারত জননী ' কবিতায় সেই ভাবনা ব্যক্ত করেছেন তিনি --

' আশার আলোকে ফুল্ল হৃদয়ে আবার শোভিবে ধরনী ।
নব জীবনের পশরা বহিয়া
আসিছে কালের ধরণী , হাস তো কমল বরণি ।
এসেছে বিদ্যা , আসিবে ঋদ্ধি
শৌর্য্য বীর্য শালিনি ,
আবার তোমায় দেখিব জননী
সুখে দশদিক পালিনী ।
অপমান কত জুড়াইবে মাতঃ
খর্পর কর বালিনী , শৌর্য্য বীর্য শালিনী ।

তাঁর অন্য যে সকল কবিতা এই যুগে রচিত সেইগুলি হচ্ছে ' বীরাষ্টমীর গান ' । ১৩১১ সালের কার্তিক সংখ্যায় ভারতীতে প্রকাশিত । ' মাতৃদ্রোহীর প্রতি ' শ্রাবন ১৩১৩ তে প্রকাশিত , ' ভয় নাই ' মাঘ ১৩১৩ ও ' বাঙালীর পরীক্ষা ' আশ্বিন , ১৩১২ তে প্রকাশিত । ' বীরাষ্টমীর গান ' দেশবোধে উদ্দীপিত করার গান —

' স্বদেশানুরাগে যেই জন জাগে , অতি মহাপাপী হোক না কেন ,
তবুও সে জন অতি মহাজন সার্থক জনম তাহার জেনো ।
দেশ হিত ব্রত এ পরশমনি , পরশিবে যারে বারেক যখনি
রাজভয় আর কারা ভয় তার ঘুচিবে তাহার তখনি জেনো ।
মাতৃভূমি তরে যেই অকাতরে নিজ প্রাণ দিতে কভু নাহি ডরে
অপঘাত ভয় আশু তার যায় মরণে গোলকে যায় সে জেন' ।

দেশ জননী যখন বিপন্না , শত্রু পদাঘাতে আর্তা , স্বৈরাচারীর শাসনে বিদীর্ণা , সেই সময় তাঁর সন্তান যদি বিলাস ব্যসনে কাল কাটায় , জননীকে ভুলে যায়

তবে সে তো মাতৃদ্রোহী। এই ভাবনার কবিতা 'মাতৃদ্রোহীর প্রতি' —

ও কিরে সাজ
বিলাস বসনে ভূষিত অঙ্গ
নাহিরে লাজ
কাঙালিনী ওই জননী তোদের
নাহিরে ঠিকানা উদরান্নের
তারি সুত তুমি গর্বে চলেছ
পরিয়া তাজ
নাহিরে লাজ।

খাটিবে আয়
জননীরে আজি রাখিতে সকলে
মরিবি আয়
যে শোণিত ওরা লয়েছে শুষিয়া
পূরা তাহা আজি নিজ লহু দিয়া
মাতৃদ্রোহীর প্রায়শ্চিত্ত
মানিব তায়
মরিবি আয়।

'ভয় নাই' এ কবির বক্তব্য —

সারাটা বিশ্ব চকিত চক্ষে
চাহিয়া মোদের পানে
পতিত দলিত এ জাতি কভু কি
পারিবে জিনিতে রণে

লব শিরে কি কলঙ্ক ডালি ,
সহিব পরের উপহাস গালি ,
কভু নয় কভু নয় । মাঝ পথ হতে
আমরা কি ফিরি ভাই ,
মায়ের মন্ত্রে দীক্ষিত সবে
কোন ভয় নাই , নাই ।

বাংলার জাগরণে কবি নিজেও উদ্দীপ্তা । ' বাঙালীর পরীক্ষা ' য় বাঙালীকে সকল দুর্বলতা ত্যাগ করে সাহসী হতে বলেছেন — নাহলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না ।

তাই বলি মন জেগে থাক্
পাছে আছেরে শ্বেত চোর
কালি নামের অসি ধর , তারা নামের ঢাল
ওরে সাধ্য কি বৃটেনে তোরে করতে পারে জোর !

॥ মুকুন্দ দাস (১৮৭৭ - ১৯৩৬) ॥

জাতীয়তাবোধ জাগরণের চারণ কবি ছিলেন মুকুন্দ দাস । বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী যুগে স্বাধীনতার গান গেয়ে তিনি সুপ্তি মগ্ন দেশবাসীকে জাগাতে সচেষ্ট ছিলেন । জন্ম তাঁর ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের বানারি গ্রামে । বাংলা ১২৮৫ তে তাঁর জন্ম (ইংরাজী ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে) । পিতৃদত্ত নাম যজ্ঞেশ্বর দে । নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে চারণ কবি তাঁর ডায়েরীতে লিখে রেখেছিলেন " আমার বাবার নাম গুরুদয়াল

দে , মার নাম শ্যামা সুন্দরী । আমার পাগল বাবা , পাগলী মা — আমার নাম শ্যামা । " তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু অবধূত রামানন্দের ইচ্ছায় তিনি মুকুন্দ দাস হয়েছিলেন । স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রটিকে প্রস্তুত করার প্রয়োজনে বিংশ শতাব্দীর উষা লগ্নে যে নব জাগরণের মন্ত্র কানে কানে প্রাণে প্রাণে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল মুকুন্দ দাস নিজের জীবন নিঃশেষিত করে সগৌরবে তারই প্রয়োজন সাধন করেছিলেন ।

বাংলা ১৩১০ ইংরাজী ১৯০৩ সালে তিনি একশটি গান নিয়ে তাঁর সঙ্গীত সংগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন । নাম দিয়েছিলেন ' সাধন সঙ্গীত ' । এই সাধন সঙ্গীতের গান তাঁর প্রায়ই প্রতিটি যাত্রাই যুক্ত হয়েছিল । যদিও সাধন সঙ্গীতের পুস্তক খানি দুর্লভ , চারণ কবি মুকুন্দ দাসের দৌহিত্রী পুতুল দেবীর প্রচেষ্টায় সেই সকল গান উদ্ধার করা হয়েছে । সেই সব গানের উল্লেখযোগ্য কিছু গানের প্রথম কলি নিয়ে সন্নিবেশিত হলো ।

১ । জাগরে জাগরে , ডাকরে ডাকরে , মাতরে মায়ের নাম গানে

২ । মা আমার বিশ্বরাণী আমি তাঁর আদরের ছেলে

৩ । এমন দিন কি আসবে মোদের , আমরা আবার মানুষ হবো

৪ । ভারতের ভগ্ন প্রাণগুলি লগ্ন করে দে মা

৫ । শুনি মাভৈঃ মাভৈঃ ধ্বনি মাভৈঃ মাভৈঃ

৬ । ভাইরে মানুষ নাই এ দেশে

৭ । ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে

৮ । ভরসা মায়ের চরণ তরণী আমরা এবার হবই পার

৯ । জাত গেছে সে জাতির — যারা প্রাণ দেখেনা বিচার করে দেখে কেবল বাহির

১০ । স্বরাজ সেদিন মিলিবে যেদিন চাষার লাগিয়া কাঁদিবে প্রাণ

১১ । করমেরই যুগ এসেছে , সবাই কাজে লেগে যা

১২ । আর কারে ভয় , মায়ের পেয়েছি অভয়

১৩ । আয়রে বাঙালী আয় সেজে আয় আয় লেগে যা দেশের কাজে

১৪ । অতীত গিয়াছে অতীতে মিলিয়া সম্মুখে মহা-ভবিষ্যত

১৫ । বান এসেছে মরা গাঙে খুলতে হবে নাও

১৬ । জাগ গো জাগ জননী , তুই না জাগিলে শ্যামা কেউ জাগিবে না গো মা

১৭ । স্বরাজ স্বরাজ করিস তোরা স্বরাজ কি আর গাছের ফল ?

১৮ । সাবধান , সাবধান আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দন্ড রুদ্র দৃপ্ত মূর্তিমান

১৯ । বন্দে মাতরম বলে নাচরে সকলে

২০ । অগ্নিময়ী মায়ের ছেলে আগুন নিয়েই খেলবে তারা

২১ । মূর্ত করিয়া লুপ্ত গরীমা আবার বিশ্বে আনিল যে

২২ । এমন দিন কি আসবে মোদের আমরা আবার মানুষ হব

২৩ । আমি গান করিতাম গাইতে দিলে গান , সে গানে মাতিয়ে দিতাম প্রাণ

২৪ । এসেছে ভারতে নব জাগরণ পেয়েছে ভারত নূতন প্রাণ

২৫ । আমি দশ হাজার প্রাণ যদি পেতাম

২৬ । ফুলার — আর কি দেখাও ভয় ?

' সাধন সঙ্গীত ' বইটি মুকুন্দ দাস গুরু রামানন্দের নামে উৎসর্গ করেন ।

১৩১২ সালে সারা বাংলায় শোনা গেল বঙ্গভঙ্গের আর্তনাদ । স্বদেশী জাগরণের বিজয় ডঙ্কাও শোনা গেল । বৈষ্ণব মুকুন্দ দাসের হৃদয় বীনা বেজে উঠল সেই আন্দোলনে । অশ্বিনী কুমার দত্তের সংস্পর্শে তিনি আকৃষ্ট হলেন রাজনীতিতে ।

" অশ্বিনী কুমার বলেছিলেন — যজ্ঞা তোর এই কন্ঠ আর প্রাণ নিয়ে তুই হবি নূতন যুগের চারণ , যাদের আজও ঘুম ভাঙেনি , তুই জাগিয়ে দিবি তাদের । " ৪৬ এর পরেই তিনি লিখেছিলেন ' মাতৃপূজা ' নাটক । তাঁর স্বদেশী যাত্রায় বাংলার প্রান্তর আবেগে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল ।

দাম্ভিক অত্যাচারী বৃটিশ সরকারের স্বৈরাচারী শাসনে বাংলার করুণ মুখচ্ছবি মুকুন্দ দাসের হৃদয়ে তুষানলের সৃষ্টি করল । কীর্তনীয়া মুকুন্দ দাসের মন থেকে বৈষ্ণবের প্রেমময় ও বিনয় ভাব অন্তর্হিত হয়ে রুদ্র রূপিনী মাতৃভাব জেগে উঠল । রুদ্র রূপিনী শ্যামা মায়ের আরাধনায় দেশ জেগে উঠবে —

জাগো গো জাগো জননী
তুই না জাগিলে শ্যামা , কেউ তো জাগিবে না
তুই না নাচালে কারো নাচিবে কি ধমনী ?
ডেকে ডেকে হলাম সারা কেউ তো সাড়া দিল না মা
খুঁজে দেখলাম কত প্রাণ , কারো প্রাণ তো কাঁদে না
তুই না কাঁদালে প্রাণ , কাঁদিবে কি কারো প্রাণ
না কাঁদিলে সবার প্রাণ , পোহাবে কি রজনী ।

জীবন তো একটা আদর্শের জন্য সমর্পিত । বিশেষ করে জাতির জীবনে যখন একটা দুর্যোগ সেখানে আত্ম সমাহিত জাতিকে চৈতন্যের অধিকারী হতেই হবে । মোহ মুগ্ধ

ভারতবাসীকে কবি আহ্বান জানাচ্ছেন —

' হাসিতে খেলিতে আসিনি এ জগতে
করিতে হবে মোদের মায়ের সাধনা
দেখাতে হবে আজি জগতবাসী সবে
এখনো ভারতের যায়নি রে চেতনা ।
গভীর ওঁঙ্কারে , হুঙ্কারি দেবে ডাক
শিহরি উঠুক বিশ্ব মেদিনীটা ফেটে যাক
আমাদের জন্মভূমি দেবতার লীলাভূমি
দেবগণ আসুক নেমে পূর্ণ হোক কামনা ।

বিভক্ত বাংলার বিক্ষুব্ধ দেশবাসীর উপর ব্যামফিল্ড ফুলারের রক্ত নেত্র হতে যেন অগ্নি বর্ষিত হতে লাগলো । বিক্ষোভের আগুনকে তিনি অত্যাচারীর ভূমিকায় চাপা দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন । ফুলার তখন পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের গভর্নর । তাঁর অত্যাচারে যখন দেশের মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত , মুকুন্দ দাস ফুলারের বিরুদ্ধে নির্ভিক তালে গান ধরলেন —

" ফুলার , আর কী দেখাও ভয়
এ দেহ তোমার অধীন বটে
মনতো তোমার নয় ।।
হাত বাঁধিবে পা বাঁধিবে
ধরে না হয় জেলই দেবে
মনকে ফিরাতে পারবে
সে তো পূর্ণ স্বাধীন রয় ।।
বন্দে মাতরম মন্ত্র কানে

ধর্ম এঁটে দেহে মনে
রোধিতে কি পারবে রণে
তুমি কত শক্তি ময় ।

পরাধীন ভারতের অর্ন্তবেদনা মুকুন্দ দাসের হৃদয়ের তন্ত্রীতে ঢেউ তুলতো । ইংরাজ শাসনে শোষিত ভারতবাসী নিপীড়িত লাঞ্ছিত হতো । ভারতের কৃষিজাত ফসল ও শিল্পের লভ্যাংশ সবই যেত বিদেশে । এত অত্যাচার সহ্য করেও ভারতবাসী যেন অসহায় ছিল । এই নীরব থাকার বেদনা তাঁর বুকে বড় বাজত । তিনি নিজেকে যেন বিপ্লবী সত্ত্বায় প্রতিষ্ঠিত করে সংগ্রামী মনোভাব প্রকাশ করতেন তাঁর বজ্রকণ্ঠে —

আমি দশ হাজার প্রাণ যদি পেতাম
তবে ফিরিঙ্গী বণিকের গৌরব রবি
অতল জলে ডুবিয়ে দিতাম ।
শোন ভাই সব স্বদেশী
হিন্দু মোছলেম ভারতবাসী ,
পার কি না ধরতে অসি
জগতকে তা দেখাইতাম
কথা শুনে প্রাণ যদি মজে
সেজে আয় বীর সাজে
দাস মুকুন্দ আছে সেজে
দাঁড়ি পেলে তরী ভাসাইতাম ।

মুকুন্দ দাসের জীবন ছিল অশ্বিনী কুমার দত্তের আদর্শবোধে গড়া । জাতীয় চেতনার গান রচনার প্রেরণা অশ্বিনী কুমারই দিয়েছিলেন মুকুন্দ দাসকে । যাত্রাগানের মধ্য দিয়ে স্বদেশ বাসীকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস ছিল তাঁর এক অভিনব প্রচেষ্টা ।

উদ্দীপিত দেশবাসী আদর্শের টানে ছুটত মুকুন্দ দাসের প্রতি। স্বদেশী আন্দোলনের প্রচারে অশ্বিনী কুমার দত্তের বিশাল এক ভূমিকা ছিল পূর্ব বঙ্গে। যার জন্য তিনি ইংরাজদের কোপ দৃষ্টিতে পড়েন। ইংরেজ সরকার কর্তৃক অশ্বিনী কুমারকে রাষ্ট্রবিরোধী কাজের জন্য গ্রেপ্তার করা হলো। অশ্বিনী কুমারের গ্রেপ্তারে বরিশাল বাসীর মনে শোকের ছায়া নেমে এল। মর্মাহত হলেন মুকুন্দ দাস। এই জ্বালাময়ী বেদনা তাঁর হৃদয়ে উত্তাপের সৃষ্টি করল। আগুনের সমুজ্জ্বল জ্যোতিতে জ্বালাময়ী রূপ নিয়ে যেন ভাষা তার লেখনীর মাধ্যমে আত্ম প্রকাশ করল —

" অগ্নিময়ী মায়ের ছেলে আগুন নিয়ে খেলবে তারা,
মরেনি বীর সেনা দল আবার আগুন জ্বালবে তারা।
অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষা তাদের জ্বালবে নারে হোমানল,
তাদের ত্যাগে বৈরাগ্যের পূর্ণাহুতি বজ্রানলের কালানল।
স্বর্গ নরক করি মনে, চায় না তারা মোক্ষপানে,
বীরাচারি লেংটা মায়ের বীর পূজার এমনি ধারা।
বেসুরেই বাজাবে তারা তাদের রণোন্মাদের যন্ত্রগুলি,
গগন ছেয়ে উঠবে তাদের নৃত্য পায়ের মুক্ত ধুলি।
অত্যাচারীর কন্ঠরুধির পানীয় তাদের বড়ই তৃপ্তির,
ক্লীবত্ব যায়নি যাদের বলবে তাদের পাগল পারা।
মায়ের বুকে পাষাণ চাপা দেখেও যারা খেতাব চান,
তারাই তো দেশের দুশমন তারাই তো দেশের শয়তান।
যদি দেশের মুক্তি চাও, ওদের দূরে সরিয়ে দাও,
লাল ফাগুয়ার খেলরে হোলি, ছুটুক লালে লাল ফোয়ারা। "

স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের পটভূমিতেই জন্ম নিয়েছিল বিপ্লববাদের। চারণ কবি মাত্রেই বিপ্লবী। দেশবাসীর অন্তরে বিপ্লবের তরঙ্গ তোলাই তো তাঁর কাজ। উপরোক্ত

গানে চারণ কবি মুকুন্দ দাসের বৈপ্লবিক চেতনা প্রকাশিত হয়েছে ।

১৯০৬ এ কংগ্রেসের অধিবেশনে মুকুন্দ দাস দেশাত্ম বোধক সঙ্গীত গেয়ে সদস্য - দের মুখরিত করেন । ১৯০৭ এ বরিশালে স্বদেশী যাত্রার আসরে বিবেকানন্দের মত গৈরিক বসন পড়ে দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসীর আগুন জ্বালানো দৃষ্টি নিয়ে বজ্র নির্ঘোষ ধ্বনিতে গান ধরলেন —

" আয় রে বাঙালী আয় সেজে আয়
আয় লেগে যাই দেশের কাজে
দেখাই জগতে ভেতো বাঙালী
দাঁড়াতে জানে বীর সমাজে
বহুদিন পরে ডাক এল আজ
ওরে বাঙালী সাজ তোরা সাজ
এখনো নীরবে নাই কিরে লাজ
ধিকরে তোদের ক্ষাত্র তেজে ।
কোটি কণ্ঠে আজ জয় মা বলিয়া
দ্বেষ হিংসা আজি চরণে দলিয়া
দাঁড়াবে বাঙালী আপনা ভুলিয়া
সাজাই বাংলা নতুন সাজে ।
মাভৈঃ ওঠ রে ও বাঙালী বীর
কত কাল রবি নতকরি শির
শুনেছিলে জয় বাঙালী জাতির
অনাসৃত শব্দ ভেরীর মাঝে ।

মুকুন্দ দাস ইংরেজের বিরুদ্ধে শুধু লড়াই করতে চাননি , তিনি দেশ সেবার কাজে

এগিয়ে আসতে যুবকদের আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। যাত্রাগানের মধ্য দিয়ে তিনি স্বাবলম্বী হয়ে অর্থনৈতিক মুক্তি পথের নির্দেশ দিয়েছেন —

মানের গোড়ায় ছাই ঢেলে আজ
কষে লাঙল ধর।
ডেকে নে তাঁতী, জোলা,
ছাড়িয়ে নেংটি তিলক ঝোলা,
খুলে দে আজ তাঁতের মেলা
প্রতি ঘর ঘর
কামার, কুমোর, চামার, মুচি
তারাই কাজে তারাই শুচি
এত সব যাদের ঘরে
তারা মরে উপোষ করে।

কর্ম বিমুখ যুব সমাজকে কবি বলছেন —

এখনো খোলেনি আঁখি যার
কি দিয়ে বুঝাবো তারে
কোন কর্ম সাধিবারে
জনম লভিনু কোলে ভারত মাতার
বি.এ, এম. এ পাশ করে
নকরী যদি নাহি মেলে
ভাবনা কেন কিসের ভয়
মিশে যাওনা চাষার দলে
খেটে পড়ে খামার কর, শক্ত করে লাঙল ধর
দুদিন পরে খেতে পাবি, ঘুচে গেছে হাহাকার।

ভারতের কৃষক কুলকে তিনি ভালবাসতেন —

ভাই রে , ধন্য দেশের চাষী ।
এদের চরণ ধূলি পড়লে মাথায়
প্রাণ হয়ে যায় খাসা
এরা কপটতার ধার ধারে না ,
সত্য ছাড়া মিথ্যা কয় না ,
প্রাণের কথা গুছিয়ে বলার
নাইকো এদের ভাষা ।
প্রাণ ভরা আনন্দ এদের
বুকটা স্নেহের বাসা
চিনলে এসব সোনার মানুষ
মিটতো দেশের সব পিয়াসা ।

স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে মুকুন্দ দাস অন্য কবির রচিত গান গাইতে ভালবাসতেন । মুকুন্দ দাসের যে গানটি যাত্রার আসর থেকে বাংলার প্রান্তরে প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিলসেই " ছেড়ে দাও রেশমী চুড়ী বঙ্গ নারী কভু হাতে আর পরোনা " গানটি আচার্য্য মন মোহন চক্রবর্তীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা । এই আবেগ ভরা গানটির সাথে মুকুন্দ দাস ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন ।

ইংরাজের বিষ নজরে পড়লেন তিনি । তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলো । জেলখানায় দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে মাতৃসাধক মুকুন্দ দাস গাইতেন —

ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে
মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে ॥

তাথৈ তাথৈ , থৈ দ্রিমি দ্রিমি দং দং
ভূত পিশাচ নাচে যোগিনী সঙ্গে
দানব দলনী হয়ে উম্মাদিনী
আর কি দানব থাকিবে রঙ্গে ।।
সাজ রে সন্তান হিন্দু মুসলমান
থাকে থাকবে প্রাণ , না হয় যাইবে প্রাণ ।।
লইয়ে কৃপাণ হওরে আগুয়ান
নিতে হয় মুকুন্দেরে নিও রে সঙ্গে ।।

যে সকল নাটক রচনা করে তিনি বাংলার আকাশ বাতাস মথিত করেছিলেন সেই সব হচ্ছে ' মাতৃপূজা ' , ' কর্মক্ষেত্র ' , ' পল্লীসেবা ' , ' পল্লীসমাজ ' , ' সাথী ' , এবং ' পথ ' ; মুকুন্দ দাসের প্রভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে," Other Jatra groups caught the contagion from Mukunda, particularly Bhusan in Barisal and the Eastern Bengal and Assam government reported on 21 December 1908 that at Shikarpur in the Chittagong district a number of villagers have formed themselves into a theatrical company and have given a series of play of an unequivocally anti-British in nature. Mukunda Das himself at one time or another visited nearly every district in Bengal, his visit to Noakhali in March,1907,..... had a tremendous impact even on the hitherto apathetic Muslim Masses and it became a common sight to see the rustic Mahomedans pass the streets of the town with one of Mukunda babu's songs upon their lips. That the Government had become quite worried is indicated by the frequent references to Mukunda Das in official reports..... the patriotic jatra walla was sentenced to a year's rigonous imprisonment on 23 January 1909". ৪৭

রমেশ চন্দ্র মজুমদার মুকুন্দ দাস সম্পর্কে বলেছেন 'One Mukunda Das obtained great fame and popularity by introducing a novel type of Yatra, in which the plot was devised in such a way as to invoke the patriotic sentiment of the people and excite their animosity against the British". ৫৮

॥ কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩ - ১৯৪৯) ॥

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় তিনি ছিলেন দক্ষ। হাস্যরসের ফল্গু ধারা যখন বিখ্যাত গানগুলির মহৎ ভাবনাকে এক ভিন্ন স্পর্শী স্বাদ দেয় তাতে পাঠক অনুভব করেন এক সহজ আনন্দবোধ। তিনি 'দাদা মশায়' নামে পরিচিত ছিলেন। হাস্যরসাত্মক গল্প ও উপন্যাস রচনায় তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। তবে তিনি কিছু হাসির কবিতা লিখেছিলেন। তাঁর প্রকাশিত বইটি 'উড়ো খৈ'। বইটি প্রকাশিত ১৩৪১ সালে (বঙ্গাব্দে)। বইটির মধ্যে তিনি লিখেছেন কবিতাগুলি বাইশ বছর পূর্বের লেখা। ১৩১৯ সালে। স্বদেশী আন্দোলন যেমন একদিকে দেশ প্রেমের ভাবনায় উদ্বেলিত করেছিল বঙ্গবাসীকে অন্যদিকে কিছু মানুষের ভণ্ডামী দেখা দিয়েছিল এই আন্দোলন মুখর পরিবেশে। সৌমেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখছেন, " স্বদেশী আন্দোলনের ফলে সে সময় যেমন দেশাত্মবোধের একটা সক্রিয় বলিষ্ঠ রূপ গড়ে উঠেছিল তেমনি ভণ্ডামী ভ্রান্তি আর আদর্শহীনতার উদাহরণও কম ছিল না।'উড়ো খৈ' কবিতায়

কেদার নাথ দেশের স্বার্থপর বিলাসী অলস ও ভন্ডদের উপর কঠিন আঘাত হেনেছেন । " ৪৯

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত ' বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ ' গানটি বাঙলার মানুষকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল । একদিন এই গানটির ঢেউ পল্লী বাংলার মাঠ প্রান্তরেও ধ্বনিত হতো । স্বদেশী যুগের যে কয়েকটি গান মানুষের মুখে গীত হতো 'বঙ্গ আমার ' গানটি তার মধ্যে অন্যতম ।

স্বদেশী আন্দোলনে এক শ্রেনীর লোকের ভন্ডামীকে কবি কেদার নাথ সহ্য করতে পারেন নি । তিনি ' বঙ্গ আমার ' গানের প্যারডি লিখে তাদের উপর কশাঘাত করেছেন —

" কহু আমার , কেকা আমার , কাকলি আমার আমার দেশ —
দেখনা কেমন মলয় পবন , ভাবের স্বপন হানছে বেশ ,
দেখ না গো ঐ চাঁদের কিরণ — নাইক তাতে ময়লা লেশ ,
সপ্ত কোটি সন্তান তাই — বলে তোরে আমার দেশ ।

কোরাস

কিসের ভাবনা কিসের চিন্তা কিসের জ্বালা কিসের ক্লেশ ,
সপ্ত কোটি জঞ্জাল যার ডাকে উচ্চে আমার দেশ ।

একদা যাহার বচন বীরেরা বন্যা আনিল লোকাচারে
একদা যাহার সংস্কারকে সংহারিল এই দেশটারে
সন্তান যার হুইস্কি ধরিল , পকেটে চাঁদির সিগার কেস ,
তুই বটেই তো তাদের জননী — বটেই তো তুই তাদের দেশ ।

কোরাস

একদা যাহার পল্লী পতিরা বিলাস খুজিল কলিকাতায়
শুকালো সরসী ছাইল বন পল্লী লক্ষ্মী নিল বিদায় ,
বিদ্যালয়েতে ঝুলিল বাদুড় , তুমে সে শুইল অবশেষ
তুমিই তা বটে তাদের জননী — বটেই তো তুই তাদের দেশ ।

কোরাস

সবাই যেখানে কহে নীতি কথা নিজেরা পালেনা একটা কেউ
সলিল শূন্য শুষ্ক সিন্ধু — শব্দে কেবল উঠেছে ঢেউ
সকল বিষয়ে সবাই দক্ষ , কে কার শোনে বা উপদেশ
তুই তো বটে তাদের জননী — তুই বটেই তো তাদের দেশ ।

কোরাস

যদিও মা তোর শাস্ত্র আলোকে ঘিরে আছে আজ আচার ঘোর
তাই নিয়ে ঐ টিকি ধারী কটা কোরচে বটে বেজায় সোর ,
আমরা মা তায় দিব রসাতল , আমরা মানুষ নহি গবেশ
বিলাস আমার, ব্যসন আমার, বচন আমার আমার দেশ ।

স্বদেশী আতিশয্যে কিছু মানুষ ইংরেজের নিকট চাকরী করাকে ঘৃণ্য পেশা বলে ধূয়া তোলে । তাদের মনে সবকিছু ছেড়ে বেরিয়ে এসে দেশের কাজে লাগতে হবে । এই ধরণের ভন্ডামীর বিরুদ্ধে কবি লিখলেন ' দেশের পাপ ' । এই কবিতার কয়েকটি পংক্তি —

বরাবরই আসচি শুনে — চাকরে গুলোই দেশের পাপ
লেখক বক্তা সম্পাদকে দিচ্ছে তাদের অভিশাপ ।
সবাই কবে হবে চাষা , তাড়ির দোকান খুলবে খাসা
কেউ বা ধোপা হয়ে তোফা কাপড় গুলো করবে সাফ ।

কারুর নাকি বড়ই দুখখু কেরানীরা দেশের আপদ
ওরাই শুধু মানুষ কজন তারাই নাকি খাঁটি শ্বাপদ ।
মোট নে সবাই গেল হাটে , কিম্বা যদি কাটটা কাটে
দেশটা সটান স্বাধীন হত , ঘুচতো তাদের মনস্তাপ ।

সেই টে নাকি ' মরেল কারেজ ' — এম.এ মাথায় নিয়ে ঝুড়ি
গামছা পোরে মুড়ি খেয়ে দ্বারে দ্বারে বেচবে চুড়ি ,
পুজো বাড়ী বাজিয়ে ঢাক , বি.এ লাগাবে তাক
আদর্শটা উঠলে গড়ে — দেশের ভাগ্যে ধরবে ঝাঁপ ।

সবাই তখন মনিব হবে রবে না কেউ পরাধীন
চাকরী ছেড়ে হওয়াটা চাই ত্বরায় অন্ন বস্ত্রহীন ।
দেখবে তাতে দুশো মজা , স্বাধীনতার উড়বে ধ্বজা
খালিপেটে হালকা হয়ে , উচ্চ হবে মেরে লাফ ।

সব দেশে সব আন্দোলনের সময় একদল মানুষ থাকে যারা আদর্শ বাদী । এদের এক মাত্র সম্বল স্বদেশ ভক্তি । এরা শ্রদ্ধেয় । আরেক শ্রেনী থাকে যারা এদের বিপরীত মানসের । এরা মুখে স্বদেশ ভক্তির কথা বলে , কিন্তু কর্মে বিপরীত । এই ভন্ড দেশ প্রেমিকের দল সর্ব যুগেই আছে । স্বদেশী যুগেও ছিল । কবি এই ভড়ং বাজদের উদ্দেশে ' স্বদেশ ভক্তি ' কবিতায় লিখছেন —

আমার কথায় রক্ষা হয় তো হোক দেশটা রক্ষা
অন্যে যদি করে সেটা তো একখুনি পাক অক্কা ।

আমার যাতে নামটা নাই এমন কোন কাজই
অন্যে যদি করতে চায় সে ব্যাটা ঘোর পাজী

ভারত উদ্ধার আমার দ্বারা হয় যদি তো হোক
তা না তো দেশ চুলোয় যাক -- নাই কো আমার শোক ।

আমায় ডিঙিয়ে অন্যে করবে সইতে হবে নাকি ?
জাহান্নামে যাক সে দেশ , কিছু না খেদ রাখি ।

এইটে মোদের আসল কথা স্বভাবের সেরা
বিদ্যা বুদ্ধির জোরে সেটা ঢেকে ঢুকে ফেরা ।

॥ ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৮ - ১৯২৯) ॥

শিক্ষাব্রতী রূপে তিনি বিশেষ পরিচিত । সাহিত্যের ভাণ্ডারের সরস সাহিত্যে রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত । সমালোচনা মূলক সাহিত্যেও তিনি রচনা করেছেন । স্বদেশী যুগে তাঁর একটি অনবদ্য ব্যঙ্গ রচনামূলক কবিতা ' গোরা চাঁদ বনাম শ্যামা মা ' । কবিতাটির রচনা প্রসঙ্গে সৌমেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন " ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ্যে যখন সারা দেশে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়েছিল গানটি সেই সময়ে লেখা । এটি তার কোন গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়নি । ' ভারতী ' পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত । এখানে ' গোরা চাঁদ ' ইংরেজ এবং ' শ্যামা মা ' বঙ্গ জননী । " ৩০ গানটি শ্যামা বিষয়ক ----

ওহে গৌর গৌর হে , তোমার মুখে পড়ুক ছাই ।
ইচ্ছে করে যাই হে মরে লয়ে তোমার নামের বালাই ॥

তোমার মুখে জ্ঞানের আলো
যে পায় সে না বাসে ভালো
আপন জনে খোলা মনে
হয়ে যায় ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই ॥

ভেদ বুদ্ধি ভেবে স্যার
পাকা চাল চাললে এবার
সোনার বাংলা চুর মার
করলে তুমি দুটো দুঠাঁই ॥

শেল দিয়েছ মোদের বুকে
বলহে গৌর আর কি সুখে
সমান ভাবে ভজবো তোকে
তোমার প্রেম নীতিতে ফাই ফাই ॥

তোমার মুলুকের আমদানী
বসন ভূষণ চুড়ী চিরুণী
ছড়ি জুতা চোখ রাঙানী
প্রেমের গৌর আর না চাই ॥

চুরুট সাবান পান্দা লবন
দোবরা চিনি লোহার বাসন
সাগর জলে দিই বিসর্জন
তোমায় ভজলে ধর্ম নাই ॥

কালাপানির অতল জলে
চায়ের রাশি দিল ফেলে
স্বদেশ ব্রতে প্রাণটা ঢেলে
মার্কিন তুল্য কীর্তি নাই ॥

এখন গৌর চাঁদকে ছেড়ে দিয়ে
ভজবো মোদের শ্যামা মায়ে
কালীকালী সাপ জপিয়ে
মনের কালি মুছবো ভাই ॥

ঘুচেছে মোহ এত দিনে
সুজন কুজন লই হে চিনে
গতি নাই রে শ্যামা বিনে
ঘরের ছেলে ঘরে যাই ॥

ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে
সাধের শ্যামা মাকে ঘিরে
আবেগ ভরা চাপা সুরে
স্বদেশ প্রেমের গুণ গাই ॥

লাঞ্ছনার আর বাকি নাই
পর হয়েছে আপন ভাই
সবাই মিলে কান মলা খাই
মিটেছে মোদের বিলাতী বাই ॥

।। গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী (১৮৫৮ - ১৯২৪) ।।

স্বদেশী যুগে মহিলা কবি রূপে প্রতিষ্ঠিতা । কাব্য কবিতায় সহজ ভাবে দেশ প্রেমের কথা ব্যক্ত করেছেন । তাঁর কাব্য গ্রন্থের নাম ' স্বদেশিনী ' । প্রকাশিত ১৩১২ সালে । বইটির প্রথম পাতায় লেখা আছে ' ভারতের স্বদেশ ভক্ত নর নারীর করে ' সমর্পিত । মোট কবিতার সংখ্যা ১৮ । কবিতা গুলো ' আদেশবানী ' , ' এস পুজি মার চরণ দুখানি ' , ' আহ্বান ' , ' গীতি ' , ' কণ্ঠচ্ছেদ ' , ' মাতৃস্তোত্র ' ইত্যাদি ।

' আদেশ বানী 'তে সর্বশ্রেণীর মানুষকে দেশ প্রেমের মন্ত্রে উদ্বোধিত হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন ---

ঐ শোন শোন কাহার আদেশ
হতেছে ধ্বনিত বিষাণে
পূরব পশ্চিম উত্তরে দক্ষিণে
নৈঋতে অগ্নি ঈশানে । ....
বাজ তবে শিঙা ঘন ঘন ঘোর
বল ভারতের অমানিশা ভোর
যে আছে নিদ্রিত ভেঙেঁ যাক ঘোর
নব রবিচ্ছটা গগনে । .....
দেবের দুন্দুভি ভারত গগনে
উঠয়ে বাজিয়ে ভয় কি মিলনে
যেখানে একতা , সিদ্ধি সেইখানে
কি ভয় জননী পূজনে ।

' আহ্বান গীতি ' কবিতায় কবি তাঁর কন্ঠের বলিষ্ঠ আওয়াজ তুলেছেন —

অন্ধের মতন দ্বারে বসে বসে
কতই কাঁদিস কাঁদুনী
কি দিবে তোদের ঈপ্সিত রতন
করে তুলে বল তা শুনি
ঝটিকার মত আয় উচ্ছৃঙ্খল
উদ্দাম বেগে ছুটিয়া —
ঘর ভরা মোর সাধের ভান্ডার
চোরে ঐ নিল লুটিয়া ।

শিবাজী স্বাজাত্য বোধের আদর্শে মহারাষ্ট্রে একদিন বিদেশী শক্তির সাথে যুদ্ধ করেছে । তিলক মহারাষ্ট্রে শিবাজী উৎসব শুরু করেন । বাংলায় সখারাম গনেশ দেউস্করের প্রচেষ্টায় ১৯০৪ এ শিবাজী উৎসব হয় । সেই শিবাজী উৎসবে কবি ও প্রভাবিত হয়েছেন । ' শিবাজী উৎসব ' কবিতায় বলেছেন —

' আজি গাও গাও খুলে মন প্রাণ
ভারতের কথা ভারতের গাথা
ভারত বীরের যশোগান ।
সদা বীর প্রসূ ভারত জননী
বীর রত্ন মালে কোহিনুর মনি
স্মর শিবময় শিবাজী কাহিনী
সহায় ভবানী অমূল্য দান । ....
শিব শিব মন্ত্রে ভারত দীক্ষিত
গাও দেখি বঙ্গ করিয়া কম্পিত
হর হর হর পুণ্যময় গীত
কোটি কোটি কন্ঠে মিলায়ে তান ।

' বঙ্গভঙ্গে কৃষকের গান ' কবিতায় কৃষকের জীবনের যে দুঃখ ভাবনা তাকে বড় সুন্দর করে প্রকাশ করেছেন —

ওরে দুপুর রোদে ফাটিয়া মাথা
সার হয়েছে ছেড়া কাঁথা
মরে অনাহারে বৃদ্ধ মাতা
বলবো কত শুনবি কি আর
ও ভাই ঘরের লক্ষ্মী পরকে দিয়ে
ঘুরে বেড়াই দুয়ার দুয়ার ।

গিরিন্দ্র মোহিনী দাসীর কবিতা গুলিতে দেশ প্রেমের ঝঙ্কার , বঙ্গভঙ্গে মানুষের বেদনা বোধ ও এই সঙ্কট হতে পুনরায় উঠে দাঁড়ানো অভিপ্রায় এই তিনটি মানসিকতায় তাঁর কবিতাগুলি সমৃদ্ধ ।

॥ মান কুমারী বসু (১৮৬৩ - ১৯৪৩) ॥

- -

এ যুগের আরেক মহিলা কবি মান কুমারী বসু স্বদেশবাসীর উদ্দেশ্যে কবিতা লিখেছেন । নব্য ভারতে তাঁর তিনটি কবিতা প্রকাশিত হয় ' আনন্দমঠ ' (১৯০৫) , 'আহ্বান' (১৯০৭) , ' আবেদন ' (১৯০৭) । মান কুমারী বসুর কবিতায় বলিষ্ঠ ভাবের সন্ধান পাওয়া যায় । কবি আবেদন কবিতায় লিখেছেন —

' চিরদিন রাজভক্ত জাতি আজি তারা রাজদ্রোহী কিসে
লালটুপী লাল কোর্তা ধারী রক্ত পিয়ে নিমেষে নিমেষে ।

প্রজাদের জাতীয় উন্নতি মাতৃসেবা স্বদেশ পূজন
তারি নাম 'রাজদ্রোহ' যদি 'রাজভক্তি' নীরব মরণ ?
স্বেচ্ছাচারী অত্যাচারী দল মর্ম গ্রন্থি ফেলিবে ছিঁড়িয়া
অর্ধাশন অনশনে মোরা মৃতবৎ রহিব পড়িয়া ?
জননীর ধন রত্ন লুঠি যাবে চলি বিদেশী বণিক
নিবারিতে পদাঘাত সব , আমরা কি পশু বাস্তবিক ।

॥ অম্বুজা সুন্দরী দাশগুপ্তা (১৮৭০ - ১৯৪৬) ॥

সাধারণ কবি রূপে তিনি পরিচিতা ছিলেন । স্বদেশ প্রেমের স্বভাবজ ধর্ম তাঁর হৃদয়ে সাড়া জাগিয়েছিল । অম্বুজা সুন্দরীর বিখ্যাত কবিতাগুলির মধ্যে 'অভ্যুত্থান' এবং 'স্বদেশ সেবা' উল্লেখযোগ্য । নব্যভারতে ১৩১২ সালে প্রকাশিত হয় 'অভ্যুত্থান' ও 'স্বদেশ সেবা' । 'অভ্যুত্থান' কবিতায় বঙ্গভঙ্গকে দুঃখ - জনক বলে অভিহিত করলেও তিনি এই বঙ্গ বিভাগকে সৌভাগ্যের ঘটনা বলে চিহ্নিত করেছেন । কারণ এই বঙ্গবিভাগ সকলকে একই দুঃখ ও অনুভূতিতে মিলিত হতে সুযোগ করে দিয়েছে ।

বয়কটের ভাবনা আছে 'স্বদেশ সেবা'য় । কবি বলছেন ---

ছোব না বিদেশী বস্তু করিয়াছি পণ
এস আজ সবে মিলি
দাঁড়াইব গলাগলি
করিব যাহাতে হয় প্রতিজ্ঞা পূরণ

সঁপিব জীবন মন স্বদেশ সেবায়
আপন প্রতিজ্ঞা স্মরি
শক্তিরে স্মরণ করি
বঙ্গ নিবাসী যত ভগ্নিগণ আয় ।

গানের বিষয় বস্তু নারী সমাজকে সেদিন বিদেশী বর্জনের আহ্বানে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছিল ।

॥ বীরেন্দ্র শাসমল (১৮৮১ - ১৯৩৪) ॥

রাজনীতির অঙ্গিনায় তিনি প্রসিদ্ধ । পেশা ব্যারিষ্টারি । কবিতা লেখায় তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন । নব্য ভারতে লিখতেন । নব্য ভারতের পৌষ সংখ্যা ১৩১২তে 'মায়ের ডাকে' কবিতায় বড় সুন্দর ভাবে ইংরেজ বিরুদ্ধতার কথা বলছেন —

যত লিখি জোরে যত পড়ি গায়
শুনিবে না কেহ মোদের কথা
হৃদয়ের ব্যথা ঘুচাতে হইলে
দিতে হবে জেনো হৃদয়ে ব্যথা ।

এছাড়া তাঁর 'আমার দেবতা' ১৩১২ সালে চৈত্র সংখ্যায় নব্য ভারতে প্রকাশিত হয় ।

॥ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০ -১৯) ॥

বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থনে যে সব মুসলমান এগিয়ে এসেছিলেন সৈয়দ সিরাজী তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য । তিনি প্রথম যে কাব্য গ্রন্থ লেখেন তার

নাম ' অনল প্রবাহ ' (১৩০৬ সালে প্রকাশিত হয়) । ইংরেজ সরকার এই কাব্যগ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করেন । সিরাজীর দুই বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড হয় । কবির দুটি কাব্য - গ্রন্থে জাতীয় ভাবধারার চেতনা আছে — ' নবউদ্দীপনা ' ও ' উচ্ছ্বাস ' । দুটি বই প্রকাশিত হয় ১৯০৭ সালে ।

ইংরেজদের কূটনীতির চালে যখন মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হতে নিজেদের সরিয়ে নিচ্ছিল সেই সময় সিরাজীর ভাবনা হিন্দু মুসলমান ঐক্যের ভিত্তিভূমিতে স্বাধীনতা বোধ । তার কবিতায় ইংরাজের অত্যাচারে জর্জরিত বাংলার বর্ণনা করেছেন —

সোনার ভারত হয়ে গেল ছাই
বল বীর্য ধন কিছু আর নাই ।
শিল্প বাণিজ্য লুপ্ত সব ভাই
গোলাম মজুর সেজেছি সকলে ।

উঠিতে বসিতে শয়নে স্বপনে
চলিতে ফিরিতে কিবা সে ভ্রমণে
শ্বেতাঙ্গের ঘুষি সদা জাগে মনে
বুটের আঘাতে প্লীহা বিদারণে
নিত্য কত ভাই মরিছে অকালে ।

দেশবাসীর এই অত্যাচারের হাত হতে নিবৃত্তি পাওয়ার জন্য তিনি ভারতবাসীকে অন্তরে এক তীব্র শপথ গ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন —

ভারত সন্তান কর আজি পণ
প্রাণ দিয়া আজি লভিব জীবন

সাধন করিতে মায়ের কল্যাণ
মহোল্লাসে দিব প্রাণ বলিদান
তথাপি রব না এমনি পড়ে ।

হইব না আর মথিত দলিত
রহিব না আর অধম ঘৃণিত
সহিব না আর কোন অত্যাচার
সহিব না আর বিন্দু অবিচার
জড়ের মতন এমনি করে ।

সিরাজী ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্প থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত । বঙ্গভঙ্গের যুগে জাতীয়তার এত স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ মানুষ মুসলিম সমাজের মধ্যে খুবই কম দেখা গিয়েছিল ।

॥ কামিনী কুমার ভট্টাচার্য্য (১৮৮৯ - ১৯৪৪) ॥

কামিনী কুমারের গানে ছিল বিপ্লবী চেতনা জাগ্রত করার প্রয়াস । একদিন স্বদেশী যুগে তাঁর গান পূর্ব বাংলার প্রান্তরে বিপ্লবীদের উদ্দীপ্ত করেছিল । ইংরেজ জাতির মোহ বন্ধনে যারা আচ্ছন্ন তাদের কবি মোহ ত্যাগ করতে আহ্বান জানাচ্ছেন —

' না করিলে পান মোদের শোনিত , হয় ওদের চিত্ত ক্ষুব্ধ ,
তাই ভুলাইতে চায় মাতৃমন্ত্র করি আকাশ কুসুমে লুব্ধ ,
ওরা মোদের দৈন্যে করে পরিহাস , কেড়ে নিতে চায় মুখের গ্রাস ,
তবু যুক্ত করে ওদের দুয়ারে কেন নিত্য নিষ্ফল যাচনা ?
এখন আপনার পানে ফিরাও নয়ন , জাগাও আপন শক্তি

পরের চরণ না করি লেহন , কর আপনার মায়ের ভক্তি ।
তবে জাগিবে নবীন রঙ্গে , নব জীবন নব বঙ্গে ,
বিশ্ব কাঁপায়ে উঠিবে বাজিয়া রুদ্র বিজয় বাজনা ।

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য জারি হয়েছিল বিভিন্ন বিধি নিষেধ । বন্দে মাতরম ধ্বনি ছিল নিষিদ্ধ । বিভিন্ন সার্কুলারের চাপে ইংরেজ শাসনের নিষ্ঠুরতা ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছিল । কামিনী কুমার এই সময় বলছেন ---

' শাসন - সংযত কণ্ঠ জননী , গাহিতে পারিনা গান ,
(তাই) মরম - বেদনা লুকাই মরমে , আঁধারে ঢাকি মা প্রাণ
সহি প্রতিদিন কোটী অত্যাচার
কোটি পদাঘত কোটী অবিচার । ....
না জানি জননী , কতদিন আর
নীরবে সহিব হেন অত্যাচার
উঠিবে কি কভু বাজিয়ে আবার
স্বাধীন ভারতে বিজয় বিষাণ ?

দেশ যখন বিপন্ন তখন কবির আশা দেশকে উদ্ধার করার জন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হবেন । শ্রীকৃষ্ণ ত বলেছেন অধর্মের বিনাশের জন্য তিনি পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন । কবির আশা কৃষ্ণ মুরারীর তেজোদীপ্ত আবাহন সঙ্গীতে দেশ আবার উঠে দাঁড়াবে ।

অবনত ভারত চাহে তোমারে
এস সুদর্শন ধারী মুরারী ।
নবীন তন্ত্রে নবীন মন্ত্রে
কর দীক্ষিত ভারত নর - নারী ।
মুক্ত সমুন্নত পতাকা তলে
মিলাও ভারত সন্তান সকলে
নব আশে হিন্দুস্থান , ধরুক নূতন তান ,

এস অরি - শোণিতে মেদিনী রঞ্জিতে
নব বেশে ভীষণ অসি ধারী ।

দৌলতপুর দাঙ্গার সময় (১৯০৭) নারী অবমাননার বিরুদ্ধে কবির বেদনা মথিত কণ্ঠে যেন অগ্নির শিখা প্রজ্বলিত হয়েছিল —

আপনার মান রাখিতে জননী
আপন কৃপাণ ধরগো ।
. . . .
এলাইয়ে দাও কুটিল কুন্তল
জ্বাল মা হৃদয়ে প্রতিহিংসানল
নয়নের কোনে লুকায়ে গরল
মরণে বরণ করিয়া লওগো ।
শুনিয়া তোমার ভৈরব হুংকার
নিখিল চমকি উঠুক আবার . . . .

সত্যিই কামিনী কুমারের গানে বাংলা জেগে উঠেছিল ।

॥ বঙ্কিম চন্দ্রের ' বন্দেমাতরম ' । দর্শন ও ভাবনা ॥

' বন্দেমাতরম ' ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনা , দেশ ও বিশ্বজনীন চিন্তাধারার পটভূমিকায় ঋষি বঙ্কিমের লেখা এক সঙ্গীত । " বঙ্কিমের দেশ জননী এ যে

মাটি নয় মা'টি । দেশ যে মাটির বস্তু নয় — এ যে জাতির যুগ যুগান্তরের সাধনার বিগ্রহ । এই বিগ্রহের সেবায়ে যে জীবন ধন্য হয় , জীবের অমৃত লাভ হয় । যে শুদ্ধ ভাবধারায় আবেদন নাই , তর্জন নাই , গর্জন নাই , পরমুখাপেক্ষিতা নাই , পর বিদ্বেষ নাই — যা দাছে তা শুধু মাতৃভক্তি , অনাবিল দেশপ্রীতি । যা রইল তা দেশ মাতৃকার জন্য সর্বস্ব ত্যাগের উদাত্ত গদগদ করুণ আহ্বান — সেই গান যে সাহিত্য যে সত্য সৃষ্টি করেছে তা অমর " । ৫৯

" জাতীয়তার ঋষি বঙ্কিম বুঝেছিলেন দেশকে পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্ত করতে হলে চাই দেশ সন্তান । কিন্তু সন্তানের সাধনা বস্তুটি সাধ্য বিষয়টি হওয়া চাই সত্য , শিব ও সুন্দরের বানী । মিথ্যা বা কথার অহমিকা দিয়ে আর যা কিছু পাওয়া যাক না কেন জীবন বেদীতে ' বন্দেমাতরম ' ধ্বনি দিয়ে প্রাণ দানের সন্তান পাওয়া যায় না । সুদীর্ঘ সাধনায় তিলে তিলে আত্মদান , আত্ম ত্যাগের প্রসাদে সর্ব প্রাপ্তির সর্ব রিক্ততা যে আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে সম্ভব বঙ্কিম তাঁর দেশভক্তের মাতৃমন্ত্রের মধ্যে তার রূপ দান করলেন । দেশকেই বঙ্কিম চন্দ্র বড় করেন নি দেশের সঙ্গে বঙ্কিম চন্দ্র দেশ ধর্ম দিয়েছেন — দিয়েছেন দেশ দর্শন । রাজনীতিক বুঝতে পারেন দেশকে স্বাধীন করতে না পারলে দেশবাসীর কল্যাণ নাই , দেশ প্রেমিক প্রিয় দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত কিন্তু ভবিষ্যত দ্রষ্টা ঋষি যে তারচেয়ে ও বড় । দেশপ্রাণ সত্যানন্দ বলতে পারেন দেশের মুক্তির জন্য জীবন সর্বস্ব বলি দেব । কিন্তু দেশ ভক্তির স্রষ্টা সে যে বলে — ' জীবন দিলেই হইবে না — আরও চাই - ভক্তি ' । "

' বাংলার বিপ্লববাদে ' নলিনী কিশোর গুহ বলেছেন " স্বাদেশিকতার পর পর পীড়ন মূলক আসুরিকতা কে প্রজ্ঞা দ্বারা , সংযত সাধনার দ্বারা মানুষের উন্নতি যেমন সম্ভব — ভাবাদর্শের উন্নতি ও প্রসার তেমনি সম্ভব । মানুষ তথা মনুষ্য সমাজ মাতৃভক্তিকে সমন স্তরে আনিয়াছে যেখানে অপরের মায়ের কণ্ঠ নিপীড়ন না

করিয়াও আমরা আপন মাকে পরিপূর্ণ ভালবাসিতে পারি। তেমনি স্বাদেশিকতা দেশ - ধর্মে পরিণত করিয়া উহাকে মানুষই পারে মানবতার অবিরোধী করিতে। শুধু তাহাই নহে, পারে মানবতার সহিত স্বাদেশিকতাকে অভিন্ন করিয়া তুলিতে। বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম' এ দিক দিয়া অপূর্ব।" ৫২

হেমচন্দ্র কানুনগো বলছেন "বন্দেমাতরম গানটিতে যে এত শক্তি ও ভাব নিহিত ছিল তাও কেও তখন সন্দেহ করতে পেরেছিলেন বলে শুনিনি। বঙ্কিম চন্দ্র নিজে নাকি বাগবাজারের রাজবাটীতে একদিন নিমন্ত্রিতদের সভাতে কথাচ্ছলে বলেছিলেন 'তোমরা দেখবে এই বাংলাদেশে আমার আনন্দ মঠ জলজ্যান্ত অভিনীত হয়ে মহা বিপ্লব আনবে।' সেদিনের ঋষি বঙ্কিমের এই উক্তি বিফল হয়নি। বাংলা কেন ভারতবর্ষের সীমানা অতিক্রম করে 'বন্দেমাতরম' এর প্রভাব সমগ্র বিশ্বে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন কারীদের সঞ্জীবন মন্ত্র হয়ে উঠেছিল।" ৫৩

Vandemataram : This is in child's greeting to the Mother. It underlines the sacred bond between mother and child. This slogan embodies the revolve do preserve this relationship for ever. It is also a declaration of war on those who seek to break this bond. At the National level the motherland is the mother and the people are her children. This kindship between them is the essence of Nationalism." ৫৪

অরবিন্দের ভাষায় Nationalism is a religion that has come from god". এবং সেই ভগবানের প্রকাশ দেশ মাটিতে। এই চিন্তা ধারারই মন্ত্র 'বন্দেমাতরম'।

যে শব্দটির এই বিশাল ঐতিহ্য সেই শব্দ ' বন্দেমাতরম ' কোন সময় হতে কোন দেশ সন্তানের ভাব গম্ভীর কন্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল সেটা সঠিক ভাবে বলা কঠিন । ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ হতে প্রায় ১৮00 খ্রীষ্টাব্দ ধরে সারা পূর্ব ভারতে চলেছিল কৃষক বিদ্রোহ ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ । কৃষক বিদ্রোহের কারণ ছিল অর্থনৈতিক ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কারণ ছিল ভাবগত । এই সন্ন্যাসীরা ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ করত । ইংরেজদের অত্যাচার হতে অধিবাসীদের নিবৃত করার চেষ্টা করত । সেই সময় তাদের মুখে ধ্বনিত হতো ' ওঁ বন্দেমাতরম ' । এই শব্দ বঙ্কিমচন্দ্রকে পরবর্তী কালে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল তাঁর জাতীয়তাবাদের মন্ত্র সংগীত রচনা করতে । আর এই সংগীত জন্মভূমিকে অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে রচনা ১৮৭৬ সালে । ১৮৮২ তে প্রকাশিত ' আনন্দ মঠে ' এই সংগীত আত্ম প্রকাশ করল দেশ সন্তানদের প্রাণের মন্ত্র সংগীত রূপে । বঙ্কিমচন্দ্র ' বঙ্গদর্শনের ' এক কর্মকর্তাকে এ প্রসঙ্গে বলেছেন " এই সংগীতের মর্ম এখন বুঝিবে না । দেখিবে ২৫ বা ৩০ বৎসর পরে সারা দেশ ইহা লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছে । তাই অরবিন্দের কথায় বঙ্কিমের বানী প্রতিধ্বনিত হলো "The whole people had been converted into the religion of patriotism".

সেই সময় সকলের নিজস্ব সুরে ' বন্দেমাতরম ' গীত হত । রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৬ এ জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে নিজের সুরে এই গান গাইলেন । ১৯০৫ সালে কাশীতে সরলা দেবী মহামতি গোখলের অনুরোধে এই গান করেন — সপ্তকোটির পরিবর্তে ত্রিংশ কোটি জুড়ে দিয়ে । সারা ভারতে এই গান সেদিন ভাবের উম্মাদনায় সকল অন্তরকে স্পর্শ করতে শুরু করেছিল । ১৯০৫ এর ৭ই আগষ্ট বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে টাউন হল ময়দানের জনসভায় গর্জে উঠল ' বন্দেমাতরম ' । এবার সংগীত নয় । নিপীড়িত জাতির নবজাগরণের মন্ত্র । উদ্বেলিত হৃদয়ের আওয়াজ । বন্দেমাতরমের অভিব্যক্তি যেন জীবন বোধের সাফল্যের মন্ত্র । এই মন্ত্র এনে দিবে স্বাধীনতা , এনে দিবে আত্ম প্রত্যয় । বক্তা সুরেন্দ্রনাথ — "Your inner most feeling should be perfect harmony with the raga and bhava of Vandemataram". ৫৫

এই মন্ত্র ছড়িয়ে গেল দিগ দিগন্তে। "The reviving mantra which is creating a new India is Vandemataram".

বন্দেমাতরম সেদিন মিছিলে, বন্দেমাতরম সেদিন গানে, কবিতায়, সাহিত্যে। বন্দেমাতরম সেদিন ফাঁসীর মঞ্চে, আদালতে, আত্মপ্রত্যয়ে, স্বদেশ প্রেমে। Dr.R.R.Diwakar সেদিনের স্মৃতি চারণ করে লিখলেন 'The immortal song Vandemataram became in Swadeshi days the symbol of Nationalism, It spread through out India and was in the lips of all as the national song".

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সাথে সাথে এল স্বদেশী আন্দোলন। বিদেশী দ্রব্য বর্জন কর। ইংরেজকে আঘাত দিতে হবে বাণিজ্যিক দিকেও। স্বদেশী আন্দোলন এ যে দেশাত্মবোধের চরম নিদর্শন। সেই আন্দোলনে প্রাণের ভাষা যোগাল 'বন্দেমাতরম'। "Swadeshi was a practical application of love of country. It was an economic, political and spiritual weapon.. Swadeshi was Vandemataram in action'.

বন্দেমাতরমের মন্ত্রে ও ধ্বনিতে দেশের আকাশ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। The surging waves of the subconscious of the valiant line of India hungry for freedom since centuries, beat upon the shore and roared Vandemataram. From the streets of Barisal in East Bengal it arose, reverberated through the length and bredth of India, filling the Indian sky with its echo, and chilling the heart of the enemy as it is issued from a myriad throats : Bandemataram, Bandemataram". ৫৮

শেষে বন্দেমাতরম এর এমনই প্রভাব এল সাড়া দেশে যে 'Vandemataram gained great prominence is the sessions. It became a regular habit to sing Vandemataram end shout slogan with every programme. Speakers closed their speeches with the shouting of Vandemataram. Bandemataram was sung by girls in choir, the audience standing and the congress adjorned after the subject committee had been elected." ৫৭

এই বন্দেমাতরম সংগীত বা মন্ত্রের প্রভাব যে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পড়ল তা নয়, এই ধ্বনি ও সংগীতের ভাবনায় রচিত হলো সাহিত্য। সাহিত্য রচনার কাল ছিল এই বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী যুগ। কবিরা যেন এই মন্ত্রের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। বিপ্লবীরা সাড়া দিয়েছিলেন জীবন বিসর্জনের ক্ষেত্রে আর সাহিত্যের প্রতিভূরা প্রেরণা পেয়েছিলেন সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে ।

॥ স্বদেশী কবিতায় 'বন্দেমাতরম' এর প্রভাব ॥

১৮৭৬ এ বঙ্কিম জাতিকে উপহার দিলেন 'বন্দেমাতরম' সংগীত। অরবিন্দ এই প্রসঙ্গে বলেছেন Supreme service of Bankim to his nation was that he gave the vision of our Mother. এই ভাবনা 'আনন্দ মঠ' প্রকাশিত হওয়ার পর সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের 'পুরু বিক্রম' নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৭৯) 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' গানটি সংযুক্ত হয়। ১৩১২ সালের 'সংগীত প্রকাশিকা'য় ঐ গানের ধ্রুব পদ হিসেবে 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র যুক্ত হয়। ৫৮ ফলে বঙ্গভঙ্গের যুগে জ্যোতিরিন্দ্র নাথের গানটি নিম্নরূপে গাওয়া হত ।

একই সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন
বন্দেমাতরম বন্দেমাতরম ।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮ - ১৯০৩) ছিলেন প্রখ্যাত কবি । দেশভক্তি তাঁর চরম গৌরবের বস্তু । জাতিকে তিনি দিয়েছেন তাঁর কবিতা কাব্যের মধ্য দিয়ে নব প্রেরণার মন্ত্র । ১৯০১ এ কংগ্রেসের অধিবেশন বসল কলকাতায় । কংগ্রেসের এই অধিবেশন উপলক্ষ্যে তিনি লিখলেন ' রাখি বন্ধন ' কবিতা । এই কবিতায় তিনি বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরমের' ভাবদর্শকে গ্রহণ করলেন । কবিতাটি দীর্ঘ । কিছু অংশ উদ্ধৃত হলো —

কি আনন্দ আজ ভারত ভুবনে
ভারত জননী জাগিল
আহা কি মধুর নবীন সুহাসি
মায়ের অধরে রয়েছে প্রকাশি ,
যেন বা প্রভাতী কিরণের রাশি
উষার কপালে জ্বলিল ।

প্রেম আলিঙ্গনে করে রাখি কর
খুলে গেছে হৃদি — হৃদি পরস্পর
এক প্রাণ সবে এক কণ্ঠ স্বর
মুখে জয়ধ্বনি করিল ।

প্রণয় বিহ্বলে ধরে গলে গলে
গাহিল সকলে মধুর কাকলে
গাহিল 'বন্দেমাতরম'
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরং ।

শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীং
ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিনীং
সুখদাং বরদাং মাতরং ।

বহু বল ধারিনীং নমামি তারিনীং
রিপু দল বারিনীং মাতরং ।
উঠিল সে ধ্বনি নগরে নগরে
তীর্থ দেবালয় পূর্ণ জয়স্বরে
ভারত জগৎ মাতিল ।

বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলনে বরিশাল সংলগ্ন পূর্ববঙ্গের জননেতা ছিলেন অশ্বিনী কুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২১) । চরম সংকট মুহূর্তে তিনি দেশের মানুষকে নেতৃত্ব দিয়েছেন , প্রেরণা দিয়েছেন , আন্দোলনের পথে পরিচালনা করেছেন । তিনি স্বদেশ প্রেমের কবিতাও লিখতেন । তাঁর সেই কবিতায় ধরা পড়েছে বন্দেমাতরমের প্রভাব ।

' এখন ও কি তোরা মড়া পড়ে রবি ?
এখন ও কি তোরা অপমান সবি ?
উঠে ভাই দাঁড়া পড়েছে যে সাড়া ,
ভারত ভুবনে উঠেছে ধ্বনি —
বন্দেমাতরম , বন্দেমাতরম , বন্দেমাতরম । ।

পুরাতন মোদের শিল্পকলা যত
জাগাব নূতন আনিব কত
নূতন প্রাণে , নূতন তানে , গাইব সকলে নিত্য নব নব
' বন্দেমাতরম , বন্দেমাতরম , বন্দেমাতরম । '

কবি রাই চরণ বিশ্বাস বন্দেমাতরমের ধ্বনিতে ভারত জাগবে এই বিশ্বাসে লিখেছেন ---

' তোমার আকাশ , তোমার বাতাস , তোমার কিছু নয় রে
নবীন প্রভাতে নবীন প্রাণে নবীন তপন রে ।
কোটী কণ্ঠ স্বরে গাও উচ্চৈঃস্বরে বন্দেমাতরম রে ।
শুনিয়া সে ধ্বনি স্বরগে অমনি হবে প্রতিধ্বনি রে ,
শত বরষের অলস পরাণ , জাগিবে জাগিবে রে । '

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন কালী প্রসন্ন কাব্য বিশারদ । তার লেখা কবিতাগুলো স্বদেশী আন্দোলনের যুগে সকলের মুখে মুখে ফিরত । বঙ্গভঙ্গের পর বন্দেমাতরম ধ্বনি ছিল নিষিদ্ধ । ' বন্দেমাতরম ' ধ্বনি দেওয়ার অর্থই ছিল ইংরেজের রোষ চক্ষুতে পতিত হওয়া । অথচ বন্দেমাতরম ছিল দেশাত্ম বোধের ভাবনায় প্রাণ সঁপে দেওয়ার গান । কালি প্রসন্নের ভাবনায় এই গানের আদর্শ অত্যন্ত মহান হয়ে উঠেছে । তাইতো দেশ মাতৃকার কাছে তিনি প্রার্থনা করছেন ---

মাগো , যায় যেন জীবন চলে
শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাজে
' বন্দেমাতরম ' বলে ।

আমি ধন্য হব মায়ের জন্য
লাঞ্ছনাদি সহিলে
ওদের , বেত্রাঘাতে , কারাগারে
ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলিলে ।

আমার যায় যাবে জীবন চলে
শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাজে
' বন্দেমাতরম ' বলে ।

চারণ কবি মুকুন্দ দাস বিপ্লবের বার্তা বহন করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন দেশের কাজে। তিনি অনুভব করেছিলেন প্রাণ বিসর্জনের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হবে। ছাত্র যুব সমাজ সেদিন দেশ প্রেমের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ। দেশ প্রেমের আরেক নাম 'বন্দেমাতরম'। মুকুন্দ দাস তাই সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছেন 'বন্দেমাতরম' বলে দেশের কাজে যোগ দিতে।

'বন্দেমাতরম বলে নাচরে সকলে
কৃপাণ লইয়া হাতে
দেখুক বিদেশী হাসুক অট্টহাসি
কাঁপুক মেদিনী ভীম পদাঘাতে।
বাজাও দামামা কাড়া ঘন্টা ঢোল
শঙ্খ করতাল জয়ডঙ্কা খোল
নাচুক ধমনি শুনিয়ে সে রোল
হউক নূতন খেলা শুরু এ ভারতে।

কবি শশিকান্ত'র একটি গান স্বদেশী যুগে প্রচলিত ছিল যার ভাবনা ছিল 'বন্দেমাতরম' এর মন্ত্রে জেগে উঠা। কবি বলছেন —

জাগ ভারতবাসী রে কত ঘুমে রবে রে,
বল সব হয়ে এক মন 'বন্দেমাতরম'।
ভাই রে ভাই, জননী আর জন্মভূমি স্বর্গ হতে শ্রেষ্ঠ মানি রে,
এ দুয়ে ভক্তি নাই যার, নরকে নিবাস তার,
পুরাণে লিখেছেন মুনিগণ।

সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন স্বদেশী কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত । স্বদেশী যুগে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সংকলিত ' বন্দেমাতরম '-এ সতীশ চন্দ্রের ' আহ্বান সংগীত ' নামে একটি কবিতা সংযোজিত হয় । এই কবিতায় সতীশ চন্দ্র স্বদেশী আন্দোলনে উদ্দীপিত হয়ে উঠার জন্য ' বন্দেমাতরম ' সংগীতকে গ্রহণ করেছেন । তিনি লিখছেন —

নগরে নগরে জ্বালরে আগুন ,
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ
বিদেশী বাণিজ্যে কর পদাঘাত
মায়ের দুর্দশা ঘুচারে ভাই ।

আপনি বিধাতা সেনাপতি আজ
ওই ডাকিছেন সাজ রে সাজ ,
স্বদেশী সংগ্রামে চাই আত্মদান
' বন্দেমাতরম' গাও রে ভাই ।

স্বদেশী আন্দোলনে বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন । স্বাভাবিক ভাবে 'বন্দেমাতরম' সংগীত সম্পর্কে তাঁদের অনাস্থা ছিল । তদানীন্তন যুগে মুসলমান সমাজের পত্রিকা 'The Mussalman'-এ এই মনোভঙ্গীর কিছু অংশ ধরা পড়েছে । ১৯০৬ সালের ১৪ই ডিসেম্বর এই পত্রিকা তার সম্পাদকীয় মন্তব্য 'The Bandemataram and ourselves' নামক শীর্ষকে মন্তব্য করছেন —

' We fully realise the natural fondness - a sort of fillial piety which the Bandemataram feels and should naturally feel for the gifted author of Ananda Math, but it is will scrutinese Bankim's works as an unbiased critic, it will find that a Brahmin to the core. Bankim Chandra could not shake off his Brahmanical prejudices and cease to having a fling, every time the occasion arose at the Moslem........ Bankim

commands our respect, but as delineator of Moslem character, he cannot and will never extort from the Moslem a single word of unqualified praise, not to say of admiration. As for the remarks of the Bandemataram' they fell flat — on us. For 'The Bandemataram is a reply without an answer".[৫৯]

অথচ এই সময়ে মুসলিম কবি সৈয়দ ইসমাইল সিরাজীর 'নব ভারতের' পৌষ সংখ্যায় ১৩১২ সালে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটির নাম 'বন্দেমাতরম'। জন্মভূমি বঙ্গকে বন্দেমাতরম আদর্শে বন্দনা করছেন —

জয় জয় পুণ্য ভূমি সোনার বাংলা
প্রকৃতি লীলা ভূমি কুসুম কুন্তলা,
তোমার সন্তানগণ
হয়ে সবে এক মন
সাধুক, সাধুক মাত তোমার কল্যাণ
করগো জননী, তুমি মহা অভ্যুত্থান!

অমৃত লাল বসু ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি 'দ্বন্দ্বেমাতরম' নামে একটি প্রহসন রচনা করেন। এ যেন 'বন্দে মাত রমের' ধ্বনি সাদৃশ্য অক্ষুন্ন রেখে বাঙালীর আদর্শ হীনতার প্রতি তিনি কটাক্ষ করেছেন। 'বন্দেমাতরম' এর আদর্শ হতে ভ্রষ্ট হয়ে তুচ্ছ ভোটের ব্যাপার নিয়ে আমরা কি রূপ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে পারি এই প্রহসনের সেই বিষয়বস্তু। অমৃতলাল বসুর 'অমৃত মদিরা' কাব্যের

অন্তর্গত একটি কবিতার নাম 'নব বন্দেমাতরম' । বাংলা 'বন্দেমাতরমের' দেশ । এই দেশের আকাশ বাতাসে 'বন্দেমাতরম' এর সুর , অথচ আদর্শহীনতা লক্ষ্য করে তাঁর মনে জাগ্রত হয়েছে গভীর নৈরাশ্য বোধ । 'নব বন্দেমাতরম' এ সেই নৈরাশ্য বোধ প্রকাশ পেয়েছে —

'নাহি বিদ্যা , নাহি ধর্ম , নাহি হৃদি নাহি মর্ম ,
কেবল সকল কন্ঠে কলহ কল্লোল গাজে ।
বাহুতে নাই মা শক্তি , হৃদয়ে কই মা ভক্তি ,
প্রাণ ত দেখিনা মা কাহারও শরীরে ।

'বন্দেমাতরম' ধ্বনি যখন নিষিদ্ধ হলো , নির্ভীক রজনীকান্ত তার প্রতিবাদ করে গেয়ে উঠলেন —

মা বলে ভাই ডাকলে মা - কে , ধরবে টিপে গলা ।
তবে কি ভাই , বাংলা হতে উঠবেরে 'মা' বলা ?
মারলে কি আর "মা" ডাক আমার ছাড়তে পারি ?
হাজার মারো 'মা' বলা ভাই কেমন করে ছাড়ি ?

রবীন্দ্রনাথ নিজেও 'বন্দেমাতরমের' প্রভাবে মুগ্ধ ছিলেন । জগদীশ ভট্টাচার্য্য মন্তব্য করেছেন " ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা । তোমাতে বিশ্বময়ীর , তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা ...." । রবীন্দ্রনাথের এই মাতৃ প্রণাম 'বন্দেমাতরম' এর " তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম । তুমি হৃদি তুমি মর্ম । ত্বং হি প্রানাঃ শরীরে' এই স্তবকাংশকে কি স্মরণ করিয়ে দেয় না ? এই গানেই রবীন্দ্রনাথ জননী জন্মভূমির মধ্যে 'বিশ্বময়ী' 'বিশ্বমাতাকে' মানস - প্রত্যক্ষ করে বলেছেন 'তুমি সকল সহা সকল বহা মাতার মাতা ।" ৫৯ (ক)

' ভারত বিধাতা ' কবিতা লেখার পাঁচ বছর পরে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ পুত্র রথীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে লেখেন , " আমাদের বন্দেমাতরম মন্ত্র বাংলা দেশের বন্দনা মন্ত্র নয় — এ হচ্ছে বিশ্বমাতার বন্দনা — সেই বন্দনার গান আজ যদি আমরা প্রথম উচ্চারণ করি তবে আগামী ভাবী যুগে একে একে সমস্ত দেশে এই মন্ত্র ধ্বনিত হয়ে উঠবে । " ৫৯ (খ)

॥ স্বদেশী যুগে কাব্য বা কবিতা সংকলন ॥

এই যুগে কবিতা ও গানের পাশাপাশি বহু কবিতাগুচ্ছ বা কাব্য রচনার প্রয়াস দেখা গিয়েছিল । অনেক রচনাকার দেশাত্মবোধক কবিতা রচনা করে একত্রে পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন । অনেকে আবার বিভিন্ন ব্যক্তির প্রসিদ্ধ দেশাত্মবোধক কবিতা একত্রিত করে কাব্যের পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন । এই পুস্তক প্রকাশের পিছনে যে দৃষ্টি-কোন ছিল তা হচ্ছে সম্মিলিত দেশাত্মবোধক কবিতার মধ্য দিয়ে জাতির দেশ ভাবনাকে উদ্দীপ্ত করা । এই সব গানের সংকলনের ও কাব্যের মধ্যে কবিত্ব শক্তির পরিমাণ যাই থাকুক না কেন সব চাইতে বড় জিনিস ছিল কবিদের দেশ প্রেমের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ । এই শ্রদ্ধাবোধই সেদিন গান বা কবিতাগুলোকে সর্বজনপ্রিয় করে তুলেছিল । এই সংকলন গুলোর মধ্যে নিম্নলিখিত গুলি উল্লেখযোগ্য ।

১ । যোগীন্দ্র নাথ সরকারের ' বন্দেমাতরম ' (সেপ্টেম্বর , ১৯০৫)

২ । রজনী কান্ত পণ্ডিতের ' স্বদেশী পল্লী সঙ্গীত ' (মৈমনসিং , ১৯০৫)

৩ । জ্ঞানেন্দ্র মোহন সেনগুপ্তের ' দেশের গান ' (১৯০৫)

৪ । যোগেন্দ্র নাথ গুপ্তের ' স্বদেশ গাথা ' (১৯০৬)

৫। হেম চন্দ্র সেনের ' মাতৃগাথা ' (১৯০৭)

৬। নলিনী রঞ্জন সরকারের ' বন্দনা ' ২য় খন্ড (১৯০৮)

৭। যোগেন্দ্র নাথ শর্মা র ' স্বদেশী সংগীত ' (নভেম্বর , ১৯০৫)

৮। হীরালাল সেনগুপ্তের ' হুঙ্কার ' (১৯০৮)

৯। প্রমোদ বসুর ' বঙ্গ স্বাধীনতা '

১০। তুলসী দাস ভাদুড়ীর ' সোনার ভারত '

১১। গিরিন মুখার্জীর ' স্বদেশী রামায়ণ '

১২। কালিঘাটের পন্ডিত (গিরিন মুখার্জী) ' স্বদেশী কথকতা '

১৩। নীলমনি ভট্টাচার্য্যের ' বিখ্যাত স্বদেশী কথকতা '

১৪। ডঃ হরেন্দ্র নাথ বসুর ' জাগরণ '

১৫। কুঞ্জ বিহারী গাঙ্গুলীর ' মাতৃপূজা '

১৬। গিরিন্দ্র মোহিনী দাসীর ' স্বদেশিনী কাব্য ' (ফেব্রুয়ারী , ১৯০৬)

১৭। অনাথ বন্ধু মজুমদারের ' বিজনে বিলাপ ' (১৩১২) । ১৯০৫

১৮। দুর্গাদাস লাহিড়ীর ' বাঙালীর গান ' (১৩১২) । ১৯০৫

১৯। উপেন্দ্র নাথ দাস সম্পাদিত 'জাতীয় সংগীত '

স্বদেশী যুগে সংগীত ও কবিতার আবেদন ছিল বেশী। জাতীয় উদ্দীপনার যুগে সংগীত বা কবিতার গীতি ধর্মিতার জন্য এ গানগুলো বিপ্লবীদের বা স্বদেশীদের মুখে মুখে ফিরত। বাঙালী হৃদয়ে দুর্বার গতি প্রবাহ এনে দিল এই গানগুলি। স্বাভাবিক ভাবে এই গানের ব্যাপকতা ও স্বদেশীদের মুখে এই গান শুনে ইংরেজদের ধারণা হয়েছিল এই সব কবিতাই হচ্ছে তাদের প্রেরণার আকর বস্তু। তাই রাজরোষে পড়েছিল

এই পুস্তকগুলি। ইংরেজ সরকার কর্তৃক এই রূপ বহু কাব্যগ্রন্থ বা কবিতা সঙ্কলন পরবর্তীতে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কয়েকটি কাব্যের আলোচনা করা হলো।

বন্দনা

বন্দনায় আছে দেশভক্তি মূলক গান ও কবিতা। বইটি দু খণ্ডে প্রকাশিত হয়। সংগ্রহ কর্তা ও প্রকাশক নলিনী রঞ্জন সরকার। প্রথম খণ্ডে আছে কবিতা ও গান মিলিয়ে ১০৪টা, দ্বিতীয় খণ্ডে ৬৮টি। প্রথম খণ্ড ছাপা হয় ১৩১৩ সালের আশ্বিন মাসে। দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশের কোন সাল নেই। প্রথম খণ্ডে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিকৃতি মুদ্রিত আছে। প্রথম গান 'বন্দেমাতরম' দিয়ে শুরু। দ্বিতীয় খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের চিত্র মুদ্রিত। প্রথম গান 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।'

ভূমিকায় নলিনী রঞ্জন সরকার বলেছেন, "বহুদিন পূর্বে যখন বাংলার হিন্দু মেলা আরম্ভ হয় তখন কতকগুলি জাতীয় সঙ্গীতের সৃষ্টি হইয়াছিল। তারপর কংগ্রেসকে উপলক্ষ করিয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীমতী কামিনী রায় প্রভৃতি বহু কবি উপাদেয় জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। .... রবীন্দ্রনাথ, কাব্য বিশারদ, বিপিন চন্দ্র, অশ্বিনী কুমার, কামিনী কুমার, দ্বিজেন্দ্রলাল, মুকুন্দ দাস প্রভৃতির যে সকল সঙ্গীতে পূর্ববঙ্গের পল্লীপথ, নদীবক্ষ, সভাস্থল এবং প্রান্তর মুখরিত, সেই সকল সঙ্গীতে স্বদেশীর প্রবাহ প্রবলতর বেগে প্রবাহিত হইয়াছে। যখন বাংলার নতুন ইতিহাস লিখিত হইবে তখনই ঐ ঐতিহাসিক সে কথা বুঝাইবেন। বর্তমানে আমরা কেবল সে সকলের সংগ্রহ করিয়া সাহিত্যের উপাদান সঙ্কলন করিতেছি মাত্র। ইতিপূর্বে একাধিক জাতীয় সঙ্গীত সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু ইহার কোনখানি-তেই পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ গান স্থান পায় নাই।" ৬০

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আছে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের —

' বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ । '

এ ছাড়া দ্বিজেন্দ্রলালের ' বিলেত ফের্তা ' কবিতাও এতে অন্তর্গত । রবীন্দ্রনাথেরও বহু গান এতে স্থান পেয়েছে ।

পূর্ব বাংলার এক জন অজ্ঞাত নামা কবির কবিতা এই সংকলনে গ্রথিত আছে ।

" কিবা হইল ওগো নানি ,
বড় আশা দিছিল লাটবাহাদুর কৈরা মেহেরবানী ,
দারগা গিরির চাকরি দিবে , সাথে বইসা খানা খাইবে ,
ওরে সাদি দিবে , আমি দেখাম কেরদানী ।
হুজুরেতে আর্জি দিলাম
দারগা গিরি না পাইলাম ।
ওরে এত আশা কইরা শেষে
নছিবে সানকী ধোয়া পানি । "

কালী প্রসন্ন কাব্য বিশারদের কতকগুলো নতুন গানের উল্লেখ এতে আছে । বাঙালীর সুপ্তি মগ্নতা কবিকে ব্যথিত করেছে । কবি গাইছেন —

' ঐ যে জগৎ জাগে — স্বদেশ অনুরাগে ,
কে আর ব্যবচ্ছিন্ন বঙ্গ ভিন্ন , নিদ্রমগ্ন দিবাভাগে ?
ভাঙবে না কি এ কাল নিদ্রা , রইবে এ ভাব যুগে যুগে ?
পেয়ে পরের প্রসাদ , যায় কি বিষাদ ,
এ অবসাদ কোন বিয়োগে ? '

বঙ্গভঙ্গের জের হিসেবে ফরিদ বরিশাল আন্দোলনে উত্তপ্ত ছিল। ইংরাজ পুলিশের অত্যাচার ও তীব্র হয় সেখানে। সে প্রসঙ্গে কালি প্রসন্ন গাইছেন —

" শুনরে ভাই দেশের দশা কি দুর্দশা
গেলরে দেশ রসাতলে।
হয়েছে দারুণ আকাল তাই কলাকাল
ফরিদপুর আর বরিশালে।

কালিপ্রসন্নের হিন্দীগানও এতে স্থান পেয়েছে।

" ভেইয়া দেশকা এ ক্যেয়া হাল,
খাক মিট্টী জৌহর হোতী সব, জৌহর হ্যায় জঞ্জাল।
ঘর ছোড়কে সব পরকো সেবে, ভাইকো দেৎ ভাগাই।
সাগর পার সব ধন গয়া, আউর ঘর মে লছমী নাই।
পুন্য স্থান এহী আর্যাবর্তমে নহি মিলে কোই চীজ।
আদমী বউরা মূরখ্ হোকে ছোড় দিয়া তজবীজ্।
আঁখ আগে সবী পড়া হ্যায়, কোই ন পাওয়ে বুখা।
ঘরকী লছমী পরকো দেকর, সব কোই রহেঁ ভূখা।
দীন বিশারদ গনই বিপদ, ভনো দুঃখ কো গীত।
হো মতিমান্ দেশকে সন্তান, করো স্বদেশ হিত।

কামিনী কুমার ভট্টাচার্যের কয়েকটি গানের সাথে এই গানটি উল্লেখযোগ্য " জামাল পুরে লাঞ্ছিত রমণীদের প্রতি " —

" আপনার মান রাখিতে জননী আপনি কৃপাণ ধরগো ।
পরিহরি চারু কনক ভূষণ , গৈরিক বসন পরগো ,
আমরা তোদের কোটী সন্তান গিয়ছি ভুলিয়া আত্ম অভিমান ,
কবে সব পিশাচে তোদের অপমান , তাও নেহারি নীরবে সহি গো , ...

ঐ শোন বাজে বিধাতার ভেরী , বাঁধ কটীতটে সুশাণিত ছুরী ,
দানব দলনী সাজগো জননী , বাঙালিনী বেশ ছাড়গো ,
তোদের তপ্ত শোণিত পরশে , পিশাচ পিড়ীত ভারত বরষে
জাগুক আবার যত কুলাঙ্গার আজিও সুখে ঘুমায়ে রয় ,
শুনিয়া তোদের ভৈরব হুঙ্কার , নিখিল চমকি উঠুক আবার
বিমল পুন্যে মোদের দৈন্যে কর মা , ধৌত করগো । "

চারণ কবি মুকুন্দ দাসের কয়েকটি গানও এতে সঙ্কলিত । যতীন্দ্র মোহন বাগচীর ' মায়ের তরে ' গানটি এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে । গানটি এইরূপ ---

ওরে ক্ষ্যাপা , যদি প্রাণ দিতে চাস
এই বেলা তুই দিয়ে দে না ।
ওরে , মায়ের তরে প্রাণটি দিবার
এমন সুযোগ আর হবে না । ....

মায়ের দেওয়া এ ছার জীবন
দেরে মায়ের তরে ,
অমর জীবন পাবি রে ভাই ,
জগৎ মায়ের ঘরে ।

কি দিয়েছিস , লিখবে যখন
পরকালের খাতা ,
(তখন) তোরই দানে হবে আলো
বইয়ের প্রথম পাতা
ওরে ক্ষ্যাপা ।

অশ্বিনী কুমার দত্তের —

শ্মশান ত ভালবাসিস মাগো , তবে কেন ছেড়েগেলি ?
এত বড় বিকট শ্মশান এ জগতে কোথায় পেলি ?
দেখ সে হেতা কি হয়েছে ত্রিশ কোটি শব পড়ে আছে ,
কত ভূত - বেতাল নাচে রঙ্গেঁভঙ্গেঁ করে কেলি ,
ভূত পিশাচ তাল - বেতাল নাচে আর গাল ,
সঙ্গেঁ ধায় ফেরু পাল , এটা ধরি ওটা ফেলি ।
আয় না হেথায় নাচবি শ্যামা । শব হবে শিব পাছুঁয়ে মা ,
জগত জুড়ে বাজবে দামা , দেখবে জগত নয় মেলি ।

ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায় ' সন্ধ্যা ' , ' করালী ' প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশ করতেন । ' করালী ' ছদ্ম নামে ব্রহ্ম বান্ধব ' আছিস কোন উল্লাসে ' ? গানটি বন্দনার্থ সঙ্কলিত হয়েছিল ।

" আছিস কোন উল্লাসে ?
সবাই বিদেশী জোঁক রক্ত চোষে ,
জলে গেলে জলের জোঁকে
ধরে জীবের আশে পাশে ,
এ যে এমনি নাছোর জোঁক
জলে স্থলে ধরলো ঠেসে ।
তোরা ধনে প্রাণে গেলি মারা
বিলাসের চুলকানি দোষে ।
করালীর পদাবলী
উড়াইও না উপহাসে ,
(দেখছ না) সোনার ভারত হচ্ছে শ্মশান
দুষ্ট জোঁকের শ্বাস প্রশ্বাসে । "

'ময়মনসিংহ সুহৃদ সমিতি'তে গাওয়া একটি গান এই সংকলনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য —

" পেটের খিদায় জইলে গো মইলাম , উপায় কি করি ?
ওরে কি দারুণ আকাল পইড়া দেরে ধান টাকায় হইল দু পসুরী ।
মোমিন বলে , করি গো মানা , ভাতের দু:খু আর রবে না ,
বিলাতী চিজ কিনবো না আর — কত কসম করি ।
তবে দেশের টাকা রহবোরে দেশে ,
লক্ষ্মী ঘরে আসবে রে ফিরি । "

দেশাত্মবোধের গানের এই অমূল্য পুস্তক দুটিকে ইংরাজ সরকারের আদেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় । নোটিশ নং PIB , PP BEN B 3/182 .

মাতৃগাথা

এই গানের সংকলনটি প্রকাশিত হয় ১৯০৭ সালে । প্রকাশ করেন হেম চন্দ্র সেন । এতে দুষ্প্রাপ্য ৬০ টি গান সংকলিত । বইটি ছাপানো হয়েছিল কৃষ্ণ কুমার মিত্রের সাম্য প্রেস থেকে । আমরা এই গানের মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করি । ২১ টি গানের মধ্যে আছে বিদেশী বাণিজ্যের শোষণের ফলে দেশীয় শিল্পগুলো কিভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণের প্রতি যৌক্তিকতা বর্ণিত হয়েছে । বঙ্গভঙ্গ জনিত কারণে বেদনা বোধ ও দেশাত্মবোধ জাগরণের ভাবনা আছে ৭ টি সঙ্গীতে । অতীতের হিন্দু গৌরব কাহিনী আছে পাঁচটি কবিতায় । দশটি কবিতায় আছে হিন্দু মুসলমান ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার কথা । ময়মন সিংহ সুহৃদ সমিতির এই রূপ একটি গান —

রাম রহিম না জুদা কর (ভাই) মনটা খাঁটি রাখজী ,
দেশের কথা ভাব ভাই রে , দেশ আমাদের মাতাজী ।
হিন্দু মুসলমান , এক মার সন্তান , তফাৎ কেন কর জী ।
দুই ভাইয়ে , দু ঘর বেঁধে একই দেশে বসতি ।
কাপড় , জুতা , লবন , চিনি , ছুরী , কাঁচি বিলাতী ।
(মোদের) ভাইরা সকল পায় না খেতে , জোলা , কামার আর তাঁতী ।
টাকায় ছিল মনেক চাল ভাই , এখন বিকায় পসুরী
এরপরে ভাই , হতে বাকি গাছের তলে বসতি ।
দেশের দিকে চাও ফিরে , (ভাই) দেশ লুটিছে বিদেশী ।
মোদের টাকা নিয়ে দেয়রে চাবুক , চাপড় , কীল , ঘুঁষি ।

বন্দেমাতরম

সংকলন কর্তা যোগীন্দ্র নাথ সরকার । পুস্তকটি প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে । এই সংকলনে রবীন্দ্র নাথের গানের সংখ্যা বেশী । ' শিবাজী উৎসব ' কবিতাটিও এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে । রবীন্দ্র নাথের গানের সংখ্যা ৩৩ । এ ছাড়া সরলা দেবী , প্রমথ নাথ চৌধুরী , রজনী কান্ত সেন , বিজয় চন্দ্র মজুমদার , সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় , হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকদেরও কবিতা আছে ।

যোগীন্দ্র সরকারের এই কবিতা সংকলন প্রকাশ করার পিছনে যে ভাবনা ছিল সখারাম গণেশ দেউস্করের লেখা ভূমিকায় তা স্পষ্ট । সখারাম দেউস্কর বলেছেন -- " এই পরাধীনতার ও পরতন্ত্রতার বিষময় ফলে দেশের লোকের আর পূর্বের ন্যায়

সংকল্পে দৃঢ়তা নাই , সকলেই জড়পিন্ডবৎ নিশ্চল ও নির্জীব অবস্থায় কালহরণ করিতেছে , দেশের জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ দেশের ও সমাজের এই দুরবস্থা দর্শনে হৃদয়ে ব্যাকুলতা অনুভব করিতেছেন , নানা সংগীত ও কবিতার আকারে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে । ইহাই বর্তমানকালে স্বদেশভক্তি মূলক সংগীতগুলির উৎপত্তির কারণ । জাতীয় সংগীত ভিন্ন জাতীয় চিত্তের অবসাদ দূরীভূত হয় না , জাতীয় ভাব যথোচিত বল - বেগ লাভ করে না । এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের আশায় বর্তমান সংগীত গ্রন্থের প্রকাশক মহাশয় ' বন্দেমাতরম ' প্রচার করিতেছেন । "

মনো মোহন বসুর কয়েকটি পংক্তি —

" আহা মরি , ' স্বদেশ ' কি সুধা মাখা নাম ,
মনে হয় তার কাছে তুচ্ছ স্বর্গ - ধাম ,
যে স্থানে মায়ার বস্তু , সকলি আমার ,
সুখের বিষয় যথা , অশেষ প্রকার ,
যে স্থানের পূর্বকথা , করিলে স্মরণ ,
অনুরাগে উথলিয়া উঠে প্রাণ মন ।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের —

আজি শুভক্ষণে ভারত উত্থান
এ দেউটি কভু হবে কি নির্বান ?
হে ভারতবাসী হিন্দু মুসলমান
হের দুখ - নিশি পোহাল ।

শত হৃদি বাঁধা একই লহরে
পূরব পশ্চিম দক্ষিণ সাগরে
হিমগিরি আজি মিলিল ,
ভারত জননী জাগিল ।

* * * * *

জীবন সার্থক আজিরে আমার
এ 'রাখি' বন্ধন ভারত মাঝার
দেখিনু নয়নে - দেখিনু রে আজ
অভেদ ভারত চির মনোরথ
পুরাবার তরে চলিল ।

সরলা দেবীর ---

তোমায় ভারত জননি , বিদ্যা মুকুট ধারিনি
বর - পুত্রের তপ - অর্জিত গৌরব মনি মালিনী
কোটি সন্তান আঁখি - তপন - হৃদি আনন্দ - কারিনি
মরি বিদ্যা মুকুট ধারিণি ।

সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আহ্বান সংগীতে' ধ্বনিত হয়েছে জাগরণের উদ্দীপনী সুর --

নগরে নগরে জ্বালরে আগুন ,
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ ,
বিদেশী বাণিজ্যের কর পদাঘাত
মায়ের দুর্দশা ঘুচারে ভাই ।

আপনি বিধাতা সেনাপতি আজ
ওই ডাকছেন সাজ রে সাজ
স্বদেশী সংগ্রামে চাই আত্মদান
' বন্দেমাতরম ' গাও রে ভাই ।

এই স্বদেশী যুগের জ্বালাময়ী আবেগ হতে প্রকৃতির কবি করুণা নিধানও মুক্তি পাননি । তিনিও বজ্র অসির ন্যায় মসি ধরেছিলেন —

লোহার নিগড় ছিঁড়ে
মত্ত মাতাল বাহিরিয়া পড়
লক্ষ লোকের ভিড়ে ।
বর্শা শানায়ে নিয়ে
অশ্বের খুরে আগুন ছুটাও
পাহাড়ের পাশ দিয়ে
এসো গো দুঃসাহসি
ললাট হইতে উঠাও সবলে
দুর্ভাবনার মসী ।

প্রমথ নাথ রায়চৌধুরীর নিম্নোক্ত গানে প্রাকৃতিক বর্ণনার সাথে মাতৃ বন্দনার এক অপূর্ব সংমিশ্রন ঘটেছে । এই গানে বঙ্গজননী যেন শ্যামা মায়ের প্রতীক রূপে চিহ্নিত —

" নম বঙ্গভূমি শ্যামাঙ্গিণী
যুগে যুগে জননী লোক পালিনী

সুদূর নীলাম্বর প্রান্ত সঙ্গে
নীলিমা তব মিশিতেছে রঙ্গে
চুমি পদ ধূলি বহে নদীগুলি
রূপসী শ্রেয়সী হিত কারিনী ।
তাল তমাল নীরবে বন্দে
বিহগ স্তুতি করে ললিত সুছন্দে
আনন্দে জাগ , অয়ি কাঙ্গালিনী । "

স্বদেশ সঙ্গীত

এই গানের পুস্তকের সঙ্কলন কর্তা যোগেন্দ্র নাথ শর্মা । যোগেন্দ্র নাথ শর্মা কালি প্রসন্ন কাব্য বিশারদের ছদ্ম নাম । পুস্তকটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৬ । প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালের নভেম্বর মাসে ।

পুস্তকটি সেদিনের জনতার নেতা , অসাধারণ বাগ্মী , রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত । সুরেন্দ্রনাথ কালি প্রসন্নের সাথে ঘনিষ্ঠ ছিলেন । সুরেন্দ্র নাথ তাঁর আত্ম জীবনীতে লিখছেন " আমি কালি প্রসন্ন কাব্য বিশারদের কথা বলছি । তিনি ছিলেন ' হিতবাদী ' পত্রিকার সম্পাদক । এক মারাত্মক ব্যাধিতে তিনি ভুগছিলেন , যে ব্যাধির নাম ব্রাইটস ডিজিজ । তা সত্ত্বেও আমন্ত্রণ পেলেই তিনি যে কোন স্বদেশী সভায় উপস্থিত থাকতেন । তিনি সভাগুলোতে একটি নতুন রীতির প্রচলন করেন । সেই রীতিটি আজও আমাদের সভা সমিতি ও বিক্ষোভ শোভাযাত্রা ইত্যাদিতে অনুসরণ করা হয়ে থাকে । রীতিটি হচ্ছে এই সমস্ত সমস্ত অনুষ্ঠান একটি সময়োপযোগী দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের দ্বারা শুরু করা । কাব্য বিশারদের অতি সুন্দর সঙ্গীত প্রতিভা

ছিল । নিজে তিনি গান করতে পারতেন না , কিন্তু তিনি অতি চমৎকার সঙ্গীত রচনা করতেন । এই সঙ্গীত গুলি স্বদেশী সভায় গাওয়া হত । শ্রোতাদের হৃদয়ে তা গভীর ভাবে রেখাপাত করতে কখনই ব্যর্থ হয়নি । সঙ্গীত রচনার ক্ষমতা ছিল তাঁর একটি প্রকৃতি দত্ত স্বাভাবিক গুণ । হিন্দী ভাষায় তাঁর সে রকম পাকা দখল না থাকা সত্ত্বেও তাঁর রচিত ' দেশ কি হয়ে ক্যা হালত ' হিন্দী সঙ্গীতটি ছিল অন্যতম শ্রেষ্ঠ হৃদয় গ্রাহী সঙ্গীত । দেশী জিনিস ফেলে বিদেশী জিনিস গ্রহণের প্রতি যে মোহ আছে, তাকে প্রচন্ডভাবে নিন্দা করা হয়েছে এই সঙ্গীতে । ১৯০৬ সালে কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে , হাজার হাজার লোকের সমক্ষে যখন এই গানটি গাওয়া হয় তখন সেই বিশাল শ্রোতৃ মন্ডলীকে তা এক প্রবল অশান্ত উত্তেজনার মধ্যে টেনে নিয়ে যায় ।

"কাব্য বিশারদের সঙ্গে সর্বদাই দুজন ওস্তাদ সংগীত শিল্পী থাকতেন । তারা স্বদেশী সভা গুলিতে উদ্বোধন ও সমাপ্তি সঙ্গীত গান করে শোনাতেন । কাব্য বিশারদ নিজেই তাদের শিক্ষা দিতেন ও বেতন দিয়ে ভরণ পোষণ করতেন । .... একজন বড় ধরণের বক্তা ছিলেন না , কিন্তু একজন শক্তিশালী লেখক ছিলেন । বিদ্রূপাত্মক রচনা লিখে ভারতের প্রগতি বিরোধী শক্তিগুলির উপর তীব্র ও নির্মম আক্রমণ চালাতেন ।" [৬১]

এই সংকলনে তাঁর গানের সংখ্যাই অধিক । গানের ভাবোদ্দীপক পরিবেশ রচনা করে দেশের যুব শক্তিকে উদ্বোধিত করাই ছিল তাঁর আদর্শ । ' স্বদেশের ধূলি ' কবিতায় তিনি আহ্বান জানিয়েছে —

' স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেনু বলি
রেখো রেখো হৃদে এ ধ্রুব জ্ঞান
যাহার সলিলে মন্দাকিনী চলে
অনিলে মলয় সদা বহমান ।

নন্দন - কাননে কিবা শোভা ছার

বনরাজি কান্তি অতুল তাহার
ফল শষ্য তাহার সুধার আধার
স্বর্গ সে যে মহীয়ান ।

অন্য একটি গানে দেশ জননীকে শ্যামা মা রূপে তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণনা করেছেন —

সেই তো রয়েছ মা তুমি
ফুলে ফুলে সুশোভিত শ্যামা জন্মভূমি
শিরোপরি গিরিবর
সেই শুভ্র কলেবর
পদতলে সেই সিন্ধু আছে অনুগামী ।
তেমনই বিহঙ্গ কুল
কলরবে সমাকুল
তেমনি শুনিতে পাই মধুপ ঝঙ্কার ।
সেই তো সকলি আছে
তবে মা সবার পাছে
তোমার সন্তান কেন অধোপথ গামী । ৭৪

কালি প্রসন্ন কাব্য বিশারদ নিজের মধ্যে দেশবাসীর স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন । এই কবিতায় তিনি দেশবাসীর প্রতীক রূপে চিহ্নিত । গীতিকার দেশজননীর নিকট ভিক্ষা করছেন । গানটি সঙ্গীত নিয়মের অন্তরা , সঞ্চারী , আভোগ এই অংশগুলো ব্যবহার করেছেন ।

নয়ন মুদিত মোহ ঘুম ঘোরে অচেতন
সহসা কেমনে আজি করি আঁখি উন্মীলন ।

অন্তরা : অলস অবশ অঙ্গ হবে না এ মোহভঙ্গ
কে যেন স্বপনে শুনি , করিতেছে আবাহন ।

সঞ্চারী : আঁধারে আবৃত বিশ্ব অবণী না হয় দৃশ্য
' জাগ জাগ দেখ চেয়ে ' কে বলিছে অই --

আভোগ : কেন মা জনম তুমি অবোধে জাগালে তুমি
ছিন্ন ভিন্ন কু সন্তানে কেন কর সম্ভাষণ ।

সঞ্চারী : স্বপনে শুনিয়া স্বর শিহরিল কলেবর
শিরায় শোনিত ধারা বহিল আবার

আভোগ : ঘুমের এ ঘোর হতে জাগাইলে যদি সুতে
শক্তি দেহ সুপ্ত দেহে কর মৃত সঞ্জীবন ।

অন্য একটি গানে কালি প্রসন্ন শক্তিরূপিনী দেবী দুর্গা স্বরূপিনী দেশ মাতৃকার প্রতি ' আবাহন ' এ ব্রতী হয়েছেন --

দন্ড দিতে চন্ড মুন্ডে এস চন্ডি যুগান্তরে
এ যুগে আবার মাগো দুর্গতি নাশিতে জাগো
এসো নিজে রক্তবীজে নাশ সেই মূর্তি ধরে
এসো মা ত্রিতাপহরা , স্তম্ভিত এ বসুন্ধরা ।
শুম্ভ নিশুম্ভের দম্ভে সর্বনেত্রে অশ্রু ঝরে ।
আবার সে রূপ ধরি অবনীতে অবতরি
' তিষ্ঠ তিষ্ঠ ' বলে ডাক তেমনি ভীষণ স্বরে
শুনে ভয়ংকর শব্দ , ত্রিভুবন হক স্তব্ধ ।
বিশারদ ঐ পাদ কাতর হৃদয়ে স্মরে ।।

কালিপ্রসন্ন এই গানে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের প্রতি কবির আবেদন প্রচারিত —

এই দ্বারদেশে এসেছে ভিখারি
কহ কৃপা করি কি দিব তায়
স্বদেশ সেবক এ সব যাচক
বঞ্চিত কোরনা করুণা কণায় ।

এই ভিক্ষা চাই সদনে তোমার
স্বদেশের বস্তু কর ব্যবহার
বিদেশীয় কিছু কোরো না গ্রহণ
যদি তুল্য তার দেশে পাওয়া যায় ।

বলে বিশারদ এই ভিক্ষা দাও
কোনো না বিমুখ মুখ তুলে চাও
স্বদেশের ধন স্বদেশে রক্ষণ
না করিলে বল কী হবে উপায় ।

[১] স্বদেশ সংগীতে[৭] কালি প্রসন্নের একটি দুষ্প্রাপ্য কবিতায় স্বদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের দীন হীন অবস্থা বর্ণিত হয়েছে —

ভাই সব দেখ চেয়ে , বাজার ছেয়ে
আসতেছে মাল বিদেশ হতে
আমাদের বেচা কেনা , পাওনা দেনা
অভাব মোচন পরের হাতে ।
ঘরে নাইকো আহার বেশের বাহার
যাহার তাহার ঘাটের পথে

হায়রে নিজের দেশে যায় না অভাব
অশন বসন সব বিলাতে ।
ছেড়ে পরের ঠাকুর ঘরের কুকুর
ইচ্ছা করে মাথায় নিতে
বিশারদ ছাড়তে নারে কেঁদে মরে
কার্য্য সারে কোন মতে ।

বরিশাল পূর্ব বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের এক পূন্যতীর্থ ভূমি ছিল । এই বরিশাল ছিল স্বদেশী যুগের প্রেরণারউৎস স্বরূপ । কালিপ্রসন্ন সেই বরিশালের জাগরণের মধ্য দিয়ে বাংলার জাগৃতির স্বপ্ন দেখেছেন —

জাগো জাগো বরিশাল
তোমার সম্মুখে আজি পরীক্ষা বিশাল ।।
প্রাণ দিয়া হুতাশনে
দেখাও জগৎ জনে
বিশুদ্ধ কনক কান্তি-সৌর করজাল ।।
দেখিব তোমার শক্তি
দেশভক্তি অনুরক্তি
দেখিব গৌরব তব রবে কতকাল ।।
বুঝিব দেশের তরে
কতটা রুধির ঝরে
মনুষ্যত্বে বরিশাল হবে কি কাঙাল ?
নিরখি আরক্ত নেত্র
প্রহরীর করে বেত্র
হারায়ে প্রতিজ্ঞা ভর্তে হই পরকাল

ভুলিও না কোনভয়ে
থাকিও যাতনা সয়ে
ঝুলুক বঙ্গের শিরে খর করবাল ॥

স্বদেশী আন্দোলনে মুসলমান সমাজ ছিল বিচ্ছিন্ন। জাতীয় জাগরণের মহতী অনুষ্ঠানে মুসলমানদের যোগ অবশ্যই প্রয়োজনীয় ছিল। তাই কালি প্রসন্ন এই গানে মুসলমানদের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করে তাদের আহ্বান জানিয়েছেন স্বদেশ কর্মে —

এখন মুসলমানের ইমান্ কোথা
না খারার বাহার
দেখি খোদা তালার রাখার পরে
দেল রাখে না কেহ আর।
ফেতো নবাব মস্ত খিতাঁ
খান বাহাদুর গাঁয়ের মির্সী,
নামের লোভে কাম ছেড়ে সব
দেনা করে দেয় বাহার ॥
আখেরে সব ভাবনা ভুলে
জাতি ভাইকে ফেলছ তলে
যারা বাদশা ছিল এলেম বিনে
তারাই গোলাম আর গোভার।
কি লোভে সব ভায়ের গলায়
অন্ধ হয়ে ছুরি চালায়
আখেরে খানসামা গিরি
(এখন) বড় জোর রেজিষ্টার ॥
সদাই শুনি অন্ন কষ্ট
দুবেলা দুই মুঠোভাত (পেট ভরে)
জুটছে দেশে কজনার ?

কোথা থেকে কারা এসে
লুটে নে যায় নিজের দেশে
বাহিরের চটকে লালছ
আমাদের কই হাট বাজার ?
করেছি হায় এয়ছা স্বভাব
নিজের দেশে যায় না অভাব
অযত্নে বিলালাম রত্ন
বদলি মিললো ফক্কিকার ॥
সায়েব বলে জেগে দেখো
নয়ন কেন মুদে রাখ
যে মাটিতে পয়দা হলো
সেই মাটি সার দুনিয়ার ॥

ঈশ্বরে বিশ্বাসী কালি প্রসন্ন স্তব রূপে দেবতার কাছে প্রার্থনা করেছেন দেশকে উদ্ধারের জন্য —

জয় জগদীশ হরে , জয় জগদীশ হরে
মীনরূপ ধরি হরি অবনীতে অবতরি
প্রলয় পয়োধি জলে বেদ ব্রহ্ম উদ্ধারিলে ,
বিষম বিদেশী স্রোতে কে আজি উদ্ধার করে ?
জয় জগদীশ হরে ।

রাজকৃষ্ণ রায়ের একটি সংগীতে ভারত জননীর বেদনার কথা কবিতায় দিও —

দিবস বিগত , তবুও ভারত ,
নহিল বিগত দুঃখ তোমার ?
রজনী আইল, আবার ছাইল
শোকের উচ্ছ্বাস মুখ তোমার ।

পূবের আকাশে আঁধার ধায় ,
বদন তোমার আঁধার তায়
তপত করিছে শীতল বায়
    দুঃখ নিপীড়িত বুক তোমার ।
শিশির - শীকর ঝরে ধীরে ধীরে ,
শরীর তোমার ভাসে আঁখি নীরে ,
আরো কতদিন , তবে দুখিনী রে
    দুঃখ নীরে পড়ি দিবি সাঁতার ।

রাম প্রসাদী সুরে রাজকৃষ্ণ রায়ের 'খ্যাপেকী কবিতা' এই সংকলনে গ্রথিত —

মন বসেনা দেশের হিতে
বাগান ভোজে খাওরে মজে
গরিব গুলো পায়না খেতে ।
গেজেটে নাম উঠবে বলে
টাকা ঢালো চাঁদার খাতে
তেলা মাথায় তেল ঢেলে দাও
ক্ষুধিত বসে খালি পাতে ।
হুজুর হুজুর বলে দাড়াও
হাজার সেলাম ঠুকে মাথে
কাজের বেলায় কলা হলে
দেশটা গেল অধঃপাতে ।

রাজকৃষ্ণ রায়ের কবিতাগুলি বহু পূর্বেই প্রকাশিত হলেও এই সংকলনে ঠাঁই পেয়েছিল । পরবর্তী কালে স্বদেশ সঙ্গীত ইংরাজ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ পুস্তক রূপে ঘোষিত হয় ।

বিজনে বিলাপ

কাব্যটি রচনা করেছেন অনাথ বন্ধু মজুমদার । প্রকাশ কাল ১৯০৫ । কবি এই গ্রন্থকে উৎসর্গ করেছেন প্রমথ নাথ চৌধুরীকে । দেশভক্তি মূলক ২০টি কবিতা এই সংকলনে সংযোজিত । " মোটামুটি ভাবে সব কবিতাতেই পরাধীনতার কারণে কবিকে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে দেখা গেছে , অতীত গৌরবের কথাও কবি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন , জাতিগত ঐক্য স্থাপনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন শক্তিশালী জাতি তথা দেশ গঠনের জন্য ।" ৬২

' সুপ্তোত্থিত ' কবিতায় কবি দেশের হীনমন্যতা বিসর্জন করে জাগরণের বানী শুনিয়েছেন —

যাহাদের পদতলে লুটাতেছে প্রভুবলে
ধন মান বিসর্জিছ মানিয়া সভয় ,
ভান্ডার করিয়া শূন্য দিয়ে মান ধন মান্য
মাগিয়া লতেছ শুধু দাসত্ব অভয় ।

জাতির ঐক্য প্রতিষ্ঠা হলে সব দুঃখ দূর হবে —

জাতিত্বের অভিষেকে নব দিবা - করালোকে
যেদিন করিবে প্রাণ পবিত্রতাময় ,
সেদিন তারাই দূরে লাজে ভয়ে রবে সরে
সম্ভ্রমে চাহিবে ফিরে মানিবে বিস্ময় ।

জননীর বেদনায় সন্তানদল কাতর হয় না এই শুনে কবি ' একতা ' কবিতায় খেদোক্তি করেছেন —

' জননীর আঁখি জলে ভাসে ক্ষিতি গিরিগলে
না জানি তোদের প্রাণ কঠিন কেমন
তাই শুষ্ক রাখিস নয়ন ।

ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে হানাহানি একান্ত অপমানকর । কবি এই দৃশ্যে ব্যথিত হয়েছেন । ' জন্মভূমি ' কবিতায় তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে এই আচরণে দেশমাতৃকার প্রতি অবমাননা করার সামিল —

সকলেই পূজে পুণ্য মোক্ষ জন্ম দায়িনী
কেবল ভারত বাসী
পরায়ে গলায়ে ফাঁসী
করে তব অপমান পরপদ শিরে হানি ।

' আর্য গাথা ' য় কবি বেদনাজনিত দীর্ঘশ্বাস নিক্ষেপ করে বলেছেন —

কেবল ভারত রহে পদানত রে ।

হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হলে দেশজননীর কল্যাণ নাই এই মর্ম প্রকাশ করে তিনি এই দুই জাতির মধ্যে মিলনের জন্য প্রার্থনা করেছেন —

মায়ের দুইটি ছেলে হিন্দু মুসলমান ,
দুইটি যমজ মোরা
জননীর বুক জোড়া
দুইটি যে দু:খিনীর অন্ধের নয়ন ।

ভুলো দ্বিধা ত্যজ দ্বন্দ্ব জননীর কারণ
আয় আজ ভাই ভাই
দাঁড়াইয়া এক ঠাঁই
একতারে প্রাণে প্রাণ করিয়া বন্ধন
দাঁড়াই যেন রে দুটি যমজ সন্তান ।

সাধনা

কাব্যটির প্রকাশ কাল ১৩১৪ সাল । কবি রজনী কান্ত চট্টোপাধ্যায় । কবির বাড়ী ছিল খয়েরাবাদ । কাব্য গ্রন্থটি কবি উৎসর্গ করেছেন মনীষী অশ্বিনী কুমার দত্তকে । এই কাব্যে কবির উচ্ছ্বাসের ধারা প্রবাহিত । প্রথম উচ্ছ্বাসে কবি ভীষ্ম , দ্রোণ , দধীচি , রানাপ্রতাপ , শিবাজী প্রমুখ প্রাচীন ভারতীয় বীরদের কাহিনী স্মরণ করেছেন । অন্যদিকে যশোরের প্রতাপাদিত্য , মোহনলাল , সিরাজদৌল্লা প্রমুখ বাঙালী বীরদের গৌরবময় অতীত কাহিনী বর্ণনা করেছেন ।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে প্রধান কর্মসূচী ছিল বিদেশী দ্রব্য বর্জন । স্বদেশীর ব্যবহার । কবি এই ভাবনানুসারে দেশবাসীকে সাড়া দিতে আহ্বান জানিয়েছেন —

বিদেশী বর্জন কর ধর্মের দোহাই ,
বঞ্চক বণিক গণ কত ছলে বলে
তোমাদের সর্বনাশ করিছে কৌশলে ,

কবি সেইজন্য দেশবাসীকে পরামর্শ দিয়েছেন —

একটি সিকিও আর বিদেশে দিও না
তবে আর তোমাদের এ দুঃখ রবে না ।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস পর্বে জননীর চাইতেও জন্মভূমিকে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছেন —

তারাই প্রকৃত সুখী এই ভূ মন্ডলে —
যাঁহারা স্বাধীন ভাবে ভ্রমে কুতুহলে
জাতীয় কেতন তুলি
' জয় জন্মভূমি ' - বলে
অতি তুচ্ছ স্বর্গ সুখ তাঁহাদের ঠাঁই ,
জন্মভূমি জননীর তুল্য আর নাই ।।

তৃতীয় উচ্ছ্বাসে কবি চন্ডীর আত্ম প্রকাশ ও প্রকৃতির রূপ , হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশমাতৃকার তরে জীবন বিসর্জনের আহ্বান জানিয়েছেন । চতুর্থ উচ্ছ্বাসে ইংরাজ দাসত্বের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে দেশবাসীকে উদ্বোধিত করেছেন । ডঃ বরুণ চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন " উচ্চাঙ্গের কবি কল্পনা কিংবা ছন্দ অথবা অলংকার প্রয়োগ নৈপুণ্যের কোনো স্বাক্ষর না রাখতে পারলেও অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে ' সাধনা 'র কবি দেশপ্রেম মূলক রচনার ইতিহাসে আসন লাভের অধিকারী । " ৬৩

অবসর

কাব্যটির প্রকাশ কাল ১৯০৮ (১৩১৪) । লেখিকা ফুল কুমারী গুপ্ত । জন্মস্থান হুগলী জেলার গুপ্তি পাড়া । কবিতা সঙ্কলনটি ভিন্ন জাতীয় কবিতা হলেও

দেশাত্মবোধের কবিতা আছে ।

এই কাব্য গ্রন্থের দীর্ঘতম কবিতা ' উচ্ছ্বাস ' । বিলাতে বসবাসকারী ভাই এর উদ্দেশ্যে লেখা এক অপূর্ব দেশাত্ম বোধক কবিতা । বিদেশীদের গুণরাশির পাশে ভারতীয়দের নিস্পৃহতা কবিকে অভিমানে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে । পরাধীনতা ও ইংরাজ শাসনে বিদীর্ণা ভারত জননীর স্বরূপ উল্লেখ করে কবি ভাইকে আহ্বান জানাচ্ছেন বিলাতের ভূমি ছেড়ে ভারতে এসে দেশের কাজে আত্ম নিয়োগ করতে —

যে দশা হয়েছে আজি জনম ভূমির ,
যে দশা হয়েছে আজি ভারতবাসীর ,
এদের উদ্ধার তরে
কত শক্তি এক করে ,
অপমান নির্যাতন সহিয়া নীরবে
দেশের মঙ্গল কর্ম করিবারে হবে ।

কবিতাগুলিতে কবির দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতা ধরা পড়েছে ।

বাঙালীর গান

এটি একটি বিশাল বাংলা গানের সংকলন । বহু কবির সংগীত এই সংকলনের অন্তর্গত । সম্পাদনা করেন দুর্গাদাস লাহিড়ী । প্রকাশ সাল ১৩১২ (১৯০৫) । কয়েকজন বিরল কবির গান উল্লেখিত হলো ।

আনন্দ মিত্র সুলেখক ও কবি খ্যাতি লাভ করেন । তাঁর রচিত ' ভারত শ্মশান

মাঝে আমি রে বিধবা বালা' অত্যধিক প্রচারিত সঙ্গীত। গীতিকার আনন্দ চন্দ্র একটি গানে দেশ মাতৃকার বর্তমানের দৈন্যতা প্রকাশ করে ব্যথিত হয়েছেন —

কোথায় রহিলে সব ভারত ভূষণ,
এক বার এসে দুঃখিনীরে কর দরশন।
সুরম্য কুসুমবন দাবানলে দহে যেন,
নিষ্ঠুর শ্বাপদ পদে করিছে দলন।
কোথা ভীষ্ম ভীমার্জুন, কোথা যোগী ঋষিগণ
কোথা সে নব রত্ন অমূল্য রতন।
অজ্ঞানতা অন্ধকারে, অধীনতা পারাবারে,
ভাসিছে ভারত ঐ, ভরসা নাহি সংসারে,
জননী এ যাতনা, কেউ দেখেও দেখে না
পথিক বলে সবে মোহ নিদ্রায় মগন ॥

আনন্দ মিত্র 'পথিক' শব্দের ভনিতা ব্যবহার করেছেন তাঁর বহু গানে।

বঙ্গভঙ্গ যুগে নারীর জাগরণ ছিল এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এতদিনের প্রচলিত কুসংস্কার ভেঙে নারীরাও অংশ গ্রহণ করেছিলেন স্বদেশী আন্দোলনে। আনন্দ চন্দ্র মিত্র সেই প্রসঙ্গে লিখলেন —

আজি এ আনন্দ দিনে মিলে সকলে
করি হে আনন্দ ধ্বনি, হৃদয় খুলে।
বঙ্গের যতেক নারী অজ্ঞান আঁধারে,
পাশ বদ্ধ পাখী প্রায় ছিল এতকালে
চেয়ে দেখ এবে, তারা পেয়ে সুসময়,

চলেছে উন্নতি পথে মন কুতুহলে ।
আমরা কি তবে বল এ শুভ সময়ে ,
উদাসীন ভাবে সবে থাকিব ঘুমায়ে ?
যার যতটুকু বল আছে দেহ মনে ,
প্রদানিব তাহাদের সহায়তা তরে ।

গোবিন্দ চন্দ্র রায়ের (১৮৩৭ - ১৯১৭) দেশ প্রেমের অনবদ্য ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর গান ও কবিতায় । তাঁর দুটি কবিতা উল্লেখযোগ্য । একটি ' যমুনা লহরী ' অন্যটি ' ভারত বিলাপ ' । ভারত বিলাপে কবির বিলাপ মাতৃ দুর্দশায় শোকগ্রস্ত । কবি বেদনা চিত্তে লিখছেন —

কতকাল পরে , বল ভারত রে ,
দুখ - সাগর সাঁতারি পার হবে
অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে
ওকি শেষ নিবেশ রসাতল রে ,
নিজ বাস ভূমে , পরবাসী হলে
পর - দাস - খতে সমুদয় দিলে !
পর - হাতে দিয়ে , ধন রত্ন সুখে
বহু লৌহ বিনির্মিত হার বুকে !
পর ভাষণ , আসন , আনন রে
পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে ,
পরদীপ শিখা , নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে , তুমি সে তিমিরে ।
পর বেশ নিলে , পর দেশ গেলে
তবু ঠাঁই মিলে নাহি দাস বলে ।

লড়িয়ে বল বুদ্ধি , পরের বশে
হত জীবন চা অহিফেন চষে ,
শিখিল যত জ্ঞান , নিশীথে জেগে
উপযুক্ত হলো পর সেবা লেগে ।
হলো চাকরি সার , যথায় তথায়
অপমান সদায় কথায় কথায় ।
শুনিবে বল কে , তব আপন কে
পর দাস দশায় বধির সবে ।
উলটে পৃথিবী , পরগা পরশে
সুখ শান্তি লভে তব কায় রসে ।
আজি যে টুকু মান লভে কুকুরে
ঘটে সে টুকু না তব বাসী নরে ।
করি যেমন কাটিছে , রাত্রি দিবা
জীবনে মরণে বল ভেদ কিবা ।
মন চায় কষায় , কৌপীন পরি
তব দুঃখ গেয়ে সব দেশে ঘুরি ।

ডঃ সীমা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন " গোবিন্দ চন্দ্র রায় প্রাণ স্পর্শী সংগীত রচনা করেই সাহিত্য সংসারে অমরত্ব লাভ করেছেন ।" ' বাঙালীর গান ' গ্রন্থের সঙ্কলক দুর্গাদাস লাহিড়ী মন্তব্য করেছেন " গোবিন্দ চন্দ্রের সংগীতে পাষাণও বিদীর্ন হয় । " ৬৪

যোগেন্দ্র চন্দ্র বসুর (১৮৫৪ - ১৯০৫) কয়েকটি গান এতে সঙ্কলিত হয়েছে । যোগেন্দ্র চন্দ্র বসুর এই দুটি গান ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির

কমিশনারদের পদত্যাগ উপলক্ষে লেখা এবং ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ২২শে চৈত্র ' বঙ্গবাসী ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । " ৬০

(১)

আয় রে আয় লাট মহালাট আয় ।
আত্ম শাসন সংকীর্তনে নাচবি যদি আয় ॥
ওরে মার খেয়েছি , না হয় আরো খাবো আয় ।
ও ভাই , সেরেছে কলসীর কানা
তা বলে কি প্রেম দিব না -- আয় ,
আয় রে আয় লাট মহালাট আয় ॥

(২)

দিয়েছ যে কান মলা ঘুচলো মোর দেহের মলা ,
জুড়ালো অন্তরের জ্বালা
মধুমাখা করস্পর্শ তোমার হে ।
বা কান পাছে দুঃখ করে ,
মলে দাও সেটি খুব জোরে
আত্ম শাসন ধ্বজা উড়ুক অম্বরে ,
গুন গেয়ে তোর মধুর স্বরে
ঘরে গিয়ে খাই ক্ষীর খাবার হে ।

স্বদেশী সংগীত

কবিতাবলীর সংকলন । সম্পাদনা করেন নরেন্দ্র শীল । ইনি হিন্দু মেলার সমকালীন

লেখক ছিলেন । প্রকাশিত হয় ১৯০৭ সালে ।

কবি অশ্বিনী কুমার দত্তের গানেও সমৃদ্ধ । অশ্বিনী কুমার দত্ত বাংলার জাগরণী গানে ' শক্তিতন্ত্র ' ও ' স্বদেশমন্ত্র ' কে মিলিয়ে দিয়েছেন । অশ্বিনী কুমার দত্ত গাইছেন ---

শ্মশান তো ভালবাসিস মা গো
তবে কেন ছেড়ে গেলি
এত বড় বিকট শ্মশান এ জগতে কোথা পেলি
দেখ সে হেথা কি হয়েছে
ত্রিশ কোটি শব পড়ে আছে
কত ভূত বেতাল নাচে, বগেঁভগেঁ করে কেলি ।
ভূত পিশাচ, তাল, বেতাল
নাচে আর বাজায় গাল,
সবেঁ খায় ফেরু পাল এটা ধরি ওটা ফেলি ।
আয় না হেথা নাচবি শ্যামা
শব হয়ে শিব পা ছুয়ে মা
জগত জুড়ে বাজবে দামা
দেখবে জগত নয়ন মেলি ॥

প্রমথ নাথ রায়চৌধুরীও দেশজননীকে শ্যামা মায়ের সাথে তুলনা একটি আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ---

তুই মা মোদের জগতের আলো
সুখে দুখে হাসি মুখে
আঁধারে দীপ তুমিই জ্বালো,

'মা' বলে মা ডাকলে তোরে
সারাটি প্রাণ ওঠে ভরে।
বেসেছি মা তোরেই ভালো,
তোরেই যেন বাসি ভালো,
পরের পোষাক খুলে ফেলে
ফিরলাম ঘরে ঘরের ছেলে,
আঁখির নীরে মোদের শিরে
আশীষ ধারা আজি ঢালো ॥

একজন অজ্ঞাত গীতিকারের রচনাতেও মাতৃভক্তির একই রূপ প্রকাশ পেয়েছে —

আপন মায়েরে চিনেছি এবার,
লভেছি বিরাম স্থান জুড়াবার
'মা' বলে ডাকিতে হৃদয়ের দ্বার
চকিতে গিয়াছে খুলিয়া,
দূরে গেছে ভয় ভাবনা দীনতা
ঘুচে গেছে লাজ দারুণ হীনতা
প্রাণের আবেগে দেহের ক্ষীনতা
গিয়াছি সকলে ভুলিয়া।

স্বদেশী যুগে মাতৃ সাধনার সাথে দেশ সাধনারও ভাবনা যুক্ত হয়ে উঠে। শাক্ত পদাবলীকারদের শ্যামা মা ও দেশজননীর সাধকদের ভারত মা একাত্মভূতা হয়ে যায়। শশি ভূষণ দাশগুপ্ত বলছেন "বাংলা দেশ মাতৃ পূজার দেশ, দেশকে এখানে প্রথম হইতেই চৈতন্যময়ী প্রেমময়ী দেবী বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

পৌরাণিক মাতৃপূজা এবং নব দীক্ষায় লব্ধ দেশমাতৃকার পূজা এখানে মিলিয়া মিশিয়া একেবারে এক হইয়া গিয়াছে । ..... সমগ্র জাতীয় মানসের মধ্যেই , সহস্র সহস্র বর্ষের ঐতিহ্য সূত্রে এই 'দেশমাতা'র পরিকল্পনা একটি সহজাত বিশ্বাস রূপে আমাদের কাছে ধরা দিয়াছিল ।" ৬৬

জাতীয় উচ্ছ্বাস

সংগীত ও কবিতার এই সংকলনের সম্পাদনা করেছেন জলধর সেন । সংকলনটি প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালে । কালিচরণ চট্টোপাধ্যায় , রাজকৃষ্ণ রায় , জগদীশ্বর সেন , কালি প্রসন্ন কাব্য বিশারদ প্রমুখ কবিদের কবিতা ও সংগীত এই সংকলনে আছে । জলধর সেন 'হিতবাদী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন । সংকলক নিজেই দেশের উত্থানের জন্য লেখনী ধারণ করেছেন —

গভীর রজনী ডুবেছে ধরণী জাগরে জাগরে সাধের লেখনী
প্রাণ প্রিয় ভাই ভারত সন্তান জাগরে সকলে শোন কবিগান ।
ভারতের গতি ভারত নিয়তি ভেবে আজ কেন উথলিল প্রাণ
কার কথা ভাবি কোন দিক দেখি , সব অন্ধকার যে দিক নিরখি ।
কোটি কোটি লোক অজ্ঞান আঁধারে , চিরমগ্ন যেন আছে কারাগারে
দারিদ্র ভাবনা অসহ্য যাতনা শোণিত শুষিছে তাদের সংসারে ।

কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের একটি গান —

ভারত উদ্ধার বল , হবে হে কেমনে
ধর্ম্মবল মহাবল লভ প্রতি জনে ।

বচনে বল কোথায় , জেগেছে মানব চয়
জীবন উৎসর্গ বিনা , বাঁচে না জাতি জীবন
জেনেছ যাহা উচিৎ , কিম্বা যাহা অনুচিৎ
কার্য্যে কর পরিণত , দৃঢ়তা দেখাও জীবনে
সত্যেতে নির্ভর যার , ঈশ্বর সহায় তার
জাতীয় গৌরব চাহ , গঠন কর জীবনে ॥

গীতিকার রাজকৃষ্ণ রায়ের কবিতায় ভারতের প্রাচীন গৌরবময় অতীতের পাশে বর্তমান দুরবস্থা চিত্রিত হয়েছে —

কোথা সে অযোধ্যাপুর , মথুরা এখন
কোথা সে কুরুক্ষেত্র সমর প্রাঙ্গন ?
কোথা সে বীরত্ব লীলা , কোথা সে অসির খেলা ,
কোথা সেই হুহুঙ্কার হৃদয় কম্পন ।
বীর মাতা হয়ে তুমি , হইলে অবীর ভূমি ,
ভারত রে , ভাগ্যে তোর বিধি বিড়ম্বন ।

এই বেদনার কথা জগদীশ্বর সেনের কবিতাতেও প্রকাশিত হয়েছে —

যদি গাবে গাও বঙ্গে দুখের কাহিনী
মিলিয়া সহস্র স্বরে মাতাও মেদিনী ।
কামিনী কোমল গানে , মোজ না যুবকগণে
রসাতলে যেও নাকো মদিরা সেবনে ,
উদ্বোধিয়া সাধুভাবে , জাগাও নিদ্রিত জীবে ,
পুলকে বঙ্গের অঙ্গে নাচাও ধমনী ।

কালী প্রসন্নের একটি গানে দেশ জননীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য স্বরূপ সুন্দর ভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে —

সেই তো রয়েছ মা তুমি
ফলে ফুলে সুশোভিত শ্যামা জন্মভূমি ।
শিরোপরি গিরিবর
সেই শুভ্র কলেবর
পদতলে সেই সিন্ধু আছে অনুগামী ।
তেমনি বিহঙ্গ কুল
কলরবে সমাকুল
তেমনি শুনিতে পাই মধুপ ঝঙ্কার ।
সেই তো সকলি আছে
তবে মা সবার কাছে
তোমার সন্তান কেন অধোপথ গামী ।

হুঙ্কার

স্বদেশী সংগীতের এই সংকলন গ্রন্থনা করেছিলেন হীরালাল সেনগুপ্ত । হীরালাল নিজে বিপ্লবী ছিলেন । তাঁর এই সংকলন প্রকাশিত হয় ১৯০৮ সালে বাংলায় ১৩১৫ তে । তিনি 'হুঙ্কার' সংকলনটি রবীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করেছিলেন । বইটি নিষিদ্ধ হয়ে যায় ১৯১১ সালে । বইটির কপি পাওয়া দু:সাধ্য ব্যাপার , তবে এই বই নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে সাক্ষী দেওয়ার জন্য খুলনা কোর্টে যেতে হয় । শিশির কর এই প্রসঙ্গে বলেছেন , " এই ঝঞ্ঝাটের পরেও রবীন্দ্রনাথ ওই লেখককে (হীরালাল সেন)

শান্তি নিকেতনে শিক্ষকতার কাজ দেন । কিন্তু তাতে পুলিশের উৎপাত এমন বেড়ে যায় যে রেহাই পাবার জন্য কবি পরে হীরালাল বাবুকে তাঁর জমিদারী দেখাশুনার কাজ দেন । " ৬৭

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায় বলেছেন , " বিদ্যালয়ের পক্ষে দুর্দিন যাচ্ছে , সরকার থেকে গোপন ইস্তাহার প্রকাশিত হয়েছে যে , শান্তি নিকেতন বিদ্যালয় গর্বমেন্ট কর্মচারির ছেলেদের শিক্ষার উপযোগী স্থান নয় । বহু অভিভাবক গর্বনমেন্টের এই গোপন অন্তর টিপুনিতে ভীত হয়ে ছেলেদের সরিয়ে নিয়ে গেছেন । হীরালাল সেন নামে খুলনা সেনহাটি জাতীয় বিদ্যালয়ের এক জেল খাটা শিক্ষককে কয়েক বছরের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন বলে পুলিশের ঘোর আপত্তি । তাঁকে বিদায় করে দেবার জন্য কবির উপর অনেকবার চাপ এসেছিল , তিনি কর্ণপাত করেননি । এবার বুঝলেন , স্কুল রাখতে হীরালালকে বিদায় করতেই হবে । কবি তাঁকে বিদায় করলেন বটে , কিন্তু পথে বসালেন না , তাঁকে নিজের জমিদারীতে কাজ দিলেন । " ৬৮

জাতীয় সংগীত

সঙ্কলন কর্তা ছিলেন উপেন্দ্র নাথ দাস । কলকাতা এ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত । প্রকাশ কাল ১৯০৮   ।

' বন্দেমাতরম ' ধ্বনি বা সংগীতের উপর ইংরেজদের রোষ দৃষ্টি বর্ষিত হলেও স্বদেশীপ্রাণ যুবকদের কন্ঠ হতে সেই সংগীত বিচ্ছিন্ন হয়নি । কার্লাইল সার্কুলার প্রবর্তিত হলে ছাত্ররাও এ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি গঠন করে । সেই এ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির প্রকাশিত একটি গান —

' জাগ ভারতবাসী গাও বন্দেমাতরম্ ,
আজ কোটী কণ্ঠে কোটী স্বরে
উঠুক বেজে বন্দেমাতরম্ ,
(বন্দে মাতরম বলরে , কোটী কণ্ঠে)
গেলে জননীর কোল হতে হায়রে কি বিহ্বল ,
মাকে দেখরে চেয়ে বুকখানি আজ অশ্রুনীরে প্লাবিতম্ ,
কোটী কোটী থাকতে ছেলে — দেখরে চেয়ে
এস এস সবে ভাই , সে কাল নিশি আর যে নাই ,
এই জীবনটা তোর ঘুমিয়ে কেটে
ঘুমাবার সাধ তবু এখন ।
অচেতন হয়েরে ভাই — এ জীবনটা ওরে
দেখ সোনার বাংলার কি করিয়াছে হায়
কোথা বিদেশ হতে বণিক এসে
হরে নিল সকল ধন
(দলে বলে ছলে যে বিদেশ হতে)
বুকে সাহসেরি ডোর — তাই বাঁধ করে জোর ,
প্রাণ থাকতে দেহে মায়ের ছেলে সইবে
কি আর নির্যাতন
(কোটী কোটী থাকতে ছেলে) ।

আরেকটি উদ্দীপনাময় গান যা এ্যান্টি পার্টিশান প্রসেসন পার্টির সদস্যরা গাইতেন তাতেও 'বন্দেমাতরম ' এর ভাবনা দীপ্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেছে —

কানে কানে প্রাণে প্রাণে
মায়ের নাম আজ কে শোনালে

সঞ্জীবনী মন্ত্রবলে আট কোটী
প্রাণকে মাতালে
বন্দেমাতরম্ মাতরম উঠেছে ধ্বনি কি মধু
মরতের জয়ধ্বনি স্বর্গের আসন কাঁপাইল ,
শক্তি মেলে মায়ের নামে ।
পাষাণ গলে মায়ের গানে ।
ভক্তি রসলীলা এসে নবীন বেশে দেখা দিল ।
মরা প্রাণে ধরে আগুন , প্রাণ পেয়ে প্রাণ জ্বলছে দিগুণ
যা ভাবি নাই যা শুনি নাই
সে আগুন আজ কে জ্বালাইল ।

স্বদেশী যুগের লোকগীতি

লোক সাহিত্য যে কোন জাতির দর্পন । এই দর্পনেই প্রতিবিম্বিত হয় সেই জাতির হৃদয়ের গভীরতম পরিচয় । বাংলার লোক সাহিত্য একান্ত ভাবেই বাংলার নিস্ব সম্পদ । বাঙালীর আশা আকাংখা , ধরন ধারণা , কাব্য - কল্পনা , জীবনের সুখ - দুঃখের গঙ্গা যমুনার ধারা হয়ে এই লোক সাহিত্যে মিশে আছে । এই লোক সাহিত্য শাখার স্বর্ণ ফসল লোকগীতি । এই গীতির সুরের মূর্চ্ছনায় সে গান গেয়েছে , দুঃখ প্রকাশ করেছে , তার জীবন আবেগে নৃত্য করেছে । বাংলা এই লোকগীতি প্রাচীন বাংলার পথ প্রবাহে পরিক্রমা করে বিংশ শতাব্দীর তীরে এসেও তার মাহাত্ম্য হারায় নি । তাই লর্ড কার্জনের বঙ্গচ্ছেদে দেশ যখন উত্তাল লোক গীতির সাধকেরা এই রাজনৈতিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গান বেঁধেছেন , লোক সংস্কৃতির আসরে এই লোক গীতিকে পরিবেশন করে জাতীয়তাবোধ ও স্বাদেশিকতার পরিচয় দিয়েছেন ।

' গম্ভীরা গান ' লোক সংস্কৃতির এই রূপ প্রাণবন্ত সম্পদ । ' গম্ভীর ' শব্দের অর্থ দেবার্চন । এই দেবার্চনে পূজিত হয় শিব । শিবের সম্মুখে মানুষ জানায় তাদের দুঃখ বেদনার কথা । গম্ভীরা গানের প্রচলন অত্যন্ত প্রাচীন । ধর্মীয় ও ব্যক্তিগত জীবনের পালার ক্ষেত্র ছেড়ে গম্ভীরা যখন রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করল তখন তার পরিধি ও আকর্ষন ত্বত বেড়ে গেল । ডঃ প্রদ্যোৎ ঘোষ এর মতে " রাজনীতির বিষয় বস্তুতে প্রবেশ করায় তার সার্বজনীনতা ও আবেদন হল ব্যাপক । কারণ ধর্মীয় আবেদন বেশী দূর এগোতে পারে না । জাতি ধর্মের চৌহদ্দীতে তা আটকে পড়ে যায় । " ৬৯

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য গম্ভীরা প্রসঙ্গে বলেছেন " এই গানের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে প্রত্যেকটি গানই শিব ঠাকুরকে উদ্দেশ্য করিয়া রচিত হইয়া থাকে । সংসারের সকল সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগের কারণই শিব , তাহার নিকট এই সকল বিষয় অভিযোগ জানাইয়া প্রতিকারের প্রার্থনা করাই গম্ভীরা গানের মূল উদ্দেশ্য । শিব ঘটে অধিষ্ঠান করিয়া নির্বিকার ভাবে এই সকল অভিযোগ , এমন কি অনেক সময় তিরস্কারও শুনিয়া যায় । ইহাদের মধ্য দিয়া ভক্তের সঙ্গে ভগবানের কোন সুদূর পার্থক্য রচিত হয় না । " ৭০

স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলার সংস্কৃতির রূপকে উজ্জ্বল করার প্রচেষ্টা শুরু হয় । ডন সোসাইটি ছিল এই সব সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রগুলির উন্নতির প্রধান হোতা । বিনয় সরকার ছিলেন গম্ভীরার পৃষ্ঠপোষক । " ডন সোসাইটিতে সেকালে আলোচিত হত দেশের লোক সংস্কৃতি , লোক সাহিত্য , লোক সংগীত , লোক শিল্প নিয়ে । কেবল মাত্র দেশের বড় ঘরের বড় সমাজের ব্যক্তিদের নিয়ে দেশ নয় , দেশটা জনগণকে নিয়ে । জনগণকে জাগাতে হলে তাদের সংস্কৃতি , তাদের ভাষা জানতে হবে । তাদের ভাষায় দেশের অবস্থা বলতে হবে । লোক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিনয় সরকারের হাতে খড়ি হয় ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে । " ৭১

স্বদেশী যুগে বিনয় সরকার গম্ভীরা গানের ব্যাপক সংস্কার ও প্রসার চেয়েছিলেন । "১৯০৭ সালের জুন মাসে মালদহে জাতীয় শিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হল । তার সঙ্গে সঙ্গেই জেলার ভিতরে ঐতিহাসিক গবেষণার ব্যবস্থা করি । স্বদেশী যুগে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান শব্দটির ইজ্জৎ ছিল খুব বেশী । মালদহের সদরে ও পল্লীতে বৈশাখ মাসে শিব পূজার ধূম পড়ে । সেই উপলক্ষে তিনি দিন চলে নাচ গান বাজনা । একদিন রাস্তায় রাস্তায় সঙের মিছিল । সেই মিছিলটা নাচ গান বাজনার হৈ হৈ আর আফালাফি ছাড়া আর কিছু নয় । পূজাই বল উৎসবই বল , নাচানাচিই বল , লাফালাফিই বল — এসবের সার্বজনিক নাম গম্ভীরা ।

জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনকে আমি জন সাধারণের আন্দোলন মনে করতাম । স্বদেশী স্বরাজ ইত্যাদি বঙ্গ বিপ্লবের আন্দোলন আমার চিন্তায় ছিল 'গণ' শক্তির অভিব্যক্তি । এর ফলে নিরক্ষর ও গরীবের উন্নতি আশা করতাম । ছেলে বেলা থেকেই দেখতাম গম্ভীরা বারোয়ারী জিনিষ । কাজেই এই সার্বজনিক গম্ভীরার ইতিহাস লেখাবার জন্য বাতিক লেগে গেল । " ৭২

গম্ভীরা গানের অঙ্গ প্রশস্ত হলো । স্বদেশী যুগের এক বিশিষ্ট গম্ভীরা শিল্পী ছিলেন মোহাম্মদ সুফীর । তাঁর গানে সেদিনের চিত্র —

> তুমি ঘুসির (ঘুঁটে) আগুন , তুষের ধোয়া লাগিয়ে দিলে বঙ্গে ।
> আজ হাবু ডুবু খায় ভারতবাসী , স্বরাজ তরঙ্গে
> হালচাল করে বঙ্গের মাটি
> বুঁদলা (রোপন করলে) গোপাল ভোগের (এক ধরণের আম) আঁটি
> তাতে হল ফজলি তরমুজ ফুটি
> আলু পটল ঝিঙে ।

বঙ্গ মাতার সুত - সুতা   দেশের মাঝে সাজলো নেতা
আজ পিঠে তাদের রুলের গুঁতা দিতেছে শ্বেতাঙ্গে ।

স্বদেশী আন্দোলনে বিনা দোষে কারাগারে আবদ্ধ করা হতো দেশ ভক্তদের । সেখানে চলতো অকথ্য অত্যাচার । মরমী শিল্পী সে যুগের চিত্রকে অমর করেছে গম্ভীরা গীতে —

বিনা কারণে ধরে এনে এখানে কষ্ট দিচ্ছ কেন প্রাণে প্রাণে
কি অপরাধে রেখেছো বাঁধা কোন দোষের দোষী মোরা দুই জনে ?
. . . .
রোজ বিহানে (বৈকাল বেলা) তাল দাও দলনে
কোন প্রাণে জুড়ো তেলের ঘানিতে (ঘানি)
পশুর কাজ করাও মানব গণে
সাহেব এই প্রথা আছে কি তোমার লণ্ডনে ?

বঙ্গভঙ্গের যুগে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নিত হলে মুসলিম গম্ভীরা কবিশফীর খলিফা হিন্দু মুসলিম ঐক্যের সঙ্গীত তুলে ধরলেন ।

এ যে হিন্দু মুসলমান   ছিল এক আসনে খান
গলাগলি পিরীত করতো , গাইতো গম্ভীরা গান ।
(এখন) দেখছি ঢাক ভাঙ্গা   আর তাজিয়া টানা ।
ভাঙ্গাতে ডিঙা ডুবায় ।

আবার এক আসরে কবি গাইছেন —

কুন্ঠে আল্লা ভগবান কুন্ঠে আছে আদের থান

মন্দির কি মসজিদেতে পূজা সিন্নি খান

তোমার নূরে কি টিকিতে বোসয়া তসবীর কি মালা ঘুরায় ?

কবি বলছেন —

শিব মিটাও গন্ডগোল লাগাও আজান ঢাক আর ঢোল

আল্লা আল্লা হরি হর ধর সবাই বোল ।

একলা থলিয়া শরীরকে হাজির রাখো তোমার গম্ভীরায় । ৭৩

স্বদেশী আন্দোলনে এই লোক সঙ্গীত গম্ভীরার অবদান সম্পর্কে বিনয় সরকার মন্তব্য করেছেন " .... ১৯০৭ সনে যে ধরণের অনুসন্ধান গবেষণার সূত্রপাত করেছি সেই ধরণের কাজের জন্মদাতা জার্মান বাচ্চা হার্ডার । আর হার্ডারের পথে চলে দুনিয়ার বহু সংখ্যক জাত স্বদেশী স্বরাজ - স্বাধীনতার কেল্লা দখল করতে পেরেছি ।" ৭৪

স্বদেশী যুগে মৈমনসিংহের কথ্য ভাষায় লোক সংগীত রচিত হয়েছিল । মুসলমান কবির দল এই গানগুলো গাইতেন । এই সংগীত গ্রামের মানুষকে রাজনীতির ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে একদিকে যেমন সচেতন করে তুলত অন্যদিকে ঠিক সেই রূপভাবে তাদের অনুপ্রেরণাও দিত ।

" লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গ বিভাগ এবং তৎকালীন বিদেশী বর্জন প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত গানটি রচিত হয় —

হুন ছিলিম চাচা , আইজ এ্যাক দুক্ষুর হইয়া কৈবার চাই আই আই ।

দয়াশে এ্যাক বাও যে আইছে ,

যিবা চন্কা হিবা বইছে
বিলাইতি আর বোলে কিনন নাখি নাই - আঁই - আঁহা - আই ॥

কৎ-জুনা নাট বাহাদুর দিছে পরানা
বেবাক পরজা মুনীর কৈল তালকানা
এহেন কুম্পুনীর মুলুক গয়াল কুঠ ঠাইকার কুন আসামানিয়া
করবো খাজানা আয় আদা - আ ॥
বাংলা মুলুক ঘোর জবর,
এহানো বাপ দাদার হইছে কবর,
খবরা খবর কত বাতেশা করছে আজিত্তি ই - ই -
এহেন কুম্পুনী যাব কাবু অইয়া
খাজনা করবো ছত্রান অইয়া
মোহারাণীর আজিত্তে বাই ইকি বিকিতি ইয় - ইহী - ই ॥
যাত মুন্সী মৌলায় করছে কুমুটি
হুনা হুন হুন লাইম এঠাইতি
আরাম যাত নিমক চিনি কাপইর বিলাইতি ইহী ঈ।
ধুয়া : তোবা তোবা ইকি করছি,
না জাইনা কি জকমারি এহ্যান কওছেন কি করি - ই - ই।
কিরিস্তানে জাইত মাইরা ন্যায়, মরণ নাই, কইলজা হয় বারি
ইয়া - ইহী - ঈ ॥

(দুষ্কুর - দুঃসাধ্য বা দুঃসাহসী । কৈবার - বলতে । বাও - বাতাস এখানে স্বদেশী আন্দোলন । কৎজনা - কর্জন । পরানা - ঘোষণা । আজিত্তি - রাজত্ব । ছত্রান অইয়া - বিচ্ছিন্ন ভাবে । বিকিতি - বিকৃতি । কিরিস্তানে - খ্রিষ্টানে । জাইত মাইরা - জাতি ভ্রষ্ট করে । কইলজা - কলিজা

বা হৃদয় । গানটি ১৩১৩ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় মুদ্রিত হয়, পৃষ্ঠা ১৪৩ - ১৪৪ ।)

সারিগানও বাংলার লোক গীতের একটি ধারা । শশিকান্ত নামে এক কবি স্বদেশী যুগে তিনি গেয়েছেন ---

জাগ ভারতবাসী রে, কত ঘুমে রবে রে ।
বল সবে হঁয়ে এক মন 'বন্দেমাতরম' ।
ভাই রে ভাই, জননী আর জন্মভূমি স্বর্গ হতে শ্রেষ্ঠ মানি রে ।
এ দুয়ে ভক্তি নাই যার, নরকে নিবাস তার,
পুরাণে লিখেছেন মুনিগণ ।
ভাই রে ভাই, ভারতের ভাগ্য দোষে ফিরিঙ্গি আইল দেশে রে,
অসার খোসা ভুবি দিয়ে দেশের ধন নিল লুটিয়ে,
অন্নাভাবে মরে প্রজাগণ ।
ভাই রে ভাই হিন্দু আর মুসলমান, এক মায়ের দুইটি সন্তান রে ।
একত্র হয়ে সবে, মাতৃ পূজা কর ভবে, ধন্য হবে মানব জীবন ।
ভাই রে ভাই ভারতের সুসন্তান, কর সবে অবধান রে,
বিলাতী লবণ, বিলাতী চিনি, অপবিত্র শাস্ত্রে শুনি,
ছুঁইও না ভাই, চিনি আর লবণ । (বন্দেমাতরম)

. . . .

ভাই রে ভাই, দ্বিজ শশিকান্তে কয়, জাগ সবে এ সময় রে,
পূজিতে মায়ের চরণ, না করিলে প্রাণপণ
কাজ কি রেখে এ ছার জীবন ? (বন্দেমাতরম)

জার্মান পণ্ডিত হার্ডার গণ দর্শনের ঋষি ছিলেন । তিনি অনুভব করতেন একটি জাতির চিত্ত লোক সাহিত্যের সাথে অঙ্গীভূত । তিনি জনসাধারণের আত্মা , জাতিগত চেতনা , জাতীয় চিত্ত ইত্যাদি দেখতে পেতেন লোক সাহিত্যে , লোক শিল্পে , লোকাচারে ও লোক সঙ্গীতে । আমাদের দেশের স্বদেশী যুগের লোক সঙ্গীতের কবিরা এরই মধ্যে দিয়ে জাতি কে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন ।

* * * * * *

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বদেশী আন্দোলনের উন্মেষ । জাতীয় জীবন ও সাহিত্যে । ক্ষেত্র সঙ্গীত ও কাব্য

১ । ইতিহাস ও সাহিত্য - অশীন দাশগুপ্ত পৃ : ১২

২ । মিশেল ক্যারিয়ের - বিপ্লবের সাহিত্য , ফরাসী বিপ্লব দ্বিশতবার্ষিকী 'দেশ' সংখ্যা ১০ই জুলাই , ১৯৮৯ , পৃ : ১১০

৩ । বাংলা ভাষা পরিচয় , পৃ : ৩৬

৪ । উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য - অরুণ মুখোপাধ্যায় - পৃ : ১৬৫

৫ । স্বদেশ ও সমাজ

৬ । জীবন স্মৃতি পৃ : ৭৮

৭ । Tagore as a political thinker. The Golden Book of Tagore P. 270-71

৮ । কারাগারে কণ্ঠরোধ রবীন্দ্র নাথ পৃ :

৯ । সমকালের বাংলা গান ও রবীন্দ্র সঙ্গীত , পৃ : ৩২ - ৩৩

১০ । রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ চিন্তা - শ্রীমন্ত জানা , পৃ : ৩৫৫

১১ । রবীন্দ্র রচনার দর্শন ভূমি , পৃ : ৩৬৮ - ৯

১২ । সমকালের গান , পৃ : ৩৪

১৩ । ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব , পৃ : ১০৭ - ১০৮

১৪ । দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী , প্রথম খন্ড , ভূমিকা , পৃ : ৮

১৫ । সমকালের বাংলা গান , পৃ : ৫৯

১৬ । দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী (হরফ) ১ম খন্ড ভূমিকা , পৃ : ১২

১৭ । দ্বিজেন্দ্রলাল , পৃ : ৩৯৯

১৮ । জাতীয়তার মন্ত্রগুরু যাঁরা , পৃ : ১৭৭

১৯ । পূর্বোক্ত , পৃ : ১৭৭

২০ । সমকালের বাংলা গান , পৃ : ৬২

২১ । 'ভারতী' অগ্রহায়ন , ১৩০৫

২২ । জাতীয়তার মন্ত্র গুরু যাঁরা , পৃ : ১৭৬

২৩ । পূর্বোক্ত , পৃ : ২০২ - ২০৩

২৪ । নলিনী রঞ্জন পন্ডিত — কান্ত কবি রজনী কান্ত , পৃ : ৩৯

২৫ । A Nation in Making P. 202-3

২৬ । সমকালের বাংলা গান , পৃ : ১১২

২৭ । কবি রজনী কান্ত সেন

২৮ । সমকালের বাংলা গান , পৃ : ১১৪

২৯ । সমকালের বাংলা গান , পৃ : ১৪৪

৩০ । অরুণ কুমার বসু — অতুল প্রসাদের গান

৩১ । Prithwis Chandra Roy, Life & times of C.R. Das - The Story of Bengal Self Expression P 41-42

৩২ । সমকালের বাংলা গান , পৃ : ১৪৫

৩৩ । বঙ্গ কবিতা ও গানে স্বাদেশিকতা — সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় , পৃ : ১৫২

৩৪ । বঙ্গভঙ্গ , পৃ : ১৫২

৩৫ । বঙ্গ কবিতা ও গানে স্বাদেশিকতা — পৃ : ১৫৮

৩৬ । বঙ্গবানী ও তার সম্পাদক — বন্দিরাম চক্রবর্তী , 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা , ১৩৯৭ , পৃ : ৯২

৩৭ । জাতীয়তার মন্ত্র গুরু যাঁরা , পৃ : ২৩৯

৩৮ । অমৃত লাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য : ডঃ অরুণ কুমার মিত্র , পৃ : ১২০

৩৯ । পূর্বোক্ত , পৃ : ১৪১ - ৪২

৪০ । ১৩৩৩ সালে মজফরপুরে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে অমৃত লাল বসুর ভাষণ

৪১ । অমৃত লাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য , পৃ : ৪৮৯

৪২ । সাহিত্য সাধক চরিত মালা , চতুর্থ খন্ড , পৃ : ৮

৪৩ । Speeches Surendra Nath Banerjee (1908) Vol VI P 397-98

৪৪ । The Case for India P - 123

৪৫ । চারণ কবি মুকুন্দ দাস — সুবোধ চক্রবর্তী , পৃ : ৮

৪৬ । সঙ্গীত চয়ন - পৃ চ (জীবনী অংশ) বসুমতী

৪৭ । The Swadeshi Movement in Bengal P - 302-3

৪৮ । History of Freedom Movement Vol II P. 130

৪৯ । বঙ্গ কবিতা ও গানে স্বাদেশিকতা , পৃ : ৯

৫০ । বঙ্গ কবিতা ও গানে স্বাদেশিকতা , পৃ : ১৯৯

৫১ । বাংলায় বিপ্লববাদ , পৃ : ১৮

৫২। পূর্বোক্ত, পৃ: ১৯

৫৩। বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা, পৃ: ১২

৫৪। Story of a Song P. 45

৫৫। A Nation in Making P. 206

৫৬। Story of a Song P 1-2

৫৭। How India Wrought Her Freedom - Annie Besant

৫৮। স্বদেশ আমার, শান্তি সিংহ, ভূমিকা

৫৯। Selections from the Mussalmans 1906-1908 P. 12-13

৫৯ (ক)। বন্দেমাতরম, জগদীশ ভট্টাচার্য, পৃ: ৪৮

৫৯ (খ)। স্বদেশ আমার, শান্তি সিংহ, ভূমিকা পৃ: ২৪ - ২৫

৬০। নির্বাসিত সাহিত্য, হিরন্ময় ভট্টাচার্য (সং) পৃ: ১১০

৬১। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা, পৃ: ২৬৩ - ২৬৪

৬২। বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃত অধ্যায়, পৃ: ৭০

৬৩। পূর্বোক্ত, পৃ: ৭২

৬৪। রবীন্দ্র সংগীতে স্বদেশ চেতনা, পৃ: ১১০

৬৫। বাংলা কবিতা ও গানে স্বাদেশিকতা, পৃ: ১১৬

৬৬। ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, পৃ: ৩১০

৬৭। ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই, পৃ: ১০২

৬৮। রবীন্দ্র জীবন কথা, আনন্দ সংস্করণ, পৃ: ৮২

৬৯ । লোক সংস্কৃতি : গম্ভীরা , প্রদ্যোৎ ঘোষ , পৃ : ৮৬

৭০ । বাংলার লোক সাহিত্য , তৃতীয় খন্ড , পৃ : ২৪৪

৭১ । লোক সংস্কৃতি প্রসঙ্গে বিনয় সরকার — দিলীপ মালাকার , পৃ : ৪৬

৭২ । বিনয় সরকারের বৈঠকে , প্রথম ভাগ , পৃ : ৩৬৭

৭৩ । সূত্রলোক সংস্কৃতি : গম্ভীরা , পৃ : ৭৮ - ৮১

৭৪ । বিনয় সরকারের বৈঠকে , প্রথমভাগ , পৃ : ৩৬৮

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

॥ নাট্য রচনা । স্বদেশী যুগ ॥

।। বাংলা নাটকে আদর্শবোধ ও স্বাদেশিকতা ।।

বাংলা নাটক শুভ সূচনার মধ্য দিয়ে রচনা করেছিল জীবনের প্রতিরূপ । নাটকের সর্বাঙ্গে প্রকাশ পেয়েছিল সমাজ মানসের প্রতিফলন । বাংলা নাটকে প্রথম যুগ হতেই দেশ প্রেমের প্রকাশ নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছিল । ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এল বাংলার সাংস্কৃতির জগতে বিশাল পরিবর্তন । বাংলার মানুষ এই নব চেতনায় সব কিছুকে নতুন করে ভাবতে শুরু করল । বাংলার চিত্ত ও মানসলোক আত্ম প্রকাশের তাগিদ অনুভব করল । এই আত্ম প্রকাশের অভিব্যক্তির মধ্যে ছিল জাতীয়তাবোধ । জীবনের সকল ক্ষেত্রে যখন নব চেতনা বা জাগরণের উন্মেষ ঘটল তার মধ্য হতে সাহিত্যে সেই নব জাগরণের দোলা লাগল সব চাইতে বেশী । সাহিত্যের অঙ্গরূপে নাটকেও এসে লাগল সেই জাগরণ ও চেতনার ধারা ।

উনিশ শতকের প্রথম হতেই বাঙালীর জীবন চেতনাতে এক পরিবর্তনের পালা শুরু হয়েছিল । সুদীর্ঘ কালের ইংরাজের অপশাসনে একদিকে যেমন সৃষ্টি হয়েছিল এক নৈরাশ্য জনিত শূন্যতাবোধ , আর এই পথেই দ্রুত গতিতে এগিয়ে ছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যের বিজয় রথ । এই বিজয় রথের পথ দিয়ে পরোক্ষ ভাবে প্রবেশ করেছিল পশ্চিমী যুক্তিবাদী জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলো । প্রযুক্তির বিদ্যার প্রসার ও ইতিহাস নির্ভর মানব হিতবাদী বিভিন্ন কর্মের ধারা বাঙালীর চিত্তলোকে নিয়ে এল এক বিমিশ্র ফল । বাঙালী চিন্তা করতে শুরু করল স্বদেশ কথা ।

বাংলার এই ভাবনার বাহক ছিলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় । এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দ্বৈত কর্ম প্রনালী ছিল । একদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সেবা করা বা কর্মচারী রূপে চাকুরী করা অন্যদিকে শিক্ষামূলক তথা সমাজ মূলক সংস্কারে এঁরা

ছিলেন অগ্রণী ভূমিকার উদ্দীপ্ত প্রাণ পুরুষরূপে আলোক বর্তিকা বাহকের দল। তাই একদিকে এঁরা যেমন শিক্ষা সংস্কারের, রাষ্ট্রীয় বিষয়ের উপরে আলোকপাত, সংবাদ পত্র পরিচালনা, সমাজ ধর্ম নিয়ে আলোচনা করলেন তেমনি অন্যদিকে জাতির মুক্তি নির্দেশিকার পথ হিসেবে দেশের সামনে তুলেধরলেন সাহিত্যের সম্ভার। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে জাতির মধ্যে এক চিরঞ্জীবি শক্তির অভ্যুদয় ঘটাতে চাইলেন।

পাশ্চাত্য জ্ঞান ও জীবন ভাবাপন্ন চিন্তা ধারার প্রভাবে বাঙালীর মনেও জেগে উঠেছিল অতীতের ইতিহাস চিন্তা, যার মধ্যে তাঁরা খুঁজে পেলেন স্বদেশবোধ বা দেশ প্রেমের ভাবনা। ইতিহাসের গতি এই ভাবনা জাগাতে বড় বেশী কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে। পৃথিবীর সব দেশেই এই ভাবনা দেখা গিয়েছিল। এক সমালোচকের ভাষায় Man is explicable by nothingless than all his history. Without hurry, without rest,the human spirit goes forth from the begining to embody every faculty, every thought, every emotion which belongs to it, in appropriate events. But the thought is always prior to the fact, at the facts of history pre exist in the mind as laws. Each law in turn is made by circumstances predominant, and the limits of nature give power to but one at a time. A man is the whole encyclopaedia of facts........There is a relation between the hours of our life and the centuries of time..........the hours should be instructed by the ages and the ages explained by the hours. Of the universal mind each individual man is one more incarnation. All its properties consist in him. Each new fact is his private experience flashes a light on what great bodies of men have done, and the crises of his life refer to national crises. Every revolution was first a thought in one man's mind, and when the

same thought occurs to another man, it is the key to that era. Every reform was once a private opinion and when it shall be a private opinion again it will solve the problems of the age". ১

বাংলার নাট্যকারেরা এই সুরটি ধরেছিলেন । নাটকের বিষয়বস্তুর গভীর অন্তরালে ইতিহাস চেতনাকে যদি জাতির মর্মস্থলে গেঁথে দেওয়া যায় তবে জাতি বা দেশ পায় এক অখন্ড আদর্শবোধ । এই আদর্শ বোধ অনুপ্রাণিত করে সমগ্র সমাজকে । অতীত বাস্তব হয়ে ধরা দেয় জন মানসে । ইতিহাসের এই মানবিক আবেদন শুধু কোন দেশ কাল সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয় এর ব্যপ্তি বিশাল । এ আবেদন সার্বজনীন, বিশ্বজনীন । ইতিহাসের ঘটনাবলী হতে তাই নাট্যকারেরা যুক্তিবাদ, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বাদ উদার ধর্মনীতির আদর্শ নাটকের মধ্যে উপস্থাপিত করলেন । যার ফল হলো স্বাদেশিকতা বোধের জাগরণ । প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য্য বলছেন, " বাঙালী নাট্যকারেরা ইতিহাস পাঠের আশ্রয়ে উদার দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হন । এর জন্যই তাঁরা কোন সংকীর্ণ মতবাদ প্রচার করতেন না । বিরোধ ও বিসম্বাদের চেয়ে জাতি গঠন মূলক ঐক্য ভাবনাকে তাঁরা প্রচার করতে চেয়েছিলেন । তাঁরা যে আদর্শ প্রচার করেছিলেন তার সার কথাই হচ্ছে কেবল বন্ধন মুক্তিই বিপ্লব নয়, পরবশতার শৃংখল ছিন্ন করাই স্বাধীনতা সংগ্রাম নয়, বিদেশী শোষণের অচলায়তন যেমন ভাঙতে হবে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে গড়বার শক্তিও অর্জন করতে হবে । দাসত্বের লৌহ - বলয় যেমন ভাঙতে হবে, তেমনি পালন করতে হবে স্বরাজ গঠনের মহান দায়িত্ব ।

জাতির সমস্ত শক্তি যদি অন্তর্মুখী হয় তবেই দেশ গঠন সম্ভব । তাই দেশবাসীর মানবিক পরিবর্তনের দিকে তাঁরা বেশী জোর দিয়েছিলেন । কারণ তাঁরা জানতেন বিপ্লবের ফলে মানুষের চিত্তের যে রূপান্তর ঘটে তাকে স্থায়ী করতে হলে দরকার নব সংগঠন । এই জন্যই নাট্যকারেরা 'Construction Nationalist' এর ভূমিকা নিয়েছিলেন ।" ২

উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক সমস্যা জর্জর পটভূমিতে যে সব নাটক লেখা হয়েছিল তার মধ্যে ছিল সামাজিক সমস্যার প্রতি মানুষের দৃষ্টির আকর্ষন ও তার সম্পর্কে সচেতনতা বোধ জাগানোর প্রচেষ্টা । ব্যতিক্রম দেখা গেল 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে । লেখক মধুসূদন । 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে আমরা দেখলাম যুগ মানসের প্রতিফলন — আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের সংঘাতে ব্যক্তি মানসিকতার পরাজয়ের বেদনা । এই পরাজয়ের পশ্চাতে আছে পরাধীনতার জ্বালা । কৃষ্ণকুমারীর আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে প্রমানিত হলো বৃহত্তর কল্যাণের জন্য আত্মাহুতি সামাজিক তথা রাষ্ট্রিক গৌরবের বস্তু । মানব জীবনের এই পরিণতির মূলে আছে দেশপ্রেম । সুকুমার সেন সত্যিই বললেন " মধুসূদনের স্বদেশ প্রীতি ও স্বাজাত্য বোধের সুস্পষ্ট প্রকাশ 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে ।" ৩

১৮৫৯ এ বাংলায় শুরু হলো নীল বিদ্রোহ । এই বিদ্রোহের বিষয় বস্তু নিয়ে দীনবন্ধু মিত্র লিখলেন 'নীলদর্পন' । মানব দরদী বস্তু নিষ্ঠ এই নাট্যকারের 'নীলদর্পন' ব্রিটিশ দুর্গে আঘাত হানল । দেশে এমন কি দেশের বাইরে এই নাটকের প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হলো । শিবনাথ শাস্ত্রী লিখছেন, " আবাল বৃদ্ধ বনিতা আমরা সকলেই ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া গিয়াছিলাম । ঘরে ঘরে সেই কথা । বাসাতে বাসাতে তাহার অভিনয় ভূমিকম্পের ন্যায় বঙ্গ দেশের সীমা হইতে সীমা পর্যন্ত কাঁপিয়া যাইতে লাগিল ।" ৪ সমাজ চেতনায় ও দেশ প্রেমের আকরে লেখা

দীনবন্ধুর এই নাটক সাহিত্যেও বিপ্লবের সূচনা করল। এই স্বদেশ প্রেমের ধারা সামাজিক সমস্যার পাশাপাশি নাটকের গভীরে স্থান করে নিল। প্রাণনাথ দত্তের 'সংযুক্তা স্বয়ম্বর' নাটকে প্রকাশিত হলো পরাধীনতার বেদনা। মনো মোহন বসুর 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকে ইংরেজ আমলে দুর্দশার অভিব্যক্তি ধরা পড়লো। কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত মাতা' নাটকে ভারতমাতার মলিন দৃশ্য উপস্থাপিত হলো। জননী আবেগ ভরা কন্ঠে সন্তানদের উদ্দেশ্যে জাগ্রত হওয়ার আবেদন জানালেন, "তোদের অভাগা জননীর দুরবস্থা একবার দেখ বাবা, অলংকারগুলি দস্যুতে অপহরণ করেছে, একটু তেল পাইনে যে চুলে দিই, এই মলিন শত গ্রন্থি বস্ত্র আর কতকাল পরতে হবে .... ? বাবা তোরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে তোদের মার এই দুর্দশা ঘোচা।"

এই যুগে আরও কিছু দেশাত্ম বোধক নাটক হলো। হারান চন্দ্র ঘোষের 'ভারত দুঃখিনী', কৃষ্ণবিহারী বসুর 'ভারত অধীনা ভারতমাতা', হরলাল রায়ের 'হেমলতা', জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের 'পুরু বিক্রম', 'সরোজিনী', 'অশ্রুমতি', 'স্বপ্নময়ী' নাটকগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। উপেন্দ্র নাথ দাস তার নাটকে দিলেন বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্র'। তাঁর নাটক 'শরৎ রজনী' ও 'সুরেশ - বিনোদিনী' ইংরেজদের বিরুদ্ধে জীবন উৎসর্গের ব্রত গ্রহণের সার্থক আহ্বান জানানো হয়েছে। সুকুমার সেন বলছেন "দেশ প্রেমের উদ্দীপনা তো আছেই সেই সঙ্গে দেশকে স্বাধীন করিবার উদ্দেশ্যে বৈপ্লবিক চেষ্টার প্রথম ইঙ্গিতও রহিয়াছে।" ৫ কমল কুমার সান্যাল বলছেন 'সুরেন্দ্র - বিনোদিনী' নাটক যখন লেখা হয়েছিল তখন দেশে সশস্ত্র বিপ্লবের কোন অস্তিত্ব ছিল না। মঞ্চের উপর এই ধরণের ঘটনা অভিনীত হতে দেখে দেশের তরুণ সম্প্রদায় উৎসাহিত হয়েছিল। পরবর্তী কালের বৈপ্লবিক আন্দোলনের আগমণ বার্তা উপেন্দ্র নাথ দাসই শুনিয়েছিলেন। কিংবা বলা চলে তিনি বিপ্লবী আন্দোলনের পরোক্ষ স্রষ্টা।" ৬ এই সময় দক্ষিণা চরণ চট্টোপাধ্যায় 'চাকর দর্পন' রচনা করেছিলেন। এই নাটকেও ইংরেজদের বিরুদ্ধ

ছিল তীব্র বিষোদগার । নাট্য সাহিত্যের এই ধারার জন্যই ১৮৭৬ এ এল ' অভিনয় নিয়ন্ত্রণ বিল ' । এই মানসিকতার পটভূমিতে এল বিংশ শতাব্দী । বাংলার নাট্য - কারদের স্বদেশ প্রেমের জোয়ার দেখা দিল বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলনে ।

এই বিংশ শতাব্দীর পরিমন্ডল সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য্য বললেন " যে দেশা - ত্মবোধ অবলম্বন করিয়া খ্রীষ্টীয় বিংশতি শতাব্দীর প্রথম দশকের প্রথমভাগেই বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল তাহার ভাব উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতেই এই জাতির মনে ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করিয়াছিল । বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই এই ভাবটি যখন অনেকটা পরিণতি লাভ করিল , তখনই স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে ইহার পরিচয়টি বাহিরে প্রকাশ পাইল । অতএব বাংলার স্বদেশী আন্দোলন কোন একটা আকস্মিক উত্তেজনা জাত গণ আন্দোলন মাত্র ছিল না জাতির সুদীর্ঘ তপস্যার শক্তি ইহার মধ্যে সঞ্চিত হইয়াছিল । সেইজন্য ইহার ক্রিয়া বহুমুখী ও সুদূর প্রসারী হইয়াছে । " ৭

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য আরও মন্তব্য করেছেন যে বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের তুলনায় নাট্য সাহিত্য বিভাগেই এর প্রভাব সব চাইতে বেশী প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল । নব যুগের নতুন চৈতন্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে সে যুগে যেমন প্রতিভাশালী নাট্যকারের আবির্ভাব হয়েছিল তেমনি প্রাচীন যুগের যে সব নাট্যকার সে যুগ পর্যন্ত এসে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তারাও নতুন যুগের প্রভাব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন । এর ফলে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক হতেই বাংলার নাট্য সাহিত্য এর মধ্য যুগের ধারা পরিত্যাগ করে নতুন ধারায় সে অগ্রসর হতে লাগল । ৮

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত নব্য যুগধারায় প্রভাবিত বাঙালী সমাজের অবক্ষয়ের পটভূমি হতে তাদেরই বংশধরেরা বিংশ শতাব্দীতে এসে পাশ্চাত্য

আদর্শের মোহ বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে স্বদেশ ও সমাজকে নতুন করে গড়ে তোলার আদর্শে লিপ্ত হলেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের ভাষায় "তখন হইতেই সমাজের জন্য মানুষ নহে, মানুষের জন্য সমাজের স্থান নির্নীত হইল।" ৯

১৯০৫এ বঙ্গ বিভাগ হলো। সুরেন্দ্র নাথ বললেন "Lord Curzon has divided our provience, he has sought ~~to sought~~ to bring about the disintegration of our race, and to destroy the solidarity of our popular opinion. Has he succeeded in this novel endeavour ? He has built better than he know, he has laid broad and deep the foundations of the national life, he has stimulated those forces which contribute to the up building of nations, he had made us a nation, and the most reactionary of the Indian Viceroys will go down to posterity as the Architect of the Indian national life". ১০

সত্যই জাতীয় নির্মাণের কার্যকলাপ শুরু হয়ে গেল। স্বাদেশিকতার এই বন্ধন মুক্তির অধ্যায়ে নাট্যকারেরা নাটকের পটভূমি খুঁজলেন বাংলা ও ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসের প্রাণবন্ত অধ্যায়গুলি হতে। এই ঐতিহাসিক বিষয়ের মধ্যে হয়ত ঐতিহাসিক উপাদানের ঘাটতি ছিল, হয়তো বা সমালোচনার বিচারে এই নাটকের দোষ ত্রুটি ছিল, তবুও জনসাধারণ এই নাটকের আবেগ হতে প্রেরণা পেয়েছিল স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বলিদানের ভাবনার। স্বদেশ প্রেম তাদের হৃদয়কে অমিয় মথিত করেছিল। তাই বাংলার ইতিহাস বা টডের রাজস্থানের কাহিনী এই নাট্যকারদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিল। বৈদ্যনাথ শীল বলছেন, "বর্তমান যুগের বাঙালী তাহার মধ্যেই দেশ-হিতৈষণার অনেক নির্দেশ পাইয়াছে। বিদেশী ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে যে অভিযান, রাজভয় ব্যাকুলতা তাহা প্রকাশে বাধা দিয়াছে। তাই বাঙালী নাট্যকার দুধের পিপাসা ঘোলে মিটাইয়াছেন। তাঁহার নাটকে বিদেশী আছে ইংরাজ নাই, দেশদ্রোহী আছে

তাহার ঐতিহাসিক পরিচয় নাই। দেশ প্রেমিক রহিয়াছে, হয়তো সে কোন দিনই ছিল না, কল্পনার দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে।" ১১ তবুও কল্পনার উৎস স্রোত বাস্তবায়িত হয়ে যেন নাটকগুলি বাংলার রঙ্গালয়ে জলজ্যান্ত রূপে অভিনীত হতে লাগল। গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' (১৩১২), 'মীরকাশিম' (১৩১৩), ও 'ছত্রপতি' (১৩১৪) এই আবহাওয়ার মধ্যে অভিনীত হয়। ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যা-বিনোদের 'প্রতাপাদিত্য' (১৩১০), 'পদ্মিনী' (১৩১৩), 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' (১৩১৩), 'চাঁদবিবি' (১৩১৪), 'নন্দকুমার' (১৩১৪), 'বাংলার মসনদ' (১৩১৭) প্রভৃতি জাতীয় ভাবোদ্দীপক ঐতিহাসিক নাটক গুলিও এই সময়ে রচিত হয়। অমৃতলাল বসুর 'সাবাস বাঙালী' (১৩১২) ও 'নব জীবন' (১৩০৮), অমরেন্দ্র নাথ দত্তের 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ' (১৯০৫), দ্বিজেন্দ্র লালের 'প্রতাপ সিংহ' (১৯০৫), 'দুর্গাদাস' (১৯০৬), 'নূরজাহান' (১৯০৮), 'মেবার পতন' (১৯০৮), 'সাজাহান' (১৯০৯) প্রভৃতি রোমান্টিক ঐতিহাসিক নাটক এই যুগের ফসল। জাতীয় জীবনের সেই গরিমা দীপ্ত প্রহরে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এই সকল নাটকের স্বদেশ প্রেম, ত্যাগ ব্রত, কর্তব্য বুদ্ধি, আত্মোৎসর্গ মহিমা সর্বভারতীয় দৃষ্টি কোনের রাষ্ট্রিক চেতনা জাতীয় জীবনে আশার এক আলোক বর্তিকার সৃষ্টি করেছিল। এই সময় বঙ্গ ভঙ্গের প্রভাব সম্পর্কে এক ঐতিহাসিক বলছেন,

Our country remembers that to the great national sorrow, Bengal was partitioned in 1905 and the agitation inaugurated, and the Swadeshi Movement started stirred the whole country from one end to other. Meetings and processions help in propaganda to a certain extent only, but can not continue for long and unless there is a solid back ground no movement can last.

The above movements too would have proved short lived, were not the aforesaid dramas produced at that time. At such time of the greatest need, these, dramas acted like a great inspiration & changed the servile mentality of the people, In fact at the time of the Swadeshi Movement what hundred lectures could not do, was accomplished by our single perfermance of Serajuddoula or Mirkasem". ১২

তদানীন্তন নাটকের প্রভাব সম্পর্কে সুমিত সরকার মন্তব্য করেছেন, 'The Swadeshi movement brought about a sudden swing in fashion back do patriotic cum historical plays......All these damas were really variations on the single them of the need for courage, unity and self sacifice in the battle for freedom." ১৩

স্বদেশী যুগের এই ধারা অবলম্বন করে নাট্য সাহিত্যে এসেছিল এক নবযুগ।

॥ অমৃত লাল বসুর স্বদেশী নাটক ॥

অমৃত লাল বসু আজন্ম দেশপ্রেমিক। দেশ প্রেমের দীক্ষা পেয়েছিলেন নব গোপাল মিত্রের কাছ হতে। এমে তাঁর জীবনের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা, দেশের রাজনৈতিক পরিমন্ডলকে গভীর ভাবে অবলোকন করার মানসিকতা, তাঁর স্বাজাত্য বোধ তাঁর চরিত্রকে এক দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠা করেছিল। গিরিশ চন্দ্রের ধর্মীয় একাত্ম বোধ ও সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আধ্যাত্মিক মাতৃ সাধনার অনুশীলন ব্রত তাঁর জীবনে এক গভীর প্রভাব বিস্তার করে। অমৃত লাল সুরেন্দ্র ভাবনার সাথে একমত

ছিলেন "The service of the motherland is the highest form of religion-It is the trust service of god".

এই বিশ্বাসে অমৃত লালের জীবন বাঁধা ছিল। তাই দেশের সংকট জনক পরিস্থিতিতে শুধু মাত্র চিন্তাশীল ভাবনা তাঁর মধ্যে ছিল না, তিনি আন্দোলনের সাথে নিজেকে একাত্ম করে গড়ে তুললেন। তিনি দেশ প্রেমকে শুধু মাত্র রাজনৈতিক পটভূমিতে স্থাপন করতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন দেশ প্রেম জাতির ধর্ম হয়ে উঠুক। দেশের মানুষ ধর্মকে অনুশীলন করে প্রাত্যহিক ক্রিয়া কর্মের মধ্য দিয়ে, কল্যাণ বোধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, জীবনের সহজ সাবলীল গতির মধ্যে অনুসন্ধান করে, প্রেয়র মধ্যে শ্রেয়কে খোঁজে। তাই প্রতিটি গৃহ কোনে দৈনন্দিন ভাবনায় স্বদেশ ব্রতকে যুক্ত করা যায় তবে দেশও গড়ে উঠবে, গড়ে উঠবে মানুষ আত্মার স্বাভাবিক স্পন্দন। তাই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় সুরেন্দ্র নাথের সহযোগী রূপে তিনি গান রচনা করেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন। কিন্তু এই সব কর্মে ভাবোচ্ছ্বাস যেমন আছে, তেমনই আছে অতি বাস্তব সমস্যার প্রতি সমাধানের ইঙ্গিত।

তাঁর দেশ প্রেম বাঙলাকে নিয়েই বিকশিত হয়েছে। তাঁর 'নবজীবন' নাটকে 'ভারত মাতা'র দুর্ভাগ্যের ইঙ্গিত দিলেও তিনি বাঙলার সাথে বেশী আত্মিক ছিলেন। তিনি নিজেই বলতেন, "সারা ভারতবর্ষটাকে এক করে আঁকড়ে ধরবার মত প্রশস্ত বক্ষঃস্থল আমার নেই, তাই আমার সমস্ত ভালবাসাটা চিরজীবন ধরে বাঙালার নামে – বাঙালীর নামে উৎসর্গ করে রেখেছি।" ১০

তিনি স্বদেশ প্রেমে ছলনা বা চাতুরীর আতিশয্যকে তীব্র কষাঘাত করেছেন। "ইংরাজের শিক্ষা ও সংসর্গের প্রভাবে আমাদের সর্বাপেক্ষা বলবান হইয়াছে পরোপকার প্রবৃত্তিটি, এই সৎ প্রবৃত্তির উত্তেজনাতে আমরা গর্ভধারিনী মাতাকে পাঁচ টাকা মাসহারা বন্দোবস্তে কাশী পাঠাইয়া সস্ত্রীক শকটারোহণে দেশ মাতার 'বন্দমাতা' গাহিয়া বেড়াই, এই পরোপকার ব্রতে মত্ত হইয়াই আমরা সহোদর ভ্রাতার নামে হাইকোর্টেমোকদ্দমা রুজু করিয়া দিয়া প্রয়াগে, আত্মীয় কানপুরে ভাই খুঁজিয়া

আলিঙ্গনের আকুলতায় কাঁদিয়া ফিরি।" ১৬

'আদর্শ বন্ধু' নাটকে অমৃত লাল যখন প্রজাতন্ত্রের প্রাধান্য দেখাইয়াছিলেন তখন স্বরাজ আন্দোলনের বাষ্পও এদেশে দেখা যায় নাই। স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাতের পূর্বে সাহিত্যের মধ্যে জাতীয়তা বোধ কি ভাবে প্রতিফলিত হইতেছিল, তাহার ইতিহাসও নাটকটিতে মিলে। প্রজাতন্ত্রের পরিবর্তে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় গর্ভাঙ্কে দিনকরের আক্ষেপোক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় —

'মন্দারবতী মন্দারবতী
মাগো এই ছিল ভাগ্যেতে তোমার
হা ধর্ম স্বাধীনতা।'

এবং

'ওগো মা জন্মভূমি
আজি মনে রেখ তুমি
তোমার উদ্ধার তরে
অনেক যতন করে না পেয়ে উপায়
ম্লান রাজা পায়
এই দেহ দিব বলিদান।' ১৭

বঙ্গভঙ্গের পটভূমিকায় ১৯০৬ সালে অমৃত লাল লিখলেন 'সাবাস বাঙ্গালী'। ১৯০৫ এর ১৬ই অক্টোবার বঙ্গ বিভাগ হলো। দেশ ব্যাপী গড়ে উঠল স্বদেশী আন্দোলন ও বিদেশী বর্জনের তীব্র কার্যকলাপ। অমৃতলাল একদিকে যেমন অংশ গ্রহণ করলেন আন্দোলনে অন্যদিকে রচনা করলেন 'সাবাস বাঙ্গালী'। ১৯০৬ সালে জানুয়ারী মাসে নাটকটি প্রকাশিত হলো। নাটক গ্রন্থটি "স্বদেশ হিতৈষী

মহা মহিমান্বিত শ্রীযুক্ত মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর মহদাশয়েষু ' কে উৎসর্গীকৃত । গ্রন্থে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই ১৯০৫ সনের ২৫শে ডিসেম্বর স্টার থিয়েটারে ' সাবাস বাঙালী ' প্রথম অভিনীত হয় । ১৮ নাটকটিতে দুইটি অঙ্ক । প্রথম অঙ্কে ছয়টি ও দ্বিতীয় অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য । এ ছাড়া প্রারম্ভে ' প্রস্তাবনা ' ও শেষে পট পরিবর্তন আছে । পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬২ । ' সাবাস বাঙালী ' তে অবিচ্ছিন্ন কাহিনী নাই । স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙালী সমাজের সর্বস্তরে যে প্রতিক্রিয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল সেই পরিবেশ এই নাটকে প্রকাশিত হয়েছে । প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য্য বলছেন " বাঙালী যুবকদের মন ও ধ্যান স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে অন্তর্মুখী হয়েছিল । বিদেশী শাসকদের দাসত্ব অস্বীকার করে এবং ইংরেজদের কেরাণী বৃত্তি শিক্ষা পরিত্যাগ করে , দেশীয় শিল্প চর্চা ও বাণিজ্য অনুশীলনের প্রয়াস একদল স্বাবলম্বনাভিলাষী স্বাধীনতা কামী যুবকদের মধ্যে প্রত্যয় নিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল । নাট্যকার অমৃতলালের স্বাদেশিক চিত্ত , তৎকালে বিভিন্ন পত্রিকাতে স্বদেশী শিল্প বাণিজ্যের প্রসারের প্রতি যে আহ্বান এবং দিকে দিকে স্বদেশী মেলা ও ভাণ্ডার স্থাপনের মধ্যে বাঙালীকে আত্ম সচেতন ও স্ব - নির্ভর করে তোলবার যে সক্রিয় প্রয়াস দেখা - দিয়েছিল , তার সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা অনুভব করে । তাঁর এই মানস নৈকট্যের ফসল ' সাবাস বাঙালী ' । " ১৯

' সাবাস বাঙালী ' তে অমৃত লাল এক আদর্শ ভাবনা দিতে চেয়েছিলেন । স্বদেশী আন্দোলন এর পটভূমি সকলের মনে দেশাত্মবোধের সঙ্কল্প তথা স্বদেশীর প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন । নাট্য চরিত্র মতিলাল যেন অমৃত লালের ভাবনার উৎপন্ন ফসল । মতিলাল তাঁর পিতা অঘোর নাথের প্রতি যে মন্তব্য করছেন সেই ভাবনাই তদানীন্তন আদর্শ রূপে পরিব্যক্ত হয়েছে ।

" মতিলাল — .... কেন ভাবছেন ? না হয় আমি দেশের জন্য দুমাস জেল খাটলুমই বা । ছেড়ে দাও বাবা চাকরী । আমাদের সুর বংশ কত বড় বংশ ।

আর সেই বংশে জন্ম গ্রহণ করে তুমি কি না একটা দরজীর দোকানে গোলামী করছো।
.... কেন আপনি চাকরী করেছিলেন ? কেন ঘোটনা পাড়ার ভিটে ছেড়ে , সেখান কার চাষ - বাস উঠিয়ে দিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন ? ঠাকুর মার মুখেও গল্প শুনেছি যে আমাদের দেশের বাড়ীতে কত সুখ ছিল , কত লোক অন্ন খেয়ে যেতো , কত পাল পার্বন হতো , আর এই কলকাতায় কত সুখেই আছি ? .... আপনি তো জানেন যে ছেলেবেলা থেকেই আমি একটু হাতের কাজ করতে পারি , ... আমি উকিলী একজামিন দেব না যাতে ভায়ে ভায়ে , দেশের লোকে লোকে ঝগড়া বাড়ান যায় , সে ব্যবসা আমি করব না। আমার ইচ্ছে হয়েছে বিজ্ঞান শিখে শিল্পের উন্নতি করবো। আমি শেলাইদার ঠাকুরদের এস্টেটের রামচরণ বাবুর তাঁত দেখেছি , শ - বাজারের অনুকূল মল্লিক যে তাঁত করেছেন , তাও দেখেছি , আর আপনার বন্ধু জহর কাকার তোয়েরী ভাল তাঁত দেখেছি , এই সব দেখে শুনে আমার মাথায় এমন সব তাঁতের চরকার আইডিয়া এসেছে যে তা করতে পারলে বিলিতী সেলাই কলের মত আমাদের মেয়েরা ঘরে ঘরে কার্পেট বোনা ছেড়ে বাড়ীর ব্যবহার্য্য কাপড় করতে পারবে , আর ঘরে ঘরে সূতো তোয়ের হবে।" (তৃতীয় দৃশ্য)

অমৃত লালের আদর্শ ছিল দেশ সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। নাট্য চরিত্রে নরেণের মুখ দিয়ে সেই ভাবনাই প্রকাশ করিয়েছেন —

" নরেন। ... সকল কর্ত্তব্যের আগে কর্ত্তব্য মাতৃসেবা করা , আমরা আমাদের স্বর্গাদপী - গরীয়সী জননীর সেবা করছি। (তৃতীয় দৃশ্য)

মতিলালও সেই ভাবনার অংশীদার। তার উক্তি , " বঙ্গ মাতার এখন সঙ্কটাপন্ন পীড়ার অবস্থা , এখন আমার পড়া যাক , কর্ম যাক , ভবিষ্যতের ভাবনা যাক , প্রাণ - পাত করে মায়ের সেবা করি , মাকে আরাম করি, মাকে বাঁচিয়ে তুলি।"(তৃতীয় দৃশ্য)

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বিদেশী দ্রব্য বর্জনের উদ্দেশ্যে যুবকেরা বিলিতী দোকানে পিকেটিং করত। স্বদেশী দ্রব্যের পসরা মাথায় নিয়ে ফেরী করত। সবাই

যে স্বদেশীতে আকৃষ্ট হতো তাও নয়। কিন্তু যুবকের দল আন্দোলন চালিয়ে যেত। এই রকম এক বিলিতী দ্রব্য কেনায় অভ্যস্ত এক মহিলার হৃদয় পরিবর্তনের কাহিনী সুন্দর ভাবে অমৃত লাল ' সাবাস বাঙালী 'তে স্থান দিয়েছেন।

" মতিলাল। (মিসেস গুপ্তাকে) মা। আপনাকে যে আমাদের বাঙালী দেখছি, আপনি এখানে ? আপনি এই ইংরেজের দোকানে বিলিতি জিনিস কিনতে এয়েছেন ? .... মা আমরা কলেজে যাই, কিন্তু বুঝেছি যে কলেজে পড়ে, একজামিন পাশ করে, অর্থোপার্জন করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। আমরা ছাত্র, কিন্তু ছাত্র হলেও মনুষ্য এবং এই বঙ্গ মাতার সন্তান। মনুষ্যত্বের এবং মাতৃ পূজারও একটি কর্ত্তব্যের দায়িত্ব আছে। তাই আমাদের কতকটা অবসর সময় আমোদ, ক্রীড়া বা আলস্যে না দিয়ে, মায়ের পূজায় ক্ষেপন করতে প্রতিজ্ঞা করে ব্রত গ্রহণ করেছি।.... মা, আপনার পায়ে পড়ি, বাঙালায় কথা কোন আমাদের সঙ্গে, মাগো, আমাদের গর্ভধারিনীর স্তন্য ক্ষীরের সঙ্গে যে ভাষা আমরা বুঝতে শিখেছি — আপনি মা সেই ভাষায় কথা কোন। ....

মিসেস গুপ্তা। কেন আপনারা আমাকে বাধা দিচ্ছেন ? আপনারা কলেজে পোড়ছেন, জানেন যে প্রতি মনুষ্যেরই স্বাধীন ইচ্ছা চালনার ক্ষমতা আছে। আমার যা ইচ্ছা আমার যা আবশ্যক, সেই মত আমি দ্রব্য সংগ্রহ করবো, তাতে কাহারও বাধা দেবার অধিকার নেই।

১ম ছাত্র। মা, মা, আপনি আমাদের গুরুপত্নী। আপনাতে আর আমাদের গর্ভধারিনীতে কোন পার্থক্য নেই, আপনার সঙ্গে তর্ক করবার অধিকারও আমাদের নাই। তবে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি, দেশীয় শিল্পের উন্নতির পক্ষে প্রাণ পণে সাহায্য করবো, ... আপনি মা, জননী, গুরুপত্নী, দেশের আদর্শ রূপিনী, আপনাকে আর অধিক কিছু বলতে পারি না, ... এসো ভাই সকল, এসো — এই দোকানের সামনে আমরা শুয়ে পড়ি, মা আমাদের ঐ বিলাতী জিনিস নিয়ে আমাদের বুকের উপর দিয়ে গাড়ী চালিয়ে চলে যান, মার কাজে আমরা বাধা দিতে পারিনে, কিন্তু মার পায়ে রক্ত দিতে প্রাণ দিতে তো পারি।....

মিসেস গুপ্তা । বাবা , বাবা , ওঠ , ওঠ , বাবারা আমার , ছেলেরা আমার । ওঠ । উঃ । তোদের প্রাণে দেশের জন্য এমন মমতা জেগে উঠেছে রে । ছেলে তোরা— আমায় শিক্ষা দিলে আজ । .... সমস্ত প্যাকেজগুলো নাও , তোমাদের হাতে দিলুম , যা ইচ্ছা তাই করগে । তোমাদের নাম করে প্রতিজ্ঞা করছি যে , আমি আজ থেকে আর যথাসাধ্য আমাদের বাড়ীতে বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার হতে দেবো না । .... আমার জয় নয় , বল তোদের স্নেহের জয় , তোদের মাতৃভূমির জয় , বঙ্গ মাতার জয় , ধর্মের জয় । " (১।৫ গ)

নাটকে গানের একটা ভূমিকা থাকে । ' সাবাস বাঙালী ' তে ষোলটা গান আছে । প্রস্তাবনার গানে আছে বিদেশী বর্জনের আনন্দ অভিষেক । মুচিদের গানে বিদেশী বর্জনের প্রতিজ্ঞা গৃহীত হয়েছে । চুড়িওয়ালীদের গানে বিলিতি চুড়ি বিক্রী না হওয়ার জন্য আক্ষেপ প্রকাশিত হয়েছে । চিনিবাসের গানে সুযোগ সন্ধানে বেশী পয়সা রোজগারের ধান্দা আছে । মাতাল বণিকের গানে আছে শ্লেষ । তাঁতি বৌ , বিনোদিনী চারু প্রভৃতি মহিলা চরিত্রের মুখে বিভিন্ন গানে বিলাতী বর্জন ও স্বদেশী - আন্দোলনের নানাদিক পরিস্ফুট হয়েছে ।

এই নাটকে একটি গানে স্বদেশী শিল্প ও বানিজ্যে অনুরাগী হতে আবেদন করেছেন নাট্যকার ।

" ওগো তোরা আলো কর বঙ্গদেশের মুখ ।
চেয়ে তোদের পানে আমার যেন
বাড়ছে দশ হাত বুক ॥ .....
কিন্তু হাত ধরে মানা করি বাপ ,
পুন্যের ভারতে আর এনো নাক পাপ ,
নিজের কড়ি পুড়িয়ে দিয়ে
আর বাড়িও নাকো দুখ ॥

ময়লা সারে ফসলটা বেশ ফলে বটে দেখে ,
কিন্তু ফসলটা বই ময়লাটা আর
নেয় না তো কেউ খেতে ,
তেমন জন্মেছে বিরাগ সারে যেই অনুরাগ
যত্নে রাখ তারে বুকে করে সব সোহাগ ,
স্বদেশীতে মন দাও বেশী কাঙাল
বাঙলায় দুঃখ ঘুচুক ॥ (১।৫ গ)

স্বদেশী আন্দোলন ও বিলিতি দ্রব্য বর্জনের আন্দোলন মেয়েদের অন্দর মহলে পৌঁচেছে । তারাও এই প্রসঙ্গে চিন্তাশীল হয়ে উঠেছে । বিরাজ একটি নারী চরিত্র । তার মুখের কথায় " ম্যাকেসর মেখে চুল বাঁধি , নতুন নতুন ফ্যাসেনের জ্যাকেট পরি , আর বিলিতি রঙে কাপড় রাঙাই , কিন্তু কোথেকে যে আমাদের এই সব সুখের সজ্জা যোগায় , তার কথাটি একবার ভাবি ? আমি শুনেছি — সে বুঝেছে — যে ওইতে দেশের টাকা সব বিদেশে চলে যায় । " (২।৫ গ)

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ইংরেজদের বহু দ্রব্য অবিক্রিত থেকে যায় । বানিজ্যের ক্ষতি হতে থাকে । তার প্রতিক্রিয়া এক নাট্য চরিত্র বলছে —

অঘোর নাথ । এই এবারকার হাফ প্রাইজ আমাদের সাহেবের দোকানে বেশী বাঙালী খদ্দের হয় নি বলে বড় সাহেব একেবারে আগুন হয়ে আছেন । .... সাহেবেরা আজকাল বাঙালীর ওপর যা চোটেছে , তাতে পেটের ভাতটা আর কোরে খেতে হবে না । " (১।৩ গ)

আন্দোলন চলাকালীন সময়ে ইংরেজের বিরোধিতা করা হলেও ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রকাশ হতে সংযত ছিলেন অমৃত লাল । ইংরেজ রাজার প্রতি আনুগত্য

রেখে স্বদেশী আন্দোলন করার মানসিকতা অমৃতলালের নাটকে দেখা যায় । অমৃতলালের এই মানসিকতা সুরেশের মুখ দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে —

" আজ পর্যন্ত সেই স্বর্গগতা মহারাণীর পুত্র , আমাদিগের পরম পূজনীয় সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডকে আমরা প্রাণ দিয়ে ভক্তি করি , কিন্তু তা বোলে কি আমাদের দেশের তাঁতি , জোলা , ছুতোর , কুমোর , কামার — এরা যে একেবারে আপনাদের ব্যবসায়ে বঞ্চিত হয়ে উচ্ছন্নে যাচ্ছে , তাদের উদ্ধারের জন্য কিছু চেষ্টা করবে না ?" (২ ।২ গ)

'বঙ্গভঙ্গ'এর সময় ইংরেজ শাসক কুল চেয়েছিল হিন্দু মুসলমান বিভেদ আনতে । এই উদ্দেশ্য সফল হলে ইংরেজদের শাসন কার্য্য পরিচালন করতে সুবিধা হবে । তাই ইংরেজরা প্রত্যক্ষ ভাবে মুসলমানদের মদত দিতে লাগলেন । হেনরী কটন বলছেন — "For the first time in history a religious find was established between them by the partition of the province. For the first time the principle was enunciated in official circular"-Divide and Rule". ২০

অমৃত লাল সরকারের এই বিভেদ নীতির বিরুদ্ধে কলাম ধরেছিলেন । হিন্দু মুসলমানের সংহত শক্তিতেই দেশ স্বাধীন হবে এই ভাবনা তাঁর মনে ছিল । তাই 'সাবাস বাঙ্গালী' নাটকে মুসলমানদের বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধতার চিত্র আঁকলে মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি দিয়ে এই আন্দোলনকে সমর্থন জানানোর অভিপ্রায়ও তাঁর ছিল । গোলাম ঈশা নামে এক ক্ষুদ্র চেতা মুসলমান স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধিতা করে বলছে " এই স্বদেশী আন্দোলন মুসলমান সম্প্রদায়ের অভিপ্রেত নয় ।" (২ । ২ গ) আবার নাট্যকার আবদুল গোতান নামে এক মুসলমান এর মুখ দিয়ে স্বদেশী আন্দোলনকে সফল করার ব্রতে দীক্ষিত হওয়ার কথা প্রকাশ করেছেন ।

" আবদুল শোভান । মিথ্যে কথা , মিথ্যে কথা , আমার নাম আবদুল শোভান , আমি একজন জমিদার এবং হিন্দু মুসলমানের আমার সম্প্রীতি আছে — এ স্পর্ধা আমি রাখি । আমি বলছি যে , আমাদের গোলাম উল্লা সাহেব গোলামী আমল - দারীর সর্দার হতে পারেন কিন্তু আমরা এই বঙ্গ দেশের এই মুসলমান সম্প্রদায় ওঁর ফোক্ত নবাবীর ডঙ্কার তলে সেলাম করিনা । .... আমরা শিক্ষিত কি অশিক্ষিত , চাষী মুসলমানগণ আমাদের হিন্দু ভ্রাতাগণকে এক মাতার সন্তান বোলে প্রাণের সঙ্গে আলিঙ্গন করি । ওঁর কথা আমাদের বঙ্গবাসী মুসলমান গণের কথা নয় , আমরা সবাই বাঙালী , কি হিন্দু কি মুসলমান -- কি জৈন - কি বুদ্ধ - কি খৃষ্টান - বাঙ্গালায় যাদের বাস , আমরা সেই সবাই বাঙালী হবো । হিন্দু আমাদের দাদা , আমরা ছোট ভাই , বাঙ্গলায় হিন্দু মুসলমানে বিবাদ কখনো হবে না । ' বন্দেমাতরম ' । (২।২ গ)

এই নাটকের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখনীয় । বঙ্গভঙ্গের সময় " পাশ করা ছেলের দাম বিলাতী কাপড়ের মত সিকি নেমে গেছে শুনে গরবিনী বলে এ সব বিধেতার টিটকিলিমি । " থ্রেড নিডল কোম্পানীর অঘোর বাঙালী চরিত্রের বিশ্বস্ত চাকুরীওয়ালার চরিত্রে উজ্জ্বল । অথচ তাঁর পুত্র মতিলাল স্বদেশী ব্রতে দীক্ষিত । এই নাটকে শিশুদের মনে বিদেশী বর্জনের আন্দোলনে অনুপ্রাণিত । ' মানিক ' বন্দেমাতরম বলে গ্রেপ্তার বরণ করেছে । অন্তিমে গৃহ অন্তঃপুর মহিলারা পুরাতন সংস্কার বিসর্জন দিয়ে চরকা কাটা ব্রত গ্রহণ করার দৃশ্যটির পর নাটকের সমাপ্তি ।

অমৃতলালের দেশাত্মবোধ ও সাবলীল জীবন ভাবনা তাঁর নাটকের বিষয় বস্তুকে যেমন জনসাধারণের নিকট সহজেই পৌঁছে দিয়েছিল ঠিক সেই রূপ তার আদর্শ নিষ্ঠায় তদানীন্তন মানুষ খুঁজে পেয়েছিল স্বাজাত্য বোধের ব্রতের অভিষিক্ত জীবন ধারা । এখানেই অমৃতলালের কৃতিত্ব ।

।। গিরিশচন্দ্র ।।

এক নাট্য সমালোচক গিরিশচন্দ্র ঘোষ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ' গিরিশ চন্দ্র নাট্য সাহিত্যের ' গিরিশ ' - হিমালয়ই বটেন ' । বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বাংলার স্বাদেশিকতা জাগরণের ক্ষেত্রে যশস্বী নাট্যকারদের প্রভাব বিচার করতে গেলে সমালোচকের মন্তব্য সার্থক বলে মনে হয় ।

গিরিশ চন্দ্রের জন্ম ১৮৪৪ সালে । হিন্দু মেলার অন্যতম উদ্যোক্তা নাট্যকার মনো মোহন বসুর সাথে তাঁর বাল্য কাল থেকে যোগ ছিল এবং তাঁর দেশাত্ম বোধক কার্যকলাপের সাথে তিনি সংযুক্ত ছিলেন । উনবিংশ শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ যে আদর্শ প্রচার করেছিলেন গিরিশচন্দ্রের জীবনে সেই আদর্শ নিজের দেশ ও সমাজের প্রতি এক গৌরবময় ভাবনার সৃষ্টি করেছিল । গিরিশচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ্বাস করতেন ভারতের ধর্ম সাধনাকে ত্যাগ , সেবা ও জাগ্রত পৌরুষের সাধনার মধ্যে জাগিয়ে তুলতেই পারলেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সার্থক হবে । তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সময় এই ভাবনাকেই প্রচার করেছেন , " আমার বিশ্বাস দেশ স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের আর আদেশের অনুসরণ না করলে কিছুতেই অগ্রসর হবে না । তিনি বারবার দেশকে বলে গেছেন যে ভারতবর্ষের জাতীয়তার মূল প্রাণ ধর্মে । " ২১

গিরিশ চন্দ্র যুগ ধর্মকে অস্বীকার করেননি । পরাধীন ভারতে জাতির স্বপ্নই হচ্ছে স্বাধীনতা । দেশ প্রেমের কঠোর ব্রত না গ্রহণ করলে স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব নয় । তাই বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলন কালে তিনি দেশ প্রেমকে ধর্ম রূপে সকল মানুষের কাছে তুলে ধরার সংকল্প নিয়েই নাটক রচনা করেন । যে কোন সাহিত্যিকের নাটক যা হতে স্বাজাত্যবোধের প্রচার হতে পারে তাকে তিনি নাট্যরূপ দিয়েছেন । এইজন্য

বঙ্কিম চন্দ্রকে তিনি বিশেষ ভাবে বেছে নিয়েছিলেন। তার নিজের ভাবনা তিনি নিজেই ব্যক্ত করে বলছেন :

" দেখ যুগধর্ম বলে একটা জিনিষ আছে , এই স্বদেশী যুগে যে প্রবল দেশ হিতৈষণার বন্যা ছুটে আসছে , আমাদের রঙ্গালয়কেও সেই ভাবে টেনে নিয়ে যেতে হবে। আমার মনে হচ্ছে নাটকের ভিতর দিয়ে দেশ হিতৈষণা preach করি। রঙ্গালয়কে powerful করতে এই একটা মস্ত সুযোগ। প্রত্যেক দেশের ইতিহাস পড়লে একটা বিশেষ সত্য দেখতে পাবে — রঙ্গালয় দেশের জাতি ও সমাজকে উন্নততর স্তরে চালিয়ে নিতে কতটা সাহায্য করেছে সাধারণ মানুষের প্রাণে একটা নূতন প্রেরণা জাগাতে। আমার ইচ্ছা আমাদের বাঙ্গালার , ভারতের এমন কতকগুলি মহামানবের চরিত্র নিয়ে নাটক লিখি , যে নাটক পড়ে বা অভিনয় দেখে মানুষ সত্যিকার দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে। যে জাতি আপনার ধর্ম , জাতি , মানুষ ও দেশের সাধককে ভালবাসতে পারেনি , ভালবাসতে শেখেনি , সে কি করে বড় কাজ করবে। আমার মনে হচ্ছে রঙ্গালয়কে নতুন করে গড়ি। একটা জাতির জীবন যে রঙ্গালয়ের নাট্যাভিনয়ে প্রতিফলিত হয় , এই সত্য কথা বোঝাবার জন্যই আমি রঙ্গালয়ে তিরস্কার পুরস্কার স্বরূপ গ্রহণ করে , অভিনেতার জীবন হতে নাটক পর্যন্ত লিখে চলেছি। বিধাতা আমাদের জাতির কল্যাণের জন্যই বোধ হয় রঙ্গালয়ের সহিত আমাদের সংশ্লিষ্ট করেছেন। .... জানো আমরা মরে যাব। কিন্তু এমন একদিন হয়ত আসবে , যখন লোকে জানবে আমরা রঙ্গালয়ের ভিতর দিয়ে দেশের সব বিভেদ ভুলিয়ে হিন্দু ও মুসলমান প্রভৃতি সব জাতি এক করে দেশের ঐক্য মন্ত্র সাধন ও কল্যাণের জন্য কি করেছি। জানো গিরিশ ঘোষকে যদি কেউ বলে মশাই , সভায় এসে বক্তৃতা করুন , সভাপতি হন। আমি বলব no never , আমি ও সব বক্তৃতার হাঙ্গামা ভালবাসি না। কাজ চাই। Not in words but in deeds".

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হলো। এই আন্দোলন মানুষের বহু ধ্যান ধারণা ও চিন্তার ক্ষেত্রকে প্রবল ভাবে নাড়িয়ে দিল। দেশবাসীর এই রাজনৈতিক দুর্যোগে ঘোর

তমিস্রায় ভরা রজনীতে গিরিশ চন্দ্রের দরদী প্রান ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। উদ্দীপ্ত জাতিকে গভীর ভাবে আত্ম প্রত্যয়ী করে গড়ে তোলে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের আদর্শে ভারতকে গড়ে তোলায় ছিল আত্মার অভিব্যক্তি। স্বদেশ প্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত করাই ছিল গিরিশ চন্দ্রের ধর্ম ভাবনা। গিরিশ চন্দ্র এই আন্দোলনের যুগে লিখলেন সিরাজদ্দৌলা (১৯০৬), মীরকাসিম (১৯০৬) ও ছত্রপতি শিবাজী (১৯০৭)।

গিরিশ 'সৎনাম' (১৯০৪) নাটকের মধ্য দিয়ে পূর্বেই দেশ প্রেমের ভাবনায় নাটক রচনা ভাবনাকে প্রদীপ্ত করে তুলছিলেন। 'সৎনাম' নাটকে তিনি স্বাদেশিকতার ভূমিকা টেনেছেন। সিরাজদ্দৌলা নাটকে তার অভিব্যক্তির প্রকাশ। গিরিশচন্দ্র সিরাজদৌলা নাটকে ইতিহাস নির্ভর তথ্য নিয়ে আবির্ভূত হোন। গিরিশ চন্দ্র ঘোষ সিরাজদ্দৌল্লাকে দেখেছেন ইংরেজ বিদ্বেষী, হিন্দু মুসলমান মিলনকারী, জাতীয় হিতের কল্যাণকারী নবাব বলে। অনেকেই গিরিশ চন্দ্র নাটকে ঐতিহাসিক তথ্যের ভ্রান্তি বা বিকৃতির কথা বলেছেন। অবশ্য এর জন্য যুগধর্মকে নাট্যকার অস্বীকার করতে পারেন নি। ডঃ প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য্য বলছেন "স্বাদেশিকতার যৌবন মুক্তি পর্বে নাট্যকারদের ইতিহাস আনুগত্য পূর্বের নাট্যকারদের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে সুদৃঢ় ছিল। গিরিশ চন্দ্র ইতিহাসের প্রকৃত তথ্যের কাছে আনত হয়েও যুগধর্মকে অস্বীকার করতে পারেন নি। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বৃটিশ বিদ্বেষ প্রচারের সঙ্গে হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য রচনা স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জন প্রচার, জাতীয় নেতাদের রাজনৈতিক চিন্তার মূল নীতি ছিল। সেকালের ঐতিহাসিকগণও স্বাদেশিকতার বিস্তৃততর পটভূমি রচনা করার উদ্দেশ্যে ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়ণে আগ্রহী হয়েছিলেন। এই ঔৎসুক্যের জন্য সিরাজদ্দৌল্লা ও মীর কাসিম, বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন নবাব-দ্বয় জাতীয় বীর হিসাবে চিহ্নিত হন। গিরিশচন্দ্র নাটকে এরই ছায়াপাত ঘটেছে। সুতরাং আমাদের নাট্যকার গিরিশের ইতিহাস বিচ্যুতিকে যুগধর্মের অবশ্যম্ভাবী প্রভাব জনিত রূপান্তর সাধন বলে গ্রহণ করতে হবে।" ২৩

সিরাজদৌল্লা অভিনীত ২৮ই সেপ্টেম্বর , ১৯০৫ সালে (২৪শে ভাদ্র , ১৩১২) মিনার্ভা থিয়েটারে । নাটকটি মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত ১৯০৬ এর জানুয়ারী মাসে । ১৯০৫ এর লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের উত্তাল দিনগুলিতে সিরাজদৌল্লা অভিনীত হলো ।' সিরাজদৌল্লা 'র আবির্ভাব বঙ্গভঙ্গ কালে । স্বেচ্ছাচারী ইংরেজ বিরুদ্ধে স্বাধীন নবাব সিরাজের লড়াই ।

" সিরাজ । জন্মিয়াছে ধারণা আমার
রাজকার্য্য নহে স্বেচ্ছাচার
নবাব প্রজার ভৃত্য , প্রভু প্রজাগণে
প্রজার মঙ্গল কার্য্য সতত সাধন
নবাবের উদ্দেশ্য জীবনে ।
যথা সাধ্য আত্ম সংশোধন
চেষ্টা করি দিবা নিশি
হও অনুকূল তোমরা সকলে
কুশলে যাহাতে হয় রাজ্যের শাসন । (১ম অঙ্ক । ৩য় গর্ভাঙ্ক)

এই সিরাজ অমাত্যদের অনুভব করতে শেখাচ্ছেন —

" হে অমাত্যগণ আমায় শত্রু বিবেচনা করবেন না । কিন্তু যদি সত্যই শত্রু হই , আমি আপনাদেরই শত্রু বাঙ্গালার নই । আপনাদের যদি বর্জন করা আমার অভিপ্রায় হয় , আপনাদের পরিবর্তে বঙ্গবাসীকেই রাজকার্য্য প্রদান করবো । আপনাদের আত্মীয় বান্ধব স্বদেশবাসী নির্বাচিত হবে , কোন বিদেশী রাজকার্য্য প্রাপ্ত হবে না । হিন্দু মুসলমান এক স্বার্থে বাঙ্গালায় আবদ্ধ , সে স্বার্থের বিঘ্ন হবে না । বঙ্গবাসীর পরিবর্তে বঙ্গবাসীই কার্য্যভার প্রাপ্ত হবে । যদি আমার প্রতি বিদ্বেষ পরিত্যাগ না করেন .... বিদ্রোহীর ধ্বজা উড্ডীন করে যোগ্য জনকে সিংহাসন প্রদান করুন । কিন্তু স্থির জানবেন ফিরিঙ্গি বাঙ্গালার দুষমন । (প্রথম অঙ্ক । ৩য় গর্ভাঙ্ক)

সিরাজ বুঝতে পেরেছিলেন যুদ্ধ আসন্ন । এই যুদ্ধে তাঁর দেশের হিন্দু মুসলমান প্রজাকে একত্রিত করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে । বঙ্গভঙ্গের কালে গিরিশ চন্দ্র সিরাজের মত অনুভব করেছিলেন যুদ্ধ আসন্ন । ইংরেজদের বিরুদ্ধে হিন্দু মুসলমানের এক সাথে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে না পারলে মুক্তি নেই । তাই তিনি সিরাজের মুখে সেই বানী বিধৃত করেছেন —

নাহি দিও ফিরিঙ্গিরে সূচ অগ্র স্থান
জানিহ নিশ্চিত —
রাজ্য লিপ্সা প্রবল সবার । .....
বঙ্গের সন্তান — হিন্দু মুসলমান ,
বাঙ্গালার সাধহ কল্যাণ ,
তোমা সবাকার যাহে বংশধরগণ —
নাহি হয় ফিরিঙ্গি নফর ।
শত্রু জ্ঞানে ফিরিঙ্গিরে কর পরিহার ,
বিদেশী ফিরিঙ্গি কভু নহে আপনার ,
স্বার্থ পর — চাহে মাত্র রাজ্য অধিকার
হও সবে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত । (১। ৫ গ)

স্বাজাত্য বোধের তীব্র ভাবনা ছিল গিরিশ চন্দ্রের মনে । সিরাজের মুখে তাই শুনি " যার হৃদয়ে ধারণা যে স্বদেশী অপেক্ষা বিদেশী আপনার হয় , তার সে ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রম , এই উমিচাঁদ আর কৃষ্ণদাসের প্রতি বিদেশীর ব্যবহার তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ । চক্ষের উপর এই দৃষ্টান্ত দর্শন করে যার ভ্রম দূর না হবে , যে হিন্দু বা মুসলমান স্বার্থ চালিত হয়ে স্বদেশের প্রতি ঈর্ষায় বিদেশীর আশ্রয় গ্রহণ করবে , সে কুলাঙ্গার । মাতৃভূমির কলঙ্ক । তার জীবন ঘৃণিত । এই দৃষ্টান্তে যদি বঙ্গবাসীর মনে প্রতীতি জন্মায় যে শত দোষে দোষী হলেও স্বদেশী আপনার বিদেশী চিরদিনই পর তা হলে আমাদের যুদ্ধ শ্রম রণব্যয় সফল । (১। ১০ গ)

যে কোন বিশাল কাজের জন্য চাই আত্ম বলিদান ও সংহত শক্তি ভাবনায় যুদ্ধ। পলাশীর যুদ্ধের অন্তিমে সিরাজের এই কথায় মনে পড়ছে। সিরাজ মীর মদনকে বলছেন — " যদি কখনো সুদিন হয়, যদি কখনো জন্মভূমির অনুরাগে হিন্দু মুসলমান ধর্ম বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে, পরস্পর মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হয়, উচ্চ স্বার্থে চালিত সাধারণের মঙ্গল যদি আপন মঙ্গলের সহিত বিজড়িত জ্ঞান করে, যদি ঈর্ষা, বিদ্বেষ, নীচ প্রবৃত্তি দলিত করে স্বদেশবাসীর অপমানে আপনার অপমান জ্ঞান করে, যদি সাধারণ শত্রুর প্রতি একতায় বদ্ধহস্ত হয়, এই দুর্দম ফিরিঙ্গি দমন তখন সম্ভব।" (২। ৬ গ)

নবাব সিরাজদৌল্লা নাটকে গিরিশ চন্দ্র তদানীন্তন পরিবেশকে সুন্দর ভাবে কাজে লাগিয়ে ছিলেন। যুগধর্মকে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর নাট্য ভাবনায়। তাই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন চলা কালীন সময়ে ফিরিঙ্গি বিরোধী সিরাজ সকল মানুষের মনে মধ্যেস্থান করে নিয়েছিল।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নাট্য সমালোচক সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী বলেছেন " গিরিশ চন্দ্র ঘোষ যে সিরাজকে আঁকিলেন তা এক প্রতিবাদী বিপ্লবী, রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতায় তাঁর কাছে সকলেই পরাভূত হয়েছে। চরিত্র চিত্রণে এই বিরাট পরিবর্তনের কারণ দেশের সম্পূর্ণ ভিন্ন আবহাওয়া। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কামনা স্পষ্ট রূপ নিয়েছে। স্থাপিত হয়েছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধ জনমত সৃষ্টি হয়েছে। সন্ত্রাসবাদীদের চরমবাদে তখন শাসন যন্ত্র উদ্বাস্ত। জাতীয়তাবাদের এই মহা সন্ধিক্ষনে গিরিশ চন্দ্র ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর রচিত সিরাজদৌল্লা নাটক প্রকাশ করলেন। ভারতের রাজনীতিতে তখন বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায় ও বিপিন চন্দ্র পাল দিকপাল।..... স্বদেশী কেনার জন্য আন্দোলন শুরু হয়েছে। স্বদেশী ব্যবসা স্থাপন এবং স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদনে বহু বাঙালী উৎসাহিত হয়ে

কাজ শুরু করেছেন । এই সময় দেশের মধ্যে এক জটিল অবস্থার উদ্ভব হলো । বঙ্গভঙ্গের আলোচনা শুরু হলো পুরোদমে । বাংলাকে ভাগ করে দুই প্রদেশে বিভক্ত করার প্রস্তাবে বাঙালী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল । ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে 'সিরাজদৌল্লা' প্রকাশের মাসাধিক কালের মধ্যেই বঙ্গভঙ্গের আদেশ প্রচারিত হলো অক্টোবার মাসে । এই পরিস্থিতির মধ্যে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে অভিনীত গিরিশ চন্দ্রের সিরাজদৌল্লা (২৪শে ভাদ্র , ১৩১২) রাজনৈতিক নেতার মত সুসংযত ভাষায় পরিপক্ক বুদ্ধি চেতনা ও কর্ম দক্ষতা নিয়ে দেখা দিলে আশ্চর্য্য হবার কোন কারণ নাই । এই স্বাধীনতা কামী সিরাজ বাংলার জন্য জীবন তুচ্ছ করে যুদ্ধ করবেন এটাই স্বাভাবিক । কেবল মাত্র হিন্দু মুসলমানে মিলন গ্রন্থী সৃষ্টির প্রয়াস নয় , গিরিশ - চন্দ্রের রচনায় পরাধীন বাঙালীর ক্ষোভ দুঃখ আর স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা প্রকাশিত হয়েছে । এই নাটকে সিরাজদৌল্লাকে অবলম্বন করে জাতির শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বাঙালীর আশা আকাংখাকে ভাষা দিয়েছেন । " ২৪

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অন্যতম যশস্বী নেতা সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত Bangalee পত্রিকার ১৯০৬ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় লিখলেন ,
"....both from the dramatic and the literary point of view, Siraj-ud-Dowla is destined to occupy a high an enduring place in our national literature".

গিরিশ চন্দ্র বঙ্গভঙ্গের পটভূমিকায় আরেক ঐতিহাসিক নাটক রচনা করলেন তার নাম '<u>মীর কাসিম</u>' । মীর কাসিম নাটকে গিরিশ চন্দ্রের মর্ম বানীই প্রচারিত হলো । এই নাটকে তদানীন্তন পরিবেশ তিনি নাটকের আলেখ্যে সুন্দর ভাবে চিত্রিত করেছেন । ইংরেজদের লুঠ করার প্রবৃত্তি এবং অর্থ গৃধ্নুতা , দেশের কুটির শিল্প ও শিল্পীকে নির্মম ভাবে ধ্বংস করার মানসিকতা , সাম্প্রদায়িক অনৈক্য জাতীয় চেতনার অভাব এবং তদানীন্তন কলহ ও যুদ্ধ যা সেদিন বিদেশী শক্তি ইংরাজের

আধিপত্য বিস্তারে সাহায্য করেছিল তাকে তিনি সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি এই সঙ্কটময় কালে জাতির ঐক্য চেতনা স্থাপনের উপর জোর দিয়েছেন, সর্বত্র সংগঠন সুলভ প্রক্রিয়া আরম্ভ করার মানসিকতায় দৃঢ় বিশ্বাসী হয়েছেন। ভারতবর্ষে এক দৃঢ় জাতীয়তাবাদের বনিয়াদ গড়ে তোলা ছিল তার স্বাদেশিক ভাব উৎসমুখ স্বরূপ। গিরিশ চন্দ্র অনুভব করেছেন ইংরাজের আগমনের সময় বাঙ্গলায় জাতীয় চেতনার অভাবে ইংরেজ রাজত্বের মূল বাংলা তথা ভারতে দৃঢ়বদ্ধ হয়েছিল। এই ভাবনার প্রতিধ্বনি আমরা ঐতিহাসিকের মুখ হতে শুনতে পাই ——

"It is to be remembered that the establishment of the British rule in Bengal was not really a foreign conquest that is to say, conquest of Bengal by England, but ratther the result of an internal revolution....India can hardly be said to have been conquered at all by foreignens. She has rather conquered herself'.....there was no India in the political sense. It was a mere geographical expression, and was therefore easily conquered by a foreignenjust as Italy and Germany were conquered by Napoleon. There was no national feeling in at least the greater part of India, as there was none in Germany and Itlay. Nor had India any jealousy of the foreigners, because she had no since whatever of national unity. Because there was no Indian and therefore, properly speaking no foreigner" ২৫

এই জাতীয়তাবোধের অভাব দেখেই মীর কাসিম বলছেন " যারা আমার পক্ষে প্রকাশ্যে আছে, তারাও সকলে স্বার্থের নিমিত্ত ব্যাকুল। .... হায় হায়

কি দুর্দিনই উপস্থিত হলো । কেউ একবার মনে করে না , যে বিদেশীর পদানত হয়ে চিরদিন যাপন করতে হবে , পুত্র পৌত্ররা বিদেশীর গোলাম হবে , অনুগত দীন প্রজারা অন্নাভাবে মরবে , শস্য শালিনী রত্ন প্রসূ বাঙ্গালা ছারখার হবে । ধিক ধিক — বাঙ্গালায় ধিক , বাঙালীকে ধিক , স্বার্থে ধিক , হীনতায় শত ধীক । আলী , জনাব , এ বাঙ্গালায় হিন্দু মুসলমানের ভিতর কয়জন আছে যে কায়মনো - বাক্যে ইংরাজের দাসত্ব না প্রার্থনা করে । .... ইংরাজের সামান্য বেতনের নিমিত্ত পিতা পুত্র , স্বদেশীকে হত্যা করতে সহস্র সহস্র লোক উদ্যত । অর্থ দানে কর্পদ্দক শূন্য ইংরাজকে গদীয়ান করে তাদের মুৎসুদ্দি হবার শত শত লোক প্রার্থী । ইংরাজের কেরানী পদ যদি প্রাপ্ত হতে পারে তা হলে শত শত লোক আপনাকে ধন্য বিবেচনা করে । জনাব স্বদেশ অনুরাগ , প্রভুভক্তি , কৃতজ্ঞতা যদি এ সকল অমূল্য রত্ন বাঙ্গালায় থাকতো , তা হলে কি সামান্য রত্নের প্রার্থী হয়ে বিদেশী বণিকের পদ লেহনে প্রবৃত্ত হয় । " (দ্বিতীয় অঙ্ক । ৩ গর্ভাঙ্গ)

' মীর কাসিম ' এর মধ্য দিয়ে গিরিশ চন্দ্র জাতিকে শিখালেন দেশের তরে প্রাণ বলিদান দিতে । গিরিশ চন্দ্রের নাট্য রচনার কাল ছিল বিপ্লবী আন্দোলন । বিপ্লবী আন্দোলন তখন দানা বেঁধে উঠেছে । স্বাধীনতা কামী এই বিপ্লবী দের ধারণাই ছিল জাতীয় সরোবরে স্বাধীনতারূপী স্বর্ণ কমল প্রস্ফুটিত করতে চাইলে সেখানে রক্ত ঢালতেই হবে । মীরকাসিমের কিছু চরিত্রের মধ্যে দিয়ে এই ধরণের সঙ্কল্প ফুটে উঠেছে । এই রূপ চরিত্র তকী খাঁ ও তারা । তাদের মুখ দিয়ে ধ্বনিত হয়েছে সেই ভাবনার সঙ্কল্প ।

" তারা । বাবা দেখছো , সোনার রাজশাহী দেখছো । সকলি গেল — সকলি গেল । দোকানি , দোকান বন্ধ করে চলে গিয়েছে — ধনী পাগল হয়ে ধুলো ঘাঁটিকাচ্ছে — বালক ক্ষুধায় কাতর হয়ে কাঁদছে — অন্নাভাবে গৃহিনী র চক্ষে শতধারা । দেখ দেখ , আরো দেখ , কবে রাজ্য মরুভূমি হয় দেখো । সোনার বাঙ্গালায় তৃণ থাকবে না । গেল সকলি গেল ।

তকী। মা, তুই তো কেঁদে বেড়াস, কিছু উপায় আছে কি?

তারা। উপায় নাই? এমন কথা বলো না। আত্ম বিসর্জন দিয়ে স্বদেশীর দু:খে দু:খিত হও, হও, নিজ স্বার্থ ত্যাগ করে, স্বদেশীর স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি করো, ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য করো, ধর্মের প্রতি লক্ষ্য করো, জন্মভূমির প্রতি লক্ষ্য করো, উপায় নাই? উপায় আছে করো।

তকী। মা, তুমি শিখিয়ে দাও।

তারা। শুনছো না — শুনছো না? মা তৃষ্ণায় হাহাকার করছে, মার তৃষ্ণা নিবারণ করো। সামান্য বারি পানে সে তৃষ্ণা দূর হবে না — শোনিত পিপাসা — বক্ষের শোনিত দান করো। মা মা মা, আমার বক্ষের শোনিতে কি তুই তৃপ্ত হবি নে — নে মা নে আর যে আমার সয় না। আমি যে তোর দাসী, আমি যে তোর কন্যা, আমার প্রতি সদয়া হও মা। নাও মা নাও আমার বক্ষের শোনিত নাও। সন্তানের প্রতি চাও। বড় অভাগা বড় অভাগা।

তকী। মায়ি, আমি তোর ছেলে, আমায় শোনিত দিতে শেখা না, কি কাজে বুকের শোনিত দেব বলে দে।

তারা। বাবা, ভাইদের ধর্ম শিক্ষা দাও, বাঙালার কৃতঘ্নতা দূর করো, বাঙালার সেবায় নিযুক্ত হও। প্রেমে সকলকে বশীভূত করো — স্বদেশ প্রেম — স্বদেশ প্রেম — সেই প্রেমে বক্ষের শোনিত দানে প্রস্তুত হও — আর তো কিছু শিক্ষা নাই।

(১। ৪ গর্ভাঙ্ক)

তারার মুখ নি:সৃত বানী মীর কাসিমকে জাগ্রত করেছে। যেন ইংরেজদের আগমনে তারা উদাসিনী নয় এক জাতীয়তাবাদী নারীর ভূমিকা গ্রহণ করে চারণ কবির মতো জাতীয় চেতনার অভিব্যক্তিতে সবাইকে উদ্দীপ্ত করছে। তারা মীর কাসিমের প্রতি বলছেন " আমার দুখিনী জন্মভূমি মুমূর্ষু। তার আর্তনাদ আমার মৃত কর্ণেও প্রবেশ করে, মৃত চক্ষে তার পুত্রের দুর্দশা দেখতে পাই, কিন্তু কি করবো —

আমি মৃত । বাবা তুমি বঙ্গবাসী , বীর পুরুষ , উচ্চ বংশোদ্ভব , মুমূর্ষু বঙ্গমাতাকে পুনর্জ্জীবিত করো ।

কাসিম । মা , আমায় এ সব কথা কেন বলছেন ? আমি বঙ্গভূমির দুঃখ কি রূপে নিবারণ করবো ।

তারা । তবে কে করবে ? তুমি স্বদেশ বৎসল , তোমারই কার্য্য , এ কার্য্য আর কার ? যে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত , মাতৃসেবা যার ব্রত যে মাতৃ বৎসল — তারই কার্য্য— বীরের কার্য্য — তুমি বীর — তোমারই কার্য্য । (১। ২ গর্ভাঙ্ক)

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এসেছিল স্বদেশী আন্দোলন । দেশ নেতাদের তখন স্বদেশী শিল্প স্থাপনের এক পবিত্র সংকল্প হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়েছিল । কিছু দেশী বনিক তারা ইংরাজদের বানিজ্য বিস্তারে সাহায্য করেছিল । গিরিশ চন্দ্র নাট্যকার রূপে সেই যন্ত্রনা প্রশমিত করতে পারেন নি । তারার মুখ দিয়ে বেদনার অভিব্যক্তি প্রকাশ করে স্বদেশী শিল্পের প্রতি আবাহনের সরল মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন । " আপনার মাতৃভূমিকে মরুভূমি কচ্ছ । নিজে অর্থ দিয়ে অর্থহীন সাহেবের মুৎসুদ্দি হয়ে প্রজার শোনিত শোষণ করছ । যে কার্য্যে দেশী লোকের কিছুমাত্র লাভ আছে সেই কার্য্যে বিদেশীকে প্রবৃত্ত কচ্ছ । .... যদি স্বদেশীর প্রতি তিলমাত্র তোমাদের মমতা থাকতো , তা হলে বিদেশী বানিজ্য বিস্তারে সহায়তা করে , স্বদেশী বণিকের উচ্ছেদ করতে না । (২। ২ গর্ভাঙ্ক)

স্বদেশী আন্দোলনের পথ ধরে এসেছিল বিপ্লববাদ । বিপ্লবী আন্দোলনের যুগে মৃত্যু পাগল দামাল ছেলেগুলো হাসিমুখে ফাঁসিকাঠে প্রাণ বিসর্জন দিতেন । দেশহিতে মৃত্যু যে গৌরবময় । সাহসী সন্তানরাই জীবনকে বলিদান দিতে পারে এই ভাবনার অংশীদার ছিলেন নাট্যকার গিরিশচন্দ্র । তকী খাঁ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিল । উদাসিনী তারা তখন তার পাশে , তকী খাঁ সেই সময় বলছেন " মা এসেছ , দেখ মা তোমার আদেশ মত রণক্ষেত্রে বক্ষের শোণিত দান করেছি । তোমার আদেশ মত বঙ্গবাসীর দুঃখ মোচনের চেষ্টা পেয়েছি, মৃত্তিকার দেহ উচ্চ কার্য্যভার গ্রহণে অক্ষম । এক মিনতি আমার এই শোণিত সিক্ত পাগড়ী যদি পারেন বেগম মাতাকে দেবেন ।

তারা । যাও যাও , বীর লোকে গমন করো । যাও যাও মাতৃ বৎসল , স্বদেশ বৎসল , ভ্রাতৃ বৎসল যেথায় বাস করে তথায় গমন করো । যাও যাও কীর্তিপুরে গমন করো , যথায় আত্মত্যাগী সুপুত্র ভীমসিংহ , গোরা, বাদল , হামির বাস করে, যথায় বীর কেশরী রাণা প্রতাপ , শিবাজী , গুরু গোবিন্দ উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত তথায় গমন করো । ঐ দেখ মীর মদন , মোহন লাল তোমার প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান ।
(৩। ১২ গর্ভাঙ্ক)

সমগ্র ভারতবর্ষের বীর সন্তানরা ধর্মের কাজে , স্বদেশ রক্ষার কার্য্যে বা স্বাধীনতার জন্য সমরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন তাদের স্মরণ করার মধ্যে এক মহীয়ান ভাবনা লুকানো ছিল । বিপ্লববাদের যুগে বিপ্লবীদের জীবন প্রেরণার উৎস ছিল এই সব প্রাচীন বীরেরা । তাদের মধ্যে এই বীর পূজার অভিব্যক্তি ঘটলে এরাও দেশের তরে প্রাণ বলিদান দিতে কুণ্ঠা বোধ করবে না । বেঁচে থাকলে স্বাধীনতা মৃত্যু হলে স্বর্গ লাভ এই বীর ব্রতের ধার্মিক মনোভাবে গিরিশ চন্দ্র আচ্ছন্ন ছিলেন । তারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই তারার বানীর মধ্যে ।

উদাসিনী তারা স্বাদেশিকতার চারণী , নাট্যকারের অভিব্যক্তির প্রকাশের উৎস স্রোতা স্রোতস্বিনী , তারার মুখনিঃসৃত বানী যেন বর্তমান স্বদেশী আন্দোলনের অংশ গ্রহণকারী প্রজন্ম শেষ বার্তাটুকু শুনিয়ে দিয়ে যাচ্ছে , " মীরকাসিম , তুমি স্বদেশ বৎসল , বঙ্গমাতা অতি কঠিন জননী , তার শোণিত পিপাসা প্রবল , সামান্য শোণিতে তাঁর তৃপ্তি নাই , স্বদেশভক্ত , স্বদেশ বৎসল , স্বদেশ প্রিয় , স্বার্থশূন্য হৃদয়ের শোণিত পানে পিপাসা । সে পিপাসা তৃপ্ত না হলে বঙ্গভূমি প্রসন্না হবেন না । যুদ্ধে অগ্রসর হও , বক্ষের শোণিত দান করো — তোমার ন্যায় স্বদেশ বৎসল সকলে একত্রে মিলে শোণিত দান করো । কঠিন ব্রত — বক্ষের শোণিত দান ব্রত — নচেৎ এই মহা ব্রত উদযাপন হবে না । .... (৪। ১ গর্ভাঙ্ক) । তারার আহ্বান মিথ্যে যায়নি , মীর কাসিম তো জীবন যুদ্ধে ঝাঁপ দিয়েছিলেন । এ ছাড়া বহু শত শত বীর আত্মত্যাগ করেছিল ।

'মীর কাসিম' বাংলার রঙ্গমঞ্চে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করে। এইজন্য বৃটিশ সরকার এই নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দেন ও নাটকটি বাজেয়াপ্ত করে। মীর কাসিম এক জাতীয়তাবাদী নাটক। এই নাটকে যে জাতীয়তাবাদের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে সেই জাতীয়তা বঙ্গভঙ্গ জনিত কারণে উদ্বুদ্ধ। ১৯০৬ সালে ২৩শে জুন 'Bengalee' পত্রিকায় মীর কাসিমের প্রশংসা ধ্বনি শোনা যায়।

"Babu Girish Chandra Ghose's new historical drama 'Mir Kaseem', which was put on the boards of the Minerva theatre for the first time on Saturday last, has been a phenomental success, both from the histrioric and literary points of view. The tumultous period that followed the accession of Mir Masim to the throne, the strenuous fight that the ruler had with the East India Company for the protection of the indigenous industries and the various stratageems resorted to by both sides to win their points, have with remarkable fidelty and consummate art been portrayed by Bengal's greater playwright. The place abounds with diverse and complex characters, all of them very skill fully marshalled to produce an excellent stage effect, which one must see to fully realise".

'বসুমতী' পত্রিকা মন্তব্য করল "ইতিহাসে পাঠ করিয়াছি মীর কাসিম প্রজা হিতৈষী নরপতি ছিলেন, ইংরাজ বনিকের কর্মচারীর হস্তের ক্রীড়া পুত্তলিকা হইয়া তিনি নবাবী করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, তাই তিনি ইংরাজের সঙ্গে লড়িয়াছিলেন, হটিয়া ছিলেন ও শেষে সর্বস্ব বঞ্চিত হইয়া নিরাশ্রয় অনাথের ন্যায় মরিয়া ছিলেন।

এই কঙ্কাল টুকু অবলম্বন করিয়া এমন একখানি বিচিত্র ও বিপুল নাটক গিরিশ চন্দ্র ভিন্ন অন্য কেহ রচনা করিতে পারিবেন কি না জানি না। ২৬ Statesman পত্রিকাও মীর কাসিমের সফলতায় লিখলেন "The exceedingly lavish manner in which'Mir Kaseem'has been staged at the Kohinoor theatre assets materially in enhancing the enjoyment of this place, which deals with the incidents of the tumuluous period that followed the accession of Mir Kaseem to the throne and the strenuous fight that the ruler had with the East India Company for the protection of indigenous industries. The acting allround reaches high watermark of excellence and the huge audience testified their appreciation in a most remarkable manner". ২৭

গিরিশ চন্দ্রের স্বাদেশিকতা নাট্য মঞ্চের প্রবাহে কত সার্থক হয়েছিল তার বিবরণ দিয়েছেন হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত "Hey (Sirajdoulla & Mir Kasim) changed the mentality of the people who for the first saw before our eyes'What history of Bengal is now and uptil now we had simply committed to memory incorrect things that have been put to our mouths as a parrots".

তাই বোধহয় বর্দ্ধমানের আবুল কাসেম গিরিশচন্দ্রকে বলেছিলেন " মহাশয়, আপনার সিরাজদ্দৌলা ও মীর কাসিম দেখলে আর সভায় গিয়ে বক্তৃতা করতে হয় না।" ২৯

গিরিশ চন্দ্র ঐতিহাসিক নাটকের সমাপ্তি টানলেন ' ছত্রপতি শিবাজী ' রচনা করে । গিরিশ চন্দ্রের নাট্য রচনার পিছনে ছিল শিবাজী উৎসবের প্রেরণা । মহারাষ্ট্রে তিলক ১৮৯৫ সালে শিবাজী উৎসবের সূচনা করেন । কংগ্রেসের চরম পন্থী নেতৃবৃন্দ বুঝেছিলেন জাতিকে পরাধীনতার গ্লানি হতে মুক্ত করতে এমন বীরের প্রয়োজন যাকে নিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটানো যায় । তাই নরম পন্থী কংগ্রেসের পক্ষে তীব্র আন্দোলন ও বৃটিশ বিরোধী বিপ্লববাদ গঠন করা সম্ভব ছিল না । অমলেশ ত্রিপাঠী বলছেন " এডমন্ড বার্কের রাজনৈতিক দর্শন ও পার্লামেন্টারী মডেলের প্রতি আনুগত্যে এবং ইংরাজের ন্যায় নিষ্ঠার অন্ধ বিশ্বাসে প্রতিফলিত নরম পন্থীর শিক্ষা ও বৃত্তির স্বভাব তাঁদের শ্রেনী স্বার্থ । তাঁদের আদর্শ উঠে এসেছিল ইংলন্ড , আমেরিকা , ইতালীর ইতিহাসের পাতা থেকে পিম , হ্যামপডেন , ম্যাৎসিনী রূপে । কিন্তু যে ম্যাৎসিনি কার্বো নারীর প্রেরণা সুরেন্দ্রনাথ তাঁর পক্ষ শাওন করেছিলেন । ' নতুন দল ' এ সব মডেল বিজাতীয় , তাই বর্জনীয় মনে করলেন । তাঁরা বেছে ছিলেন স্বদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে শ্রী কৃষ্ণ যাঁর লক্ষ্য এক ধর্ম রাজ্য পাশে খন্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে বেঁধে মহাভারত সৃষ্টি । আর সে লক্ষ ভেদের জন্য হিংসা অহিংসা সৎ অসৎ উপায় ভেদ যিনি করেন নি । এখানেই চরম পন্থীদের নিজস্ব গীতা ভাষ্যের তাৎপর্য্য নিহিত । আত্মীয় বধ তাতে সমর্থনীয় আর যুদ্ধে জীবন দান স্বর্গ প্রাপ্তির সোপান । ইতিহাস থেকে তাঁরা বেছে নিলেন শিবাজীকে । তিলক প্রবর্তিত শিবাজী উৎসব শুধু মহারাষ্ট্র নয় সমগ্র ভারতকে অনুপ্রাণিত করল । " ৩০

মহারাষ্ট্রে শিবাজী উৎসব প্রচন্ড সাড়া জাগালো । মহারাষ্ট্রের ঢেউ এসে লাগালো বাংলা দেশে । ১৯০২ সালে পালিত হলো শিবাজী উৎসব । তারপর শিবাজী উৎসব বার্ষিক অনুষ্ঠানে পরিণত হলো । বঙ্গ দর্শনে এই প্রসঙ্গে বলা হলো " আমাদের আজকালকার ভাব ও ভাষায় শিবাজীর এই উদ্দীপনা ও প্রেরণাকে ব্যক্ত করিতে গেলে আমরা ইহাকে জাতীয় শক্তি নামে হয়ত অভিহিত করব । যখন যে দেশে যে কোন ব্যক্তি স্বদেশ ও স্বজাতির উদ্ধার সাধনে বদ্ধ পরিকর হন , তখনই

তাদের মধ্যে এই শক্তি কার্য্য করিয়া থাকে । এই জাতীয় মহাশক্তি , এই Spirit of the race' এর দ্বারা অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ না হইলে কেহ কদাপি স্বদেশের জন্য সত্যভাবে আত্মোৎসর্গ করিতে পারে না । " ৩১ বাংলা দেশে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে যে ভবানী পূজা শুরু হয়েছিল , তাতে মহাশক্তি দেশমাতৃকার আরাধনাই ঘটে । কারণ চরম পন্থী রাজনৈতিক নেতারা স্বদেশী আন্দোলনকে অধ্যায় বিপ্লব বলে অভিহিত করেছিলেন । যে অলৌকিক শক্তি পূজা করে শিবাজী খন্ড বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ততার মধ্যে জাতীয়তার এক মহান ঐক্য সৃষ্টি করেছিলেন , সেকালের জাতীয়তাবাদী নেতারা তাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে ব্রতী হয়েছিলেন ' শিবাজী উৎসব ও ভবানী পূজার ' মধ্যে প্রধানত শিবাজী উৎসব ছিল শূর ধর্ম ও আদর্শের উপাসনা ।

শিবাজী উৎসব সম্পর্কে বিপিন চন্দ্র পাল বলছেন ....."The strength and inspiration of which we sadly need at present day for the recontruction of our new national life. It is for this reason that we regard the Sivaji celebrations as a sacrament of the new civic life in India and willing do lend our most cordial support......The movement of Sivaji, though outwardly a politica movement, was inwardly profoundly spiritual. ৩২

বাংলা শিবাজী উৎসবকে প্রাণের আবেগে গ্রহণ করল । বাংলা চিরদিনই বিপ্লবী সাধনার তীর্থ ক্ষেত্র । ক্ষাত্রধর্ম বা শূর ধর্মের সাধনাই বাংলা চিরদিনই আগ্রহী । তাই বাংলার মাটিকে শিবাজী উৎসব উদ্দীপ্ত করে তুলল । রবীন্দ্র নাথ শিবাজী উৎসব সম্পর্কে কবিতা রচনা করে বললেন ' মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালী , এক কন্ঠে বলো জয়তু শিবাজী । মারাঠির সাথে আজে হে বাঙালি এক সঙ্গে চলো মহোৎসবে সাজি । '

গিরিশ চন্দ্রও বাংলার স্বাদেশিকতার জোয়ারে প্লাবিত হয়ে রচনা করলেন ছত্রপতি শিবাজী। ১৩১৪ সালে ৩১শে শ্রাবণ মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হলো। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলো ভাদ্র, ১৩১৪ সালে। গিরিশ চন্দ্র বিশ্বাস করতেন মাতৃপূজা ও শক্তিসাধনায় দেশ তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। ভারতের স্বাধীনতা আনার জন্য আধ্যাত্মিকতার চেতনা সম্পন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রয়োজনের কথা স্বীকার করতেন গিরিশ চন্দ্র। স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমের মতো গিরিশ চন্দ্র স্বীকার করতেন দেশ মাতৃকার ঋন শোধ করার জন্য দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে মাতৃ আরাধনার একান্ত প্রয়োজন। তাই ভবানী দেবীকে তিনি বিবেকানন্দের দেশ মাতৃকা ও বঙ্কিমের দশ প্রহরণ ধারিণী বলে মনে করতেন। তাই শিবাজীর মধ্যে গিরিশচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন "It can rise from beneath the seemingly crashing load of continued political bondage". ৩৩

থিয়েটারে অভিনীত হওয়ার পূর্বে বিজ্ঞাপন পত্রে বলা হলো "Sivaji is a name to conjure with and his spirit still lives amongst as and is sure to guide ~~w~~ us to our salvation in our days of woe and distres". ৩৪

শিবাজীর আদর্শ ছিল স্বাধীন দেশ। স্বাধীন জাতি, বিদেশী গোলামীকে মেনে নেওয়া এটা জাতীয় অভিশাপ। 'ছত্রপতি শিবাজী' তে গিরিশ চন্দ্র সেই আদর্শের কথা ব্যক্ত করেছেন, শিবাজী বলছেন " তারা জন্মভূমির দুঃখে কাতর, তারা ধর্ম রক্ষার জন্য কাতর, বিধর্মীর অধীনতায় অসহিষ্ণু তারা প্রাণের মমতা শূন্য। যদি মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার উদ্যম, মনুষ্য জীবনে কর্তব্য হয়, সেই কর্তব্য সাধনের সুযোগ সম্পূর্ণ উপস্থিত। .... এই অবস্থায় যদি আত্মোন্নতি সাধন করতে না পারি, তা হলে আর সহস্র বৎসরে উন্নতির আশা থাকবে না। স্বাধীনতা অর্জন কিংবা জীবন বিসর্জন এই আমার সঙ্কল্প।" (১।১ গ)

দাদাজী কোন্ডদেব ছিলেন শিবাজীর বাল্যগুরু । জীবনাদর্শ তিনি দিয়েছেন । বাংলার দামাল ছেলেরা চরম পন্থী নেতাদের জীবনে আদর্শ গুরুর স্থান দিয়েছিল । গিরিশ চন্দ্র এই সময় বিপ্লবীদের মুখ নিসৃত বানীর প্রতিধ্বনি শিবাজীর মুখে শোনা গেল , " তোমার শিক্ষায় আমার চরিত্র গঠিত , তোমার শিক্ষায় আমার চক্ষু উন্মীলিত , জন্মভূমির হীনাবস্থা তোমার শিক্ষায় আমার হৃদয় অঙ্কিত , তোমার শিক্ষায় আমি স্বাধীনতা প্রিয় , তোমার শিক্ষায় আমি জন্মভূমির উদ্ধারে কৃত সঙ্কল্প । তোমার আশীর্বাদে কৃতকার্য্য হবো নিশ্চয় । বিপদ সাগরে ঝম্প প্রদান করেছি সে তোমারই আদেশে । মা ভবানী আমার কাণ্ডারী , নির্বিঘ্নে কূলে নিয়ে যাবেন সন্দেহ নাই । " (১। ১ গ)

শিবাজী বলছেন , " তারা স্বদেশী আমাদের ন্যায় পর পীড়িত । .. যদি তারা একবার বুঝতে পারেন যে মহারাষ্ট্র একত্র হলে ভারত বিজয় করবে , যদি তাঁদের হৃদয়ে ধারণা হয় যে পরাপর স্বার্থ পরিত্যাগ করে একতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হলে মহারাষ্ট্রে আর্য্য ধর্ম পুনঃ সংস্থাপিত হবে .... তা হলে আমাদের ন্যায় তারাও মাতৃভূমির কার্য্যে প্রাণপন করবে নিশ্চয় । এই মহাকার্য্য সাধন করা , এই একতা সংস্থাপন করা আমাদের উপস্থিত কার্য্য । আমরা অস্ত্র চালনে অক্ষম নই । তা আমরা বারবার প্রমাণ করেছি । কিন্তু আমরা যে ভ্রাতৃবৎসল , এই মহারাষ্ট্র প্রদেশে হীন ব্যক্তিও যে আমাদের সহোদরের ন্যায় প্রিয় , আমরা যে পরস্পর বিদ্বেষশূন্য জগতে তা প্রচার করবো । " ১। ১ গ)

শিবাজীর জীবন ছিল মাতৃ সাধনায় রত । জাতীয়তাবাদের সাথে মাতৃ সাধনার এই ওত প্রোত জড়িত অধ্যাত্মবাদ নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরতে চেয়েছেন গিরিশ চন্দ্র । রামদাস স্বামী বলছেন " দেবীর উগ্র শরীর দৃষ্টি ব্যতীত নিদ্রিত হিন্দুর হৃদয় জাগ্রত হবে না , ধর্ম হীন জীবনে ধর্ম সঞ্চার হবে না , হীন প্রাণে মাহাত্ম্য

উদয় হবে না । .... এখন হতে যে ব্যক্তির শরীরে এক বিন্দু হিন্দু শোণিত প্রবাহিত , অতি হীন হলেও সে ব্যক্তি উত্তেজিত হবে এ অসম্ভব নয় -- শুত -- হিন্দু স্বাধীনতার ভিত্তি । অত্যাচার চরম সীমায় না উপস্থিত হলে পরাধীন দেশে পরাধীন জাতি নব জীবন প্রাপ্ত হয় না । (১ । ৬ গ)

জীজাবাই শিবাজীকে অনুপ্রাণিত করতেন মাতৃ সাধনায় । দেশমাতা যে সন্তানের একমাত্র আরাধ্য বস্তু । দেশ সন্তান যেমন আনন্দ মঠে এটিব্যক্তি প্রকাশ করে বলেছেন যে তাদের মা নেই বাবা নেই ভাই নেই বন্ধু নেই ঘর নেই সংসার নেই আছে একমাত্র দেশ জননী । জিজাবাই নিজের পুত্রকে মাতৃধর্মে দীক্ষার কথা শুনিয়ে পুনরায় তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন , " তোমায় বাবা বলেছি , তুমি ভবানীর পুত্র , ভবানীর কার্যে অবতীর্ণ হয়েছ , পুন্য তুমি উদ্ধারের জন্য তোমার জন্ম , সনাতন ধর্ম সংস্থাপন তোমার একমাত্র ধর্ম -- মহারাষ্ট্র স্বাধীনতার ধ্বজা ধারণ করবার জন্য তোমার বীর বাহু । শত্রুকে কম্পিত করবার জন্য তোমার তরবারি । তুমি ভবানীর পুত্র , আমার পুত্র নও । আমি ভবানীর দাসী । আমার গর্ভে তোমায় স্থান দিয়েছেন , এই আমার শ্লাঘা । তোমার কর্তব্য তুমি স্থির করো , ... ভবানী কার্যে যে দুষ্কর ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় , সেই কার্যে , অবিচলিত চিত্তে অগ্রসর হও । তোমার কার্য ভবানীর কার্য , তোমার মাতা নাই , পিতা নাই , ভাই নাই , বন্ধু নাই -- যে ভবানীর কার্যে অগ্রসর সেই তোমার পিতা , সেই তোমার মাতা , সেই তোমার ভ্রাতা , সেই তোমার বন্ধু । " (১ । ২ গ)

শত শত বৎসরের অত্যাচারে দেশ শোষিত । মোঘল অত্যাচারে যে শোষণের চিত্র দেখে শিবাজী কাতর সেই শোষণের চিত্র যা ইংরেজরা দীর্ঘকাল ধরে সৃষ্টি করেছে তা দেখে গিরিশচন্দ্র কাতর । তিনি ভারতবর্ষের অবস্থার যে চিত্র অঙ্কিত করেছেন তাতে স্বাধীনতা কামী মানুষের দল সম্যক ভাবে উপলব্ধি করতে পারবে ।

শিবাজী তাঁর মাতুলকে বলছেন , " মামাজি , ... মহারাষ্ট্র আপনার জন্মভূমি ! একবার নয়ন উন্মিলন করে জন্মভূমির অবস্থা দেখুন , দেবভূমি – আর্য্য ভূমি বিধর্মী পীড়িত । যে গো দুগ্ধে অসহায় বাল্য অবস্থায় শরীর পুষ্ট হয় , আপনার মাতৃভূমি সেই গো হত্যা নিত্য উদাস ভাবে আর কতদিন সহ্য করবেন ? কতদিন আর স্বজাতির দুর্গতি দেখবেন ? কতদিন লোক নিন্দা শুনবেন – কতদিন ধর্মের গ্লানি , প্রতিমা ভগ্ন উপেক্ষা করবেন ? কতদিন দীন হীন মহারাষ্ট্র সন্তানের পর পীড়ন দর্শন করে নিশ্চিন্ত হয়ে আহার করবেন ? দেশে অন্ন নাই , বস্ত্র নাই , ধর্ম্ম নাই , কর্ম্ম নাই , সকলই শেষ হল । .... জগতে এমন হীন পশু নাই যে শৃঙ্খলাবদ্ধ হলে মস্তক সঞ্চালন না করে । কেবল কি আমরা বিনা চেষ্টায় সেই বন্ধনে স্থির থাকবো ? পড় পীড়ন সহ্য করবো ? না আমরা আর্য্য সন্তান , আমরা হীন নই , আর্য্য কীর্তি স্মরণ করে আর্য্য সন্তান বীর দর্পে উত্থিত হোন , শৃঙ্খল ছেদন করুন – মাতৃ ঋণ শোধ করুন , – মাতার দাসীত্ব মোচন করুন । "

(১। ৩ গ)

স্বদেশী আন্দোলনে নারী জাগরণের প্রয়োজন ছিল । অতীতের ইতিহাসে নারী দেশ রক্ষায় বা যুদ্ধ যাত্রায় পিছিয়ে থাকেনি । গিরিশ চন্দ্রের ভাবনা ছিল নারী জাগরণের । তাই শিবাজীর সাথে সই বাই এর কথোপকথনে গিরিশচন্দ্র সেই উদ্দীপনা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন । সই বাই শিবাজীর দিল্লীর যাত্রার পূর্বে বলছেন , " জননী জন্মভূমি প্রসন্না হও । মাগো তোমার কার্য্যে স্বামী পুত্রকে কাল সর্প বিবরে বিদায় দান করছি –জননী প্রসন্না হও । মাগো বর প্রদান করো – হৃদয় ভক্তিপূর্ণ করো – মাগো তোমার কৃপায় যেন ভারত রমণীর কর্তব্য নিষ্ঠা উদ্দীপ্ত হয় । কর্তব্য যেন ভারত রমণীর একমাত্র উদ্দেশ্য হয় । যেন ভারত রমণী বীরাঙ্গনা বীর পুত্র প্রসবিনী হয় – যেন পরাধীনতা অপেক্ষা ভারত রমণীর মৃত্যু শ্রেয় জ্ঞান হয় – যেন পুত্রকে স্তন্য দুগ্ধের সহিত স্বদেশভক্তি প্রদান করতে সক্ষম হয় – যেন

উপদেশ দানে পুত্রকে দৃঢ়ব্রত করতে সক্ষম হয় — মাতো কর্তব্য নিষ্ঠা যেন ভারতের একমাত্র জীবনের সার হয় — মুক্তি অপেক্ষা যেন কর্তব্য সাধন ভারতের প্রিয় হয় — যেন ভারত মহিলার উপদেশে ভারত ভূমি আবার বীর ভূমি বলে জগতে গৌরবান্বিত হয়। " (৩। ২ গর্ভাঙ্ক)

পরাধীন ভারতবর্ষে ভারতবাসীর অন্তরে দেশ প্রেমের অঙ্কুর উদগম হতে দেরী হয়েছিল। সর্বত্র বিরাজ করত এক ইংরাজ ভীতি। জাতীয় চেতনার অস্তিত্ব সর্ববাপী হয় নি। R.C.Majumder বলেছেন, 'So long as there was no conception of India, there could not have been any struggle for attaining it. But in reality, the case was perhaps worse. For even among the smaller political units into which India was divided, therewas not the same urge for freedom from British yoke ......Indeed freedom was not only not thought of, it was not even desired". ৬৫

গিরিশচন্দ্রের এই অবস্থার প্রতি সম্যক ধারণা ছিল। তাই নাট্যকার রূপে তিনি ভারত জাগরণের মর্মবানী শিবাজীর মুখ নিঃসৃত বক্তব্যের মধ্যে রূপায়িত করলেন। " শিবাজী, ভাই, আক্ষেপের সময় নাই। আক্ষেপে অত্যাচার নিবারণ হবে না। হিন্দুরা মোহমুগ্ধ, তাই এই দুর্দশা, এ সকল আমাদের হীন সহিষ্ণুতার ফল। যদি মস্তক অবনত করে এতদিন না বিজাতির পীড়ন সহ্য করতেম — যদি আঘাতের পরিবর্তে আঘাত দান করতে শিক্ষা লাভ করতেম — যদি আপনাকে মনুষ্য বলে আত্ম সম্মান করতেম — যদি স্বজাতি, স্বধর্ম, স্বদেশের প্রতি অনুরাগী হতেম — যদি বিদেশী শৃঙ্খল ঘৃণা করতেম — যদি অদৃষ্টের উপর

নির্ভর না করে মনুষ্যত্বের উপর নির্ভর করতেন , যে যুদ্ধ মৃত্যু তীর্থ মৃত্যু অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেয় , সহস্র যাগ যজ্ঞ অপেক্ষা জন্মভূমির কার্য্য উচ্চ — যদি স্বদেশানুরাগ , স্বজাতি প্রেম মনুষ্যত্বের একমাত্র পরিচয় , এই সকল উচ্চ ধারণা হৃদয়ে স্থান দিতেন , তা হলে আজ আমাদের এই দুর্দশা কদাচ হতো না , — তা হলে আমাদের নিরীহ , নির্বিরোধী , নিরস্ত্র শত শত স্বজাতির হত্যাকান্ড দর্শন করতে হতো না — তা হলে দেবস্থান কলুষিত দেখতেন না , দেবী অঙ্গ ছিন্ন দেখতেন না । এ সকল মহা পাপের ফল — জড়তা মহাপাপ , সেই মহা পাপের ফল । এসো সকলে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করি , — লুপ্ত ধর্ম উদ্ধার করি , মাতৃ ভূমির পর শৃঙ্খল মোচন করি , একতায় পরস্পর আলিঙ্গন করি , মনুষ্য বলে সমাজে পরিচয় দিই , বীর বীর্য্যে তরবারি ধারণ করি । এসো , শত্রু নিপাতে কৃত সঙ্কল্প হই । "

(১ । ৭ গ)

শিবাজীর এই বক্তব্য যেন স্বদেশী আন্দোলনের যুগে কোন রাজনৈতিক নেতার আত্ম সমীক্ষা ও জাতিকে চৈতন্যের পথে নিয়ে আসার সঙ্কল্প ।

শিবাজীর জীবন ন্যায়ধর্ম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কাহিনীতে দীপ্ত । শিবাজী কোনদিন মুসলিম ধর্ম বিদ্বেষী ছিলেন না । ' শিবাজী উৎসবের মধ্যে তদানীন্তন জাতীয় নেতারা কোন সাম্প্রদায়িক অভিব্যক্তির প্রকাশ দেখেন নি ।' শিবাজী উৎসব ' সম্পর্কে তিলক বলছেন 'Unfortunately we had no political festival to keep up the memory of our heroes except the National Congress. This is the reason why the Sivaji festival was started in Maharashtra with the hope that it will spread all over India without distinction of caste and creed. There is no reason to object to the festival because Sivaji was a Marahatta. If Sivaji was Marahatta it was because he was born at Poona. If you look at the ethnology you will find Sivaji belonged to the same stock as the Rajputs. You may call him a Rajput if you like, and you may call him a

Bengalee if you like.........some objected to it because they were Mohamedans. That objection no longer exists, Sivaji did not fight against the Mohamedans but against the tyrannical power that existed at that time.....That is the true spirit in which you must read the life of Sivaji and if not read the life of Sivaji in the proper spirit I can assure you that you are sure do deive an inspiration as sentiment in life which will serve you in these days". ৬৬

১৯০৬ এর শিবাজী উৎসবের সভাপতিত্ব করতে গিয়ে যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে বলেন "The object of these Sivaji festivals is to awaken in as a feeling of respect for the noble, for the disinterested and for the self saceificing life of Sivaji. The other object of the festival is the union of the Bengalees with the Maharathas......we are one nation, although we are going to admire every mohomedan hero & Hindu hero. No one in this auidence thinks now that we are two nations. We are one nation - Hindus & Mohomedans- and we must embrace each other as brothers". ৬৭

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের প্রয়োজন ছিল। এই ঐক্য শিবাজীর উক্তিতে গিরিশ চন্দ্র তুলে ধরলেন সমাজের কাছে।

" শিবাজী। ... হে মুসলমান বীর, আজ হতে তোমরা আমার সৈন্য দল ভুক্ত। প্রজা আমার পুত্রের ন্যায় প্রিয়। তোমাদের যখন আমার প্রজা হবার বাসনা, তোমরাও জনে জনে আমার পুত্রের ন্যায় আদরণীয়। তোমাদের বাহু বলে অনেক শত্রু পরাজিত হবে এই আমার প্রত্যাশা। আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি জাতির স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র ধারণ করেছি। তোমরাও সেই স্বাধীনতার অধিকারী। স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র ধারণ করে জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করবে সন্দেহ নাই। আমার সম্পর্কে ধারণা, প্রজাপীড়ক ওমরাও চালিত বিজাপুর দরবার, তোমাদের স্বাধীনতা অপহরণ করেছে। আজ হতে তোমরা স্বাধীন — মহারাষ্ট্র প্রদেশ স্বাধীন। সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে জাতিভেদ কখনই হবে না। জাতিভেদ বুদ্ধি শত্রুর বাহু বলবান করে। জাতি বিরোধে শত্রুর পদানত হওয়া অনিবার্য। স্বাধীন মহারাষ্ট্র প্রদেশে ধর্ম প্রভেদ বা জাতি প্রভেদে পরস্পর বিরোধের সম্ভাবনা নাই। স্বাধীনতা প্রিয় মনুষ্য মাত্রই এক জাতীয়। স্বাধীনতায় তারা এক সূত্রে আবদ্ধ। যে স্বাধীন চেতা, তার হৃদয়ে হিন্দু মুসলমান ভেদ নাই। ভেদ বুদ্ধি কাপুরুষের হৃদয়ে, কাপুরুষে হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ করে। সে ভেদাভেদ স্বাধীন মহারাষ্ট্রে নাই, পরমানন্দে স্বাধীন মহারাষ্ট্রে স্বাধীনতা ভোগ করো। তোমার সহচরকে নিয়ে এসো। আমি জনে জনে পুত্র সম্বোধনে সম্ভাষণ করবো।" (১। ৬ গ)

'ছত্রপতি শিবাজী' নাটক রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র বলছেন
" শিবাজীতে আমি এই আদর্শ দেখাবার চেষ্টা করেছি যে ধর্মের উপর ভিত্তি করে সনাতন ধর্ম রক্ষার জন্য, অত্যাচারিত, দুর্বল, পীড়িতকে রক্ষা করার জন্য, ত্যাগের উপর সেই মহাবীর মহারাষ্ট্র গঠন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।" ৩৮

গিরিশ চন্দ্র স্বদেশ ভাবনার এক অতি অভিমানী নেতা ছিলেন। সাহিত্যের ক্ষেত্র তিনি তাঁর তীব্র দেশাত্মবোধ ছড়িয়েছিলেন। প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য্য বলছেন,

গিরিশচন্দ্রের নাটকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আহ্বান থাকলেও তিনি কদাচ Militant Nationalist ছিলেন না। পরবর্তী নাট্যকার উপেন্দ্র নাথ দাসের মত তিনি ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষ চিত্র সরাসরি কোথাও অঙ্কিত করেন নি। তিনি ইতিহাসকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছিলেন বলে, প্রকৃত সত্যকে গ্রহণ বা সহ্য করা ইংরেজদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। নিজেদের লজ্জা ও অপরাধবোধ ঢাকবার জন্য তারা রাজশক্তির অমোঘ শাসন নীতি পরিচালনা করে নাটক গুলির কণ্ঠ রোধ করেছিল। গিরিশচন্দ্র প্রকৃত পক্ষে ছিলেন Constructive Nationalist". ৩৯

'ছত্রপতি শিবাজী' নাটক জন মানসে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। (ChhatraPati Sivaji) is one of the best and most powerful dramas ever produced on the Indian stage". ৪০

Bengalee পত্রিকার 24th August, 1907 এর সংখ্যায় এই নাটক সম্পর্কে লেখা হলো 'Chhatrapati or the life story of Sivaji has been cast in drama by Babu Girish Chander Ghose and will be reproduced for the second time on the board of the Minerva threatre to night. On the night of its debut, last week the play drew a full house and no wonder for the achievements of the Marhatta hero can not fail to extort the chivalrous admiration of the Indianpeople and mounted as the play was by the Minerva staff, it was admirably calculated to recall those achievements with realistic vividness before the audience. Mr. Dutta as Sivaji was unexceptionable while the other parts were beautifully and faithfully interpreted. The scenery and dress were gorgeous they were appropriate, while other stage property wascleverly manipulated".

Statesman(21st sept, 1907) এই নাটক সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "The sentiments to which the Marhatta Patriots gave utterance were warmly applauded. The songs were sung to orchestral accompaniment an innovation on the Bengali stage. Another novelty was the funeral dirge set to the music of the 'Dead March in Soul' The play has grit in it and is in for a long run". ৪১

গিরিশ চন্দ্রের ত্রয়ী ঐতিহাসিক নাটক 'সিরাজদৌল্লা, মীর কাসিম ও ছত্রপতি শিবাজী' তদানীন্তন বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলনে বিদীর্ণ বাংলা দেশে জনমানকে উত্তাল করে দিয়েছিল। 'Stage' যে কতখানি Powerful media হতে পারে ইংরেজ সরকার তা বুঝেছিলেন। তার ফল স্বরূপ নেমে এল সরকারের স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত। নাটকটি দেশের পক্ষে ক্ষতিকর তাই এই তিনটি নাটক "held objectionable vide Govt. letter No. 559 P dated the 25th January 1911 is which government further directed that if an attempt is made to stage the play, resort should be had to section 3 of Act 19 of 1876.

সরকারী আদেশে পুস্তক তিনটির প্রকাশনাও বন্ধ হয়ে গেল।

॥ দ্বিজেন্দ্র লাল রায় ॥

দ্বিজেন্দ্র লাল জন্মেছিলেন এমন এক সময়ে যখন সেই কাল বাঙালী মনীষার আত্ম সম্প্রসারণের যুগ বলে পরিচিত। উনিশ শতকের শেষার্ধে নব জাগ্রত বাঙালার চৈতন্য প্রভা প্রভাব বিস্তার করছিল সর্বদিকে। সঙ্কীর্ণ গন্ডীর মরুবালুরাশি রূপী জীবনের অচলায়তনকে চূর্ণ করা সৃষ্টিশীল সাংস্কৃতিক ভাবনার স্রোতস্বিনী বাংলার মনোভূমিকে সিঞ্চিত ও উর্বর করে এগিয়ে চলেছিল। দ্বিজেন্দ্র লাল স্নানসিক্ত হয়েছিলেন এই জাতীয়তাবাদের ধারায়। স্বদেশ চিন্তা ছিল সেই যুগের প্রধান ধর্ম। সর্ববিধ কর্মে এই স্বদেশ ভাবনা যুগ ধর্ম বলে স্বীকৃত হয়েছিল। দেশ প্রেম কাব্য মানস থেকে জাতীয় মানসের প্রধান বৈশিষ্ট্য রূপে স্বীকৃত হলো।

দ্বিজেন্দ্র লাল যেন এই যুগেরই প্রতিভূ রূপে আবির্ভূত হলেন। গিরিশচন্দ্রের মতো তিনিও নাট্য সাহিত্যে দেশ প্রেমের বান আনলেন। তাঁর রচনার ক্ষেত্র ছিল বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন। জাতির সংকল্প প্রতিরোধে দ্বিজেন্দ্র লাল নাটক রচনার নতুন ধারা সংযোজিত করলেন।

ডঃ প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য্য বলছেন, " বঙ্গভঙ্গ বিলের বিরুদ্ধে বঙ্গবাসীর যে জাতীয় অভ্যুত্থান তাতে কেবল দেশ প্রেমের আদর্শই চিহ্নিত হয় নি, যে অখন্ড মানবাত্মা একই উৎসভূমি থেকে জন্মলাভ করে বিদেশী শক্তির মদমত্ততার পদতলে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হচ্ছিল, মনুষ্যত্বের চরম অবমাননায় বিশ্ব বিধাতার শাশ্বত নির্দেশকে অসম্মানিত করা হয়েছিল, তারই বিরুদ্ধে বাঙালীর মনোভাব ইস্পাত কঠিন স্বাক্ষরে মুদ্রিত হয়ে প্রাণোৎসর্গের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ী হতে থাকে। এদেশবাসীগণ যে স্বাধিকার দাবী করেন, তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মনুষ্যত্বের উদ্ধার ও প্রতিষ্ঠা

এই জাগ্রত জিগীষাই স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকাতে নানা সংগঠনী ক্রিয়া কাণ্ডের মধ্যে উদ্দাম আবেগ ভরে বাংলা দেশের আকাশ বাতাসকে করেছিল মুখরিত। সম - কালীন সাহিত্য সম্ভারের বিভিন্ন রচনাতে জাতির এই মুক্তি পিপাসাই প্রতিধ্বনিত।" ৪৩

দ্বিজেন্দ্র লালের নাটক রচনার মধ্যে যুগ ধর্মের এই শাশ্বত বানীটি পরিস্ফুট হয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের উন্মেষের মধ্য দিয়ে বাংলার চিত্তের যে জাগরণী প্রভা বিকীরণ করেছিল দ্বিজেন্দ্রলাল সেই প্রভার মধ্যে নাটক রচনা করলেন। অন্যান্যদের মতো তিনিও খুঁজে পেলেন ঐতিহাসিক বীরদের জীবনী। এই বীরদের জীবনে ছিল এক উচ্চ আদর্শবোধ। এই আদর্শবোধকে পরিশীলিত করে তিনি ঐতিহাসিক চরিত্র গুলো যুগোপযোগী করে উপস্থাপিত করলেন। এই নাটক গুলো ভীষণভাবে সাড়া জাগালো। "As such time of the greater need, these dramas acted like a great inspiration and changed the servile mentality of the people". ৪৪

দ্বিজেন্দ্র লাল দেশাত্ম ভাবনাকে মানব ভাবনার পীঠভূমিতে রূপান্তরিত করলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন মানব প্রেমের উচ্ছ্বাস হতে যে শক্তি উদ্ভূত হয় সেই শক্তিই জাতীয়তাবাদের অস্ত্র রূপে কাজ করে। তিনি বলছেন —

" প্রেম উন্মত্ততা নহে। জানিও, জ্বলন্ত অনুরাগই বিশ্ব বিপ্লবীর কার্য্যের প্রাণ। এই অনুরাগ না থাকিলে হয়ত ইটালী আজও শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিত, আমেরিকায় স্বাধীনতার লোহিত নিশান উড়িত না। এই অনুরাগ না থাকিলে যীশুর প্রেমময় উপদেশ জগতে প্রচারিত হইত না, বৌদ্ধ ধর্ম নিষ্ঠুর জগতে আসিত না। অনুরাগ জ্বলন্ত স্থির। অনুরাগ উচ্চ কার্য্যের চির সহচর। অনুরাগ — চিরদিন কার্য্যের প্রাণ আছে ও থাকিবে। যদি জগৎ হইতে কার্য্যের পরিচালিকা শক্তি অন্তর্হিত হয়, বিপ্লবের জলোচ্ছ্বাসে ভাসিয়া যায় এ শক্তি বর্তমান থাকিবে। এ শক্তি অনন্তকাল

স্থায়ী। .... যে দিন এই শক্তি যাইবে, সেদিনে কার্য্য বিলুপ্ত হইবে, মনুষ্য পশু হইবে, জগতে অরাজকতা আসিবে। তাই বলি অনুরাগ উম্মত্ততা নহে। অনুরাগ মহৎ, স্বর্গীয়, উচ্চকার্য্যের মূল মন্ত্র।" ৪৫ তিনি এই প্রবন্ধে পুনরায় বলছেন, " ভালবাসিয়া মানুষকে ও কর্তব্যকে ভালবাসিয়া নিজের কার্য্য করিয়া যাও। উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে, সাধনা সিদ্ধ হইবে। এই অনুরাগই তোমার ভবিষ্যতের তিমিরে দীপ্ত প্রদীপ — স্থির স্থির। তাহা লইয়া নির্ভয়ে বিচরণ কর। শতবার পড়িয়া যাও, শতবার ক্লান্ত হইয়া যাও, ক্ষতি নাই। এ তুরী বাজাও। উড়াও তোমার বিজয় নিশান।" ৪৬

দেশাত্মবোধের মূলে এই মানব প্রীতির আদর্শ নিয়ে দ্বিজেন্দ্র লাল তাঁর নাটকে সেই ভাবনা প্রচার করেছেন। এই ভাবনার বশবর্তী হয়েতিনি যেমন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রথম সারির প্রচারক ছিলেন তেমনি তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অনেক নেতি বাচক দিক সমূহকে পছন্দ করেন নি। তিনি দেব কুমার চৌধুরীকে লিখিত এক পত্রে জানাচ্ছেন (৯ই জুন, ১৯০৬) " বাঙালীরা আপনাদের মধ্যে যদি একতা রাখে, 'Partition' এ বঙ্গ বিভাগে তা ভাঙিতে পারিবে না। বাঙালীর আপনাদের মধ্যে একতা স্থাপিত করিতে চেষ্টা করার পূর্বে, তাহাদের মনে ব্যক্তি - গত ক্ষুদ্রতা, ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব দূর করিতে হইবে। বঙ্গচ্ছেদ রদ করিয়া তাহা সাধিত হইবে না।"

দ্বিজেন্দ্র লাল জানতেন জাতির জীবনে বিশেষ ঘটনায় এক ভাব তম্ময়তা আসে। এই সময় জাতি উদ্বেল হয়ে উঠে। সেই সত্যকে স্বীকার করেই তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর জীবনীকার দেব কুমার রায়চৌধুরী সেই প্রসঙ্গে বলছেন, " দ্বিজেন্দ্র লাল সে ভাব তরঙ্গে ভাসমান হইয়া, একেবারেই প্রকাশ্য রাজপথে নামিয়া আসিয়া, স্বয়ং সে গানে যোগদান করিলেন, এবং ঊর্ধ্ব - বাহু হইয়া মেঘমন্দ্রবৎ মুহুর্মুহু 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রে অকস্মাৎ অম্বর তলে ভাব রোমাঞ্চ সঞ্চারিত করিয়া দিলেন। .... প্রকাশ্য পথ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মাতৃভক্ত

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার সেই পুরুষ গম্ভীর কণ্ঠে সেদিন যে মহাসঙ্গীত সুধা শতশত সন্তান কর্ণে বিতরণ করিয়া ছিলেন , আর এ দুর্ভাগ্য দেশ সে গান শুনিতে পাইবে না ।" ৪৭

স্বদেশী আন্দোলনে দ্বিজেন্দ্রলালের যে নাটকগুলি ভীষণভাবে সাড়া জাগিয়ে ছিল তা হলো প্রতাপ সিংহ (১৯০৫) , দর্গাদাস (১৯০৬) , মেবার পতন (১৯০৮) । দ্বিজেন্দ্র লালের স্বাদেশিকতার সূচনা ' প্রতাপ সিংহ ' এবং তার পরিণতি ' মেবার পতন ' নাটকে ।

ভারতের একটা নিজস্ব ঐতিহ্য আছে । আছে ধর্ম বোধ । তাকেই প্রথমে তুলে ধরলেন দ্বিজেন্দ্র লাল । প্রতাপ সিংহ বলছেন , " আকবর , অন্যায় সমরে গুপ্ত ভাবে জয়মলকে বধ করে চিতোর অধিকার করেছে । আমরা ক্ষত্রিয় , ন্যায় যুদ্ধে পারিত চিতোর পুনরাধিকার কর্ব্ব । অন্যায় যুদ্ধ কর্ব্ব না । তুমি মোগল দূর দেশ থেকে এসেছো । ভারতবর্ষে এসে কিছু শিখে যাও — ধর্ম যুদ্ধ কাকে বলে , শিখে যাও — একাগ্রতা , সহিষ্ণুতা , প্রকৃত বীরত্ব কাকে বলে । শিখে যাও দেশের জন্য কি রকম করে প্রাণ দিতে হয় । " (১। ১ দৃশ্য)

ভারতের বর্তমান অবস্থার কারণ ভারতের পরাধীনতা । শত কুসংস্কার নীচতা ভারতবাসীকে হীনমন্য করে তুলেছিল । ভারতের এই পরাধীনতার কারণের পশ্চাদপট বর্ণনা করেছেন দ্বিজেন্দ্র লাল রায় 'রানা প্রতাপ সিংহ ' নাটকে ।

" গোয়ালীয়র । .... বলেছিলাম না যে , মহারাজ মান সিংহকে পাবার আশা দুরাশা । ভারতের স্বাধীনতা স্বপ্ন মাত্র ।

মান সিংহ । স্বাধীনতা মহারাজ , জাতীয় জীবন থাকলে তবে ত স্বাধীনতা , সে জীবন অনেক দিন গিয়েছে । জাতি এখন পচছে ।

উঠছে — মনে পড়ে আজ আমার পূর্ব পুরুষ স্বর্গীয় বাপ্পা রাওকে — যিনি চিতোরের আক্রমনকারী ম্লেচ্ছকে পরাস্ত করে তাকে গজনি পর্যন্ত প্রতাড়িত করে গজনির সিংহাসনে নিজের ভাতুষ পুত্রকে বসিয়েছিলেন । মনে পড়ে পাঠানের সঙ্গে সমর সিংহের সেই ঘোর যুদ্ধ । যাতে কাগার নদের নীল বারি রাশি ম্লেচ্ছ ও রাজপুত শোণিতে রক্তবর্ণ হয়েছিল । মনে পড়ে পদ্মিনীর জন্য মহাসমর যাতে বীর নারী চন্দ্রাওৎ রাণী তাঁর ষোড়শ বর্ষীয় পুত্র ও তাঁর পুত্র বধূর সঙ্গে যবনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন । আজ সে সব যেন প্রত্যক্ষবৎ দেখছি । " (৩। ৮ দৃশ্য)

সামাজিক ক্ষেত্রে কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ নিজের স্বার্থের হানি হলে সে দেশকে দোষ দেয় । প্রশ্ন তোলে দেশ আমার জন্য কি করেছে ? বৃটিশ ভারতে এ ধরণের লোকের অভাব ছিল না । প্রতাপ সিংহ নাটকে শক্ত সিংহের মুখে একবারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই । প্রতাপ সিংহের কন্যা ইরার সাথে শক্ত সিংহের কথোপকথনে এই ভাবনা পরিস্ফুট ।

" ইরা । পিতৃব্য , সমস্যা এত কঠিন নয় , আর আপনিও এত মূঢ় নয় , যে এ সহজ জিনিস বুঝতে কষ্ট হচ্ছে । প্রতিশোধ , উত্তম , যদি পিতাই অপরাধ করে থাকেন তবে আপনার প্রতিশোধ পিতার উপর , স্বদেশের উপর নয় । স্বদেশ জন্মভূমি — সে নিরীহ তার উপর এ বিদ্বেষ কেন ? সেই দেশকে উচ্ছন্ন করার জন্য আপনি এই মোগল সৈন্য টেনে এনেছেন — যে দেশকে প্রতাপ সিংহ রক্ষা করবার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ।

শক্ত । ইরা , আমি বালক্কাল হতেই জন্মভূমির ক্রোড় হতে বঞ্চিত ।

ইরা । তবুও সে জন্মভূমি ।

শক্ত । সে নামে মাত্র । সে জন্মভূমির কাছে আমার কোন ঋণ নাই ।

ইরা । ঋণ নাই থাকুক , বিনা অপরাধে তাকে মোগল পদ দলিত করার এ প্রয়াস

কি অন্যায় অত্যাচার নয় ? যদি প্রতাপ সিংহ আপনার প্রতি অন্যায় করে থাকেন সে কৈফিয়ৎ তিনি দিতে বাধ্য , মেবার বাধ্য নয় । (২। ৪ দৃশ্য)

জন্মভূমির পরাধীনতার জ্বালা দ্বিজেন্দ্র লাল হৃদয়ে সব সময় অনুভব করেছেন । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কালে তার হৃদয়ের বেদনা বোধকে স্বদেশ প্রেমের চেতনায় পরিণত করে জাতির জীবনে সেই দেশাত্ম বোধের ভাবনাকে প্রাণবন্ত করে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন । তাঁর অভিব্যক্তি ও প্রতাপের অভিব্যক্তি যেন এক সুরে বাঁধা হয়েছিল । দেশমাতৃকা ছিল তাঁর উপাস্য দেবী ।

" প্রতাপ । .... জন্মভূমি , সুন্দর মেবার , বীর প্রসূ মা । এখন এই বেশই তোমাকে সাজে মা । তোমাকে আমার বলে আবার ডাকতে পারিত তোমার পায়ে স্বহস্তে আবার ভূষণ পড়িয়ে দেব । নৈলে তোমাকে এই শ্মশান চারিণী তপস্বিনীর বেশই পরিয়ে রেখে দেবো মা । মা আমার । তোমাকে আজ মোগলের দাসী দেখে আমার প্রাণ ফেটে যায় না । " (১। ৪ দৃশ্য)

স্বদেশী যুগে দ্বিজেন্দ্র লালের আরেক রচনা ' দুর্গাদাস ' । ভারতের একটি রাজ্যের গৌরব ইতিহাস রচনা করলেও এই ভাবনাকে তিনি বাংলার প্রান্তরেও ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন । সমগ্র ভারত যদি তার সকল বহু শক্তি নিয়ে এক হয়ে দাঁড়াত তবে ঐক্যবদ্ধ ভারতের সামনে দাঁড়াত কে ? দুর্গাদাসের উক্তিতে সেই কথা প্রকাশিত হয়েছে ।

" দুর্গাদাস । যোদ্ধা বটে মারাঠা জাত , অদ্ভুত অশ্বচালনা , অদ্ভুত সমর কৌশল , অদ্ভুত সহিষ্ণুতা , এর সঙ্গে যদি রাজপুত জাতির একাগ্রতা , ত্যাগ আর দৃঢ়তা পেতাম , কি না হতে পার্ত । না তা হবার নয় । ভারতের ভাগ্য সু প্রসন্ন নয় । হিন্দু জাতি যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে , আর এক হবার নয় । সে তেজ গিয়েছে যাতে কম্পমান আত্মাকে গজের ছিতে টেনে নিয়ে যায় । উঠেছিল এই আর্যজাতি — যে দিন ব্রাহ্মণের তপোবল ছিল , ক্ষত্রিয়ের ত্যাগ ছিল , বৈশ্যের নিষ্ঠা ছিল , শূদ্রের কর্তব্য জ্ঞান ছিল । সে সব গিয়েছে । আর ফিরবার নয় ।

এখন আবার নূতন উপাদানে জাতীয় চরিত্র গঠন কর্তে হবে , নূতন বলে উঠতে হবে , নূতন তেজে কম্পমান হতে হবে । " (৪ । ৬ দৃশ্য)

দুর্গাদাস আক্ষেপ করে বলছেন " একদিনের জন্য এক হ দেখি । একদিন নিজের চিন্তা ছেড়ে সবাই ভায়ের চিন্তা কর দেখি । একদিন সবাই নতজানু হয়ে করজোড়ে আমাদের এই মাকে প্রাণ ভরে মা বলে ডাক দেখি । দেখ এই অত্যাচার এই অন্যায় এই স্বেচ্ছাচার চূর্ণ হয়ে যায় কি না । " (৩ । ৮ দৃশ্য)

দ্বিজেন্দ্র লাল অনুভূমি হীন ভারতবাসীকে বড় কাছ থেকে দেখেছিলেন । গতানুগতিক জীবন , উদ্দীপনা হীন কর্ম শক্তি , উচ্চ জীবন চিন্তার অভাব ভারত - বাসীর মধ্যে দেখে তিনি বিষণ্ন বোধ করতেন । যে জাতি তার দৃঢ়তা হারায় , জীবনে শুধু গতির অসাড় প্রবাহে সেই জাতি সর্ব মূল্য জিনিস হারায় যার নাম স্বাধীনতা । এই জীবন দেখে দুর্গাদাসের কথায় আক্ষেপ করে বলছেন " সহস্র বৎসরের নিষ্পেষণে জাতি নির্জীব হয়েছে । নগরের রাস্তায় রাস্তায় বেড়িয়ে দেখেছি যে পুরবাসীরা নিস্তেজ । ছায়া নিবিড় গ্রামগুলি দিয়ে হেঁটে গিয়েছি , দেখেছি যে , গ্রামবাসীরা নিশ্চেষ্ট উদাসীন । বিস্তীর্ণ শস্য ক্ষেত্রের পাশ দিয়ে বেড়িয়ে গিয়েছি , দেখেছি যে কৃষকেরা অলস মন্থর গমনে ভূমি কর্ষন কর্চ্ছে । সমস্ত জাতির প্রাণ নাই । অত্যাচারে প্রপীড়িত হলেও পদাহত দরিদ্র কুকুরের মতো নিম্ন স্বরে একটা গভীর আর্তনাদ করে মাত্র । প্রতিকারের চেষ্টা করে না । মোগল সাম্রাজ্য থাকবে না বটে , কিন্তু এ জাতি আর উঠবে না । " (৫ । ৮ দৃশ্য)

হতশ্রী রাজপুত শক্তিকে কর্তব্যের ডাকে , মাতৃভূমি রক্ষার সংকল্প বহুবার রাজপুত রমণীরা তাদের উদ্দীপ্ত করেছে মাতৃভূমি রক্ষার শপথ বাণীতে । দুর্গাদাস নাটকে দ্বিজেন্দ্র লাল যেন স্বদেশী আন্দোলনের দিনে জাতির হৃদয়ে প্রেরণা সৃষ্টি করার শপথ নেওয়ুছেন ।

" রাণী । মৃত্যু , ... মৃত্যু কি একদিন আসবে না ? সে যখন বিছানায় এসে টুঁটি চেপে ধরবে , সে বড় সুখ মৃত্যু নয় । কিন্তু স্বেচ্ছায় দেশের জন্য , পরের জন্য , কর্তব্যের জন্য মৃত্যুই সুখ মৃত্যু ।

গ্রামবাসীগণ । আমরা যাবো , মহারাণী , যেখানে আপনি নিয়ে যান , আমরা যাবো ।

রাণী । এই তো তোমাদের যোগ্য কথা । শোন — আমি কাউকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডাকছি না । যদি কারো স্বধর্মের প্রতি সম্মানের জ্ঞান থাকে , যদি কেউ স্বাধীনতার জন্য প্রাণ উৎসর্গ কর্তে প্রস্তুত থাকো — সে এসো । সে একাই একশ । ক্ষীন সংকল্প দ্বিধা সন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে আমি চাই না । একাগ্র দৃঢ় স্থির প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিকে আমি চাই । দুই পথ আছে বেছে নাও । একদিকে বিলাস , আমোদ আর উপভোগ । আর একদিকে শ্রম, অনাহার , দারিদ্র ও দুঃখ । একদিকে সংসার , গৃহ ও শান্তি , আর একদিকে সমর ক্ষেত্র , ক্ষত ও মৃত্যু । একদিকে নিজের সুখ , আর একদিকে দেশের প্রতি কর্তব্য — বেছে নাও ।

সকলে । আমরা কর্তব্য বেছে নিলাম । "

এই শপথ বাক্য যেন স্বদেশী নেতার । দেশহিতে প্রাণ বিসর্জন করার জন্য যেন তিনি সমগ্র বাংলার মানুষকে সেই উদ্দীপনায় ভরা আবেগের বানী শোনাচ্ছেন । দ্বিজেন্দ্র লাল দুর্গাদাস এ সে বীর চরিত্র খুঁজেপেয়েছিলেন ।

"As a skillful general and gallant soldier, in the defence of his country, he is above all praise. As a chivalrous Rajpoot his braving all consequences when called upon to sure the honour of a noble female of his race, he is without parallel. As an accomplished prince and benevolent man his digquified lette edict places him high in the scale of moral as well as intellectuals, excellance". ৪৮

তাই তো দ্বিজেন্দ্র লাল জাতিকে যেন প্রশ্ন করছেন " যে পুত্র জন্য প্রাণ দান করে , দেশের পায়ে সর্বস্ব অর্পন করে , আশ্রিতকে রক্ষা করার জন্য দেশ ছাড়ে , অপসরা সম্রাজ্ঞীর অবৈধ প্রেম প্রত্যাখান করে , প্রপীড়িত অবলার প্রাণ রক্ষার্থে নিজের বুক আগিয়ে দেয় , শেষে আশ্রিতা কুমারীর ধর্ম রক্ষার জন্য নির্বাসিত হয় — সে রূপ চরিত্র তোমাদের পুরানে কয়টা আছে দুর্গাদাস ?" (৫ । ৮ দৃশ্য)

স্বদেশ ভাবনার পরিমণ্ডলে রচিত নাটকের মধ্যে পূর্ণতা প্রাপ্তি ' মেবার পতনে ' । প্রকাশ কাল ২৭ ডিসেম্বর , ১৯০৮ । দেশপ্রেম জাতীয় সমস্যা , বিশ্ব - ভাতৃত্ব প্রভৃতি ধারণার বশবর্তী হয়ে দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ' প্রতাপ সিংহ ' নাটক দিয়ে যা শুরু ' মেবাড় পতনে ' তার সমাপ্তি । নাট্যকার নিজেই বলছেন " মৎপ্রণীত অন্যান্য নাটক হইতে এই নাটকের একটি পার্থক্য লক্ষিত হইবে । আমার অন্যান্য নাটকে চরিত্রাঙ্কন ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না । .... কিন্তু এই নাটকে আমি একটি মহানীতি লইয়া বসিয়াছি , সে নীতি বিশ্ব প্রেম । কল্যাণী , সত্যবতী ও মানসী এই তিনটি চরিত্র যথাক্রমে দাম্পত্য প্রেম , জাতীয় প্রেম এবং বিশ্ব প্রেমের মূর্তিরূপে কল্পিত হইয়াছে । এই নাটকে ইহাই কীর্তিত হইয়াছে যে বিশ্ব প্রীতি সর্বাপেক্ষা গরীয়সী । .... অতএব এই আমার উদ্দেশ্য মূলক নাটক । "

মেবাড় পতনের পটভূমিকা রানা প্রতাপের কীর্তি ভাস্বর জীবনের সূর্য্য অস্তমিত হয়েছে । সংগ্রাম শীল জীবনের জোয়ার ভাটার টান অমর সিংহের রাজত্ব কালে মোগল দাসত্ব স্বীকার করায় মেবাড় জুড়ে পরাধীনতার সন্ধেকালীন বেদনার ছায়া । নাট্যকারের এই অনুভূতি তাঁর হৃদয় সঞ্জাত চিত্তবৃত্তির চিরন্তন ফসল । রাণা প্রতাপের ভাবাদর্শ , সংগ্রামী চেতনা আজ কোথায় ? নাট্যকার আক্ষেপ করছেন —

" রাণা । না শঙ্কর তিনি এ জাতির কেহ ছিলেন না । তিনি এ জাতির মধ্যে এসেছিলেন একটা দৈব শক্তির মত , একটা আকাশের বজ্র সম্পাত , একটা পৃথিবীর ভূমিকম্প , একটা সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস , কোথা থেকে এসে ছিলেন কোথায় চলে গেলেন কেউ জানে না । সকলেই রানা প্রতাপ সিংহ হতে পারে না শঙ্কর ।

কৃষ্ণদাস । সকলে রানা প্রতাপ সিংহ হতে পারে না , স্বীকার করি । কিন্তু রানা প্রতাপ সিংহের পুত্র তাঁর পদানুসরণ কর্বেন আশা করা যায় । প্রতাপ সিংহ মেবাড়ের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ দিলেন , আর তাঁর পুত্র বিনা যুদ্ধে মোগলের দাস হবে ? (১ । ৩ দৃশ্য)

সত্যবতীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা হীন জীবন মৃত্যুর চেয়েও নিকৃষ্ট এই ভাবনার প্রসার ঘটালেন ।

সত্যবতী । রানা প্রতাপ সিংহের পুত্রের কাছে কি বেছে নেওয়া এত শক্ত যে কোনটি শ্রেয় — অধীনতা কি মৃত্যু ? মর্য্যার ভয়ে আমার রত্ন দস্যুর হাতে সঁপে দেবো ? আর এ যে সে রত্ন নয় — আমার যথা সর্বস্ব , আমার বহু পুরুষের সঞ্চিত বহু শতাব্দীর স্মৃতি স্নাত মেবারকে প্রাণ ভয়ে বিনা যুদ্ধে শত্রু করে সঁপে দেবো ? তারা নিতে চায় তো মেরে কেড়ে নিক । নিশ্চিত মৃত্যু ঃ সে কি একদিন সকলেরই নাই ? মান দিয়ে ক্রয় করে রানা কি প্রাণটা চিরকাল রাখতে পার্বেন ? " (২ । ২ দৃশ্য)

ভারতবর্ষের এই অবনতির মূলে আছে হিন্দু ধর্মের সঙ্কীর্ণতা ও ধর্ম বিদ্বেষ । দ্বিজেন্দ্র লাল এই ভাবনায় দৃঢ় ছিলেন যে দেশবাসীর চৈতন্য বোধ জাগিয়ে তোলার জন্য হিন্দু সমাজের অবক্ষয়ের চিত্র গুলো নাটকে তুলে ধরার প্রয়োজন আছে । মহাবৎ খাঁ বলছেন " এত বিদ্বেষ , এত আক্রোশ , আশ্চর্য্য নয় , যে জাতি বারবার মুসলমানের পদদলিত হয়েছে , আশ্চর্য্য নয় , যে এই ঘৃণা মুসলমান সুদ সমেত ফিরিয়ে দিচ্ছে । এই এঁদের উদার অত্যুদার সনাতন হিন্দু ধর্ম ।

মুসলমান ধর্ম , আর যাই হোক তার এ মহত্তটুকু আছে যে , সে যে কোন বিধর্মীকে নিজের বুকে করে আপন করে নিতে পারে । আর হিন্দু ধর্ম ? একজন বিধর্মী শত তপস্যায় হিন্দু হতে পারে না । " (৩ । ৪ দৃশ্য)

" ধর্মের গোড়ামি ও স্বার্থপরতা হিন্দুদের যেমন শক্তিহীন ও হীনবীর্য্য করে তুলেছে , তেমনি (ইসলাম) ধর্মের উদারতা মুসলমানদের করেছে বলশালী । স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় ঐক্য বল , এবং উদারতার মধ্যে ঐক্য শক্তির বন্ধন বীজ বর্তমান থাকে । ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতির সংঘ বদ্ধ চেতনাকে আরও গভীর ভাবে উদ্দীপ্ত করবার উদ্দেশ্যেই দ্বিজেন্দ্র লাল হিন্দুদের চিত্তের সকল অসাড়কে দূর করতে চেয়েছিলেন । "

স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে তার নাটকগুলো যুক্ত থাকলেও তিনি স্বদেশী আন্দোলনের অন্তর্নিহিত একটি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন । তাই উচ্ছ্বাস সর্বস্ব দেশ প্রেমই শেষ কথা নয় - এই সত্য তিনি স্বীকার করেছিলেন । দেব কুমার রায়চৌধুরীকে তিনি চিঠিতে লিখছেন , " আমি জানি , বিশ্বাস করি , বেশ যেন দেখতে পাচ্ছি - যে যাই বলুক , যতই কেন আমাদের নগন্য ও হেয় ভেবে উপেক্ষা করুক না কেন - আমরা আবার জাগব , উঠব , মানুষ হব । .... আমি ' দেশ ' চিনি না , বিদ্বেষ মানিনা , আমি চাই শুধু বীর্য বল - ব্রহ্ম চর্য , চাই শুধু ঐ সত্য নিষ্ঠা , চাই শুধু আসল , খাঁটি , ধ্রুব ও নিটোল ধর্মবল , আর ঐ এক কথায় মনুষ্যত্ব । " ৩৯

তাই নাটকে দেখতে পাই সত্যবতী যখন মানসীকে জিজ্ঞেস করছে নব ধর্ম কি - তার প্রত্যুত্তরে মানসী বলছে , " সে ধর্ম ভালবাসা । আপনাকে ছেড়ে ক্রমে ভাইকে , জাতিকে , মনুষ্যকে , মনুষ্যত্বকে ভালবাসতে শিখতে হবে । তারপরে আর তাদের নিজের কিছু কর্তে হবে না , ঈশ্বরের কোন অজ্ঞেয় নিয়মে

তাদের ভবিষ্যৎ আপনিই গড়ে আসবে । জাতীয় উন্নতির পথ শোনিতের প্রবাহের মধ্য দিয়ে নয় মা , জাতীয় উন্নতির পথ আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে । যে পথ বঙ্গের শ্রীচৈতন্যদেব দেখিয়ে গিয়েছেন , সেই পথে চল মা । নইলে নিজে নীচ , কুটিল স্বার্থ সেবী হয়ে রানা প্রতাপ সিংহের স্মৃতি মাথায় রেখে অতীত গৌরবের নির্বাণ প্রদীপ কোলে করে চির জীবন হাহাকার কল্লেও কিছু হবে না । " (৩।৭ দৃশ্য)

দ্বিজেন্দ্র লাল রাজনীতির চাইতে মনুষ্যত্ব বোধ , মানব প্রেমকে বড় করে তুলতে চেয়েছেন । এবং এই মূল্যবোধকেই তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের বেদীমূলে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন । দ্বিজেন্দ্র লাল অনুভব করেছিলেন ভারতবর্ষ সমাজকে রাষ্ট্র চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল । ফলে বিদেশী আক্রমণের সহস্র প্রতিঘাত সত্ত্বেও সমাজ দৃঢ়বদ্ধ হয়ে তার স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে এসেছিল । সমাজমুখী এই মন স্থাপনের জন্য ভারতবর্ষের সামাজিক গৌরব বোধ বা সামাজিক অভিমান বোধ তীব্রতর হয়েছে কিন্তু রাষ্ট্রীয় বোধ অসম্পূর্ণ থেকে গেছে । তাই বিদেশী আক্রমণে সমাজের আচার বিচারকে বাঁচানোর তাগিদই বেশী করে দেখা দিয়েছে । আজ সমাজের আভ্যন্তরীন অজস্র কুসংস্কার জাতির অগ্রগতির পথে সব চাইতে বেশী বাধা হিসেবে দাঁড়িয়েছে । সামাজিক অবক্ষয়ের পথ ধরে এসে পরাধীনতা । তবুও এই পরাধীনতার একদিন অবসান ঘটবে আত্মত্যাগ ও বলিদানের মাধ্যমে । সত্যবতীর মুখ হতে সেই বানী শোনা গিয়েছে । তিনি বলছেন " বীরের রক্তই জাতিকে উর্বর করে । দুঃখ সে দেশের নয় রানা , যে দেশের বীর মরে , দুঃখ সেই দেশের যে দেশের বীর মরে না । " (২। ২ দৃশ্য)

' মেবারের পতন ' দিয়েও যে ভবিষ্যত রূপ রানা সুন্দর রূপ দেখতে পেয়েছেন নাট্যকারের সেই অভিব্যক্তিই ছিল । রানা বলছেন ' সুন্দর মেবার , আজ তোমার এক সৌন্দর্য্য দেখছি মা । এত কখন দেখি নাই । তোমায় তারা বধ্য ভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে — ছিন্ন বসনা , ধূলি ধূসরিতা , আলুলায়িত কেশ । এ কি

সৌন্দর্য্য মা। আজ এত দিন পরে তোমায় চিনলাম। এতদিন তোমার সৌভাগ্যের সূর্য্য কিরণ তোমায় ছেয়ে ছিল। সে সূর্য্য নেমে গিয়েছে। আজ তাই তোমার আকাশ প্রান্ত হতে এ কি অপূর্ব অনন্য আলোক উদ্ভাসিত হতে দেখছি। এ কি জ্যোতি, একি নীলিমা, একি নীরব মহিমা।" (৪। ৫ দৃশ্য)

বেদনা মিশ্রিত এক অপূর্ব দেশ প্রেম প্রকাশিত হয়েছে। প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য্য বলছেন, "দ্বিজেন্দ্র লালের এই দেশাত্মবোধ অকৃত্রিম জন্মভূমি প্রেমের পরিণত রূপ। তাঁর স্বদেশ প্রীতিতে কোন সঙ্কীর্ণতা যে কোন দিন ঠাঁই পায় নি, বাঙালী তাঁর কাছে এই শিক্ষাই পেয়েছিল যে, সঙ্কীর্ণ বিজাতি বিদ্বেষ ও স্থূল জাতীয়তা কখনও স্বাদেশিকতার প্রকৃত বাহন হতে পারে না। জাতি উদ্ধারের জন্য প্রয়োজন নৈতিক নিষ্ঠা ও সংযম, অকৃত্রিম ধর্মভাব ও দৃঢ় চরিত্রবল। স্বাদেশিকতার ক্ষেত্রে ভাব ও কর্মের মধ্যে সুসঙ্গতি ঐক্য ও সামঞ্জস্য থাকা একান্ত প্রয়োজন। দ্বিজেন্দ্র লাল বাঙালীর দেশ প্রেমকে বিশ্বমৈত্রী ও কল্যাণাদর্শের স্নিগ্ধ আলোকে উদ্ভাসিত দেখতে চেয়েছিলেন। 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনের উত্তেজিত মুহূর্তে বাঙালীর চিত্ত সায়রে দেশ প্রেমের যে চঞ্চলতা এসেছিল, তাতে ছিল অনেক আবেগ, যা তাঁর কাছে বৃহত্তর জন কল্যাণ ও দেশহিতাদর্শের পরিপন্থী বলে মনে হয়েছিল। তাই তিনি এই আত্মঘাতী ও সঙ্কীর্ণ স্বদেশ প্রেমকে দূরে থেকে বর্জন করেছিলেন। তাঁর স্বাদেশিক চিত্তের সংহিতা 'মেবার পতন' নাটকে এ বিষয়ের মূল ও চিন্তা পূর্ণভাবে ধরা পড়েছে।" ৫৫

দ্বিজেন্দ্র লাল নিজেই বলছেন "এই নাটকে (মেবার পতন) আমি একটি মহানীতি লইয়া বসিয়াছি, সে নীতি বিশ্বপ্রেম। কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী এই তিনটি যথাক্রমে দাম্পত্য প্রেম, জাতীয় প্রেম এবং বিশ্ব প্রেমের মূর্ত্তি রূপে কল্পিত হইয়াছে। এই নাটকে ইহাই কীর্ত্তিত হইয়াছে যে বিশ্ব প্রীতিই সর্বাপেক্ষা গরীয়সী।"

দ্বিজেন্দ্র লালের মনোপরিবর্তনের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁর পুত্র দিলীপ রায় বিশেষ ভাবে অবহিত ছিলেন। তিনি এই পরিবর্তনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন —

"He was my father. So naturally I followed intimately the psychic changes in his life with deep sympathy and reverence. I began to revere his patriotism, too, the first fire of which had made him famous in the Swadeshi days when he wrote patriotic dramas one after another. He was a poet and a man of outstanding nobility of character. But he was an artist, highly sensative to his circumambient atmosphere. It was then the hey day of Bengali Patriotism and he caught its contagion, a contagion we should avoid to day. But in those days we look militant patriotism at its face value and so persuaded ourselves that it was the panacea for all the evils our flesh was heir to. We know better now. But in the first flush of our patriotic adolescence we had all devoutly believed in the gospel of nationalism(which came, ever since, to suck mankind down into real hell with the pledge of a phantom heaven) and had burned with hatred of everything foreign. How easy, alas to glare at others as the respository of iniquity forgetting our blackest sins.

It was at this point that Dwijendralal grew suddenly and utterly sick of patriotism. It was at this turning point of his life that he wrote 'Fall of Mewar'. And it was only then

that we, his deep admirers, discovered that patriotism was a false guide". ৫১

স্বদেশী আন্দোলনে দেশবাসী পেয়েছিল এক স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মবোধ — যার নাম দেশ প্রেম। তাই এই মহা ভাবনার অংশীদার হয়ে তারা জীবন পণ করে লড়াই এ প্রস্তুত ছিল। স্বাধীনতা লাভের এক মহৎ আকাংখা তাদের মন প্রাণকে মথিত করেছিল। নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার আকাংখা নয়, প্রতিশোধে ঝলসে উঠার ভাবনা নয়, চিত্ত বৃত্তির তলে সুপ্ত থেকে উঠে তীব্র দেশ প্রেমকে মিলাতে চেয়েছিলো ত্যাগ ও মহনীয় আদর্শের সাথে।

গরীয়সী এই ভারতভূমি। বহু প্রাচীন এর ইতিহাস। কিন্তু বারংবার পদস্খলন ঘটেছে, নৈতিকতার অধঃপতন ঘটেছে, স্বার্থান্বেষীদের হীন চক্রে দেশ কলুষিত হয়েছে, ভাতৃ বিরোধ, ঐক্যহীন সমাজ, অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামাজিক বাতাবরণে দেশ অধঃপতিত হয়েছে। দেশের মানুষ যদি স্বাভিমানী হয়, আদর্শ পরায়ন হয়, মানব দরদী হয়, সংগ্রামী কর্মঠ হয়, জড়তা ক্লীবতা হতে মুক্তি প্রাপ্ত হয় তবে সে দেশকে বাঁধবার, পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার সাহস কারও থাকে না। একটি স্বাভিমান জাতি মনুষ্যত্বের গৌরব নিয়ে বড় হয়। পৃথিবীর গতিতে এগিয়ে যায়। ইংরেজ শাসনে এই অধঃপতিত দেশের দ্বিজেন্দ্র লাল তাই বাঁচবার সঞ্জীবনী মন্ত্র দিলেন, দেশের মানুষ মনুষ্যত্ব ফিরে পেলে দেশকে আবার ফিরে পাব। মনুষ্যত্ব হীন দেশ আবার তার স্বাধীনতা হারাবে। স্বদেশ বোধের মানস কন্যা মানসী দ্বিজেন্দ্র লালের জীবনাদর্শকে তুলে ধরতে চাইলেন যখন মেবারের সূর্য্য অস্তমিত। " আমার এই ক্ষীন দৃষ্টির সম্মুখে একটা ধূমায়মান মহত্বকে আকাশে মিলিয়ে যেতে দেখেছি। সব গিয়েছে, আর কি আছে জয়সিংহ ?

এখন আছে সেই মহিমার শেষ রশ্মি। এখন দেখছি একটা ম্রিয়মান গৌরব মৃত্যু শয্যায় শুয়ে আমাদের পানে নিষ্ফল করুণ নেত্রে, শ্বাস রোধের অপেক্ষায় মাত্র।" (১। ৩ দৃশ্য)

আর এই হতাশাজনক দেশের পরিবেশ হতে মানসীর মর্মলোক হতে উৎসারিত হলো দেশগান —

কিসের শোক করিস ভাই আবার তোরা মানুষ হ।
গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ।

. . . .

ঘুচাতে চাস যদিরে এই হতাশা ময় বর্তমান।
বিশ্বময় জাগায়ে তোল ভায়ের প্রতি ভায়ের টান॥

দ্বিজেন্দ্র লাল বলছেন, "আমি জানি, বিশ্বাস করি, বেশ যেন দেখতে পাচ্ছি — যে যাই বলুক, যতই কেন আমাদের নগন্য ও হেয় ভেবে উপেক্ষা করুক না কেন — আমরা আবার জাগব, উঠব, মানুষ হব। .... আমি 'দেশ' চিনি না, বিদ্বেষ মানিনা, আমি চাই শুধু বীর্যবল - ব্রহ্মচর্য, চাই শুধু ঐ সত্য নিষ্ঠা, চাই শুধু আসল, খাঁটি, ধ্রুব ও নিটোল ধর্মবল, আর ঐ এক কথায় মনুষ্যত্ব।" ৫২

যে জাতি নিজের হাতে স্বাধীনতা হারিয়ে পরাধীনতার শিকল পড়েছে তাকে নিজেই আবার সেই শৃঙ্খল উন্মোচন করতে হবে।

।। ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ।।

ক্ষীরোদ প্রসাদ ছিলেন স্বদেশী যুগের নাট্যকারদের মধ্যে আদর্শবাদী নাটক রচনা কারী মাতৃ সাধনায় পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করার এক সাধক । নিজে ছিলেন শ্রী সারদামার দীক্ষিত সন্তান । তন্ত্র সাধনার পীঠ পরিবারে তাঁর জন্ম । এক সময় 'থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির' সদস্য ছিলেন । তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হতো ' অলৌকিক রহস্য পত্রিকা ' । তাঁর জীবনে রামকৃষ্ণের বিবেকানন্দের আদর্শ ভাবনার প্রভাব ছিল তীব্র । রামকৃষ্ণের ভক্তিবাদী দর্শন আর বিবেকানন্দের জ্ঞানবাদী বেদান্ত দর্শনের মিলিত ফল ছিল তাঁর স্বদেশ ভক্তির সাধনা ।

তিনি নাট্য সাধনার মধ্যে মাতৃ সাধনার আদর্শকে মিশিয়ে দিয়েছিলেন । তিনি আত্ম শক্তির উদ্বোধন ঘটিয়ে জাতির দুর্দশা ঘোচাতে চেয়েছিলেন । অরবিন্দের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন 'Nationalism is a religion that has come from god'. অরবিন্দ বলছেন " স্বদেশ প্রেমের ভিত্তি মাতৃ পূজা । স্বদেশ মাতা , স্বদেশ ভগবান , এই বেদান্ত শিক্ষার অন্তর্গত মহতী শিক্ষা জাতীয় অভ্যুত্থানের বীজ স্বরূপ । .... এই সপ্ত কোটি বঙ্গবাসী , এই ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর আশ্রয় শক্তি স্বরূপিনী , বহু ভূজান্বিতা , বহুবল ধারিণী ভারত - জননী মাতা , দেবী , জগজ্জননী কালীর দেহ বিশেষ । " তাই অরবিন্দের মতো ক্ষীরোদ প্রসাদও বিশ্বাস করতেন এই অন্তর্নিহিত শক্তিকে আরাধানা করে জাতিকে উদ্ধার করা ছাড়া আর কোন পথ নেই । তাঁর কাছে স্বদেশ প্রেমই ছিল মাতৃ - সাধনার মূল ও প্রতিপাদ্য বিষয় । শক্তির মধ্যে সেই মায়ের মুক্তি সংগীত গাওয়া যাবে এই বিশ্বাস তিনি করতেন । তাই স্বদেশী যুগে এই ভাবনার প্রবাহে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে জাতির চৈতন্যকে সঞ্জীবন করতে চাইলেন । আর এই ভাবনারই ফসল ' বঙ্গের প্রতাপাদিত্য ' (১৯০৩) ।

'প্রতাপাদিত্য' নাটকে তাঁর সাধনার মাতৃশক্তিকে তিনি আহ্বান করছেন, " মহাকালীর মূল মন্ত্র দিগ দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করুক। জন্মভূমির শ্যামল বক্ষে দিন দিন গভীর শেলাঘাত আর সহ্য করতে পারি না। মা করাল বদনে, দুর্বল রক্ষণে, দানব দলনে ... চির প্রসারিত দশহস্ত কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস মা। .... বহুকাল পূর্বে দানব পদ দলিত ধরিত্রীকে রক্ষা করতে ইন্দ্রাদি দেবগণের সম্মুখে উচ্চারণ করেছিলি সেই বাক্য তোর এই অদৃষ্ট নির্ভর সন্তান গুলোকে শুনিয়ে একবার বল।" (২।২ গ)

তাঁর এই নাটক রচনার সময় বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। বাংলায় মানসিকতা গভীর আঘাতে জর্জর। জাতি উদ্বেল হতে শুরু করেছে। সেই সুপ্ত অবস্থায় স্বাভিমান ও দেশ প্রেম জাগাতে তিনি বেছে নিলেন বঙ্গের বীর সন্তান 'প্রতাপাদিত্য'কে। তাঁর লেখনীতে প্রতাপাদিত্য জাতীয় বীর রূপে আখ্যায়িত হলেন। স্বদেশী যুগ চেতনার আন্দোলনে মুসলিম মানসিকতা ছিল নিস্পৃহ। ক্ষীরোদ প্রসাদ জানতেন হিন্দু মুসলিম মিলনের সখ্যরে এক যোগে বলিষ্ঠ আন্দোলন না ঘটলে জাতির দৌর্বল্যই প্রকাশ পাবে। তাই প্রতাপাদিত্য বলছেন —

" ভাই সব, তোমরা সবাই মিলে মা যশোরেশ্বরীর যশোরের সীমা বৃদ্ধি কর। হিন্দু মুসলমান এক মায়ের দুই সন্তান। এক অন্নে প্রতিপালিত, এক স্নেহ রসে সিঞ্চিত। বাল্যে ক্রীড়ায়, যৌবনে মাতৃ সেবা কার্যে প্রতিযোগিতায়, বার্ধক্যে আত্মীয়তায় — এস ভাই সব — আমরা এক প্রাণে, এক মনে মায়ের দুঃখ দূর করি। পরস্পরের সহায়তায় বঙ্গে মহা যশোহরের প্রতিষ্ঠা করি। মাতৃ সেবা কার্যে আমরা ব্রাহ্মণ নই, শূদ্র নই, সেখ নই, পাঠান নই বঙ্গ সন্তান।" (৩।৩গ)

'বঙ্গভঙ্গ' সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য ছিল বাংলায় প্রান্তর হতে উত্থিত জাতীয়তা - বাদ যা সমগ্র ভারত বর্ষকে মাতিয়ে তুলেছে তাকে প্রতিহত করা। বাংলা তখন

ইংরাজের চক্ষুশূল । জাতীয়তাবাদের এই বেদী স্তম্ভকে বিচূর্ণ করার জন্য আয়োজন ' বঙ্গভঙ্গ ' । তাই তদানীন্তন সকলের প্রাণে বাংলার অখন্ডতা রক্ষা করে বাঙালীর মানসিকতাকে প্রদীপ্ত করাই ছিল সাহিত্যকার থেকে দেশ নেতাদের আদর্শ । মুসলমানকে দূরে সরিয়ে রেখে ইংরেজ এই আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে জর্জরিত করতে চেয়েছিলেন । ইংরেজদের এই দুরভিসন্ধি সম্পর্কে তদানীন্তন সাহিত্যকারেরা সজাগ ছিলেন । এই ভাবনার অংশীদার রূপে ক্ষীরোদ প্রসাদ ' প্রতাপাদিত্য ' নাটকে প্রতাপাদিত্য ও ঈসা খাঁর উক্তির মধ্য দিয়ে সেই মিলিত আদর্শ প্রচার করার চেষ্টা করলেন ।

" প্রতাপ আদিত্য । বঙ্গ দেশে আপনার মত দু চারজন হিন্দু - মুসলমান থাকলে কি আর এ দেশের দুর্দশা হয় ? কবে বাঙ্গালার হিন্দু মুসলমান আপনার মতন পাগড়ী বদলা বদলি করবে জনাব ?

ঈসা খাঁ । আশ্বস্ত হও , শীঘ্রই করবে । দুদিন বাদে সবাই বুঝবে বাঙ্গালা মুলুক — হিন্দুরও নয় , মুসলমানেরও নয় — বাঙ্গালীর । " (৪ । ২ গ)

একদিন বাংলা সোনার দেশ রূপে গণ্য হতো । আজ বাংলায় ইংরাজ অত্যাচারে শ্মশানের শূন্যতা । দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত বিদেশী শাসনে লাঞ্ছিত জন্মভূমির দুঃখ দুর্দশায় প্রতাপাদিত্য বিচলিত ? না নাট্যকার ? না তদানীন্তন বাংলার মানুষ ? নাট্যকার বলছেন প্রতাপাদিত্যের মুখ দিয়ে সেই বেদনার কথা ।

" প্রতাপাদিত্য । পথে আসতে আসতে যা দেখলুম , তাতেও যদি জ্ঞান লাভ না হয় , তবে সে জ্ঞান কি আশ্রায় গেলে হবে ? কি দেখলুম , জনাকীর্ণ নগর জঙ্গল হয়েছে । বড় বড় অট্টালিকা ব্যাঘ্র ভল্লুকের বাসস্থান । নদী তীরস্থ বানিজ্য প্রধান বড় বড় বন্দর জন শূন্য । দেব মন্দির বিধর্মীদের আমোদ উপভোগের স্থান হয়েছে । এই রূপ বাসন্তী সন্ধ্যায় যে স্থানে আকাশ আনন্দের কলকলে পূর্ণ থাকত , সেখানে এখন শৃগালের বিকট চিৎকার । যার গৃহে জন্ম ছিল , যে পুজা অর্থে সামর্থে সচ্ছল

ছিল , দেশের অরাজকতায় তার গৃহেই এখন হাহাকার । " (২। ৩ গ)

দেশভক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বঙ্কিমী মানসিকতার বীজ মন্ত্র ' বন্দেমাতরমে ' উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন । মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসার টান তাঁর নাটকে তিনি প্রকাশ করতেন । বঙ্গভঙ্গ যুগে বাংলার দুর্দশায় করুণ চিত্রে মাতৃ প্রেম দেশ প্রেম সতত জাগ্রত হয়েছিল এই দেশ প্রেমের কথাবলা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কালে সাধারণ মানুষের স্বভাবজ ধর্ম হয়ে গিয়েছিল । প্রতাপাদিত্য নাটকে সেই ভাবনার প্রতিধ্বনি পাই । প্রতাপাদিত্য দিল্লী থেকে ফিরে এক্য প্রবেশ করছেন তাঁর প্রিয় জন্মভূমিতে । জন্মভূমি হতে কিছুদিন বিচ্ছেদ তাঁর হৃদয়ে অভূতপূর্ব বেদনার সৃষ্টি করেছিল । প্রতাপ - আদিত্য বলছেন " মা বঙ্গভূমি, তোমার এই প্রাণোন্মাদকর নামের ভিতর এত মধুরতা , এমন কোমলতা এরূপ ঐশ্বর্য্য , সৌন্দর্য্য লুকানো আছে তা তো জানতুম না । মা , তোমাকে নমস্কার , তোমাকে নমস্কার , কোটি কোটি নমস্কার , বারম্বার নমস্কার । কিন্তু কি করি ? কেমন করে যশোহরের মর্য্যাদা রক্ষা করি ? করতেই হবে । মান যাক , যশ যাক , তথাপি বঙ্গভূমিকে শত্রু পদদলন থেকে রক্ষা করতেই হবে । " (৩ । ১ গ) আবার এই মনোভাব অন্যত্র ব্যক্ত করে প্রতাপাদিত্য বলছেন " সম্মুখ সমরে , দেশ ত্যাগে যে স্বর্গ , আমি সে স্বর্গ চাইনা ম যে কার্য্যে স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমির বিন্দুমাত্র উপকার হয় সে কার্য্যে যদি নরকও অদৃষ্টে থাকে , যদি বুঝতে পারি মা আমার বেঁচেছে — তা হলে হাসি মুখে নরকেও প্রবেশ করতে পারি । " (৪ । ৪ গ)

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালী সব বলে বলীয়ান হয়ে উঠেছিল । ঐক্য বদ্ধ জাতি হয়ে ইংরাজের শক্তি ও দমননীতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল । এই নব জাগ্রত শক্তির অভ্যুদয় সম্পর্কে ক্ষীরোদ প্রসাদ অবহিত ছিলেন । প্রতাপাদিত্য নাটকে সূর্য্যকান্তের মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি সাধনে কি ভাবে ঐক্যবদ্ধ বাংলা গড়ে উঠতে পারে তার ভাবনা তিনি করেছেন ।

" সূর্যকান্ত। জানি মহারাজ। আমি বহু যোদ্ধাকে সংগ্রামে পরাস্ত করেছে। কিন্তু এটাও জানি — বাঙালায় তার প্রতিদ্বন্দ্বী বাঙালী। আমি দাক্ষিণাত্যে এক এক যুদ্ধে এক এক সেনাপতিকে পরাস্ত করেছে। কিন্তু একটি জাতি যে যুদ্ধের সেনাপতি যে স্থানের অগণ্য সৈন্য একমাত্র প্রাণের আদেশে পরিচালিত, আমি কখনও সেই রূপ সৈন্যের সম্মুখীন হয় নি। প্রকাণ্ড বাহিনীর ধ্বংস হয়, কিন্তু এক প্রাণে পরিচালিত একটি জাতি অতি ক্ষুদ্র হলেও তার বিনাশ নেই। মহারাজ, কাঠবিড়ালী দিয়েই সাগর বন্ধন। রেণু রেণু সঞ্চিত মৃত্তিকা কণায় সাগর হৃদয় ভেদ করে যে বাঙালার সৃষ্টি, সে বাঙালায় সঞ্চিত ক্ষুদ্র বাঙালী শক্তি কণায় কি সম্রাটের বিশাল শক্তির বিলোপ হতে পারে না ?" (৪ । ২ গ)

বাংলার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন দেখে ইংরেজও বিচলিত বোধ করেছিল। আকবরের মুখ দিয়ে ক্ষীরোদ প্রসাদ সেই উক্তিই করেছেন, " বাঙালীতে একতা এসেছে। বাঙালী একটা জাতি হয়েছে। বাঙালার বিদ্রোহ তুচ্ছ ভুঁইয়ার বিদ্রোহ নয়। সাত কোটী বাঙালীর বিশাল জাতীয় অভ্যুত্থান।" (৫ । ১ গ) এই উক্তি যেন তদানীন্তন ভারতের ইংরাজ শাসকের উক্তি। স্বদেশী আন্দোলনের তীব্রতা দেখে যারা অনুভব করেছিলেন বাংলা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

ক্ষীরোদ প্রসাদের বঙ্গভঙ্গের পটভূমিকায় আরেকটি নাটক 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৭)। বাংলার নবাবী যুগের গোধূলি বেলায় সিরাজ ও মীর কাসিমের বিষয়বস্তুকে নিয়ে নাটকের বিষয়। ঐতিহাসিক উপাদানকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত হয়ে এই দুই ঐতিহাসিক ব্যক্তির কর্ম প্রয়াস তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে এই নাটকে। এই 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের মুখবন্ধে ক্ষীরোদ - প্রসাদ বলেছেন, " ইহার ঐতিহাসাংশে বিহারী বাবুর 'ইংরাজ জয়' শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায় মহাশয়ের 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' ও শ্রীযুক্ত অক্ষয় মৈত্রেয় মহাশয়ের 'মীর কাসিম' নামক গ্রন্থ হইতে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।"

'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' নাটক সম্পর্কে সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী মন্তব্য করেছেন, "গিরিশের সিরাজদ্দৌলার ছাপ পড়েছে ক্ষীরোদ প্রসাদের 'বাংলার মসনদের' সরফরাজ খাঁর ওপর আর মীর কাসিমের অপূর্ব আলোয়, বাঙালীর মনের ভাবালুতাকে নিঙড়ে গিরিশ চন্দ্রের মেধার পূর্ণ সুযোগ কেবল অর্থকরী রূপে ব্যবহার করার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত। এই নাটক রচনার পেছনে সমসাময়িক কালের উত্তেজনার ছাপ আছে।"

ক্ষীরোদ প্রসাদ এই নাটকে সিরাজদ্দৌলাকে স্বদেশপ্রেম স্বাভিমানী নবাব রূপে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছেন। মীর কাসিমের উক্তির মধ্য দিয়ে এই ভাবনাকে প্রকাশ করেছেন নাটককার। মীর কাসিম বলছেন "সিরাজ দৌল্লার পর বাংলায় আর নবাব নেই।" (৩।৪ গ) অন্যত্র মীর কাসিমের উক্তি "মুর্শিদাবাদের মসনদ — তাতে বসা এখন নবাবী না গোলামী? নবাবী সিরাজদৌল্লার সঙ্গে সঙ্গে চলে গেছে। নবাব নিষ্ঠুর ঘাতকের হাতে শুধু নিজের প্রাণ দেন নি, সঙ্গে সঙ্গে বাংলার প্রাণটা পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছে।" (১।৫ গ)

মীর কাসিম ইংরেজদের ব্যবসা ও বানিজ্যে দস্তক নিয়ে অবাধ বানিজ্যে আঘাত দিয়েছিলেন। মীর কাসিমের প্রজাবৎসল্যের চিত্র নাটককার এঁকেছেন। "মীর কাসিম। এতে বাধা না দিলে ত দেশ বাঁচবে না। পাপে ক্রমাগত লিপ্ত হয়ে তাদের ধর্ম জ্ঞান একেবারে লোপ পেয়েছে। .... সময়ের অপেক্ষা করতে করতে দেশ রসাতলে যায়। আর প্রাণের জ্বালা সহ্য করতে পারছি না — একবার প্রতিবাদ করে লোক পাঠাই। .... উৎসব আড়ম্বর একেবারে বন্ধ করে দিন। বিলাসিতা তুলে দিন। আর যে সকল অকর্মন্য শুধু বসে বসে সরকারের মাসোহারা ভোগ করছে তাদের মাসোহারা বন্ধ করুন। .... প্রজা না খেয়ে মরবে আর তাদের অন্নে দেহ পুষ্ট করে কেউ যে ঘরে বসে পর নিন্দায়, পাপ চিন্তায় আর চক্রান্তে সময় নষ্ট করবে, তা করতে দেব না।" (৪।১ গ)

'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' যেন বিশ্বাস ঘাতক মীরজাফরের প্রায়শ্চিত্তের কাহিনী। অতীতের কথা স্মরণ করে আজ তাঁর হৃদয় বেদনাদীর্ন। বাংলার রাজ্য শাসনে ইংরাজ প্রাধান্যে বাংলা নিঃস্ব। বাংলার শিল্প গুলি বিধ্বস্ত। দেশীয় বানিজ্যের অবলুপ্তি ঘটানো হচ্ছে। যুগোপজীবী সেই চিত্র ক্ষীরোদ প্রসাদ মীরজাফরের উক্তিতে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন।

"মীরজাফর। কি হে গুরগণ ? আর দেখতে পাই না কেন ?

গুরগণ। হজুরালি জানেনই তো কাপড়ের সন্ধানে গোলামকে বাঙালার নানা স্থানে যেতে হয়।

মীরজাফর। সে রকম মলমল আর দেখতে পাই না কেন গুরগণ ?

গুরগণ। শুধু মলমল কেন জাঁহাপনা। আর কোন সামগ্রীই দেখতে পাবেন না। বাঙালার সে সকল অপূর্ব শিল্প দেখতে দেখতে লোপ পায়।

মীরজাফর। কেন বল দেখি।

গুরগণ। কোম্পানীর এক চেটে ব্যবসা সব খেয়ে দিল। কারিগর সব একটি একটি করে সরে পড়েছে। তারা বলে এ সমস্ত সামগ্রী সখের দর। দাদনের বাঁধনে পড়লে এত মেহনত পোষায় না। দু এক জন ইংরেজ ব্যবসাদার বেশি খাটিয়ে অল্প পয়সা দেয়। না দিতে পারলে অত্যাচার। হুজুরের তরফ থেকে তার কোনও প্রতিকার হয় না। কাজেই তারা একে একে গা ঢাকা দিচ্ছে।

মীরজাফর। তা হলে দেখছি ব্যবসা গুলো ক্রমে ক্রমে যেতে লাগলো।

গুরগণ। যেতে লাগলো কি জাঁহাপনা, এক রকম গিয়েছে। কৌনসিলে দরখাস্ত ত সকল লোকে করতে পারে না। তারা জানে নবাবই রাজা — নবাবই রফা কর্তা। কিন্তু গোস্তাকি মাপ হয়, নবাব তার কোনও প্রতিকার করতে পারেন না।.... অত্যাচারে ভাল ভাল তাঁতি সব বুড়ো আঙুল কেটে ফেলেছে, যা তে তাঁতে হাত না দিতে হয়। আপনার এই মেদিনীপুরের এলাকায় প্রায় লাখো তাঁতিয়া তুঁতের চাষ করত — রেশমের ব্যবসা উঠে যাচ্ছে — তারা না খেতে পেয়ে চুরি ডাকাতি আরম্ভ করেছে।" (২। ১ গ)

ইংরেজ এই নির্দয়ে শোষণ ও অবাধ লুণ্ঠন সেদিন ঐতিহাসিক দিক দিয়ে জীবনে সত্য ছিল। স্বদেশী যুগে ইংরেজদের অত্যাচার ও শোষণের কথা তুলে ধরে জনতা জাগৃতির প্রয়োজন ছিল তীব্র। নাট্যকার সেই কথা মনে রেখেছিলেন। সেই যুগে ব্রিটিশ বনিকদের শোষণ কিরূপ তীব্র হয়ে উঠেছিল তার বিবরণ আমরা দেখতে পাই কলকাতা মেয়র কোর্টের জজ মিঃ উইলিয়াম বোলটস এর বিবরণে।

"We come across to consider a monopoly, the most cruel in its nature and most destructive in its consequences to the company's affaivs in Bengal of all that have of late been established there. Perhaps it stands unparrelleded in the history of any government that ever existed on earth considered as a public act, and we shall be not less astonished when we considered the men who promoted it and the reason given by them for the establishment of such exclusive dealings in what may there be considered as necessaries of life". ৫৬

কোম্পানীর গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট ও এই অবাধ লুণ্ঠনকে সমর্থন করেন নি। ক্ষীরোদ প্রসাদ নাটকে ভ্যান্সিটার্টের মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন, " আমি নবাবের কথা বলিয়া যা বুঝিয়াছি তাহাতে তাঁহার কোন অপরাধই আমি দেখিতে পাই না। দিবারাত্র প্রজার হাহাকারের মধ্যে বসে কোন রাজা কখনও কি রাজ্য করিতে পারে। তা দয়াবান মীর কাসিম কেমন করিয়া পারিবেন। আমার কাছে প্রজার কথা তুলিতেই তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। তাহার পর আমি সন্ধান লইয়া জানিয়াছি সমস্ত দোষ আমাদের। .... অর্থের প্রলোভনে ইহাদের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে। ইহারা শুধু নবাবের অনিষ্ট করিতেছে না, কোম্পানীরও যথেষ্ট অনিষ্ট করিতেছে। .... (আলিবর্দী)

" I say Mr Amyatt, I am sorry to say. We are entirely to blame for this regrettable transaction and Nawab is perfectly justified in putting a stop to this illegal trade. There are ample proofs. I have received private intelligence, that a party of sepoys who were sent to Sylhet by the gentleman at Dacca, on account of some private dispute, fixed upon and killed one of the principal people of the place and afterwards made the Zaminder prisoner....If this shameful oppressive systems be not checked, the respective class of native merchants will be ruined, whole districts will be impoverished the entire native trade will be disorganised. I think that the honour and dignity of our nation will be best maintained by scrupulous and careful restraint of the 'dustuck'." (৪।৩ গ)

ইংরেজের এই নিষ্ঠুর চরিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে বলে তাই রাজরোষে 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' নাটক বাজেয়াপ্ত হয়। " জাতি ধর্ম নির্বিশেষে দেশের সকলকে মাতৃমূর্তি বন্দনায় ক্ষীরোদ প্রসাদ উদ্বুদ্ধ করেছিলেন বলেই জনসাধারণের কাছে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলির আবেদন ছিল অপরিসীম। বাঙালীর শান্ত শীতল ধমনীতে সেদিন নবজাগরণের যে অগ্নিস্রোত প্রবাহিত হয়েছিল, ক্ষীরোদ প্রসাদের নাটকে তারই প্রতিফলন ঘটেছে বলেই নাটকগুলির অভিনয় সাফল্যে ইংরেজদের মনে বিষক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। " ৩৪

স্বদেশী যুগে নাট্যজগতের দেশ প্রেমের এক রোমান্টিকতার ছোঁয়া লেগেছিল। বাংলার অনবদ্য প্রকৃতিকে কি ভাবে পরাধীনতার লেলিহান শিখা গ্রাস করে নিচ্ছে

এই ভাবনায় দেশপ্রেমিক নাট্যকারেরা বড় চিন্তিত ছিলেন । দেশ প্রেমের সেই ভাবনা স্বদেশী যুগে সভা সমিতির বক্তৃতা মঞ্চ হতে নাট্যালয়ের রঙ্গ মঞ্চ পর্যন্ত সেই ধারা এসে পৌঁছিত । 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্তে' মীর কাসিমের ভূমিকায় অমৃতলাল মিত্র যেন স্বদেশ ভাবনাকে মথিত করে তুলতেন তাঁর জলদ কন্ঠস্বরে , "পশ্চিমা দিক রাক্ষসীর ওই অনন্ত প্রজ্বলিত ক্ষুধা শত লোলরসনায় বাঙালার শ্যাম বনাচ্ছন্ন বেলাভূমিকে স্পর্শ করেছে । যতই দেখছি , ততই প্রাণের ব্যাকুলতায় আমি অস্থির হচ্ছি । সম্মুখে স্বদেশ রক্ষা রূপ উচ্চাভিলাষের প্রশস্ত পথ মুরশিদাবাদের দিকে পড়ে রয়েছে । আত্মশক্তিতে যে নির্ভর করে সেই এই পথে অগ্রসর হোক । .... গৌড় । তুমি নীরবে ঘন পত্রের অবগুন্ঠনে ধ্যানমগ্না যোগিনীর ন্যায় মানুষের অপেক্ষা করছ । হে ঈশ্বর , গৌড়ের কামনা পূরণ কর । তার বন্ধন মুক্তির জন্য বাঙালায় একজন মনুষ্য ভিক্ষা দান কর ।" (২।৫ গ)

"The lion(Amritalau Mitra) was worn out with age and diseased. Even in that condition such flashes of lightening were now and then omitted by him at the Palasheer Prayaschitta that used to send a thrill to the hearts of the audience".- Indian Stage(Vol IV). H.N.Dasgupta P. 159.

ক্ষীরোদ প্রসাদ ১৯০৮ এ রচনা করলেন 'নন্দকুমার' । 'নন্দকুমার' ক্ষীরোদ প্রসাদের দৃষ্টিতে অমর শহীদ । স্বাধীনতাকামী, ইংরাজ বিতাড়ণকারী যজ্ঞের পুরোহিত । তাঁর বিচারের প্রহসনকে ক্ষীরোদ প্রসাদ ষড়যন্ত্র মূলক হত্যা মনে করেছেন । বিনা অপরাধে তাঁর প্রাণ দন্ড তাঁকে বীরের আসনে আসীন করেছে ।

'নন্দকুমার' ইতিহাসের পাতায় ইংরেজ এর বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য কতখানি সোচ্চার ছিলেন তা সম্পর্কে সন্দেহ থাকতে পারে । তাঁর জীবনের কার্য্যাবলীতে ইংরেজ বিদ্বেষ কতখানি ছিল তা সচরাচর আলোকে আসেনা । প্রখ্যাত

ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার নন্দকুমার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ,"

"So far as we can judge from the facts at our disposal there seems to be little doubt that Nanda Kumar had made an attempt do injure the cause of the company. It may also be admitted that he was possibly willing to drive the English out of Bengal. But it is very difficult to ascertain the real motives behind all this. His proposal to Mir Kasim shows that he was probably actuated by the notives of full interest rather than patriotism. His intrigue with Shuja-ud-daulah, if it can be regarded as a fact, may be interpreted to mean that he wanted do expiate hisformer sin(helping Clive to capture Chandernagore and thereby defeat Siraj-ud-daulah) by making a last minute effort do drive out the English. But this is at best doubtful. As regards his intrigues with the French government at Pondichery, the Raja of Burdwan and other rebellious Zamindar, they may be regarded as the actions of man, naturally disposed to intrigues, on behalf of his master rather any organised attempt against the English. On the whole, it is difffcult to assert with any amount of certainty, that Nanda Kumar's action was inspired by a patriotic zeal to free his country from the yoke of the British.

But whetever we might think of the motives of Nanda Kumar, the capital punishment inflicted upon him had evidently nothing to do with these previous transactions. Whatever may be our views about the legality of his conviction and of the sentence passed upon him by the supreme court, there is nothing to show that it was influenced in any way by any previous action of

Nanda Kumar against the interest of the British government.... There is, therefore, no reasonable ground do suppose that Nanda Kumar died a martyrs death". ৫৬

ক্ষীরোদ প্রসাদের কাছে নন্দ কুমার ছিলেন এক জাতীয় নেতা । তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে শক্তি সাধনা তপস্যা এই জাতি তার দৌর্বল্যকে অতিক্রান্ত করতে পারবে ক্ষীরোদ প্রসাদ এই বিশ্বাস করতেন । নন্দ কুমারের গুরুদেব বাসু - দেব শাস্ত্রী যেন সেই শক্তির দেবীকে আবাহান করছেন —

" এ কি করলি মা চৈতন্য রূপিণী ? বাঙালীর কোন পাপে তাকে পরিত্যাগ করে গেলি ? চারিদিক থেকে স্বার্থরূপী রাক্ষস বাঙালাকে গ্রাস কর্তে একসঙ্গে হাত বাড়িয়েছে । এই ঘোর দুর্দিনে তার সন্তানদের চেতনা বিহীন করলি ? এক মুহূর্তের অন্ধকার যখন কল্পান্ত সময় বলে বোধহয় , তখন কতকালের জন্য এই অভাগা জাতির মাথায় এই ঘনান্ধকার ঢেলে দিলি ? ধর্মহীনের মনুষ্যত্ব থাকে না , মনুষ্যত্বের সঙ্গে মান যায় , মর্য্যাদা যায় , স্বাধীনতা যায় । পর পদ - দলিত জাতির ওপর প্রকৃতি মানুষে একসঙ্গে নির্মম ভাবে অত্যাচার করে । দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি দৈব পীড়নে সোনার গৃহ শ্মশান হয় , ভাই ভাইকে চিনতে পারে না , পিতা মাতা মোহান্ধ হোয়ে সন্তানের কল্যাণ আর বুঝতে পারে না ।

কিরীটেশ্বরী যে কিরীটের ঔজ্জ্বল্যে একদিন জগৎকে বিমোহিত করেছিল , জ্ঞানের সেই পূর্বালোক কোন গুপ্ত ভাণ্ডারে লুকিয়ে রাখলি ? তোর সেবক বাঙালী তোরই রূপ প্রভায় কোথায় সমস্ত ধরণী অজ্ঞানান্ধকার দূর করবে , তা না কোরে দিগন্তের অন্ধকার প্রলয় তরঙ্গ নিয়ে তাকে গ্রাস করতে আসছে । তামস ময় জলদ মালা বন্যার বারিরাশি , শূন্যে শকুনি গৃধিনীর পরিক্রমন , নিম্নে ক্ষুধার্ত ফেরুর চীৎকার , মা বাঙালীকে রক্ষা কর । " (২। ৫ গ)

নন্দ কুমারের মৃত্যুতে নাটককার স্তব্ধ হয়ে গেছেন । বিশাল কর্ম যজ্ঞের এক সেনাপতি নিদ্রিত । বাসুদেব শাস্ত্রী বলছেন , ' এই ভারতবর্ষের উদীয় মান মহানগরীর বায়ু এক সঙ্গে দুটি সামগ্রী নিয়ে খেলা করছে । বামে দুর্গ শিরে একটি রক্ত বর্ণ পতাকা আর দক্ষিণে এই মধ্যুলাম্বিত ব্রাহ্মণের দোদুল্য শব । হিন্দু , তোমার সিংহ বাহিনীর সিংহ আজ শ্লেচ্ছের অঞ্চল আশ্রয় করেছে , আর তোমার ব্রাহ্মণ আজ শক্তিহারা শব । .... নন্দকুমার দুলুক দুলুক , তোমার এ যজ্ঞোপবীত বিভূষিত শব বায়ুতে আন্দোলিত হোক । দুলতে দুলতে তোমার শব হিন্দুকে স্মরণ করিয়ে দিক যে ব্রাহ্মণের শক্তির অবসানে সকল বর্ণের শক্তি লোপ । শক্তি লোপই আর্য্য জাতির পতন । " (৭। ৯ গ)

ইংরেজরা চক্রান্ত করে নন্দ কুমারের ফাঁসী দিয়েছিল । নাটককার ইংরেজদের সেই স্বরূপ উন্মোচিত করেছেন । তাই রাজরোষে এই নাটকটিও বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় । নন্দ কুমার সম্পর্কে সরকারী নোটে লিখিত আছে , "
"Proscrided by Govt. under Sec(4) press Act and 3, Dramatic performance Act(Notification Nos 79 N and 80 N dated 18th Jan 1911. Also considered by legal R 10 cons. under sec 124A and 153A I.P.C.
Based on incidents alleged to have led to the execution of Maharajas Nandakumar taken off the boards by a theatrical company in Calcutta by arrangement with the commissioner of Police". ৫৭

ক্ষীরোদ প্রসাদের ' বাংলার মসনদ ' (১৯১০) , ' পদ্মিনী ' (১৯০৬) প্রভৃতি নাটকেও জাতীয়তা বাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে । দেশ প্রেমের উদ্বেল প্রবাহ নাট্যকার বইয়ে দিতে চেয়েছিলেন সেই স্বদেশী যুগের কালখন্ডে । হিন্দু মুসলিম ঐক্য চেতনার কথাও প্রকাশিত হয়েছে । কোথাও বা নাট্যকার ইতিহাসের গতি থেকে সরে এসে নাটকগুলিতে ভাবনাদর্শ (Idiological sentimentalism) এর প্রবক্তা হয়ে উঠেছিলেন । যুগ চেতনার দিকে দৃষ্টি রাখলে এটাই বোধহয় স্বাভাবিক ছিল । ডঃ প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য্য বলেছেন , " ইতিহাসের শাশ্বত মূল্যকে অস্বীকার করবার পিছনে সে যুগের নাট্যকারদের এক গূঢ় কারণ ছিল বলে মনে হয় । স্বদেশ চিন্তার যৌবন মুক্তি পর্যায়ে নাট্যকারেরা দেশ ও জাতি ব্যতিরেকে অন্য কিছু ভাবতে পারতেন না । সুতরাং তাঁরা স্বদেশবাসীর হিতের জন্যই ইতিহাসের তথ্যকে লংঘন করেছিলেন । দ্বিতীয়ত মুসলমান রাজ চরিত্রের নব মূল্যায়নের কারণ টি ছিল আরও গভীরে । একথা সর্বজন স্বীকৃত যে মুসলমান সম্রাট অথবা বাংলা দেশের নবাবদের অধিকাংশই ছিলেন অমিতাচারী ও হিন্দু বিদ্বেষী । ইতিহাসের এই নির্জলা সত্যকে যুগধর্মের প্রচ্ছদ পটে গ্রহণ করা ছিল একেবারে অসম্ভব । যুগ নেতারা জাতীয় সংহতি বজায় রাখবার জন্য হিন্দু মুসলমানের ঐক্য গড়ে তুলতে বিশেষ তৎপর ছিলেন । নাট্যকাররাও অনুরূপ চিন্তায় প্রভাবিত হন । ইংরেজ সরকারের বিভেদ নীতিকে ব্যর্থ করে দেবার উদ্দেশ্যেই তাঁরা ইতিহাসের উপাদানকে ভেঙে চুরে নতুন ছাঁচে গড়ে নেন । তাঁরা ঐতিহাসিক নাটক লিখতে চান নি , চেয়েছিলেন ইতিহাসের বেদীতে জাতীয়তার নির্ভিক মন্ত্র প্রচার করতে । " ৩৮

ক্ষীরোদ প্রসাদের এই যুগের পটভূমিকায় আরেক রচিত নাটক ' দাদা - দিদি ' । রচনা কাল ১৯০৮ । অর্থনৈতিক শোষণ বিদেশী দ্রব্যের প্রতি আকাঙ্খা , মদ্যপান , প্রভৃতি নিয়ে যে এক অরাজক পরিস্থিতি ঘটেছিল তা বিশ্লেষণ করেছেন নাট্যকার । এই নাটক স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটভূমিতে রচিত । নাটকটি

রঙ্গ নাটক ও রূপক নাটক রূপে স্বীকৃত । ইংরেজ সরকারের শোষণ কে তীব্র আক্রমণ করেছেন ক্ষীরোদ প্রসাদ ।

এই নাটকের প্রতিটি চরিত্র এক একটি তাৎপর্য্য বা অর্থবহ পরিণাম বহন করছে । তক্ষক ও শঙ্খিনী চরিত্রে লেখক ইংরেজ পুরুষ ও ইংরেজ রমণীকে চিত্রিত করেছেন । চন্দ্র বিন্দু ও চিত্র লেখা , হট্টমালার বড়ঠাকুর ও বড় ঠাকুরাণী বাংলা তথাকথিত শিক্ষিত ও অনুকরণ প্রিয় শ্রেনীর মানুষ রূপে নাট্যকার চিত্রিত করেছেন ।

দেশকে কিভাবে উচ্ছন্নে নিয়ে যাচ্ছে তক্ষক আর শঙ্খিনীর কথোপকথনে বোঝা যায় ।

" তক্ষক । বস , আর কী , আর কী এত দিনে আমাদের পরিশ্রম সার্থক , জন্ম সার্থক ।

শঙ্খিনী । আমাদের দেশের বরফ সার্থক , পেটের খিদে সার্থক । পেটের জ্বালায় আমরা হট্টমালাকে গ্রেপ্তার করেছি ।

তক্ষক । .... এখানকার মাটি থেকে আরম্ভ করে মানুষ পশু পক্ষী , ঘর বাড়ী - এমন কি উপরে খেচরের মধ্যে ঘুড়ী আর নীচে চতুষ্পদের মধ্যে তক্তপোষ পর্য্যন্ত উদর গত করতে হবে , বুঝেছো , কিন্তু জুগোপিষা , অর্থাৎ জুগুপ্সা অর্থাৎ মূল মন্ত্র গোপন রাখতে হবে — কাক পক্ষী পর্য্যন্ত কেউ যেন এ মন্ত্রের কথা জানতে না পায় , জানবো তুমি আর আমি — তা হলে সঙ্গে সঙ্গে করতে হবে চিকিমিষা অর্থাৎ চিকিৎসা , বোঝাতে হবে তোমাদের বিষম রোগ — তোমরা ওষুধ না খেলে আর বাঁচবে না । " (তৃতীয় দৃশ্য)

তক্ষকের উক্তি আরেক স্থানে লক্ষণীয় —

" তক্ষক । যাবো যাবো — ব্যস্ত হয়ো না — সমস্ত দেশটি যখন খেতে তবে ,

তখন রয়ে বসে ধীরে ধীরে খেতে থাকো। যে রকম করে ভেড়া – ছাগল – মৃগ – মহিষাদি খেতে আরম্ভ করেছ, তাতে ওঁরা আর বেশীদিন দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে চরবেন না। দু দিন পরে থেকে সব ফাঁক। তখন এদের ইহকাল পরকাল খাওয়া ভিন্ন গতি থাকবে না।" (সপ্তম দৃশ্য)

বিদেশী দ্রব্য ছাড়া যেন জীবনটা অচল। বিদেশী বিলাসী দ্রব্য ব্যবহার না করলে জীবন যেন ব্যর্থ হয়ে গেল। এই ভাবনাকে নাট্যকার কশাঘাত করেছেন।

" তক্ষক। এই দেখুন আপনার হাতে দুঃখু - ছড়ি নেই। (চন্দ্রবিন্দুর হস্তে ছড়ি দান)

শঙ্খিনী। এই দেখুন আপনার বুকে দুঃখু - ঘড়ি নেই। (চিত্রলেখাকে ঘড়ি দান)

তক্ষক। এই দেখুন আপনার পায়ে দুঃখু – মোজা নেই।

শঙ্খিনী। এই দেখুন আপনার নাকে দুঃখু - চসমা নেই। (নানা ভাবে চন্দ্রবিন্দু ও চিত্রলেখাকে সজ্জিত করণ)

চিত্রলেখা। তাই ত প্রাণেশ্বর, এ সব ত আমাদের কিছু ছিল না।

চন্দ্রবিন্দু। তাই তো প্রাণেশ্বরী, এত কাল বড় দুঃখেই ত দিন যাপন করেছি।

তক্ষক। এখনও হয়েছে কি – আপনাদের অনন্ত দুঃখু – ঘরে চলুন একটি একটি করিয়ে দেখিয়ে দিই তো। (তৃতীয় দৃশ্য)

গ্রাম বাংলার সংস্কৃতি হচ্ছিল ধ্বংস। গ্রামের কুটির শিল্প শেষ হয়ে গিয়েছিল। বিদেশীয়ানা গ্রামের আঙিনায় প্রসারিত হচ্ছিল। সেই প্রসঙ্গে একটি দৃশ্য।

" কেশিনী। .... তোমরা কি করছ - কাজ, ছি, ছি, আর কর না – আমরা এতকাল অন্ধকারে ডুবেছিলুম, তাই নিজের সুখ দুঃখ কি তা বুঝতে পারিনি। কাজ অসভ্যে করে, যে সভ্য সে আমার মতন পোষাকে পরিচ্ছদে কেবল আমোদে আহ্লাদে লটিঘটি হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

৪র্থ স্ত্রী — এ বেশ তুমি কোথায় পেলে বোন ?

কেশিনী — কেমন , এ বেশ তোমার চক্ষে ঠেকছে কেমন ?

১ম স্ত্রী — ঠেকছে ত ভাল , কিন্তু তাই ধোপে টিকবে না ।

কেশিনী — না টেঁকে তোমার আমার কি ? চরকা না ঘুরিয়ে, তাঁত না দুলিয়ে , মাকু না চালিয়ে — সুতো না সরিয়ে — চোক না ক্ষরিয়ে — আর বেশি কত বলব — মন না মরিয়ে যদি ঘরে বস , পায়ের ওপর পা দিয়ে যদি ওই রকম সামগ্রী জোগান পাই , তাতে - তোমার ওই টাঁকসই শাড়ী কাপড়ের মুখে ছাই । "

এই কেশিনী পরে সুগন্ধীযুক্ত রুমাল বার করে । বিদেশী গন্ধে আমোদিত হয় ঘর ।

" সকলে । আ , আ , প্রাণ মেতে তোল , কি গন্ধ - কি গন্ধ —

১ম স্ত্রী । তাই ত এ কি গন্ধ ।

কেশিনী । এখন বুঝতে পারছ । তোমাদের স্বামীরা অর্থাৎ তোমাদের সোয়ামীরা , তোমাদের কি অন্ধকারে ঘুমের ঘোরে আবৃত করে রেখেছে । " (ষষ্ঠ দৃশ্য)

বাংলার শিল্প নষ্ট করে ইংরেজ সরকার শান্ত হয় নি । দেশবাসীর মেরু - দন্ড সোজা করে যাতে দাঁড়াতে না পারে সেজন্য মদ ও মাদক দ্রব্যের চলে ছিল ঢালাও কারবার । মদ্যপায়ী হলে স্বাভাবিক চেতনাই জাগে না দেশ চেতনা তো দূরের কথা । এক ইংরেজ এই প্রসঙ্গে লিখছেন " In this way began that odious business of poisoning the people, not only of India, but of the whole orient, with the liquors of the supposed more civilized and 'christian' 'West'." ৫)

তাই আমরা শঙ্খিনীর মুখ হতে শুনতে পাচ্ছি সেই সময়কার এক দৃশ্যের কথা ।

" শঙ্খিনী । আমি হাট করে এই ফল নিয়ে এলুম । তাঁতি তাঁত ভেঙেছে – কামার মত্ত হয়ে আপনার গায়ে চোপ মেরেছে – কুমোর জালার ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে বসে আছে – চাঁদের সুধা খেয়ে সকলেই উন্মত্ত – হাট ভেঙে চুরে ছারখার – খদ্দেরের হাহাকার । "

শুধু পুরুষদের নয় বিদেশী মদে মেয়েরাও আসক্ত হয়েছিল ।

" সকলে । (কেশিনীকে) বস – বস – একটু জল খাও –

কেশিনী । জল , হা , হা , তোমাদের এই তরঙ্গ হীন রসহীন জল কি মানুষে খায় ? খানসামা পানি লে আও – (সোডার বোতল লইয়া বালিকার প্রবেশ ও বোতল খোলা)

সকলে । ওগো বোতলে বান ডেকেছে – পালাও – পালাও – ঘর সামলাও ।

কেশিনী । ভয় কি , ভয় কি – (পান করণ)

সকলে । ওমা সে কি – ঢেউ খেয়ে ফেললে । " (ষষ্ঠ দৃশ্য)

এই পরদ্রব্য স্পৃহার প্রতি নাট্যকার আঘাত করতে চেয়েছেন । স্বদেশী যুগের পটভূমিতে জাগাতে চেয়েছেন স্বাভিমান । দেশের দ্রব্যেই কল্যাণ নিহিত আছে । কর্ম্মানন্দের মধ্য দিয়ে তিনি দেশবাসীর কাছে সেই বাণী ব্যক্ত করতে চেয়েছেন ।

" কর্ম্মানন্দ । জান না মূর্খ ? এ অসন্তোষের পরিণাম কি ? এমন ফল - শস্যপূর্ণ বসুন্ধরা , এমন কুসুম - কানন - বাহিনী স্রোতস্বিনী , এমন মরিচী মালীর সপ্তবর্ণ রঙ্গময়ী শিখরিণী – এতেও তোমাদের মন উঠল না । এমন ওষধি পূর্ণ উপত্যকা , সুবর্ণরাশি পূর্ণ শৈলমালা , মুক্তা পূর্ণ জলনিধি – এ পেয়েও তোমাদের তৃপ্তি হল না । তাই যার বহিরাবরণ শুধু সুন্দর , নির্ম্মম কঠোর অভ্যন্তর , এক পার্শ্বে তরুলতা শূন্য , জীব শূন্য চির জনাবৃত অন্ধকার কবলিত তুষার প্রান্তর – উত্তাপহীন প্রাণ হীন চন্দ্রলোকে যেতে তোমাদের সাধ হল । তবে যাও ।

ভগবান কারুর ঐকান্তিক কামনা কখন অপূর্ণ রাখেন না। প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে ঘূর্ণাবর্তে - কাদম্বিনী তোমাদের অদৃষ্ট আকাশ আচ্ছন্ন করতে আসছে।" (তৃতীয় দৃশ্য)

এই খেদোক্তি যেন স্বদেশী যুগের অভিমান হত নেতার কণ্ঠ স্বর। একদিকে ইংরেজের চক্রান্ত ও শোষণ, অন্যদিকে দেশবাসীর নির্লজ্জ নিস্পৃহতায় কাতর ও বেদনা হত দেশ প্রাণের এই অবরুদ্ধ বেদনার ভাষা। তাই এই নাটকে 'কমলা' চরিত্র হয়েছে দেশ মাতৃকার। তিনিও বেদনাহতা। তাঁর খেদোক্তি —

" আমি যাই চলে যাই —
আমার সাধের যাঁতা, সাধের ঢাকা, সাধের চরকাখানি
আমার সাধের মাকু, সাধের থাল, সাধের সেই ঢেঁকি,
আমার সাধের সাথী তারা — আমার প্রাণের বোন ভাই
তারাও চলে আমার সনে, তাই শোকের সীমা নাই।" (তৃতীয় দৃশ্য)

" ক্ষীরোদ প্রসাদ তাঁর 'দাদা ও দিদি' নাটকে ইংরেজ শাসনে দেশ ও জাতির অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের অখণ্ড রূপটি পরিস্ফুট করেছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব কালের সূচনা পর্ব থেকে মহারাণী ভিক্টোরিয়া এবং পরবর্তী কাল পর্যন্ত বাংলা দেশে বৃটিশ নীতিতে কি ভাবে শোষণ ও নিপীড়ণ চলেছিল, দেশের শিল্প বানিজ্য বিলুপ্ত হয়েছিল এবং বিদেশী পণ্য দ্রব্য প্রসারে জাতির আত্ম নির্ভরতা বিলীন হয়েছিল ও পরিশেষে মাদক দ্রব্যের উগ্র প্রসারে দেশবাসীর কশেরুকাতে পচন ধরেছিল - এ সমস্ত কিছুই ক্ষীরোদ প্রসাদ অত্যন্ত নিরাসক্ত ভাবে এঁকেছেন। দীন বন্ধুর 'নীল দর্পন' নাটক যেখানে ইংরেজ অত্যাচারের একটি অধ্যায়, সেখানে ক্ষীরোদ - প্রসাদের 'দাদা ও দিদি' বঙ্গ নাট্য ইংরেজ শাসকদের অত্যাচার ও শোষণের পূর্ণ ইতিহাস। নাট্যকার এখানে কোনো রোমান্টিক কল্পনার বিস্তৃতি বা অতিশয্য ঘটান নি। অবশ্য ক্ষীরোদ প্রসাদের এই অনুসরণের পশ্চাতে 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনের

প্রভাব বিশেষ ভাবে কার্যকরী হয়েছিল । " ৬০

শিশির কর বলছেন , " শিক্ষিত বাঙালীদের বিদেশী পণ্য ব্যবহারের প্রবনতারও বর্ণ করেছেন ক্ষীরোদ প্রসাদ এই নাটকে । বিদেশী দ্রব্যের প্রতি লালসা দেশবাসী কে গ্রাস করেছিল , নাটকার তার বিরুদ্ধে সকলকে সজাগ করেছেন । দলাদলি কি ভাবে ইংরেজের স্বার্থ সিদ্ধি করছিল ক্ষীরোদ প্রসাদ তাঁর চিত্র এঁকেছেন নিপুন ভাবে , বিদেশীয়ানায় নকলের সঙ্গে মদ্যপান বেড়ে যাচ্ছিল , তার বিরুদ্ধে ' দাদা ও দিদি 'তে ধিক্কার আছে । এই রঙ্গ নাট্যে ক্ষীরোদ প্রসাদ দেশবাসীর অন্ধ প্রমত্ততা হীন অনুকরণ প্রিয়তা , আলস্য ও পরনির্ভরতা এবং ফিরিঙ্গী বনিকদের শোষণের রূপটি তুলেধরেছেন । " ৬১

রাজ রোষে পড়ে নাটকটি বন্ধ হয়ে যায় । এই নাটক সম্পর্কে গোয়েন্দা রিপোর্টে লেখা হয় 'One of the plays taken off the Calcutta stages by arrangement between the theatre managers and A Calcutta Police in 1910. It is described as thinly vested seditious allegory". ৬২

দেশ ও জাতির প্রতি তীব্র নিষ্ঠা নিয়ে ক্ষীরোদ প্রসাদ যে সকল নাটক রচনা করেছিলেন যুগ চেতনার কালসীমা অতিক্রম করেও তিনি 'Constructive Nationalist'.

।। অমরেন্দ্র নাথ দত্ত ।।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে অমরেন্দ্র নাথ দত্ত ছিলেন এক পরিচিত নাট্যকার। তিনি সামাজিক নাটকের সাথে সাথে স্বদেশী নাটকও লিখেছিলেন। তাঁর রচিত ফটিক জল (১৯০২), রাধা (১৯০৪), শিবরাত্রি (১৯০৫), ঘুঘু (১৯০৫), বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ (১৯০৫) প্রমুখ নাটকগুলি পরিচিত ছিল।

' বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ' বঙ্গভঙ্গের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা। নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৩১২ সালের শ্রাবণ মাসে। নাটকের মধ্যে লেখক ছাত্রদের স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণের জন্য উদ্দীপ্ত করেছেন। তাদের স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের জন্য প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে বলেছেন। নাটকটি এক রকম প্রচার মূলক রচনা। গতিবিহীন নাটক। সংলাপ পুরোনো পদ্ধতির।

নাটকের শেষে আছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রশস্তির সুর।
"The play ends with a eulogy for Edward VII and a prayer to him to rescind the partition". ৬৬

॥ মনো মোহন বসু ॥

স্বদেশী নাট্যকারদের মধ্যে মনো মোহন বসুর নাম উল্লেখযোগ্য । তিনি ছিলেন চরম পন্থী দেশভক্ত । তাঁর নাটকের বিষয় বস্তুর তীব্র আবেগ অনুভব করে তাঁকে 'বিপ্লবী নাট্যকার' নামে অভিহিত করা হয় । তিনি লিখেছিলেন ' হরিশ্চন্দ্র ' নাটক । কলকাতার ২ নং গোয়া বাগান স্ট্রীট ' ভিক্টোরিয়া প্রেসে ' মুদ্রিত হয় । প্রকাশ চৈত্র ১৩১১ সাল , মার্চ , ১৯০৫ ।

হরিশ্চন্দ্র নাটকের মধ্য দিয়ে মনো মোহন বসু স্বদেশ ভক্তি জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন । তার সাথে সাথে তিনি এই নাটকে ইংরেজদের নগ্ন সাম্রাজ্যবাদকে সুকৌশলে উপস্থাপিত করেন । হরিশ্চন্দ্র নাটকের প্রথম অংশে এইরূপ প্রচুর নিদর্শন আছে । রাজা মন্ত্রীকে বলছেন :

" মন্ত্রী এখন সেই সব শাসন কর্তাদের বিনা দোষে পদচ্যুত করে বিদেশীয় শাসন কর্তার হাতে লক্ষ লক্ষ প্রজার ধন মান প্রাণ সমর্পিত হচ্ছে । উচ্চ কর্ম মাত্রেই দ্বীপের লোক নিযুক্ত । তারা এদেশের কিছুই জানেনা , আপনাদের খেয়ালে যেটা ভাল বোধ হয় তাই করে । দেশীয় বিজ্ঞ লোকেরা পরামর্শ দিতে গেলে উড়িয়ে দেয় । ফলতঃ তারা দেশাচারে যেমন অনভিজ্ঞ , আত্ম গরিমা আর স্বেচ্ছাচারে বেশি মত্ত । অধিক কি , অধীন জাতিকে মানুষ বলেই গ্রাহ্য করে না । " (৫ম অঙ্ক , পৃ ৯৪)

উপরোক্ত প্রচ্ছন্ন ভাবে বৃটিশদের আক্রমন রচিত হয়েছে । মন্ত্রীর উক্তিতে এই ভাবনা আরও সুপরিস্ফুট হয়েছে ।

" মন্ত্রী .... কিন্তু নাগেশ্বরের রাজ্যে যেমন অমিতব্যয়িতা , অসুর জাতির

রাজত্ব কালেও তেমন ঘটে নাই। কাজেই ভারতের লোক এমন দু:সহ করভারে আর কখনও প্রপীড়িত হয় নাই। নাগেশ্বরে যে কতবিধ কর, তার সংখ্যা করা ভার। প্রজারা কোন পুরুষে সে সকলের নাম পর্যন্তও স্মরণ - শ্রবণ করেনি। নাগেশ্বরের সচিবগণ কর গ্রহণে যেন সহস্র কর — তাদের নিয়ন্ত্রিত করের দায়ে ভারতে হাহাকার পড়েছে — যারে অসহ্য বলে। প্রকৃত প্রস্তাবে সেই দশাই ঘটেছে। ঐ শুনন প্রজারা গীতচ্ছলে বোধহয় সেই দু:খই জ্ঞাপন করছে।

নেপথ্যে গীত

" নরবর নাগেশ্বর শাসন কি ভয়ঙ্কর, দে কর, দে কর, কর নিরন্তর
করের দায় অর্থে জর জর।
সিন্ধু বারি যথা শুষে দিন কর
শোণিত শোষণ করে শত কর
কর দাহে নর নিকর কাতর
রাজা নয়, যেন বৈশ্বানর। (১)

তুমি কর মাত্র ছিল দেশে কর,
কে জানিত এত কর দুখাকর?
কর বিনা রাজা করে না বিচার,
ধর্মে নয়, ধনে জয়ী নর। (২)

বাড়ী - ঘর - আলো - শান্তি - জল কর
স্থল পথে আর সেতুর উপর
জলে গেলে তরী ধরে রাজ চর —
শূন্য বই গতি নাহি আরো। (৩)

গো - অশ্ব - শকট - কর
বহুতর -
পশু - নর , কারো নাহিক নিস্তার ।
নীচ কর্মে ঘাটে তাদের তাদের ধরে কর -
নীচাশয় এম্নি রাজেশ্বর (৪)
আয় কর শুনে গায়ে আসে জ্বর ।
অস্থি ভেদী রথ্যা কর কি দুষ্কর ।
লবণ টুকু খাব , তাতেও লাগে কর
কত আর খাব মুনিবর । (৫)

মাদকতা কর হলে দেশ ময় ,
মদ্যের বিপনি , নিত্য বৃদ্ধি হয়
সে গরলে দগ্ধ ভারত নিশ্চয় ।
হাহাকার রব নিরন্তর । (৬)

(পঞ্চম অঙ্ক , পৃ ৯৭)

বৃটিশ শাসন ব্যবস্থায় নিষ্পেষণ-এর সুন্দর চিত্র গীত সুরে ধ্বনিত । অত্যাচারের যাতনার প্রকাশ ভঙ্গীও সুন্দর ।

" মন্ত্রী বলছেন , এখন ভূর্গ দ্বীপ হতে বস্ত্র এসে ভারতের সজ্জারূপে লজ্জা নিবারণ করছে আর যদি সেই বস্ত্র আসা বন্ধ হয় , কাল পরিধেয় বসনের জন্য দেশে হাহাকার পড়ে যায় ? .... বৎসর বৎসর এ দেশের কোটি কোটি মুদ্রা লভ্য স্বরূপ নানা কৌশলে ভূর্গ দ্বীপে চলে যাচ্ছে , তাতে দেশ নিতান্তই নির্ধন হয়ে পড়েছে । (৫ম অঙ্ক , পৃ ৯৮)

নাটকের অভ্যন্তরে এই সমালোচনার আক্রমণ বৃটিশ সরকার সহ্য করতে পারেন নি। চীফ সেক্রেটারী এই সম্পর্কে উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে একটা নোট দেন। তাতে বলা হয় 'Please see note and translation below of the play 'Harish Chandra'. The words themselves bear evidence that the present administration is meant. The paper may be sent to L.R. to consider action to be taken in connection the general question.
This 8th edition of the book was brought out in 1905. First edition came out 1880 A.D. but it is probable that objectionable passages did not appear in the former edition".

এই নোটের ফলে নাটকটি নিষিদ্ধ হয়ে যায়।
"........this Govt here issued prohibiting the performance of the play entitled 'Harish Chandra Natak', 8th edition, undersee 3 of the Dramatic Performance Act,1876". ৬৪
বহু অনুরোধেও এই নিষিদ্ধ নাটকের আদেশ প্রত্যাহার করা হয় নি।

মনো মোহন বসুর স্বদেশী যুগের পটভূমিতে লেখা আরেকটি নাটক 'সমাজ'। নাটকটি ইংরাজের রক্তচক্ষুর নির্দেশে নিষিদ্ধ হয়। নাটকটি সামাজিক পটভূমিতে রচিত। তদানীন্তন সমাজের স্বদেশী আন্দোলন স্বাভাবিক ভাবেই এই নাটকে স্থান করে নিয়েছে। কমলা এর নায়িকা, এক গরীবের মেয়ে। জমিদারের

পুত্র পরেশের সাথে তার বিবাহ হতে, নানা রূপ জটিল প্রক্রিয়ায় নাটকটি প্রবাহিত। সেই সঙ্গে কিছু স্বদেশী যুবক অতুল, শরৎ এদের স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার ও আন্দোলনের কথায় নাটকটি পূর্ণ। এই নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে সেই সময়কার পরিবেশকে আমরা জীবন্ত রূপে পাই।

" অতুল। ভাই সব আমরা জাতীয় মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছি। কে কোথায় আছ বঙ্গবাসী, সকলে ছুটে এস, এই মন্ত্র গ্রহণ কর, সমপ্রাণে, সমবলে একবার প্রাণ ভরে বল বন্দেমাতরম —

সুরেশ — ওই দেখ আমাদের ভাগ্যাকাশ ঊষার বিমল বরণে রঞ্জিত হয়েছে। এ সময়ে জীবনের এ সুমধুর প্রভাবে, আর নিদ্রিত থেক না। অলস নিদ্রা পরিত্যাগ করে কর্মে প্রবৃত্ত হও। এস ভাই হিন্দু। এস ভাই মুসলমান। এস ভাই খৃষ্টান। আমরা সকলে জাতিগত পার্থক্য ভুলে, মনের সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করে, ভাই ভাই বলে আলিঙ্গন করি। সকলে মাতৃভূমির সেবায় প্রবৃত্ত হই। ভাই সব একবার প্রাণ ভরে বল বন্দেমাতরম।

সকলে। বন্দেমাতরম।

অতুল। চল চল, জাতীয় ধন ভান্ডারের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করব। কে, কোথায় স্বদেশী হিতৈষী আছ, আমাদের ভিক্ষা দাও। ভাই সব, আর একবার প্রাণ ভরে বল বন্দেমাতরম। তোমাদের কণ্ঠ ধ্বনি উচ্চ হতে আরও উচ্চে চলে যাক।

সকলে। বন্দেমাতরম, বন্দেমাতরম, বন্দেমাতরম। "

স্বদেশী যুবকদের জীবন প্রবাহ নাটকটিকে সমৃদ্ধ করেছে। সাথে সাথে আছে ইংরাজ বিরোধী আন্দোলন। অসংখ্য বার উচ্চারিত হয়েছে ' বন্দেমাতরম ' ধ্বনি যা ইংরাজ সরকারের কাছে অসহনীয় ছিল। নাটকটি যেন স্বদেশী আন্দোলনের প্রচার শাখা রূপে ধ্বনিত। তাই ইংরাজ সরকার কর্তৃক এই নাটক নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

।। হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ।।

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের রচিত ' রনজিতের জীবন যজ্ঞ ' নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৩১৫ সালে । ইংরাজী ১৯০৮ সালে । ৭৫ নং কলেজ স্ট্রীট ভট্টাচার্য্য এন্ড সন্স এর পুস্তকের দোকান হতে দেবেন্দু নাথ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত । এর পূর্বে নাট্যকার ' পদ্মিনী ' ও ' দুর্গাসুর ' রচনা করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন । হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের নাটক রচনার পিছনে ছিল দেশের মানুষের স্বদেশ ভাব জাগানো । তিনি নাটকের মধ্যে জাতিকে জাগাতে চেয়েছিলেন । ' তারাবাঈ ' নাটকের ভূমিকায় বা উপহারে সেকথা ব্যক্ত করেছেন সুন্দর ভাবে —

" তা হলে হিন্দু পুনঃ গৌরব তপন
বঙ্গের আকাশে আসি দিবে দরশন ।
সতীত্ব , বীরত্ব , দেশ হিতৈষিতা আলো
জ্বালিয়ে দেশের মুখ করিবে উজ্জ্বল ।
হায় কবে দেখিব রে ভরিয়া নয়ন
বীর পত্নী বীর মাতা বঙ্গ যোষাগণ ।

' রনজিতের জীবন যজ্ঞে ' কিছু ঐতিহাসিক পটভূমি আছে । নাট্যকার বলছেন " যাহাদের সন্দেহ হইবে , তাঁহারা ভরতপুরের প্রতিপক্ষ বৃটিশ সৈন্য - গণ কি বলিয়াছিল তাহা **Thrunton's East Indian Gazeteer P-117** দেখিবেন । " ৬৫

ত্রৈলিঙ্গ ধরের উক্তির মধ্য দিয়ে আমরা আনন্দ মঠের সন্তান দলের আদর্শ দেখতে পাই । তিনি বলছেন " আমি আত্ম রাজ্যের রাজা হবার জন্য এই

মাতৃচিতানল প্রজ্বলিত দেখেছি , আর তুমি জন্মভূমি জননী ভরতপুর রাজ্যের রাজা হয়ে আজীবন স্বাধীনতা হোমানলে মায়ের তৃপ্তি যজ্ঞ সম্পন্ন করতে পারবে না ? সন্তান , তবে তুমি সন্তান রূপে জন্ম গ্রহণ করেছ কেন ? মায়ের আনন্দ ভরা প্রভাত পদ্মবৎ হর্ষোৎফুল্ল মুখখানি সতত নয়নের সম্মুখে রেখে একবার দাঁড়াও দেখি , তোমার জীবনের মহাযজ্ঞে স্বাধীনতা অগ্নি প্রজ্বলিত করে একবার আত্ম সর্বস্ব দান করে দেখি সন্তান । তখন দেখতে পাবে , অমর শান্তি স্বর্গধাম কোথায় । "

(১ম অঙ্ক , ১ম গর্ভাঙ্ক)

ইংরাজ সাম্রাজ্য কি ভাবে জগদ্দল পাথরের মতো কি ভাবে স্বাধীনতাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে তার স্বরূপ আমরা রণজিতের উক্তির মধ্যে পাই ।

" ইংরাজের সঙ্গে সন্ধি করে ভরত পুরের স্বাধীনতা রাখা সম্ভব বলে কি , তাই তাঁর ঘৃণা । কিন্তু উপায় কি ? আজকাল ইংরাজের প্রবল প্রতাপে ভারতের সমুদয় স্বাধীন রাজাই মস্তক অবনত করেছেন । যেদিন দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম সত্ত্বেও ইংরাজগণ কৌশলে পলাশীর যুদ্ধে সোনার বাংলা হস্তগত করেছে , সেই দিন ভারতের কোন রাজা না ইংরাজকে ভয় করে । "

আরেক স্থানে তাঁর উক্তি —

অগ্নিস্তূপ । এরি নাম স্বাধীনতা অগ্নি । এ অগ্নি হৃদয়ে প্রজ্বলিত থাকলে সকল আততায়ীই ভস্মসাৎ হয়ে যাবে । সে স্বাধীনতা রূপী অনল দেব । রণজিতের জীবন যজ্ঞে তুমিই হোমানল রূপে চির প্রজ্বলিত থাক । আজ হতে আমি রাজ্যে এক নবীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেম । .... আজ হতে জননী জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষা রূপ মহাব্রত গ্রহণ করলাম , মাতৃসেবা মহাব্রত গ্রহণ করলাম । এ ব্রত আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত । এ ব্রত উদ্‌যাপন আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত । এই মহা - কার্যের একটি সরল সহজ নাম ' রণজিৎ রাজার জীবন যজ্ঞ ' । এই অগ্নি স্পর্শ করে (অগ্নিতে হস্ত প্রদান পূর্বক) বলছি এই প্রতিজ্ঞার নাম ' রণজিৎ রাজার জীবন যজ্ঞ ' ।

সেবকগণ । এস এস এস , মাতৃভক্ত ভূপ । উন্মুক্ত ঐ কর্ম পথ তোমার ,

যাও বীর বর , ধরি ধনু শর , বীর গৌরবে রাখ
স্বাধীনতা মার ।।

আরেক স্থানে রনজিত ব্রাউন সাহেবের প্রত্যুত্তরে যে উক্তি করেছেন তাতে যেন তাঁর হৃদয়ে অগ্নি শিখা প্রজ্বলিত ছিল ।

" রনজিৎ । যাও সাহেব , তুমি আমার গৃহে এসেছ , তাই তোমার চোখ রাঙানি সহ্য করলাম , তা না হলে দেখতে তোমার দেহ এতক্ষণে রনজিতের শাণিত তরবারে খণ্ড খণ্ড হয়ে যেত । অর্থের জন্য তোমরা না করো কি ? সোনার রাজ্য বাঙালা রাজ্য ছারখার করেছ , সাধু স্বভাব প্রজাপ্রাণ মীর কাসিমকে দেশ ছাড়া করিয়েছ । অহো কি হৃদয় ভেদী কথা । আহা ভারত তুমি । কেন মা তুমি ইংরাজগণকে তোমার কোমল অঙ্গে স্থান দিলে । তোর কোমল কোল শ্মশান করলি মা , কেন মা ? বুক ফেটে যায় মা , বুক ফেটে যায় । "

নাট্যকারের এই হৃদয়ার্তির বহিঃপ্রকাশ সেদিন বঙ্গ জীবনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি রূপে চিহ্নিত ছিল । এই নাটকের ৪র্থ অঙ্ক ও ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কে ভারত মাতার কণ্ঠে এক গান সন্নিবেশিত হয়েছে । এই গানে ভারতবাসীর নিদারুণ দুঃখ ভাবনাকে স্নেহময়ী জননী কিভাবে বাণীবদ্ধ করেছেন তা বোঝা যায় —

" ভারত মাতা ,

কি ছিলাম কি হয়েছি আরও কি আছে কপালে ।
শত শত কোটী সন্তান জননী একা কেন ভাসে নয়নের জলে ।
আমার যাতনা আমি ত ভাবি না , বাছাদের দশা
দেখিতে পারি না ,
দেখিলে সে দুখ , ফেটে যায় বুক , পায় বুক , পায়
না খাইতে

ক্ষুধার জ্বালে ।
পেটে অন্ন নাই , পরনে বসন , পর অত্যাচারে নিষ্পেষণ
মা হয়ে কেমনে , দেখিবে নয়নে , ভাসে দু নয়নে
পেটের ছেলে ।

ইংরাজ সরকারের রোষাগ্নিতে পতিত হলো এই নাটক । ৭ই আগষ্ট ১৯১১ সালে নিষিদ্ধ হলো এই স্বদেশ ভক্তির উপাখ্যান ।

।। মনো মোহন গোস্বামী ।।

মনো মোহন গোস্বামী ছিলেন উপেন্দ্র নাথ দাসের ভাব শিষ্য । স্বদেশ প্রেমের ভাবনায় তিনি ছিলেন চরম পন্থী । তাঁকে Militant Nationalist বলা হতো । তাঁর রচিত নাটকের নাম সংসার (১৯০৪) , সমাজ (১৯০৭) , কর্মফল (১৯০৯) , রোশিনারা (১৯০৬) , পৃথ্বিরাজ (১৯০৩) ।

' সংসার ' নাটকের পটভূমি আসামের চা বাগান । আসামের চায়ের বাগানে সাধারণ নিরীহ ও দরিদ্র কুলিদের ওপর ইংরাজ বণিকদের দ্বারা নির্মম অত্যাচার চালানো হতো নাট্যকার সেই শোষণকে উন্মোচিত করেন । দরদী মন , হৃদয়ের আকুল অনুভূতি ও গভীর সহানুভূতির সাথে সব চরিত্রগুলো তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন । মিনার্ভাতে নাটকগুলি মঞ্চস্থ হয় ।

শিবাজীর কাহিনী অবলম্বনে তিনি ' রোশিনারা ' নাটকটি লেখেন । এই নাটকে দেশ প্রেমের উপাদান প্রচুর । নাট্যকার নিজে দেশকে মাতৃজ্ঞানে পূজা

করতে চেয়েছিলেন। তাই দেশ ছিল স্বর্গের চাইতে শ্রেষ্ঠ। রাম দাস স্বামী শিবাজীকে সেই অভিব্যক্তিই প্রকাশ করেছেন —

" ভবানীর বর পুত্র তুমি।
দেব আঁখি মেরে তব পায়ে,
ইষ্ট মন্ত্র দিয়েছি তোমায়
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী ॥ (১।৩ গ)

পরাধীনতার তীব্র জ্বালা ও বেদনাবোধকে শিবাজীর মুখ হতে উচ্চারিত হতে দেখি —

" জন্মভূমি পর পদানত,
বর্ণাশ্রম ধর্মহের লুপ্ত প্রায় আজ
গো ব্রাহ্মণ সহে নিপীড়ণ,
শুনি ওই দেবতার করুণ ক্রন্দন
করিব কি জীবন ধারণ। " (২।১ গ)

মনো মোহন গোস্বামী ' পৃথ্বিরাজ ' নাটকে দেশাত্মবোধের সুরে বীনা বেঁধেছেন — ' বীরের প্রধান ধর্ম স্বদেশ রক্ষণ ' (৩।২ গ) ।
সংযুক্তার মুখে শুনি দেশাত্মবোধের বানী —

" কে হেন ক্ষত্রিয় আছে ভারত ভিতর
জন্মভূমি মহা রত্ন
ম্লেচ্ছ করে তুলে দিতে ডালি
যেই না হবে কাতর। " (৩।৩ গ)

মনো মোহন গোস্বামীর নাটকগুলি সরকারের বিষ দৃষ্টিতে পড়ে। স্বরাষ্ট্র বিভাগ ১৯১১ সালের ১৬ই মে স্টিভেনসন মুরকে একটি চিঠি দেন —
"I am now to address you in regard to the play' Samaj' No 28 of the statement. Our Legal Remembrancer who was consulted has advised that this play is not objectionable, and, as it was one of these against which your Government has taken action, I am desired do request that with the permission of the L.Governor is council, we may be favoured with a copy of the opinion recorded by the legal Remembrancer, Bengal regarding this play in order that is proscription may be ~~xutke~~ further considered".

মনোমোহন গোস্বামীর 'সময়' নাটকটি সম্পর্কেও অভিযোগ তোলা হয়।
The play 'Samay' regarding which E.De A Govt. asks for L.R.'s opinion is one of 11 plays above mentioned and one of 4 plays written by Babu Mon Mohan Goswami was brought to the notice of the controller of customs with suggesstions that the Babu might be warned from publishing any other play of these type, and the controller has replied that he has promised not to produce other similar plays." ৬৬
মনো মোহন গোস্বামীর পৃথ্বিরাজ নাটকটিও ইংরেজ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়।

॥ মনো মোহন রায় ॥

বঙ্গভঙ্গ - স্বদেশী যুগের আরেক নাট্যকার মনো মোহন রায় । তাঁর নাটক ' জাগরিতা ' রচিত ও প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালে । তখন বাংলা দেশ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে প্রদীপ্ত । স্বদেশ প্রেমের প্রসার ও পরাধীনতা হতে মুক্তি লাভই এই নাটকের উপজীব্য বিষয় বস্তু । নাটকের পটভূমি মোগলদের সাথে রাজপুতদের সংঘর্ষ ।

প্রতাপ সিংহ এই নাটকের কেন্দ্রীভূত নায়ক । বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক নেতার মতো প্রতাপ সিংহ জাতিকে আহ্বান করছেন —

" এস ভারত সন্তান,
হয়ে এক প্রাণ
উজ্জীবিত হও নবীন জাতীয় জীবনে । " (২।১ গ)

প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য্য বলছেন , " স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত বলে সমকালীন জাতীয়তাবাদের প্রভাব নাটকটির সর্ব শরীরে বিশেষভাবে প্রতিফলিত । "

প্রতাপ চন্দ্র দেশের বর্তমান দুঃখ দুর্দশায় যেদোক্তি করেছেন যে ভাবে মনে হয় যেন বঙ্গ আন্দোলনের কোন নেতার অভিব্যক্তি —

" মাতঃ জন্মভূমি , তবে কি তোমার ভাগ্যে নাহি
পরিত্রাণ । ..... হায়
বিধি , হিন্দু জীবনের এই নিদারুণ
অভিশাপ হবে না কি দূর । " (২।২ গ)

নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব পরিহার করে সকলে একত্রিত হয়ে ভাতৃ প্রেমের উদার আদর্শের প্রতি ধাবিত হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন প্রতাপ চন্দ্র —

" জীবনের ঘোরতর অভিশাপ আত্ম
বিচ্ছেদের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপিয়ো না
হিন্দুস্থানে তুমি , ...
আত্ম দ্বন্দ্বে শক্তি ক্ষয়
নাহি কর কদাচন । " (২।৬ গ)

স্বদেশী আন্দোলনে নারীরা যোগ দিলেন । অন্তঃপুর বাসিনীরা রাজপথে এসে দাঁড়ালেন । জাতীয় স্তরের নেতারা সেদিন নারী জাগরণের বানী শুনিয়েছিলেন । এই নারী জাগরণের বার্তায় ' জাগরিতা ' সমৃদ্ধ ।

" দেব , রমণীর
তবে নাহি জাতীয়তা , নাহি তার উচ্চ
অধিকার , সে তাহলে শুধু অপদার্থ
বিলাসের হার । .....
সে কি
শুধু গৃহকোণে রহিবে বসিয়া আমরণ
নীরব ক্রন্দনে । " (৩।২ গ)

স্বদেশ মথিত হয়েছিল এই নাটকে ।

* * * * *

।। তৃতীয় অধ্যায় ।।

।। নাট্য রচনা । স্বদেশী যুগ ।।

তথ্যপঞ্জী

১ । Essays : Ralph Waldo Emerson(first series) P-3-5.

২ । ' বাংলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব ' , পৃ : ৫

৩ । বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) পৃ :

৪ । রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ , পৃ :

৫ । বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড)

৬ । বাংলা নাটক সমীক্ষা , পৃ : ৮২ - ৮৩

৭ । বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড) পৃ : ১

৮ । পূর্বোক্ত , পৃ : ১

৯ । পূর্বোক্ত , পৃ : ২

১০ । Speeches - Surendra Nath Banerjee(1908) Vol - VI Page 397 -398.

১১ । বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা , পৃ : ২৬৮

১২ । Indian Stage Vol -IV H.N. Dasgupta P.58

১৩ । The Swadeshi Movement in Bengal P-207

১৪ । Nation in Making P 184.

১৫ । ১৩৩৩ সালে মজঃফরপুরে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে অমৃত লালের ভাষণ , গ্রন্থনা অমৃত লাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য — ডঃ অরুন কুমার মিত্র পৃ : ১৪২

১৬ । ' অকাল বোধন ' — সোনার বাংলা ২৯এ জ্যৈষ্ঠ , ১৩৩০

১৭ । অমৃত লাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য , পৃ : ১৯২

১৮ । পূর্বোক্ত , পৃ : ২৯১

১৯ । বাংলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব — ডঃ প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য্য , পৃ : ৫১৯

২০ । India in Transition P -55

২১ । গিরিশ চন্দ্র ও নাট্য সাহিত্য — কুমুদ বন্ধু সেন , পৃ : ৭ -৮

২২ । মহাকবি গিরিশ চন্দ্র — যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত , পৃ : ৮৩ - ৮৪

২৩ । বাংলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব , পৃ : ৪২৬

২৪ । বাংলা ঐতিহাসিক নাটক সমালোচনা , পৃ : ২০১ - ৩২

২৫ । History of the Freedom Movement in India (VOL I) Page 14-16.

২৬ । বসুমতী , ৩০শে আষাঢ় , ১৩১৩ বঙ্গাব্দ

২৭ । Statesman, November, 1907

২৮ । Indian Stage Vol IV P.49.

২৯ । ভারতীয় নাট্য মঞ্চ — হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত , পৃ : ১৯০

৩০ । ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরম পন্থী পর্ব , পৃ : ১৪

৪৯ । দ্বিজেন্দ্র লাল, পৃ : ১৪৪

৫০ । বাংলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব, পৃ : ৫০৪

৫১ । Fall of Mowar : Translation Note PP VIII-IX, April, 1958.

৫২ । দ্বিজেন্দ্র লাল, পৃ : ২৪৪

৫৩ । Consideration on Indian Affairs, William Bolts, London 1772.

৫৪ । বাংলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব, পৃ : ৭৮ - ৭৯

৫৫ । পূর্বোক্ত, পৃ : ৩৬১

৫৬ । History of the Freedom Movement in India, Vol-I, Page 64-65.

৫৭ । ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই, পৃ : ২০৯

৫৮ । বাংলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব, পৃ : ৫৪৮ - ৫৪৯

৫৯ । India in Bondage J.T. Sunderland P-131.

৬০ । বাংলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব, পৃ : ৫৮০

৬১ । ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই, পৃ : ২০৫

৬২ । পূর্বোক্ত, পৃ : ২০৫

৬৩ । The Swadeshi Momement in Bengal P-98.

৬৪ । ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই, পৃ : ২৪০

৬৫ । পূর্বোক্ত, পৃ : ২৪২

৬৬ । পূর্বোক্ত, পৃ : ২৪৪ - ৪৫

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

॥ ছোট গল্পের ক্ষেত্রে স্বদেশী যুগ ॥

। ছোট গল্পের পটভূমি ।

এক সমালোচক বলেছেন ছোট গল্প হচ্ছে "Preculiar product nineteenth century" । ঊনবিংশ শতাব্দীতে এক অদ্ভুত বিক্ষুব্ধ জীবন বোধ দেখা দিয়েছিল সারা বিশ্বজুড়ে । এই জটিলতার যুগে আমরা পেয়েছি ছোট গল্পের ভিত্তি । দান্তের অন্ধকারের পথে অভিসার আর পেত্রার্কের বিদগ্ধ রোমান্টিকতার যুগে নির্মোহ জীবন সন্ধানী জনসাধারণের শিল্প বোধোদিত , চার্চের দিকে — সামাজিক গ্লানির দিকে তাঁর জিজ্ঞাসা উচ্চে তুলে ধরেছিলেন । ঊনবিংশ শতক পৃথিবীর ইতিহাসে বুদ্ধি জীবীর জীবনকে যন্ত্রণা বিদ্ধ করে তুলেছিল । ফ্রান্সে ও রাশিয়ায় জীবন ক্ষেত্রে এই যন্ত্রণা ছিল প্রকট ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন , " আধুনিক ছোট গল্প যন্ত্রণার ফসল । মহৎ বিশ্বাস থেকে — অন্তত মোটামুটি একটা নিশ্চিন্ত ভিত্তি থেকে (যা স্কটের রাজতন্ত্রের মধ্যে পেয়েছিলেন) উপন্যাস সৃষ্টি হত , কিন্তু শূন্যতার আঘাতে , তার উপকরণগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে আদর্শ আর বিশ্বাসের উজ্জ্বল - জোনাকি ধারালো খণ্ডগুলিতে লেখক জিজ্ঞাসার সাহায্যে নগ্ন চেতনার স্পর্শ ছুঁয়ে দিতে থাকেন । ....

" আমেরিকায় ছোট গল্পও এমনি যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে । সেখানে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক কোনো বিপুল সংঘাত নেই বটে , কিন্তু আছে লেখকের ব্যক্তিক বেদনা ও ব্যর্থতার ট্র্যাজেডি । নিঃসঙ্গ উন্মাদ ন্যাথানিয়েল হথর্ন সেই বেদনাতেই আলো ছায়ার মধ্যে ' পিউরিটান উচ্চ ধারণা 'কে ভাসিয়ে দিয়েছেন — কত বিকৃত অন্ধকার এ্যালান পো দেখেছেন তাঁর জানালার পাশে দাঁড়িয়ে কাকের জ্বলন্ত দৃষ্টি কপালে নিয়তির মতো জেগে আছে । এবং সামাজিক সঙ্কট —

নয় ব্যক্তিক সঙ্কট - উনিশ শতকের ছোটগল্পে এই দ্বিবিধ যন্ত্রণা বিদ্যমান। ছোটগল্পে যন্ত্রণার সকল রূপেই এই সময় প্রথম অভিব্যক্তি হয়েছে।" ১

উনবিংশ শতকের শেষপাদে রিয়ালিজম ও ন্যাচারালিজমের তমসে বিদগ্ধ ছিল এই ছোটগল্পের বেলাভূমি। পুরনো সমাজ জীবনের মূল্য বোধের গ্রন্থিগুলো অর্থহীন মনে করে, শিল্পীর ব্যক্তি সত্ত্বা ও চেতনার সাথে সমাজ চেতনার যখন সংঘাত শুরু হয় তখন শিল্পীর মানসিকতার এক রোমান্টিক প্রবণতা জাগে, যে প্রবণতায় সে মিষ্টি মধুর 'নাইটিঙ্গেলের' মতো কল্পনার বিলাসী ডানায় ভর করে উড়ে যেতে যায়। কিন্তু বেদনা বিদ্ধ তাকে সে কর্দমাক্ত মাটিতে ঝরে পড়ে। মৃত্যুকালীন সে গীত 'Swan Song' এ লুকিয়ে থাকে জীবন যন্ত্রনার সাথে অনির্দিষ্ট জগতের প্রতি এক অপূর্ব মমত্ব বোধ। যেন শিউলি ফুল সারা রাত সুগন্ধ বিস্তার করে সূর্যোদয় দেখবে বলে বৈশ প্রহরীর মতো জেগে থাকে সারা রাত। কিন্তু প্রভাতে সূর্যোদয়ের আগেই পৃথিবীর মাটিতে ঝরে পড়ে। কিন্তু মৃত্যুজনিত সুগন্ধী দিয়ে যায় শেষ অবধি।

এই জীবন বেদনার অভিব্যক্তিই ছোটগল্পের প্রাণবন্ত রূপ। চেকভ, আলফঁস দোদে, ন্যাথানিয়েল হথর্ন, মোপাঁসা সকলের জীবনের ব্যথিত বেদনার রসঘন রূপে অতৌল ভাবে গড়া ছোটগল্প।
John Cournons বলেছেন, 'Brevity and natural lėmitations give the short story a precison as an art, beside which the art of the novel seem rambling and formless, standing as a single crystalline episode or experience the short story bears, perhaps, the same relation to the novel as a single parable to the whole gospel.........The parable is indeed a fragment, but is a complete fragment, and if it is cumulation of truth, it is still better the essence of all truth and it is not less than the whole of which it is a fragment". ২

উপন্যাসকে পৌঁছুতে হবে তার পূর্ণতায় তা সে কাহিনীগত সমাপ্তিতে যাত্রা করুক অথবা দর্শন গত অনুভূতিতেই তা শেষ হোক। আর ছোট গল্পকে জীবনের বিশাল প্রান্তর হতে একটি অনুভূতি বা ঘটনাকে বেছে নিয়ে তাকে সমাপ্ত করতে হবে আচমকা। সমাপ্তির পর অনুভূতির অজস্র প্রশ্ন থাকবে। এ যেন মুহূর্ত মধ্যেই বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের মতোই দৃষ্টির সামনের দিগন্তে উদ্ভাসিত হবে।

এই ভাবনার পরিমণ্ডলে ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যে বিকশিত হয়েছিল। রবীন্দ্র নাথ এর ভিত্তি ভূমিকে দৃঢ় করে তুলেছিলেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এক অভূত পূর্ব সাহিত্য চেতনার জন্ম দিয়েছিল। এই চেতনার প্রাচুর্যের ফসল ছিল কাব্য ও কবিতা ও গান। ছোটগল্পের রূপকার রবীন্দ্র নাথের হাত দিয়ে এই আন্দোলন মুখী গল্প আমরা পাইনি। কিন্তু সমকালীন সমস্যার ছোঁয়া তাঁর গল্পে ছিল। বরং উপন্যাসের মধ্যে স্বদেশী বা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রতি তাঁর দৃষ্টি লেখন পেয়েছি। তবুও স্বদেশী যুগের চেতনায় কিছু গল্পের ফসল উৎপন্ন হয়েছিল বিভিন্ন মানসিকতাকে কেন্দ্র করে। কখন সমর্থক, কখন ব্যঙ্গাত্মক, কখন বা বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন। এই গল্পের সীমারেখা ক্ষুদ্র হলেও জন মানস চিত্তে সাড়া জাগিয়েছিল। বিক্ষুব্ধ মুখর বাংলার পটভূমিতে রাজনৈতিক চিন্তাধারার গল্প লেখার প্রবণতা মোটামুটি এখান থেকেই তার সূত্রপাত ঘটেছিল। ইঙ্গিত দিয়েছিল সেই আন্দোলন ক্ষুব্ধ জীবনবোধের ও অভিব্যক্তির।

।। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ।।

প্রভাত কুমার তাঁর সাহিত্য জীবনে সর্বক্ষেত্রে প্রতিভার ছোঁয়া দিয়েছেন। তিনি সাহিত্যের অঙ্গনে যশস্বী হয়েছেন ছোট গল্পের ক্ষেত্রে। প্রভাত কুমারের যৌবন দীপ্ত কাল ছিল বাংলায় নবজাগরণের ক্ষণ। মানুষের শিক্ষাধর্ম, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্র সর্বত্রই এক গভীর প্রভাব দেখাদিয়েছিল। সামাজিক তমসা একেবারে দূরীভূত হয় নি। উষালগ্নের মুহূর্ত আলো আঁধারির সমাজে প্রভাত কুমারের আগমণ।

বিংশ শতকের প্রারম্ভেই দেশকাল উদ্দীপ্ত হলো রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে। সুরেন্দ্রনাথ বললেন Lord Curzon has divided our province, he has sought to bring about the disintegration of our race, and to destory the solidarity of our popular opinion. Has he succeeded in his novel indeavour ? He has btill better than he knew ; he has laid broad and deep foundation of our national life ; he has stimulated those forces which contibute to the upbuilding of nations ; he has made as a nation ; and the most reactionary of the Indian Viceroys will go down to the posterity as the architect of the Indian national life. ৬

এই আন্দোলনের পথ ধরে শুরু হয় বয়কট , ধর্মঘট , স্বদেশী আন্দোলন । বিদেশী দ্রব্য বর্জনের সংকল্প ও স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণের অঙ্গীকার ছিল এই আন্দোলনের অভীষ্ট লক্ষ্য । বিনয় সরকার বলছেন , " ১৯০৫ হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসর , এই সময় শুরু হয় গৌরবময় বঙ্গ বিপ্লব । এ একটা খাঁটি যুগান্তর ।" ৪

এই আন্দোলনের প্রভাবও প্রভাত কুমারের লেখায় প্রতিধ্বনিত হলো । সুকুমার সেন বলছেন , " সমসাময়িক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনও প্রভাত কুমারের গল্পে ঢেউ তুলিয়াছে । বিধবা বিবাহ , অসবর্ণ বিবাহ , স্বদেশী আন্দোলন , বোমা ডাকাতি , নন কোঅপারেশন সবই তাহার গল্পে রস ও রসদ জোগাইয়াছে ।" ৫ যেহেতু এই স্বদেশী আন্দোলন দেশবাসীর মনোজীবনে সক্রিয় ছিল , প্রভাত কুমারও এই আর্তিকে নিজেকে প্রসারিত করেছিলেন ঘটনা প্রবাহ জনিত সাহিত্য কর্মে ।

স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় তিনি রচনা করলেন গল্পের সংকলন ' দেশী ও বিলাতী ' । প্রকাশকাল আশ্বিন , ১৩১৬ (১৩ই অক্টোবর , ১৯০৯)। স্থান গয়া । এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট গল্পগুলির নাম ও প্রথম প্রকাশের নির্দেশ : - দেশী -- (১) আমার উপন্যাস (প্রবাসী , আশ্বিন , ১৩১৩), (২) বিবাহের বিজ্ঞাপন (প্রবাসী , বৈশাখ , ১৩১২) , (৩) আধুনিক সন্ন্যাসী (প্রবাসী , মাঘ , ১৩১১) , (৪) এক দাগ ঔষধ (ভারতী , পৌষ , ১৩০৮ সংখ্যায় ' পতন ' নামে প্রকাশিত হয়) , (৫) স্বর্ণ সিংহ (প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ , ১৩১২) , (৬) প্রতিজ্ঞা পূরণ (ভারতী , ভাদ্র , ১৩১১) , (৭) উকিলের বুদ্ধি (প্রবাসী কার্তিক , ১৩১৪) , (৮) হাতে হাতে ফল (প্রবাসী , শ্রাবণ , ১৩১৩), (৯) খালাস (প্রবাসী , ভাদ্র , ১৩১৪) , (১০) প্রত্যাবর্তন (প্রবাসী , বৈশাখ , ১৩১৬) ।

বিলাতী -- (১) মুক্তি (প্রবাসী , আষাঢ় , ১৩১২) , (২) ফুলের মূল্য

(প্রবাসী , ভাদ্র , ১৩১২) , (৩) প্রূর্ণমূষিক (প্রবাসী , কার্তিক , ১৩১২) , (৪) প্রবাসিনী (প্রবাসী , আষাঢ় , ১৩১৬) ,

' আমার উপন্যাস 'গল্পটি প্রভাত কুমারের মূলত রোমান্টিক প্রেম - মিলনের কাহিনী । ডাক্তারী পাস নব্য যুবক হারাধনের ' ডাক্তার ' হওয়ার মানসিকতার চাইতে উপন্যাসের নায়ক হওয়ার ইচ্ছা ছিল প্রবল । অভিভাবকেরা বিবাহের কথা উত্থাপন করলে হারাধনের " নিজের দৈনন্দিন গদ্যময় জীবনটার উপর বড়োই অশ্রদ্ধা জন্মিতে লাগিল । .... পূর্বরাগবর্জিত অ্যাডভেঞ্চার লেশহীন বিবাহ করিতে কিছুতেই মন উঠিল না । " ৬ পরে এই গল্পে হারাধন পাচক ঠাকুর হয়ে কাশীকান্তর বাড়ীতে চাকুরী গ্রহণ ও তার কন্যা প্রিয়ম্বদার সাথে রোমান্টিক ভাবে বিবাহের মাধ্যমে গল্প শেষ হলেও , স্বদেশী আন্দোলন বা তদানীন্তন পরিবেশকে কয়েকটি ঝলকে তিনি উপস্থাপিত করেছেন ।

' আনন্দমঠের ' প্রভাব প্রসঙ্গে তিনি তাঁর গল্পে মন্তব্য করেছেন , " সেই বৎসর নূতন ' আনন্দ মঠ ' বাহির হইয়াছে । আমার মেজদাদা মহাশয় কলিকাতায় কলেজে পড়িতেন , পূজার ছুটিতে বাড়ী আসিবার সময় বহিখানি আনয়ন করেন । তিনি আসিয়া হঠাৎ প্রচার করিয়া দিলেন যে তিনি একজন ' সন্তান ' , চিরদিন অবিবাহিত থাকিয়া দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবেন । গ্রামস্থ অন্যান্য নব্য যুবক গণের সহিত মিলিত হইয়া গোপনে অনেক পরামর্শ করিতে লাগিলেন । আমি জিজ্ঞাসা করিলে আমায় কিছু বলিতেন না , -- আশা দিতেন , বড় হইলে আমায় দীক্ষিত করিবেন । " ৭ সেই যুগে স্বদেশী ব্রতের বালক যুবকদের কারারুদ্ধ করে দেশীয় বশংবদ শাসকেরা কিরূপে কর্মোন্নতির আশা করতেন সেই ভাবনাকে তিনি স্বল্প কথায় ব্যক্ত করেছেন , " ..... দাদা মহাশয় এখন পূর্ববঙ্গের একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট । সম্প্রতি একটি স্বদেশী মোকদ্দমায় কয়েকজন বিদ্যালয়ের বালককে জেলে দিয়া তাঁহার পদোন্নতির সম্ভাবনাও হইয়াছে । " ৮

' উকিলের বুদ্ধি ' গল্পটির পটভূমি স্বদেশী আন্দোলন । সুবোধ চন্দ্র বুদ্ধিমান উকিল । কিন্তু বুদ্ধির বরাতেও ওকালতি জমল না । দিনাশ শাহীতে জীবন কষ্টকর হয়ে উঠল । স্ত্রীর অলংকার বিক্রী করে সংসার চালানোও দু:সহ হয়ে উঠল । এমন সময় তার শহরে এলেন ফুলার সাহিব । বন্ধুর কাছে জানতে পারলেন ফুলারকে সম্বর্ধনা দিতে রাজী নয় শহর । সরকারী উকিল পদ প্রাপ্তির লোভে সকলের মুখে ' দেশদ্রোহী ' র বিশেষণ শুনে , খবরের কাগজে গালাগালি খেয়ে ফুলারকে সম্বর্ধনা দিয়ে অষ্টম গ্রেডের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ তিনি গ্রহণ করলেন । " উকিলের বুদ্ধি গল্পের নায়ক সুবোধ আন্দোলনের মত্ততাকে নিজ চাকুরী লাভের সুবিধার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছে । সে যে স্বদেশী আন্দোলনের বিপক্ষে অথবা ইংরাজ দমন নীতির স্বপক্ষে তাহা নহে । কিন্তু সর্বাগ্রে নিজ অস্তিত্ব রক্ষাই কর্তব্য ইহাই তাহার বিশ্বাস । " ৯

গল্পটির পটভূমিতে স্বদেশী যুগের এক বাস্তব চিত্র গড়ে উঠেছে । সুবোধ বাবু এখন দারিদ্র পীড়িত । তাই গুড় দিয়ে চা পান করেন । " স্বদেশীর এখন আর তাহাতে তাঁহার লজ্জা নাই । গর্বের সহিত লোককে বলিয়া থাকেন — দোকানদার বেটাদের বিশ্বাস নেই মশাই । দেশী চিনি বলে যা দেয় তা জাভার চিনি । " ১০

সুবোধ বাবু তার বন্ধু জগৎ প্রসন্নের সাথে মিলে ফুলারের সম্বর্ধনায় একটি কবিতা রচনা করল । স্বদেশী যুগে দেশবাসী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত ইংরেজ তাদের যে কোন রূপে একটা কবিতা লিখে ছেপে দিলেও তাতে যে তাদের মনে সম্ভ্রম বাড়ে এই ধারণার প্রতি প্রভাত কুমার বড় সুন্দর ব্যঙ্গোক্তি করেছেন । কবিতাটি এইরূপ —

"Hail Bamfylde Fuller - Lord of half Bengal
How glad are Dinajshahi people all
to Welcome the to their most ancient town
The glorious representative of the crown". ১১

৩০শে আশ্বিন , ১৩১২ বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হয় । সুবোধ চন্দ্র ভাষণ দিয়ে - ছিলেন , " ভাই বাঙালী — মায়ের অঙ্গে এ খড়গাঘাত — এ রুধির পাত — যতদিন এর প্রতিবিধান না হয় , ততদিন যেন কোন বিলাস বিভ্রমে আমরা মগ্ন না হই । " আজ তিনিই যখন ফুলার এর আগমনে গৃহ সজ্জা করছেন জাতীয় বিদ্যালয়ের ছেলে - দের উক্তি ' বঙ্গচ্ছেদের জন্য সবাই এখন শোকে মগ্ন রয়েছে , এই কি উৎসবের সময় ? " ১২

এই সময়কার পরিবেশ সম্পর্কে ইতিহাসকার বলছেন "There are moments in the life of an Individual as well as of a nation when he is Over whelmed by an emotion and is guided by an instinct which leads him. he knows, not whither, the goal and direction being determined by his innate character. At such a moment reason halts, judgement is suspended - only a great inspulse moves the nation and carries everything before it. Bengal, in 1905-07, was passing through such a moment. It has no precedent and was strange to Indian politics". ১৩

এই পরিবেশ সৃষ্টিতে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জির ভূমিকা ছিল প্রখর । তাই ফুলার কে বলতে শুনি " উকিলেরা ভারী রাজদ্রোহী — আমি তাহাদের উপর অত্যন্ত চটিয়াছি । তুমি দেখিতেছি সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জীর ইঙ্গিতে বাঁদর নাচ নাচিতে সম্মত হও নাই । " ১৪

ইংরেজ বিরোধী মনোভাবাপন্ন মানুষেরা ফুলারকে সম্মান দেখাতে প্রস্তুত ছিল না তার সুন্দর চিত্র লেখক এই গল্পে দিয়েছেন , " বঙ্গভঙ্গ জনিত শোক

ও অপমান সকলেরই মনে জাগরূক রহিয়াছে । নূতন লাট সাহেবকে সকলেই বিদ্বেষের চক্ষে দর্শন করিতেছে । মিউনিসিপ্যালিটির বে - সরকারী সভ্যগণ অভিনন্দন করিবার বিরুদ্ধে রেজোলিউশন করিয়াছেন । ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সভাতেও ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃত কার্য্য হইতে পারেন নাই । সেখানেও অভিনন্দন দিবার প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া গভর্নমেন্ট পক্ষ ভোটে পরাজিত হইয়া গিয়াছেন । স্থানীয় যে সকল বড় জমিদার সমস্ত সাধারণ কার্য্যে অগ্রসর ছিলেন , তাহাদের অধিকাংশ লোকেই হঠাৎ পীড়া গ্রস্ত হইয়া বায়ু পরিবর্তনের জন্য নানা স্থানে প্রস্থান করিয়াছেন । কেবল সম্প্রতি জনৈক মুসলমান ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও সাব রেজিস্ট্রার সাহেবের বিশেষ চেষ্টায় , জন কুড়ি মুসলমান লইয়া একটি ' আঞ্জুমান - ই - ইস - লামিয়া ' সভা গঠিত হইয়াছে — সেই সভার পক্ষ হইতে দরবারে লাট সাহেবকে এক অভিনন্দন পত্র দেওয়া হইবে । দুঃখের বিষয় , আঞ্জুমানের বে - সরকারী সভ্যগণের মধ্যে কেহই ইংরাজী ভাষা ভালরূপ অবগত ছিলেন না । দরবারে অভিনন্দন পত্র পাঠ করে কে ? এই বিষম সমস্যার বিষয় তার যোগে অবগত হইয়া ঢাকার নবাব বাহাদুর একজন ইংরাজী জানা পারিষদকে দিনাজ পাহীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন । " ১৫

সুবোধ বাবু যখন ' ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট ' এর পদলাভের সম্ভাবনা দেখেছিলেন তাঁর প্রতিক্রিয়া ছিল মর্মান্তিক । " আমার ত মোটেই কাজটা লোভনীয় মনে হচ্ছে না । দেখ , এই একমাস জাল - স্বদেশদ্রোহী সেজেই প্রাণটা ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে । পুলিশে চাকুরী নিলেত আসল দেশদ্রোহী হতে হবে । কে কোথায় বিলিতি নুন ফেলে দিয়েছে — যাও তাকে ধর । কোথায় কোন ছেলে বন্দেমাতরম বলছে তার মাথায় রেগুলেশন লাঠি । সে ত ভাই আমি পারব না । " ১৬
" ইংলিসম্যান "যে তখন সরকারী মুখপত্র ছিল লেখক সে সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন , " ইংলিসম্যানেরও পয়রা গভর্নমেন্টের চিঠিরই সমান । " ১৭

' আধুনিক সন্ন্যাসী ' গল্পটি এক ভন্ড সন্ন্যাসীর । জাল চেক ভাঙানোর অপরাধে গ্রেপ্তার হন । ছাত্র রাজীব লোচন সাধুর ইংরাজী সাহিত্যের পান্ডিত্য ও ভক্তিতে গদগদ ছিল । পরে তার সে ভুল ভাঙে । স্বদেশী দ্রব্যের প্রতি সাধুর

একটি উপদেশ এই গল্পে আছে যা তিনি ছাত্র রাজীব লোচন কে বলেছিলেন , " তুমি বাসায় ফিরিবার সময় এক শিশি সুগন্ধি কিনিয়া লইয়া যাইও । যদি দেশী পাও তো বিলাতী কিনিও না , কারণ দেশীয় শিল্পের উৎসাহ বদ্ধর্ন করা আমাদের সকলের কর্তব্য । " ১৮

' হাতে হাতে ফল ' গল্পটিতে স্বদেশী আন্দোলনের একটি বিশেষ দিককে লেখক উন্মোচন করেছেন । স্বদেশী যুগে পুলিশের পক্ষ হতে কি ভাবে সাধারণ মানুষের উপর ' স্বদেশী ' সন্দেহে অত্যাচার করা হতো তার নির্মম চিত্র লেখক অঙ্কিত করেছেন । সাধারণ ছেলেদের উপর কি ভাবে মিথ্যা মামলা সাজানো হতো তার প্রক্রিয়া বড় পরিষ্কার । হরগোবিন্দ বাবু সরকারী ডাক্তার হলেও মনে প্রাণে স্বদেশী ছিলেন । দারোগা বদন চন্দ্র নিজের চাকরি বাঁচাবার জন্য সাহেবকে মারার মামলায় মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার জন্য হরগোবিন্দকে বাধ্য করার চেষ্টা করে । ডাক্তার বাবু এ হেন নীচ কার্য্যে অসম্মতি জানালে দারোগা বদন চন্দ্র ডাক্তার হরগোবিন্দের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রচনা করে । এবং ডাক্তার হরগোবিন্দের ছেলে দুটোকে সাহেবকে মারার ঘটনায় মিথ্যা ভাবে জড়িয়ে দেওয়ার কথা ভাবে । " ছেলে দুটোকে ত এখনি ধরে আনছি কিন্তু ডাক্তারকে আরও জব্দ করতে হবে । ওর নামে একটা মোকদ্দমা খাড়া করতে হচ্ছে । চোরাই মাল রাখে — ডাক্তার চোরেদের কাছ থেকে অল্প মূল্যে চোরাই মাল কেনে । থানা তল্লাশী করে বাড়ী থেকে রাশি রাশি চোরাই মাল বের করে ফেলব এখন — তার কৌশল আছে । হাকিমের বিশ্বাস হবে ত ? হবে না আবার ? দারোগা হল ডেপুটি বাবুদের গুরু পুত্তুর । .... পুলিশ সাহেব দিয়ে এমন লম্বা রিপোর্ট করান — অমনি ডেপুটি বাহাধনের ডিগ্গাটি বছর প্রোমোশন স্টপ । " ১৯

এই দারোগা যে কতখানি শিক্ষিত (?) তা তার রিপোর্ট তৈরীতে প্রভাত কুমার বড় সুন্দর বক্রোক্তি করেছেন , " রিসেস দেখিতে আরও জানিয়াছী উক্ত অজয় চন্দ্র কলকাতা বীডন স্কোয়ার হাঙ্গামাতে লীপ্ত ছিল যে এখানে আসিয়া

একটি লাঠী খেলা সমিতী স্থাপন করিয়াছে তাহাতে স্থানীয় অনেক লোক চাঁদা দেয় ডাক্তারের ছোট পুত্র সুসীল চন্দ্র অল্প বয়স্ক হইলেও অত্যন্ত দুষ্ট সে এখানে অনেক বালক লইয়া একটী ঢীল ছোঁড়া সমিতী স্থাপন করিয়াছে উদ্দেশ্য সাহেব মেম দেখিলেই ঢীল ছুড়িবে । " ২০

দারোগাবদন চন্দ্র ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট হতে সার্চ ওয়ারেন্ট পাওয়ার পর যে ভাবে তল্লাসী শুরু করেছিলেন তাতে তদানীন্তন পুলিশের অত্যাচারের নিদর্শন মেলে ।

" থানা তল্লাসী আরম্ভ হইল । কনেষ্টবলদের দারোগা বলিলেন , সমস্ত বাক্স তোরঙ্গ এই উঠানে নিয়ে আয় ।" যেগুলির চাবি মিলিল সে গুলি খুলিয়া , বাকী সমস্ত বাক্স ভাঙ্গিয়া উঠানের মধ্যে ধূলার উপর সমস্ত জিনিস পত্র ঢালিয়া ফেলা হইল । দারোগাবাবু জুতোর ঠোক্কর মারিয়া মারিয়া সেগুলো বিক্ষিপ্ত করিয়া ' তল্লাস ' করিতে লাগিলেন । শাল , আলোয়ান , ঢাকাই শাড়ী , শান্তিপুরী শাড়ী , কোর্ট , কামিজ , শেমিজ , বডিস , মোজা , রুমাল প্রভৃতি দারোগা বাবুর জুতার ঠোক্করে চারিদিন ছিড়িয়া উড়িয়া পড়িতে লাগিল । ডাক্তার বাবুর বধূ মাতার বাক্স হইতে অজয় চন্দ্রের হস্ত লিখিত এক বান্ডিল পত্র বাহির হইল , তাহা দেখিয়া দারোগাবাবু উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন । কনেষ্টবলের হাত হইতে অতি সন্তর্পনে তাহা নিজ জিম্মায় লইলেন । পরে কক্ষে কক্ষে প্রবেশ করিয়া আলমারি সিন্দুক ভাঙ্গিয়া অনেক তল্লাসী হইল । ডাক্তার বাবুর প্রেস্কৃপসন বহি , তিনটা চিঠির ফাইল , বাজার খরচের হিসাব বহি , সুরেন্দ্রবাবুর বাঁধানো ছবি , বিপিন পাল , লাজপত রায় প্রভৃতির ছবিযুক্ত একখানি মাসিক পত্র — সমস্তই দারোগা বাবু ধৃত করিয়া লইলেন । অতঃপর শয্যা গৃহে প্রবেশ করিয়া দারোগা বাবু বলিলেন গদি বালিস গুলো কাটো । অনেক সময় বালিসের ভিতর থেকে মাল পাওয়া যায় । " ২১

যে ডাক্তারকে শায়েস্তা করার জন্য দারোগার এ হেন অমানবিক কার্যকলাপ , এত পরিকল্পনা , অথচ সেই ডাক্তারের চিকিৎসাতেই দারোগার মৃত্যুমুখ হতে ফিরে আসার ঘটনায় কাহিনী সমাপ্ত ।

' খালাস ' গল্পের পটভূমিতেও আছে স্বদেশী আন্দোলনের পরিবেশ । এই গল্পে স্বদেশী মোকদ্দমার বিচারক ডেপুটি নগেন্দ্রবাবু মানসিক দিক দিয়ে দ্বিধা বিভক্ত । একদিকে তার কর্মের প্রতি ভক্তি , উপরওয়ালা ম্যাজিস্ট্রেটের উপর ভয় , চাকুরীতে সুবিধা লাভের ভাবনা , অন্যদিকে দেশবাসী ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি মমত্ব বোধ ও স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতি তাঁর মনোভাবনাকে দ্বিধা - দীর্ণ করে তুলেছে । মিথ্যা মামলায় স্বদেশী বালকদের শাস্তি দেওয়ায় তার হৃদয়ে অনুশোচনা হয়েছে । " পবিত্র আসনে বসিয়া , জানিয়া , শুনিয়া আজ তিনি অবিচার করিয়া আসিয়াছেন । ..... বহু বর্ষব্যাপী শিক্ষা সাধনার ফল , ধর্মবুদ্ধি , বুদ্ধি বিবেক , কর্তব্য নিষ্ঠা — শুধু পদোন্নতির জন্য ভাসাইয়া দিয়াছেন । ছি ছি পূর্বকালে অর্ধ শিক্ষিত ডেপুটিরা ঘুষ লইত তাহাদের মার্জনা ছিল । সুশিক্ষা অভিমানী নগেন্দ্রবাবু গভর্নমেন্টের নিকট হইতে পদবৃদ্ধি স্বরূপ ঘুষ লইয়া বিচারাসন কলঙ্কিত করিয়াছেন । তাহার কি মার্জনা আছে ? " ২২

আত্ম বিবেক ও পত্নীর আদর্শ নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে তিনি কর্ম হতে অব্যাহতি নিলেন । মানসিক অবসাদ ও পরাধীনতার কর্ম প্রবাহ মুখী বন্দী জীবন হতে তিনি খালাস পেলেন । তার অন্তরের দেশ প্রেম জয়ী হলো । " যখন তিনি কংগ্রেসে চাঁদা দেন , তখন তিনি প্রকৃতই ' স্বদেশীর স্বপক্ষে ' ছিলেন এমন কথা হলফ করে বলা যায় না । স্বদেশী শ্যালক - শ্যালিকার কাছে মান বাঁচানোই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল । যদি দেশ প্রেমের তাগিদে দিতেন তাহলে নিজের নাম প্রকাশে এমন কুন্ঠিত হতেন না । এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্র নাথের ' রাজটিকা ' (১৩০৩) গল্পের নবেন্দু শেখরকে মনে পড়ে । সাহেব ভক্ত নবেন্দু শেখরও এইভাবে অবস্থার গতিকে কংগ্রেসে চাঁদা দিয়েছিল , কিন্তু তখনো তাঁর মানস জগতে তেমন কোনো পরিবর্তন সূচিত হয় নি । " ২৩

' খালাস ' গল্পে প্রভাত কুমার স্বদেশী যুগের অনেক প্রাসঙ্গিক চিত্রকে বড় সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন । নগেন্দ্রবাবুর শ্যালক ও শ্যালিকাদের সাথে আলোচনা

কালে বলছেন , " তোমাদের কলকাতার চেয়ে ফরিদ পিংহে স্বদেশী ঢের বেশী চলছে । প্রকাশ্য ভাবে সেখানে একখানি বিলিতি কাপড় কেনে কার সাধ্য । এক এক লাঠি কাঁধে ছেলেরা রাস্তায় পাহাড়া দিয়ে বেড়াচ্ছে । .... পুলিশকে তারা তোড়াই কেয়ার করে । বৈকালে বাজারে বেড়তে বেড়াতে দেখেছি , পুলিশ ঘুরছে , আর ছেলেরা বলছে এজি এজি সিপাহী , দেখো হাম পিকেট করতা হ্যায় — আর পিকেটিং করছে । " ২৪

স্বদেশী কিশোরদের চাঁদা তোলায় সততার চিত্র এই স্থানে পরিস্ফুট । তাদের অন্তরের দেশ গানের চিত্র প্রভাত কুমার তুলে ধরেছেন —

কে কোথা আছিস জনম ভূমির
ভকত সন্তান ,
মার পূজো হবে , আয় নিয়ে আয়
কে কি করিবি দান ।
কার আছে সোনা কার আছে রূপা
অঞ্জলি ভরিয়া আন ,
ও ভাই , এমন সুদিন কবে আর পাবি
দিয়ে নে ভরিয়ে প্রাণ ,
যার বেশী নাই দিক সে কিঞ্চিৎ
ছেড়ে লাজ অপমান ,
যার কিছু নাই সে দিক কেবল
ব্যথিত হৃদয় খান । ২৫

বিদেশী দ্রব্যের প্রতি স্বদেশী বালকদের অভিব্যক্তির একটি চিত্র তিনি এঁকেছেন । " ছেলেরা বলিল , ভাই এ টিনটাকে ' বন্দেমাতরম ' করা যাক এস । বলিয়া টিন

খুলিয়া , বিস্কুট গুলো রাজপথে ছড়াইয়া দিল । তখন সকলে ' বন্দেমাতরম '
এবং ' বিদেশী বানিজ্যে কর পদাঘাত ' গান করিতে করিতে বিস্কুটের উপর নৃত্য
করিতে লাগিল । দুই এক মিনিটেই সমস্ত বিস্কুট চূর্ন হইয়া রাজপথের সেই
অংশ শুভ্র করিয়া ফেলিল । একজন খালি টিনটাকে পদাঘাতে তাল তোবড়া করিয়া
এক লাথিতে রাস্তার পার্শ্বস্থিত ড্রেনে ফেলিয়া দিল । " ২৬

জাতীয় দলের বালকেরা যখন জামীনের আদেশ পেল তখন তাদের দেশ ভাবনা
উচ্ছ্বাসের বর্ণনা লেখক দিয়েছেন , " এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র বালকগণ ভীষণ রবে
' বন্দেমাতরম ' ধ্বনি করিয়া উঠিল । কোথা হইতে একখানা গাড়ী আনিয়া , তাহাতে
বালক ত্রয়কে বসাইয়া , ঘোড়া খুলিয়া নিজেরা গাড়ী টানিয়া শহরময় ঘুরিয়া
বেড়াইল এবং সমস্বরে গাহিতে লাগিল —

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে
মোদের বাঁধন ততই টুটবে । " ২৭

' পোষ্ট মাষ্টার ' গল্পের মূল কাহিনী স্বদেশী আন্দোলন মুখী নয় ।
গ্রামের পোষ্ট মাষ্টার বিমল অপরের প্রেম পত্র চুরি করে পড়ে এবং সেই সঙ্কেত
অনুসারে গোপন অভিসারে ধরা পড়ে ও প্রহৃত হয় । এ ঘটনায় সুযোগ নিয়ে
তিনি রটিয়ে দিলেন যে স্বদেশী ডাকাতরা পোষ্ট অফিস লুঠ করেছে । তদানীন্তন
আমলে বিপ্লবীদের কার্যকলাপে পোষ্ট অফিস লুঠ ছিল । তাই সকলেই পোষ্ট মাষ্টারের
কথা বিশ্বাস করল । এবং বিমল আত্ম প্রাণ তুচ্ছ করিয়া সরকারের টাকা রক্ষা
করিতে চেষ্টা করিয়াছিল , এই বিশ্বাসে সদাশয় গভর্নমেন্ট তাহাকে ইনস্পেকটার
পদে উন্নীত করিয়া দিলেন । " ২৮

' রেলে কলিশন ' স্বদেশী যুগের চিত্রকে এক বালকে দেখিয়ে ছাত্র জবানবন্দীতে
আপন মনো ভাবনা লেখক ব্যক্ত করেছেন । অটল বিহারী কলেজের ছাত্র । স্বদেশী

আন্দোলনে যুক্ত । অটলের উক্তি , " বঙ্গবাসী কলেজে বি.এ পড়িতেছিলাম ,
এমন সময় বঙ্গভঙ্গের ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল । পড়াশুনা পরিত্যাগ করিয়া
সভা সমিতিতে ছুটাছুটি , ফেডারেসন হলের জন্য চাঁদা সংগ্রহ , এবং স্বদেশী
বস্ত্রের মোট কাঁধে করিয়া বাড়ী বাড়ী বিক্রয় করিতে লাগিলাম । দুই একটা
সভায় বক্তৃতা করিবার পর , সুবক্তা বলিয়া কিছু খ্যাতি অর্জন করা গেল । মনে
আছে বীডন উদ্যানে এক সভা অন্তে স্বয়ং সুরেন বাঁড়ুয্যে আমার পিঠ থাবড়াইয়া
বলিয়া ছিলেন , " জিতা রও বাবা । " এমন সময় কলিকাতা ইউনিভারসিটির
নাম হইয়া গেল ' গোলাম খানা ' । কে একজন একখানা কাগজে বড় বড় অক্ষরে
' গোলাম খানা ' লিখিয়া সেনেট হাউসের দেওয়ালে আটিয়া দিয়াছিল । সুতরাং
অনেকের সঙ্গে আমিও কলেজ পরিত্যাগ করিয়া , ধর্ম্মের ষাঁড় হইয়া বেড়াইতে
লাগিলাম । " ২৯

কিন্তু এই গল্প শেষ হয়েছে রোমান্টিক প্রেমের গল্পে । এই অটল ট্রেনে
দুর্ঘটনার কবলে পড়ে । বিধ্বস্ত রেলগাড়ীতে আহত অবস্থায় পড়ে ছিল গুজরাটী
বালিকা সরস্বতী । অটলের আহত অবস্থায় গড়ে উঠল তার সাথে প্রেম ।
" মানুষের মনের গতি বিচিত্র , মৃত্যুর মুখোমুখি হইয়াও তাহার এই নারী
হস্তের মমতা মাখা সেবায় আমার মনে মধুর ভাবের সঞ্চার হইল । বলিলাম
" এস্ত্রী , যদি আমরা বাঁচি , তুমি আমায় বিয়ে করবে ? বলিয়া আমি
তাহার হাত খানি ধরিলাম । সে বলিল , আচ্ছা । " ৩০ গল্পের শেষ লাইন
" স্বদেশীর কৃপায় , আমার দোকান দিন দিন বেশ গুলজার হইয়া উঠিতে
লাগিল । " ৩১

' সম্পাদকের আত্ম কাহিনী ' তে স্বদেশী যুগের পটভূমিকে বড় অভাবনীয়
ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন । এই গল্পের মধ্যে সম্পাদকের বহিরাবরণে আত্মিক সাহসের
ভাবনা আর ' ডিপোর্ট ' হওয়ার ভয়ে অন্তরে যে কাপুরুষতা তা তিনি সুন্দর

ভাবে এঁকেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ যে সাহিত্যকে স্পর্শ করেছিল তার বিশদ বিবরণ এখানে আছে। " ..... তখন স্বদেশী আন্দোলন পুরাদমেই চলিতেছে। বঙ্গ সাহিত্যের মরা গাঙ্গেও ভাবের বান ডাকিয়া উঠিয়াছে — আমিও 'আর্যশক্তিতে' উদ্দীপনা পূর্ণ বহু প্রবন্ধ কবিতা, গান মাসে মাসে ছাপিয়া যাইতেছি। গোল - দীঘি, বিডন বাগান প্রভৃতি স্থানে প্রতিদিন তুমুল বক্তৃতা চলিতেছে, কয়েকটা সভায় আমিও বক্তৃতা করিয়াছি। অশ্বিনী দত্ত, বিপিন পাল প্রভৃতি জন নায়ক গণ দেশান্তরিত হইয়াছেন, আবার গুজব উঠিয়াছে, সিমলা শৈলে এক নূতন তালিকা প্রস্তুত হইতেছে — আরও কয়েকজন বিখ্যাত লোককে ডিপোর্ট করা হইবে।" ৩২

'আর্যশক্তি' স্বদেশী প্রবন্ধ বার করে। নবীন লেখক এসে বলেন 'আর্য - শক্তির মত পত্রিকা থাকলে দেশ উদ্ধার হতো। স্বদেশী আন্দোলনকে আর্যশক্তিই জাগিয়ে রেখেছে।' আরেকটি চিত্র "কলেজের ছেলেদের মধ্যেও আমাদের যথেষ্ট গ্রাহক। আগে তত ছিল না। স্বদেশী প্রবন্ধ গুলো যে সময় থেকে বেরুতে আরম্ভ করেছে — সেই সময় থেকে কলেজের ছেলেরা খুব গ্রাহক হচ্ছে।" ৩৩

অথচ পত্রিকায় জ্বালাময়ী প্রবন্ধ প্রকাশ এবং ব্যক্তিগত জীবনে জেলে যাওয়া পুলিশের ডিপোর্ট লিস্টে নাম উঠার সম্ভাবনা থাকলে যে ভীরুতা ও দৌর্বল্য সেটা সে যুগের কিছু মনের লোকের মধ্যে ছিল লেখক তার সাবলীল ইঙ্গিত দিয়েছেন, " ..... জেলকে আমার এত ভয় কেন? ... প্রথমত জেলে ধর্ম্ম বিচার নাই, জাতি বিচার নাই। আমি ব্রাহ্মণের ছেলে ত্রিসন্ধ্যা না করিয়া জল গ্রহণ করি না। জেলে আমি সন্ধ্যা আহ্নিক করিবার জন্য কুশাসনই বা পাইব কোথায়, একটু গঙ্গা - জলই বা আনিয়া দিবে কে? দ্বিতীয় কারণ — বিধবা হইতে আমার ব্রাহ্মণীর ঘোরতর আপত্তি। দীর্ঘ কাল কারাদণ্ড হইলে আমি জীবিত অবস্থায় জেল হইতে বাহির হইব না নিশ্চয়। .... এই দুটি বাধার জন্য জেলে যাওয়া আমার পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধা।" ৩৪

'মাদুলী' গল্পের পটভূমি স্বদেশী যুগের। গল্পের প্রধান চরিত্র রাইচরণ — বিদেশী বস্ত্রের আক্রমণে এক দরিদ্র ও নির্যাতিত তাঁতি। এই তাঁতির জীবনে আসে স্বদেশী দেশ সেবক। প্রভাত কুমার এই স্বদেশী দেশ সেবকদের অতি উগ্রতাকে ব্যঙ্গ ভরে প্রকাশ করেছেন। স্বদেশী যুবক মানেই যে ত্যাগ ব্রতী ও নিষ্ঠাবান এ রূপ চিত্র তিনি এই গল্পে আঁকেন নি। অনেক দেশ সেবক খ্যাতি ও প্রশংসার জন্য এ পথ বেছে নিত। এখানে রাইচরণ দরিদ্র তাঁতিকে দিয়ে কি ভাবে তার কার্য্য সিদ্ধি করতে চেয়েছিল তার বিবরণ এখানে পাই। গল্পের পাশাপাশি বিদেশী বস্ত্র কিভাবে দেশীয় তাঁত শিল্পকে ধ্বংস করছে তা স্বল্প কথায় তিনি তুলে ধরেছেন।

" কিন্তু কালের কি বিচিত্র গতি, সে সকল কথা এখন স্বপ্নের মতো — উপকথার শ্রেণী ভুক্ত। দেশে বিলাতী কাপড়ের বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ব্যাবসায় মাটী হইল ক্রমে তাহারা নিরন্ন হইয়া পড়িল।" ৩৫

আরেকটি চিত্র, " ..... সাপা পাঁচ টাকা কে দেবে ? আর কি সে দিন আছে ? দু টাকা জোড়া বিলাতী ধুতির জমিটে একবার মিলিয়ে দ্যাখ দেখি, সে ছেড়ে আড়াই টাকা জোড়া দেশী কাপড় কে কিনবে বাপু ?" ৩৬

স্বদেশী প্রচারকেরা কিভাবে স্বদেশীর ব্যাখ্যান করতো তার চিত্র এই গল্পে আছে। " যুবক বলিলেন — কেঁদ না রাই চরণ — কেঁদ না। তোমাদের দু:খের রাত পুইয়ে এসেছে। স্বদেশী জিনিষের প্রতি ক্রমেই লোকের ভক্তি বাড়ছে। শীঘ্র এমন দিন আসবে যখন কাপড় বুনে তোমরা কুলিয়ে উঠতে পারবে না। দেশের শিল্পের উপর, বিশেষত: তাঁতের উপর, ভগবানের শুভ দৃষ্টি পড়েছে। তাঁতির কান্না শুনে ভগবানের আসন টলেছে।" ৩৭

স্বদেশী যুবক যখন স্বদেশী প্রচার করেন তখন সন্ন্যাসী বেশ ধারণ করেন,

" সেবার গ্রামে গ্রামে স্বদেশী মন্ত্র প্রচার করতে বেরিয়ে ছিলাম , তাই সন্ন্যাসীর বেশে এসেছিলাম । " এই স্বদেশী যুবকের কথা মতো প্রতাড়িত করা অর্থ নিয়ে রাইচরণ স্বদেশী তাঁত কারখানা বসাতে অস্বীকার করল তখন " মূর্খ — নরাধম- দেশদ্রোহী বলিয়া সবুট পদাঘাতে রাইচরণকে ধরাশায়ী করিয়া যুবা রজনীর অন্ধকারের মধ্যে মিলায়ে গেল । "

অন্তিম লাইনে লেখক তাঁর খেদোক্তি প্রকাশ করে বলছেন , " এই নগন্য নিরক্ষর তাঁতিকেই নিজ প্রিয় সন্তান জ্ঞানে তারতমাতা বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন ।" ৩৮

' জামাতী বাবাজী ' গল্পে একদিকে স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমি অন্যদিকে স্বদেশী আন্দোলন হতে জাত বিপ্লবী কর্মক্ষেত্রের পূর্বাভাষ । এই গল্পে নব বিবাহিত যুবক পূর্ণচন্দ্র কলকাতার কলেজে পড়ত । হঠাৎ সে নিরুদ্দেশ হয় । পরে সে স্ত্রীকে একটি চিঠিতে জানায় যে জননী জন্মভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হতে মুক্ত করার জন্য সন্তান ধর্ম গ্রহণ করেছে । চিঠির ভাষা — " আমরা কয়েকজন যুবক মিলিয়া সন্তান ধর্ম অবলম্বন করিয়াছি । ... জননী জন্মভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হতে মুক্ত করাই সন্তানের জীবন ব্রত ।

' আমি দল গঠন করিয়া আপাততঃ গ্রামে স্বদেশী মন্ত্র প্রচার করিতে বাহির হইয়াছি । কবে কোথায় থাকি , কিছুরই স্থিরতা নাই ।

' মার শৃঙ্খল যত দিন না ভগ্ন করিতে পারি , ততদিন আমাদের গৃহ - সংসার নাই , পিতা - মাতা নাই , স্ত্রী - পুত্র নাই — কিছুই নাই । আছে কেবল দেশ । ..... এ জীবনে এ পবিত্র ব্রত যদি উদযাপন করিতে পারি , তবেই গৃহে ফিরিব , তোমার সঙ্গে আবার আমার মিলন হইবে , আবার আমি সংসারী হইব , নচেৎ এই শেষ । " ৩৯

সন্তান দলের মতো সে নাম ধারণ করেছিল ' পূর্ণানন্দ ' ব্রহ্মচারী রূপে । কিন্তু আনন্দ মঠের অনুকরণে সন্তান ধর্মে দীক্ষিত পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারেনি । ডাকাতি করতে গিয়ে শ্বশুর এবং মামা শ্বশুর যিনি দারোগা ছিলেন তাদের হাতে ধরা পড়ে । প্রাণ বাঁচানো ও জেল হতে বাঁচবার ভয়ে পূর্ণানন্দ সুবোধ বালকের মতো প্রতিজ্ঞা করে সে আর স্বদেশী করবে না এবং মন দিয়ে পড়াশুনা করবে ।

এই ' জামাতী বাবাজী ' গল্পের ক্যানভাসে সে সময়কার অনেক ছবি ধরা পড়েছে ।

" দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল । প্রায় প্রতি সপ্তাহেই স্বদেশী ওয়ালাদের কর্তৃক খুন বা ডাকাতির সংবাদ বাহির হয় । .....

..... একদিন ভীষণ সংবাদ পাঠ করিলাম । মজফরপুরের উকীল কেনেডী সাহেবের স্ত্রী ও কন্যা স্থানীয় জজ কিংসফোর্ড সাহেবের গাড়ীতে রাত্রে ক্লাব হইতে বাড়ী ফিরিতে ছিলেন , কে বা কাহারা বোমা মারিয়া কিংসফোর্ড সাহেব ভ্রমে মেম দুয়কে হত্যা করিয়া পলাইয়েছে — জোর তদন্ত চলিয়াছে । ..... ইহারই কিছুদিন পরেই কাগজে দেখিলাম , কলিকাতার মুরারী পুকুর বাগানে পুলিশ এক বোমার কারখানা আবিষ্কার করিয়াছে , বারীন্দ্র কুমার ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজন যুবক এই সম্পর্কে ধৃত হইয়াছে , ঐ ব্যাপারে দেশ ব্যাপী খানাতল্লাসী চলিতেছে । " ৪০

পুলিশের আত্মকথায় স্বদেশী যুগে পুলিশের সম্পর্কে জনমানসের ধারণা এই গল্প প্রকাশিত । পুলিশ ইন্সপেকটর হরেন বাবু বলছেন , " আমাদের হয়েছে দাদা শাঁখের করাত । স্বদেশী ওয়ালারা মনে করে পুলিশ তাদের পরম শত্রু । আবার গর্ভনমেন্ট মনে করেন , আমরা তলেতলে স্বদেশীওয়ালাদের সঙ্গে সহানুভূতি করি । " ৪১

' জামাতা বাবাজী ' তে প্রভাত কুমার একদিকে যেমন স্বদেশী যুগের পথভ্রষ্ট রোমান্টিক যুবকদের চিত্রে হাস্যরস দিয়েছেন তেমনি তিনি এই আন্দোলন সম্পর্কে নিজস্ব অনুভূতি অকপটে প্রকাশ করেছেন । তাই জামাতা বাবাজী যখন চিঠি দিয়ে জানালেন স্বদেশ ব্রত গ্রহণ করেছেন তখন তার শ্বশুর মশায় বলছেন ---

" স্বদেশী হয়ে একেবারে গৃহত্যাগ , কেন রে বাপু , এত বাড়াবাড়ি কেন ? স্বদেশী হয়েছিস বেশ তো , মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় পর , দেশী চিনি করকচ নুন ব্যাভার কর , বিড়ি খা -- কেউ ত মানা করছে না । একেবারে গৃহত্যাগ , পত্নীত্যাগ । " ৪২ এ কথা যেন শ্বশুরের নয় প্রভাত কুমারের নিজস্ব উপলব্ধি ।

" বি.এ পাস কয়েদী ' গল্পে স্বদেশী ডাকাতের প্রসঙ্গ এসেছে । স্বদেশী ডাকাতিতে ধরা পড়ে শরৎ বাঁড়ুজ্যে জেলে বন্দী হল । স্বদেশী ডাকাতদের বেশী এক জেলে রাখতে সাহস করত না ইংরেজ সরকার । তাকে পাঠানো হয় বকসার জেলে । স্বদেশী ডাকাতদের উপর ইংরাজ সরকারের কি রূপ ক্রোধ এবং তারা কেন ডাকাতি করত তার বিবরণ মোক্ষদার মুখ হতে আমরা পাই ।

" ..... গভর্নমেন্ট অন্যায় করে ওকে জেলে পুরেছে । বি.এ পাস করে ঢাকা জেলার কোন হাস্কুলে নাকি ও হেড মাস্টারি করত । সেখানে ওরা একটা সমিতি করেছিল ।সেই গ্রামের আর আশে পাশের গ্রামের অনেক ছোঁড়া সেই সমিতির মেম্বার ছিল । ও ছিল সমিতির সভাপতি । কাছে একটা বড় গ্রামে কি সাহা নাম বললে , তার কাপড়ের দোকান ছিল । ওরা বারবার তাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে বিলিতি কাপড় আমদানী করে দোকানে বিক্রী করছিল । টাকার মহাজনীও করতো । গরীব চাষাদের বেশী সুদে টাকা ধার দিয়ে ক্রমে তাদের জোৎ - জমা নীলাম করে নিয়ে তাদের সর্বনাশ করতো , এই রকমে সেই সাহা পোড়ার মুখো অনেক টাকা

জমিয়েছিল । স্বদেশীওয়ালারা বারণ করে তবুও সে শোনে না । তাই তাকে শাস্তি দেওয়ার হিসেবেও বটে , দেশের কাজে লাগাবার জন্য টাকা সংগ্রহের উদ্দেশ্যেও বটে ..... এক রাতে সেই সাহা মহাজনের বাড়ীতে ডাকাতি করেছিল । তাদের মধ্যে কেউ কেউ ধরা পড়ে । একজন মহারাণীর সাক্ষী হয়ে সব কথা প্রকাশ করে দেয় । ঐ শরৎ বাড়ুয্যে , সেই সমিতির সর্দার ছিলকিনা তাই গভর্নমেন্ট রাগে ওকে সুদ্ধ জেল দিয়েছে , নইলে ও নিজে ডাকাতি করে নি । ডাকাতদের সঙ্গে ছিলও না । " ৪৩

' ভুল ' গল্পটি রোমান্টিক প্রেমের গল্প । কিন্তু নায়িকার পিতা ছিলেন দেশীয় খ্রীষ্টান । স্বদেশী আন্দোলন তাঁদের প্রাণেও সাড়া জাগিয়েছিল । তারই পটভূমি এই গল্পটিতে লেখক উপস্থিত করেছেন ।

" কলেজে পাঠ্যদশাতেই হরিনাথ খৃষ্ট ধর্ম দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । শুধু তাহাই নয় নিজ নামটারও পরিবর্তন করিয়া মিষ্টার হ্যারি সাণ্ডেল হইয়াছিলেন । বঙ্গভঙ্গের পর ১৯০৫ সালে দেশে যখন স্বদেশী ভাবের বন্যা বাহিল , তখন হইতেই তাঁহার এই মতি পরিবর্তন । ধর্ম মানুষের অন্তরের জিনিষ , অপর কাহারও সহিত এ বিষয়ের কোন সম্বন্ধ নাই -- যার মনের যা বিশ্বাস তাই তার ধর্ম -- কিন্তু জাতীয়তা যে জন্মগত । খৃষ্ট ধর্মে বিশ্বাস করেন বলিয়াই তাহাকে যে সাহেব হইতে হইবে এমন ত কোন কথা নাই -- ঐ বরং তাহা হইতে চেষ্টা করাই স্বজাতি ও স্বদেশদ্রোহিতা । একদিন কৌতুহল বশতঃ সাণ্ডেল সাহেব কলেজ স্কোয়ারে বিপিন পালের বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলেন । বক্তৃতাটি শেষ পর্যন্ত শ্রবণ করিয়া , রুমালে চোখের জল মুছিয়া , গোলদীঘি হইতে বাহির হইয়া সোজা তিনি সোসাইটির কাপড়ের দোকানে প্রবেশ করেন এবং পকেটে যে কয়টি টাকা ছিল তাহা দিয়া মিলের ধুতি ও শাড়ী ক্রয় করিয়া বাড়ী আসেন । বহুকাল যাবৎ তিনি ধুতি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বাড়ীতে পায়জামা সুটই ব্যবহার করিতেন । সেদিন

ইংরাজী পোষাক ছাড়িয়া নতুন ধুতি একখানি পরিধান করিলেন । ভাবের আবেশে সেই কোরা ধুতির গন্ধটিও যেন তাঁহার আতর গোলাপের তুল্য মনে হইল । " ৪৪

প্রভাত কুমারের ছোট গল্পের যুগ ছিল বাংলার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে উত্তেজনার যুগ । স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বিদেশী দ্রব্য বর্জনের আন্দোলন হয় । 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় বিদেশী বর্জ্জনের আহ্বান , বিলাতী বর্জন ও স্বদেশী গ্রাণের জন্য ব্যাপক প্রচার , বন্দেমাতরম ধ্বনির সাথে ছাত্রদের বিদেশী বর্জন , কন্ঠে তখন দেশ ভক্তির গান , সাহিত্যে তখন দেশ ভক্তির জোয়ার , স্বাদেশিক সাময়িক পত্রিকায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা , স্বদেশী গ্রহণের আবেদন , দেশের পুলিশের নির্লজ্জ আচরণ , বিপ্লববাদের সূচনায় স্বদেশী ডাকাতি , বোমা পিস্তলের রাজনীতি , ক্ষুদিরাম , প্রফুল্ল চাকীর মৃত্যু , সবকিছুই ছিল সেদিনের নিত্য আলোচনা । বিদেশী বর্জনে বোম্বাই গোষ্ঠীর লাভ , সকল বস্তুকে জীবন্ত ভাবে প্রভাত কুমার চিত্রিত করেছেন ।

" শুধু বিদেশী পন্য বর্জন আন্দোলন নয় , সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী শিল্পেরও লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয় । এই সকল কাজে ছাত্রদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল । ১৯০৫ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত এই আন্দোলনের জের চলেছিল ছাত্র ও যুব সমাজের ঐকান্তিকতায় , বঙ্গের এমন জেলা ছিল না যেখানে স্বদেশীয় ভাবে লোক অনুপ্রাণিত হয় নি । নেতাদের সকল প্রকার কর্মের ছাত্ররাই ছিল সাধক , স্বদেশী সভা আহ্বান , স্বদেশী সংগীতের শোভা যাত্রা চালনা , বিলাতী মাল পিকেটিং বা এর বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ , গ্রামে গ্রামে স্বদেশী বস্ত্র ও মনোহারী সামগ্রী মাথায় করিয়া বিক্রয় প্রভৃতি বিচিত্র কর্মের কর্মী ছিল এই ছাত্র বাহিনী । এই সকল কর্মে প্রধানত রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সংগীতগুলি ছিল রণ সঙ্গীত তুল্য । " ৪৫

প্রভাত কুমার দরদী লেখক ছিলেন। রবীন্দ্র প্রভাবী প্রভাত কুমার কোন উগ্রতাকে কোনদিন যুক্তি বোধের উপরে স্থান দেন নি। স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপক রূপকে তিনি বাস্তব ভাবে তুলে ধরেছেন। তার গল্পে যেমন আছে আদর্শবাদী ব্যক্তিদের কথা, তেমনি আছে উগ্রতার নামে ভীরুদের কথা। সে যুগের চিত্রকে এমন নিরপেক্ষ ভাবে তিনি গল্পের মাধ্যমে চিত্রিত করেছেন যা আর কারও রচনায় মিলে না।

এই সময় রবীন্দ্র নাথ বলেছিলেন, " ঝগড়া করিতে গেলে হট্টগোল করা সাজে কিন্তু যুদ্ধ করিতে গেলে সেনাপতি চাই।" রবীন্দ্র নাথ বললেন, " সুরেন্দ্র নাথকে সকলে মিলিয়া প্রকাশ্য ভাবে দেশ নায়ক রূপে বরণ করিয়া লইবার জন্য আমি সমস্ত বঙ্গবাসীকে আহ্বান করিতেছি।" সুরেন্দ্র নাথের প্রভাব ছিল এই আন্দোলনে অপরিসীম। সবই চিত্র সার্থক ভাবে তিনি তুলেছেন।

ডঃ প্রমথ নাথ বলছেন, " স্বদেশী আন্দোলন মূলত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম এবং প্রধানত হিন্দু জাতীয়তাবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রায় সমগ্র দেশের শিক্ষিত সমাজ মানসে এক সুতীব্র স্বাদেশিকতা ও স্বাজাত্যাভিমানের প্লাবন এনেছিল। এইরূপ জাতীয় ভাব উদ্দীপক দেশ ব্যাপী আন্দোলন সম্পর্কে কেউ নিস্পৃহ থাকতে পারেন না। বিশেষত যে আন্দোলন শিক্ষা সমাজ অর্থনীতি ইত্যাদি রাষ্ট্রের সব দিক হতে একটি বিপুল পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। কথা সাহিত্যিক প্রভাত কুমারও যে এই কাল সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। ..... তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতার প্রমাণ স্বদেশী আন্দোলনের পরবর্তী কালে রচিত তার এই সকল গল্প।" ৪৬

প্রভাত কুমার স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে জীবন ও ঘটনা প্রবাহকে দেখতেন। দেশের জাতীয় ভাবকে তিনি উপেক্ষা করেন নি। তিনি তাঁর গল্পে বলছেন, " ধর্ম

মানুষের অন্তরের জিনিষ , অপর কাহারও সহিত এ বিষয়ে কোন সম্বন্ধ নাই — যার মনের যা বিশ্বাস তাই তার ধর্ম — কিন্তু জাতীয়তা যে জন্মগত । " ৪৭ এই স্পষ্ট ভাবনার ব্যাখ্যা তাঁর ছোট গল্পের মধ্যে আমরা পেয়েছি যেখানে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সার্থক , বাস্তব ও নিরপেক্ষ শিল্পী । এই নিরপেক্ষ দৃষ্টি - ভঙ্গীই তাঁর জীবন বেদ । তাই তাঁর ছোট গল্পগুলো স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে সাহিত্যের মোড়কে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপাদান ।

।। দক্ষিণা রঞ্জন মিত্র মজুমদার ।।

স্বদেশী যুগে বাংলা সাহিত্যের আনকোরা স্বদেশী জিনিষটিকে দক্ষিণা রঞ্জন নিজস্ব প্রতিভা বলে উন্মোচিত করলেন । ঢাকা জেলার সাভার - এর কাছে উলাইল গ্রামে দক্ষিণা রঞ্জন জন্মেছিলেন । ইংরাজী সন ছিল ১৮৭৭ । মায়ের কাছ থেকেই তিনি পেয়েছিলেন তাঁর পরম সম্পদ — রূপ কথার রসাস্বাদ । পিসিমা তাঁর সাহিত্য জীবনকে করেছিলেন উন্মোচিত । মুর্শিদাবাদেই তাঁর কিশোর ও যৌবনের প্রথম ভাগ কাটে । পিতার গ্রন্থাগারে যে সাহিত্য সম্পদ তিনি লাভ করলেন , জীবনের পাতায় সেই অভিজ্ঞতা যেন ধ্রুবী করণের কাজ করল ।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থ ' উত্থান ' প্রকাশিত হয় ১৯০২ এ । বাংলা দেশে জমিদারী দেখতে গিয়ে তিনি বাংলার লোক কথা কে আবিষ্কার করলেন । নদী পথে " কাঁপা ছায়া কাঁপিয়ে ' শির বিজুরিক রেহা ' সম এক পানসি এসে শির শিরিয়ে পাশ কাটাল । পানসি থেকে ভেসে আসা গানে জলের বুকে

তখন দ্রুত লয়ের কাঁপন । গান কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করেছে । ভাবাবিষ্ট তিনি সেই গীতিকথার গীতরসে । ..... জলে ভেসে আসা একখানা গান দক্ষিণা রঞ্জনের জীবনের দিশারী হয়ে গেল । এই মনের মানুষকেই তো তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন । ..... বের করে আনলেন হৃদয় রসে জারিত সেই অপরূপ রূপকথা । কবি ও নিষ্ঠাবান প্রাবন্ধিক দক্ষিণা রঞ্জন বাংলা সাহিত্যের অবহেলিত ' কথা ' সাহিত্যের দিকে চিত্ত নিবিষ্ট করলেন । " ৪৮

সুদীর্ঘ কাল একনিষ্ঠ সাধনার মাধ্যমে তিনি বাংলার পল্লী সম্পদ থেকে উদ্ধার করলেন বাংলার লোককথাকে । একে ভাগ করলেন চার ভাগে – গীতিকথা , ব্রতকথা , রূপকথা ও রসকথা । গীতিকথা – ঠাকুর মার ঝুলি , মালঞ্চ মালা , পুষ্প মালা , ব্রতকথা – ঠানদিদির থলে , রূপকথা – ঠাকুর মার ঝুলি , রসকথা – দাদা মশায়ের থলে ।

দক্ষিণা রঞ্জন কলকাতায় এলেন ১৯০৬ এ । বাংলার আকাশ বাতাস তখন উদ্দীপিত । স্বদেশী গানের সুর বাংলার প্রান্তরে প্রান্তরে । যুবদের কণ্ঠে ' বাংলার মাটি বাংলার জল ' , পরনে ' মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় ' । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হতে উৎপন্ন স্বদেশী মানসিকতার আকাঙ্খা অত্যন্ত তীব্র । দীনেশ চন্দ্র সেনের সহায়তায় বহুদিনের পরিশ্রম সাধ্য ফল 'ঠাকুর মার ঝুলি ' প্রকাশিত হলো ১৯০৭ এ । প্রকাশক ভট্টাচার্য্য এন্ড সন্স । দেশবাসী ঠাকুর মার ঝুলিকে সাদরে বরণ করল ।

' ঠাকুর মার ঝুলি 'র নিবেদনে গ্রন্থকার বলছেন " আকাশ নিখিল ভরা জ্যোৎস্নার রাজ্যে , জ্যোৎস্নার সেই নির্ম্মল শুভ্র পটখানির উপরে পলে পলে কত বিশাল ' রাজ রাজত্ব ' কত ' অচিন অচিন ' রাজপুরী .... সেই অজানা রাজ্যের সেই অচেনা রাজপুত্র সেই সাত সমুদ্র তের নদীর ঢেউ ক্ষুদ্র বুক খানির মধ্যে

স্বপ্নের ঘোরে খেলিয়া বেড়াইত , ... কিন্তু এত শীঘ্র সেই সোনা - রূপার কাঠী কে নিল , আজ মনে হয় আর ঘরের শিশু তেমন করিয়া জাগেনা , তেমন করিয়া ঘুম পাড়ে না । " ৪৯

ঠাকুর মার ঝুলির চার ভাগ -- দুধের সাগর , রূপ তরাসী , চ্যাং ব্যাং , আম- সন্দেশ । লেখক বলছেন ---

হাজার যুগের রাজপুত্র , রাজকন্যা সবে
রূপ সাগরে সাঁতার দিয়ে আবার এল কবে ।
বিজন দেশে কোথায় যে সে ভাসানে ভাই বোন
গড়লো অবাক অতুল পুরী পরম মনোরম ।
সোনার পাখী ভাসঁল স্বপন কবে কি গান গেয়ে -
লুকিয়ে ছিল এ সব কথা দুধ সাগরের ঢেউয়ে ।

বানর ছানা বুদ্ধুর বুধকুমারের পরিণতি লাভ ও পেচা পুত্র ভুতুমের রূপ কুমারের গল্প , পাঁচ হিংসুটে রাণীর আর পাঁচ ঈর্ষাকাতর পুত্রের নির্মম পরিণতি এবং রাজা বুধ কুমারের ও রূপ কুমারের সাথে কলাবতী , হীরাবতীকে নিয়ে সুখে রাজত্বে কাল কাটানো রূপকথার প্রিয় গল্প । এই ভাবেই এসেছে ' ঘুমন্তপুরী ' জিয়ন কাটি আর মরণ কাটির গল্প । রাজপুত্র জিয়ন কাটির স্পর্শে রাজাকে জাগালেন । " রাজা বলিলেন -- তুমি কোন দেশের ভাগ্যবান রাজার রাজপুত্র আমাদিগে মরণ ঘুমের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছ । জন পরিজনেরা বলিল -- আহা আপনি কোন দেবতা - রাজার দেব রাজপুত্র - এক দৈত্য রূপার কাঠী ছোঁয়াইয়া আমাদের গমগমা সোনার রাজ্য ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছিল - আপনি আসিয়া আমাদিগে জাগাইয়া রক্ষা করিলেন । " ৫০ রূপকথা কি রূপক রূপে লেখক ব্যবহার করেছিলেন ? বাংলার প্রান্তরে প্রান্তরে শ্বেত দৈত্যের প্রভাবে মানুষেরা ভীরু সুলভ নিস্তব্ধতা যেন বাংলাকে ঘুমন্ত পুরীতে পরিণত করেছিল ।

আজ রূপকথার সেই রাজপুত্রই যেন বাংলাটাকে জাগিয়ে তুলেছেন ।

পাঁচ রাজার গল্প , সাতভাই চম্পা ও তাদের বোন পারুলের গল্প গুলির ভিতরে লেখক দরদী মনে বাংলার রূপকথাকে তুলে নিয়ে এসেছেন । রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মার ঝুলি ' সম্পর্কে লিখছেন , " ঠাকুর মার ঝুলিটির মত এতবড় স্বদেশী জিনিস আমাদের দেশে আর কি আছে ? কিন্তু হায় এই মোহন ঝুলিটিও ইদানীং ম্যাঞ্চেস্টারের কল হইতে তৈরী হইয়া আসিতে ছিল । এখনকার কালে বিলাতের 'Fairy Tales' আমাদের ছেলেদের একমাত্র গতি হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে । স্বদেশের দিদিমা কোম্পানী একেবারে দেউলে । তাঁদের ঝুলি ঝাড়া দিলে কোন কোন স্থলে মার্টিনের এথিকস এবং বার্কের ফরাসী বিপ্লবের নোটবই বাহির হইয়া পড়িতে পারে , কিন্তু কোথায় গেল — রাজপুত্র পাত্তরের পুত্র , কোথায় বেঙ্গমা বেঙ্গমী , কোথায় সাত সমুদ্র তের নদীর পারের সাত রাজার ধন মানিক ।

পাল পার্বন যাত্রা গান কথকতা এ সমস্তও ক্রমে মরা নদীর মত শুকাইয়া আসাতে , বাংলা দেশের পল্লী গ্রামে যেখানে রসের প্রবাহ নানা শাখায় বহিত , সেখানে শুষ্ক বালু বাহির হইয়া পড়িয়াছে । ইহাতে বয়স্ক লোকের মন কঠিন স্বার্থ - পর এবং বিকৃত হইবার উপক্রম হইতেছে । তাহার পরে দেশের শিশুরাও কোন পাপে আনন্দের রস হইতে বঞ্চিত হইল । তাহাদের সায়ংকালীন শয্যাতল এমন নীরব কেন ? তাহাদের পড়ার ঘরের কেরোসীন দীপ্ত টেবিলের ধারে যে গুঞ্জন ধ্বনি শুনা যায় তাহাতে কেবল বিলাতী বানান বহির বিভীষিকা । মাতৃদুগ্ধ একেবারে ছাড়াইয়া লইয়া কেবলি ছোলার ছাতু খাওয়াইয়া মানুষ করিলে ছেলে কি বাঁচে । কেবলি বইয়ের কথা ? স্নেহময়ীদের মুখের কথা কোথায় গেল ? দেশলক্ষ্মীর বুকের কথা কোথায় ?

এই যে আমাদের দেশের রূপকথা বহু যুগের বাঙালী বালকের চিত্ত ক্ষেত্রের উপর দিয়া অশ্রান্ত বহিয়া কত বিপ্লব কত রাজ্য পরিবর্তনের মাঝখান দিয়া অক্ষুন্ন

চলিয়া আসিয়াছে , ইহার উৎস সমস্ত বাংলা দেশের মাতৃস্নেহের মধ্যে । যে স্নেহ দেশের রাজ্যেশ্বর রাজা হইতে দীনতম কৃষককে পর্যন্ত বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে , সকলকেই শুক্ল সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ দেখাইয়া ভুলাইয়াছে এবং ঘুম পাড়ানি গানে শান্ত করিয়াছে , নিখিল বঙ্গ দেশের সেই চির পুরাতন গভীরতম স্নেহ হইতে এই রূপকথা উৎসারিত ।

.... বাঙালীর ছেলে যখন রূপকথা শোনে তখন কেবল যে গল্প শুনিয়া সুখী হয় , তাহা নহে — সমস্ত বাংলা দেশের চিরন্তন স্নেহের সুরটি তাহার তরুণ চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া , তাহাকে যেন বাংলার রসে রসাইয়া লয় ।

দক্ষিণা বাবুকে ধন্য , তিনি ঠাকুর মার মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুতিয়াছেন তবুও তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমনি সবুজ , তেমনি তাজাই রহিয়াছে । " ৩১

অরবিন্দ ঠাকুর মার ঝুলি সম্পর্কে 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় লিখলেন ,
"The book has marked out an epach in our literature. This is sure to give him a prominent place in the rank of prominent poets and writers".

"... বাংলার ঘরে ঘরে কথিত যুগযুগান্তরের ঐতিহ্য সম্পন্ন রূপকথার গল্পগুলি মনের মধ্যে যে আবিলতা সৃষ্টি করত , কল্পনা বিলাসী শিশু ও কিশোর মন যে ভাবে তার কল্প জগতে বিচরণ করত তা যেন ভারতবর্ষের এক নিজস্ব পরিমন্ডলে গড়ে উঠা এক মহতী জিনিষ । এই স্বদেশী ঐতিহ্য খুঁজে বার করতে তাঁকে দীর্ঘ দিন পরিশ্রম করতে হয়েছে । তাঁর সম্পর্কে একজন সমালোচক বলছেন " এ সব কাজের জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্য পর্যন্ত নিলেন । প্রাচীন ধরণের এক ফনোগ্রাফের সাহায্য নিয়ে বৃদ্ধ বৃদ্ধার জিহ্বা জড়িত শব্দকে মোমে করা রেকর্ডে

লিপিবদ্ধ করে আনতেন । বারো বছরে চার হাজারেরও অধিক দিন ধরে দক্ষিণা রঞ্জন যেন ' কথা ' রস সৃষ্টি বিদ্যুতের দ্বারা অভিভূত থাকলেন । " ৩২

তাই কাঞ্চন মালার গল্প হোক , সূঁচ রাজার কষ্ট বা রাখাল ও রাজার সাথে নিবিড় বন্ধুত্ব প্রতিটির মধ্যেই লেখক দরদী মন নিয়ে সেই রূপকথার রাজ্যে নিয়ে গেছেন , ' সাতভাই চম্পা আর পারুলবোনের স্নেহার্ত রূপ' , কিংবা ' অরুণ বরুণ আর কিরণ মালার' দুঃসাহসিক মায়া পাহাড়ের অভিযান ভাইবোনের মহতী স্নেহরূপকে বড় অনাবিল ভাষায় বর্ণনা করেছেন । ' শীত - বসন্ত ' দুই ভাইয়ের জীবনের বিভিন্ন গতি কি ভাবে তাদের রাজ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করল তা যেন কিশোর মনের উৎসুক জীবনের চিন্তার ফসল ।

দক্ষিণা রঞ্জন ' ঠাকুর দাদার ঝুলি ' প্রকাশ করলেন ১৩১৬ সালে (ইং ১৯০৯) । বাংলার লোক সঙ্গীত সভার আশুতোষ হলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষিণা রঞ্জন বলেছিলেন , " কথা ও সঙ্গীতের দোলা বাজে এসে জাতির অন্তরের তারে । দেশের জলৈশ্বর্যে, মেঘের পুষ্ফুট প্রসন্নতায় , মাটীর ছন্দিত সবুজে , কুটীর গৃহে প্রাসাদে , রৌদ্র জ্যোৎস্না লেখা উপমাহীন আনন্দ হার পরিয়ে দিয়েছে - কথা ও গান ।

দেশের বিদেশের যিনি অভিলাষ করেন বাংলাকে জানার , নিবিড় সন্ধান তাঁকে নিতে হবে বাংলার কথা ও গানে । জাতির জীবন বল , অক্ষয় ঐতিহ্য , অশেষ কাব্য বিকশিত হৃদয় , দিবস রাত্রি , পরিপূর্ণ রয়েছে এই পরিচয়ে ।

রসলোকের ভাষা এবং সুর দেশের নিগূঢ় কথা , মুক্ত কথা , উভয়কেই লিখেছে ঐ দুয়ের মধ্যে । যেমন করে বিশ্বের বিপুল রহস্য , বউকথা কও পাখী

আকাশ নিখিল ভবে অনির্বচনীয় অক্ষরে অমর রথয়ে লিখে রেখে যায় । " ৩৩

বাংলার লোক গাথার বিস্মৃতির অতল গহ্বর হতে লেখক কুড়িয়ে নিয়ে এলেন মধুমালা , পুষ্পমালা , মালঞ্চমালা , কাঞ্চনমালা ও শঙ্খমালার সুমধুর প্রেম কাহিনী । রূপকথার রাজপুত্রের অনবদ্য সাহস ও মধুর মিলন কাহিনী দিয়ে গল্প গুলো সমাপ্ত ।

রূপকথার কাহিনীর মধ্যে আছে বহু বিপদের ঝুকি নিয়ে রাজপুত্র বা রাজকন্যার বিজয় কাহিনী । দক্ষিণা রঞ্জন চেয়েছিলেন শিশুমন হতে বাংলার কিশোরদের মন যেন দু:সাহসিক ভাবনায় উদ্বেল হয়ে উঠুক । যে জাতি ' এ্যাডভেঞ্চার ' জানেনা তাদের জীবন গতি সমাপ্ত । তারা তো স্থবির । রূপকথার রাজ্যের ভিতর দিয়ে দক্ষিণা রঞ্জন এক সাহসী পরিবেশ বাংলার বুকে দেখাতে চেয়েছিলেন ।

তাই দক্ষিণা রঞ্জন তাঁর ' আশীর্বাদ ও আশীর্বানী ' তে বলছেন " তোমাদের দেশের আনন্দ আরও অপরূপ আরও সুন্দর । তপস্যা আর আনন্দ মানুষের কে ? ও দুজন মানুষের চির বন্ধু । ওই দুটো জিনিষ মানুষকে সব কিছু থেকে শুধু বড় করতেই জানে । জানে খাঁটি মানুষ করতে । পেয়েছ ও জিনিস দুটো তোমাদের নি:শ্বাসের সাথে । তামাদের খেলনা থেকে , তোমাদের পুতির পাতে , তোমাদের ভাষা থেকে তোমাদের আশাতে , তোমাদের দুরন্ত অশান্ত চঞ্চলতার রাজ্যে আর তোমাদের সুপবিত্র সুধা ঢালা বুকের , চিন্তার তপোবনে । " ৩৪

দক্ষিণা রঞ্জন চেয়েছিলেন বাংলার রূপকথার রাজপুত্রের মতো বাংলার দামাল কিশোরেরা দুরন্ত হয়ে করুক অভিযান । তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলছেন , " কোন স্বর্গ থেকে আসবার পথে কত কি আশ্চর্য্য তোমরা নিয়ে যে এসেছ কে জানে ?

..... সেই ক্ষমতাকে ঘোড়ার মতো দাও ছুটিয়ে তোমাদের জন্মভূমির দোর থেকে দশ দিকে উথল উল্লাসের হাসিতে দিক ভরে।

থাক তোমাদের হাসি মুখে অসীম দুষ্টুমি ,
রাখো শুধু বুক খানিতে অমর জন্মভূমি ।
হাতে এসে মিলাক হাত , সোনালী দিন রূপালী রাত ,
রঙিন খেলায় দিক ভরে দাও , দেশ ভরে দাও কাজে ,
সাত সাগরের ঢেউ দোলা দিক , প্রাণের স্বপন মাঝে ।
অমল কিশোরী , অটল কিশোর চলো
প্রভাতের মতো জ্বলমান ,
আকাশে বাতাসে খেলে যাক সাথে —
প্রভাত রোদের কলগান ।

বেজেছে ঘুমের শেষের শঙ্খ । দেশের শঙ্খ । তরুণ রাজ্যের চির অক্ষয় প্রাণের শঙ্খ ।

দেশ চায়
তার কিশোর স্বপ্নে মাখা হয়ে
রঙ সায়রের পারের ঢেউয়ের ধারেধারে
অজানারি বিপুল অন্ধকারে
চলবে জগৎ জয়ে
চলা তাদের হবে সফল হবে
শঙ্কা হরণ অখন্ড গৌরবে ।

এই শঙ্খ শুনেছ ?

" শুনেছি আমিও । শত শত যুগের শত শত মানুষের মনের হাজার জমাট স্বপ্ন থাকে একটা জাতির বুকের মধ্যে লুকিয়ে । সেই স্বপ্ন মানিকের জাগরণ টিকা কপালে এঁটে কিশোরেরা দাঁড়ায় জগতের সম্মুখে — কি করে জাতিকে বড় করবে , জ্বলন্ত করবে মহান করবে । সেই জাতির আর দেশের , শঙ্খের ডাক তারা শুনতে পায় আপন মায়ের মুখের গানে , দেশের আকাশে বাতাসে জলে অরণ্যে , পিতৃপুরুষের দুঃখ - সুখ - ভরা উজ্জ্বল কাজের ইতিহাসে , আর শোনে .... পৃথিবীর অন্য দেশের ভাই বোনদের সাথে , খেলার মাঠে আর পড়ার মন্দিরে । " ৩৫

যে দেশের কিশোর তার ' এ্যাডভেঞ্চারী ' মনোভাব হারিয়ে ফেলে সেই দেশটা মৃত । জীবনের দুর্বার বেগের মতো বুধ কুমার , বা অরুণ বরুণ বা মদন কুমার কিংবা শীত বসন্তের মতো যারা অজানা রূপকথার দেশে যাত্রা করতে পারে তাদের তো আছে প্রাণ সঞ্জীবনী শক্তি । দক্ষিণা রঞ্জন সেইরূপ দেশই চেয়েছিলেন —

" দেশ চায় , তার কিশোর সাগর ঢেউয়ের সাথে
ঝড় বৃষ্টির দোলায় দুলবে আপন ভোলা
শক্তি সাহস রইবে আগল খোলা সন্ধ্যে দুপুর প্রাতে ?
দেশ চায় , তার কিশোর কুটির অট্টালিকায়
হবে শ্রমিক চাষীর দুঃখ দিনের হাসি ,
হবে ধনীর সুপ্ত ঘরে আসি দীপ্ত অমল শিখা ।
দেশ চায় , তার কিশোর — আশার আলোক পুরে ...
জাগবে সবুজ প্রাণের দারুণ সন্ধানে
সৃষ্টি তারে ডাকছে যে কোনখানে
কোন কাছে কোন দূরে

দেশ চায় , তার কিশোর শিল্প , বনিজ জ্ঞানে ,
আনবে নবীন উষার দেশের হীরক ভূষা
জগৎ জোড়া খ্যাতি নিরঙ্কুশা , গহন সম্মানে । " ৫৬

দক্ষিণা রঞ্জন ' ঠাকুরদার ঝুলি 'তে ভূমিকায় মন্তব্য করছেন , " দেশের জীর্ণ পর্ণ কুটিরের নিরক্ষর কৃষক হইতে ধনী গৃহের দিদিমাদের কণ্ঠে যে ' মধুমালা ' , ' মালঞ্চমালা ' , কথা গুচ্ছ সুর মূর্চ্ছনার চির প্রিয় পুলক নহর , শিক্ষিতের অক্ষর মহিমার কাছে তাহার যোগ্য মূল্য ধরা পড়া কত স্বাভাবিক ভারতীয় প্রাণধারা বাঙালীর জাতীয় চিত্তরস — এ খর স্রোতের উচ্ছল তরঙ্গে ।

পৃথিবীর বিবিধ দেশ যাহা লইয়া আপনাদের কুটির প্রাসাদ রৌদ্রে জ্যোৎস্নায় , সুগৌরব ফুলের তোড়ায় সাজায় — আমরা অবাক দৃষ্টিতে দেখি , ঝড়া পাপড়ি কুড়াই — তাহারই মত , আমাদের গরিমা মহিমা আমারই বাংলা মার অন্তর স্পর্শ , জাতির বেদনা উল্লাসের মর্ম্ম মর্যাদা — আপনতম আমাদের জিনিস , অপরের মতে এ জাতিও তাহা জগতের বাহির করিতে পারে । আরব পারস্যের ' একাধিক সহস্র রজনী ' আসিয়া এ দেশ জুড়িয়া কত তারা নক্ষত্র ফুটাইয়া গেল । আমাদের ' রজনী ' — পবিত্র সুন্দর নিষ্কলঙ্ক রাকা চাঁদের মত প্রাণের জিনিষ আমাদের — আমার ' বাংলা মা ' র নৈশ বাঁশীর সুর , তাহাকে দেশে ও বিশ্বে চাই , তাহার প্রতিদিনের আরতির নিশ্চিত আকাঙ্খা করি । " ৫৭

দক্ষিণা রঞ্জনের এই ভাবনায় নির্মিত সাহিত্যকে অবলোকন করে অশ্বিনী কুমার দত্ত বলছেন দক্ষিণা রঞ্জনের সাহিত্য " নিত্য নতুন চির স্থায়ী আনন্দের খনি " । চিত্ত রঞ্জন দাস মন্তব্য করেছিলেন ' এতে আছে বাংলার চিরন্তন বাঁশীর সুর । " কারণ তাঁর সাহিত্য দেশের জলমাটির মতো পরম স্নিগ্ধ ও সুন্দর ।

।। সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার ।।

স্বদেশী যুগের পটভূমিকায় সুরেন্দ্র নাথ গল্প লিখেছিলেন । বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী যুগের সেই সময় চরমক্ষণ । একদিকে যেমন স্বদেশী কার্যকলাপ তীব্র হতে শুরু করেছে অন্য দিকে জন্ম নিচ্ছে সন্ত্রাসবাদ । সেই পটভূমিকায় সুরেন্দ্র নাথ লিখলেন ' স্বদেশী ও বিলাতী ' । সুরেন্দ্র নাথ পেশায় ছিলেন ডেপুটি কালেকটর । প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের গল্পের অনেক চরিত্রের মতো ইনিও স্বদেশী ভাবনার প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করেছিলেন । তাঁর ' স্বদেশী ও বিলাতী ' গল্পটি সাহিত্য পত্রিকায় ১৩১৪ এর পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ।

গল্পের উপজীব্য বিষয় রোম্যান্টিক প্রেম । অপূর্ব নামে এক যুবকের সাথে শান্তির বিধবা বিবাহ , এবং নরেন্দ্রের সঙ্গে অনিলার শুভ পরিণয়ে গল্পের সমাপ্তি । এই গল্পের পটভূমিতে লেখক স্বদেশী যুগের কিছু পরিবেশ সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন ।

মিষ্টার সেন সদ্য বিলেত হতে ফিরেছেন । শরৎকালের মধুর রাত । তিনি নিজের দেশের পুকুরের পাশে এসে শুয়ে পড়লেন ।

" স্বদেশের পুকুরটা পানায় পরিপূর্ণ । বন বাদাড় ভরা ভাঙা পাড়ের অন্ধকার ভাগে ঝিল্লিকুল বিষম চীৎকার করিতেছিল । স্বদেশী শৃগাল বিলাতীয় ব্যারিস্টারের সহৃদয়তা লক্ষ্য করিয়া ক্ষণ কালের জন্য দার্শনিক বিচার পরায়নতার পরিচয় দিয়া নীরব হইল । গোটা কয়েক অন্ধকার আর গোটা কয়েক আলোক স্বদেশী ও বিলাতী ভাব ধরিয়ে দুই দলে বিভক্ত হইয়া গেল । গোটা কতক বিলাতী স্বপ্ন ও গোটা কতক দেশী স্বপ্ন দুই দিকে সারিসারি দাড়াইয়া চন্দ্র করে নৃত্য করিতে লাগিল । "

মিস্টার সেনের মনে পড়ল বিনোদ বন্ধুর কথা। বিনোদের সাথে তার এই ভগ্ন দশা প্রাপ্ত বাড়ীতে কত স্বদেশী ভাবনার কথা সে বলেছিল। বিনোদের বাড়ীতে বিনোদের বাবার কাছে শুনল বিনোদ মারা গেছে। সে কলকাতায় একটি কলেজে অধ্যাপনা করত। বিয়েও করেছিল। দেশের কাজ করতে করতে বিনোদ মারা যায়।

অপূর্ব কৃষ্ণ সেন বন্ধুর মৃত্যুতে আঘাত পেলেন। ফিরে এলেন কলকাতার বাড়ীতে যেখানে তাঁর মা তাঁর ছেলেকে স্বদেশী ধুতি চাদরে দেখে প্রচন্ড খুশী হলেন।

অপূর্ব সেন বিলেত যাওয়ার আগে কাঁসারি পাড়ার রামহরি গুপ্তের কন্যা অনিলার সাথে এর বিলাতী ধরণের প্রেম হয়েছিল। অপূর্ব সেন চললেন সেই বাড়ী। অনিলার পিতা রামহরির মদ খাওয়ার তীব্র নেশা ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে তিনি 'দেশী' খেতে বাধ্য হতেন। অপূর্বের সাথে অনিলার দীর্ঘদিন পর দেখা হলো। " অনিলা অনিকটা বিলাতী। চক্ষু কটা, কিন্তু কটার মধ্যেও স্বদেশী বেগুনের মতো একটু মাধুর্য্য ছিল। অনিলা আনন্দময়ী। অনিলা পিতার শিক্ষায় গা ঢালিয়া দিয়া বিলাতী ভাবে ও বিলাতী উপাদানে মিশিয়া গিয়াছিল। কিন্তু অনিলার পশ্চাতে যে একটা স্বদেশী ভাব ছিল সেটা কেহই জানিত না। "

বিনোদের স্ত্রীর নাম ছিল শান্তি। অনিলার সাথে শান্তির হৃদ্যতা ছিল। শান্তির দাদা নরেন্দ্র ছিলেন বিনোদের স্বদেশী শিষ্য। বিনোদ ও অপূর্বর চেহারা ছিল প্রায় একই ধরণের। এমন কি বিনোদ মৃত্যুর পূর্বে শান্তিকে বলেছিলেন, " যদি সংসারে কখনও সহায়হীনা হও, যদি কখনও হৃদয়ের বল না পাও, তবে অপূর্বর সাহায্য লইও। "

একদিন অনিলার বাড়ীতে নরেন্দ্র শান্তি ও অপূর্ব সবাই একত্রিত হলেন।

নরেন্দ্র অনিলাকে দেখে জানতে চাইলেন শান্তির কাছে অনিলার মাথায় কি আছে ? শান্তি বলেছিলেন যে বিলাতী পুটলি । অনিলা সেই সময় বাইরে এসে অপূর্বকে বললেন ' আপনার বিলাতী সাজগুলা আমাকে দিন । '

অপূর্ব ও অনিলার বিলাতী সরঞ্জাম সব একত্রিত করে অনিলা তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিল । " বিলাতী ও দেশী ভাব তুমুল সংগ্রাম পূর্বক ধূম আশ্রয় করিল । " নরেন্দ্র অপূর্বকে বললেন " আমার বোধহয় দেশী ও বিলাতী মিশিয়া যাহা হইয়াছে তাহার নাম স্বদেশী । "

অবশেষে এঁদের বিবাহ হলো । অপূর্ব কৃষ্ণের সাথে শান্তির ও নরেন্দ্রর সাথে অনিলার । অপূর্বর সাথে বিধবা শান্তির বিবাহটা যেন ' স্বদেশী ' হলেও এটা যেন ' বিলাতী ' ধরণের ।

সুরেন্দ্র নাথের গল্প প্রসঙ্গে বলা হয় , " গদ্য রচনায় সুরেন্দ্র নাথের স্টাইল তাঁহার নিজস্ব । সে স্টাইল বিষয়ের সঙ্গে অচ্ছেদ্য । " ৩৮

।। জ্ঞানেন্দ্র শশী গুপ্ত ।।

স্বদেশী যুগে জ্ঞানেন্দ্র শশী গুপ্ত " ঠাকুর মার ঝুলি " গ্রন্থ প্রনয়ন করেন । প্রকাশ কাল ছিল ১৩১২ । লেখকের বক্তব্য অনুসারে ' ঠাকুর মার ঝুলি ' গ্রন্থটি দক্ষিণা রঞ্জন মিত্র মজুমদারের আগের লেখা । তিনি তাঁর প্রথম সংস্কারের ভূমিকায় বলেছেন " আমাদের দেশের মা ও দিদিমা- রা বহুকাল অবধি যে সকল

' উপকথা ' তাহাদিগের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ও নাতি নাতনীদের বলিয়া আসিতেছেন বর্তমান পুস্তকে সেই সকল গল্প প্রকাশিত হইল । এইরূপ ' উপকথা 'র পুস্তক ইহার পূর্বে বঙ্গভাষায় আর প্রকাশিত হইয়াছে কি না , বলিতে পারি না , অন্ততঃ আমি সেইরূপ কোন পুস্তক এই পর্যন্ত দেখি নাই । আমাদের দেশে সচরাচর যে ভাষায় কথাবার্তা চলে , বর্তমান পুস্তকে সেই ভাষা অবলম্বন করিয়াছি । যথা - সাধ্য গ্রাম্য কথার ব্যবহার করি নাই । " ৩৯

জ্ঞানেন্দ্র শশীর পুস্তকে যে সব গল্প আছে তার সংখ্যা পনের । উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি রাজপুত্র ডালিম কুমার , হীরামন তোতার গল্প , ব্রহ্ম দৈত্যের গল্প , কেশবতীর গল্প , রুদ্রাবতীর গল্প , শাকচুন্নীর গল্প , পুষ্পবতীর গল্প ।

' রাজপুত্র ডালিম কুমারের ' ভাষার নিদর্শন —

" এইদিকে বিধাতা পুরুষের বোনের একটি কন্যা সন্তান জন্মিল । ছেলে কি মেয়ে হওয়া মাত্র বিধাতা পুরুষ করেন কি সেই ছেলে কি মেয়ের ভাগ্যে যাহা থাকে তাহা তার কপালে লিখিয়া দিয়া যান । সেই জন্যই তো আঁতুর ঘরের দুয়ারে দোয়াত আর কলম রাখিয়া দিতে হয় । বিধাতা পুরুষ দস্তুর মতো তাঁর ভাগ্নীর কপালে লিখিয়া দিয়া যেমনি বাহির হইবেন অমনি তার বোন বিধাতা পুরুষকে ধরিয়া বলিল ' হেই দাদা আমার মেয়ের কপালে কি লিখিলে বল । '

বিধাতা পুরুষ প্রথমে বলিতে চাহেন না , শেষে বোন না ছোড়বান্দা হওয়াতে বলিলেন ,

" ধরা কন্যা , মরা বর
অনাথ মন্দিরে ঘর । "

জ্ঞানেন্দ্র শশী গুপ্ত এই পুস্তক রচনার জন্য গল্পগুলো বিভিন্ন মানুষের নিকট হতে সংগ্রহ করেছিলেন ।

॥ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১২৮৩ সালে । স্থান মালদহের চাঁচলে । দীর্ঘকাল তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন । গল্পকার , ঔপন্যাসিক , সাংবাদিক রূপেও তিনি প্রসিদ্ধ । তিনি 'প্রবাসী'র সহ সম্পাদকও ছিলেন । স্বদেশী যুগে প্রকাশিত গল্পের নাম 'মা' । প্রকাশকাল আশ্বিন ১৩১৫ । প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছিল ।

স্বদেশী যুগে হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতিতে বিশ্বাস করতেন সকল জাতীয়তাবাদী মানুষ । লেখকও এই সম্প্রীতির উদাহরণ 'মা' গল্পের মধ্যে সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন । তার সাথে সাথে এনেছেন স্বদেশী যুগের কথা ।

'মা' এর নাম দয়া ঠাকুরাণী । বৈধব্য অবস্থার একমাত্র ধন পুত্র ষষ্ঠীচরণ । দয়া ঠাকুরাণীর নিকট আরেক ছেলে প্রতিপালিত হচ্ছিল তার নাম জহর । ধর্মে ছিল মুসলমান । মায়ের স্নেহ কারও জন্য কমতি ছিল না । দুজনের শিক্ষার সমান সুযোগ মা দিতেন । দুজনেই এফ.এ পাশ করলো । ষষ্ঠীচরণ আরও পড়তে চায় । সে বি.এ পাশ করবে । জহর মাতার উপর আর নির্ভর করে তাঁর বোঝা বাড়াতে চায় না । তাই জহর চাকরী করবে । করলও তাই । জহর দারোগা হলো । সে নবাবগঞ্জেই দারোগা হয়ে এল । তখন স্বদেশী যুগ । ষষ্ঠীচরণ স্বদেশী যুগে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আন্দোলনে । স্বদেশীদের উপর জহর শুরু করল অত্যাচার । তার বাল্য সখা ও ভাতৃ প্রতিম ষষ্ঠীচরণও রেহাই পেল না তার অত্যাচার থেকে । ষষ্ঠীচরণ তখন স্কুলের শিক্ষক । ছাত্র সহ ষষ্ঠীচরণকে সে গ্রেপ্তার করলো ।

গ্রেপ্তার হওয়া অবস্থায় মা দয়াঠাকুরাণী এলেন পুত্রকে দেখতে । ষষ্ঠীচরণ জহরের বিরুদ্ধে মার কাছে নালিশ করলো ।

মা বললেন , " বাবা, জহর তোর অবোধ ছোট ভাই । তার প্রতি রুষ্ট হোসনে । সে আমাদের ছেড়েছে বলে আমরা তাকে ছাড়তে পারি না । তুই আপন কর্ত্তব্য করেছিস , ফলের ভার ভগবানের ওপর । যে পবিত্র বন্দেমাতরম নাম গ্রহণ করে তুই সেবা ব্রত গ্রহণ করেছিস তাতে নির্যাতন - ক্লেশ সহ্য করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে । তুই যদি হাসিমুখে সহ্য করতে পারিস , আমি আপনাকে ধন্য মনে করব । আর এক কাজ তোকে করতে হবে , জহরকে বাঁচিয়ে তোর আত্ম সমর্পন করতে হবে । "

মায়েরকথা মতো ষষ্ঠীচরণ আত্ম সমর্পন করে ছাত্র সহ কারাবাস বরণ করলো ।

এ ঘটনার পর জহর মার সাথে মিলিত হলো । নিজের ভুল স্বীকার করে পুলিশের চাকরী ছেড়ে দিল । ফিরে এল মার কাছে । তথা স্বদেশী আন্দোলনের ব্রতে ।

* * * *

চতুর্থ অধ্যায়

স্বদেশী যুগের ছোট গল্প

তথ্যপঞ্জী

১ । সাহিত্যে ছোটগল্প , প্রবন্ধ , সমন্বয় , শারদ সংখ্যা ১৯৮৭ , পৃ : ৩০

২ । সমন্বয়, শারদ সংখ্যা, ১৯৮৭, সাহিত্যে সময় পর্যায় - ছোটগল্প পৃ ৩৭

৩ । Speeches of Surendra Nath Banerjee (1908) Vol VI
Page 397-98

৪ । বিনয় সরকারের বৈঠকে , পৃ :

৫ । বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস , সুকুমার সেন , ৪র্থ খণ্ড , পৃ : ৩৮

৬ । প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় গল্পসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড পৃ, ২৯০

৭ । প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প সংগ্রহ , কলকাতা , ১৯৯২ , প্রথম খণ্ড ,
পৃ : ২৯০

৮ । পূর্বোক্ত , পৃ : ২৯০

৯ । প্রভাত কুমার : জীবন ও সাহিত্য : ডঃ শিবেশ কুমার চট্টোপাধ্যায় , কলকাতা ,
৭৩ , পৃ : ৩৪

১০ । প্রভাত কুমার গল্প সংগ্রহ (২য়) , পৃ : ২

১১ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৪

১২ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৬

১৩ । History of Freedom Movement Vol II P-117.

১৪ । প্রভাত কুমার গল্প সংগ্রহ , পৃ : ৮

১৫ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৬

১৬ । ঐ পৃ : ১৬

১৭ । ঐ পৃ : ১৩

১৮ । পূর্বোক্ত প্রথম খন্ড , পৃ : ২২১

১৯ । পূর্বোক্ত ২য় খন্ড , পৃ : ১৮

২০ । পূর্বোক্ত ২য় খন্ড , পৃ : ১৮ - ১৯

২১ । পূর্বোক্ত পৃ : ১৯ - ২০

২২ । পূর্বোক্ত প্রথম খন্ড , পৃ : ৩১২

২৩ । প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য , প্রণতি নাথ , পৃ : ১২৬ - ৭

২৪ । প্রভাত কুমার গল্প সংগ্রহ , ১ম খন্ড পৃ : ৩৩৩

২৫ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৩৩৪

২৬ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৩৩৫

২৭ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৩১০

২৮ । পূর্বোক্ত , তৃতীয় খন্ড পৃ. ২১৩

২৯ । পূর্বোক্ত , তৃতীয় খন্ড , পৃ : ২৫৩ - ২৫৪

৩০ । পূর্বোক্ত , পৃ : ২৫৭

৩১ । পূর্বোক্ত , পৃ : ২৫৯

৩২ । পূর্বোক্ত , দ্বিতীয় খন্ড , পৃ : ১৬৯

৩৩ । পূর্বোক্ত , দ্বিতীয় খন্ড , পৃ : ১৭০

৩৪ । পূর্বোক্ত , ঐ পৃ : ১৭০

৩৫ । পূর্বোক্ত , ঐ পৃ : ৮৪

৩৬ । পূর্বোক্ত , ঐ পৃ : ৮৬

৩৭ । পূর্বোক্ত , ঐ পৃ : ৮৯

৩৮ । পূর্বোক্ত , ঐ পৃ :

৩৯ । পূর্বোক্ত , চতুর্থ খন্ড পৃ : ১৪৯

৪০ । পূর্বোক্ত ঐ পৃ : ১৫২

৪১ । পূর্বোক্ত পৃ : ১৫৩

৪২ । পূর্বোক্ত পৃ :

৪৩ । পূর্বোক্ত , চতুর্থ খন্ড , পৃ : ১৬৩

৪৪ । পূর্বোক্ত , ঐ পৃ : ৪৬

৪৫ । প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য , পৃ : ৮৮

৪৬ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৯২ - ৯৩

৪৭ । প্রভাত কুমার গল্প সংগ্রহ , চতুর্থ খন্ড , পৃ : ৪৬

৪৮ । দক্ষিণা রঞ্জন রচনা সংগ্রহ , ১৩৮৮ , পৃ : ' ছ ' (ভূমিকা)

৪৯ । ' ঠাকুরমার ঝুলি ' সপ্ত ত্রিংশৎ সংস্করণ পৃ : ১৫ (মিত্র , ঘোষ)

৫০ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৬৬

৫১ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৯ - ১২

৫২ । দক্ষিণা রঞ্জন রচনা সংগ্রহ , ২য় খন্ড , পৃ : ' জ ' ভূমিকা

৫৩ । ঠাকুর দাদার ঝুলি , মিত্র ঘোষ , সপ্তদশ সংস্করণ , ১৩৯৮ , পৃ : ২৭

৫৪ । দক্ষিণা রঞ্জন রচনা সংগ্রহ , ২য় খণ্ড , পৃ : ১২৯

৫৫ । পূর্বোক্ত , পৃ : ১৩২ - ১৩৪

৫৬ । পূর্বোক্ত , পৃ : ১৪৪

৫৭ । দাদা ঠাকুরের থলি , পৃ : ১৫ - ১৬

৫৮ । সুকুমার সেন , বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস , ৪র্থ খণ্ড , পৃ : ৬৩

৫৯ । ঠাকুর মার ঝুলি , ১৩১২

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা কথা সাহিত্য ও স্বদেশী আন্দোলন

উপন্যাসের পটভূমি ও স্বদেশ চেতনা

উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে নবতম চিন্তাধারার ফসল হচ্ছে উপন্যাস। প্রাচীন বা মধ্য যুগের সাহিত্যে উপন্যাসের কিছু কিছু উপাদান লুকিয়ে ছিল। তা নিয়ে উপন্যাস ধর্মী সাহিত্য রচনা হয় নি। উনবিংশ শতাব্দীতে যাঁরা বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রচনায় ব্রতী হলেন তাঁরা ইংরাজী বা বিদেশী সাহিত্য হতে ভাবনানুসারী উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। সাহিত্যে উপন্যাসের কালখন্ড ও ব্যাপ্তি বিশাল। এর সাথে জড়িয়ে আছে দেশীয় সমাজ অর্থনীতি মনস্তত্ত্বের জটিল প্রক্রিয়া। আছে আদর্শ বোধ এর সাথে সমাজ রচনার সংকল্প।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, "সর্বশ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যে উপন্যাসই সর্বাপেক্ষা গণতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত। এই গণতন্ত্রের মূলভিত্তির উপরেই ইহার প্রতিষ্ঠা। উপন্যাস যে সমাজের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে, তাহা অতীত কালের সমাজ হইতে অনেকগুলি গুরুতর বিষয়ে বিভিন্ন হওয়া চাই। .... মধ্যযুগের সামাজিক শৃংখল হইতে মানুষের মুক্তিলাভ ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের উদবোধন উপন্যাস সাহিত্যের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। .... ব্যক্তিত্ব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নতম শ্রেনীর মানুষের মনেও যে একটা আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়া উঠে ও যাহা সমাজের অন্যান্য শ্রেনীর লোক, শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, স্বীকার করিতে বাধ্য হয়, তাহাও উপন্যাসের প্রধান উপাদান। উপন্যাসের উপর গণতন্ত্রের প্রভাব এখানেও সুপরিস্ফুট।"

উনিশ শতকে মুর্শিদাবাদ তার রাজধানীর মর্যাদা হারালো। ব্যবসা বানিজ্য কলকাতায় স্থানান্তরিত হলো। শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্র রূপে গড়ে উঠল কলকাতা।

ঐতিহাসিকের ভাষায় "There was no other city of great trade in Bengal except Calcutta at the end of the Eighteenth Century". ২

মূলতঃ উপন্যাসের কর্মভূমি নাগরিক জীবন। মধ্যবিত্ত সমাজের সৃষ্টি হলো বাংলা দেশে। গড়ে উঠল নগর। গ্রাম তার মর্য্যাদা হারালো। আর এর জন্য দায়ী ছিল বিদেশী শাসন। গ্রামের সমৃদ্ধি ক্ষয় পেতে লাগল। শুকিয়ে গেল সম্পদ সৃষ্টির উৎস মুখ। ব্যবসা বানিজ্যের অগ্রগতির সাথে গড়ে উঠা মধ্যবিত্ত সমাজ সংস্কৃতি ও শিক্ষায় নিজের আধিপত্য বিস্তার করলো। "without commerce industry there can be no middle class, where you had no middle class, you had no renaissance". ৩

ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সাথে এসে ছিল মুদ্রণ যন্ত্র। প্রকাশিত হলো সংবাদ পত্র। বাংলার এই নবযুগে সৃষ্টি হলো পাঠক সমাজ। নতুন আস্বাদনের প্রতি তাদের আগ্রহ। আর এই আগ্রহের জন্য গ্রন্থাগারে নতুন বই সংযোজিত হলেই তা জানিয়ে দেওয়া হতো। পাঠকের চাহিদার সাথে অজস্র অনুবাদ সাহিত্য গড়ে উঠেছিল।

" বাংলা উপন্যাসকে যে ধারাটি সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছিল, তা হল ঐতিহাসিক রোমান্সাশ্রিত কাহিনী। এবং এই ধারাটিকে অবলম্বন করেই বাঙলা উপন্যাস আত্ম প্রকাশের ছাড়পত্র পেয়েছিল। সমাজ শিক্ষা ধর্ম নিয়ে দীর্ঘ পঞ্চাশটি বছর নানা আলোড়ন আন্দোলনের সাফল্য ব্যর্থতা, সভা সমিতি, সংবাদ পত্রের মধ্যে আত্ম বিজয়ের উল্লাস, আত্ম দমনের দীর্ঘশ্বাস, বাঙলা রস নির্ভর গদ্যের ক্রমবিকাশ — এক কথায় ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে উপন্যাসের সমস্ত প্রাথমিক শর্তই

পূরিত হয়েছিল , কিন্তু বাঙলা নাট্য শাখার তুলনায় বাঙলা উপন্যাসের আবির্ভাব বিলম্বিত । এই বিলম্বের কারণ শুধু উপন্যাস স্রষ্টার প্রতিভার দীনতাই নয় , বাঙালীর জীবনে রোমান্স প্রিয়তা ও আকস্মিকতার অভাব , জীবন বোধের অস্বাভাবিক অস্বীকৃতি , এক কথায় নবলব্ধ জীবন প্রত্যয়ের অপ্রতুলতা , বাঙলা উপন্যাসের স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যাহত করেছে । বঙ্কিম চন্দ্রের মত স্রষ্টা জীবনের এই অভাবকে ইতিহাসের দূর পটভূমিকার আশ্রয়ে পূরণ করতে চেয়েছিলেন । " ৪

বঙ্কিম পাশ্চাত্য ইতিহাস ও সাহিত্যের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও রোমান্টিক চেতনার সাথে পরিচিত ছিলেন । তাই রোমান্টিকতা প্রকৃতি প্রেমের সাথে সাথে বঙ্কিমের উপন্যাসে ছিল দেশ চেতনা । উনবিংশ শতাব্দীর শেষ যুগে দৃঢ় হয়েছে ইংরেজ শাসন । বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ হতে স্বাধীনতার ক্ষীন আকাঙ্খা জাগতে শুরু করেছে মানুষের মনে । এই দেশ ভক্তি প্রত্যয় তখন জাতি গ্রহণ করতে শুরু করেছে । বঙ্কিমের উপন্যাস তখন সেই চেতনাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল । বঙ্কিম ও সমকালীন যে সব উপন্যাসিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন তাঁদের উপন্যাসে এসেছে দেশ প্রেমের বাতাবরণ । কাহিনীর পটভূমি কখনও পাঠান-মোঘল , রাজপুত - মোঘল , মারাঠি - মোঘল সংঘর্ষের কাহিনী । এ ছাড়া আঠার ও উনিশ শতকে ব্রিটিশ শাসনের বা অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে যে বিদ্রোহ হয়েছিল তার পটভূমিকায় কিছু উপন্যাস রচিত হয়েছিল । বিদ্রোহের বিস্তার পূর্বক উপন্যাস রচিত হলেও সেখানে ইংরাজ প্রীতির সুর ছিল স্পষ্ট । এই উপন্যাস গুলিতে দেশ ভাবনার সাথে সাথে সামাজিক ও রাজনৈতিক উপাদানও মিশ্রিত ছিল ।

উনবিংশ শতকের শেষ থেকে ইংরেজ শাসনের নির্মম শোষণের রূপ যত প্রকাশিত হয়েছে , মানুষের মনে জাগ্রত হয়েছে ইংরেজের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ এবং এই পরিবেশ দেশাত্মবোধ ও স্বদেশ চেতনার জন্ম দিয়েছে । স্বাভাবিক অভিব্যক্তি রূপে এই দেশাত্মবোধের প্রকাশ দেখা দিয়েছে সাহিত্যে । তাই উনবিংশ শতকে শেষ

দু দশকে স্বদেশ ভাবনার পরিমন্ডলে রচিত হয়েছে উপন্যাস । মানুষ যতই রাজ - নীতি সচেতন হয়ে উঠেছে তখনই দেখা গেছে দেশ প্রেমের উদ্বোধন ।

বঙ্কিম চন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র (১৮৬৫) মধ্যে সেই দেশ ভাবনাকে লক্ষ্য করা গেল । বিপিন চন্দ্র পাল এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন "'দুর্গেশনন্দিনী' আমাদের স্বদেশাভিমান কে জাগিয়ে ছিল । আমাদের অন্তরের সমস্ত সহানুভূতি আমরা উজার করে দিলেম বীরেন্দ্র সিংহের উদ্দেশ্যে । " ৫ 'মৃণালিনী' তে (১৮৬৯) দেশ প্রেমের কিরণ সুন্দর ভাবে প্রতিভাত হলো । জাতীয় চেতনার নতুন ধারায় রমেশ চন্দ্র রচনা করলেন 'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৪), 'মাধবী কঙ্কন'(১৮৭৭), মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত'(১৮৭৮) ও 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' (১৮৭৯) । সমস্ত কির্দ্ধির পরিবর্তে স্বাধীনতা প্রাপ্তি যে মহান জিনিষ রমেশ চন্দ্র তাঁর উপন্যাসে একথা স্পষ্টভাবে তুলে ধরলেন । এছাড়া দামোদর মুখোপাধ্যায়ের 'প্রতাপ সিংহ' (১৮৮৪), হারাণ চন্দ্র রক্ষিতের 'বঙ্গের শেষ বীর' (১৩০৪) ও মন্ত্রের সাধন' (১৩০৫), স্বাদেশিকতার পটভূমিতে রচিত ।

সমসাময়িক বিদ্রোহাত্মক ঘটনার উপর দেশ প্রেমের ভাবনা মিশিয়ে উপন্যাস রচিত হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষে । সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিকায় বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) জাতীয় চেতনার মূলমন্ত্র রূপে পরিগণিত হলো । উত্তর বঙ্গের প্রজা বিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত হলো 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪), উপেন্দ্র চন্দ্র মিত্রের 'নানাসাহেব' (১৮৭৯), গিরিশচন্দ্র ঘোষের চন্দ্রা' (১৮৮৭), প্রসন্নময়ী দেবীর 'অশোকা' (১৮৮৯), বরদাকান্ত সেনগুপ্তের 'হেমপ্রভা' (১৮৯৪) সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত ।

উনবিংশ শতাব্দীর এই ঐতিহ্যের পথ ধরে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্র যখন বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ করল তখন উপন্যাসের ক্ষেত্রে গড়ে উঠল উদ্দেশ্যমূলক

নাট্য রচনা। স্বদেশী আন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলনের এই অভ্যুত্থান লেখকদের রচনায় ধরা দিল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। কেউ বা সমর্থক কেউ বা বিরুদ্ধবাদী। তবে এই উপন্যাসে যেমন আদর্শবাদ একদিকে প্রোজ্জ্বল রূপে পরিস্ফুট হলো তেমনটি রোমান্টিক প্রেম এই আদর্শ বোধের দ্বন্দ্বে মিশ্রিত হয়ে উপন্যাসে এক নবীন ভাবনার সৃষ্টি করল।

মনীন্দ্র নাথ বসুর 'সোফিয়া বেগম'

পৃথিবীর যে কোন দেশের গণ আন্দোলন সাহিত্যকে প্রভাবিত করে। বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও স্বাভাবিক ভাবে সাহিত্যের ক্ষেত্র আন্দোলনের ধারায় প্রভাবিত হয়েছিল। পরাধীন ভারতে উপন্যাসের বিষয়বস্তু রচনাকালে পুরনো স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনীর পটভূমিকে বিষয় বস্তু রূপে গ্রহণ করে রাজনৈতিক পরিমন্ডলে তার প্রভাব বিস্তার করা ছিল এই ধরণের উপন্যাসিকের লক্ষ্য।

বঙ্গভঙ্গ জনিত উদ্ভব পরিস্থিতিতে যখন সাহিত্যের অন্য সকল ধারা গণ আন্দোলনের ভাবনায় প্লাবিত, উপন্যাসেও এই ঢেউ এসে স্পর্শ করল। মনীন্দ্র কুমার বসু রচনা করলেন 'সোফিয়া বেগম'। সোফিয়া বেগম রাজনৈতিক পটভূমিতে লেখা উপন্যাস। প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৯ সালের ১১ই নভেম্বর। পটভূমি ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় হায়দ্রাবাদের নিজামের বিরুদ্ধে কয়েকজন ক্ষমতা লোভী ভ্রষ্ট চরিত্র ব্যক্তিদের ষড়যন্ত্রের কাহিনী দিয়ে এই উপন্যাসটা শুরু।

নিজাম হওয়ার জন্য লোভে পরে বকতিয়ার শাহ নামে নিজামের এক আত্মীয় সদাশিব রাওয়ের সাথে ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে শুরু করেন । সদাশিব হায়দ্রাবাদের ইংরেজ রেসিডেন্ট মিউরোজের মনে বিষ ঢুকিয়ে দেন নিজামের বিরুদ্ধে । ইংরেজরা বিশ্বাস করেন যে নিজাম ইংরাজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন । এমন কি নিজামের বেগমের সহচরী মেহের বান বকতিয়ারের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন প্রধানা বেগম হওয়ার লোভে ।

ফরাসী সেনাপতি কাউন্ট লালি ইংরেজদের বিরুদ্ধে নিজামকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এলে ইংরেজরা নিজামকে বন্দী করেন । লেখক মনীন্দ্র নাথ বসু মন্তব্য করেছেন যে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ নিজাম ও ঝাঁসীকে নিজের শত্রু বলে মনে করে ঠিক কাজ করেন নি । লেখক গ্রন্থে তাঁতিয়া টোপিকে সত্যকার দেশ প্রেমিক বলে বর্ণনা করেছেন । তিনি এই বিদ্রোহের ভয় দূর করার জন্য যাবতীয় প্রচেষ্টা করেছেন ।

এই উপন্যাসে একটি চিঠির মধ্য দিয়ে ইংরেজসাম্রাজ্যবাদের নগ্ন স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে । সদাশিব রাও নিজামের বিরুদ্ধে ইংরেজের কাছে অভিযোগ করেন যে নিজাম ঝাঁন্সির রাণীকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে এক পত্র লেখেন । এবং সদাশিব রাও এই পত্রটি তিনি স্যার হিউরোজের কাছে পেশ করেন । পত্রের বক্তব্য নিজামের ভাষায় , " আমাদের ভারতকে দখল করে ফিরিঙ্গিরা আমোদ আহ্লাদ করছে — আমরা কি তা বরদাস্ত করতে পারি । যখনই আমরা অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করি , তখনই আমাদের অবহেলিত অসুস্থ শরীরে দ্রুত রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে ..... আপনারা যদি ঐক্যবদ্ধ হন , — ঈশ্বরের নামে , ধর্মের নামে এগিয়ে আসুন , এগিয়ে আসুন আপনাদের নিজেদের দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে , নিজেদের মাতৃভূমির গৌরব ফিরে পাবার জন্য ও জাতীয় মহত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠায় । আপনারা অনেকের সাহায্য পাবেন । সকলের অন্তরে এখন এই স্বাধীনতা স্পৃহা জেগেছে — সময় হয়েছে এখনই । " ৬

লেখক এই চিঠির মধ্য হতে যে ভাবনা ও আহ্বান বাঁশির মানুষের জন্য করেছেন তা তদানীন্তন বাংলার প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ ইংরেজ বিরোধী গণ আন্দোলনের ঢেউ সর্বত্র লেগেছিল।

লেখক সাম্রাজ্যবাদী শাসক ডালহৌসির আমল থেকে কি ভাবে একের পর এক ভারতীয় রাজ্য গ্রাস করছে এবং কি ভাবে একের পর এক রাজ্যের রাজা ও রাজমাতা ভিখারী হয়ে যাচ্ছেন তার বিবরণ তিনি এই উপন্যাসে দিয়েছেন।

'সোফিয়া বেগম' মূল উপন্যাসটি আর পাওয়া যায় না। পুস্তক রূপে প্রকাশ হওয়ার পূর্বে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় কিছু সংখ্যায় উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। ইংরেজ সরকার এই উপন্যাস বাজেয়াপ্ত করেন। এর বাজেয়াপ্ত করার বিজ্ঞপ্তি বের হয় ২৩শে এপ্রিল, ১৯১০ এবং ১৯৮ পি। এই বইটি সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নথিতে নিম্নোক্ত মন্তব্য আছে - Manindra Nath Bose S/o. RajNarayan Bose the author of the book and it was issued out of the press on the 11th Nov. 1909 but was proscribed by Government notification dated the 23rd April1910 as being a rovolutionary book". ৭

গঙ্গাচরণ নাগ

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত এই উপন্যাস 'রাখী কঙ্কন'। এই উপন্যাসের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯০৭ সালে। দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয় ১৯০৯ সালের জুন মাসে। লেখক গঙ্গাচরণ নাগ এই উপন্যাস বরিশাল থেকেই প্রকাশ করেন। বরিশাল ছিল স্বদেশী আন্দোলনের উর্বরা তীর্থ - ভূমি। এই বরিশালের স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত হয়েছিল এই উপন্যাস।

প্রবাসীর ১৩১৪ সালের কার্তিক সংখ্যায় ' মুদ্রারাক্ষস ' নামে এক ছদ্ম নামীর সমালোচনা বের হয় এই ' রাখী কঙ্কন ' সম্পর্কে । সমালোচক বলছেন " বরিশালের প্রথম স্বদেশী ব্রত গ্রহণ উপলক্ষ্যে দৃঢ়ব্রত যুবক যুবতীদেরকে স্বদেশ দ্রোহী আত্মীয় স্বজন দ্বারাও যে কিরূপে নিগৃহীত হইতে হইয়াছিল তাহারই চিত্র এখানে অঙ্কিত হইয়াছে । "

বইটিতে আছে ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদী শোষণের তীব্ররূপ । ভারতের তদানীন্তন পরিস্থিতি বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথনের মাধ্যমে সন্নিবেশিত হয়েছে । উপন্যাসে বিভিন্ন তথ্য পরিসংখ্যান থাকলেও ঘটনার সামঞ্জস্যে একটা গতিবেগ আনার চেষ্টা উপন্যাসিকার করেছেন । উপন্যাসের অনন্দমঠের আদর্শ জনিত প্রভাব আছে ।

বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের কার্যকর হয় ৩০শে আশ্বিন , ১৩১২ বা ১৯০৫ সালে ১৬ই অক্টোবর । উপন্যাসের শুরুতেই আলোচনা হচ্ছে যদুগোপালের সাথে তাঁর কুল গুরু গনেশাচার্য্যের সাথে । যদুগোপাল এক ভন্ড দেশ প্রেমিক । রাখী বন্ধনের কার্য্য সূচীর জন্য সাদা সুতোয় হলুদ রঙ করছেন । যদু তাঁর আচার্যদেবকে জিজ্ঞেস করছেন " তবে পরাধীন জাতি বলিয়া আমাদের দুঃখের কারণ কি ?

গণেশাচার্য্য উত্তর করছেন " দুঃখের কারণ ইংরেজ জাতির স্বার্থ - স্বাতন্ত্র্য ও স্বার্থপরতা । তজ্জন্য আমরা দিনের দিন পার্থক্য - স্বাধীনতা হারাইতেছি । তাহাদের মার্জিত সুকৌশলে আমরা এমনই সহিষ্ণুতা প্রাপ্ত হইয়াছি যে , আমাদের পরম স্বার্থ আমরা রক্ষা করিতে পারিতেছিনা ।

" তোমরা যাহাকে ক্লোরোফরম বল , ডাক্তারগণও সেইরূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা কোন জীবের অর্ধাংশ কাটিয়া ফেলিলেও সে যেমন তাহা জানিতে পায় না , সেই রূপ এই যাদুকর জাতি মন্ত্রবলে আমাদিগকে এমন সংজ্ঞাহীন করিয়া ফেলিয়াছে যে

আমাদের অস্থি , মজ্জা , শোণিত পর্যন্ত পৃথক করিয়া যে বিদেশে লইয়া যাইতেছে , আমরা তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিতেছিনা ।

যদুগোপাল যখন গনেশাচার্য্য কে প্রশ্ন করেন যে , " অনেকেই বলেন ইংরেজ রাজত্বে আমরা সুখে আছি ? " এই উত্তরে গনেশাচার্য্য বলছেন , " সত্য - এ মহা নাটকের পথম অঙ্কেই চিত্তাকর্ষকভাবে চিত্রিত হইয়াছে যে , দেশের প্রায় পনের আনা পরিমাণ লোকই তাহাতে মোহিত হইয়া পড়িয়াছেন । সুতরাং ' সুখে আছি ' এ কথা সত্য । কিন্তু পরিণাম দর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তি দিব্য চক্ষে দেখিতেছেন যে নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে ' মহা দুঃখ ' । যবনিকায় ভারতবাসী নীল তরঙ্গায়িত মহাসমুদ্রে কেবল ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে । তৃতীয় অঙ্কে ' ভীষণ দুর্ভিক্ষ ' — যবনিকা ঘোর অন্ধকার — মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের রেখা । তদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে যে কঙ্কাল বিশিষ্ট বঙ্গবাসী পেটে হাত দিয়া রাশি রাশি পড়িয়া আছে । যাহারা অপেক্ষাকৃত সবলকায় তাহাদের মধ্যে আহার্য - মরা মূষিক - মরা শৃগাল লইয়া বিরোধ চলিতেছে । অন্যত্র বিরলে বসিয়া কেহ তীক্ষ্ণ দশনে শিশু সন্তানের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া মাংস উৎপাটন করিতেছে — আর খাইতেছে । একদল কঙ্কাল উহা দেখিতে পাইয়া লম্ফে ঝম্পে তদাভিমুখে চলিতেছে । চতুর্থ অঙ্কে ' মহামারী ' — চিত্রপট মধ্যস্থ রাক্ষসী মূর্তি বড়ই ভীষণ দর্শনা । ..... রাক্ষসী , কবলিত নরদেহ সকল বাম পার্শ্বে উদগীরণ করিতেছে । উদগীরিত দেহ সমস্তই শবাকার । ....

এখনও কিঞ্চিৎ সময় আছে । যদি সাবধান না হও তবে এই বিশাল ভারত - ভূমি এক শতাব্দীর মধ্যেই যে একটি বিশাল শ্মশানে পরিণত হইবে তৎপক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই । "

গঙ্গাচরণ নাগ এই উপন্যাসে কিছু তথ্য দিয়েছেন কথোপকথনের মাধ্যমে , " আমার বলিতে দ্বিধা নেই যে আমাদের অর্দ্ধেক কৃষকই বছরের পর বছর কী করে

পেট ভরাবে তাই জানে না ।" লেখক এই প্রসঙ্গে ১৮৯৩ সালের মে মাসে এলাহাবাদের 'পাইওনিয়রে' যা লেখা হয়েছিল তার উদ্ধৃতি দেন । লেখক বলছেন যে "ব্রিটিশ ভারতের প্রায় ১০ কোটি লোক চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছেন । ঐ পাইওনীয়রে আর বলা হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ২৫ বছরে দুর্ভিক্ষের ইতিহাস আরও মর্মান্তিক , এই ২৫ বছরে আমাদের দেশ ১৮ বার বন্যার কবলে পড়ে , ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে ২ কোটি ৬০ লক্ষ লোক প্রাণ হারায় ।"

লেখক আরও বলেছেন যে খাদ্য ও সম্পদের অভাবে কী করে ভারতীয়দের আয়ু ক্রমশ কমে যাচ্ছে । ১৮৯১ সালের লোক গণনায় দেখা যাচ্ছে যে লোক সংখ্যা কমেছে ৬০ , ৭৩৭ জন । এবং ১৯০১ - ৪ সালে কলেরা ম্যালেরিয়ায় মারা গেছে ২ , ৫৭ , ৯৯ জন । নদীয়া জেলা চিত্র একরূপ । নাটোরে ১৮৯১ থেকে ১৯০১ সালের মধ্যে লোক সংখ্যা কমেছে ২২ , ০০৬ জন । মালদা , খুলনা , ফরিদপুর , বরিশাল জেলাতেও জন্মহারের তুলনায় মৃত্যুর হার বেড়েছে ।

১৯০১ সালের লোক গণনা অনুসারে ১০ বছরে ভারতে হিন্দুর সংখ্যা ২কোটি বেশী কমেছে ।

লেখক বলছেন যে বিদেশী পণ্যের বিনিময়ে আমাদের সম্পদ বিদেশে চলে যাচ্ছে । আমাদের ভেতর কোন সারবস্তু থাকলে আমাদের ব্যবসা বানিজ্য আমাদের হাতেই থাকতো । আমরা কুম্ভকারের হাতের মাটির পুতুলের মতই এমন ভাবে পরিচালিত হচ্ছি যে , এই পদাঘাতের পর বেতন হিসাবে যাই দেওয়া হোক না কেন , অদ্ভুত কৌশলে পরক্ষণেই তা আবার ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে । সমস্যার সমাধান হচ্ছে দৈনিক প্রয়োজনে বিদেশী পণ্যের বয়কট করা ।

লেখক গঙ্গাচরণ লিখছেন , ব্যবসা বিস্তারের জন্য ইংরেজরা (ইস্ট ইন্ডিয়া কোং) ভারতে চরম উৎপীড়ন চালিয়েছে । তিনি এই বক্তব্যের সমর্থনে তিনি

বাংলার তৃতীয় গভর্নর মিঃ ভারলেস্ট ক্লার্টিয়ার এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন –

" শুল্ক না নিয়েই ব্যবসা চালানো হয়েছে । এর ফলে সীমাহীন উৎপীড়ন করা হয়েছে । ইংরেজের এজেন্ট বা গোমস্তারা জনগণকে উৎপীড়ন করেই সন্তুষ্ট হত না । সরকারের অধিকার পদদলিত করতো এবং বাধা পেলে নবাবের কর্মচারী - দের শাস্তি দিত । মীর কাসিমের সঙ্গে যুদ্ধ এটাই কারণ । " ৮

এই উপন্যাসে রাখী বন্ধনের অনুষ্ঠান ব্রত পালনে তাৎপর্য্য বিশ্লেষিত হয়েছে । লেখক বলছেন যে এটা একটা সাধারণ সূতা হলেও এটিই বাঙালীদের রক্ষা কবচ এবং কয়েকটি শপথ থেকেই এর সৃষ্টি । এই রাখী বাঁধার ফলের সঙ্গে পশ্চিমী দেশ গুলির লাভ লোকসান জড়িয়ে আছে । তাদের ব্যবসার পক্ষে প্রতিকূল কোন কাজে তারা শুধু অসন্তুষ্টই হবে না সর্বশক্তি দিয়ে তারা তাতে বাধা দেবে । "

' জোলার ' তৈরী এক জোড়া ধুতি পরলেই রাখীর উদ্দেশ্য সফল হবে না । এর গভীরে মহৎ উদ্দেশ্য আছে । ৪০ কোটি মানুষের চোখের জলে বঙ্গভঙ্গের শিলান্যাস করে ঈশ্বর ভারতের জাতীয় নব জাগরণের সিঁড়ির প্রথম ধাপ তৈরী করেছেন , ধর্ম এর অবলম্বন , সত্য এর ভিত্তি এবং রাখী এই সবকে ঐক্যবদ্ধ করেছে । "

হিন্দু মুসলিম দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রকে ভালভাবে অনুধাবনের জন্য তিনি এক মুসলিম স্বদেশী যুবকের মুখ দিয়ে প্রকাশ করিয়েছেন , " তুমি হিন্দুদের বিরুদ্ধে , তুমি ভালমন্দ বিচার শক্তি হারিয়েছ । তুমি ভেবেছ সরকারের পক্ষে গিয়ে , তুমি হিন্দুদের তুলনায় উচ্চতর পদে আসীন হবে , কিন্তু সে গুড়ে বালি । অসমের হাতে ইংরেজরা কোন কাজের দায়িত্ব দেবে না । মুসলিমদের পক্ষে দক্ষ লোক খুবই

ক্রম । হিন্দু বিরোধী মনোভাবের দরুণ রাজনীতি থেকে দূরে থাকাই এই অধঃপতনের কারণ । এমন কি লেখক আমীর আলীর উক্তি দিয়ে মন্তব্য করেছেন ," মুসলমানরা এ পর্যন্ত রাজনৈতিক আলোচনা থেকে দূরে থাকায় তাদের ক্ষতিই হয়েছে । " ৯

ব্রিটিশ শাসনের পশ্চাতে যে নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ছিল লেখক উপন্যাসের কাহিনীর আড়ালে তাকে স্পষ্টরূপে প্রকাশ করেছেন । এই উপন্যাসের একজন সমালোচক বলছেন , " লেখক ইংরেজ শাসনের বহুল প্রচারিত চাকচিক্যের আড়ালে বাংলা তথা ভারতবর্ষকে কি ভাবে শোষণ করা হয়েছে এবং তার ফলে স্বদেশী বানিজ্যের ক্রমাবনতি, একটানা দুর্ভিক্ষ মহামারী ও লোকক্ষয় প্রভৃতি সর্বনাশা পরিণতির দিকে এ দেশের লোকেরা কি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে এই সব কথাই যুক্তি সহ বর্ণনা করেছেন । লেখকের রচনায় সংখ্যা তত্ত্বের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় । তাঁর মতে এই সর্বনাশের পরিণতি এড়াতে হলে দেশবাসীকে ব্যাপকভাবে ব্রিটিশ পন্য বয়কট করতে হবে । লেখক রাখী কঙ্কন উৎসবের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন যে দেশবাসীকে লাঞ্ছনা সহ্য করেও স্বদেশী শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে । স্বদেশী আন্দোলনে মুসলমান সমাজের বিরোধীতা ও নিরপেক্ষ থাকার মনোভাবেরও তিনি সমালোচনা করেন । প্রাজ্ঞ মুসলমান লেখক আমির আলির বক্তব্য উদ্ধৃত করে তিনি বলেন যে , " রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরত্ব বজায় রাখলেই মুসলমান জনসাধারণের মনস্কামনা পূর্ণ হবে না । সমাজে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তাদেরও হিন্দুদের সঙ্গেই হাত মিলিয়ে আন্দোলনে নামতে হবে , কেন না চতুর ইংরাজ প্রয়োজন বোধে তাদেরও অবহেলা করতে পশ্চাৎপদ হবে না । " ১০

' রাখী কঙ্কন ' উপন্যাসটি সরকারের বিষ নজরে পড়ে । বইটির প্রথম প্রকাশ ১৯০৭ এর ৩০শে জুন , ছাপানো হয়েছিল ১০০০ কপি । এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯০৯ এর ২৪ এ জুন । ১৯১০ সালে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে এই উপন্যাস নিষিদ্ধ হয় ।

রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর

বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলনের সাথে রবীন্দ্র নাথ একাত্ম ভাবে যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্র নাথ বঙ্গভঙ্গের যে বেদনা ও গ্লানি অনুভব করেছিলেন অন্তরে তারই প্রভাব পড়েছিল তাঁর কর্ম ভাবনায় ও চিন্তার ফসল তাঁর সাহিত্য কর্মে। স্বদেশী আন্দোলন ছিল নিপীড়িত জাতির ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ। রবীন্দ্র নাথ ছিলেন সেই প্রতিবাদী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। একদিকে দেশকে ভালবাসার বানী শোনালেন অন্যদিকে সেই বানীকে কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে রূপ দিলেন। প্রফুল্ল কুমার সরকার মন্তব্য করেছেন, " ১৯০০ - ১৯০৫ এই পাঁচ বৎসর বাংলার জাতীয় জীবনে মহা সন্ধিক্ষণ। এই পাঁচ বৎসরে বাংলাদেশ এক শতাব্দীর পথ অতিক্রম করিয়াছিল। রবীন্দ্র নাথ এই ' স্বদেশী যুগের উষায় ' জাতির ভাব ও চিন্তার পরিচালনার কার্য্যে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া তাহাকে বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। " ১১

বাঙালীর ঐক্যকে দৃঢ়তর বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি রাখী বন্ধনের প্রচলন করলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র নাথ বঙ্গদর্শনের নবপর্য্যায়ে লিখলেন, "আগামী ৩০শে আশ্বিন (১৩১২) বাংলা দেশ আইনের দ্বারা বিভক্ত হইবে। কিন্তু ঈশ্বর যে বাঙালীকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই তাহাই বিশেষ রূপে স্মরণ ও প্রচার করিবার জন্য সেই দিনকে আমরা বাঙালীর রাখী বন্ধনের দিন করিয়া পরস্পরের হাতে হরিদ্রা বর্ণের সূত্র বাঁধিয়া দিব। রাখী বন্ধনের মন্ত্রটি এই — ' ভাই ভাই এক ঠাঁই। "

স্বদেশী আন্দোলন তীব্রতর হলে এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে চরম পন্থী ও নরম পন্থী বা মডারেট মতবাদের ভিন্নতা দেখা দেয়। প্রাচীন পন্থীদের বা নরম পন্থীদের নেতা ছিলেন সুরেন্দ্র নাথ, চরম পন্থী দলের নেতা ছিলেন বিপিন চন্দ্র পাল। রবীন্দ্র নাথ এই দ্বন্দ্বকে প্রশমিত করার জন্য ' দেশনায়ক ' (বঙ্গদর্শন, ১৩১৩ জ্যৈষ্ঠ) প্রবন্ধে উত্তেজনা ও দলগত অভিমান বিসর্জন দিয়ে প্রত্যেক দেশ -

বাসীকে দেশের বৃহত্তর মঙ্গল সাধনের জন্য আপন কর্তব্য ও লক্ষ্যপথে অবিচল থাকার আহ্বান জানান। এ ছাড়া তিনি বয়কট আন্দোলনকে একটা বাহ্যিক আন্দোলন হিসেবে না দেখে তার মাধ্যমে পল্লী সংগঠন, দেশের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি মূলক স্বাদেশিকতার বৃহৎ ও সামগ্রিক আদর্শ রূপে গ্রহণ করার নির্দেশ দেন। রবীন্দ্র নাথ বলছেন, " দেশের হিত সাধন একটা বৃহৎ মঙ্গলের ব্যাপার, নিজের প্রবৃত্তির উপস্থিত চরিতার্থ সাধন তাহার কাছে নিতান্তই তুচ্ছ। যদি এই বৃহৎ লক্ষ্য টাকে আমাদের হৃদয়ের সম্মুখে যথার্থভাবে ধরিয়া রাখিতে পারি, তবে ক্ষণিক উত্তেজনা ক্ষুদ্র অন্তর্দাহ আমাদিগকে পথ ভ্রষ্ট করিতে পারে না। " ১২

ডন সোসাইটির সভাতে তিনি বলছেন, " এখন আমাদের ছোট ছোট জায়গায় organisation তৈরী করা উচিৎ। ..... আমাদিগকে এখন পল্লীর Patriotism জাগাইয়া তুলিতে হইবে। আমরা যদি পল্লীর সকল অভাব মোচনের ভার নিজেরা গ্রহণ করি, তাহা হইলে পল্লীকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিতে পারি। ..... আত্ম শক্তি চালনা করিয়া কর্তৃত্বের প্রকৃত অধিকারী হওয়ার জন্য এইরূপ পল্লী সমিতিতে আমাদের এখন হাতে খড়ি করিতে হইবে। " ১৩

রবীন্দ্র নাথ এই স্বদেশী যুগে তাঁর মানসিক প্রকাশ করেছেন গানে, কবিতায়, কাব্যে, নাটকে, প্রবন্ধে। স্বদেশী আন্দোলনের গতিপথ পরিবর্তনের ঝোঁক দেখা দিল আন্দোলন কারীদের মধ্যে। যে স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃত্ব রবীন্দ্র নাথ গ্রহণ করেছিলেন তা হতে তিনি একদিন সরে দাঁড়ালেন। স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মত পার্থক্য দেখা দিল। স্বদেশী আন্দোলনের এক স্বাভিমানী লক্ষ্য ছিল কংগ্রেসের রাজনৈতিক ভিক্ষা বৃত্তির পথকে অস্বীকার করা। আত্ম শক্তির উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। তারই ফল স্বরূপ গড়ে উঠার প্রচেষ্টা চলেছিল স্বদেশী শিল্প, স্বদেশী শিক্ষা, স্বদেশী মূল্যবোধ, স্বয়ং নির্ভর গ্রাম্য ব্যবস্থা। রবীন্দ্র নাথ স্বদেশী আন্দোলনের সাথে একাত্ম ভূত হয়েছিলেন এই সূত্রের সাথে আত্মিক যোগ ধরেই।

তাঁর ' স্বদেশী সমাজ ' প্রবন্ধে (১৯০৩) সেই মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন । প্রমাণ ছিল তার ' আত্ম শক্তির ' প্রত্যয়ে । স্বদেশী আন্দোলনের এই ধারার পাশা - পাশি আরেক মতবাদ পথ করে নিয়েছিল - যা ছিল রাজনৈতিক চরম পন্থা , পরবর্তীতে তা রূপান্তরিত হয়েছিল বিপ্লবী পন্থায় , ইংরেজদের ভাষায় সন্ত্রাসবাদ । রাজনৈতিক চরম পন্থা ছিল বিপিন চন্দ্রের । বিপ্লবী পন্থা ছিল অরবিন্দ , ব্রহ্ম - বান্ধবের মতে প্রশস্ত পথ । এবং এঁরা তার নেতৃত্বও দিয়েছিলেন । তাঁদের নেতৃত্বে গড়ে উঠল বৃটিশের দ্রব্য , আইন , শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বর্জন ও বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ রূপে । ১৯০২ সাল হতেই বিপ্লবীদের সমিতি গড়ে উঠে । যেখানে নৈতিক , দৈহিক ও স্বদেশ ভাবনার অনুশীলন হতো । তার সাথে চলত দেশের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের পথ বেছে নেওয়া । বৈদেশিক শক্তির কাছে অস্ত্র সাহায্য নিয়ে সেই পরিকল্পনা অনুসারে দেশকে স্বাধীন করার সংকল্প এঁদের কর্মভাবনায় ছিল । বৃটিশ শাসকদের সন্ত্রস্ত করে তোলা ছিল এঁদের স্বাভাবিক কর্মসূচী ।

রবীন্দ্র নাথের মানসিক ভাবনা এই সব কর্মসূচীতে আহত হলো । ' পথ ও পাথেয় ' প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন , জ্যেষ্ঠ , ১৩১৫) কবি ইংরাজের শাসন নীতিকে ধর্মহীনতা ও সন্ত্রসবাদীদের গুপ্ত পন্থাকে তীব্রভাবে সমালোচনা করলেন । ভারতের মুক্তি আন্দোলন ইউরোপের মানবতা বর্জিত রাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে চলতে পারে না । ভারতের রাষ্ট্রিক প্রচেষ্টা জাতীয় আন্দোলন ন্যায় নীতি , ধর্মবুদ্ধি ও গঠন - মূলক কর্মপদ্ধতির ভিত্তি করে এম পরিণতি লাভ করবে । 'সদুপায়' প্রবন্ধে (প্রবাসী , শ্রাবণ , ১৩১৫) রবীন্দ্র নাথ তাঁর অনুভবের কথা বললেন , " একটি কথা আমাদের কখনও ভুলিলে চলিবে না যে অন্যায়ের দ্বারা, অবৈধ উপায়ের দ্বারা , কার্যোদ্ধারের নীতি অবলম্বন করিলে কাজ আমরা অল্পই পাই , অথচ তাহাতে করিয়া সমস্ত দেশের বিচার বুদ্ধি বিকৃত হইয়া যায় । অদ্য বার বার দেশকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে অধ্যবসায়ই শক্তি এবং অধৈর্য্যই দুর্বলতা , প্রশস্ত ধর্মের পথে চলাই নিজের শক্তির প্রতি সম্মান , এবং উৎপাতের সংকীর্ণ পথ সন্ধান করাই

কাপুরুষতা , তাহাই মানব শক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা , মানুষের মনুষ্য ধর্মের প্রতি অবিশ্বাস । 'দেশহিত' (প্রবন্ধ , বঙ্গদর্শন , আশ্বিন , ১৩১৫) সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে লিখলেন , " আজ দস্যুবৃত্তি , তস্করতা , অন্যায় পীড়ন , দেশহিতের নাম ধরিয়া চারিদিকে সঞ্চরণ করিতেছি , অথচ এক মুহূর্তের জন্য তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন , যাঁহারা জানেন আত্মহিত , দেশ হিত , লোক হিত যে কোন হিত সাধনই লক্ষ্য হউক না কেন কেবল মাত্র যাহারা বীর ত্যাগী ও তপস্বী তাহারাই যথার্থ সাধক । "

রবীন্দ্র নাথের সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে উদ্ভূত এই ধারণারই কর্ষন ভূমিতে জাত হলো এক উপন্যাসীয় ফসল যার নাম ' ঘরে বাইরে ' (১৯১৫) " রবীন্দ্র নাথ যখন ' ঘরে বাইরে ' লেখেন তখন নিঃসন্দেহে তিনি নতুন ধরণের উপন্যাস সৃষ্টি করলেন । সেই নতুনত্ব ভাষার নতুনত্ব মাত্র নয় , কাহিনীর বর্ণনায় নতুনত্ব নয় , বিষয় বস্তুর নতুনত্ব । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা এই উপন্যাস । আমরা যাকে সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস রূপে চিহ্নিত করতে অভ্যস্ত ছিলাম তার থেকে অনেকাংশেই পৃথক । একে আমরা ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে পারতাম না । প্রচলিত ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাস সুদূর , অন্তত একশ - দেড়শ বছর আগের ঘটনা । ' ঘরে বাইরে ' র ইতিহাস নিকট ইতিহাস , দশ এগারো বছর আগেকার বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন , মাত্র সাত আট বছর আগে ক্ষুদিরামের কথা লোকে শুনেছে , শুনেছে স্বদেশী ডাকাতির কথা । ' ঘরে বাইরে ' র পটভূমি নিকট অতীত , এতই নিকট যে তাকে সমকাল বললে অন্যায় হবে না । " ১৪

' ঘরে বাইরে ' সম্পর্কে শিশির দাস মন্তব্য করছেন " বঙ্গভঙ্গ থেকে গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মধ্যবর্তী কালে ভারতীয় মনে রাজনৈতিক আন্দোলনের নতুন প্রস্তুতি চলছিল । বাংলা দেশে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কার্যকলাপ জনচিত্তে আশা - আকাংখা দুই - ই জাগিয়ে তুলছে । বাংলা দেশের বাইরেও মহারাষ্ট্রে এবং পাঞ্জাবে

সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ ছড়াচ্ছে , কংগ্রেসী আন্দোলনের রীতি নীতি নিয়ে বুদ্ধি - জীবী মহলে নানা প্রশ্ন উঠছে । রবীন্দ্র চৈতন্যে এই কালের রাজনীতির ধাক্কায় একটিই মূল্যবান নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে — রবীন্দ্র নাথের ' ঘরে বাইরে ' । 'আনন্দ - মঠে' র মতো ঐতিহাসিক কাহিনীর কাঠামো নয় , ' পর পুরমে 'র মতো (বৃটিশ বিরোধী মালয়ালম উপন্যাস , ১৯০৭ , লেখক কে. নারায়ণ কুরুক্কল) রূপক নির্ভর নয় , সম কালের একটি আন্দোলন এই উপন্যাসের কেন্দ্রে । যে আন্দোলন ভারতবর্ষে নানা অঞ্চলে রাজনৈতিক চেতনাকে সংহত করেছে , এবং যে আন্দোলনের সমন্ধে লেখকের একটি স্পষ্ট বক্তব্য আছে , এমন একটি আন্দোলন রূপ পেল ঘরে বাইরে উপন্যাসে । " ১৩

রবীন্দ্র নাথ তাঁর ' ঘরে বাইরে ' তে স্বদেশী আন্দোলনের গভীরতম অন্ত - নিহিত প্রেক্ষাপটের অপূর্ব অথচ স্পষ্ট ছবি এঁকেছেন । এই আন্দোলনের দুটি ধারার — বয়কট ও সন্ত্রাসবাদী বা বিপ্লবী — প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত অনীহা প্রকাশ করেছেন । সন্ত্রাসবাদী বা বিপ্লবীদের ব্যক্তিগত ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গকে রবীন্দ্র নাথ কোন দিনই সম্মান দিতে কুন্ঠিত হন নি । কিন্তু তাদের আদর্শের কর্মপথকে তিনি কখনও স্বীকার করেন নি । বিমলার কথায় " অমূল্যের সেই আত্মোৎসর্গের দীপ্তিতে সুন্দর বালকের মুখখানি যে কিছুতে ভুলতে পারছিনে । " — এ যেন বিপ্লবীদের পথ বিরোধী রবীন্দ্র নাথের উক্তি ।

' ঘরে বাইরে ' দুই প্রধান পুরুষ চরিত্র । দুটিই দুটো পরস্পর বিরোধী চিন্তা ধারার প্রতীক । সন্দীপ আর নিখিলেশ । নিখিলেশের চরিত্রের দুর্বোধ্য অংশ ও আদর্শবাদের অবিশ্বাস্য প্রেরণার উৎস বোঝাবার জন্যই বোধহয় মাস্টার মশায়ের চরিত্রের সৃষ্টি । নিখিলেশ ঘরবাসী প্রনয়ী । খানিকটা নিষ্ক্রিয় জীবনের বহু ঝঞ্ঝাটে ' আমার পথ আর সরল নেই ' এ হচ্ছে নিখিলেশ । আর সন্দীপের আছে উদ্যম , কর্মে স্পৃহা এবং জীবন যেন তার বেগবান জীবন্ত । সন্দীপের এই

আবেগ জনিত উচ্ছ্বাস রবীন্দ্র নাথ প্রত্যক্ষ করেছেন স্বদেশী যুগে । স্বদেশী যুগে উদ্দীপনাকে যখন উম্মাদনা গ্রাস করে নিল , যুক্তি ও বিশ্বাসের পরিধি যখন অন্ধ আবেগ তাড়িত সীমা রেখায় বাঁধা পড়ল তখনই ঘটল পদস্খলন, হলো চরিত্র ভ্রষ্ট । তখন রবীন্দ্র নাথ সন্দীপদের চরিত্রে লোভ রিপুর প্রকাশ দেখেছেন ।

নিখিলেশের গৌরবময় সংসারে স্বদেশীর ঢেউ কি ভাবে প্রবেশ করল তারই পটভূমি হচ্ছে এই উপন্যাস । নির্লিপ্ত নিখিলেশের বিশাল প্রাসাদে সন্দীপ রূপ স্বদেশী ঢেউ এর প্রবেশ । সন্দিপের বিমলা কে নিয়ে ভাবনা — " যে ছিল ঘরের প্রদীপ তাকে দেওয়ালির উৎসবে বাইরে টেনে আনার উদ্যোগ করতে শুরু করল " । আর বিমলা অভিভূত । নিখিলেশ অনুভব করছিল , " বাংলার সমস্ত উদাস মাঠ বাট জুড়ে গোরুটার মতো চোখ বুজে পড়ে আছে — কিন্তু আরামের নয় , ক্লান্তিতে, ব্যাধিতে , উপবাসে । "

কিন্তু বিমলার জীবনে সেদিনের উদ্দীপনাময় স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে অগ্নি জ্বালার সৃষ্টি হয়েছিল এবং যে কোন অন্তপুর বাসিনী নারী এই উদ্দীপনার প্রতি মমত্ব পূর্ণ আবেগ দেখিয়েছিল বিমলার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি । সন্দীপের স্বদেশী ঢেউ এ সেও মোহিত । বিমলার কথায় " সেই সময়ে হঠাৎ সমস্ত বাংলা দেশের চিত্ত যে কেমন হয়ে গেল তা বলতে পারিনে । ষাট হাজার সগর সন্তানের ছাইয়ের পরে এক মুহূর্তে যেন ভাগীরথীর জল এসে স্পর্শ করবে । কত যুগ - যুগান্তরের ছাই , রসাতলে পড়েছিল — কোনো আগুনের তাপ জ্বলে না , কোনো রসের মিশালে দানা বাঁধে না , সেই ছাই হঠাৎ একেবারে কথা কয়ে উঠল , বলল এই যে আমি । " বিমলা নিজেই নিখিলেশের অভিব্যক্তির প্রতিক্রিয়াকে প্রকাশ করছে " মনে আছে সন্দীপের সঙ্গে তর্কে তিনি একদিন বলেছিলেন , সৌভাগ্য হঠাৎ এসে আমাদের দরজার কাছে হাঁক দিয়ে যায় । কেবল দেখবার জন্য যে তাকে গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের নেই তাকে ঘরের মধ্যে নিমন্ত্রণ করে বসাবার কোনো আয়োজন

আমরা করিনে।"

স্বদেশী বা বয়কট ভিতরের জড়ত্ব ঘোচানোর বা সুপ্ত চৈতন্যের যে জাগরণে সহায়তা করেছিল সেই জাগরণকে বাহিরের কাজে ব্যয়িত না করে ব্যবহার করা হোক আমাদেরই অভ্যন্তরের দীনতা হীনতা আর অন্ধকার দূরীকরণের কাজে — বোধহয় রবীন্দ্র নাথ নিখিলেশের মুখ দিয়ে নিজ বক্তব্য এই ভাবেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

নিখিলেশের ভাবনা আবেগ মথিত পরিবেশে গা ভাসাতে পারেনি। উচ্ছ্বাস বা উত্তেজনায় স্বদেশকে খোঁজা যায় না। চৈতন্যের দীপ্ত প্রভাবে স্বদেশ এসে ধরা দেয় হৃদয়ে। মাস্টার মশায়ের উক্তিতেও এই ভাবনা ধরা পড়েছে, " দেশ বলতে মাটি তো নয় এই সমস্তই মানুষই তো। তা তোমরা কোনদিন একবার চোখের কোণে এদের দিকে তাকিয়ে দেখেছ? আর আজ হঠাৎ মাঝখানে পড়ে এরা কি নুন খাবে আর কি কাপড় পড়বে তাই নিয়ে অত্যাচার করতে এসেছ, এরা সইবে কেন, আর এদের সইতে দেব কেন? .... আমি বুড়ো মানুষ, নেতা বলে তোমাদের নমস্কার করে পিছনে পিছনে চলতে রাজি আছি। কিন্তু ঐ গরীবদের স্বাধীনতা দলন করে তোমরা যখন স্বাধীনতার জয় পতাকা আস্ফালন করে বেড়াবে তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াব, তাতে যদি মরতে হয় সেও স্বীকার।"

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে দেশাত্মবোধের উম্মাদনা জাগ্রত হয়েছিল নিখিলেশ তা হতে বিচ্ছিন্ন। নিখিলেশের ভাষায়, " ..... ভারতবর্ষ কেবল ভদ্রলোকেরই ভারতবর্ষ নয়। আমি স্পষ্টই জানি যে, আমার নীচ লোক যত নাবছে ভারতবর্ষই নাবছে। তারা যত মরছে ভারতবর্ষই মরছে।" আর সন্দীপ বড় সুচতুর রাজ-নীতিবিদ। তার বক্তব্য " লোকের ভিরই আমার যুদ্ধের ঘোড়া। আমার আসন তার পিঠের উপরে, তার রাশ আমার হাতে। তার লক্ষ্য সে জানে না, শুধু আমিই জানি।"

রবীন্দ্র নাথ ' ঘরে বাইরে ' কে প্রত্যক্ষ করেছেন নিজের জীবনের বাস্তব অনুভূতি দিয়ে । রবীন্দ্র নাথ নিজেই এই প্রসঙ্গে বলছেন , " ঘরে বাইরে গল্প যখন লেখা যাচ্ছে তখন তার সঙ্গে সঙ্গে লেখকের সাময়িক অভিজ্ঞতা জড়িত হয়ে পড়েছে এবং লেখকের ভালো মন্দ লাগাটাও বোনা হয়ে যাচ্ছে । "

" নারী গৃহ লক্ষ্মী । স্নেহ - প্রেমের বন্ধনে বাঁধা পড়া রয়েছে তার প্রকৃতির মধ্যে । লিপিকার ' বানী ' তে তাই কবি বলেছেন ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি হয়ে আকাশের মেঘ নামে , মাটির কাছে ধরা দেবে বলে । তেমনি কোথা থেকে মেয়েরা আসে পৃথিবীতে বাঁধা পড়তে ।

" তাদের জন্য অল্প জায়গার জগৎ , অল্প মানুষের । ঐ টুকুর মধ্যে আপনার সবটাকে ধরানো চাই — আপনার সব কথা , সব ব্যথা , সব ভাবনা । তাই তাদের মাথায় কাপড় , হাতে কাঁকন , আঙিনায় বেড়া । মেয়েরা হলো সীমা স্বর্গের ইন্দ্রাণী । এই কারণেই স্নেহ ভালবাসা উপেক্ষা করে , গৃহের বন্ধন ছিন্ন করে নারী যখন বাইরের জগতে বেরিয়ে আসে তখন নারীর পক্ষে যে তার পরিণতি শুভ হতে পারে না তাও ' ঘরে বাইরে 'র মধ্যে রবীন্দ্র নাথ দেখিয়েছেন । " ১৬

বাংলায় এল স্বদেশী যুগের তুফান । বিমলা এই তুফানকে দেখল নিজস্ব দৃষ্টি দিয়ে , " সেদিন আমারও দৃষ্টি এবং চিত্ত , আশা এবং ইচ্ছা উন্মত্ত নবযুগের আবিরে লাল হয়েউঠেছিল । এতদিন মন যে জগৎটাকে একান্ত বলে জেনেছিল এবং জীবনের ধর্ম কর্ম আকাংখা ও সাধনা যে সীমা টুকুর মধ্যে বেশ গুছিয়ে সাজিয়ে সুন্দর করে তোলবার কাজে প্রতিদিন লেগেছিল সে দিনও তার বেড়া ভাঙেনি বটে , কিন্তু সেই বেড়ার উপরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ যে একটি দূর দিগন্তের ডাক শুনলুম স্পষ্ট তার মানে বুঝতে পারলুম না , কিন্তু মন উতলা হয়ে গেল । " এ যুগের তীব্র বাতাসে বিমলা মোহিত । অথচ তাঁর স্বামী নিখিলেশ ' বন্দেমাতরম ' ধ্বনি

হতে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ। সেখানেই বিমলা আছে। এমন সময় এল সন্দীপ। স্বদেশী প্রচারের জ্বালাময়ী প্রাণবন্ত ভাষার আবেগ তপ্ত হৃদয় নিয়ে। বিমলা সেই আদর্শে ধরা দিল। আর সন্দীপ বিমলাকে সেই ঝড়ের সুযোগে উড়িয়ে নিয়ে ভেসে যেতে চাইল নিজের টানে। সন্দীপ বলছে, " যে পশ্চিমের ঝড়ে আমার স্বদেশ লক্ষ্মীর মুখের উপর থেকে ন্যায় অন্যায়ের ঘোমটা উড়ে গেছে সেই ঝড়েই বিমলার মুখে বধুর ঘোমটা খুলবে — সেই অনাবরণে তার অগৌরবের থাকবে না। "

অথচ নিখিলেশ ঠিকই বুঝেছিল, " বিমলা দেশের নাম করে যে কথাগুলো বলছে সে কেবল সন্দীপের ছায়া দিয়ে গড়া, আইডিয়া দিয়ে নয়। "

কিন্তু বিমলা ঘর হতে বাইরে ছুটে এলো। সন্দীপের সাথে দেশের কাজে। বিমলার অনুভূতি, " আমি আলো দেব, আমি জীবন দেব, আমি অমৃত দেব, সেই বিশ্বাসে সেই আনন্দে দুই কূল ছাপিয়ে আমি বাহির হয়ে পড়েছিলুম। " কারণ, " সন্দীপ বাবুর কথায় দেশের স্তবের সঙ্গে যখন আমার স্তব মিশিয়ে যায়, তখন সংকোচের বাঁধন আর টেকে না, তখন রক্তের মধ্যে নাচন ধরে। "

ডঃ জীবেন্দু রায় বলছেন, " আইডিয়ার রূপ নির্মিতিতে সে (সন্দীপ) শক্তি উপাসক, আর তাতে তো মেয়েদের একান্তই প্রয়োজন। অন্যথায় ' কালীর ' সাধনা সম্পূর্ণ হবে কেমন করে ? তার আক্ষেপ মেয়েরা যদি পুরুষের বাঁধনে আটকে না পড়ে না থাকত, পৃথিবীতে কালীকে প্রত্যক্ষ দেখতে পেতুম। " বিমলাকে প্রলয়ের মাঝে টেনে এনে সেই কালীর উপাসনাই ব্রত তার, অতএব ' দেশ প্রেম ' নামে দেশী নারী প্রেমে এবং সেই কথাই সামান্য কিছুটা বলবার পর কল্পনা উদ্দাম হয়ে উঠল উলঙ্গিনী কালিমূর্তির বর্ণনায়। স্বদেশ রস আর আদি রসের এরকম অপরূপ মেল বন্ধন স্বদেশী সন্ত্রাসপন্থী (?) সন্দীপ ছাড়া আর কারোর পক্ষে সম্ভব নয়।" ১৭

বিমলার শিন্তু প্রত্যাবর্তন করতে দেরী লাগেনি । সে দ্রুত সন্দীপের লালসা - ময় অন্তঃকরণের চিত্র দেখতে পেল । সে বুঝল নিখিলেশ তাকে যে ভালবাসা দিয়েছে তাতে কোন উদ্দেশ্য নেই । সে প্রেম নিঃস্বার্থ । সেই মুহূর্তে সে অনুভব করল — " আমি যে স্তবগান শুনেছিলুম , যে গান শুনে স্বর্গ থেকে ধূলায় নেমে এসেছিলুম সে কি ধূলাকে স্বর্গ করবার জন্য নয় ? সে কি স্বর্গকে মাটি করবার জন্যে ? " বিমলা তাই এখন নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছে । অশুভ হতে শুভে প্রত্যাবর্তনই ছিল রবীন্দ্র নাথের কাম্য ।

' ঘরে বাইরে ' রবীন্দ্র নাথের রাষ্ট্রীয় অনুভূতির মানসিক ফসল । রবীন্দ্র নাথ মনে করতেন , " দেশ মানুষের সৃষ্টি । দেশ মৃন্ময় নয় , সে চিন্ময় । মানুষ যদি প্রকাশমান হয় , তবেই দেশ প্রকাশিত । দেশ মাটিতে তৈরী নয় , দেশ মানুষে তৈরী । তাই দেশ নিজের সত্তা প্রমানেরই খাতিরে অহরহ তাকিয়ে আছে তাদেরই জন্যে যারা কোনো সাধনায় সার্থক । তারা না থাকলেও গাছ পালা জীব জন্তু জন্মায় , বৃষ্টি পড়ে , নদী চলে , কিন্তু দেশ আচ্ছন্ন থাকে মরুবালু তলে ভূমির মতো । ..... আমাকে গ্রহণ করার দ্বারা দেশ যদি কোনো ভাবে নিজেকে লাভ করে না থাকে তবে আজকের এই উৎসব অর্থহীন । " প্রাজ্ঞ কবি এই কথা বলেছিলেন সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে । ১৮

তাই রবীন্দ্র নাথ উৎকট স্বাদেশিকতাকে গ্রহণ করতে পারেন নি । পারেন নি মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য যা কিছু করা হবে তাই হচ্ছে ধর্ম এই ভাবনাকে । রবীন্দ্র নাথ পিয়রসনকে চিঠিতে বলছেন (১১ই ডিসেম্বর , ১৯১৮) " ... দেশ প্রেমের অহংকার আমার জন্য নয় । এই পৃথিবী ছেড়ে যাবার আগে সর্বত্র আমি আমার ঘর খুঁজে পাব , এই একান্ত আশা আমার আছে । " ১৯

ইউরোপের ' ন্যাশনালিজম ' কে রবীন্দ্র নাথ কোনদিনই ভাল চোখে দেখেন

নি , তিনি বলছেন ......"This nationalism is a great epidemic of evil that is sweeping over the human world of the present age and eating into its moral vitality. ২০

বিলিতি বস্ত্রের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে যে বিরাট আন্দোলন এবং বহ্ন্যুৎসব শুরু হয়েছিল রবীন্দ্র নাথ তাকেও সমর্থন করতে পারেন নি । সন্দীপ ' ঘরে বাইরে ' বলছে , " যে লোক বিলিতি কাপড় কিনবে তাকে দিশি কাপড় বখশিস দেওয়া চলবে না । দন্ড তারই হওয়া চাই , আমাদের নয় । মামলা যারা করতে যাবে তাদের ফসলের খোলায় আগুন লাগিয়ে দেব গায়ে হাত বুলিয়ে কিছু হবে না । ..... চাষির খোলায় আগুন দিয়ে রোশনাই করায় আমার শখ নেই । কিন্তু এল যুদ্ধ । দুঃখ দিতে যদি ডরাও তাহলে মধুর রসে ডুব মারো , রাধা ভাবে ভোর হয়ে ক বলতেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ো । "

সেদিন বয়কট আন্দোলনে জবর দস্তি ভাব এসেছিল । কিন্তু স্বাভাবিকতাও ছিল "Mukherjee's Magazine - এ বলা হয়েছে "Not to speak of the participation of zamindars and pleaders, students and youths, peasant and shop keepers, even medical man and native army. Brahminis and Priets, barbers and washer men played an important part in the extension of the Boycott-Swadeshi movement. It is reported that on the refusal by three rejiments of Sepoys at Barrackpore and Fort William to wear uniform made of foreign cloth, they were ~~discovered~~ disarmed and sent off to distant military stations in North West India, Agains, at a Washerman's meeting at Boalia, the participants took the solemen vow of not washing foreign cloths on pains of ex-communication....... Moreover, the Government also noticed how the secret connivance of the native police festered the

the Boycott Swadeshi Cause". ২১

সরকারী মুখ্য সচিবও সহজভাবে স্বীকার করেছেন , "The market is piece good duller, and dealers are not anxious to indent, as prices show weakness in Lancashire, and many mills are working short time or closing for a period". ২২

রবীন্দ্র নাথ গঠন মূলক কাজে বিশ্বাস করতেন , ধ্বংসাত্মক কাজে তাঁর অনাগ্রহ ছিল । তাই বিলিতি বস্ত্রের এই বহ্ন্যুৎসবকে তিনি ভাল চোখে দেখেন নি । তিনি তাঁর মত প্রকাশ করে বলছেন " ..... এখনকার লোকে তাই তিলে তিলে কিছু গড়ে তোলার জন্য দল বাঁধে না । দল বাঁধে গড়া জিনিসকে ভাঙবার পৈশাচিক আনন্দে । " ২৩

' ঘরে বাইরে 'র সন্দীপের মধ্যে দিয়ে তৎকালীন দেশ প্রেমিকদের তীব্র স্বাদেশিকতার ভাব যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি রবীন্দ্র নাথের মতামতটিও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে । " ধর্মের ক্ষেত্রে যেমন , জীবন যাত্রার ক্ষেত্রেও তেমনি ধ্যান স্তিমিত শান্ত ভাবকেই রবীন্দ্র নাথ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন । মননশীলতার প্রতি তাঁর

গভীর আস্থা ছিল দেশ প্রীতির ক্ষেত্রেও কবির এই মনোভাবই প্রকাশ পায় । উত্তেজনার ঘূর্ণি নৃত্যের মধ্যে পাক খেয়ে ফিরতে তাঁর কখনও রুচি হয় নি । যাঁরা নিভৃতে চিন্তা ও নিঃশব্দে কাজ করে যান , কবির সমস্ত সহানুভূতি তাঁদেরই প্রতি ।"

নিখিলেশ আত্ম সমাহিত , সংযত চিত্ত ও সত্যের পূজারী । স্বাদেশিকতার উচ্ছ্বাসকে সে কোনো দিনই পছন্দ করেনি । সন্দীপের জনপ্রিয় মত সকলে নির্বিচারে গ্রহণ করলেও নিখিলেশের পক্ষে তা মেনে নেওয়া সম্ভব হয় নি । স্বাতন্ত্র্যবাদী ইন্টেলেকচুয়াল মন স্বভাবতই প্রতিক্রিয়াশীল হয় । বহু লোকের যা গ্রহণ যোগ্য তার পক্ষে তা অনায়াসে গ্রহণ যোগ্য নয় । তাই সন্দীপের কথায় নিখিলেশের মনে কুণ্ঠা জেগেছে । সন্দীপের দল দেশকে দেবতা বলে খাড়া করে যখন অন্যায়কে কর্তব্য ও অধর্মকে পুণ্য বলে চালাতে চেয়েছে , তখনই নিখিলেশের মনে সবচেয়ে বেশী আঘাত লেগেছে । দেশের ওপরেও রয়েছে ধর্ম । তাই নিখিলেশের মতে , " দেশের উপরে যারা ধর্মকে মানছেনা ..... তারা দেশকেও মানছেনা । " ২৪

' ঘরে বাইরে ' প্রসঙ্গে গুনময় মান্না বলছেন — ' ঘরে বাইরে ' উপন্যাসের নায়ক নিখিলেশ ও প্রতিনায়ক সন্দীপ — এরা বন্ধু অথচ বিপরীত মুখে সক্রিয় , ... জাতীয়তার ভিত্তিতেই দুই বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে , কিন্তু নিখিলেশের অভিমুখতা বিশ্বাত্ম বাদের দিকে , এবং সন্দীপ জাতীয়তার বিকৃতিকেই পোষকতা দিচ্ছে ।

নিখিলেশ বলে, "মা যেমন নিজের গহনা দিয়ে তার মেয়েকে সাজিয়ে দেয় আজ তেমনি একটা দিন এসেছে যখন সমস্ত পৃথিবী প্রত্যেক দেশকে আপন গয়না দিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছে । আজ আমাদের খাওয়া পরা চলাফেরা ভাবনা চিন্তা সবই সমস্ত পৃথিবীর যোগে । "

স্বাধীন অথচ সহযোগী জাতি সমূহ স্বেচ্ছায় মঙ্গলের উদ্দেশ্যে পরস্পরের সঙ্গে

মিলিত হবে — এই অস্ত্র প্রয়োগ নিখিলেশ কেবল বাইরেই করতে চেয়েছে তাও নয় , ঘরেও স্ত্রী বিমলাকে সে বলেছে , " তুমি একবার বিশ্বের মাঝখানে এসে সমস্ত আপনি বুঝে নাও । এই ঘর গড়া ফাঁকির মধ্যে কেবল মাত্র ঘর কণা টুকু করে যাওয়ার জন্য তুমিও হওনি আমিও হইনি । সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয় তবেই আমাদের ভালোবাসা সার্থক হবে । "

আমরা সহজেই বুঝতে পারি , জাতীয়তার শ্রেয়ো মুখিন প্রসারণ যে বিশ্বাত্মবাদ , নিখিলেশ তার প্রবক্তা । পক্ষান্তরে , জাতীয়তার বিকৃত প্রসারণ যে সাম্রাজ্যবাদ , সন্দীপ তারই উপাসক ।

" রবীন্দ্র নাথের জীবন দৃষ্টি এতই মূল গত যে নিখিলেশও সন্দীকে তিনি আলাদা করে উপস্থিত করেন নি , তারা বন্ধু , পরস্পর সম্পৃক্ত , ফলে সন্দীপের কাজ করার জন্য যেমন নিখিলেশের গৃহ ও জমিদারী প্রয়োজন তেমনি নিখিলেশের একান্ত প্রয়োজন সন্দীপকে — স্বীয় আদর্শকে যাচাই করার জন্য — তাই নিজের জমিদারীতেই সন্দীপকে সে কাজ করতে দেয় , স্ত্রীকে অন্তঃপুর থেকে বের করে এনে সন্দীপের মুখোমুখি করে । সন্দীপ আগুন জ্বালিয়েছে , নিখিলেশের জমিদারীতে বাইরে , আর ঘরে বিমলার অন্তরে — এ আগুন নিখিলেশের আত্ম কৃত । কিন্তু আত্মকৃত দহনের প্রায়শ্চিত্ত ও তাকে করতে হবে তা না হলে বিশাত্ম বাদের সার্থকতা কোথায় , বিশ্বাত্মবাদ : আত্মবাদ । নিখিলেশ বিশ্ববাদকে জয়ী করার জন্য আত্মাহুতি দিতেই গিয়েছিল । " ২০

' ঘরে বাইরে ' র অনুভূতি নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছে । স্বাধীনতা অর্জনের তবে পথ কি ? মানুষ খুঁজে পেতে চেয়েছে তার সমাধানের প্রশ্ন । শিশির দাস বলছেন , " এই উপন্যাসে যে দুটি শক্তির সংঘর্ষ , তার একটি প্রত্যক্ষ , ঐতিহাসিক ,

সেই শক্তি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের , সেই শক্তি সমকালীন স্বদেশী অর্থনীতির চিন্তার । অন্য শক্তির ঐতিহাসিক প্রত্যক্ষতা নেই স্পষ্টতা নেই । নিখিলেশ যে শক্তির প্রবক্তা , যাকে রবীন্দ্রনাথ বলছেন ' আত্মশক্তি ' তা প্রকৃত পক্ষে রবীন্দ্র নাথের রাজনৈতিক বিশ্বাস । সেই , বিশ্বাসের কোনো জনভিত্তি নেই , রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সমর্থনও নেই । তাই স্বভাবতই স্বদেশী অর্থনীতির সমর্থকরা এবং সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা প্রশ্ন করতে পারতেন — রবীন্দ্র নাথ তাহলে কোন পথে জনশক্তিকে একটি প্রবল বিদেশী শাসক শক্তির বিরুদ্ধে চালিত করবেন ? কোন পথে আসতে পারে ভারতবর্ষের অর্থ - নৈতিক স্বাধীনতা ? স্বদেশী সমাজের আদর্শের মহত্ত্ব অনেকেই স্বীকার করবেন , ব্যক্তিগত ত্যাগ ও আত্ম নির্ভরতাও কাম্য , সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । কিন্তু বৃটিশ শাসনের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার পক্ষে তা যথেষ্ট কি না ? রবীন্দ্র নাথ তার উত্তর দিতে পারেন নি । " ২৬

' ঘরে বাইরে ' সম্পর্কে বহু আলোচিত হয়েছে । উপন্যাস যখন ঐতিহাসিক দলিল হয়ে যায় তখন সমালোচনার প্রশ্ন আসাই স্বাভাবিক । স্বদেশী আন্দোলনের কাল খন্ডে যা ঘটেছিল তার মধ্যে শুভ অশুভ অনেক কিছুই স্থান করে নিয়েছিল সেই আন্দোলনে । বিশ্ব কবি ' ঘরে বাইরে ' যখন লেখেন তার আগেই তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়ে গেছেন । তাঁর চিন্তার প্রসারণ ঘটেছে । স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে হয়তো ' সন্দীপ ' এক বিচ্ছিন্ন চরিত্র । সামগ্রিক বর্গভঙ্গ আন্দোলনে ' সন্দীপের ' মতো দু একজন থাকা অস্বাভাবিক নয় । কিন্তু রবীন্দ্র নাথ ছিলেন শ্রেয়র উপাসক । রাজনীতির মধ্যে যে উগ্রতা ও অশুভকে তিনি দেখেছিলেন তাকে তিনি অকলয়ণে উম্মোচিত করেন নি শুধু কল্যাণের পথে পরিচালনার জন্য তার ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন । জয় হোক শুভ বোধের বা শ্রেয় বোধ প্রাধান্য বিস্তার করুক সর্বত্র — এই মনোভাবনা তাঁর প্রদীপ্ত ছিল সর্বদা ।

রবীন্দ্র নাথের 'গোরা'

' গোরা ' রবীন্দ্র নাথের বিশাল ও ক্লাসিক উপন্যাস । প্রকাশ কাল ১৯১০ । বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ তখন তীব্র । শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় , " বঙ্গদেশের একটা বিশিষ্ট যুগ সন্ধিক্ষণের সমস্ত বিক্ষোভ আলোড়ণ , আমাদের দেশাত্মবোধের প্রথম স্ফুরণের সমস্ত চাঞ্চল্য , আমাদের ধর্ম বিপ্লবের সমস্ত একাগ্রতা ও উদ্দীপনা এই উপন্যাস স্থানে লাভ করিয়াছে । ..... গোরাকে একটা জীবন্ত মানুষ অপেক্ষা ভারতবর্ষের আত্মবোধের প্রকাশ বলিয়াই মনে হয় ।" ২৭

' গোরা ' শুধু উপন্যাসই নয় , গোরা রবীন্দ্র নাথের মানসিক ভাবনার উত্তরণ । স্বদেশী যুগের পরবর্তী কাল হতে রবীন্দ্র নাথের চিন্তার জগতে এক পরিবর্তনের দ্বন্দ্ব প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল । স্বাদেশিকতা ও বিশ্বমানবতা দুই চিন্তাধারা কবিকে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে ধরেছিল । কবি এই স্বদেশী আন্দোলন কালেই স্বাদেশিকতাকে বিশ্বমানবিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে চাইলেন । এই আদর্শই ভারতীয় সভ্যতার মর্মবানী । যুগে যুগে কাব্যে সাহিত্যে ও ধর্মে বা দর্শনে এরই মুক্ত প্রকাশ ঘটেছে । ' ভারতের ইতিহাস ' খুঁজতে গিয়ে রবীন্দ্র নাথ বলছেন , " ঐক্য মূলক যে সভ্যতা মানব জাতির চরম সভ্যতা , ভারতবাসী চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে । পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই , অনার্য্য বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই , অসংগত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস করে নাই । "

' গোরা 'র রচনা কালে স্বদেশী গ্রহণ , বিদেশী বর্জন এবং সন্ত্রাসবাদের বহুমুখী উত্তেজনার আগুনে বাঙালীর হৃদয় তখন প্রজ্বলিত ছিল । " শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের একটি লক্ষণ যদি হয় যুগের গভীরে অনুপ্রবেশ করে যুগাতীত হওয়া , যুগের বিশিষ্ট সত্যের সঙ্গে মানবতার চির কালের সত্য প্রকাশ করা তবে গোরা এক সত্যি - কারের সাহসী পদক্ষেপ । গোরার মধ্যে একদিকে রয়েছে স্বদেশী যুগের প্রচন্ড

দাবানলে সত্যকার পথ আবিস্কারের প্রয়াস , অন্যদিকে আত্মার দর্শন কে বিশ্লেষণ করে সার্থক আত্মানুসন্ধান । "

নাজমা জেসমিন চৌধুরী বলছেন , " স্বদেশ প্রেমের উন্মেষ পর্ব বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্র নাথ যেন বলতে চাচ্ছেন স্বদেশী আন্দোলনের সত্য পথের কথা । জাতীয়তাবাদ নয় , ভারতাত্মা সন্ধানই ' গোরা 'র মূল লক্ষ্য এবং সেটা রবীন্দ্র - নাথেরও । ......

গোরার সংস্কার বদ্ধতা , ইংরেজ বিদ্বেষ , হিন্দু সভ্যতাকে এবং ধর্মকে অনুসন্ধান করে ফেরা এ দিকটি স্বদেশী যুগের উন্মেষ ও বিকাশ পর্বের । তবে ' গোরার ' সত্যের উৎস হচ্ছে নিঃস্বার্থ স্বদেশ প্রেম । কিন্তু রবীন্দ্র নাথের নিঃস্বার্থ স্বদেশ প্রেম এবং ' স্বদেশী 'র শ্রেনীস্বার্থ যুক্ত দেশ প্রীতির মধ্যেকার পার্থক্যটা বিরাট । স্বদেশী যুগের ' দেশহিত ' করার প্রয়াসকে তিনি দেশপ্রেম নাম দিতেও কুন্ঠিত ছিলেন । ' গোরা 'র শেষাংশ রচনা এবং ' গীতাঞ্জলি ' লেখার শুরু একই সময়ে । হিন্দু পুনরুজ্জীবন ঘেঁষা স্বদেশবোধ থেকে একটা উদার মানবতা বোধে রবীন্দ্র নাথ তখন উত্তীর্ণ । " ২৮

রবীন্দ্র নাথ ' গোরা ' উপন্যাসে তাঁর বিশ্বজননীর দার্শনিক ভাবনাকে সুস্পষ্ট রূপ দিতে চাইলেন । গোরা বিদেশী পরিবারে জন্মানো শিশু । পালিত রক্ষণশীল গোঁড়া হিন্দু পরিবারে । গোরা যখন তাঁর আত্ম পরিচয় জেনেছে সে মনে করেছে সে সার্বজনীন । রবীন্দ্র নাথ তাঁকে যেন পৃথিবীর নাগরিক বা 'citizen of the world' রূপে অঙ্কিত করতে চেয়েছেন ।

" বিশ্ব ও ভারতের মিলনের ছবি যে কবি দেখেছেন , তাঁর পক্ষে গোরার জন্ম ও লালন পালনের ইতিহাস এই ভাবে বিশ্ব ও ভারতের পরিধির সমন্বয়ের

মধ্যে গড়ে তোলা ছাড়া উপায় ছিল না। বস্তুত রবীন্দ্র নাথের দার্শনিক চিন্তাধারার মধ্যে একটি প্রধান সত্য সিদ্ধান্ত হচ্ছে মানুষকে জাতীয়তার গন্ডি ছাড়িয়ে একটি আন্তর্জাতিক মানব রূপে দেখতে হবে।" ২৯

রবীন্দ্র নাথ 'তপোবন' প্রবন্ধে বলছেন " ..... যে সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিন্তভাবে লাভ করতে পারে সে সত্যটি কী। সে সত্য প্রধাণতঃ বণিগবৃত্তি নয়, স্বরাজ্য নয় স্বাদেশিকতা নয়, সে সত্য বিশ্ব জাগতিকতা।"

রবীন্দ্র নাথ গোরাকে সেই ভাবে আদর্শে সৃষ্টি করতে চাইছিলেন। গোরা গোঁড়া হিন্দুর আদর্শবাদকে সমর্থন করেছিল। তাতে তার চরিত্র মহিমার কোন ক্ষতি হয় নি। নিজস্ব ধর্মে বা নিজ দেশের প্রবল আকাংখা না থাকলে জাতীয়তা থেকে বিশ্ব মানবিকতায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। তাই গোরা কে যখন দেখি, সুচরিতার প্রশ্নের উত্তরে সে হিন্দু ধর্মের সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছে তাতে তার একান্তিকতা আমাদের মুগ্ধ করে। গোরা বলছে, " আমার দেশের লোকের ভক্তিকে তোমরা উপহাস করবে এও আমি কোন দিন সহ্য করতে পারব না। তুমি তোমার দেশের লোককে ডেকে বলছ — তোমরা মূঢ়, তোমরা পৌত্তলিক। আমি তাদের সবাইকে আহ্বান করে জানাতে চাই — না তোমরা মূঢ় নও, তোমরা পৌত্তলিক নও, তোমরা জ্ঞানী তোমরা ভক্ত। আমাদের ধর্ম তত্ত্বে যে মহত্ত্ব আছে, ভক্তি-তত্ত্বে যে গভীরতা আছে শ্রদ্ধা প্রকাশের দ্বারা সেইখানেই আমার দেশের হৃদয়কে জাগ্রত করতে চাই ..... আমি তাঁর মাথা হেট করতে দেব না, নিজের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে নিজের সত্যের প্রতি তাকে ক্ষুব্ধ করে তুলব না।" গোরার মুখ দিয়ে জাতি ধর্মের এই মহিমা প্রকাশ যে কতখানি নিরপেক্ষ রবীন্দ্র নাথের মানস তত্ত্ব যে আত্ম জিজ্ঞাসা কত গভীরে প্রবেশ করেছিল তার বিস্ময়কর প্রকাশ।

গোরা বলত, " হিন্দু ধর্ম মায়ের মতো নানাভাবের নানামতের লোককে কোল দেবার চেষ্টা করেছে।"

রবীন্দ্র নাথ গোরাকে নিয়েই তাঁর পরীক্ষা নিরিক্ষা শুরু করেছিলেন । রবীন্দ্র নাথ যেন গোরাকে এই ভাবনায় উন্নীত করতে চাইছিলেন " যা সত্য তার জিয়োগ্রাফি নেই । ..... বস্তুত যদি এমন কোনো ভালো থাকে যা একমাত্র ভারতবর্ষেরই ভালো , তবে তা ভালোই নয় , ... যদি ভারতের দেবতা ভারতেরই হন তবে তিনি আমাদের স্বর্গের পথ বন্ধ করিবেন , কারণ স্বর্গ বিশ্বদেবতার । " ৩০

' গোরা ' র ব্যাপ্তি বিশাল । কবি এই উপন্যাসে স্বদেশ প্রেমের ভাবনা প্রকাশ করেছেন । বিদেশী শাসনের ফলে দেশের মানুষের যে নিদারুণ যন্ত্রনা তাকে প্রকাশ করেছেন । অজস্র দেশভক্তের জীবনের শ্রেষ্ঠ পাথেয় স্বাধীনতা , সেই স্বপ্নের আভাস তিনি এই উপন্যাসে দিয়েছেন । দেশ কালের বাইরে বহু সিদ্ধান্ত ও সমস্যার জটিল পথকে মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণে প্রাঞ্জল করে তুলেছেন ।

' গোরা ' উপন্যাসে ' বিনয় ' আরেক অপূর্ব সৃষ্টি । বিনয় গোরাকে বোঝার চেষ্টা করেছিল । গোরার ধারণার মধ্যে ত্রুটি থাকলেও তার ধারণাকে সে যথেষ্ট মর্য্যাদা দিত । গোরা আর বিনয়ের প্রীতির মাঝে অবস্থান করেছেন আনন্দময়ী । মাতৃস্নেহের করুণা শীতল ধারায় গোরা ও বিনয় দুজনেই স্নান সিক্ত । আনন্দময়ীর জীবনে শ্রেষ্ঠ সুখ ও শান্তি রূপে বিরাজ করত গোরা ও বিনয় । এই দুই পুত্র পেয়েছে অনাবিল স্নেহধারা । গোরা প্রত্যক্ষ করেছে আনন্দময়ীর মধ্যে তার দেশ মাতৃকার মৃন্ময়ী কল্যাণময়ী মূর্তি । তাই গোরা বলেছে " যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসেছিলেন । " বিনয়ও আনন্দময়ীর মধ্যে দেশ - প্রেমের উদ্গাতা জননীকে দেখেছেন । বিনয়ও বলছে , " এই মুখই আমার মাতৃ - ভূমির প্রতিমা স্বরূপ হউক , আমাকে কর্তব্যে প্রেরণ করুক এবং কর্তব্যে দৃঢ় রাখুক । "

আনন্দময়ীর মধ্যে রবীন্দ্র নাথ মাতৃত্বের সার্বজনীন প্রবেশ ঘটাতে চেয়েছিলেন । আনন্দময়ী ও ভারত জননীতে যেন কোন প্রভেদ নেই । তিনি সকলকেই কোলে টেনে

নিতে প্রস্তুত , তিনি যেন বিশ্বজননী । তাই তো তিনি ভাবেন জাত নিয়ে কেউ পৃথিবীতে জন্মায় না । রক্ষণশীল পরিবারের গৃহবধূ হয়ে তিনি সকল সংস্কার মুক্ত । গোরাকে সবাই খ্রীষ্টান বলে দূরে সরালে তার বুকে বেদনা হয় । তিনি বলেন , " ..... খ্রীষ্টান কি মানুষ নয় ? তোমারাই যদি এত উঁচু জাত আর ভগবানের এত আদরের তবে তিনি একবার পাঠানের , একবার মোঘলের , একবার খ্রীষ্টানের পায়ে এমন করে তোমাদের মাথা মুড়িয়ে দিচ্ছেন কেন ? "

আনন্দময়ীর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পেয়েছিলেন দেশমাতার স্বরূপ । যার কাছে সকলেই সমান । সকল পুত্রকেই তিনি সাদরে গ্রহণ করেন । মায়ের কাছে পুত্রের প্রতি স্নেহের কোন বিভিন্নতা নাই । ভারতবর্ষও যেন আনন্দময়ী হবেন — যেখানে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলেই পাবে সমাদর । বিনয়ের সাথে কথোপকথনে আনন্দময়ীর সেই অভিব্যক্তি ই প্রকাশ পেয়েছে । তিনি বলছেন , " মানুষ বস্তুটি যে কত সত্য — আর মানুষ যা নিয়ে দলাদলি করে , ঝগড়া করে মরে , তা যে কত মিথ্যে — সে কথা ভগবান গোরাকে যেদিন দিয়েছেন সেদিনই বুঝিয়ে দিয়েছেন । বাবা ব্রাহ্ম বা কে আর হিন্দুই বা কে । মানুষের হৃদয়ের তো কোন জাত নেই - সেইখানেই ভগবান সকলকে মেলান এবং নিজে এসেও মেলেন । তাঁকে ঠেলে দিয়ে মন্তর আর মতের উপরেই মেলাবার ভার দিলে চলে কি ? "

অথচ গোরা , তারও ভারতের প্রতি ভালবাসার অনুরাগে কমতি ছিল না । গোরার ভারতবর্ষ প্রথমে ছিল হিন্দুত্ব বোধের ভাবনায় আবদ্ধ । বিনয়ের ভাবনার সাথে গোরার ভাবনার সংঘাত হয়েছে , কারণ বিনয় স্পষ্টই বলেছে , " সমাজের দাবিকে আমি ততক্ষণ স্বীকার করব যতক্ষণ সে আমার উচিত দাবিকে রক্ষা করবে । সে যদি আমাকে মানুষ বলে গণ্য না করে , আমাকে কলের পুতুল করে বানাতে চায় , আমিও তাকে ফুল চন্দন দিয়ে পূজো করব না , লোহার কল বলেই গণ্য করব । " গোরাও এই ভারতবর্ষকে খুঁজেছে — কিন্তু অন্তরের মধ্যে তীব্র আলোর সন্ধান পায় নি ।

কিন্তু যখন গোরা জানতে পেরেছে তার বাবা আইরিশম্যান , মিউটিনির সময় তাঁর জন্ম , এই কথায় তার জীবনে নেমে এসেছে এ নিঃসীম শূন্যতা, কারণ " তার মা নেই , বাবা নাই , দেশ নাই , জাতি নাই , নাম নাই , গোত্র নাই , দেবতা নাই । " গোরা নিজেই প্রকাশ করেছে " ভারতবর্ষের উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত সমস্ত দেবমন্দিরের দ্বার আজ আমার কাছে রুদ্ধ হয়ে গেছে , আজ সমস্ত দেশের মধ্যে কোন পঙক্তিতে কোনো জায়গায় আমার আসন নেই । " এই নিঃস্পৃহতা , এই নিরালম্বতাই গোরাকে পৌঁছে দিয়েছে তার অভিষ্ট ভারতবর্ষে । যে গোরা একদিন একটা বৃহৎ সত্যের ভারতবর্ষকে খুঁজে ফিরছিল অথচ তার সন্ধান পায় নি , বিভিন্ন সংস্কারের উর্ণজাল ভেদ করে তার স্বপ্নের ভারতকে সে খুঁজে পায়নি , আজ সেই ক্ষুদ্রতার পরিসীমা সীমিত ভারতের রূপ , সংকীর্ণতার জগদ্দল পাথরের মতো তার হৃদয় থেকে সরে গেছে অন্ধকার । সে অনুভব করেছে " সমস্ত ভারতবর্ষের ভালোমন্দ সুখ দুঃখ জ্ঞান অজ্ঞান একেবারেই আমার বুকের কাছে এসে পৌঁচেছে — আজ আমি সত্যকার সেবার অধিকারী হয়েছি — সত্যকার কর্মক্ষেত্র আমার সামনে এসে পড়েছে — সে আমার মনের ভিতরকার ক্ষেত্র নয় — সে এই বাইরের পঞ্চ বিংশতি কোটি লোকের যথার্থ কল্যাণ ক্ষেত্র । " তাই পরেশ বাবুর কাছে সে প্রার্থনা করেছে " আমাকে আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন যিনি হিন্দু - মুসলমান - খ্রীষ্টান - ব্রাহ্মণ সকলেরই — যাঁর মন্দিরের দ্বার কোন জাতির কাছে , কোন ব্যক্তির কাছে কোন দিন অবরুদ্ধ হয় না — যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন , যিনি ভারতবর্ষের দেবতা । "

গোরার এই ভারতবর্ষ রবীন্দ্র নাথের কল্পনার ভারতবর্ষ । এই ভারতের বানী - বদ্ধ রূপ আঁকিতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্র নাথ । ধর্ম ও জাতি বিদ্বেষের ভেদাভেদ উত্তীর্ণ , গভীর সহানুভূতিতে গড়া ভারতের রূপ , ঐক্যের পথে চলার সাধনার ভারতকে তিনি খুঁজে ফিরেছেন স্বদেশী আন্দোলন কালে । রবীন্দ্র নাথ চিরদিনই উগ্রতার ও হিংস্রতার বিরুদ্ধে ছিলেন । তিনি বলছেন,

"I refuse to waste my manhood in lighting the fire of anger and spreading it from house to house". ৩১

প্রাচীন ভারত ও আধুনিক ইউরোপ রবীন্দ্র নাথকে মুগ্ধ করেছিল । ফলে একদিকে স্বাদেশিক চেতনায় তিনি ঋষি, অন্যদিকে আবার তিনি ইউরোপীয় প্রাণ শক্তির স্তাবক । কিন্তু এই প্রবণতা অবিমিশ্র রয়ে গেছে তাঁর চেতনায় । তাই " স্বদেশ প্রেমের উন্মেষ পর্ব বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্র নাথ যে বলতে চাচ্ছেন স্বদেশী আন্দোলনের সত্য পথের কথা । জাতীয়তাবাদ নয় ভারতাত্মা সন্ধানই ' গোরার মূল লক্ষ্য এবং সেটা রবীন্দ্র নাথেরও । " ৩২

রবীন্দ্র নাথের ' চার অধ্যায় '

রবীন্দ্র নাথের শেষ উপন্যাস ' চার অধ্যায় ' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৪ সালে । চার অধ্যায় সন্ত্রাসবাদের পটভূমিকায় লেখা দুই চরম পন্থী বিপ্লবী (এলা ও অতীন) প্রেমপ্রীতি ও দেশ প্রীতির প্রেক্ষাপটে এক জটিল মনস্তাত্ত্বিক কাহিনী । সন্ত্রাসবাদ এখানে উপেক্ষিত ও ধিকৃত । রবীন্দ্র নাথ বলতে চাইলেন মানব জীবনের ভালবাসার কাছে স্বদেশ মুক্তির প্রতিজ্ঞা বিফল হয়ে যায় । ' চার অধ্যায় ' লেখার পিছনে রবীন্দ্র নাথের এক সুস্পষ্ট মানসিক ভাবনা কাজ করছিল ।

তিনি যখন ' চার অধ্যায় ' লেখেন তখন বিপ্লব পন্থীর প্রবল গতি স্তিমিত প্রায় । তাঁর আট বছর আগে শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন ' পথের দাবী ' (১৯২৬) । ' পথের দাবী ' বিপ্লব পন্থার সমর্থনকারী গ্রন্থ । অজস্র বিপ্লবী

প্রেরণা পেয়েছেন এই বই থেকে । ইংরেজ শক্তি 'পথের দাবী' সম্পর্কে ভীত ছিলেন , তাই স্বাভাবিক ভাবে বিপ্লব পন্থার এই উৎস স্রোতকে অবরুদ্ধ করবার জন্য নিষিদ্ধ হয়েছিল এই পুস্তক । শরৎ চন্দ্রের অভিপ্রায় ছিল 'পথের দাবী'র নিষিদ্ধ হওয়ার প্রতিবাদে রবীন্দ্র নাথ কিছু লিখুন । সেই অভিপ্রায়ের কথা তিনি রবীন্দ্র নাথকে জানিয়ে ছিলেন । কিন্তু রবীন্দ্র নাথ প্রতিবাদত করেন নি বরং তিনি শরৎচন্দ্রকে (১৯৩৩ এ) চিঠি পাঠিয়ে তাঁর সুস্পষ্ট মত জানিয়ে ছিলেন এই ভাষায় , " বইখানি উত্তেজক অর্থাৎ ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে । ..... একমাত্র ইংরেজ গভর্ণমেন্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোনো গভর্ণমেন্ট এতটা ধৈর্য্যের সঙ্গে সহ্য করেনা , নিজের জোরে নয় , পরন্তু সেই পরের সহিষ্ণুতার জোরেই যদি আমরা বিদেশী রাজত্ব সম্বন্ধে যথেচ্ছ আচরণের সাহস দেখাতে চাই , তবে সেটা পৌরুষের বিড়ম্বনা মাত্র — তাতে ইংরেজ রাজ্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয় , নিজের প্রতি নয় । রাজ শক্তি-র আছে গায়ের জোর , তার বিরুদ্ধে কর্তব্যের খাতিরে যদি দাঁড়াতেই হয় , তাহলে অপর পক্ষে থাকা উচিৎ চারিত্রিক জোর — অর্থাৎ আঘাতের বিরুদ্ধে সহিষ্ণুতার জোর । কিন্তু আমরা সেই চারিত্রিক জোরটাই ইংরাজ রাজের কাছে দাবী করি , নিজের কাছে নয় । তাতে প্রমাণ হয় যে , মুখে যাই বলি নিজের অগোচরে ইংরেজকে আমরা পূজা করি , ইংরাজকে গাল দিয়ে কোনো শাস্তি প্রত্যাশা না করার দ্বারাই সেই পূজার অনুষ্ঠান । " শরৎচন্দ্র রবীন্দ্র নাথের এই পত্রে মর্মাহত হয়েছিলেন ।

সন্ত্রাসবাদের প্রতি রবীন্দ্র নাথের চিরদিনই অনাস্থা ছিল । তিনি এই পন্থাকে বৈধ বলে কোনদিন স্বীকার করেন নি । হিংসা দিয়ে হিংসার নিবৃত্তি হয় না । অথচ এই স্বদেশী বিপ্লবী পন্থীদের জীবনে আদর্শ ছিল । ছিল আত্ম - ত্যাগের প্রেরণা । দুঃখ যন্ত্রণা যেন তাঁদের চলার পথের সাথী ছিল । দেশ প্রেম

ছিল তাঁদের একমাত্র সম্পদ , আত্মার বস্তু । কিন্তু রবীন্দ্র নাথ বিশ্বাস করতেন না যে স্বদেশ প্রেম মানব জীবনের এ মাত্র লক্ষ্য ।

......"The narrow and agressive lines on which the whole movement was worked out, making patriotism an end unto itself and efficiency the goal of all activities grew discordant to the poet's growing spiritual life". ৬৩

রবীন্দ্র নাথ বিপ্লব পন্থাকে অস্বীকার করেছেন কিন্তু বিপ্লবীদের আত্মত্যাগে তিনি শ্রদ্ধাবোধ দেখিয়েছেন । তিনি বলছেন " সেই বঙ্গ বিভাগের উত্তেজনার দিনে একদল যুবক রাষ্ট্র বিপ্লবের দ্বারা দেশে যুগান্তর আনবার উদ্যোগ করেছিলেন , আর যাই হোক , এই প্রলয় হুতাশনে তাঁরা নিজেকে আহুতি দিয়েছিলেন , এই - জন্য তাঁরা কেবল আমাদের দেশে নয় সকল দেশেই নমস্য । তাঁদের নিষ্ফলতাও আত্মার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল । " ' সত্যের আহ্বান ' (প্রবন্ধ) পৃ ৩২৬ সন্ত্রাসবাদ বিরোধী হওয়ার কারণ ছিল যে রবীন্দ্র নাথ এই পন্থায় কোন কল্যাণের পথ খুঁজে পান নি । তিনি প্রকাশ করছেন , " বড়ো আশা করেছিলাম , দেশে যখন দেশভক্তির আলো জ্বলিয়া উঠিল তখন আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যাহা সকলের চেয়ে মহৎ তাহাই উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইবে , আমাদের যুগ সঞ্চিত অপরাধ তাহা আপন অন্ধকার কোন ছাড়িয়া পালাইয়া যাইবে — দেশ ভক্তির আলো জ্বলিল কিন্তু সেই আলোতে এ কোন দৃশ্য দেখা যায় — এই চুরি ডাকাতি গুপ্ত হত্যা ?" তবুও রবীন্দ্র নাথ সেই উজ্জ্বল আলোকে আরেক মহনীয় দৃশ্য দেখবার চেষ্টা করেছেন — " দেশভক্তির আলোকে বাংলা দেশে যে কেবল চোর ডাকাতকে দেখিলাম তাহা নহে , বীরকেও দেখিয়াছি , মহৎ আত্মত্যাগের দেবীশক্তি আজ আমাদের যুবকদের মধ্যে যেমন সমুজ্জ্বল করিয়া দেখিয়াছি এমন কোনদিন দেখি নাই । "

রবীন্দ্র নাথ এই আন্তরিক ভাবনাকে কিন্তু উপন্যাসে প্রকাশ করেন নি । ১৩৪১ সালে এই উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার সময় এর একটা ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল ।

রবীন্দ্র নাথ সেই ভূমিকা ' আভাস ' শিরোনামে প্রকাশ . করেন । এই ' আভাসে ' ই প্রচ্ছন্ন ভাবে রবীন্দ্র নাথের এই উপন্যাস রচনায় মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে ।

' আভাস '

" একদা ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায় যখন Twentieth Century মাসিক পত্রের সম্পাদনায় নিযুক্ত তখন সেই পত্রে তিনি আমার নূতন প্রকাশিত 'নৈবেদ্য' গ্রন্থের এক সমালোচনা লেখেন । তৎপূর্বে আমার কোন কাব্যের এমন অকুন্ঠিত প্রশংসাবাদ কোথাও দেখিনি । সেই উপলক্ষে তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ।

তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী , অপরপক্ষে বৈদান্তিক , তেজস্বী , নির্ভীক , ত্যাগী , বহুশ্রুত ও অসামান্য প্রতিভাশালী । অধ্যাত্ম বিদ্যায় তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা ও ধীশক্তি আমাকে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট করে ।

শান্তি নিকেতন আশ্রমে বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠায় তাঁকেই আমার প্রথম সহযোগী পাই । এই উপলক্ষ্যে কতদিন আশ্রমের সংলগ্ন গ্রাম পথে পদচারণ করতে করতে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা কালে যে সকল দুরূহ তত্ত্বের গ্রন্থি মোচন করতেন আজও তা মনে করে বিস্মিত হই ।

এমন সময় লর্ড কার্জন বঙ্গব্যবচ্ছেদ ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প হলেন । এই উপলক্ষ্যে রাষ্ট্র ক্ষেত্রে প্রথম হিন্দু মুসলমান বিচ্ছেদের রক্ত বর্ণ রেখাপাত হল । এই বিচ্ছেদ ক্রমশ আমাদের ভাষা সাহিত্য আমাদের সংস্কৃতিকে খন্ডিত করবে । সমস্ত বাঙালী জাতকে কৃশ করে দেবে , এই আশঙ্কা দেশকে প্রবল উদ্বেগে আলোড়িত করে

দিল । বৈধ আন্দোলনের পন্থায় ফল দেখা গেল না । লর্ড মরলি বললেন , যা স্থির হয়ে গেছে তাকে অস্থির করা চলবে না । সেই সময় দেশব্যাপী চিত্ত মথনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠল তারই মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন । স্বয়ং বের করলেন ' সন্ধ্যা ' কাগজ , তাঁর ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন , তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নি জ্বালা বইয়ে দিলে । এই কাগজেই প্রথমে দেখা গেল বাংলা দেশে আভাসে ইংগিতে বিভীষিকা পন্থার সূচনা । বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর এত বড়ো পরিবর্তন আমার কল্পনার অতীত ছিল ।

এই সময় দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয়নি । মনে করেছিলুম হয়তো আমার সঙ্গে তার রাষ্ট্র আন্দোলনের প্রণালীর প্রভেদ অনুভব করে আমার প্রতি তিনি বিমুখ হয়েছিলেন অজ্ঞাত বশতই ।

নানাদিকে নানা উৎপাতের উপসর্গ দেখা দিতে লাগল সেই অন্ধ উন্মত্তার দিনে একদিন যখন জোড়া সাঁকোয় তেতালার ঘরে একলা বসে ছিলাম হঠাৎ এলেন উপাধ্যায় । কথা বার্তার মধ্যে আমাদের সেই পূর্বকালের আলোচনার প্রসঙ্গও কিছু উঠেছিল । আলাপের শেষে তিনি বিদায় নিয়ে উঠলেন । চৌকাঠ পর্যন্ত গিয়ে একবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন । বললেন ' রবিবাবু , আমার খুব পতন হয়েছে । ' এই বলেই আর অপেক্ষা রলেন না , গেলেন চলে । স্পষ্ট বুঝতে পারলুম , এই মর্মান্তিক কথাটি বলবার জন্য তাঁর আসা । তখন কর্মজাল জড়িয়ে ধরেছে , নিষ্কৃতির উপায় ছিল না ।

এই তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা ও শেষ কথা । উপন্যাসের আরম্ভে এই ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য । " ৩৪

' চার অধ্যায়ে 'র বিষয় বস্তু হচ্ছে দুই বিপরীত প্রেম । এলা নায়িকা ।

এলা ছিল দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করার পণে আবদ্ধ । এর পিছনে আছে সাংসারিক ক্ষেত্রে মানসিক অশান্তি । এলা চেয়েছিল এই গতানুগতিক সাংসারিক জীবন থেকে মুক্তি । ফলে চির কুমারীর ব্রত নিয়ে দেশের কাজ করবে বলে সে ইন্দ্রনাথের কাছে স্বদেশী মন্ত্রের দীক্ষা নিল । অতীন্দ্র আরেক বিপ্লবী । ' দেশহিতে প্রাণ করিবে দান ' এই ছিল তার ব্রত । বিপ্লবের এলোমেলো ঝড়ে এলা অতীন্দ্রকে পেয়েছিল । স্বদেশ মুক্তির যে সংগ্রাম সেই পথ অতীন্দ্র গ্রহণ করেছে , ইন্দ্রনাথের নির্দেশিত পথে চলেছে । সেই পথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে সে এলাকে পাইনি ।

১৯০৫ এ ঘটল বঙ্গ বিচ্ছেদ । দেশ ব্যাপী গড়ে উঠল স্বদেশী আন্দোলন । এক অনুভাবনাময় পরিবেশ গভীর ভাবে সৃষ্টি হলো । স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলায় দেখা দিল বিপ্লব পন্থা । এই বিপ্লব পন্থায় বহু নর নারীর মূল্যবান জীবনের ক্ষেত্র গুলো অকস্মাৎ হারিয়ে গেল এই পৃথিবী হতে । এইরূপ পরিবেশ থেকেই রবীন্দ্র নাথ বেছে নিয়েছিলেন এলা আর অতীন্দ্রের প্রেম কাহিনীকে । শুধু বিপ্লবের ঝোড়ো হাওয়াতেই নয় , বিপ্লবীদের কৃতঘ্নতার ফলেও তাদের জীবনে নেমে আসে ট্র্যাজিক পরিণতি । রবীন্দ্র নাথ দেখিয়েছেন স্বদেশী সংগ্রামের ব্যর্থতার সাথে এলা অতীন্দ্রের প্রেমও ব্যর্থ হয়েছে ।

অর্চনা মজুমদার এই প্রসঙ্গে বলছেন , " প্রেমের অবমাননা ও রক্তপাতের আতিশয্য যে দেশ মুক্তির প্রকৃত পথ নয় , ' চার অধ্যায়ে ' সেই কথাই বিশেষ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে । এ সম্পর্কে আমাদের ওয়ার্ডস ওয়ার্থের কথা মনে পড়ে । গোড়ার দিকে ফরাসী বিদ্রোহের (১৭৮৯) প্রতি ওয়ার্ডস ওয়ার্থের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল এবং ইংল্যান্ডও যেন ঐ পথ অবলম্বন করে , মনে মনে তাঁর সেই ইচ্ছাই ছিল । কিন্তু ফরাসী বিদ্রোহে গৃহ যুদ্ধের ফলে যে রক্তপাত হয়েছিল তাতে ওয়ার্ডস ওয়ার্থ অন্তরে গভীর ব্যথা পান এবং ফরাসী বিদ্রোহ সম্পর্কে তাঁর সমস্ত সহানুভূতি লোপ পায় । এ সময় ইংল্যান্ড সম্পর্কে তিনি মনেমনে যা চেয়েছিলেন তা যে সফল

হয় নি তাতে তিনি পরম আরামের নিঃশ্বাস ফেলে লিখেছেন "Tis past that melancholy dream" অর্থাৎ ফরাসী বিদ্রোহের দুঃস্বপ্ন দূরে যাওয়াতে কবি যেন বাঁচলেন। এনার্কিজম বা হিংসাত্মক উপায়ে দেশ মুক্তির পন্থাও রবীন্দ্র নাথের মনোমত ছিল না এবং তা তাঁকে গভীর ভাবে বিচলিত করেছিল।" ৩৩

এলা বিপ্লব পন্থায় যোগ দিল। ইন্দ্রনাথ তাকে শিখিয়েছিল " তোমাকে দেখবা মাত্রই মনে হয়েছে, তুমি নবযুগের দূতী, নবযুগের আহ্বান তোমার মধ্যে।" তাই ইন্দ্রনাথের অভিব্যক্তি এলার কাছে " সংসারের বন্ধনে কোনো দিন বদ্ধ হবে না এই প্রতিজ্ঞা তোমাকে স্বীকার করতে হবে। তুমি সমাজের নও, তুমি দেশের।"

কিন্তু এলা কিছুদিনেই বুঝতে পারল তাদের আদর্শ যেন এক মাতাল নেশার মতো। তাই এলা বলে, " যতই দিন যাচ্ছে, আমাদের উদ্দেশ্যটা উদ্দেশ্য না হয়ে নেশা হয়ে উঠছে। আমাদের কাজের পদ্ধতি চলেছে যেন নিজের বেতালা ঝোঁকে, বিচার শক্তির বাইরে। ভালো লাগছে না। অমন সব ছেলে - দের কোন অন্ধ শক্তির কাছে বলি দেওয়া হচ্ছে। আমার বুক ফেটে যায়।" কিন্তু ইন্দ্রনাথ যে তার আরাধ্য কাজে চায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ। " শরীরটাতে ছাই দিয়েছে যে সন্ন্যাসী, আর প্রবৃত্তিকে ছাই করেছে যে ভস্মকুন্ড সেই ক্লীবদের দিয়ে কাজ হবে না বলে। যখন দেখব আমাদের দলের কোনো অগ্নি উপাসক অসাবধানে নিজের মধ্যেই অগ্নি কান্ড করতে বসেছে — দেব তাদের সরিয়ে। আমাদের অগ্নিকান্ড দেশ জুড়ে, নেবানো মন দিয়ে তা হবে না, আর হবে না তাদের দিয়ে আগুন যারা চাপতে জানে না।"

অতীন্দ্রও এসেছিল আদর্শের বিপ্লব পন্থার জগতে। কিন্তু অতীন্দ্রও একই পরিবেশ অনুভব করল। তাই সে ইন্দ্রনাথকে বলছে " আমি আজ স্বীকার করব —

তোমার কাছে , তোমরা যাকে পেট্রিয়ট বলো আমি সেই পেট্রিয়ট নই । পেট্রিয়টিজমের চেয়ে যা বড়ো তাকে যারা সর্বোচ্চ না মানে তাদের পেট্রিয়টিজম কুমিরের পিঠে চড়ে পার হবার খেয়া নৌকা । মিথ্যাচারণ , নীচতা , পরস্পরকে অবিশ্বাস , ক্ষমতা লোভের চক্রান্ত , গুপ্ত চর বৃত্তি এ দিন তাদের টেনে নিয়ে যাবে পাঁকের তলায় । এই গর্তর ভিতরকার কুশ্রী জগৎটার মধ্যে দিন রাত মিথ্যের বিষাক্ত হাওয়াই কখনোই নিজের স্বভাবে সেই পৌরুষকে রক্ষা করতে পারব না যাতে পৃথিবীতে কোনো বড় কাজ করতে পারা যায় । "

" দেশের আত্মাকে মেরে দেশের প্রাণ বাঁচিয়ে তোলা যায় এই ভয়ঙ্কর মিথ্যে কথা পৃথিবী শুদ্ধ ন্যাশানালিস্ট আজকাল পাশব গর্জনে ঘোষণা করতে বসেছে , তার প্রতিবাদ আমার বুকের মধ্যে অসহ্য আবেগে গুমরে গুমরে উঠছে , এই কথা সত্যি ভাষায় হয়তো বলতে পারতুম , সুড়ঙ্গের মধ্যে লুকোচুরি করে দেশ উদ্ধার চেষ্টার চেয়ে সেটা হতো চিরকালের বড় কথা । "

এলা ও অতীন্দ্রর সম্পর্কের মধ্যেও বিপ্লব পন্থার পথে তারা চলতে গিয়ে পথ যেন ঠিক হয়নি এই ভাবনা এসেছে । কিন্তু এলা পাশ কাটিয়ে অতীনকে বলছে , " আমার আদরের ছোটো খাঁচায় দুদিন তোমার ডানা উঠত ছটফটিয়ে । যে তৃপ্তির সামান্য উপকরণ ঠেকত তলানিতে এসে । তখন জানতে পারতে আমি কতই গরীব । তাই আমার সমস্ত দাবি তুলে নিয়েছি , সম্পূর্ণ মনে সঁপে দিয়েছি তোমাকে দেশের হাতে । সেখানে তোমার শক্তি স্থান — সংকোচে দুঃখ পাবে না । " অতীন এলার এই ভাবনাকে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা জানায় নি । বরং দৃপ্ত কন্ঠে বলেছে , " দেশের কাছে হোক আর যার কাছেই হোক তুমি আমাকে সঁপে দেবার কে ? তুমি সঁপে দিতে পারতে মাধুর্যের দান , যা তোমার যথার্থ আপন সামগ্রী । ..... কিন্তু তুমি আপন দানের অধিকারকে আজ দেখছ ছোট করে । নারীর মহিমায় অন্তরের ঐশ্বর্য্য

যা তুমি দিতে পারতে, তা সরিয়ে নিয়ে তুমি বলছ — দেশকে দিলে আমার হাতে। পার না দিতে, পার না, কেউ পারে না। দেশ নিয়ে এ হাত থেকে আর এক হাতে নাড়ানাড়ি চলে না।"

অন্তুর মতো আদর্শ বিপ্লবীও এই আন্দোলনের পথের চলা যেন পুতুল খেলা মনে করেছে। সে এলাকে বলছে, "তোমাদের স্বদেশী রঙ্গ্যে জগন্নাথের রথ। মন্ত্র দাতা বললেন, সকলে মিলে একখানা মোটা দড়ি বাঁধে নিয়ে টানতে থাকো দুই চক্ষু বুজে — এই একমাত্র কাজ। হাজার হাজার ছেলে কোমর বেঁধে ধরল দড়ি। কত পড়ল চাকার তলায়, কত হল চির জন্মের মতো পঙ্গু। এমন সময় লাগল মন্ত্র উল্টো রথের যাত্রায়। ফিরল রথ। যাদের হাড় ভেঙেছে, তাদের হাড় জোড়া লাগবে না, পঙ্গুর দলকে ঝাঁটিয়ে ফেললে পথের ধুলোর গাদায়। আপন শক্তির পরে বিশ্বাসকে গোড়াতেই এমন করে খুঁচিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে সবাই সরকারি পুতুলের ছাঁচে নিজেকে ঢালাই করতে দিতে স্পর্ধা করেই রাজি হল। সর্দারের দড়ির টানে সবাই যখন একই নাচ নাচতে শুরু করল, আশ্চর্য হয়ে ভাবলে — একেই বলে শক্তি নাচ। নাচনওয়ালা যেই একটু ঢেলগা দেয়, বাতিল হয়ে যায় হাজার হাজার পুতুল।"

রবীন্দ্র নাথ যে সন্ত্রাসবাদী নেতৃবৃন্দের হাতের পুতুল হিসেবে যে বিপ্লবীদের বর্ণনা করেছেন শুধু নাই নয়, তিনি যেন ঘৃণা ভরে বলতে চেয়েছেন সন্ত্রাসবাদীদের আদর্শের চাইতে সুন্দরী নারীর দেহকে দিয়ে প্রলোভিত করে তাদের দলে রাখতে চেয়েছেন। ইন্দ্রনাথের উক্তিতে এই সত্য ধরা দিয়েছে " তোমার কাছ থেকে কথা চাইনে, কাজের কথা সব জানাইও না তোমাকে। কেমন করে তুমি বুঝবে তোমার হাতের রক্ত চন্দনের ফোঁটা ছেলেদের মনে কী আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সেটুকু বাদ দিয়ে কেবল শুধো মাইনেয় কাজ করতে গেলে পুরো কাজ পাব না।

আমরা কমনা কাঞ্চন ত্যাগী নই । যেখানে কামিনীর প্রভাব সেখানে কামিণীকে বসিয়েছি । "

' চার অধ্যায়ে ' যেন বর্ণিত হয়েছে সার্বিক পতনের ছবি । ' রবিবাবু আমার খুব পতন হয়েছে ' ব্রহ্ম বান্ধবের এই করুণ বিলাপকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্র নাথ আঁকিলেন স্বদেশী বিপ্লব পন্থার যুগের ছবি । এলা আর অতীন্দ্রকে বেছে নিলেন মাধ্যম রূপে ।

গুনময় মান্না বলছেন , " স্বদেশী যুগে রবীন্দ্র নাথ সমাজপতি , চরিত্র , দেশ নায়ক প্রভৃতির কথা বলেছিলেন , তারই সম্প্রসারণ এই পর্বে বলছেন পার্সন্যালিটি , পুরুষ , মহামানবের কথা । কিন্তু ইন্দ্রনাথ এসবের উল্টো দিক , কেন না ব্যক্তির বিকাশ তার লক্ষ নয় , নেতার সৃজ্যমানতা ও ব্যক্তির বিকাশমানতা এক হার্মনিতে এখানে সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হয় না – নেতা থাকেন , অনুগামী পর্সুর দল বিসর্জিত হয় । এবং বিপ্লবীর কাছে নেতার নির্দেশ আসে ' বিপথগামী ' বিপ্লবীকে সরিয়ে দেওয়ার । "

" যে অতীন অহরহ অন্তর্দ্বন্দ্বে খিন্ন , যে জানে " স্বভাবকে হত্যা করেছি , সব হত্যার চেয়ে পাপ । কোনো অহিতকেই সমূলে মারতে পারি নি । সমূলে মেরেছি কেবল নিজেকে " সেই অতীনের কাছেই আরেক দফা মারবার নির্দেশ এল – হত্যা এ টাতেই শেষ হয় না ..... সম্ভাব্য বিপথগামী এলাকে (তাকে ভয় এই যে দলের অনেক কথা সে জানে এবং ধরা পড়লে –– দলের লোক বটুই তাকে ধরিয়ে দিতে চায় – পুলিশের কাছে সব ফাঁস করে দিতে পারে) স্বহস্তে হত্যা করতে হবে । কিসের জন্য ? সেই তার নিজের দলের স্বার্থে যে দলের বিরুদ্ধে অতীনের তীব্র অভিযোগ । কাকে ? যাকে সে সমস্ত সত্তা দিয়ে ভালবাসে । " ৩৬

বিপ্লববাদের বর্ষতার গ্রন্থ ' চার অধ্যায় ' বিপ্লবীদের হাত দিয়ে জেলের মধ্যে পড়ে । প্রথমে অনেকে শংকা করেছিলেন যে বিপ্লব পন্থার ব্যাপারে লেখা ' চার অধ্যায় ' নিষিদ্ধ হতে পারে । রবীন্দ্র নাথ কিন্তু এই চিন্তা অমূলক বলে মনে করেন । বই প্রকাশিতের পর এই বই সম্পর্কে বেশ সোরগোল উঠে । রবীন্দ্র জীবনী - কার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন " বই বাহির হওয়া মাত্র দেশের মধ্যে ভীষণ একটা আন্দোলন সৃষ্টি হইল । এই বই সম্বন্ধে যে পরিমান সমালোচনা হইয়াছে তাহা ' ঘরে বাইরে ' র পর কবির অন্য কোন বই সম্বন্ধে হয় নাই । এক বৎসরের মধ্যে সকল কপি বিক্রীত হইয়া যায় । লোকে বলিতে আরম্ভ করিল গভর্নমেন্ট এই বই কিনিয়া অন্তরীণাবদ্ধদের দিতেছেন ও বিপ্লব দমনের জন্য এই বই উপযুক্ত অস্ত্র হইয়াছে । " ৩৭

সরকার পক্ষ সাধারণ ভাবে চার অধ্যায়কে ক্ষতিকর নয় উপকারীই ভেবেছিল , তা দেখা যায় মেজর সি. জি. ব্রেনানের সুপারিশগুলো থেকে । সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন দমনের জন্য ঐ ব্যক্তি ১৯৩৩ সালের ৮ই এপ্রিল কয়েকটি সুপারিশ করেন । বাংলা সরকারের রাজনৈতিক বিভাগের তৎকালীন অ্যাডিশনাল সেক্রেটারী এস.এন. রায় সি. এসকে লেখা এক পত্রে তিনি সেগুলো জানান । বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্র (প্রেস) বিভাগের গোপন ফাইলে সে তথ্য আছে । জবরদস্ত জঙ্গী ব্রিটিশ আমলাটি অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন । তিনি সন্ত্রাসবাদের সাংস্কৃতি মোকাবিলার সুপারিশ করেছিলেন । যে যে দফা ব্যাপক কর্মসূচীর প্রস্তাব তিনি করেন , তার এক স্থানে বলা হয়েছে , চার অধ্যায়কে নাট্যরূপ দিয়ে শহর গ্রামে তার ব্যাপক প্রচার ও অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হোক । মেজর ব্রেনানের সুপারিশের প্রাসঙ্গিক অংশ এই
"Arrangement have already been made for the staging of play to oppose the cult of terrorism and civil disobedience. Dr. Rabindra Nath Tagore has also recently persuaded through the Assistant Director of Public Instruction, Bengal to

dramatise one of his books Char Adhyaya' which delivers a powerful attak on the cult of terrorism. When ready copies will be distributed to district officer in the same manner as Patha-Bhrasta, and it is also proposed to make an attempt to make it staged in the first class theatre in Calcutta like Ragmahal and Natya Nikatan" ৩৮

মেজর বেনানের ফাইল থেকে এই তথ্য পাওয়া যায় 'I have asked Mr. Chande to request Dr. Tagore to dramatise the movel. Mr. Chande has agreed to do so. Sd. S. Basu 11.5.1995". ৩৯

' চার অধ্যায় ' গ্রন্থটি যখন জেলের মধ্যে পৌঁছায় , বিপ্লবীরা প্রচন্ড আঘাত পায় । চিন্মোহন সেহানবীশ তাঁর গ্রন্থ 'রবীন্দ্র নাথ ও বিপ্লবী সমাজ' এ লিখছেন " তখন সত্যিই আমরা যেন অপ্রত্যাশিত প্রচন্ড আঘাতে স্তব্ধ হয়ে ছিলাম । ঘরে ঘরে নিদারুণ বিষাদের ছায়া , চাপা সুরে সকাতর প্রশ্ন – রবীন্দ্র নাথ – আমাদের রবীন্দ্র নাথ , তিনি এই বই লিখলেন ..... এ কেমন রবীন্দ্র নাথ , তাঁর কাছ থেকে যে বিপ্লবীরা জপমন্ত্র পেয়েছিল , " ঘরের মঙ্গল শঙ্খ নহে তোর তরে , নহে প্রেয়সীর অশ্রু, চোখ ? "

' চার অধ্যায়ে 'র তীব্র সমালোচনা করলেন বিজয় লাল চট্টোপাধ্যায় (দেশ , ১১ই মে , ১৯৩০) । তিনি লিখলেন ' চার অধ্যায়ে ' কবি রবীন্দ্র নাথ

মোহান্ত রবীন্দ্র নাথের বেশে দেখা দিয়াছেন , আমলকির বনে সপ্তপনের ছায়ায় যে আত্ম ভোলা কবি মনের আনন্দে বাঁশী বাজাইতেছেন , চার অধ্যায়ে তিনি বাঁশী ফেলিয়া মেগাফোন লইয়া মনুমেন্টের পাশে আসিয়া যেন বক্তৃতা দিতে শুরু করিয়া দিয়াছেন । এই বক্তৃতায় প্রগতি মূলক জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে সুতীব্র ভাষায় গালাগালি । সাহিত্যের গড়ের মাঠে কবির এই প্রোপাগ্যান্ডিস্টের অদ্ভুত চেহারা দেখিয়া বঙ্গভারতী নিশ্চয়ই নিঃশব্দে অশ্রু মোচন করিয়াছেন । প্রোপাগান্ডার দারুণ উম্মাদনায় কবি আত্ম মর্য্যাদা পর্যন্ত ভুলিয়া গেলেন । যে অবিচলিত আত্মবিশ্বাস রবীন্দ্র নাথের কর্মকে ও চিন্তাধারাকে অপরূপ মহিমা দান করিয়াছে , 'চার অধ্যায়ে' সেই আত্ম বিশ্বাসও কবিকে পরিত্যাগ করিয়াছে। ..... তাই পুরাতন বন্ধু , সহকর্মীকে জীবনের ওপর হইতে সাক্ষ্য দিবার জন্য এপারে টানিয়া আনিতে তাঁহার কবিমন এতটুকু সঙ্কোচ বোধ করিল না । উপাধ্যায় মহাশয় আপন অন্তরের সুগভীর বেদনা হইতে যদি কোন কথা নিভৃতে বন্ধু ও সহকর্মীকে বলিয়াই থাকেন — সে কথা হাটের মাঝে প্রচার না করিলে কি চলিত না ? ..... 'চার অধ্যায়' লিখিবার সময়ে তাঁহার ভিতর হইতে শিল্পী মানুষটি অন্তর্হিত হইয়াছিল — শিল্পী আসন জুড়িয়া বসিয়াছিল সেই মানুষটি যে সমাজে বেশ করিয়া উপদেশ দেয় — ইস্কুল মাস্টার হইয়া ছাত্র পড়ায় । "

বিপ্লব পন্থায় মানুষের মনে হিংসা আনে । উপনিষদের সূতিকাগারে জন্ম - লব্ধ কবি মানুষের মিলনের বানী নিয়েই জীবন বেদ রচনা করতে চেয়েছেন । একথা সত্য । কিন্তু বিপ্লবীদের চরিত্রের একটা ঐতিহাসিক দিক আছে । সেদিক পবিত্র নিষ্ঠা ও আত্ম ত্যাগের দিক । মৃত্যু বেদীতে দাঁড়িয়ে নির্ভিক কন্ঠে জীবনের জয়গান যাঁরা গান তাঁরা ভীরু বা পথ ভ্রষ্ট নয় । জীবন তো সবাই দিতে পারে কিন্তু ভক্তি , সেই ভক্তি যে দেশ মাতৃকার তরে সঞ্চিত রেখেছি জীবনের প্রতিটি স্পন্দনে । তার মূল্য অস্বীকার করা ? এ এক হৃদয় হীনতা । সত্যের অখন্ডতার পরিপ্রেক্ষিতেই এই ধারণা এ মহাভুল । রবীন্দ্র নাথের উজ্জীবনের পদ্ধতির ভিন্ন - রূপ হতে পারে । ক্ষুদ্র করে জীবন ধারাকে দেখাও এক ধরণের সীমাবদ্ধতা ।

রবীন্দ্র নাথের নিজেকে এই সীমাবদ্ধতায় বাঁধবার সার্বিক ইচ্ছা হয় তো উঁচু ছিল না। কিন্তু সৃষ্টি সেও এক অদ্ভুত জিনিষ। বিকৃতি সুকৃতির মধ্যেই তার প্রকাশ।

নারায়ণ ভট্টাচার্য্য

নারায়ণ ভট্টাচার্য্য বাংলা সাহিত্যের রচনাকারদের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলন প্রসারের মতবাদী ছিলেন। স্বদেশী যুগে সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে যে যেমন বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন ঠিক সেই রূপ ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেদের প্রতিভার বিকাশ করার চেষ্টা করেছেন। নারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেখা 'স্বদেশী' 'জাহ্নবী' ও 'প্রবাহ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

নারায়ণ চন্দ্রের গতি সম্পন্ন উপন্যাস 'নব বিধান'। প্রকাশিত হয় ১০১৪ খ্রীষ্টাব্দে। এই উপন্যাসের পটভূমি স্বদেশী যুগ। তবুও এই আন্দোলনে লেখক তার উপন্যাসকে প্রত্যক্ষ ভাবে স্বদেশী আন্দোলনের বাহন রূপে তুলে ধরেন নি। দ্বিতীয়তঃ এই উপন্যাসে অন্যান্য কবি ও লেখকদের মতো বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতি ও গৌরব কত উন্নত ছিল তার ইঙ্গিত দিয়ে বর্তমান দৈন্যতায় কবি ব্যথিত হয়েছেন। তৃতীয়ত কবি এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে সমাজ তথা দেশকে সচেতন ও জাগ্রত করতে চেয়েছেন। পরিশেষে লেখক দুর্বল প্রজারা কিভাবে ধর্মের সহায়তায় প্রবল বিক্রমী ইংরাজের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে তার সুন্দর চিত্র এই উপন্যাসের বিষয় বস্তু।

* * * *

।। পঞ্চম অধ্যায় ।।

।। বাংলা কথা সাহিত্য ও স্বদেশী আন্দোলন ।।

।। তথ্যপঞ্জী ।।

১ । বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা , (পঞ্চম সং) পৃ : ১

২ । N.K.Sinha, Economic History of Bengal Vol II P,229

৩ । আমার বাল্যকাল ও আমার বোম্বাই প্রবাস — সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর , পৃ : ৪

৪ । উনিশ শতক : নবজাগরণ ও বাংলা উপন্যাস — বদরুল হাসান , পৃ : ৪৩

৫ । চরিত্র চিত্র , বিপিন চন্দ্র পাল , পৃ : ১৫৯

৬ । ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই — পৃ : ১৯০

৭ । Records preserved in State Archives, Writers' Building Calcutta.

৮ । ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই , পৃ : ১৯১ - ৯২

৯ । পূর্বোক্ত পৃ : ১৯২

১০ । Records preserved in State Archives, Writers' Buildings, Calcutta.

১১ । জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্র নাথ — প্রফুল্লকুমার সরকার , পৃ : ৪৮

১২ । রবীন্দ্র রচনাবলী (১০ খণ্ড , ১৩৫৭) পৃ : ৬৫৭

১৩ । রবীন্দ্র জীবনী (২য় খণ্ড) পৃ : ১৩৩

১৪ । ভারতীয় রাজনৈতিক উপন্যাস , প্রাক স্বাধীনতা পর্ব , শিশির দাশ ,
শারদীয় সংখ্যা অনুষ্টুপ , ১৯৮৬ , পৃ : ২

১৫ । পূর্বোক্ত - পৃ : ২৩

১৬ । রবীন্দ্র উপন্যাস পরিক্রমা , অর্চনা মজুমদার — পৃ : ১২৩

১৭ । সমকালীন ভারতীয় রাজনীতি ও রবীন্দ্র সাহিত্য — ডঃ জীবেন্দু রায় , পৃ : ১৭৪

১৮ । আত্ম পরিচয় , ৩য় সংস্করণ , ১৩৫৯ , পৃ : ৯৪ - ৯৫

১৯ । বিশ্ব ভারতী পত্রিকা , মাঘ - চৈত্র , ১৩৭০ , পৃ : ৩১৬

২০ । A Nationalism in the West :Nationalsim P-16

২১ । Mukherjee's Magazine P-112-113 Ref. History of Political thought - Dr. Biman Behari Majumder.

২২ । History of the Freedom Movement in India Vol-II P-55.

২৩ । রবীন্দ্র নাথ ও রাজনীতি কোন্ত , শনিবারের চিঠি , ৩৬ বর্ষ , ৪র্থ সংখ্যা
মাঘ ১৩৭০

২৪ । রবীন্দ্র উপন্যাস পরিক্রমা — পৃ : ১৩২

২৫ । রবীন্দ্র রচনার দর্শন ভূমি , মৃন্ময় মান্না — পৃ : ৪৭৪

২৬ । শিশির দাস , শারদীয় সংখ্যা , অনুষ্টুপ — পৃ : ২৩

২৭ । বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা — পৃ : ১৪৯

২৮ । বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি — পৃ : ৫৫

২৯ । রবীন্দ্র উপন্যাস পরিক্রমা — পৃ : ৬৪ - ৬৫

৩০ । শিক্ষার বাহন , প্রবন্ধ

০১ । রবীন্দ্র জীবনী , প্রভাত মুখোপাধ্যায় , ৩য় খন্ড , পৃ : ৬৫

০২ । বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি , ৫৪ - ৫৫

০৩ । Rabindra Nath Tagore Edward Thomson P-205.

০৪ । রবীন্দ্র রচনাবলী , অষ্টম খন্ড , প: সরকার , ১৯৮৬ , পৃ : ৫১৪

০৫ । রবীন্দ্র উপন্যাস পরিক্রমা , পৃ : ২৩৩

০৬ । রবীন্দ্র রচনার দর্শন ভূমি , পৃ : ৪৭৭

০৭ । রবীন্দ্র জীবনী , ৩য় খন্ড , পৃ : ৩৭৫

০৮ । ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই , পৃ : ১১৬ - ১৭

০৯ । File No 461 st. No. 1-33 Home(Press)confidential 1935, Bengal Govt.

॥ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥

- - - - - - - - -

স্বদেশী যুগ

ও

সমকালীন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের রচিত সাহিত্য

- -

॥ রাজনৈতিক পরিমন্ডল ও বঙ্গদর্শন ॥

ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী উদ্বেলিত হয়েছিল রাজনৈতিক ধারণা। ঊনবিংশ শতক প্রতিষ্ঠিত বঙ্গ ভাষা প্রকাশিকা সভা (১৮৩৬), জমিদার সভা (১৮৩৮), ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি (১৮৩৯), বেঙ্গলী ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি (১৮৪৩), ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন (১৮৫১), ভারত সভা ও জাতীয় কংগ্রেসের মাইল স্টোনগুলো একের পর এক অতিক্রম করে জনচিত্ত দুর্বার হয়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রও ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছিল। সমকালীন রাজনৈতিক পরিমন্ডলের বৈশিষ্ট্যই ছিল রাজনৈতিক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ, গণ-আন্দোলনের বিস্তার, সাহিত্য চর্চা বা সাহিত্যে রাজনৈতিক ভাবনার প্রতিফলন ও বৈদেশিক শাসনের স্বৈরাচারী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে মধ্য বিত্ত শ্রেণীর মধ্য হতে উঠে এসেছিল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। প্রথমে বাংলায় পাশ্চাত্যে শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রসারের মধ্য হতে মধ্য বিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল। এর ফলে সাহিত্যে, সংবাদ পত্রে সর্বত্র জাতীয়তাবাদের যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল তার রূপকার ছিলেন এই মধ্য বিত্ত সম্প্রদায়। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব হতেই গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন। পরাধীন দেশের একটি সার্বজনীন লক্ষ্য বা ধ্যেয় বোধ থাকে। পরাধীন ভারতে এই ধ্যেয় বোধের নাম ছিল দেশপ্রেম। পরে এই ধ্যেয়র লক্ষ্য পূর্তির নাম হলো স্বাধীনতা।

তাই ঊনবিংশ বিংশ শতাব্দীর নেতৃবৃন্দের কাজ ছিল পরাধীন জাতীয় চৈতন্য-বোধকে জাগিয়ে তোলা। এই কার্যে সকল শ্রেণীর মধ্যবিত্ত যারা যে কোন পেশায় নিযুক্ত থাকুক না কেন তাদের পেশার সাথে জড়িয়ে ছিল ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজস্ব দৃষ্টিকোণ নিয়ে পরাধীনতার হাত থেকে ভারতকে

নতুন আলোকে নিয়ে আসার পথ খুঁজেছেন। তাঁরা অনুভব করেছেন ভারতের দুর্বলতা। জাতিকে জাগাবার সঞ্জীবনী মন্ত্র তাঁদের কাছে ছিল। তাই স্বদেশ ভাবনাকে তীব্র করার প্রেরণা আত্ম তাগিদেই তাঁরা অনুভব করেছিলেন। তাঁদের রচিত গ্রন্থগুলি বহুদিন যাবৎ আপামর দেশবাসীকে জীবন জাগরণের গান শুনিয়ে এসেছিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল তাতে যেমন তদানীন্তন নেতৃবৃন্দের রচিত সাহিত্য আন্দোলন মুখী জনতাকে চলার পথের যেমন পাথেয় ছিল তেমনি এই সাহিত্য বলজয়ী হয়ে স্বাধীনতার উদ্দীপনায় ওতপ্রোত ভাবে মিশে গেল। এমন কিছু সাহিত্যিক দার্শনিক, সন্ন্যাসী বা দেশ-নেতা যারা বঙ্গভঙ্গের অব্যবহিত পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন স্বদেশী বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উদ্বেল জন সমাজের কাছে তাঁদের রচিত সাহিত্যও অনুপ্রেরণার বিষয় বস্তু হয়ে দাঁড়াল। আর যাঁরা এই আন্দোলনকে পরিচালনা করছিলেন তাঁদের রচিত সাহিত্যেও আনল জাতীয়তাবাদের প্রাঙ্গনে স্বদেশী আন্দোলনের ফল্গুধারা।

বিবেকানন্দের সাহিত্য ও স্বদেশী আন্দোলন

স্বদেশী আন্দোলন শুরু হওয়ার কিছু পূর্বে (১২০২) বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করেন। দেশের দুঃখ দুর্দশায় যিনি তীব্রভাবে কাতর হয়ে পড়তেন সেই বিবেকানন্দ বঙ্গভঙ্গের সময় বেঁচে থাকলে হয়তো স্বদেশবাসীকে পথ নির্দেশ অথবা নেতৃত্ব দান করতেন। এই রূপ মন্তব্য অনেক বিপ্লবী ও দেশ নেতা করেছেন। উনবিংশ শতকে যে জাতীয়তাবাদ উদ্দীপ্ত হয়েছিল বিবেকানন্দের প্রভাব ছিল সেই ধারায় খেত্রে তীব্র। পরাধীন গ্রস্ত নির্জীব দেশবাসীকে দেখে মাঝে মাঝে তিনি হতাশ হয়ে পড়তেন।

পরিব্রাজক জীবনে বহু মানুষের সংস্পর্শে তিনি আসেন । তাঁর মনের ভাবনা সম্পর্কে সিস্টার ক্রিস্টিনকে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে বলছেন , " বিদেশী শাসন উচ্ছেদ করার জন্য আমি ভারতীয় নৃপতিদের নিয়ে একটি শক্তিজোট তৈরী করতে চেয়েছিলাম । সেই জন্যই আমি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছি । সেইজন্যই আমি বন্দুক নির্মাতা স্যার হাইরাম ম্যাক্সিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলাম । কিন্তু দেশের কাছ থেকে আমি কোন সাড়া পাই নি , দেশটা মৃত । " ১

ভারতবর্ষ বিবেকানন্দের নিকট ছিল প্রাণের মোক্ষতীর্থ । তাঁর ভারত ছিল তাঁর সাধনার বস্তু । বিশ্বের দরবারে তাঁর ভারতবর্ষকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার জন্য তিনি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন । তিনি সমগ্র বিশ্বে ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সারা বিশ্বে হিন্দু ধর্মের প্রভাব বিস্তারের আদর্শে দেশের মৃত প্রায় জনমনকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন । মানবেন্দ্র নাথ রায় বিবেকানন্দের এই ভাবনাকে ব্যক্ত করে বলছেন "His nationalism was spiritual imperialism. He called on young India to believe in the spiritual mission of India...on which subsequently built the orthodox nationalism of the de classed young intellectuals, organised into search socities advocating violence and terrorism for the overthrow of British rule". ২

সমকালীন শিক্ষিত যুব সমাজ এই আধ্যাত্মিক বিজয়ে উদ্বেল হয়ে উঠে । বিবেকানন্দের বজ্র নির্ঘোষ বানী তাদের হৃদয়ে সাড়া জাগায় । ভারতবর্ষের সকল দুঃখের উৎসরূপে বিদেশী শাসকের ভারতের অবস্থিতি একমাত্র কারণ বলে তারা দেখেছিলেন । বিবেকানন্দের বানী শুনে তাদের মনে জেগে উঠে এক তীব্র

স্বাজাত্যাভিমান। ভারতের নৈরাজ্যবাদ ও সমাজের ক্ষণ ভঙ্গুর রূপে তাঁরা ব্যথিত ছিলেন। এই জন্যই তাঁরা পরবর্তী আন্দোলনগুলিতে ও রাজনৈতিক অভ্যুত্থানে বিবেকানন্দের বানীতে গতি খুঁজে পেয়েছিলেন। বিবেকানন্দের এই আদর্শগত ভাব - ভূমি হতে বিপ্লবীরা প্রেরণা পেয়েছিল এবং এই ভাবভূমি হতে জন্ম নিয়েছিল বিপ্লব - বাদ ও বিপ্লবীদের কর্ম প্রচেষ্টা। স্বদেশী যুগেও এর ব্যতিক্রম হয় নি।

বিবেকানন্দের তিরোধান ঘটেছিল ৪ঠা জুলাই, ১৯০২। তার এক বৎসর পর হতেই বাংলার প্রান্তর উজ্জীবিত ও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে। বিবেকানন্দের বিশ্বজয়ী প্রভাব তখনও জনমানসে প্রদীপ্ত শিখার মতো প্রোজ্জ্বল ছিল। স্বাদেশিকতার নেতৃবৃন্দ ও যুব সম্প্রদায় তাঁর রচিত 'বর্তমান ভারত' ও 'পত্রাবলী'র মধ্যে প্রেরণার উৎস ধারা খুঁজে পেয়েছিলেন।

স্বাধীনতা বা মুক্তির আকাংখা হল জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ বানী। বিবেকানন্দ এই মুক্তির উপাসক ছিলেন। বিবেকানন্দ কেবল মাত্র অতীন্দ্রিয় মোক্ষ বা মায়ার বন্ধন মোচনই চাননি, মানুষের বৈষয়িক মুক্তিও তিনি চেয়েছিলেন। বিবেকানন্দ বলতেন, " স্বাধীনতাই উন্নতির প্রথম শর্ত। যেমন মানুষের চিন্তা করিবার ও কথা বলিবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক তেমনি তাহার আহার, পোষাক, বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন — তবে এই স্বাধীনতা যেন অপর কাহারও অনিষ্ঠ না করে।" ৩ আবার অন্যত্র বলছেন সর্ব বিষয়ে স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই পুরুষার্থ। যে সকল সামাজিক নিয়ম এই স্বাধীনতার স্ফূর্তির ব্যাঘাত করে, তাহা অকল্যাণকর যাহাতে তাহার শীঘ্র নাশ হয় তাহাই করা উচিত। যে সকল নিয়মের দ্বারা জীবকূল স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়, তাহার সহায়তা করা উচিৎ।" ৪

কিন্তু বিবেকানন্দ জানতেন পরাধীন জাতির পক্ষে দৈহিক মানসিক আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব নয়। তাই ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষকে

বলেছিলেন 'India should be freed politically first.'
হৃদয়ে ছিল তাঁর পরাধীন মাতৃভূমির জন্য এক অন্তর্নিহিত বেদনা বোধ। তাই ভারতবর্ষ ছিল তাঁর "Queen of adoration, India was his day dream, India was his nightmare". ৬ ভারতছিল তাঁর একান্ত সাধনার দেবী। নিবেদিতা স্বামীজী সম্পর্কে বলেছেন " জন্ম প্রেমিক তিনি – তাঁর প্রেম পাত্রী তাঁর মাতৃভূমি।"

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ভারত অনুভূতিতে যে দ্বন্দ্বিক বিবর্তনবাদ চলেছে স্বামীজী তাকে লক্ষ্য করে চলেছিলেন। তিনি 'বর্তমান ভারত' এ বলছেন, " এক দিকে জড়বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্য, প্রভূত বল সঞ্চয়, তীব্র ইন্দ্রিয় সুখ, বিজাতীয় ভাষায় মহাকোলাহল উত্থাপিত করিয়াছে, অপর দিকে এই মহাকোলাহল ভেদ করিয়া ক্ষীণ অথচ মর্মভেদী স্বরে পূর্বদেবদিগের আর্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। সম্মুখে বিচিত্রযান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিদুষী নারীকূল, নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গী অপূর্ব বাসনার উদয় করিতেছে, আবার মধ্যে মধ্যে সেই দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া ব্রত উপবাস, সীতা সাবিত্রী, তপোবন জটা বল্কল, কাষায় কৌপীন, সমাধি আত্মানুসন্ধান উপস্থিত হইতেছে। এ দিকে পাশ্চাত্য সমাজের স্বার্থপর স্বাধীনা অপর দিকে আর্য্য সমাজের কঠোর আত্মবলিদান। এ বিষম সংঘর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত হইবে – তাহাতে বিচিত্রতা কি? পাশ্চাত্য উদ্দেশ্য – ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা – অর্থকরী বিদ্যা, উপায় রাষ্ট্র নীতি। ভারতের উদ্দেশ্য – মুক্তি, ভাষা – বেদ, উপায় ত্যাগ। বর্তমান ভারত এ বার যেন বুঝিতেছে, বৃথা ভবিষ্যত অধ্যাত্ম কল্যাণের মোহে পড়িয়া ইহলোকের সর্বনাশ করিতেছি, আবার মন্ত্র মুগ্ধবৎ শুনিতেছে: " ইতি সংসারে স্ফুটতর দোষ। কথমিহ মানব তব সন্তোষ।" ৭

'বর্তমান ভারত' 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে এটি গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয় ১৩১২ সালে, ইংরাজীর ১৯০৫ এ। তখন বাংলার প্রান্তরে স্বাদেশিকতার ঢেউ। দুর্বার বাংলার কাছে 'বর্তমান ভারত' প্রেরণা হয়ে দাঁড়ায়।

' বর্তমান ভারত' এ বিবেকানন্দ দেশবাসীকে শোনালেন পাশ্চাত্য মোহ বিসর্জন করে স্বাদেশিক ভাবাপন্ন হতে। মনের দিক হতে যে পরাণুকরণে বিশ্বাসী, পর শিক্ষায় লোভী সে জাতি স্বাধীনতা লাভ করতে পারে না। বিবেকানন্দ বলছেন –
" বলবানের দিকে সকলে যায়, গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছটা নিজের গাত্রে কোন প্রকারে একটুও লাগে – দুর্বল মাত্রেরই এই ইচ্ছা। যখন ভারতবাসীকে ইউরোপীয় বেশভূষামণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত। চতুর্দশ বর্ষ যাবৎ হিন্দুরক্তে পরিপালিত পার্সী এক্ষনে আর ' নেটিভ ' নহেন। জাতিহীন ব্রাহ্মণমন্যের ব্রাহ্মণ্য গৌরবের নিকটে মহারথী কুলীন ব্রাহ্মণের বংশ মর্যাদা বিলীন হইয়া যায়। আর পাশ্চাত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে ঐ যে কটিতট মাত্র আচ্ছাদন কারী অজ্ঞ মূর্খ, নীচ জাতি, উহারা অনার্য্য জাতি। উহারা আমাদের নহে।" ৮

বিবেকানন্দ পরঅনুকরণ বাদী ভারতবর্ষের মানুষকে দিয়ে গর্জনে শোনালেন স্বদেশ মন্ত্র।

" হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা এই দাস সুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা – এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে ? এই লজ্জাকর কাপুরষতা সহায়ে তুমি বীর ভোগ্য স্বাধীনতা লাভ করিবে ? হে ভারত, ভুলিও না – তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর, ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয় সুখের জন্য, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিও না – তুমি জন্ম হইতেই ' মায়ের ' জন্য বলিপ্রদত্ত, ভুলিও না – তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র, ভুলিও না নীচ জাতি, মূর্খ দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত তোমার ভাই। হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল

মূর্খ ভারতবাসী , দরিদ্র ভারতবাসী , ব্রাহ্মণ ভারতবাসী চন্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই , ভারতবাসী আমার প্রাণ , ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর , ভারতের সমাজ আমার শিশু শয্যা , আমার যৌবনের উপবন , আমার বার্দ্ধক্যের বারানসী , বল ভাই – ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ , ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ , আর বল দিন রাত , " হে গৌরীনাথ , হে জগদম্বে , আমায় মনুষ্যত্ব দাও , মা আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর , আমায় মানুষ কর । "

১৯০৩ এ (১লা মাঘ, ১৩১২) প্রকাশিত হলো বিবেকানন্দের ' পরিব্রাজক' । স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ এ আরেক তীব্র তরঙ্গের আবির্ভাব । সারদানন্দ ' পরিচয় ' মুখবন্ধে দেশবাসীকে আহ্বান জানালেন , " তাঁহার (বিবেকানন্দের) শ্রীমুখ হইতে যে সকল কথা শুনিলে , তাঁহার ভ্রমন উদ্দেশ্য বিহীন নহে । কিসে ভারতেবর্তমান অমানিশার অবসান হইয়া পূর্বগৌরব পুনরায় উজ্জ্বলতর বর্ণে উদ্ভাসিত হইবে – এই চিন্তা ও চেষ্টাই তাঁহার প্রতি পাদ বিক্ষেপের মূলে । আবার ভারতবর্ষের দুর্দশা কোথা হইতে আসিল , কোন শক্তি বলে উহা অপগত হইবে , কোথায় বা সেই সুপ্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে এবং উহার উদ্বোধন ও প্রয়োগের উপকরণই বা কি – এ সকল গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিয়াই যে তাহাকে ক্ষান্ত দেখিবে তাহা নহে , কিন্তু বহু পরিকর জাতি স্বদেশে - বিদেশে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া মীমাংসিত বিষয় সকলের সত্যতাও যথা সম্ভব প্রমাণিত করিয়াছেন তাহার নিদর্শনও প্রাপ্ত হইবে । বুদ্ধিমান বিদেশী তাঁহার উপদেশ কার্যে পরিণত করিয়া বলপুষ্ট হইতে চলিল , হে স্বদেশী , তুমিও কি এইবার তোমারই জন্য বহু - শ্রমে সমাহৃত সারগর্ভ সত্যগুলি হৃদয়ে ধারণ এবং কার্যে পরিণত করিয়া সফল কাম হইবে ? " ৯

কুসংস্কার জড়িত ভারতবর্ষে উচ্চবর্ণের অকারণ অহমিকা ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থাকে ক্ষণভঙ্গুর করে তুলেছিল । পরিব্রাজকে বিবেকানন্দ এদের প্রতি তীব্র

কশাঘাত করলেন। " তোমাদের পূতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে পূর্বকালের অনেকগুলি রত্ন পেটিকা রয়েছে। এতদিন দেবার সুবিধা হয় নাই। এখন ইংরেজ রাজ্যে – অবাধ বিদ্যা চর্চার দিনে উত্তরাধিকারীদের দাও যত শীঘ্র পার দাও। তোমরা শূন্যে বিলীন হও আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান হতে ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে – তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে – তাতে পেয়েছে অটল জীবনী শক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে, আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না, এরা রক্তবীজের প্রাণ সম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার বল যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিন রাত খাটা এবং কার্য্য কালে সিংহের বিক্রম। অতীতের কঙ্কাল চয়। এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যত ভারত। " ১০

'পরিব্রাজকের' বিবেকানন্দ 'সন্ন্যাসী একা যাত্রী' রূপে ভারতের মুক্তির উৎস খুঁজতেই তিনি ১৮৯৩ এ আমেরিকা গেলেন এবং সেখানে বিশ্বজয়ীর সম্মান লাভ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে দুর্বার করে তুলল। ভারতবাসী নিজেদের মধ্যে ফিরে পেল আত্ম প্রত্যয়। হীনমন্যতা দূর করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করল বীর্য-বত্তার আসনে। বিদেশীর চোখে অসভ্যদের দেশ ভারতবর্ষ বিশ্বে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত হলো। বহু বৎসরের প্রচেষ্টা যা রাজনৈতিক নেতা বা অন্য কোন গুরুবাদে বিশ্বাসী সন্ন্যাসীর পক্ষে সম্ভব হয় নি বিবেকানন্দের প্রচেষ্টায় তা সম্ভব হলো। ১৮৯৪ সালে ১লা সেপ্টেম্বর 'অমৃত বাজার পত্রিকা' মন্তব্য করল,

"He has done much more to elevate our nation in the estimation of the people of the West than what has hitherto been done by all our political leaders together."

সত্যই বিবেকনন্দ নিজেকে নিক্ষেপ করলেন ভারতের কাজে। জাগরণ চাই। তিনি জাতিকে শোনালেন অমোঘ মন্ত্র " আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারত মাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন, অন্যান্য অকেজো দেবতা এই কয়েক বৎসর ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন, তোমার স্বজাতি এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত। " সত্য দ্রষ্টা ঋষির বাক্য মিথ্যা হয় নি। এই উক্তি করেছিলেন ১৮৯৭ এ। ১৯৪৭ এ ভারত স্বাধীন হয়ে যায়।

বিবেকানন্দের 'পত্রাবলী' প্রকাশিত হতেই ভারতবর্ষ বিবেকানন্দের সত্তাকে খুঁজে পায়। জীবনের প্রতিদিনের প্রতিটি মুহূর্তের অভিব্যক্তি এই 'পত্রাবলীতে' লিখিত। কি বিষময় জীবন জ্বালা দহনে তাঁকে চলতে হয়েছে। কোন সময়ে কত সমস্যায় পড়েছেন কিন্তু পত্র দিয়ে সারা জগৎকে সজাগ রেখেছেন। ভারতের মানুষকে পত্রের মধ্য দিয়ে চাবুক কষেছেন। কখনও পথ নির্দেশ দিয়েছেন। এক একটি পত্র কোন ব্যক্তিকে প্রেরণ করা হলেও এই পত্রগুলো সার্বজনীন রূপ ধারণ করে বিবেকানন্দের মনোভাবনাকে প্রকাশ করেছে। পরম উৎসাহ ও চলার পথে অমৃত ময় আলোর প্রেরণাকারী এই পত্রাবলী জাতীয় আন্দোলন তথা বিপ্লবী আন্দোলনের অনুগামীদের আদর্শের পথের খোরাক ছিল।

আলস্য জর্জরিত ভারতের বুকে কর্ম প্রবাহ আনতে চেয়েছিলেন স্বামীজী। আলাসিঙ্গাকে লিখিত পত্রে তিনি বলছেন " ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো – মানুষ চাই, পশু নয়। প্রভু তোমাদের এই বাঁধাধরা সভ্যতা ভাঙবার জন্য ইংরেজ গর্ভনমেন্টকে প্রেরণ করেছেন আর মাদ্রাজের লোকই ইংরেজদের ভারতে বসবার প্রধান সহায় হয়। এখন জিজ্ঞাসা করি, সমাজের এই নূতন অবস্থা আনবার জন্য সর্বান্ত করণে প্রাণপণ যত্ন করবে, মাদ্রাজ এমন কতকগুলি নিঃস্বার্থ যুবক দিতে কি প্রস্তুত, যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হবে, তাদের ক্ষুধার্ত মুখে অন্ন দান করবে, সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার

করবে আর তোমাদের পূর্ব পুরুষদের অত্যাচারে যারা পশু পদবী উপনীত হয়েছে তাদের মানুষ করবার জন্য আমরণ চেষ্টা করবে ?" ১২

আরেক পত্রে স্বামীজী লিখছেন " সমাজের এই অবস্থাকে দূর করিতে হইবে ধর্মকে বিনষ্ট করিয়া নহে, পরন্তু হিন্দু ধর্মের মহান উপদেশ সমূহ অনুসরণ করিয়া এবং তাহার সহিত হিন্দুধর্মের স্বাভাবিকপরিণতি স্বরূপ বৌদ্ধধর্মের অদ্ভুত হৃদয় বত্তা লইয়া। লক্ষ লক্ষ নরনারী পবিত্রতার অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস রূপ বর্মে সজ্জিত হইয়া দরিদ্র পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতি জনিত সিংহ বিক্রমে বুক বাধুক এবং মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্তা দ্বারে দ্বারে বহন করিয়া সমগ্র ভারতে ভ্রমন করুক।" ..... তিনি ঐ পত্রেই লিখেছেন " যাও, এই মুহূর্তে সেই পার্থ সারথির মন্দিরে – যিনি গোকুলের দীন দরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি তাঁহার বুদ্ধ অবতারে রাজ পুরুষগণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, যাও, তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া যাও, এবং তাঁহার নিকট এক মহাবলি প্রদান কর, বলি – জীবন বলি, তাহাদের জন্য, যাহাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাদের তিনি সর্বাপেক্ষা ভালবাসেন, সেই দীন দরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের জন্য। তোমরা সারা জীবন এই ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ কর, যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে। এ এক দিনের কাজ নয়। পথ ভীষণ কন্টক পূর্ণ। কিন্তু পার্থ সারথি আমাদের সারথি হইতেও প্রস্তুত, তাহা আমরা জানি। তাঁহার নামে, তাঁহার প্রতি অনন্ত বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের শত শত যুগ সঞ্চিত পর্বত প্রমাণ অনন্ত দুঃখ রাশিতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দাও। উহা ভস্মসাৎ হইবেই হইবে।" ১৩

আমেরিকায় ধর্ম বিজয়ী বিশ্ব শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী শতবিধ প্রশংসার জালে আবদ্ধ হোন নি। ভারতের দুঃখ দুর্দশায় তিনি ছিলেন ব্যথিত চিত্ত। বিশ্বজয়ীর রাজ

মুকুট মাথায় পড়েও তিনি পত্রে লিখছেন " ইহা দূর হইতে পারে যদি , কেবল যদি লোকের হারানো সামাজিক স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি ফিরাইয়া আনা যায় । এখানে যে কেহ জন্মায় সেই জানে – সে একজন মানুষ । ভারতে যে কেহ জন্মায় সেই জানে – সে একজন ক্রীতদাস মাত্র । স্বাধীনতাই উন্নতির একমাত্র সহায়ক । স্বাধীনতা হরণ করিয়া লও তাহার ফল অবনতি । ..... ভগবান বড় বড় কাজ করিবার জন্য আমাদিগকে নির্দিষ্ট করিয়াছেন , আর আমরা তাহা করিব । নিজেকে প্রস্তুত করিয়া রাখো , অর্থাৎ পবিত্র বিশুদ্ধ স্বভাব , এবং নিঃস্বার্থ প্রেম সম্পন্ন হও । দরিদ্র , দুঃখী পদদলিতকে ভালবাসো , ভগবান তোমাদের আশীর্বাদ করিবেন । " ১৪

বিবেকানন্দ মুক্তি খুঁজেছিলেন মানুষের কল্যাণবোধের মধ্যেই । ঈশ্বর সৃষ্ট মানুষের প্রতি তাঁর তীব্র অনুভূতি ছিল । ধর্ম বিজয়ের পর সেই দেশভক্ত সন্ন্যাসী নিজের কর্তব্য স্থির করে রেখেছিলেন । একপত্রে তিনি লিখছেন " আমি এই যুবক দলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছি । আর শুধু ইহারাই নহে , ভারতের নগরে নগরে আরও শত শত যুবক আমার সহিত যোগ দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে । ইহারা দুর্দমনীয় তরঙ্গাকারে ভারত ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইবে – এবং যাহারা সর্বাপেক্ষা দীন হীন ও পদদলিত – তাহাদের দ্বারে দ্বারে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য , নীতি ধর্ম ও শিক্ষা বহন করিয়া লইয়া যাইবে – ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা ও ব্রত , ইহা আমি সাধন করিব এবং মৃত্যুকে বরণ করিব । আমাদের দেশের লোকের না আছে ভাব , না আছে সমাদর করিবার ক্ষমতা । পরন্তু সহস্র বৎসরের পরাধীনতার ফলে উৎকট পরশ্রী কাতরতা ও সন্দিগ্ধ প্রবৃত্তির বশে ইহারা যে কোন নূতন ভাবধারারই বিরোধী হইয়া উঠে । " ১৫

স্বামীজীর চেতনার বানী দেশ গ্রহণ করেছিল । স্বামীজী নিজেই অনুভব করলেন " আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইয়াছেন । কোন বহিঃশক্তি এখন আর ইহাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিবে না । " ১৬

স্বামীজীর মৃত্যুর পর দেশবাসী প্রত্যক্ষ করল লক্ষ লক্ষ যুবক বিবেকানন্দের এই ভাব ধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে জাতীয়তা জাগরণের যূপকাষ্ঠে প্রাণ বলিদানের জন্য এগিয়ে এল। তাঁর দেহত্যাগের পরই ভারত দেখল স্বদেশী আন্দোলন ও বিপ্লব পন্থার অভ্যুদয়। স্বাধীনতারসংঘর্ষে জীবন বলিদান করতে হলে লৌহ ইস্পাত সদৃশ দেহ চাই, চাই বজ্র বলিষ্ঠ মন। স্বামীজী বলছেন, সংগ্রামের পথ পিচ্ছিল — দুঃখ মৃত্যু এর নিত্যসঙ্গী।

> জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন ভয় কি তোমার সাজে?
> দুঃখ ভার, এ ঈশ্বর, মন্দির তাহার প্রেতভূমি চিতামাঝে।
> পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাব শ্যামা।
> চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধমান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।।

বিপ্লববাদের অভ্যুত্থানে যারা অংশীদার তাদের জীবনে সাধনার বস্তু হলো গুপ্তী মন্ত্র। তাই "Swami Vivekananda appeared to be more a political prephet than a religions leader. ১৭ বিবেকানন্দ দ্বিতীয় বার পশ্চিমী দেশ ভ্রমণ করার পর বেলুড়ে বলেছিলেন, "Bomb is what India needs to day". ১৮ ১৯০২ এ দেহ ত্যাগের পর তার এই উক্তি সত্যে পরিণত হয়েছিল। বিপ্লবী জীবনের উপর তাঁর প্রভাব ছিল তীব্র। প্রখ্যাত বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় বলছেন "Directly or indirectly the influence of Swamiji was great". As we could got get revolationary literatuse within our reach, we read the letters of Swamiji. The Dialogue between Master and Disciple by Sarat Chandra Chakraborty and Vivekananda's lectures contained in 'From Colombo to Almora'. These books used to kindle fire in our hoasts. The debt do that patriot saint is irrideemable". ১৯

একবার স্বামীজী সখারাম গণেশ দেউস্করকে বলেছিলেন "The country has become a powder magazine. A little spark may ignite it. I will see the revolution in my life time". ২০

স্বামীজীর প্রভাব সম্পর্কে বৃটিশ সরকার সজাগ ছিলেন। বিপ্লবীদের আস্তানায় বিবেকানন্দ সাহিত্য পাওয়া যেত। Political Troubles in India 1907-17- Edited by games Cambell Cass." এই গ্রন্থে বিভিন্ন গোপন রিপোর্টে জানা গিয়েছে বিপ্লবী আন্দোলনের উপর স্বামীজীর প্রভাব সম্পর্কে।

স্বামীজী সম্পর্কে ইংরেজ সরকার প্রথম থেকেই সন্দিগ্ধ ছিলেন। ১৮৯৯ সালের ৩০শে অক্টোবর স্বামীজী মেরী হেলকে এক চিঠি লেখেন। তাতে তাঁর ইংরাজ শাসনের সম্পর্কে মনোভাব প্রকাশিত। " ..... আর আমরা আরম্ভ করেছি নতুন ভারত – ভিতর থেকে নিজের শক্তিতে উত্থিত ভারত – আমরা অপেক্ষা করে আছি কী ঘটে তাই দেখতে। কোনো নতুন মতবাদে আমরা তখনই বিশ্বাস করি যখন জাতি তাকে চায় এবং জাতির পক্ষে তা সত্য বস্তু হয়। ব্রাহ্ম সমাজ প্রভৃতির কাছে সত্যের পরীক্ষা হল – প্রভুরা তার অনুমোদন করেন কি না আর আমাদের কাছে ভারতীয় বিচার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা অনুমোদিত করেন কি না আর আমাদের কাছে – ভারতীয় বিচার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা তা অনুমোদিত কি না – এর দ্বারা। লড়াই আরম্ভ হয়ে গেছে – ব্রাহ্ম সমাজও তোমাদের মধ্যে নয়, কারণ ইতিমধ্যেই ওরা শেষ হয়ে গেছে – এ লড়াই কঠিনতর, গভীরতর, আর অতি ভয়ানক।" ২১

শঙ্করী প্রসাদ বসু আরেক স্থানে এক তথ্য সন্নিবেশ করেছেন " নিজেন রেঁম আমাকে (ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত) বলেছেন স্বামীজী মিস ম্যাকলাউডের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আনবার মতলব করেছিলেন — একথা

ম্যাকলাউড স্বয়ং তাঁকে বলেছিলেন । ম্যাকলাউড নিবেদিতার প্রচুর চিঠি নিজেও রেখে দিয়েছিলেন কিন্তু অনেক চিঠি বা চিঠির অংশ রেমের সামনে বসেই তিনি ছিঁড়েছিলেন, Too political বা Too personal বলে ।" ২২

আমেরিকায় স্বামীজী ইংরেজের বিরুদ্ধে তাঁর ভাষণে সুস্পষ্ট মনোভাব জ্ঞাপন করেছেন । তাঁর এই বিবরণ পাওয়া যায় লুইবার্ক, মিসেস রাইটের লেখায়, " মানুষ যদি ঈশ্বরের প্রতিহিংসায় বিশ্বাস না করে, ইতিহাসের প্রতিশোধকে অগ্রাহ্য করতে পারবে না । ইংরেজের উপরে সেই প্রতিশোধ নামবে । তারা আমাদের গলায় পা দিয়ে চেপেছে, নিজেদের সুখের প্রয়োজনে আমাদের শেষ রক্ত বিন্দু পর্যন্ত চুষে খেয়েছে, লুঠে নিয়ে গেছে লক্ষ লক্ষ টাকা ..... আর আমাদের জনগণ সারা দেশ জুড়ে পেটে হাত দিয়ে পড়ে আছে ।" ২৩

এই সব উক্তির জন্য ' তাঁকে ছদ্মবেশী কংগ্রেসওয়ালা বলে প্রচারের চেষ্টা হয় ', দেশে ফেরার পর স্বামীজীর উপর রাজনৈতিক অভিসন্ধি আরোপ করে তাঁর পেছনে গোয়েন্দা লাগানো হয় । ২৪ স্বামীজী নিজেও জানতেন যে তাঁকে ইংরেজ সরকার নজরে রেখেছে । ১৯০১ সালে ম্যাকলাউড কে ঐ চিঠিতে তিনি লিখছেন, " মিসেস লেগেটের শেষ যে চিঠিখানি এসেছে, তার খামটাকে নির্লজ্জভাবে ছিঁড়েছে । ভারতের ডাক বিভাগ আমার চিঠিগুলো একটু ভদ্রভাবে খুলবার চেষ্টা করে না ।" ২৫

ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে আন্দোলনের প্রতিভূ হিসাবে স্বামীজীকেই সন্দেহ করতেন । " স্বামীজীর মৃত্যুর পরও তাঁর সম্পর্কে, তাঁর লেখা সম্পর্কে, তাঁর প্রতিটি সংস্থা সম্পর্কে রাজশক্তির বিরূপতা কমেনি, বরং দেশ যতই মুক্তি সংগ্রামে সক্রিয় হয়ে উঠেছে ততই তা বেড়েছে । ব্রিটিশ সরকার বুঝেছিল, এদেশে মুক্তি আন্দোলনে বিপুল প্রেরণা জোগাচ্ছে স্বামীজীর জীবনী ও বাণী । ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যে বিস্ফোরণ – তার বারুদ স্বামীজীই । একজন পদস্থ ইংরেজ রাজপুরুষ

একথা লিখেছেন । তিনি আটক বিপ্লবীদের কাছ থেকে জেনেছিলেন , যে এই সব মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা দিয়েছেন । " ২৬

Earl of Ranaldshay" লিখছেন "Suspecting nothing, I began to have closer intimacy with him and to have religious discourses with him at times. Gradualy he began to insert ideas of anarchism into my religiously disposed-mind, saying that religion and politics are inseparable and that our Paramount duty to should do good to the people of the country". The writer then tells how, he was given another book to read entitled 'Patravali', by Vivekananda and how he learnt from it what self sacrifice the author had made for the good of the country". ২৭

স্বদেশী আন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি তরুণদের আকৃষ্ট করার বিষয় ছিল বিবেকানন্দ । স্বামীজীর এই প্রভাবের কথা Sadition Committee তার রিপোর্টে লিখছে "Vivekananda died in 1902, but his writings and teachings survived him, have been propularised by the Ramkrishna Mission and have deeply impressed many educated Hindus. From much evidence before us it is apparent that this influence was perverted by Barindra and his followers in order to create an atmosphere suitable for the execution of their projects". ২৮

স্বদেশী ও বিপ্লবী যুগে স্বামীজীর লেখার প্রভাব দারুণ ভাবে বৃদ্ধি পায়। ইংরেজ সরকার বিভিন্ন গোপন ডেরায় হামলা করে বিবেকানন্দের সাহিত্য আটক করত। এমন এক সময় এসেছিল ইংরেজ গোয়েন্দারা বিবেকানন্দের পত্রাবলী বাজেয়াপ্ত করার প্রস্তাব করে।

"In the middle of 1915 Government of Bengal proposed to take action against the printer and publisher of 'Patrabali' Part I, 4th Edition of Swami Vivekananda for contravening Sec. 4(c) of Press Act, 1910. Accordingly a copy of English translation of the allgd objectionable passages of the book was sent to Sri S.R.Das, standing council for legal opinion. Sri Das after going through the whole book, gave a seven pages opinion in which he said.

I am strongly of opinion after going through the whole book that is does not contravene Sec. 4(C.O. of the Act, of 1910).

On receipt of the said opinion and on the ground that the author of the book is dead, the Government dropped the matter".

স্বামীজীর প্রবন্ধ 'উদ্বোধন' এ প্রকাশিত হলে তাও ইংরেজ সরকারের কোপ দৃষ্টিতে পড়ে।

"During his life time Swamiji published a fortnightly journal from Belur Head Quarter of Ramkrishna Mission called 'Udbodhan'. In one of its issues, which was subsequently considered highly objectionable as it appeared from a report D/December 1907, Swamiji write 'You have all been hyptonised, your ruler tell you that you are low, subjucated and weak and what you believe to be true. I am made of earth of this country but I have not learnt to think myself like that, so those people who used do look down upon us, by God's will respecting me like God. Peping can not lead man into salvation. What is wanted is a keen aged sword and a war to death". ৩০

বিপ্লবী আন্দোলনের পুরোধা কালীচরণ ঘোষ বলছেন, 'স্বামীজীর ভাববার কথা' ইংরেজদের কোপ দৃষ্টিতে পড়ে। পুলিশ ঐ বই বহু জায়গা হতে বাজেয়াপ্ত করে। কালীচরণ ঘোষ লিখছেন " এই নিষিদ্ধ পুস্তিকা সম্বন্ধে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। সকল ক্ষেত্রেই গ্রন্থকার, প্রকাশক প্রেসের মালিকদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা করা হয়েছে তা নয়, কেবল মাত্র সরকারী গেজেটে ছাপিয়ে এদের প্রচার বন্ধ করা হয়েছে, তারপর পুলিশ দেখতে পেলেই বাজেয়াপ্ত করেছে, মালিক ধরে টানাটানি করেছে, আর যাদের উপর রাজনৈতিক কারণে সরকার সন্দেহ পোষণ করতো বা কোনও ঘটনা সম্পর্কে থানা তল্লাসী করতে যেত সেখানে এই সকল সাহিত্য সন্দেহ ভাজন ব্যক্তির চরিত্র সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা গাড়তে করেছে এবং তদনুপাতে তাদের অপরাধের গুরুত্ব সপ্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে। কোন একটা ছেলে পড়ায় 'স্বদেশী' করে সুতরাং হয়তো ষড়যন্ত্রের

পরামর্শে পুলিশ তার গতিবিধি লক্ষ করতে লাগল। খাতায় নামও উঠে গেল। তারপর পুলিশ তার বাড়ী তলাসী করলো, অন্যকিছু অর্থাৎ বোমা, বন্দুক রিভলভার, তরোয়াল, রামদাও, ছোরা, গুপ্তি, সড়কী — এমনকি এক গাছি লাঠিও না পেলেও যদি গীতা, আনন্দমঠ, স্বামীজীর 'ভাববার কথা', গিরিশ চন্দ্রের 'সিরাজদৌলা', দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণা প্রতাপ' প্রভৃতি কিছু পেয়ে থাকে তাহলে অন্ততপক্ষে থানায় টেনে নিয়ে হয়তো দু'চারটে গোঁত্তা রুদ্দা, ঘুঁষি, চড় দিয়ে এবং কুটুম্ব সম্পর্কিত মিষ্ট বচন প্রয়োগে থানায় গারদে আটক করে রেখেছে, 'সদর' থেকে 'টিকটিকি' পুলিশ এসে পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্বানুসন্ধান এবং প্রশ্নবানে জর্জরিত করে তারপর হয়তো বা ছেড়ে দিয়েছে, আর নয়তো বিনা বিচারে বন্দী করে জীবনের বহু অমূল্য সময় নষ্ট করে দিয়েছে।" ৩১

ইংরেজ পুলিশ রামকৃষ্ণ মিশনকেও সন্দেহ করত বিপ্লবী আন্দোলনের যোগ - সূত্র হিসেবে। "There are indications that the Mission and its followers were connected with the revoluqtionary upheaval in India which has convulsed the student community in Bengal and extended its influence in and Native States". ৩২
স্বামীজীর মৃত্যুর পর স্বামী ব্রহ্মানন্দ সভাপতি হলেন। তাঁর সম্পর্কেও ইংরেজদের সন্দেহ ছিল "After the death of Swamiji in 1902 Swami Brahmananda became the president and head of the Ramkrishna Mission all ove India and outside.

These Mission aries are suspected of preaching Swaraj and Brahamananda alias Rakhal Ghose has been described as leader of these men".

বিমান বিহারী মজুমদার বলছেন "যুগান্তর গোষ্ঠীর কর্ম পরিষদের সদস্য হরিকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন যে স্বামীজীর অনুপ্রেরণা পূর্ণ শিক্ষা ছাড়া বিপ্লব আন্দোলন যে রূপ নিয়েছে , তা নিতে পারত কিনা সন্দেহের ব্যাপার । " ৩৪

তিনি আরও বলছেন Romains Rolland rightly holds that Vivekananda's non Vedantalism spread like burning alcohol in the veins of the intoxicated nation". ৩৫

বিপিন চন্দ্র পাল (১৮৫৮ - ১৯৩২)

বিশ শতকের গোড়ায় বাংলার প্রান্তরে যে প্রবল প্রবাহ দেখা গেল যা গঙ্গার তীব্র স্রোতকে মথিত করে পদ্মা মেঘনা বুড়িগঙ্গাকে হিল্লোলিত করেছিল এবং যার ঢেউ এর তীব্রতায় দুর্মদ ইংরাজ শাসক গোষ্ঠী পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল সেই বিস্ফোরণ এর নাম বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলন । ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম সুসংহত সঙ্ঘবদ্ধ আদর্শবাদী বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতার সংগ্রাম । আর এই স্বাধীনতা সংগ্রাম ' লাল - বাল - পাল ' এর যে ঐক্যবদ্ধ রূপ যা ভারতের জনচিত্তে এক স্থায়ী আসন গ্রহণ করেছিল বিপিন চন্দ্র পাল ছিলেন সেই আন্দোলনের পটভূমিতে স্বকীয়বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল ।

" সমকালীন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে তাঁকে স্বদেশী যুগের স্বাধীনতার সাধকদের মধ্যে সর্বাগ্রগন্য বললে অত্যুক্তি হয় না । রবীন্দ্র নাথের

উক্তি অনুসরণে বলা যায় , বিংশ শতাব্দীর উষা কালে ভারতে রাজনৈতিক আকাশে বিপিন চন্দ্র ছিলেন ' ভোরের পাখি ' । তাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বরকে আশ্রয় করেই নব্য জাতীয়তাবাদ এবং যৌগিক স্বাদেশিকতার নব্য ভাবধারা ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত প্রচার লাভ করেছিল । আর তাঁর সেই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর অনর্গল লেখনী । " ৩৬

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা বিপিন চন্দ্রকে বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্থাপন করল । তিনি এই নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন । বিনয় কুমার সরকার বলছেন , " বিপিন চন্দ্র শুধু গলার জোরে বাংলা , মাদ্রাজ , বোম্বাই , পাঞ্জাবকে যুক্ত করেন নি , বিদ্যায় , রাষ্ট্রনীতি , জ্ঞানে , দার্শ - নিকতায় , বিপ্লবযুগে কর্তব্য নিষ্ঠায় বিপিন পালের ঠাঁই ছিল উঁচু ..... বঙ্গ বিপ্লবের জন্মদাতা নেতা । " ৩৭

বিপিন চন্দ্র পাল জাতীয় জীবনে স্মরণীয় নেতাদের সম্পর্কে আসেন । ১৮৮৭ কংগ্রেসের মাদ্রাজের অধিবেশনে তাঁকে প্রথম দেখা যায় । তখনও তাঁর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্য অটুট ছিল । তিনি বলছেন "I was a democrat, democrat of democrats, a radical of radicals, yet I said that neither my democracy nor my radicalism took away in the least measure from my loyalty to the British Government". ৩৮

তিনি ' নিউ ইন্ডিয়া ' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন ১৯০১ সালে । এর আগেও ' ইন্দু প্রকাশ ' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে । অরবিন্দের চরমপন্থী ও বিপ্লবী চিন্তার প্রকাশ ' ইন্দু প্রকাশ ' এ (১৮৯০ - ৯৪) দানা বেঁধেছে । এর মধ্যে ১৯০০ বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব পেশ হলো । বিপিন চন্দ্রের ইংরাজ আনুগত্যে প্রচণ্ড ধাক্কা খেল । নিউ ইন্ডিয়া ' সংস্কৃতির পথ পরিবর্তন করে ইংরেজ নাগপাশ হতে মুক্তির

বজ্রগর্ভ বানী প্রকাশিত হতে লাগল , ভারতবর্ষ তখন উত্তাল । কংগ্রেসের অনুসৃত ' নরম পন্থী ' নীতিতে জাতি বিরক্ত । নবীন প্রজন্মের দল স্বাধিকারের বানীতে উদ্বুদ্ধ । বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদ ও তিলকের নেতৃত্বে মুক্তির আন্দো - লনে যুব সমাজ অনুপ্রাণিত । দেশ তখনও স্বাধীনতার হাওয়া উঠেনি । বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলনের জন্ম দিল । বিপিন চন্দ্র পাল বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনকে শুধু মাত্র অর্থনৈতিক দিক থেকে সাময়িক উপায় হিসেবেই দেখেন নি , মুক্তি সংগ্রামের অস্ত্র রূপে দেখতে চেয়েছিলেন । সেই সঙ্গে তিনি চাইলেন ইংরেজের গড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিহার করে দেশ তার জাতীয় চেতনার ভিত্তি মূলে স্বদেশী শিক্ষা ও শিক্ষালয়ের প্রবর্তন ।

বঙ্গভঙ্গ চলাকালীন সময়ে কার্জন থিয়েটারে বয়কটের পক্ষে জনসভা হচ্ছিল । হাজার হাজার লোকের সামনে বিপিন চন্দ্র বললেন , " যতদিন পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ রদ না হয় , ততদিন কি আপনারা বৃটিশ পণ্য দ্রব্য বয়কট করে যেতে পারবেন ? " সমস্বরে শ্রোতৃবৃন্দ চীৎকার করে উত্তর দিলেন " বয়কট চিরকালের জন্য । " ৩৯

স্বদেশী যুগে কার্লাইল সার্কুলার ' এর মাধ্যমে ছাত্র আন্দোলনকে স্তব্ধ করার প্রচেষ্টা চলছে । ২৪শে নভেম্বর ফিল্ড য়্যান্ড য়্যাকাডেমি 'র মাঠে জনাব আবদুল রসুলের সভাপতিত্বে এক বিরাট ছাত্র সভায় ভাষণ দিবার সময় বিপিন চন্দ্র আহ্বান জানালেন , " তোমরা মায়ের নামে প্রতিজ্ঞা করেছ এবার পরীক্ষা দেবে না । আবার দ্বিধা করছ কেন ? সেদিন গোল দীঘিতে যখন নিজেরা বলেছিলে আমরা 'গোলাম খানা ছাড়ব ' তখন কার কথা শুনে বলেছিলে ? আজ যদি এই ' রাজার মাঠে ' দাঁড়িয়ে দৃঢ়ভাবে বল " আমরা এখানে দাঁড়ালাম , ওখানে আর যাব না , সেখানে To Let লেখা হয়েছিল , সেখানে আমরা যাব না , দৃঢ়ভাবে যদি একথা বলতে পার , তবে স্বদেশী বিদ্যালয় হবেই হবে । অন্য পন্থা নাই । ..... পড়াশুনা ছেড়ে দল বেঁধে মুখে বল ' বন্দেমাতরম ' , আর প্রাণে মায়ের অভয় নিয়ে যাও — বরিশালে যাও , যাও মাদারিপুরে যাও , যাও ফরিদপুরে

যাও । যেখানে গুর্খা গিয়েছে সেখানে যাও , যেখানে ওর্খা যায় নি সেখানে যাও । গিয়ে গ্রামে গ্রামে ' বন্দেমাতরম ' রব তুলে দাও । " ৪০

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের প্রবক্তা ছিলেন বিপিন চন্দ্র । তিনিই এর প্রথম উদ্গাতা । "Our method is Passive Resistance, which means an organised determination to refuse to render any voluntary and honourary service to government." ৪১
আরেকস্থানে তিনি এই প্রসঙ্গে বলছেন "Passive Resistance is not non-active, but non agressive resistance, we stand upon our rights. We stand within the limits of law that we have still in the country." ৪২

বিপিন চন্দ্র স্বদেশী আন্দোলনকে শুধুমাত্র একটি কৌশল রূপে দেখেন নি । জাতীয় সংগ্রামকে ও জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য এটিকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ রূপে গণ্য করতেন । তিনি কলকাতা কংগ্রেসে (১৯০৬) মন্তব্য করছেন , "It is impossible to work out a divorce between politics and economics, politics and industrial advancement in India, Swadeshism associates itself with politics it becomes boycott, and this boycott is a movement of passive resistance. ৪৩

বিপিন চন্দ্র স্বরাজের স্বরূপকে সঠিক ভাবে নির্ণয়ের চেষ্টা করেন । তিনি স্বরাজ বলতে জনগণের স্বরাজ বুঝতেন । তিনি এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করছেন "The ideal of Swaraj that has revealed itself to us is the ideal of Divine Democracy. It is the ideal of democracy higher than the fighting, the pushing, the materialistic, I was going to say, the cruel democrasies of Europe and America.

This is a higher message still. Men & Gods, and the equality of the Indian Democracy is the quality of the divine nature, the divine possibilities and the divine destiny of every individual being. " ৪৪

নব জাগ্রত জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য ছিল স্বদেশ প্রেম । ইংরেজি প্রতিশব্দ ছিল Patriotism. । বিপিন চন্দ্র স্বদেশ প্রেমের বা প্যাট্রিয়টিজম এর প্রবক্তা ছিলেন । কিন্তু সেই স্বদেশ বোধ ইউরোপীয় চিন্তা হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের ছিল । ইউরোপের প্যাট্রিয়টিজম অন্যের অন্ন গ্রাস করে নিজের দেশ সমৃদ্ধ করার ভাবনা ছিল । কিন্তু ভারতবর্ষে এই ধারণা ছিল না । বিপিন চন্দ্র ইউরোপের Patriotismকে সংশোধন করে তার ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন । এই প্রেরণা বশে স্বদেশী আন্দোলনের উত্তপ্ত দিন গুলোতে তিনি ১৯০৬ , ১৬ই অক্টোবর ' বন্দেমাতরম ' পত্রিকায় জাতীয় দিবস পালনের জন্য দেশবাসীকে বলেন " আমরা এই দিনটিকে সেই স্বাদেশিকতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করি যা মানবতার মধ্যে চরিতার্থতা সন্ধান করি । আমরা এই দিনটিকে সেই মানবতার উদ্দেশ্যেও উৎসর্গ করি , যে মানবতা মানুষের কাছে ঈশ্বরের শাশ্বত প্রকাশের নামান্তর । "

এই বিপিন চন্দ্র পাল যখন কারাগৃহ হতে মুক্তি লাভ করে বেরিয়ে এলেন অরবিন্দ ঘোষ ' বন্দেমাতরম ' এ লেখেন " আমরা আজ বিপিন চন্দ্র পালকে নয় ঈশ্বর দত্ত বানীর প্রবক্তাকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানাচ্ছি , মানুষটিকে নয় , জাতীয়তাবাদের বানীর মূর্তিমান কন্ঠকে । .... তাকে স্বাগতম , বারবার স্বাগতম । "

স্বদেশী যুগে বিপিন চন্দ্র যে ভাবে আন্দোলন পরিচালনা করেছেন ঠিক সেই ভাবে জনসাধারণের চিন্তাশক্তিকে প্রাণবন্ত করার জন্য তিনি সাহিত্য রচনায়

বৃতী হয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্য রচনার পরিধি সর্ব বিষয়ে যুক্ত ছিল। তদানীন্তন আন্দোলন ভাবনা ও আদর্শ নিয়ে অনেকপ্রবন্ধ রচনা করেন। এগুলো (১) রাজধর্ম (২) প্রশ্নোত্তর (৩) আমাদের ভলান্টিয়ার দল (৪) রাজাপ্রজা (৫) বঙ্গচ্ছেদ বর্গের অবস্থা (৬) বঙ্গচ্ছেদে বর্গের ব্যবস্থা (৭) জাপান ও হিন্দু আসীয় সাধনা (৮) মায়ার পথ ও মুক্তির পথ (৯) স্বদেশী বা পেট্রিয়টিজম (১০) নেশন বা জাতি (১১) শিবাজী উৎসব (১২) শিবাজী উৎসব ও ভবানী মূর্তি (১৩) আগামী কংগ্রেসের প্রধান সমস্যা (১৪) আবেদন - আন্দোলন (১৫) রাজভক্তি (১৬) কংগ্রেসের কথা (১৭) ইজ্জৎ (১৮) ডিপ্রেসড ক্লাসেস মিশন (১৯) স্বদেশী ও বয়কট (২০) রাখীবন্ধন (২১) পাশ্চাত্য গণতন্ত্রতা (২২) ভারতের ভবিষ্যৎ ও লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসন নীতি (২৩) আমাদের রাষ্ট্রীয়ত্ব মতবাদ (২৪) হিন্দু - মুসলমানের মিলন (২৫) হিন্দু মুসলিম আর্তাত, ইত্যাদি। এই প্রবন্ধ গুলির মধ্যে অনেকটি বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলনের কালে লিখিত (১৯০৫-১৯১০)। বাকী গুলো ১৯১১ সালের পরের লেখা।

১৯০৫। ইংরাজ সরকার বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তে অটল। বাংলা জুড়ে এক অনিশ্চয়তা। এই পটভূমিকায় তাঁর রচনা 'রাজধর্ম' প্রকাশিত হলো 'ভান্ডার' পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায়, সাল ১৩১২ (ইং এপ্রিল-মে, ১৯০৫)। বাংলার প্রজাশক্তি ইংরাজের বঙ্গবিভাগ সিদ্ধান্তে বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ। প্রজার সাথে শাসকের সংঘর্ষ উপস্থিত। এই পরিস্থিতিতে তিনি 'রাজধর্ম' লিখলেন "প্রজাশক্তিহইতেই রাজশক্তি র উৎপত্তি হয়। প্রজা যদি রাজ আধার হইতে আপনার বিপুল শক্তি রাশি প্রত্যাহার করে, রাজার পক্ষে মুহূর্ত কালের জন্যও শাসন দন্ড ধারণ করা অসাধ্য হয়ে উঠে। ..... প্রজাও আত্ম প্রয়োজনেই রাজার সৃষ্টি করে। আত্ম - রক্ষা ও আত্মোন্নতির সুব্যবস্থা করিবার জনাই প্রকৃতি পুঞ্জ আপনাদিগের স্বাভাবিক স্বাধীনভাবে সন্তুষ্ট চিত্ত করিয়া রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা ও তাহার বশ্যতা স্বীকার করে।"

তাই বিপিন চন্দ্র পালের অভিব্যক্তি " রাজা আপনার সুখ ভোগ বা সুখ অন্বেষণে নহে , কিন্তু প্রজার কল্যাণ সাধনে রাজার সমুদয় শক্তিকে নিয়োজিত করিবে ইহাই সনাতন রাজধর্ম । প্রজার প্রয়োজনাতিরিক্ত বিষয়ে রাজশক্তি প্রযুক্ত হইলেই রাজধর্মের ভীষণ ব্যভিচার ঘটিয়া থাকে এবং এই ব্যভিচার নিবন্ধন ক্রমে প্রজাধর্মও বিলোপ প্রাপ্ত হয় এবং সমাজ মধ্যে অত্যাচার , অবিচার , উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিপ্লবাদি আনয়ন করিয়া থাকে । " তিনি রাজধর্মের স্বরূপের উদাহরণ দিয়ে বলছেন , " বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া বৃক্ষ যেমন আপনার সমুদয় জীবনী শক্তিকে বীজ - রূপে পরিণত করিয়াই কৃতার্থ হয় , সেইরূপ বিপুল প্রজাশক্তি হইতে প্রচ্ছন্ন ভাবে উৎপন্ন রাজশক্তিও পরিস্ফুট ও পরিপক্ক আকারে পুনরায় সেই প্রজা মন্ডলীতেই প্রত্যাবর্তন করে । এইরূপে রাজশক্তি সাক্ষাৎ ভাবে প্রজাপুঞ্জে প্রত্যার্পিত হইলেই রাজধর্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় । "

এই আন্দোলন সময়ে বিপিন চন্দ্র পালের ' রাজা ও প্রজা ' প্রবন্ধটি ' বঙ্গদর্শনে 'র আশ্বিন সংখ্যায় (সেপ্টেম্বর - অকটোবর , ১৯০৫) প্রকাশিত হয় । তদানীন্তন সময়ে ইংরেজ শাসনের উদার নৈতিক চরিত্র ও গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা সম্পর্কে লোকের মোহ ভাঙতে শুরু করেছে । লোকে অনুভব করছেন ইংরাজ শাসনের প্রকৃত চরিত্র ভেদবুদ্ধি ও স্বৈরাচারিতা । একে আশ্রয় করেই তাদের শাসন ব্যবস্থা । বিপিন চন্দ্র ' রাজা ও প্রজা ' য় এই ভাবনা সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছেন " আজও যদি আপনার স্বার্থ রক্ষার জন্য সে উদারতা আবশ্যক মনে করিত ইংরেজ প্রাণ পনে তাহা অবলম্বন করিয়া চলিত । কিন্তু আজ ইংরেজ ভারতে অভয় পদ পাইয়াছে । প্রজামন্ডলী দুর্বল , নিঃস্ব , নিরস্ত্র ও নির্বীর্য হইয়া পড়িয়াছে । ইংরেজের আধুনিক অত্যাচার - প্রবণতা ভারতের প্রকৃতি পুঞ্জের নিশ্চেষ্টতা ও বীর্যহীনতারই প্রতিফল । " অধীনস্থ প্রজার উপর অত্যাচার করা যেন সার্বজনীন । বিপিন চন্দ্র বলছেন , " ইংরেজ আজ যাহা করিতেছে , তাহার মূল মানব প্রকৃতির মধ্যে । ইংরেজ আমাদের প্রতি যে ব্যবহার করিতেছে , তাহার স্থলাভিষিক্ত হইলে আমরাও আমাদের অধীনস্থ জনমন্ডলীর প্রতি ঠিক তাহাই করিতাম । " তিনি

উদাহরণের সাহায্যে বলছেন , " জাপানের মহত্ত্বে , জাপানের সংযমে ও আত্ম - ত্যাগে , জাপানের ধর্ম ভীরুতায় আজ জগৎ বিমুগ্ধ , বিস্মিত , নতশির হইয়া তাহাকে ধন্যবাদ করিতেছে । কিন্তু এই জাপান যদি দ্বিশতবর্ষাধিকালে ইংরেজের মত একটা বিরাটাকার নির্বীর্য জাতির উপরে অপ্রতিহত প্রভাবে রাজনৈতিক অধিকার ও আধিপত্য ভোগ করিতে সমর্থ হয় , তবে তাহার এ সদগুন বেশীদিন কখনই টিকিয়া থাকিবে না । তাই ইংরেজকে যেমন বুঝিতে হইবে যে প্রজা শক্তি-র আনুকূল্য লাভ ব্যতীত ভারতের তাহার প্রভুত্ব হইতে পারিবে না , সেইরূপ ভারতের প্রজা সাধারণকেও ইহা বুঝিতেহইবে যে তাহাদের আত্মশক্তি জাগ্রত , সংহত ও যথাযোগ্য বিষয়ে প্রযুক্ত না হইলে এ দেশে ইংরেজ প্রভুশক্তি কদাপি জাতীয় জীবনের চরিতার্থতা সম্পাদনের সহায় হইতে পারিবে না । "

বঙ্গভঙ্গের পটভূমিতেই তার দুটি প্রবন্ধ ' বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের অবস্থা ' (বঙ্গ দর্শণ , কার্তিক , ১৩১২ , অক্টোবর - নভেম্বর ১৯০৫) ও ' বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের ব্যবস্থা ' (বঙ্গ দর্শণ , অগ্রহায়ণ , ১৩১২ , নভেম্বর - ডিসেম্বর , ১৯০৫) প্রকাশিত হলো । বিপিন চন্দ্র বঙ্গভঙ্গের উত্তাল তরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন । তিনি একদিকে ছিলেন এই আন্দোলনের পথিকৃৎ অন্যদিকে এর স্থিতধী ভাষ্য - কার । তিনি পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে ' বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের অবস্থা ' প্রবন্ধে বলছেন , " বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে সচরাচর যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইয়া থাকে , তাহা অধিকাংশ স্থলেই আমার নিকট অলীক ও অসার বলিয়া মনে হয় । সাক্ষাৎ - ভাবে এই বঙ্গবিভাগের দ্বারা আমাদের মানসিক বা নৈতিক বা অর্থগত বা সমাজগত কোন বিশেষ অনিষ্ট পাতের আশংকা আছে , ইহা আমি মনে করি না । " তিনি প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করে ক্ষতির দিক সম্পর্কে অবহিত করছেন , " আসল কথাটা এই যে ইহা দ্বারা ইংরেজ এমন এক স্থানে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যোগী হইয়াছে , যাহার উপরে আমাদের সকল ভবিষ্যৎ উন্নতি ও মুক্তি নির্ভর করিতেছে । এই প্রস্তাবের দ্বারা ইংরেজ রাজ আমাদের নবোন্মেষিত জাতীয় জীবনের

কেবল যে সেলব পল্লবে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে , তাহা নহে , কিন্তু তাহার মূলে একেবারে আপনার সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা চালাইবার চেষ্টা করিতেছে । " বিপিন চন্দ্র অভিমত প্রকাশ করে বলছেন , " বঙ্গ বিভাগ কেবল বাংলা নহে , কিন্তু সমগ্র ভারতের নবোন্মেষিত জাতীয় জীবনের উপরে বিষম কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে । "

' বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের অবস্থা ' প্রবন্ধে তিনি বাংলা ভাগ করার পর যে বাস্তবিক অবস্থা ও পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার বিবরণ দিয়েছেন । আর ' বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের ব্যবস্থা ' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি ব্যবস্থার পথ দেখিয়েছেন । বিপিন চন্দ্র মনে করেন বঙ্গের আয়তন বিশাল বলে বঙ্গভঙ্গ হয় নি , " ইহার মূলে গভীর , কুটিল রাজনীতি বিদ্যমান রহিয়াছে । রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইংরাজ এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে , সহজে কদাপি ইহা হইতে বিরত হইবে না । " তিনি মনে করেন এই বিচ্ছেদের কারণ হিন্দু মুসলমানে অনৈক্য সৃষ্টি করা । প্রথমত যে সূত্রে হিন্দু মুসলমানে বিবাদ হইবার সম্ভাবনা তাহা নষ্ট করিয়া দিতে হইবে । ইহার একসূত্র সরকারী চাকুরি , অপর সরকারী অবৈতনিক সম্মানার্হ পদ ও খ্যাতি । এই দুই লোভ যদি জয় করিত তবে ইংরেজ শত চেষ্টা করিয়াও আমাদিগের মধ্যে কোন বিরোধ উৎপন্ন করিতে পারিবে না । " তিনি হিন্দু - মুসলমানের নিকটে আসা প্রসঙ্গে বলছেন , " হিন্দু দিগের মধ্যে মুসলমানের এবং মুসলমানের মধ্যে হিন্দু সাহিত্য ও সাধনার সম্যক প্রচার করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ভদ্র মণ্ডলীকে পরস্পরের প্রণিধান করিতে হইবে । বিদেশীয় পণ্য ব্যবহার হইতে বিরত হইয়া বঙ্গ বিভাগ নিবারণের যে চেষ্টা হইয়াছে , তাহাকে সর্ব প্রযত্নে জাগাইয়া রাখিতে হইবে । "

' স্বদেশী বা পেট্রিয়টিজম ' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ' বঙ্গ দর্শন ' এ চৈত্র , ১৩১২ সংখ্যায় । ' শ্রী: ' ছদ্ম নামে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল । পরের বৎসর ১৩১৩ সালের আষাঢ় ও শ্রাবণের ' বঙ্গ দর্শনে ' বিপিন চন্দ্র পালের নামে ' নেশন

বা জাতি ' শিরোনামায় প ূর্ব প্রবন্ধের অন ুবৃত্তি রূপে প্রকাশিত হয় । তিনি এই প্রবন্ধে বলছেন " যে ভাব ও আদর্শকে আমরা এখন স্বদেশী নামে নির্দেশ করিতেছি , তাহা এদেশে নিতান্তই ন ূতন । ..... ইংরাজীতে ইহাকে পেট্রিয়টিজম বলে । ... এ বস্ত ু প ূর্বে আমাদের দেশে ছিল না , আমাদের ভাষায় ইহার নাম নাই । " তিনি বলছেন " য ুরোপে গ্রীকেরা পেট্রিয়টিজমের আদি গ ুর ু ছিলেন । গ্রীক সমাজতন্ত্রের মধ্যে এই অপ ূর্ব স্বদেশচর্যের বীজ নিহিত ছিল । " বিপিন চন্দ্র বলছেন , " হিন্দ ু বৈশিষ্টকে উপেক্ষা ও চ ূর্ণ করিয়া নির্বিশেষ ভাবে তত্ত্ব বস্ত ুকে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছে । সকল জাগতিক সম্বন্ধকে অলীক বা মায়িক বলিয়া উড়াইয়া দিয়া হিন্দ ু জগদতীত ও মায়াতীত , নির্গ ুন নির্বিশেষ চৈতন্য বস্ত ুর অন্বেষণে গিয়াছে । গ্রীক সে পথে যায় নাই । হিন্দ ু ম ুখ্যত নির্গ ুনবাদী , গ্রীক ম ুখ্যত সগুণবাদী । গ্রীক জগতের সম্বন্ধ সম ূহকে একান্ত অবলম্বন ও আশ্রয় করিয়া তাহার উপরে সমাজ ও রাষ্ট্র গড়িয়া ত ুলিয়াছে । হিন্দ ু সম্বন্ধকে উপেক্ষা করে নাই , কিন্ত ু এই সকল সম্বন্ধের মধ্যে সকলে সম্বন্ধের আধার ও অবলম্বন রূপে তত্ত্ববস্ত ুকে পাইতে প্রয়াস পাইয়াছে । এখানেই গ্রীক ও হিন্দ ুর মধ্যে বিশাল প্রভেদ দাঁড়াইয়া যায় । " তাই বিপিন চন্দ্র পালের ভাষায় " ভারতের ধর্ম যেমন সনাতন , গ্রীসের স্টেট সেইরূপ সনাতন বস্ত ু । ভারতে ধর্মের শাসনে , ধর্মের চর্চা করিয়া জীবনের সফলতা লাভের চেষ্টা করিয়াছে । গ্রীসে স্টেটের শাসনে , স্টেটের চর্চা করিয়া আপনার সম ুদয় শক্তিসামর্থের সার্থকতা সম্পাদনের চেষ্টা করিয়াছে । এই স্টেট রাজনীতির ম ূল । স্টেটের মধ্যে বিবিধ ব্যক্তির ব্যষ্টিভাবে ব্যক্তি সকলের পরস্পরের সঙ্গে ও সমষ্টিভাবে ঐ স্টেটের সঙ্গে যে সম্বন্ধ তাহাই রাজনীতির বিষয় । এই সকল সম্বন্ধের মধ্য দিয়া জীবনের সফলতা লাভ করিবার চেষ্টা হইতেই গ্রীসে পেট্রিয়টিজমের জন্ম হয় । "

বিপিন চন্দ্র পালের জীবনীকার শিবদাস চক্রবর্তী বলছেন যে এই প্রবন্ধ প্রকাশ হওয়ার পর ইন্দ্রনাথ দেব শর্মা ও অজিত ক ুমার চক্রবর্তী ঐ প্রবন্ধের বক্তব্য সম্পর্কে কিছ ু প্রশ্ন উত্থাপন করেন । ৪০ এঁদের প্রশ্নের উত্তরেই বিপিন চন্দ্রের 'নেশন বা জাতি' শীর্ষক প্রবন্ধটি ' বঙ্গ দর্শনে 'র পর পর দ ুটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয় । তিনি ' নেশনে 'র ব্যাখ্যা করে বলছেন , " নেশন হইতে গেলেই জগতের

অপরাপর মানব সমষ্টি হইতে পৃথক হইয়া দাঁড়াইতে হয় । এই পার্থক্য , এই পরিচ্ছিন্নতা , এই স্বাতন্ত্র্য ব্যতীত জাতি বা নেশনের উৎপত্তি অসম্ভব । .... অপর নেশনের সর্ঙে ভেদ আর নিজের নেশনের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যথা সম্ভব অভেদ ও একাত্মতার প্রতিষ্ঠা নেশন গঠনের মূলতন্ত্র । " রবীন্দ্র নাথের দেশ প্রেমের ধারণা হতে বিপিন চন্দ্রের ধারণার পার্থক্য ছিল । রবীন্দ্র নাথ বিশ্বপ্রেমের ভিত্তির উপর স্বদেশ প্রেমকে বসিয়ে ছিলেন । বিপিন চন্দ্র স্বদেশ প্রেমের ভিত্তির উপর বিশ্বপ্রেমকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন । তাই তিনি ' নেশন বা জাতি ' শীর্ষক প্রবন্ধের দ্বিতীয় সংখ্যায় বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন " নেশন অভিমান হইতেই দেশচর্য বা পেট্রিয়টিজমের উৎপত্তি হয় । সকল মানুষই সমান – এক অর্থে ইহা অত্যন্ত সত্য – সত্যই জাতিগত , বর্ণগত , দেশগত , নেশনগত , প্রভৃতি যাবতীয় ভেদ জ্ঞান একেবারে বিলোপ প্রাপ্ত হয় । সে অনাবিল উদার বিশ্বপ্রেম সাধন না করিলে মানব জন্ম সার্থক হয় না , স্বীকার করি । কিন্তু প্রত্যক্ষ ভেদাভেদকে উপেক্ষা করিয়া এই অভেদ জ্ঞান লাভ হয় না । সত্য ও অভেদ জ্ঞান ভেদের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয় । প্রকৃত উদার ও বিশ্বজনীন মৈত্রী ও সেইরূপ ভেদ - প্রাণ স্বদেশ চর্যোর মধ্য দিয়াই সাধিত হয় । অন্য উপায়ে নয় । "

স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ববর্তী সময়ে তিলক মহারাষ্ট্রে শিবাজী উৎসব শুরু করেছিলেন । পরাধীন জাতিকে সঞ্জীবনী মন্ত্রে উদ্বোধিত করার জন্য এই জাতীয় বীরের জীবন ছিল উদ্দীপনাময় । জাতীয় স্তরের বহু নেতাকে তিনি এই উৎসবের পটভূমিতে নিয়ে এসেছিলেন । সারা দেশে এর পর হতে শিবাজী উৎসব পালিত হয় । বাংলায় শিবাজী উৎসব পালিত হলো ১৯০২ এ । ১৯০৪ এ ' শিবাজী উৎসব ' উপলক্ষে রবীন্দ্র নাথ ' শিবাজী উৎসব ' রচনা করেন । তার দু বছর পর শিবাজী উৎসবের সাথে ভবানী দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে পূজিত হলো । এই উৎসবের উদ্যোক্তা ছিলেন সখারাম গনেশ দেউস্কর । ভবানী মূর্তি পূজোকে কেন্দ্র করে পৌত্তলিকতা ও হিন্দু ভাবনা আনার ব্যাপারে অনেকে সমালোচনা শুরু

করলেন । বিপিন চন্দ্র সেই সময় রচনা করলেন ' শিবাজী উৎসব ' । প্রকাশিত হলো 'বঙ্গ দর্শনে'র ভাদ্র সংখ্যা , ১৩১৩ , (১৯০৬) । এবং ' শিবাজী উৎসব ও ভবানী মূর্তি ' প্রকাশিত আশ্বিন মাসের ' বঙ্গ দর্শনে ' র সংখ্যায় , ১৩১৩ (১৯০৬) ।

' শিবাজী উৎসব ' প্রবন্ধে বিপিন চন্দ্র বললেন " রাজকীয় অত্যাচারের প্রতিবিধানই শিবাজীর জীবনের মুখ্য লক্ষ্য বা একমাত্র শিক্ষা নয় । .... মোগল অত্যাচারের প্রতিরোধ শিবাজীর জীবনের অভাবাত্মক দিক । এই বস্তুকে ধরিয়া শিবাজী আমাদের জাতীয় জীবনের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানাদিতে কদাপি সনাতন স্থান লাভ করিতে পারিবেন না । " তিনি বলছেন " আধুনিক কালের সর্বপ্রথম ও সর্ব প্রধান হিন্দু নেশন রচয়িতা ও হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতা রূপেই শিবাজী আমাদের বরণীয় ও পূজার্হ হইয়াছেন । ..... এই ভাবে শিবাজীকে ধ্যান করিতে গেলে মোগলের অত্যাচার কাহিনী স্মরণ করা অত্যাবশ্যকও নহে । " ধর্মীয় প্রভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিপিন চন্দ্র বলছেন , " রাজনীতিকে ধর্ম নিরপেক্ষ করা সহজ । ইংরেজ ভারতে তাহা করিয়াছে । কিন্তু জাতীয় জীবনকে ধর্ম নিরপেক্ষ করিতে গেলে তাহার অঙ্গহানি হইবেই হইবে । ধর্মকে যদি জাতীয় জীবনের বাহিরে না রাখিতে হয় , তবে হিন্দু মুসলমানে মিলিত হইয়া ভারতে এক বিশাল জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা হইবে কি রূপে ? " তিনি ধর্মীয় ঐক্যের কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করছেন " ভারতের ভবিষ্যত জাতীয় জীবন ফেডারেশনের আদর্শে গঠিত হইবে । এই জীবনের এক অঙ্গ হিন্দু , অপর অঙ্গ মুসলমান , তৃতীয় অঙ্গ খৃষ্টান থাকিবেই থাকিবে । কিন্তু ইহারা প্রত্যেকে আপন আপন বিশেষত্বকে রক্ষা করিয়া ও সেই বিশেষত্বেরই বিকাশ সাধনের দ্বারা ভারতের সাধারণ জাতীয় জীবনকে পরিপুষ্ট করিবে । "

' শিবাজী উৎসব ও ভবানী মূর্তি ' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বললেন " শিবাজীর বীর চরিত্র ও স্বদেশ প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জনমণ্ডলীর মধ্যে প্রচার করা ও প্রতিষ্ঠা

করা এবং শিক্ষিত জনসাধারণকে যথা সম্ভব শিবাজী চরিত্র লাভে সাহায্য করা , ইহাই শিবাজী উৎসবের মূল উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এবারে উৎসব ক্ষেত্রে শিবাজী, রামদাস ও সিংহ বাহিনী ভবানী মূর্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল । " এই ভাবনার পিছনে কারণ হিসেবে তিনি বলছেন " কোনো ভক্তকে বুঝিতে গেলে যে ভাবে তিনি ভগবানকে ভজনা করতেন সে ভাব তোমার চক্ষে ভালো হউক আর মন্দ হউক সেই ভাবেই তাহাকে দেখিতে হইবে । " এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলছেন " আমাদের আজকালকার ভাব ও ভাষায় শিবাজীর এই উদ্দীপনা ও প্রেরণা ব্যক্ত করিতে গেলে আমরা ইহাকে জাতীয় শক্তি নামে হয়ত অভিহিত করিব । যখন যে দেশে যে কোন ব্যক্তি স্বদেশ ও স্বজাতির উদ্ধার সাধনে বদ্ধ পরিকর হন , তখনই তাহার মধ্যে এই শক্তি কার্য্য করিয়া থাকে । এই জাতীয় মহাশক্তি, এই Spirit of the race - এর দ্বারা অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ না হইলে , কেহ কদাপি স্বদেশের জন্য সত্যভাবে আত্মোৎসর্গ করিতে পারে না । .... ইহুদিরা রোমক শৃঙ্খলা বদ্ধ হইয়া , খৃষ্ট জন্মকালে , এই মহাশক্তিকে – আমাদের এই সনাতন Spirit of the race কেই মশি বা Messiah নামে অভিহিত ও তাহার প্রতীক্ষায় পরাধীনতার সমুদয় ক্লেশ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া ছিল । ফরাসী বিপ্লবকালে ফরাসীরা এই মহাশক্তিকেই স্বাধীনতা(Liberty) নামে ভজনা করিয়াছিল । ..... জাপানবাসীগণ মিকাডোর মধ্যেই আপনাদের এই Race Spirit কেই প্রত্যক্ষ করে , এবং স্বজাতির সনাতন মহাশক্তি ও মহাপ্রাণতার প্রকট মূর্তি ও প্রত্যক্ষ বিগ্রহ রূপেই তাহার চরণে আত্ম সমর্পণ করিয়া একই সঙ্গে দেশ ভক্তি ও রাজ ভক্তির চরম চরিতার্থতা লাভ করিয়া থাকে । এই জাতীয় শক্তি এই Spirit of the race ই শিবাজীর নিকট ভবানী রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল । " বিপিন চন্দ্র পাল শিবাজী উৎসবের সার্থকতা সমন্ধে বলতে গিয়ে মন্তব্য করছেন ......"The strength and inspiration of which we sadly need at the present day for the reconstruction of our new national life. It is for this reason we regard the Shivaji celebration as a sacrament of the new civic life in India, and willing to lend it our most cordial support"." [৪৬]

'কংগ্রেসী কথা' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৩১৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'বঙ্গ দর্শনে' (নভেম্বর - ডিসেম্বর - ১৯০৬)। ১৮৮৫ সালের কংগ্রেস তখন প্রায় বিশ বৎসর ভারতের রাজনীতিতে অবস্থান করছে। কংগ্রেস কে ঘিরে মানুষের সংশয় ও জিজ্ঞাসা। কংগ্রেস স্বায়ত্ত শাসন চাইছে না, সুশাসন প্রবক্তাদের মুখে বিভিন্ন ধরণের উক্তি। বিপিন চন্দ্র এই পরিস্থিতি সম্পর্কে লিখলেন "ভারতের বৃটিশ শাসন কর্তৃপক্ষকে প্রধানত দুইটি শ্রেনীতে বিভক্ত করিতে পারা যায় - একদল শক্তিউপাসক, আর এক দল বৈষ্ণবী মায়ার অনুচর। একদলের অস্ত্র তরবারী আর একদলের অস্ত্র সম্মোহন বাণ। ডালহৌসি, লীটন প্রভৃতি সকলেই স্বল্প বিস্তর শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন, ... মেও, রিপন প্রভৃতি বৈষ্ণব - ভারত শাসনে বৈষ্ণবী মায়ার বিস্তার করিতে চাহিয়াছেন।" বিপিন চন্দ্র হিউমকে মনে করতেন দ্বিতীয় শ্রেনীর লোক। তিনি বলছেন "..... রিপন, হিউম, কটন প্রভৃতি উদার মতি ইংরেজগণের চিরন্তন লক্ষ্য - সুশাসন - গুড গভর্নমেন্ট, কংগ্রেসেরও সনাতন আদর্শ সুশাসন ও সত্য স্বায়ত্ত শাসন নহে। ইঁহারা স্বায়ত্ত শাসন চান না বা চান নাই যে, তা নয়। যেখানে সুশাসনের জন্য স্বায়ত্ত শাসন অত্যাবশ্যক সেখানে ইঁহারা সকলে স্বায়ত্তশাসনও চাহিয়াছেন। কিন্তু সুশাসন ইঁহাদের লক্ষ্য স্বায়ত্ত শাসন উপলক্ষ্য মাত্র।" বিপিন চন্দ্র কংগ্রেসের 'Mendicant policy' র বিরোধিতা করে বলেছেন "সুশাসনের পন্থা ছিল আবেদন ও আন্দোলন, স্বায়ত্ত শাসনের মূল মন্ত্র হইবে বোধন ও গঠন, - প্রজাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা .... প্রজা শক্তিকে বিবিধ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের আকারে গড়িয়া তোলা।"

তদানীন্তন ভারতে কংগ্রেসের আবেদন নিবেদন নীতির প্রচুর সমালোচনা হচ্ছিল। এই সমালোচনার ঢেউ বঙ্গভঙ্গ চলাকালীন সময়ে আরও তীব্র হয়।

জাতীয়তাবাদী লেখকরা এই আবেদন নিবেদনের প্রতি কটাক্ষ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই আবেদন নিবেদনের রাজনীতি ' জয় রাধে ভিক্ষা দাও গো ' রাজনীতির সাথে তুলনা করেছেন। এই নীতি সম্পর্কে বিপিন চন্দ্র আপন অভিমত ব্যক্ত করলেন তাঁর ' আবেদন ও আন্দোলন ' প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ' ভারতী 'র ১৩১৩ সালের ফাল্গুনে (১৯০৭)। বিপিন চন্দ্রের উক্তি " আবেদনের মূলে সর্বত্রই দুইটি ভাব লুকাইয়া থাকে। এক – আপনার শক্তি সাধ্যে ঐকান্তিক বিশ্বাস, অপর – যাহার নিকটে আবেদন উপস্থিত করা যায়, তাহার শক্তি ও সদিচ্ছার উপর অচল আস্থা। " আত্মশক্তি ও আত্ম বিশ্বাসহীন জাতির পক্ষে স্বাধীনতা পাওয়া খুবই কষ্টকর। তিনি বলছেন " আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস ধর্মরাজ্যে অমূল্য বস্তু। এই অবিশ্বাস হইতেই ক্রমে ভগবদভক্তি জাগ্রত হইয়া জীবের ভব বন্ধন মোচন করিয়া দেয়। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রজার আত্ম শক্তির উপরে ঐ রূপ ঐকান্তিক অনাস্থা অতিশয় সাংঘাতিক বস্তু। ইহাতে অবস্থা বিশেষে রাজভক্তি জাগ্রত হইতে পারে, কিন্তু রাজ বন্ধন কদাপি শিথিল হয় না। " তিনি বলছেন, " আত্ম প্রতিষ্ঠা যেখানে যেখানে লক্ষ্য, আত্ম চেষ্টা সেখানে এক মাত্র ধর্ম। আত্ম নিবেদনে প্রকৃত আত্ম চেষ্টার মূল বিনষ্ট করিয়া ফেলে, এইজন্য রাজনীতি ক্ষেত্রে আবেদন - নিবেদন কদাপি মোক্ষ হেতু হইতেই পারে না। " বিপিন চন্দ্র বিশ্বাস করতেন ইংরেজ শাসনের একটি মাত্র উপলক্ষ্য তা হচ্ছে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি। তাঁর বক্তব্য " ইংরেজের এই অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঔদার্য ও সদিচ্ছার উপরেই আমাদের সর্ববিধ রাজ - নৈতিক আবেদন আন্দোলন অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই আবেদন নীতির অসারতা ও অলকাযিতা ভালো করিয়া বুঝিতে গেলে ভারতে বৃটিশ শাসন নীতির কুটিল গতি পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করিতে হয়। এতকাল পর্যান্ত আমরা ইহা করি নাই বলিয়াই আমাদের সর্বাধিক রাজনৈতিক প্রয়াস এ রূপ ভাবে নিষ্ফল হইয়াছে।

' রাজভক্তি ' প্রবন্ধে (বঙ্গ দর্শন, শ্রাবণ, ১৩১৪, জুলাই - আগষ্ট, ১৯০৭) বিপিন চন্দ্র বলছেন, " আমরাও বলি অপরেও বলেন যে আমরা চিরদিনই বড় রাজভক্ত। কথাটার দৌড় কত, সকল সময় ঠিক বুঝিয়া উঠা যায় না।

একথা সত্য যে প্রচলিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতায় রাজায় রাজায় বাদবিসম্বাদের কথা অনেক দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু রাজায় প্রজায় হানাহানির ঘটনা একান্ত বিরল।" তিনি বলছেন "রাজা - প্রজার সম্বন্ধ ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত । ... ধর্মাবতার রূপেই রাজা পূজনীয়। ধর্মরক্ষক রূপেই তিনি বরণীয়। হিন্দুর রাজ - ভক্তি রাজা খেতাব ধারী ব্যক্তিটির প্রতি অন্ধ আনুগত্য নয়, একথা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে তিনি মন্তব্য করেন — হিন্দু রাজাকে এই জন্য সর্বদা ধর্মভীরু হইয়া চলিতে হয়, কারণ রাজা যদি ধর্মকে পরিত্যাগ করেন, রাজভক্তি আশ্রয়হীন হইয়া তাঁহাকেও নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করিবে।" এই প্রসঙ্গে তিনি উদাহরণ দিয়ে বলছেন, "যে রাজা ধর্মকে পরিত্যাগ করে, সে আত্মাধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। প্রজার বশ্যতার উপরে তাহার আর কোন দাবি দাওয়া নাই। সে তখন রাজা নহে আততায়ী মাত্র। তাহার বিরোধী হইলে রাজদ্রোহিতা হয় না। ইহাই হিন্দু আদর্শ। ..... এই আদর্শ অনুসারে প্রথম চার্লসের বিরুদ্ধে বৃটিশ প্রজাবর্গের অস্ত্রধারণ — রাজদ্রোহিতা পদবাচ্য কদাচিৎ হইতে পারে না।" ব্রিটিশ শাসনে ভীত সমাজে এরূপ বলিষ্ঠ রচনা খুবই কম লক্ষ করা যায়।

বিপিন চন্দ্র পালের অপর একটি প্রবন্ধ 'ইজ্জৎ' নামে প্রকাশিত হয় ১৩১০ সালের শ্রাবণের 'বঙ্গ দর্শনে'। (জুলাই - আগস্ট, ১৯০৮)। প্রবন্ধটি 'শ্রী'র ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। 'ইজ্জৎ' যে শুধু ইংরাজের অধিকার আছে তা নয়। সকলেরই অধিকার আছে। বিপিন চন্দ্র বলছেন, "প্রজার নিকট অকৃত্রিম ভক্তি লাভ করা দুর্লভ হইয়া উঠিলে রাজার পক্ষে ইজ্জৎ রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। কৃত্রিম শাসন – কৌশলে ফল হয় না। ..... রাজার নিকট অকৃত্রিম সুশাসন লাভ করা দুর্লভ হইয়া উঠিলে প্রজার পক্ষেও ইজ্জৎ রক্ষা কঠিন হইয়া পড়ে। কৃত্রিম আন্দোলন – কৌশলে ফল হয় না। ... রাজার নিকট অকৃত্রিম সুশাসন লাভ করা দুর্লভ হইয়া উঠিলে প্রজার পক্ষেও ইজ্জৎ রক্ষা কঠিন হইয়া পড়ে। কৃত্রিম আন্দোলন – কৌশলে ফল হয় না। বরং সুশাসন আদায় করিয়া লইবার কৃত্রিম চেষ্টায় অকৃত্রিম সুশাসন আরও দুর্লভ হইয়া দাঁড়ায়।" তিনি ব্রিটিশদের সাবধানী

উচ্চারণ করে বলেন " এতদিন একটানা ইংরাজের ধূমপুঞ্জে গগন মণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল । এখন তাহার মধ্যে প্রভায় ইংরাজ বিদ্যুদ্দামের মত ঝলসিয়া উঠিয়াছে ।" তাই বিপ্লববাদের সম্ভাবনা দেখে তিনি মন্তব্য করেছেন " অক্ষমের বিদ্বেষ চিরদিন যে গোপন পথে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে , সেই চির - পরিচিত পুরাতন পথেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । "

বিপিন চন্দ্র স্বদেশী আন্দোলন সময়বর্তী কালে কিছু কবিতা গান রচনা করেন । এর মধ্যে কিছু কবিতা বঙ্গ দর্শনে প্রকাশিত হয় এবং কিছু কবিতা ' নারায়ণ ' পত্রিকায় । বঙ্গদর্শনের কার্তিক , ১৩১২ (অক্টোবর , নভেম্বর , ১৯০৫) সংখ্যায় প্রকাশিত হয় (১) স্বদেশ (২) ব্রত (৩) ভিখারী (৪) উপনয়ন (৫) আগ্নেয়গিরি (৬) প্রলয় এবং (৭) বঙ্গ বিভাগ । বৈশাখ , ১৩১৩ সালের বঙ্গ দর্শনের সংখ্যায় (এপ্রিল , ১৯০৬) প্রকাশিত হয় (১) পূজারী (২) জীর্ণতরী (৩) পাদপ পাদপ (৪) সন্ন্যাস । বিপিন চন্দ্র পালের প্রায় সকল কবিতাই দেশ প্রেমের অনুরাগে সরস ও অনুপ্রাণিত । বঙ্গভঙ্গ জনিত রাজনৈতিক পটভূমিতে বিপিন চন্দ্রের মানসিক অনুভূতি ও হৃদয়ের প্রাঞ্জল ভাবনা নিশ্রিত কবিতাগুলি অপূর্ব ।

ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে অপমান বিধুর পরিবেশ কবির চিত্ত তলকে বেদনার্ত করে তুলেছিল । তবু শত শত বৎসরের লাঞ্ছনার অমোঘ কাল রাত্রি অতিবাহিত করে আজ স্বদেশ জাগছে । কবির ভাষায় —

" বেদনার মাঝে আজি জেগেছে চেতনা ,
পেয়েছি তোমার দেখা হে মোর স্বদেশ ,
নত আঁখি জল ভরা ছিন্ন চীর বেশ
শিয়রে দাঁড়ায়ে আর কথা কহিছ না । "

বেদনা ঘন রূপে কবি স্বদেশকে প্রত্যক্ষ করছেন —

" অতীত গৌরব তব , ভবিষ্যের আশা ,
আজিকার যাহা কিছু — বিদেশীর পায়ে
নিঃশেষ দিয়াছি ঢেলে । একি হেরি আজ
ভিখারীর বেশে তুমি ওগো রাজ রাজ । "

বঙ্গভঙ্গ জনিত অশান্ত পরিবেশে নারী জাগরণের কবিতা ' ব্রত ' । তিনি বঙ্গ নারীকে স্বদেশ ব্রতে উদ্দীপ্ত করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন —

' ওগো বঙ্গ কুলাঙ্গনা সতী লক্ষ্মীগণ ,
আজি বঙ্গমাতা কাঁদি তোমাদের দ্বারে
হানিছেন কর । নিরাশ কোরো না তারে । '

বঙ্গমাতা কি চাইছেন ? —

' ... শুধু চাহিছেন তিনি
রমণীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত উদযাপনা
তোমাদের ঘরে । যার পুন্যফল যিনি
লভে পৌরুষ রতন — হৃত কৌলিন্যর
ভারতের । দেশহিত ব্রত ধারিনীর
কল্যাণীর বরমাল্যে দৈন্য হবে দূর
পুরুষের, স্তনে তাঁর শিশু হবে বীর,
সাথী তার ভ্রাতৃ হস্ত বল দিবে আনি
তবে ভুলিবেন মাতা সর্ব দুঃখ গ্লানি । '

' উপনয়ন ' এ কবি সকলকে অগ্নিহোত্রী হতে আহ্বান জানাচ্ছেন —

' আজি এই মঙ্গল প্রত্যুষে
তব যজ্ঞকুণ্ড হতে যজ্ঞানল লয়ে
গৃহে ফিরি যাই সবে অগ্নিহোত্রী হয়ে । '

' আগ্নেয় গিরি ' তে কবির হৃদয় স্বদেশের লাঞ্ছনা ভাবে অগ্নি দহন শিখা প্রজ্বলিত হয়ে বানী তোলে —

' হে মোর স্বদেশ শুধু ধক ধক জ্বলে
শ্মশানের চিতা বক্ষ মাঝে রাত্রি দিন ,

' প্রলয় ' কাল উপস্থিত হলে কবি অনুভব করছেন —

' সেই দিন ভারতের চির বিভাবরী
হবে সুপ্রভাত । দ্বাদশ আদিত্যগণ
আনিবেন ভারতের মহা জাগরণ । '

' বঙ্গ বিভাগ ' কবির জীবনের সুতীব্র অনুভূতির ফসল । স্বদেশী যুগে বহু আলোচিত , পঠিত কবিতা —

' রাজার শাণিত খড়্গ নিষ্ঠুর আঘাতে
পারেনি করিতে দ্বিধা তোমার স্বদেশ
শুধু ভাঙ্গিয়াছে তব নিদ্রার আবেশ ,
দিয়াছে চেতনা । আজি নবীন প্রভাতে

যুগযুগান্তরের সুপ্ত নিমীলিত আঁখি
মেলিয়াছে , হেরিতেছ তরবারি লেখা
বিদারণ রেখাগুলি স্থির দৃষ্টি রাখি
রুধিরাক্ত বক্ষোপরি । শুধু ক্ষুণ্ন রেখা ,
ছিন্ন করে সাধ্য কার পূত দেহ তব
কুলিশ কঠোর ? এই ব্যবচ্ছেদ - খাদ
ভরিয়া বহিয়া যাব তমর্ষ ভৈরব
বর্ষবহ্ন শত বিনাশক মেঘনাদ ,
মত গর্জা পুণ্য স্পর্শ যার দিবে প্রাণ
সহস্র সন্তানে , দিবে বরাভয় দান ।

কবি নিজেকে স্বদেশ মন্দিরের ' পূজারী ' রূপে দেখেছেন । তাঁর কামনা —

তোমার স্বাক্ষর লিপি ভালে লিখি দিলে ,
নিষ্ফল জীবন মোর সার্থক করিলে ।

' জীর্ণতরী ' রূপী স্বদেশকে যে বণিক দল ডোবাতে চাইছে সে সম্পর্কে কবির দেশবাসীর কাছে অনুরোধ —

' . . . . . হে নব সংসারি ,
আবার বাঁধিয়া বুক লয়ে শত দাঁড়ী
তরাপালে নবোৎসাহে দাও তবে পাড়ী । '

স্বদেশী যুগের আন্দোলন একদিন জয়ী হয়েছিল । বঙ্গভঙ্গ রোধ হয়েছিল । বিপিন চন্দ্রের লেখনী স্তব্ধ হয় নি । তার চিন্তাধারা পরবর্তী আন্দোলন সময়বর্তী কালে সাড়া জাগিয়েছিল । বিপিন পালের স্বদেশী জাগরণের অবদান সম্পর্কে বিনয় কুমার সরকার মন্তব্য করেছেন " আমার বিচারে সে যুগের আসল নেতা

বিপিন পাল । ১৯০৫ সনের আগষ্ট হতে ১৯০৮ সন পর্যন্ত বাঙালী জাতকে তাতি তোলবার ভার ছিল বিপিন পালের হাতে । বিপিন পালের গলার আওয়াজ না শুনে যুবক বাংলার জন্ম হত না । বিদ্যায় , দার্শানিকতায় , রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞানে , বিপ্লব যোগে , কর্তব্য নিষ্ঠায় বিপিন পালের ঠাঁই উঁচু ছিল । ..... এই জন্য আমি বিপিন পালকে বঙ্গ বিপ্লবের জন্মদাতা ও নেতা বলে সম্বর্ধনা করে থাকি । " ৪৭

চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০ - ১৯২৫)

স্বদেশী আন্দোলন রাজনৈতিক জগতে বিবিধ ধারার প্রবর্তন করেছিল । একদিকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন অন্যদিকে সশস্ত্র সংগ্রামবাদে বিশ্বাসী বিপ্লব পন্থ দেশবন্ধু ছিলেন এই দুট পন্থার মধ্য পন্থী । জীবনের অনেক ঘাত প্রতিঘাতে তিনি রাজনৈতিক জগতে এসেছিলেন । ছাত্র জীবনে তিনি সুরেন্দ্র নাথ ও আনন্দ - মোহন বসুর সংস্পর্শে এসে ' স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েসনে ' রাজনীতির অভিজ্ঞতা লাভ করেন । ইংলণ্ডে থাকা কালীন সময়ে দাদাভাই নৌরজীর সংসদীয় নির্বাচনে এক- নিষ্ঠ ভাবে অংশ গ্রহণ করেন । রাজনীতির কর্মপ্রবাহে সেই সময় থেকে তাঁর প্রবেশ ।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পটভূমি ছিল উদ্দীপ্ত । কংগ্রেসও আন্দোলনের ব্যাপারে দ্বিধা বিভক্ত । ১৯০৬ এর কলকাতা অধিবেশনে তিনি যোগ দিয়েছিলেন । তখন কংগ্রেস মডারেট বা নরম পন্থীদের হাতে । তাঁদের দ্বারই কংগ্রেসের দ্বার স্বদেশী যুগের বয়কট আন্দোলনকে কংগ্রেসী নেতারা গ্রহণ করেন নি । বিপ্লব

পন্থায় বিশ্বাসীর সংখ্যা কংগ্রেসে তখন নগন্য। ১৯০৭ থেকে সাড়া দেশে বিপ্লববাদের শুরু। কিন্তু উদ্দীপ্ত বিদ্যুৎ ঝলকেই দ্রুত শেষ হয়ে বিপ্লবী কার্যাসূচী। চরম পন্থীরা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। তিলক, বিপিন চন্দ্র, লালা - লাজপত রায় এরা সবাই অন্তরীণ। চিত্তরঞ্জন বেছে নিলেন সেই যুগে নিজেকে নিয়োজিত করতে।

বৈষ্ণবীয় চিন্তার সাধক বলছেন 'I look upon the attainment of freedom and Swaraj the only way of fulfilling, one self as individuals as nations. I look upon all national activities as the real foundation of the service of that greater humanity which again is the revealation of God to man". ৪৮

স্বরাজ শব্দটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলছেন, "Swaraj is definable, and is not to be confessed with any particular system of government. There is all the difference in the world between Swarajya and Samrajya. Swaraj is the natural expression of the national mind. The full out ward expression of the mind covers and must necessarily cover, the whole life history of a nation......The question of nationalism, therefore looked at from another point of view, is the same questions as the Swaraj". ৪৯

দেশবন্ধু স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে বলছেন " স্বদেশী আন্দোলন একটা ঝড়ের মতো বহিয়া গিয়াছিল, একটা প্রবল বন্যায় আমাদের ভাসাইয়া লইয়া

গিয়াছিল । প্রাণ যখন জাগে তখনও হিসাব করিয়া জাগে না । ..... এই যে মহাবন্যার কথা বলিলাম , তাহাতে আমরা ভাসিয়া , ডুবিয়া বাঁচিয়াছি । বাঙলার যে জীবন্ত প্রাণ তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি । বাঙ্গলার প্রাণে প্রাণে আবহমান যে সভ্যতা ও সাধনার স্রোত , তাহাতে অবগাহন করিয়াছি । ..... বুঝিলাম , কেন ইংরেজ এ দেশে আসিল , বুঝিলাম রামমোহনের তপস্যার নিগূঢ় মর্ম্ম কি ? বঙ্কিমের যে ধ্যানের মূর্ত্তি সেই —

" তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণা: শরীরে ।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে -- "

সেই মাকে দেখিলাম ।

স্বদেশী আন্দোলন হিসাব না করিয়াই আসিয়াছিল । হিসাব না করিয়াই চলিয়া গেল । কিন্তু এখন আমাদের হিসেব করিবার সময় আসিয়াছে । মা দেখা দিয়াছেন — এখন যে পূজার আয়োজন করিতে হইবে । ..... এই যে মহাবন্যায় দেশ ভাসিয়া গিয়াছিল , এখন যে সব পতিত জমি আবাদ করিয়া সোনা ফলাইতে হইবে । বিশ্বাস রাখিও সোনা ফলিবেই । " ৫৭

বঙ্গভঙ্গ যেদিন কার্যকর হলো সেই ১৬ই অক্টোবর , ১৯০৫ এ চিত্তরঞ্জন ছিলেন দার্জিলিং- এ । সেখানে সেদিন তাঁর রচিত প্রবন্ধ ' স্বদেশী আন্দোলনের কথা ' পাঠ করেন । তিনি বলেছেন , " এই যে নবজীবন সঞ্চারিণী আশা -- যাহা আমাদের দেশটাকে সচকিত করিয়া তুলিয়াছে ইহা কি একমাত্র দারিদ্র বিনাশের স্মরণ ? ইহার মধ্যে কি গভীরতর সত্য নিহিত নাই ? ইহা কি আমাদিগকে চক্ষে আঙুল দিয়া মুক্তির পথ দেখাইয়া দিতেছে না ? ইহা কি বাঙ্গালী জাতির প্রবণ

বিবরে এব আশ্চর্য্য অপূর্ব স্বাধীনতা সঙ্গীত ঢালিয়া দিতেছে না ? আমার কাছে এই নব আন্দোলন যে যে কারণে সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় , তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান কারণ এই যে , ইহা ফলত ও মূলত বাঙালী জাতির আত্ম নির্ভর পথে প্রথম পদক্ষেপ । এই কারণেই আমার ধ্রুব ধারণা যে এই আন্দোলনের সফলতার উপরেই আমাদের জাতীয় উন্নতির আশা নির্ভর করিতেছে । "

তিনি বলছেন , " প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন আপনার মুক্তি আপনাকেই সাধন করিয়া লইতে হয় সেই রূপ প্রত্যেক জাতির মুক্তিও সেই জাতিকেই সাধন করিয়া লইতে হয় , সেই রূপ প্রত্যেক জাতির মুক্তিও সেই জাতিকেই সাধন করিয়া লইতে হইবে । সহস্র বৎসর ধরিয়া অন্য জাতির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলেও প্রকৃত মুক্তির পথ কখনও মিলিবে না । "

আমরা এতদিন যে ইংরাজের মুখাপেক্ষী হয়েছিলাম তার কারণ প্রসঙ্গে তিনি বলছেন " ইংরাজ যখন প্রথমে আমাদের দেশে আসে তখন নানা কারণে জাতীয় জীবন দুর্বলতার আধার হইয়াছিল । তখন আমাদের ধর্ম্ম একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল । একদিকে চির পুরাতন চির শক্তির আকর সনাতন হিন্দু ধর্ম , কেবল মাত্র মন্ত্রের মৌখিক আবৃত্তি ও আড়ম্বরের মধ্যে আপনার শিব - শক্তিকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল । অপরদিকে যে অপূর্ব প্রেম ধর্ম্ম বলে মহাত্মা চৈতন্য সমস্ত বাঙ্গালা দেশকে জয় করিয়াছিলেন সেই প্রেম ধর্ম্মের অনন্ত মহিমা ও প্রাণ সঞ্চারিণী শক্তি কেবল মাত্র মালা ঠোকাইতেই নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছিল , আর আমাদের সমগ্র ধর্ম্মক্ষেত্রে শক্তিহীন শক্তি ও প্রেম শূন্য বৈষ্ণবের ধর্ম্ম শূন্য কলহে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল । ..... এইরূপ কি ধর্ম্মে কি জ্ঞানে বাঙালী তখন সর্ববিষয়ে প্রাণহীন মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়িয়াছিল । এমন কি বাঙ্গালীর বলবীর্য্য পর্যন্ত তখন নিতান্ত কৃতঘ্নের মত সমস্ত বাঙ্গালী জাতির গলদেশে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা চালাইতে ব্যস্ত ছিল । "

ইংরেজদের প্রতি মোহাবিষ্ট জাতিকে তিনি কষাঘাত করে বলছেন , " আমরা মোহ মুগ্ধ হইয়া একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে ইংরাজের ইতিহাস ইংরাজের জাতীয় জীবনের প্রতিমা আমাদের নহে , ইংরাজের সাহিত্য ইংরাজেরই জাতীয় জীবন পুষ্ট করিতে পারে , তাহার সহিত আমাদের জাতীয় জীবনের কোন সম্বন্ধ নাই , ইংরাজের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধিতে আমাদের মাতার দৈন্য কিছুতেই ঘুচে না ও ইংরাজের গৌরবে আমাদের লজ্জা কিছুতেই নিবারণ হয় না , ইহা অতি সোজা কথা – অত্যন্ত সরল সত্য ।"

তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আরম্ভে জাতীয় জীবনের দুর্বার গতিকে অবলোকন করে মন্তব্য করছেন " আজ ভগবৎ প্রসাদে আমাদের জাতীয় জীবন হইতে মরণ - চ্ছায়া রূপী এই মহামায়া কুহেলিকা অপসৃত হইয়া গিয়াছে । এই নবোন্মেষিত জাতীয়ত্বের প্রভাত লোকে আমাদের জাতীয় জীবনের সত্য অবস্থা আমাদের চক্ষের সম্মুখে সুন্দর – পরিষ্কার রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে ।" তিনি ভাবাবেগে বলছেন , " আজিকার দিনে এই যে দেশব্যাপী আন্দোলনে শত কণ্ঠে উচ্চারিত ' বন্দেমাতরম ' ধ্বনির মধ্যেও যে মাতার আহ্বান শুনিতে পায় নাই , সে নিতান্ত হতভাগ্য । আর যে ডাক শুনিয়াছে , কিন্তু শুনিয়াও আপনার ছোট খাট স্বার্থগুলিকে সম্মুখে ধরিয়া আপনার মস্তিষ্ক হইতে আকৃষ্ট মিথ্যা তর্করাশি এবং আপনার করুণা বর্জ্জিত হৃদয় জাত শুষ্ক তুচ্ছ উপহাসের অন্তরালে আপনাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে , সে সরকারী উকিলই , বা ছোট কি বড় রকমের সরকারী জজ্‌ই হউক , কি সামান্য কেরাণী কি সামান্যতর ক্লার্কই হউক – সে মাতা ও বিধাতার অপমান করিতেছে – সে মাতৃদ্রোহী – ঈশ্বর দ্রোহী , তুষানলেও তাহার সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হয় না ।"

বয়কট ও স্বদেশী প্রসঙ্গে তিনি বলছেন " আমি কখনই স্বীকার করিব না যে Boycott বিদ্বেষ ভাবাপন্ন । Boycott ও স্বদেশীয়তা এ দুই স্বদেশ প্রেম ভাবাপন্ন । বৈষ্ণব কবিদের ভাষায় বলিতে গেলে ' বয়কট ' পূর্বরাগ , স্বদেশীয়তা মিলন । মাতার আহ্বান শুনিয়াছি বলিয়াই বিদেশী বিলাস পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছি । কুলটা রমণীর ন্যায় বিলাতী বিলাস তাহার শত সহস্র ছলা কলা বিস্তার করিয়া তাহার অধরের হাস্যে , তাহার নয়নের ভঙ্গিমায় , তাহার সুন্দর হস্তের

কোমল পরশে আমাদিগকে একেবারে মোহমুগ্ধ করিয়া তাহার বাহু বন্ধনের মধ্যেই আমাদের সুখ নিদ্রার আয়োজন করিতেছিল। সেই বাহু বন্ধন হইতে আমাদিগকে একেবারে মুক্ত না করিলে কেমন করিয়া আমাদের চিরধৈর্যশীলা চির কল্যাণময়ী মাতা — যিনি এতদিন ধরিয়া তাঁহার গৃহ প্রাঙ্গনে কল্যাণ প্রদীপ জ্বালিয়া তাঁহার অকৃতজ্ঞ সন্তানের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন — তাহার পবিত্র কল্যাণময় প্রেম হৃদয়ে ধারণ করিব? আর এই যে বিলাতী দ্রব্য বর্জন করিতেছি, ইহাতে কি প্রতিদিন আমরা সংযম শিক্ষা করিতেছি না? সংযম ব্যতীত কখনও কি প্রেম স্থায়ী হয়?" আমাদের এই বর্জনের মধ্য দিয়া স্বদেশ প্রেম সজীব হইয়া উঠিতেছে।

তিনি বয়কট - এর আরেকটি দিক তুলে ধরেছেন। " ইংরাজী অর্থশাস্ত্রে যাহাকে production বলে, তাহার জন্য demand আবশ্যক। আমরা বিলাতী দ্রব্য বর্জন করিয়া সেই demand এর সৃষ্টি করিতেছি। একবার যদি এর দ্বারা আমরা স্থায়ী demand দাঁড় করাইতে পারি আমাদের দেশের লুপ্ত ও নষ্ট বানিজ্য মাথা তুলিবেই তুলিবে।"

চিত্তরঞ্জনের জীবনের আলোচনা প্রসঙ্গে হুমায়ুন কবির বলেছেন "Every great national movement throws up a member of resplendent personalities who are partly its creators and partly its creation. They are its creation, for without the background and impulse provided by the movement, their thought and action and could not have taken shape, or even if they did, would have remained still born and ineffective. They are also its creators, for they help to give form and direction to urges and impulses which till their emergence had stirred only is the subconscious mind of the people. Great men help to formulate and express the hopes and aspirations of an age, an in doing so bring their realisation within the range of practical politics". (১)

বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলন ছিল এইরূপ এক বিশাল জাতীয় উত্থান। আর সেই যুগের রাজনীতি " তাঁকে চেয়েছিল, এবং "C.R.Das threw himself heart and soul into the struggle for India's emancipation". ৫২

বিনয় কুমার সরকার (১৮৮৭ - ১৯৪৯)

- -

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রায় সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক আন্দোলনের পৃষ্ঠভূমি হতে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হয়ে রাজনৈতিক তত্ত্বের ভাবভূমিতে বিচরণ করেছেন। কিন্তু বিনয় সরকারক্ষেত্রে ছিল জাতীয় জীবনে শিক্ষকতা, এবং এই ক্ষেত্র হতে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হয়ে তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবনার পরিমন্ডলে বিরাজ করেছেন। এই বিরাজমান অবস্থায় তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য কখনও ম্লান হয় নি। তাঁর জীবনীকার হরিদাস মুখোপাধ্যায় বলছেন, " বিনয় সরকারের সমগ্র আত্মিক জীবনটা, — বিশেষতঃ ১৯০৭ এর পরবর্তী জীবনটা – একটানা প্রতিবাদ আর বিদ্রোহ, বিদ্রোহের বানী এ যুগে বাঙালী অবাঙালী বহু নর -নারীর কন্ঠেই শুনেছি। কিন্তু এত জোরের সঙ্গে সকল প্রকার অনৈতিহাসিক ও অবৈজ্ঞানিক মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, বোধহয়, বিনয় সরকারের মতন খুব কম ব্যক্তির কন্ঠ থেকেই বেরিয়েছে।" ৫৩

এমনকি ' দি ইন্ডিয়ান সোশ্যাল রিফরমার ' তার ২৮শে ডিসেম্বর , ১৯৪০ এর সংখ্যায় মন্তব্য করছে " রাজা রামমোহন রায় , কেশব চন্দ্র সেন , পন্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর , সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় , স্বামী বিবেকানন্দ , চিত্ত - রঞ্জন দাস এবং সুভাষ চন্দ্র বসু — এঁদের সকলই বাংলার স্বাধীন প্রাণশক্তির — যা কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা মত বিশেষের নিকট নতজানু হয় না তার — মূর্ত প্রতীক । কিন্তু এঁদের থেকেও এই বিষয়ে আরও জীবন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে বিনয় কুমার সরকার । তিনি প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় জ্ঞানরাজ্যের সকল প্রকার চিন্তাধারারই প্রতিবাদ করে থাকেন । " ৫৪

বিনয় কুমার ছিলেন উদার নীতির উন্নত হৃদয়ের মানুষ । দেশের মাটির প্রতি তাঁর গভীর টান ছিল । শিল্প বাণিজ্যের মাধ্যমে স্বদেশর প্রগতি চাইতেন তিনি । তিনি বিশ্বাস করতেন ভারতের এক যুগান্তবাহী প্রাচীন সংস্কৃতি আছে । যা দিয়ে বিশ্ব জয় করা যায় । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হতেই তিনি জীবনের নতুন ব্রত খুঁজে পেলেন । স্বাদেশিকতা বোধ তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র হলো । ছাত্র জীবন ছিল অসাধারণ মেধা সম্পন্ন । সরকারী বৃত্তি ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদের চাকরী প্রত্যাখান করে তিনি সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহযোগী হন । জাতীয় শিক্ষা পরি - ষদের দ্বারা পরিচালিত 'বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজে' অবৈতনিক অধ্যাপকের কাজ গ্রহণ করেন ।

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন তাঁকে রাজনৈতিক প্রদীপের পাদপীঠে নিয়ে এল । তিনি বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে মন্তব্য করছেন " আমার কাছে ১৯০৫ হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসর । এই সময় শুরু হয় গৌরবময় বঙ্গ বিপ্লব । এ একটা খাঁটি যুগান্তর । ..... ১৯১১ সনে গর্ভমেন্ট দু - টুকরো করা বাংলাদেশকে পুন - রায় জুড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল । এই কাজের ভিতরে যুবক বাংলা রাষ্ট্রিক জয় - জয়কার মূর্তি পেয়েছিল । এ একটা বিপ্লব বা যুগান্তর । " ৫৫

স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে বিনয় কুমার অনুভব করতেন যে দেশ গঠনের কাজে বিদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে ভারতীয়দের জ্ঞান থাকার প্রয়োজন। সেইজন্য তিনি সতের জন কৃতি ছাত্রকে বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। এবং তিনিও ইউরোপ, এশিয়া ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ভ্রমন করেন। স্বদেশী যুগে বিনয় সরকার নিজের ভাবনাকে প্রকাশ করলেন তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধে।

১৯০৬ এর জুন মাসে 'মালদহ সমাচার' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হলো তাঁর প্রবন্ধ "বাংলার জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ও বর্গ সমাজ'। পরে এই প্রবন্ধ কলকাতার অমৃত বাজার পত্রিকায় ইংরাজীতে অনূদিত হয়। স্বদেশী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য বহু ছাত্র বিভিন্ন সরকারী বিদ্যালয় হতে বহিষ্কৃত হয়। এই সব ছাত্রদের শিক্ষা দানের জন্য গড়ে উঠে জাতীয় বিদ্যালয়। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ এর কর্তাব্যক্তিরা এই জাতীয় বিদ্যালয়গুলি পরিচালনা করতেন। বিনয় সরকার এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি মালদহে ১৯০৭ এর জুন মাসে মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন।

এই প্রবন্ধে জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ এর কার্যকরী ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখলেন, " যে কোননো বাঙালীই আজকাল বেশ জানে যে পেট চালানো দিন দিন কষ্টকর ও ব্যয় সাধ্য হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু তথাকথিত শিক্ষিত লোকজনের সম্মুখে আয়ের পথ হইতেছে মাত্র দুটি। প্রথমতঃ সরকারী চাকুরী আর দ্বিতীয়তঃ উকিলি ডাক্তারি ছাড়া উচ্চ শিক্ষিত বাঙালীরা রোজগারের কোন পথই খুঁজিয়া পায় না। এই সকল বাঁধা পথের বাহিরে তাহাদের পক্ষে স্বপ্নেও চলা সম্ভব পর নয়। সাধারণতঃ কেহই এই সকল বাঁধা পথ স্বাধীন খেয়ালে ছাড়িয়া দিতে চায় না। আর একটা নতুন পথ আবিষ্কার করার দিকেও কেহ বড় একটা ঝুঁকে না। ফলতঃ ভাল ভাতের জোগাড় করা ক্রমশই যার পর নাই কঠিন হইয়া পড়িতেছে। যথোচিত ভাত - কাপড়ের অভাবে শিক্ষিত বাঙালী পরিবারকে

কষ্ট পাইতে হইতেছে । এই সকল দুরবস্থা হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে চাই নতুন নতুন অন্নের পথ । বাঙলায় নরনারীর চোখের সামনে নতুন নতুন টাকা রোজগারের উপায় দেখাইয়া দিতে না পারিলে বাঙালীকে জীবন সংগ্রামে পরাস্ত হইতে হইবে । খাওয়া পরার উপায় উদ্ভাবন করাই বাঙালী জাতির পক্ষে মস্ত সমস্যা । এই জরুরি অভাব মোচনের জন্য , অন্ন সংস্থানের নতুন নতুন পথ সৃষ্টি করিবার জন্য বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ গঠিত হইয়াছে । এই পরিষদের ব্যবস্থায় যে শিল্প বাণিজ্য বিষয়ক টেকনিক্যাল শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহার ফলে বাঙ্গলার জন সাধারণ নব নব প্রণালীতে আর্থিক অভাব মোচন করিবার সুযোগ পাইবে । জাতীয় শিক্ষা পরিষদের গোড়ার কথাই এই অর্থকরী বিদ্যা , ভাত কাপড় বিষয়ক বিদ্যার ব্যবস্থা । কৃষি শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি সংক্রান্ত নানা কর্মের দিকে যুবক বাঙ্গলার মাথা হাত পা তৈয়ারী করিয়া দিবার জন্য জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন আবির্ভূত হইয়াছে । দেশের ভিতরে যে সকল প্রাকৃতিক শক্তি , সুযোগ ও সম্পদ আছে সেই গুলোকে বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক প্রণালীতে পুষ্ট করার দিকে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধানতম নজর থাকিবে । দেশের ধন সম্পদ যাহাতে বৃদ্ধি পাইতে পারে , জাতীয় ধন ভান্ডার যে যে কর্ম - কৌশলে পরিপুষ্ট হইতে পারে সেই সকল দিকে শিক্ষা প্রচার করিবার জন্য জাতীয় শিক্ষা পরিষদের জন্ম ।

বঙ্গভঙ্গ যুগে জাতীয় বিদ্যালয়ে ছাত্রদের ভর্তি করার জন্য অভিভাবকেরা ভীত ও চিন্তিত ছিলেন । প্রধান কারণ ছিল দুটি (১) এই বিদ্যালয়ে তাদের ছেলে ভর্তি হলে ' বিপ্লবী ' বা ' স্বদেশী ' বলে চিহ্নিত হবে । (২) এই বিদ্যা - লয়ের সিলেবাস শেষ হওয়ার পর সরকারী চাকুরী পাবে কি না ? বা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পাবে কি না ? এই চিন্তাগুলোর জন্য এই প্রবন্ধে বিনয় সরকার বলছেন , " এই সকল ইস্কুলে ভর্তি হওয়ার ভিতর ভাবুকতা , স্বার্থ - ত্যাগ ইত্যাদি কিছুই নাই । আছে নিজ নিজ অন্ন সংস্থানের আশা , ভবিষ্যৎ স্বার্থ সিদ্ধির ব্যবস্থা । ছেলেদেরকে জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি করিলে কোনো পরিবারের

আর্থিক লোকসান হইবার সম্ভাবনা নাই, বরং লাভই আছে ষোল আনা। এই সকল বিদ্যালয় হইতে যে সকল ছেলেরা বাহির হইয়া আসিবে, তাহার দেশের ভিতর নতুন নতুন সম্পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে। তাহারা যে কেবল দেশ বা সমাজকে ঐশ্বর্যশালী বা ধনী করিয়া তুলবে তাহা নয়। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নিজের পেট পূজার ব্যবস্থাও হইতে থাকিবে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ট্যাঁকেও রোজগারের টাকা আনিয়া জমাইতে পারিবে। এম্ন বস্তুর সঙ্গে জাতীয় শিক্ষার অচ্ছেদ সম্বন্ধ। জাতীয় শিক্ষা ষোল আনা বৈষয়িক আদর্শে গঠিত।"

তদানীন্তন পরিবেশ সম্পর্কে মন্তব্য করে বিনয় সরকার লিখছেন, "জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ইস্কুল - কলেজের শিক্ষা প্রণালীর ভিতর সমগ্র দেশের লোকের ভবিষ্যত জাতিগত সম্পদ বৃদ্ধি ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। অপর দিকে বেশ বুঝা যাইতেছে যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন কি মামুলি অভাব মোচনের সুযোগও নেহাৎ কম। সকল দিকদিয়ে বিবেচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, যে সকল পরিবারের কোনো বাঁধা পথ নাই তাহাদের পক্ষে জাতীয় বিদ্যালয়ে ছেলেদের কেতৈয়ার করিয়া লওয়াও সম্পদ বৃদ্ধির উপায় বটেই। অধিকন্তু যে সকল পরিবার বেশ স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করিতেছে তাহাদের পক্ষে ভারতবর্ষের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য জাতীয় শিক্ষা - পরিষদের আশ্রয়ে ছেলেদেরকে হাত - পায় কাজে আর যন্ত্র ব্যবহারের কাজে গড়িয়া তোলা কর্তব্য।"

স্বদেশী শিক্ষার বাস্তব ভাবনার সাথে বিনয় সরকার আদর্শগত ভাবনাকেও উন্নত করেছিলেন। স্বদেশ চেতনার যে ব্রত এই ছাত্র সমাজের মধ্যে দেখাদিয়েছিল তাকে তিনি আন্তরিক ভাবে সমর্থন করেছেন। " যে লেখা পড়ার আবহাওয়ায় স্বদেশ সেবা বে-আইনি বিবেচিত হয়, সেই লেখা পড়া ছাড়িয়া দেওয়াই তাহারা মনুষ্যত্ব গঠনের সোপান রূপে গ্রহণ করে। সরকারী স্কুল আর সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করিয়া স্বদেশ সেবার মন্ত্র বজায় রাখিবার জন্য তাহারা

ব্রতবদ্ধ হইয়াছিল । যুবক - বাংলার এই পুণ্য কাহিনী বাঙালী জাতি কোন দিনই ভুলিতে পারিবে না । "

দেশের মানুষকে এই ব্রতে আহ্বান জানিয়ে বিনয় সরকার বলছেন , " এই সমুদয় কর্তব্য নিষ্ঠ স্বদেশ ব্রত ধারী যুবাগণের ভবিষ্যত উন্নতির সম্বন্ধে আশীর্বাদ করিবার জন্য কোন বাঙালী পরিবার আজ অগ্রসর হইবে না ? ত্যাগ মন্ত্রের এই সকল উপাসকদিগকে অসহায় ও সঙ্গীহীন রূপে ফেলিয়া রাখিবার বাংলা দেশের কোন পিতামাতা ও অভিভাবক নিজ নিজ ছেলেদেরকে পরামর্শ দিবে ? নিজের ছেলেদিগের জন্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বা আর কোনো সরকারী চাকরে হিসেবে বড় হইবার ব্যবস্থা করিয়া কোন বাঙালী পরিবার আজ পর্যন্ত এই সকল স্বার্থত্যাগী যুবক বৃন্দের কর্মরাশিকে অপমানিত করিতে সাহসী হইবে ? সেই সাহস আর সেই হৃদয় কোনো বাঙালীরই নাই । যদি বাংলা দেশে এমন কোনো লোক থাকে তবে সে রক্তমাংসের মানুষ নয় । মানুষের কলিজা , মানুষের হৃদয় , মানুষের চিত্ত প্রবৃত্তি তাহার নাই । সে নরাধম । "

সেযুগে কিছু লোকের স্বার্থপরতা তাঁকে আহত করেছিল । তিনি তাই মন্তব্য করছেন " এই অবস্থায় লোক দেখানো স্বদেশ সেবা , লোক দেখানো স্বজাতি নিষ্ঠা , আর লোক দেখানো স্বদেশী আন্দোলন ছাড়িয়া দিয়া নিজ নিজ তাঁত কাপড় আর টাক সামলাইতে লাগিয়া যাওয়াই শ্রেয়স্কর । স্বদেশী আন্দোলনকে যাহারা ভালবাসে তাহারা স্বদেশী আন্দোলনের জন্য স্বার্থত্যাগী এবং সরকারী ইস্কুল বর্জন - কারী ছাত্রদের সঙ্গে সহযোগিতা করিবে এইরূপই আশা করা যায় । "

বিনয় সরকার জাতীয় আন্দোলন চলাকালীন সময়ে বহু পুস্তক রচনা করেন । ১৯০৬ - ১৯১৪ সালের এই মধ্যবর্তী সময় কালীন তাঁর প্রবন্ধগুলি সেই সব পত্রিকায়

প্রকাশিত হয়েছিল ।

(১) বঙ্গে নবযুগের নতুন শিক্ষা (১৯০৭), ৫০ পৃষ্ঠা

(২) মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতির কার্য্য পরিচালনা (১৯০৭) পৃষ্ঠা ১৬

(৩) শিক্ষা বিজ্ঞানের ভূমিকা (১৯১০) পৃষ্ঠা ৫৬

(৪) প্রাচীন গ্রীসের শিক্ষা (১৯১০) ১৭৫ পৃষ্ঠা

(৫) ভাষা শিক্ষা (১৯১০) ১২০ ঐ

(৬) সংস্কৃত শিক্ষা প্রচারণো (১৯১১) ৩২০ পৃষ্ঠা

(৭) শিক্ষা সমালোচনা (১৯১২) ১৫০ পৃষ্ঠা

(৮) নিগ্রো জাতির কর্মবীর (১৯১৪) ২৮০ পৃষ্ঠা

'শিক্ষা বিজ্ঞানের ভূমিকা'য় তিনি বলছেন " যে কোন দেশে এবং যে কোন যুগে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেই দেশ ও সেই যুগের শিক্ষাগুরু - দিগকে ত দেশোপযোগী স্বাভাবিক এবং তৎকালোচিত 'আধুনিক' শিক্ষা প্রণালীর প্রবর্তন করিতে হইবে। সেই সমাজের প্রকৃতি কি, কোথায় ইহার বিশেষত্ব, কোনো কোন বিষয়ে ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় এবং তৎকালের যুগধর্ম কি, অর্থাৎ সেই যুগে পৃথিবীতে কোন কোন ভাব ও কর্ম সমূহ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এবং তাহার দ্বারা কিরূপ নূতন অবস্থা সংঘটন হইয়াছে ও হইবার সম্ভাবনা এই সকল বিষয় আলোচনা না করিলে সকল শ্রমই পন্ড হইয়া যায়। এই রূপ সমাজোপযোগী এবং 'আধুনিক' শিক্ষা পদ্ধতিকেই স্বাভাবিক বা জাতীয় শিক্ষা বলা হয়। ইহার দ্বারাই সেই জাতির তৎকালোপযোগী জীবন বিকাশের সুবিধা হয়। এবং ইহাতে সমাজে স্বীয় কর্তব্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়া ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির সহায়তা করে এবং মানব সভ্যতার বিস্তৃতি ও বিকাশের উপযোগী হয়। " ৫৬

তিনি আরও বলছেন , " সবাজোপযোগিতা , স্বাধীনতা এবং কালোপযোগিতা প্রকৃত স্বাভাবিক শিক্ষার প্রধান লক্ষণ । তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষা ও জাতীয় ইতিহাস চেতনার উপর জোর দিয়েছিলেন । তিনি বলছেন " সুপরিচিত মাতৃভাষার শিক্ষা প্রণালী যেমন সকল ভাষা শিক্ষায় প্রয়োগ করিতে হইবে , তেমনি পরিচিত বর্তমান জাতীয় ইতিহাস আলোচনাকেই সকল ইতিহাস শিক্ষার ভিত্তিরূপে বিবেচনা করিতে হইবে । " ৩৭

বাঙালী জীবনে বিনয় সরকার যেন একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তি সত্ত্বাকে অতিক্রম করে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল । তাঁকে কেন্দ্র করে বিশাল এক পন্ডিত গোষ্ঠী' আবর্তিত হতো । তাঁর মতবাদ তদানীন্তন সময়ে ('Sarkarism') নামে পরিচিত ছিল । তাঁর সম্পর্কে সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন " আজীবন কাল বিনয় কুমার দেশ ভক্তির আবেগে চালিত হন । যুক্তিবাদী এবং আধুনিকতার অনুরাগী হলেও ভারতীয় সমাজ ও ঐতিহ্য সম্পর্কে তিনি ছিলেন সমালোচনা বিমুখ । ভারত মহিমা প্রচার ও ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছিল তাঁর স্বপ্ন ও সাধনার বস্তু । নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তিনি সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন ও আন্দোলনের বিচার করতেন শুধু প্রত্যক্ষ ভাবে সেসবের সঙ্গে বিশেষ যুক্ত থাকেন নি । বিভিন্ন মহাদেশের বহুদেশে পর্যটনের ফলে তাঁর বিপুল বিদ্যাবত্তার সঙ্গে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মিলন ঘটে । " ৩৮

অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২ - ১৯৫০)
- - - - - - - - - - - - - - - - -

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলায় রাম মোহন - বঙ্কিমের প্রভাব ছিল তীব্র । এই প্রভাবের চিন্তাধারায় অরবিন্দ লালিত পালিত হন । বঙ্কিম চন্দ্রের আদর্শ ছিল তাঁর দেশ প্রেমের উপজীব্য বস্তু । বিলাতে থাকাকালীন অবস্থাতে

রাজনীতির প্রতি তিনি আকৃষ্ট ছিলেন। দাদা ভাই নৌরজীর পার্লামেন্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাঁকেও উদ্বেলিত করেছিল। বিলাতেই তিনি ভারতীয় ছাত্রদের গুপ্ত সংস্থা 'Lotus and Dagger' এর সাথে যুক্ত ছিলেন।

দেশে ফিরে শুরু হলো ভারত ভক্তির সাধনা। বরোদায় থাকার সময় 'ইন্দু প্রকাশ' পত্রিকায় 'New Lamps for old' প্রবন্ধে দেশের রাজনৈতিক দুর্গতি সম্পর্কে লিখলেন। ধারণা পোষন করতেন বিপ্লব বাদের। সমগ্র বিশ্বের বিপ্লবী আন্দোলনের সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল প্রখর। স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি তাঁর স্ত্রীকে যে চিঠি লেখেন তাতে তাঁর মানসিক ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখছেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান যে গুণ, যে প্রতিভা, যে উচ্চ শিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন দিয়াছেন, সবই ভগবানের। যাহা পরিবারের ভরণ পোষণে লাগে আর যাহা নিতান্ত অবশ্যকীয়, তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার, যাহা বাকি রহিল ভগবানকে ফেরৎ দেওয়া উচিৎ ..... ভগবানকে দেওয়ার মানে কি, মানে ধর্ম্ম কার্য্যে ব্যয় করা। এই দুর্দিনে সমস্ত দেশ আমার আশ্রিত, আমার ত্রিশ কোটি ভাইবোন এদেশে আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মরিতেছে, অধিকাংশই কষ্টে ও দুঃখে জর্জরিত হইয়া কোন মতে বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের হিত করিতে হয়। ..... আরেকস্থানে তিনি বলছেন, " অন্যলোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতকগুলো মাঠ ক্ষেত্র বন পর্বত নদী বলিয়া জানে, আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি পূজা করি। মার বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয় তাহা হইলে ছেলে কি করে ? নিশ্চিত ভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রী পুত্রের সাথে আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায় ? আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছিনা, জ্ঞানের বল। ক্ষাত্রতেজ আমার তেজ নহে, ব্রহ্মতেজও আছে, সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।" ৫৯

১৯০৫ এ ঘটল বঙ্গভঙ্গ । বঙ্গভঙ্গবিরোধী এই বিদ্রোহী বহ্নি শিখাকে দেখে তিনি সকল শক্তি নিয়ে এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়ালেন । কলকাতার রাজপথ তখন উদ্দীপ্ত । বাংলার প্রান্তরেদেশ প্রেমের আগুনের জোয়ার । অরবিন্দ কলকাতাকে বেছে নিলেন কাজের ক্ষেত্র রূপে । ১৯০৬ ' বন্দেমাতরম ' পত্রিকার সম্পাদনার ভার তুলে নিলেন । ইংরাজী রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন ।

তবুও বাংলা রচনার অনেক ফসলই অরবিন্দ দিয়েছেন । তিনি ' কর্মযোগিন ' ও ' ধর্ম ' নামে দুইটি পত্রিকা বার করেছিলেন । ' ধর্ম ' প্রকাশিত হয় ১৩১৬ সালে । ' ধর্ম ' পত্রিকায় আধ্যাত্মিকতা আর্যধর্মের অনুশীলন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রবন্ধ রচিত হলেও অরবিন্দ স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে কিছু প্রবন্ধ ধর্ম ' পত্রিকায় প্রকাশ করেন । বাংলা ভাষায় তাঁর রচিত স্বদেশী যুগের প্রবন্ধ গুলো হচ্ছে গল্প ' স্বপ্ন ' (সুপ্রভাত পত্রিকায় প্রকাশিত , ১৩১৬) , ' ক্ষমার আদর্শ ' (ধর্ম , ১১ই ফাল্গুন , ১৩১৬) উপনিষদ (ধর্ম , ২৭শে অগ্রহায়ণ , ১৩১৬) , ' পুরাণ ' (ধর্ম , ১২ই পৌষ , ১৩১৬) , ' গীতার ধর্ম্ম ' (ধর্ম , ১৪ই ভাদ্র , ১৩১৬) , সন্ন্যাস ও ত্যাগ ' (ধর্ম , ২১শে ভাদ্র , ১৩১৬) , ' বিশ্বরূপ দর্শন ' (ধর্ম , ২৩শে মাঘ , ১৩১৬) , গীতার ভূমিকা (ধর্ম , ১৮ই আশ্বিন - ২রা ফাল্গুন , ১৩১৬) , ' অহঙ্কার ' (ধর্ম , ৪ঠা আশ্বিন , ১৩১৬) , ' স্তবস্তোত্র ' (ধর্ম , ২রা ফাল্গুন , ১৩১৬) , ' আমাদের ধর্ম্ম ' (ধর্ম , ৭ই ভাদ্র , ১৩১৬) , ' মায়া ' (ধর্ম , ২১শে ভাদ্র , ১৩১৬) , ' নিবৃত্তি ' (ধর্ম , ৬ অগ্রহায়ণ , ১৩১৬) , ' প্রাকাম্য ' (ধর্ম , ১২ , ১৯ পৌষ , ১৩১৬) , ' অতীতের সমস্যা ' (ধর্ম , ১১ই আশ্বিন , ১৩১৬) , ' দেশ ও জাতীয়তা ' (ধর্ম , ২০শে অঘ্রান , ১৩১৬) , ' স্বাধীনতার অর্থ ' (ধর্ম , ২৫শে আশ্বিন , ১৩১৬) , ' ভাতৃত্ব (ধর্ম , ২৩শে মাঘ , ১৩১৬) , ' জাতীয় উত্থান ' (ধর্ম , ৪ঠা আশ্বিন , ১৩১৬) , ' আমাদের আশা ' (ধর্ম , ৪ঠা আশ্বিন , ১৩১৬), প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ' (ধর্ম , ১৮ই মাঘ , ১৩১৬), এই সময় সুপ্রভাত পত্রিকায় ' কারা কাহিনী ' (১৩১৬) প্রকাশিত হতে থাকে , এবং ' ভারতী 'তে ' কারাগৃহ ও স্বাধীনতা ' ।

অরবিন্দর সময় ভারতীয় পুরানো অতীত ও বর্তমান সমাজ মানসিকতায় পুরানো সবকিছুকে ভেঙে নতুন করে গড়বার যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল তাতে তাঁর প্রবন্ধ ' পুরাতন ও নূতন ' এ অরবিন্দ বলছেন " ...... বঙ্গদেশের যে এখনকার অবস্থা , তাহা হইতে কি অধিক সর্বনাশ , কি অধিক শোচনীয় পরিণাম হইতে পারে , তাহা বোঝা কল্পনা করা দুষ্কর । পুরাতন কে আঁকড়িয়া যদি এই অবস্থাই হইল , তবে নূতনের চেষ্টা করায় দোষ কি ? জাতির মৃত্যুর আশঙ্কা উপস্থিত , পুরাতনের উপর ভর দিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা ভাল , না এই জাল ছিন্ন বিছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা জীবনের মুক্তপথে বাহির হইবার প্রবৃত্তিই শ্রেয়স্কর ?

অরবিন্দ বিশ্লেষণী মন নিয়ে ভারতবর্ষের বর্তমান সঙ্কট জনক পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর ' অতীতের সমস্যা ' প্রবন্ধে । ইংরাজ অধীনস্থ ভারতের কারণ খোঁজার চেষ্টা করেছেন তিনি । তিনি বলছেন , " অষ্টাদশ শতাব্দীতে তামসিক অজ্ঞান ও ঘোর রাজসিক প্রবৃত্তি ভারতবাসীকে গ্রাস করিয়াছিল , দেশে সহস্র স্বার্থপর , কর্তব্য পরাঙ্মুখ , দেশদ্রোহী , শক্তিমান অসুর প্রকৃতির লোক জন্ম গ্রহণ করিয়া পরাধীনতার অনুকূল অবস্থা প্রস্তুত করিয়া ছিল । সেই সময়ে ভগবানের গূঢ় অভিসন্ধি সম্পাদনার্থ ভারতে দূর দ্বীপান্তরবাসী ইংরেজ বণিকের আবির্ভাব হইয়াছিল । পাপ ভারাক্রান্ত ভারতবর্ষ অনায়াসে বিদেশীর করতলগত হইল । "

অনেকে ইংরেজদের এই কার্যকে স্বদেশ প্রেমের কার্য্য বলে মনে করেন । অরবিন্দ কিন্তু তাঁর প্রবন্ধে ভিন্ন কথা বলছেন " ভারতবাসী আর সকল গুনে ইংরাজের সমান হইয়াও জাতীয় ভাব রহিত ছিলেন , ইংরাজের মধ্যে সেই গুনের পূর্ণ বিকাশ ছিল । এই কথায় যেন কেহ না বুঝেন যে ইংরাজগণ স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন । .... ইংরাজ - গণ স্বদেশের হিতার্থে ভারতে আসেন নাই , নিজ নিজ আর্থিক লাভার্থে আসিয়াছিলেন , স্বদেশর হিতার্থে ভারত বিজয় ও লুন্ঠন করেন নাই । অনেকটা নিজ স্বার্থ সিদ্ধার্থে জয় ও লুন্ঠন করিয়াছিলেন । "

ভারতের ঊনবিংশ শতাব্দীর পরিবেশ প্রসঙ্গে তিনি বলছেন ভারত পূর্ণ তমো - ভাবের ক্রোড়ে নিদ্রিত হইয়া পড়িল । অপ্রকাশ , অপ্রবৃত্তি , অজ্ঞান , অকর্মণ্যতা , আত্মবিশ্বাসের অভাব , আত্ম সম্মান বিসর্জন , দাসত্ব প্রিয়তা , পরধর্ম সেবা , পরের অনুকরণ , পরাশ্রয়ে আত্মোন্নতি চেষ্টা বিষাদে আত্ম নিন্দা , ক্ষুদ্রাশয়তা , আলস্য ইত্যাদি সকলই তমোভাব প্রকাশক গুণ । এই সকলের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতে কোনটির অভাব ছিল ? সেই শতাব্দীর সর্বচেষ্টা ও গুণ সকলের প্রবল্যে তমঃশক্তির চিহ্নে সর্বত্রই চিহ্নিত । "

এখন এই স্বদেশী যুগে ভারত জাগ্রত । " সেই জাগরণের প্রথম আবেগে জাতীয় ভাবের উদ্দীপনার জ্বালাময়ী শক্তি জাতির শিরায় শিরায় খরতর বেগে বাহিতে লাগিল । তাহার সহিত স্বদেশ প্রেমের উন্মাদকর আবেগ যুবকবৃন্দকে অভিভূত করিল । আমরা পাশ্চাত্য জাতি নহি , আমরা এশিয়াবাসী , আমরা ভারতবাসী, আমরা আর্য্য । আমরা জাতীয় ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি , কিন্তু তাহার মধ্যে স্বদেশ প্রেমের সঞ্চার না হইলে আমাদের জাতীয় ভাব পরিস্ফুট হয় না । এই স্বদেশ প্রেমের ভিত্তি মাতৃ - পূজা । যেদিন বঙ্কিম চন্দ্রের ' বন্দেমাতরম ' গান বাহ্যেন্দ্রিয় অতিক্রম করিয়া প্রাণে আঘাত করিল , সেই দিন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে স্বদেশ প্রেম জাগিল , মাতৃমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল । স্বদেশ মাতা , স্বদেশ ভগবান স্বরূপ । যেমন জীব ভগবানের অংশ , তাহার শক্তি ভগবানের শক্তির অংশ , তেমনই এই সপ্তকোটি বঙ্গ - বাসী , এই ত্রিংশকোটি ভারতবাসীর সমষ্টি সর্বব্যাপী বাসুদেবের অংশ , এই ত্রিংশ - কোটির আশ্রয় শক্তি স্বরূপিনী , বহুভুজান্বিতা , বহুবলধারিণী ভারত জননী ভগবানের একটি শক্তি , মাতা , দেবী জগজ্জননী কালীর দেহ বিশেষ । এই মাতৃ - প্রেম মাতৃজাতির মনে প্রাণে জাগরিত ও প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই কয় বর্ষের উত্তেজনা , উদ্যম , কোলাহল , অপমান , লাঞ্ছনা , নির্যাতন ভগবানের বিধানে বিহিত ছিল । "

স্বদেশী আন্দোলন যুগের যুব সমাজের মধ্যে জীবন বলিদান করার মহৎ আদর্শ অরবিন্দ দেখেছিলেন , যে মহৎ শক্তির অভ্যুদয় দেখেছিলেন সেই শক্তিকে

তিনি সংহত করতে চাইছিলেন । তাই এই প্রবন্ধের শেষভাগে বলছেন , " এখন যে সব যুবক বৃন্দ দেশময় পথান্বেষণ ও কর্ম্মান্বেষণ করিতেছেন , তাহারা উত্তেজনা অতিক্রম করিয়া ছিন্দিন শক্তি আনয়নের পথ খুঁজিয়া লউন । যে মহৎ কার্য্য সমাধা করিতে হইবে তাহা কেবল উত্তেজনার দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না , শক্তি চাই । তোমাদিগের পূর্ব পুরুষদের শিক্ষায় যে শক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই শক্তি অঘটন ঘটন পটিয়সী । সেই শক্তি তোমাদের শরীরে অবতরণ করিতে উদ্যত হইতেছেন । সেই শক্তিই মা । তাহাকে আত্ম সমর্পণ করিবার উপায় শিখিয়া লও । মা তোমাদিগকে যন্ত্র করিয়া দ্রুত সত্বর এমন সকল কার্য্য সম্পাদন করিবেন যে জগৎ স্তম্ভিত হইবে । সেই শক্তির অভাবে তোমাদের সকল চেষ্টা বিফল হইবে । মাতৃমূর্তি তোমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত , তোমরা মাতৃপূজা ও মাতৃ সেবা করিতে শিখিয়াছ , এখন অন্তর্নিহিত মাতাকে আত্ম সমর্পণ কর । কার্য্যোদ্ধারের অন্য পন্থা নাই । " ৬০

বঙ্গভঙ্গ যুগে রাজনৈতিক সংজ্ঞা ও রাজনৈতিক ধারণার সংঘাত ছিল । দেশপ্রেম , জাতীয়তাবোধ , নরমপন্থী মতবাদের আদর্শ , চরমপন্থীর দৃষ্টিকোন এই সকল বিষয় নিয়ে মানুষের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ছিল । অরবিন্দ ' দেশ ও জাতীয়তা ' প্রবন্ধে কিছু ধ্যান ধারণার ব্যাখ্যা করলেন । " যখন এক দেশ এক মা – একদিন একতা হইবেই হইবে , অনেক জাতির মিলনে এক বলবান অজেয় জাতিই হইবে , ধর্ম্মমত এক নহে , সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে চির বিরোধ , মিল নাই , মিলের আশাও নাই , তথাপি ভয় নাই , একদিন স্বদেশ মূর্তি ধারিণী মায়ের প্রবল টানে ছলে বলে , সাম্য দান্ড মিল হইবেই হইবে , সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা ভাতৃভাবে , মাতৃ প্রেমে ডুবিয়া যাইবে । এক দেশে নানা ভাষা , ভাই ভাইয়ের কথা বুঝিতে অক্ষম , পরস্পরের ভাবে প্রকাশ করি না , হৃদয়ে হৃদয়ে আবদ্ধ হইবার পথে অভেদ্য প্রাচীর পড়িয়া রহিয়াছে , অতি কষ্টে লঙ্ঘন করিতে হয় , তথাপি ভয় নাই । এক দেশ , এক জীবন , এক চিন্তার স্রোত সকলের মনে , প্রয়োজনের প্রেরণায় সাধারণ ভাষা সৃষ্ট হইবেই হইবে , হয় বর্তমান একটি ভাষার আধিপত্য স্বীকৃত হইবে , নহে ত নতুন ভাষার সৃষ্টি হইবে , মায়ের

মন্দিরে সকলে সেই ভাষা ব্যবহার করিবে। ..... এক মায়ের গর্ভে জন্ম হইয়াছে, এক মায়ের কোলে নিবাস করি, এক মায়ের পঞ্চভূতে মিশিয়া যাই, আন্তরিক সহস্র বিবাদ সত্ত্বেও মায়ের ডাকে মিলিত হইব। প্রাকৃতিক নিয়ম এই, সর্বদেশের ইতিহাসের শিক্ষা এই, দেশ জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা, সেই সম্বন্ধ অবার্থ, স্বদেশ থাকিলে জাতীয়তা অবশ্যম্ভাবী। এক দেশে দুই জাতি চিরকাল থাকিতে পারে না, মিলিত হইবেই। অপর পক্ষে একদেশ যদি না থাকে, জাতি ধর্ম, ভাষা এক হউক, তাহাতে কোনও ফল নাই, একদিন স্বতন্ত্র জাতির সৃষ্টি হইবেই। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশ সংযুক্ত করিয়া এক বৃহৎ সাম্রাজ্য করা যায়, এক বৃহৎ জাতি হয় না। সাম্রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে আবার স্বতন্ত্র জাতি হয়, অনেকবার সেই অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক স্বতন্ত্রতাই সাম্রাজ্য নাশের কারণ হয়।"

তদানীন্তন ভারতের পরিবেশ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অরবিন্দ বলছেন, "আমাদের দেশে কখনও একতা হয় নাই, কিন্তু চিরকাল একতার দিকে টান ছিল, স্রোত ছিল, আমাদের ইতিহাসে ভারতের বিভিন্ন অঙ্গ এক করিবার জন্য আকর্ষন করিয়াছে। এক প্রাকৃতিক চেষ্টার কয়েকটি প্রধান অন্তরায় ছিল, প্রথম প্রাদেশিক বিভিন্নতা, দ্বিতীয় হিন্দু - মুসলমান বিরোধ, তৃতীয় মাতৃ দর্শনের অভাব। দেশের বৃহৎ আকার, যাতায়াতের আয়াস ও বিলম্ব, ভাষার বিভিন্নতা প্রাদেশিক অনৈক্যের মুখ্য সহায়।"

আমাদের দৃষ্টি যে সম্পূর্ণ দেশ গঠনের ছিল না তিনি উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করছেন, "আমাদের রাজনীতিবিদ প্রায়ই মায়ের সম্পূর্ণ স্বরূপ দর্শন করিতে অসমর্থ ছিলেন। রণজিৎ সিংহ বা গুরু গোবিন্দ ভারত মাতা না দেখিয়া পঞ্চনদ মাতা দেখিয়েছিলেন। শিবাজী ও ও বাজীরাও ভারতমাতা না দেখিয়া হিন্দুর মাতা দেখিয়াছিলেন। অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় রাজনীতিবিদ মহারাষ্ট্র মাতা দেখিয়াছিলেন। আমরাও বঙ্গভঙ্গের সময়ে বঙ্গ মাতার দর্শন লাভ করিয়াছিলাম। সেই দর্শন অখন্ড দর্শন অতএব বঙ্গদেশের ভাবী একতা ও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু ভারত মাতার

অখন্ড মূর্তি এখনও প্রকাশ হয় নাই । কংগ্রেসে যে ভারত মাতার পূজা নানারূপ স্তব স্তোত্র করিতাম , সে কল্পিত , ইংরেজ সহচরী ও প্রিয় দাসী , ম্লেচ্ছ বেশভূষা সজ্জিত দানবী মায়া , সে আমাদের মা নহে , তাহার পশ্চাতে প্রকৃত মা নিবিড় অস্পষ্ট আলোকে লুক্কায়িত আমাদের মন প্রাণ আকর্ষণ করিতেন । যেদিন অখন্ড স্বরূপ পূর্ণ মাতৃমূর্তি দর্শন করিব , তাঁহার রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার কার্যে জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য উন্মত্ত হইব , সেদিন এ অন্তরায় তিরোহিত হইবে , ভারতের একতা স্বাধীনতা ও উন্নতি সহজ সাধ্য হইবে । " ৬১

পরাধীন দেশের একটি মাত্রই উদ্দেশ্য থাকে তার নাম স্বাধীনতা । স্বাধীনতা সম্পর্কেও বিচিত্র ধারণা বিভিন্ন ব্যক্তি পোষণ করতেন । অরবিন্দ 'স্বাধীনতা' প্রবন্ধে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করছেন " জাতির পক্ষে পরাধীনতা মৃত্যুর দূত ও আজ্ঞা - বাহক , স্বাধীনতাই জীবন রক্ষা , স্বাধীনতাই উন্নতির সম্ভাবনা । ..... পরাধীনতার প্রধান ভিত্তি জাতির স্বধর্মনাশ ও পরধর্মসেবা । যদি পরাধীন অবস্থায় স্বধর্ম রক্ষা করিতে বা পুনরুজ্জীবিত করিতে পারি , পরাধীনতার বন্ধন আপনি খসিয়া পড়িবে , ইহা অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক নিয়ম । অতএব কোন জাতি যদি নিজদোষে পরাধীনতায় পতিত হয় , অবিকল ও পূর্ণাঙ্গ স্বরাজ তাহার প্রথম উদ্দেশ্য ও রাজনীতিক আদর্শ হওয়া উচিৎ । ..... আমরা পূর্ণাঙ্গ স্বরাজ চাই । যদি বৃটিশ জাতি এমন যুক্ত সাম্রাজ্যের ব্যবস্থা করে যে , তাহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া ভারতবাসীর সেইরূপ স্বরাজ সম্ভব হয় আপত্তি কি ? আমরা ইংরেজ জাতির বিদ্বেষে স্বরাজ চেষ্টা করিতেছি না , দেশ রক্ষার জন্য করিতেছি । কিন্তু আমরা পূর্ণাঙ্গ স্বরাজ ভিন্ন অন্য আদর্শ স্বীকার করিয়া দেশবাসীকে মিথ্যা রাজনীতি ও দেশ রক্ষার ভুল মার্গ প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত নহি ।" ৬২

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন দেশে এক উত্থানের সৃষ্টি করেছিল । বাস্তবিক পক্ষে এটা ছিল জাতীয় উত্থান । অরবিন্দও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে জাতীয় উত্থান বলে মনে করতেন । তাই তিনি ' জাতীয় উত্থান ' নামকশীর্ষে এই আন্দোলনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন । তিনি বলছেন " আমাদের প্রতিপক্ষীয় ইংরেজগণ বর্তমান মহৎ ও সর্ব্বব্যাপী

আন্দোলনকে আরম্ভাবধি বিদ্বেষজাত বলিয়া অভিহিত করিয়া আসিতেছেন এবং তাহাদের অনুকরণ প্রিয় কয়েকজন ভারতবাসীও এই মতের পুনরাবৃত্তি করিতে ক্রটি করেন না, আমরা ধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত জাতীয় উত্থান স্বরূপ আন্দোলন ধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া কখন প্রচার করিতে সাহসী হইতাম না। বিরোধ যুদ্ধ হত্যা পর্যন্ত ধর্ম্মের অঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু বিদ্বেষ ও ঘৃণা ধর্ম্মের বহির্ভূত, বিদ্বেষ ও ঘৃণা জগতের ক্রমোন্নতির বিকাশে বর্জনীয় হয়, অতএব যাহারা স্বয়ং এই বৃত্তিগুলি পোষণ করেন কিম্বা জাতির মধ্যে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করেন তাহারা অজ্ঞানের মোহে পতিত হইয়া পাপকে আশ্রয় দেন। এই আন্দোলনের মধ্যে কখনও যে বিদ্বেষ প্রবিষ্ট হয় নাই, তাহা আমরা বলিতে পারি না। যখন এক পক্ষ বিদ্বেষ ও ঘৃণা করে, তখন অপর পক্ষেও তাহার প্রতিঘাত স্বরূপ বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রসূত হওয়া অনিবার্য্য। এই রূপ পাপ সৃষ্টির জন্য বঙ্গদেশের কয়েকটি ইংরাজ সংবাদ পত্র ও উদ্ধত স্বভাব অত্যাচারী ব্যক্তি বিশেষের আচরণ দায়ী। ..... ভারতবাসীর প্রাণে বহুকাল হইতে ইংরাজ ব্যক্তি বিশেষের অন্যায় আচরণে ও উদ্ধত কথায় এবং বর্তমান শাসন তন্ত্রে প্রজার কোনও প্রকৃত অধিকার বা ক্ষমতা না থাকায় ভিতরে ভিতরে অসন্তোষ অলক্ষিত ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল। শেষে লর্ড কার্জনের শাসন সময়ে এই অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করিয়া বঙ্গভঙ্গ জাত অসহ্য মর্ম্মবেদনায় অসাধারণ ক্রোধ দেশময় জ্বলিয়া উঠিয়া রাজপুরুষদিগের নিগ্রহ নীতির ফলে বিদ্বেষে পরিণত হইয়াছিল। .... কোন ব্যক্তি বিশেষ, তিনি রাজ পুরুষই হউন বা দেশবাসীই হউন অমর্ষ, অন্যায় বা অযৌক্তিক কার্য বা মত প্রকাশ করিলে আমরা ভদ্র সমালোচিত আচারের অধিকারী বিদ্রূপ ও তিরস্কার করিয়া সেই কার্য্য বা সেই মতের প্রতিবাদ ও খন্ডনে অধিকারী। কিন্তু কোনও জাতি বা ব্যক্তির উপর বিদ্বেষ বা ঘৃণা পোষণ বা সৃজনে আমরা অধিকারী নহি। অতীতে যদি এইরূপ দোষ ঘটিয়া থাকে, সে অতীতের কথা ভবিষ্যতে যাহাতে এই দোষ না ঘটে আমরা সকলকে এবং বিশেষতঃ জাতীয় পক্ষের সংবাদ পত্র ও কার্যক্ষম যুবকবৃন্দকে এই উপদেশ দিতেছি। ..... আমরা ভবিষ্যত আশা স্বরূপ যুবকদিগকে বলি, যদি তোমাদের প্রাণে বিদ্বেষ থাকে, তাহা অচিরেই উন্মূলিত কর। বিদ্বেষের তীব্র উত্তেজনায় ক্ষণিক রজপূর্ণ বল সহজে জাগ্রত হয় ও শীঘ্র [illegible] দুর্বলতায় পরিণত হয়। যাহারা দেশোদ্ধারার্থে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও

উৎসর্গীকৃত প্রাণ , তাঁহাদের মধ্যে প্রবল তাড়না , কঠোর উদ্যম , লৌহসম দৃঢ়তা ও জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য তেজ সঞ্চার কর , সেই শক্তিতে অটুট বলান্বিত ও চিরজয়ী হইব । "

অন্ধকার দীর্ণ ভারতে অরবিন্দ বর্তমান যুগে আশার আলোকে যুব সমাজকে উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা করেছেন তাঁর ' আমাদের আশা ' প্রবন্ধে । তিনি বলছেন , " আমাদের বাহুবল নাই , যুদ্ধের উপকরণ নাই , শিক্ষা নাই , রাজশক্তি নাই , আমাদের কিসেতে আশা , কোথায় সেই বল যাহার ভরসায় আমরা প্রবল শিক্ষিত য়ুরোপীয় জাতির অসাধ্য সাধন করিতে প্রয়াসী হই । ..... যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ , কিন্তু ধর্ম্মের পিছনে শক্তি চাই , নচেৎ অধর্ম্মের অভ্যুত্থান , ধর্ম্মের গ্লানি স্থায়ী থাকিবার কথা । বিনা কারণে কার্য্য হয় না । জয়ের কারণ শক্তি । "

" ..... কয়েক বৎসরের নিপীড়ন দুর্বলতা ও পরাজয়ের ফলে ভারতবাসী নিজের মধ্যে শক্তির উৎস অন্বেষণ করিতে শিখিয়াছে । বক্তৃতার উত্তেজনা নহে , ম্লেচ্ছ দত্ত বিদ্যা নহে , সভা সমিতির ভাব সঞ্চারিণী শক্তি নহে , সংবাদ পত্রের ক্ষণস্থায়ী প্রেরণা নহে , নিজের মধ্যে আত্মার বিশাল নীরবতায় ভগবান ও জীবের সংযোগে যে গভীর অবিচলিত অভ্রান্ত শুদ্ধ দুঃখ জয়ী পাপ পুণ্য বর্জিত শক্তি সম্ভূত হয় , সেই মহাসৃষ্টি কারিণী , মহা প্রলয়ঙ্করী , মহাস্থিতি শালিনী , জ্ঞান - দায়িণী মহা সরস্বতী ঐশ্বর্য্য দায়িণী মহালক্ষ্মী , শক্তিদায়িনী মহাকালী , সেই তেজের সংযোজনে একীভূতা চন্ডী প্রকট হইয়া ভারতের কল্যাণে ও জগতের কল্যাণে কৃতোদ্যম হইবে । ভারতের স্বাধীনতা গৌণ উদ্দেশ্য মাত্র , মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতের সভ্যতার শক্তি প্রদর্শন এবং জগৎময় সেই সভ্যতার বিস্তার ও অধিকার । আমরা যদি পাশ্চাত্য সভ্যতার বলে সভ্য সমিতির বলে বক্তৃতার জোরে বাহুবলে স্বাধীনতা বা স্বায়ত্ত শাসন আদায় করিতে পারিতাম , সেই মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হইত না । ভারতীয় সভ্যতার বলে , আধ্যাত্মিক শক্তিতে , আধ্যাত্মিক শক্তির সৃষ্ট সূক্ষ্ম ও স্থূল উপায়ে স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে । ..... ত্রিলোক পাবনী গঙ্গা ভারত প্লাবিত করিয়া , পৃথিবী প্লাবিত করিয়া অমৃত স্পর্শে জগতের নূতন যৌবন আনয়ন করিবে । " ৬২

বিদেশের ভাবনা তদানীন্তন সমাজকে প্রভাবিত করেছিল । স্বদেশী যুগে চিন্তা - ধারার মধ্যেও বিবর্তন ঘটে । আপন দেশের ভাবনার মধ্যে নিজেকে বড় করার প্রবণতা আসে । আসে বিদেশী চিন্তাধারার ক্ষেত্রে নিজস্ব সাংস্কৃতিক চিন্তা ধারাকে প্রতিষ্ঠা করার মনোভাব । অরবিন্দ ' প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 'তে সেই ভাবনা সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেন । তিনি বলছেন , " আমাদের দেশে ও য়ুরোপে মুখ্য প্রভেদ এই যে আমাদের জীবন অন্তর্মুখী , য়ুরোপের জীবন বহির্মুখী । আমরা ভাবকে আশ্রয় করিয়া পাপ পুন্য ইত্যাদি বিচার করি । য়ুরোপ কর্মকে আশ্রয় করিয়া পাপ পুন্য ইত্যাদি বিচার করে । আমরা ভগবানকে অন্তর্যামী ও আত্মস্থ বুঝিয়া অন্তরে তাঁহাকে অন্বেষণ করি , য়ুরোপে ভগবানকে জগতের রাজা বুঝিয়া বাহিরে তাঁহাকে দেখে ও উপাসনা করে । ..... আমাদের শিব পরমেশ্বর অথচ ভিক্ষুক , পাগল ভোলানাথ , আমাদের কৃষ্ণ বালক , হাস্যপ্রিয় রঙ্গময় , প্রেমময় , ক্রীড়া করা তাঁহার ধর্ম । য়ুরোপের ভগবান কখন হাসে না , ক্রীড়া করেন না , তাঁহাতে তাঁহার গৌরব নষ্ট হয় , তাঁহার ঈশ্বরত্ব আর থাকে না ।

" ..... য়ুরোপীয় পন্ডিতগণ বলেন ভারতে প্রজাতন্ত্র কোন যুগে ছিল না । প্রজাতন্ত্র সূচক কোনও কথা সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায় না , আধুনিক পার্লিয়ামেন্টের ন্যায় কোন আইন ব্যবস্থাপক সভাও ছিল না , প্রজাতন্ত্রের বাহ্য চিহ্নের অভাবে প্রজাতন্ত্রের অভাব প্রতিপন্ন হয় । আমরাও এই পাশ্চাত্য যুক্তি যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি । আমাদের প্রাচীন আর্যরাজ্যে প্রজাতন্ত্রের অভাব ছিল না , প্রজা - তন্ত্রের বাহিক উপকরণ অসম্পূর্ণ ছিল বটে , কিন্তু প্রজাতন্ত্রের ভাব আমাদের সমস্ত সমাজ ও শাসন তন্ত্রের অন্তরে ব্যাপ্ত হইয়া প্রজার সুখ ও দেশের উন্নতি রক্ষা করিত । প্রথমতঃ প্রত্যেক গ্রামে সম্পূর্ণ প্রজাতন্ত্র ছিল , গ্রামের লোক সম্মিলিত হইয়া সর্ব সাধারণের পরামর্শে বৃদ্ধ ও নেতৃ স্থানীয় পুরুষদের অধীনে গ্রামের ব্যবস্থা , সমাজের ব্যবস্থা করিতেন , এই গ্রাম্য প্রজাতন্ত্র মুসলমানদের আমলে অক্ষুন্ন রহিল , বৃটিশ শাসনতন্ত্রের নিষ্পেষণে সেই দিন নষ্ট হয় । দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যেও যেখানে সর্ব্ব সাধারণকে সম্মিলিত করিবার সুবিধা ছিল , সেই রূপ প্রথা

বিদ্যমান ছিল , বৌদ্ধ সাহিত্যে , গ্রীক ইতিহাসে , মহাভারতে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় । বর্তমান প্রজাতন্ত্রের স্বরূপ দেখে তিনি বলছেন , " আজকাল প্রাচ্য দেশে প্রজাতন্ত্রের ভাব ও শ্রদ্ধা প্রবল বেগে পরিস্ফুট হইয়া বাহ্য উপকরণ সৃজন করিতেছে , বাহ্য আকার গঠন করিতেছে , কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে সেই ভাব ম্লান হইতেছে , সেই শ্রদ্ধা ক্ষীণ হইতেছে । প্রাচ্য প্রভাতোন্মুখ , আলোর দিকে ধাবিত পাশ্চাত্য তিমিরগামী রাত্রির দিকে ফিরিয়া যাইতেছে । " ৬৩

স্বদেশী যুগে বিদেশী মোহ সম্পর্কে সাবধান বানী উচ্চারণ করে তিনি বলছেন " কয়েকদিন রাজসিক তেজে তেজস্বী হইয়া অসুর মহান শ্রী সম্পন্ন , অজেয় হয় , তাহার পরে অন্তর্নিহিত দোষ বাহির হয় , সব ভাঙ্গিয়া চুরমার হয় । ভাব ও শ্রদ্ধা সজ্ঞান ও কর্ম , অনাসক্ত কর্ম যে দেশে শিক্ষার মূলমন্ত্র সেই দেশই অন্তর ও বাহির , প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একীকরণে সমাজ , অর্থনীতি , রাজনীতির সকল সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসা কার্যতঃ হইতে পারে । কিন্তু পাশ্চাত্য জ্ঞান ও শিক্ষার বশবর্তী হইয়া সেই মীমাংসা করিতে পারিব না । প্রাচ্যের উপর দন্ডায়মান হইয়া সেই পাশ্চাত্যকে আয়ত্ত করিতে হইবে । অন্তরে প্রতিষ্ঠা , বাহিরে প্রকাশ । ভাবের পাশ্চাত্য উপকরণ অবলম্বন করিলে বিপদগ্রস্ত হইব , নিজ স্বভাব ও প্রাচ্য বুদ্ধির উপযুক্ত উপকরণ সৃজন করিতে হইবে । " ৬৪

অরবিন্দের তেজস্বী ভাষা প্রকাশিত হতো ' বন্দেমাতরম ' পত্রিকায় । স্বদেশী যুগে ' বন্দেমাতরমে ' র জ্বালাময়ী পৃষ্ঠাগুলো হতে জন্ম নিয়েছিল জাতীয়তাবাদের অগ্নিবন্যা । এই প্রভাবের সাথে অরবিন্দের বাংলা রচনাও জনমানসে বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল ।

'The new movement is not primarily a protest against bad government-it is a protest against the continuance of British Control,whether that control is used well or ill,justly or unjustly, is a minor and unessential consideration. It is not born of a disappointed expectation of of admission to British citizenship, - it is born of conviction that the time

has come when India can, should and will become a great, free and united nation. It is not a negative current of destruction, but a positive constructive impulse to-wards the making of modern India. It is not a cry of revolt and despain, but a gospel of national faith and hope".

১৯০৭ এর ২৬শে এপ্রিল 'বন্দেমাতরম' এর সংখ্যায় অরবিন্দ লিখেছিলেন একথা। সারা দেশ জাগ্রত হয়েছিল সেই ভাবনায়। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ জাতি খুঁজেছিল মুক্তির পথ। পাথেয় ছিল অরবিন্দের ভাবনা ও রচনা।

রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪ - ১৯১৯)

বঙ্গভঙ্গ যুগে স্বাদেশিকতার ভাবনাকে যাঁরা প্রচার করার মহতী দায়িত্ব নিয়েছিলেন রামেন্দ্র সুন্দর তাঁদেরই একজন। ১৯০৫ এর ১৬ই অক্টোবর (১৩১২ এর ৩০শে আশ্বিন) রাখীবন্ধন ও অরন্ধন পালিত হয়। অরন্ধনের প্রস্তাব ছিল রামেন্দ্র সুন্দরের। " তিনি অরন্ধনের পরিকল্পনা করিয়া তাহা সামাজিক ব্রত অনুষ্ঠানের অন্তর্ভূত করিয়া দিয়াছিলেন। সমাজের অর্ধাঙ্গ ভগিনী স্ত্রী জাতিকে সেই আন্দোলনের পশ্চাতে রাখিয়া পুরুষ জাতিকে শক্তি ও উৎসাহ বর্ধন করিবার অভিপ্রায় তিনি শক্তিরূপিণী স্ত্রী জাতির জন্য অপূর্ব ভাষায় 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' রচনা করিয়াছিলেন।" ৬৫

'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' (১৩১২) এর বঙ্গদর্শনের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

পরে এটি আলাদা ভাবে পুঁথিরূপে মুদ্রিত হয়। বঙ্গভঙ্গের দিন অর্থাৎ ৩০শে আশ্বিন পল্লীগ্রামে প্রায়ই ৫০০ জন মহিলার সমাবেশে এই ব্রত উদযাপিত হয় ও পঠিত হয়।

রামেন্দ্র সুন্দর তাঁর ব্রতকথার ভূমিকায় লিখলেন, " বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের দিন অপরাহ্নে জেমো কান্দি গ্রামের অর্ধ সহস্রাধিক পুরনারী আমার মাতৃদেবীর আহ্বানে আমাদের বাড়ীর বিষ্ণু মন্দিরের উঠোনে সমবেত হইয়া ছিল, গৃহ্যোক্ত অনুষ্ঠানের পর আমাদের কন্যা শ্রীমতী গিরিজা কর্তৃক এই ব্রতকথা পঠিত হয়।

ব্রতকথা

১৩১২ সাল। আশ্বিন মাসের তিরিশে, সোমবার কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া, সেদিন বড় দুর্দিন। সেইদিন রাজার হুকুমে বাঙালী দুভাগ হবে, দুভাগ দেশে বাঙলার লক্ষ্মী বাংলা ছেড়ে যাবেন। পাঁচ কোটি বাঙালী আছাড় খেয়ে গড়াগড়ি দিয়ে ডাকতে লাগল — মা, তুমি বাঙলার লক্ষ্মী, তুমি বাংলা ছেড়ে যেয়ো না, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, বিদেশী রাজা আমাদের সুখ দুঃখ বোঝেন না। তাই ভাই - ভাই ঠাঁই ঠাঁই করতে চাইলেন, আমরা ভাই - ভাই ঠাঁই ঠাঁই হব না, মা তুমি কৃপা কর, আমরা এখন থেকে মানুষের মতো হব।

ব্রতের অনুষ্ঠান

প্রতি বৎসর আশ্বিনে বঙ্গ বিভাগের দিনে বঙ্গের গৃহিনীগণ বঙ্গ লক্ষ্মীর ব্রত অনুষ্ঠান করিবেন। সেদিন অরন্ধন। দেশ সেবা ও রোগীর ও শিশুর সেবা ব্যতীত সেদিন অন্য উপলক্ষ্যে গৃহে উনুন জ্বলিবে না। ফলমূল চিড়া মুড়ি অথবা পূর্ব দিনের রাঁধা ভোজন চলিবে।

পরিবারস্থ নারীগণ যথারীতি ঘট স্থাপন করিয়া ঘটের পার্শ্বে উপবেশন করিবেন। বিধবারা ললাটে চন্দন ও সধবারা সিন্দুর লইবেন। হরিতকী বা সুপারী হাতে লইয়া বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনিবেন। কথা শেষে বালকেরা শঙ্খ ধ্বনি করিলে পর ঘটে প্রণাম করিবেন। প্রণামান্তে বামহস্তের (বালকেরা দক্ষিণ হস্তের) প্রকোষ্ঠে স্বদেশী বা রেশমের হরিদ্রা রঞ্জিত সূত্রে পরস্পর রাখী বাঁধিয়া দিবেন। রাখী বন্ধনের সময় শঙ্খ ধ্বনি হইবে। তৎপর পাঁচালী প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। সংবৎসর কাল যথাসাধ্য বিদেশী, বিশেষত বিলাতী দ্রব্য বর্জন করিবেন। সাধ্য পক্ষে প্রতিদিন গৃহ কর্ম আরম্ভের পূর্বে লক্ষ্মীর ঘটে মুষ্টি ভিক্ষা রাখিবেন। এবংমাসান্তে বা বৎসরান্তে উহা কোনরূপ মায়ের কাজে বিনিয়োগ করিবেন।"

বাংলার উদ্দীপ্ত পরিবেশে 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' যেন স্তিমিত জোৎস্নায় প্রদীপ শিখার আলোকের পবিত্র শঙ্খের সুরে সুরে বাংলার গ্রাম গ্রামান্তর দেশ প্রেমের ধর্ম ভাবনায় মোহিত হয়ে গেল। এক সাহিত্যিকার বললেন "রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর সে এক অনবদ্য রচনা। সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ভাষা। কিন্তু প্রতিটি অক্ষরে যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে দেশের মাটির গন্ধ। দেশের আকাশের আলো, দেশের মানুষের সুদৃঢ় চেতনা। ঘরের কোনে প্রদীপ জ্বেলে মা বাবা ভাই বোন, পুত্র কন্যা সবাই মিলে একসঙ্গে বসেছে গোল হয়ে। নতুন যুগের মন্ত্র যেন পড়ছে একজন শুনছে সবাই। শুনতে শুনতে নিমেষে যেন রক্তের মধ্যে গিয়ে স্পন্দন জাগছে স্বদেশীয়ানার অভিনব মন্ত্রধ্বনি।" ৬৬

ব্রতকথা শুরু

" বন্দেমাতরম। বাংলা নামে দেশ। তার উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সাগর। মা গঙ্গা মর্তে নেমে নিজের মাটিতে সেই দেশ গড়লেন। প্রয়াগ, কাশী পার হয়ে মা, পূর্ব বাহিনী হয়ে সেই দেশে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করে মা শতমুখী হলেন।

শতমুখী হয়ে সাগরে মিশলেন। তখন লক্ষ্মী এসে শত মুখে অধিষ্ঠান করলেন। বাংলার লক্ষ্মী বাংলা দেশ জুড়ে বসলেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে বিরাজ করতে লাগলেন। ফলে ফুলে দেশ আলো হল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠল তাতে রাজ-হংস খেলা করতে লাগল। লোকের গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু। গাল ভরা হাসি। লোকে পরম সুখে বাস করতে লাগল।"

কিন্তু সেই সুখ স্থায়ী হলো না। ইংরেজ সওদাগর দেশ লুঠ করল। গ্রাস করতে চাইল দেশের ব্যবসা বানিজ্য। দিল্লী বাদশাকে টানতে চাইল নিজের বশে।

"বাংলার ধন দেখে ধান দেখে তাদের লোভ হল। লক্ষ্মী তখন আমলগীরের বংশের দিল্লীর বাদশাকে ছেড়েছেন। বাদশা ইংরেজকে বাংলার দেওয়ান করে দিলেন। বাদশার দশা দেখে বাদশাকে খাজানা দেওয়া বন্ধ করে তারাই হল বাংলার রাজা। তারা এসেছিল সদাগর, হয়েছিল বাদশার দেওয়ান, হয়ে গেল দেশের রাজা। রাজা হলো কিন্তু রাজ্যে বাস করল না, বাংলা দেশের ধন নিয়ে ধান নিয়ে সাত-সমুদ্র পারে আপন দেশে চলল। সদাগরের জাত কিনা মেজাজ ঠান্ডা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অতিশয় ধূর্ত। তারা চোর ডাকাত দমন করল, মিষ্টি মিষ্টি কথা কইতে লাগল, আবার নিজের দেশ থেকে খেলনা এনে পুতুল এনে প্রজার মন ভোলাতে লাগল। .... ইংরেজ রাজার এক ছোকরা নায়েব ছিল। সে আপন দেশে ছিল কেরাণী, এসে হয়েছিল নায়েব। নায়েবী পেয়ে সে ধরা কে সরা জ্ঞান করত। আলমগীর বাদশার তক্তে বসে সে আপনাকে আলমগীরের নাতি ঠাওরাত। সে বললে, এরা বড় ঘ্যান ঘ্যান করছে, যাক এদের দুদল করে দিচ্ছি, একদিকে থাক মোছলমান একদিকে থাক হিন্দু। — এই বলে তিনি বাঙালীকে দুদল করে দিলেন।"

"তারপর এল মহা দুর্দিন। ষড়যন্ত্রের কথা শুনে কেঁপে উঠল সারা বাংলা। লক্ষ্মীর পায়ে আছড়ে পড়ল সারা দেশ। প্রতিজ্ঞা করলে — আমরা ভাই ভাই ঠাঁই

ঠাঁই হব না। আমরা এক। আমরা এক আকাশের নীচে, এক ধানের খেতে, এক নদীর জলে, এক গাছের ছায়ায় বুকে বুক মিলিয়ে বাস করবো চিরদিন।" ৬৬

" তিরিশে আশ্বিন, কোজাগরী পূর্ণিমার পর তৃতীয়া। পূর্ণিমার পূজো নিয়ে বাঙলার লক্ষ্মী ঐ দিন বাঙলা ছাড়ছিলেন। ঐদিন বাংলার লক্ষ্মী বাঙলায় অচলা হল। বাঙলার হাটে মাঠে ঘাটে জুড়ে বসলেন। — বাঙলার মেয়েরা ঐদিন বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত নিলে ঘরে ঘরে সেদিন উনুন জ্বলল না। হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই কোলা কুলি করলে। হাতে হাতে হলুদ সুতোর রাখী বাঁধলে। ঘট পেতে লক্ষ্মীর ব্রতকথা শুনলে। যে এই লক্ষ্মীর ব্রত কথা শোনে তার ঘরে লক্ষ্মী অচলা হন।"

এর পর নেওয়া হল শপথ বানী। ব্রতকথার সাথে সমগ্র দেশ পবিত্রতার শপথ বানী উচ্চারণ করলো। " মা লক্ষ্মী কৃপা কর, কাঞ্চন দিয়ে কাচ নেবো না। ঘরের থাকতে পরের নেবো না। শাঁখা থাকতে চুড়ি পরবো না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা করবো না। মোটা অন্ন ভোজন করবো। মোটা বসন অঙ্গে নেবো। মোটা ভূষণ আভরণ করবো। পড়শীকে খাইয়ে নিজে খাব। মোটা অন্ন অক্ষয় হোক। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুক, বাংলার লক্ষ্মী বাংলায় থাকুক।" ৬৭

বঙ্গভঙ্গ যুগে বাংলার মেয়েদের মানসিকতা ধীরে ধীরে জাগছিল অন্যায় ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে। পুরুষদের পাশে এসে স্বাধীনতার আকাঙ্খায় তাদেরও মন সাড়া দিচ্ছিল অজানার আহ্বানে। 'বঙ্গ লক্ষ্মীর ব্রতকথা' সেই সুপ্ত অভিমানকে ব্যক্ত ও উদ্দীপ্ত করে তুলল।

সখারাম গণেশ দেউস্কর (১৮৬৯ - ১৯১২)

সখারাম ছিলেন স্বদেশী যুগের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধকার। তাঁর বাড়ী ছিল বোম্বাই এর রত্নগিরি জেলার দেউস গ্রামে। জন্ম বিহারের বৈদ্যনাথ ধামের নিকট। সংঘর্ষময় জীবন ছিল তাঁর। ১৮৯০ এ এসে যোগ দিলেন কলকাতার 'হিতবাদী' পত্রিকার অফিসে। ঐ পত্রিকার প্রুফ রিডার থেকে সম্পাদক হন তিনি। স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কর্মীদের সাথে তিনি পাঠ চক্রের ক্লাস নিতেন ও সমাজতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করতেন। ১৯০২ এর মার্চ মাসে প্রমথ মিত্রের সভাপতিত্বে কলকাতার অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হয়। সখারাম সেখানে অন্যান্য-দের সাথে ইতিহাস, ধর্ম নীতি, রাজনীতি নিয়ে শিক্ষকতা করতেন। অরবিন্দ, নিবেদিতা, বিবেকানন্দ এবং জাতীয় স্তরের অন্যান্য নেতাদের সাথে সখারাম দেউস্করের প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল।

তাঁর উল্লেখযোগ্য বই হল 'দেশের কথা', 'শিবাজী দীক্ষা', 'শিবাজী', 'বঙ্গীয় হিন্দু জাতি কি ধ্বংসোন্মুখ'? 'দেশের কথা' বইটি দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। স্বল্প দিনের মধ্যে চারটি সংস্করণ বের হয়। বইটি পরে নিষিদ্ধ হয়েছিল। এই বইটি সম্পর্কে কালীচরণ ঘোষ লিখছেন "এটি ১৯০৪ জুন ১৬ই তারিখে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। খুন খারাপি, হাঁক - ডাক, উদ্দাম উত্তেজনার বানী কিছুই ছিল না বইখানিতে। কি ভাবে ইংরেজ তার শাসন শোষণ নীতি সাহায্যে ভারতকে নিঃস্ব করেছে, দেশে দারিদ্র্য বাড়িয়েছে — অর্থ ও সহায় সম্বলহীন হয়ে লোক মরণের পথে চলেছে – এটা ছিল পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়। বিদেশীর কূটবুদ্ধিতে, দেশের শিল্প - বানিজ্যের অবনতি হেতু ইংরেজের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা উদ্রিক্ত হয়ে, দেশ যাতে নিজ শক্তির উপর নির্ভর করতে পারে তারই কথা ছিল প্রচুর।" ৬৮

'দেশের কথা'য় সখারাম বিভিন্ন ভাবে ভারতবাসী শোষিত হওয়ার চিত্র তুলে ধরেছিলো। "ইংরাজ চরিত্রে গুনের ন্যায় কতিপয় গুরুতর দোষও বিদ্যমান। কুটিলতা, স্বার্থপরতা, অহংকার ও বিজাতীয়ের প্রতি ঘৃণা প্রভৃতি তাহাদিগের দোষ সর্বত্র ইংরাজ চরিত্রের এই সকল দোষে আমাদিগের সামান্য উপকারও সাধিত হয় নাই। ভারতবাসীর সামাজিক স্বাতন্ত্র্য ও ধর্মগত বিশেষত্ব রক্ষার পক্ষে ইংরাজের এই সকল দোষ বিশেষ সহায়তা করিতেছে। বিজেতার সহিত সম্পূর্ণ সম্মিলন, কখনই বিজিত দিগের মঙ্গলকর নহে। আকবরের সময়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিবাহাদি প্রচলিত হওয়ায় শৌর্য্যশালী রাজপুত জাতির কিরূপ অধোগতি হইয়াছিল তাহা ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নাই। হিন্দু ইউরোপীয়ানদের মধ্যে শোণিত সম্বন্ধ স্থাপন মঙ্গলকর হইবে বলিয়া পূর্বে অনেকে মনে করিয়াছিলেন, অনেক অনুকরণ প্রিয় সংস্কারক এই প্রথার প্রবর্তনের জন্য নাচিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে দেখিয়া শুনিয়া তাঁহাদিগের অনেকেরই চক্ষু ফুটিতেছে। ইংরাজ চরিত্রের বিজাতি বিদ্বেষই যে এই ঘটনার কারণ, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ..... বর্তমান কালে ইংরাজদিগের অহঙ্কার, স্বার্থপরতা ও নেটিভ বিদ্বেষের ফলে হিন্দু মুসলমানের ক্রমশঃ অবস্থান্তর ঘটিতেছে। .... তাঁহাদিগের হস্তে ব্যক্তিগত ভাবে ভারতবাসীকে পদে পদে লাঞ্ছিত হইতে হইতেছে। ঘরে বাহিরে, পথে ঘাটে, চারিদিকে এই অপমান ও লাঞ্ছনার দৃশ্য ভারতবাসী সর্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছে। ইহার ফল ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ জাতীয় ইতিহাসে কোন না কোন প্রকারে নিশ্চিত পরিদৃষ্ট হইবে।" ৬১

পরাধীন ভারত দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে ভারত মাঝে মাঝেই পতিত হতো। দুর্ভিক্ষের এই কারণ ছিল ইংরাজ শাসন। সখারাম এই দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে গিয়ে মন্তব্য করছেন " ভারতীয় দুর্ভিক্ষের ইতিহাসে নেত্রপাত করিলে, দুর্ভিক্ষের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ক্রমেই কিরূপ ঘনিষ্ঠ হইতেছে তাহা সুস্পষ্ট রূপে উপলব্ধ হইবে। বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সর্বত্র এক প্রকার অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল, ইংরাজী ইতিহাসে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। ঐ শত বৎসরের মধ্যে

ভারতে চারিবারের অধিক দুর্ভিক্ষ পাত হয় নাই। দুর্ভিক্ষের বিক্রমও এক একটি প্রদেশেই আবদ্ধ ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এ দেশের ইংরাজের শাসন ক্রমশ: বিস্তার লাভ করিয়াছে। দুর্ভাগ্য ক্রমে সেই সঙ্গে দুর্ভিক্ষ - রাক্ষসও আপনার আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইয়াছে। বিগত শতাব্দীর প্রথম পাদে বা ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কালে সমগ্র বৃটিশ ভারতে দশ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষ জনিত অনশনে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল। উহার দ্বিতীয় পাদে পাঁচ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। .....

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের দুর্ভিক্ষ কাহিনী অধিকতর শোকাবহ। এই পঞ্চ বিংশ বর্ষের মধ্যে এদেশে অষ্টাদশবার দুর্ভিক্ষ দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। এই মহানলে প্রায় ২ কোটি ৬০লক্ষ মহাপ্রাণী ভস্মীভূত হইয়াছে। ইহার মধ্যে শুদ্ধ বিগত দশ বৎসরেই এক কোটি ১০ লক্ষ ভারত সন্তান ' হা অন্ন, হা অন্ন। ' করিয়া বিষম যন্ত্রনায় প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে। এই হৃদয় বিদারক দুর্ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে ' দুর্ভিক্ষ নিহত ' হতভাগ্য দিগকে সম্বোধন করিয়া মহামতি উইলিয়ম ডিগবী, সি.আই. ই. মহোদয় গম্ভীর খেদ সহকারে বলিয়াছেন — 'You have died, you have died uselessly!' ' তোমরা মরিয়াছ, তোমরা অনর্থক মরিয়াছ।''

পৃথিবীর অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষ কত দরিদ্র দেশ সখারাম সেই তথ্যও তুলেধরেছেন। মাথা পিছু বার্ষিক গড় আয় সম্পর্কে ইংরেজের ভ্রান্ত তথ্যকে তিনি খন্ডন করেছেন। তিনি লিখছেন " ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে আর্ল ক্রোমার মহাশয় গভর্নমেন্টের আদেশে ভারতবাসীর আয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে গড়ে ভারতবাসীর আয় প্রতি জনে বার্ষিক ২৭ টাকা মাত্র। সেই সময়ে পার্শী প্রবর শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজী মহাশয় প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, বৃটিশ ভারতের অধিবাসীদিগের বার্ষিক আয় গড়ে জন প্রতি ২০ টাকার অধিক নহে। ইহার পর লর্ড ডাফরিনের আদেশ ক্রমে এদেশবাসীর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে একবার অনুসন্ধান হইয়াছিল। কিন্তু দু:খের বিষয় সাধারণের পুন: পুন: প্রার্থনা সত্ত্বেও সে অনুসন্ধানের বিবরণ ও ফল এদেশের কাহাকেও জানিতে দেওয়া হয় নাই। কিছু দিন হইল মি: ডিগবী মহোদয়ের

চেষ্টায় উহার কতিপয় অংশ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সকল অংশে এদেশের লোকের দুরবস্থার যে শোচণীয় চিত্র প্রকটিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে কোনও হৃদয়বান ব্যক্তিই অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন না। সে যাহা হউক, গত ১৯০১ সালে মার্চ মাসে লর্ড কার্জন বাহাদুর বক্তৃতা প্রসঙ্গেবলে যে, বিগত দশ বৎসরের দুর্ভিক্ষাদি জনিত অসীম ক্ষতি সত্ত্বেও ইদানীং বৃটিশ ভারতীয় প্রজার বার্ষিক আয় গড়ে জন প্রতি অন্যূন ৩০ টাকা হইয়াছে। কিন্তু ডিগবী মহোদয় অশেষ শ্রম সহকারে তাঁহার মতের বিশেষ ভাবে সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে সরকারী গণনায় বহুল ভ্রান্তি প্রবেশ করিয়াছে। মি: ডিগবীর গনণা মতে এক্ষণে বৃটিশ শাসনাধীন ভারত সন্তানের বার্ষিক আয় গড়ে প্রতিজনে উর্ধ সংখ্যায় ১৮ - ৫৬ মাত্র।" ৭১

ভারতের অর্থনৈতিক দুর্দশায় ব্যথিত সখারাম অনুভব করেছেন " ভারতে নৈসর্গিক সম্পদ (খনি, অরণ্য ও কৃষি জাত ধন) আমেরিকার অপেক্ষাও অধিক। এখানকার বানিজ্যও বহু বিস্তৃত, তথাপি ভারতের অপেক্ষা অধিকতর দরিদ্র দেশ পৃথিবীতে আর নাই।

কেন এরূপ হইয়াছে, ভারত ভূমি রত্ন - গর্ভা হইলেও কেন তাহার সন্তানগণ ঘোর দারিদ্র ভোগ করিতেছে তাহার কারণ নির্দেশ স্থলে মি: ডিগবী বলিয়াছেন —

" ভারতবাসীর দারিদ্রের অন্যান্য কারণের মধ্যে দুইটি প্রধান। প্রথম ভারতীয় শিল্পের বিনাশ ও দ্বিতীয়, ভারতের ধন শোষণ। আমরা (ইংরাজেরা) ভারত - বর্ষীয় শিল্পের বিনাশ সাধন করিয়াছি ও ১৮৩৪। ৩৫ সাল হইতে ১৮৯৮ খৃ: পর্যন্ত (ইকনমিস্ট পত্র সম্পাদকের গনণানুসারে) এক সহস্র কোটি মুদ্রা ভারতবাসীর নিকট হইতে আদায় করিয়াছি। এই সহস্র কোটি মুদ্রা যদি ভারতবর্ষেই থাকিত ও শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা সুদে ভারতবাসী কৃষক ও শিল্পীদিগকে ধার দিতে পারা যাইত, তাহা হইলে এত দিনে উহার পরিমাণ সুদ সহ ন্যূন কল্পে পঞ্চ সহস্র কোটি মুদ্রা হইত।"

দেউস্কর মন্তব্য করছেন " পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে নগদ প্রায় এক সহস্র কোটি মুদ্রা প্রেরিত হইয়াছে । .... যে দেশ হইতে প্রতি বৎসর এরূপ অজস্র ধারায় অর্থহানি ঘটিতে থাকে সে দেশে দশ কোটি লোক অর্ধাশনে দিন যাপন করিতে বাধ্য হইবে ইহা বিচিত্র নহে । " ৭২

ইংরাজী শিক্ষা লাভের পর যুব সমাজের বেকারত্ব ছিল ভয়াবহ । ইংরাজ প্রশাসনেরা ভারতীয়দের রাজকার্যে নিযুক্ত না করার নীতি বহুদিন যাবৎ নিয়ে চলেছিলেন । সখারাম দেউস্কর এ প্রসঙ্গে বলছেন " এ দেশের শিক্ষিত জন সাধারণ সামান্য কেরাণী গিরি করিয়াই বার্ধক্যে উপনীত হইতে বাধ্য হন । উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ আপনাদিগের কার্য্য দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শনের যথোচিত অবসর প্রাপ্ত হন না । এরূপ অবস্থায় দেশের যুবক সমাজ কেবল পুস্তকগত বিদ্যার সাহায্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিবে বা কার্য্য ক্ষেত্রে নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে , এরূপ আশা করা যুক্তি সঙ্গত নহে । বিশেষতঃ যে দেশের বিদ্যালয় সমূহ ছাত্রদিগকে তেজস্বিতা বা অধ্যাবসায় শিক্ষা দিবার প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা নাই , ক্ষীণজীবী কেরাণীকুল এবং রেভেনিউ (রাজস্ব) , জুডিশিয়াল (বিচার) , ইঞ্জিনীয়ারিং (স্থাপত্য ও পূর্ত) ও মেডিকেল (চিকিৎসা) বিভাগীয় নিম্ন শ্রেনীর কর্মচারীর দল সৃষ্টি করিবার দিকেই যে দেশের শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষীয়গণের সমধিক দৃষ্টি পরিলক্ষিত হয় , সে দেশের যুবক সমাজ যখন অযোগ্যতার জন্য তিরস্কৃত হয় , তখন ভূত - ধাত্রী ধরিত্রীকে দ্বিধা হইবার নিমিত্ত সকাতর প্রার্থনা করিতে স্বতই প্রবৃত্তি জন্মে । শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজী অতি দুঃখেই ভারত সচিব মহোদয়কে বলিয়াছিলেন , ভারতবর্ষে — The young man has no place in his country.
অর্থাৎ স্বদেশে যুবকদিগের স্থান নাই । "

খ্রীষ্টান মিশনারীরা ভারতে ধর্ম প্রচার করতে এসে আমাদের দেশের সকল কিছু অন্ধ তামসিকতায় আচ্ছন্ন বলে অভিহিত করেন । । এই প্রসঙ্গে ইউরোপের

প্রতি দৃষ্টিপাত করার আহ্বান জানিয়ে সখারাম গণেশ দেউস্কর বলছেন " মিশনারীরা মহাশয়েরা এদেশবাসী নর - নারীর চরিত্রে ধর্মভীরুতার অভাব ও কুসংস্কার প্রাবল্য দর্শনে বিশেষ চিন্তিত । কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে যখন দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল , তখন ইহারা বাইবেলের দোহাই দিয়া সেই ঘোরতর নিষ্ঠুর প্রথার সমর্থন করিতেন । ইউরোপে যখন দর্শন বিজ্ঞানের প্রথম চর্চা আরম্ভ হয় , তখন এই সু - সংস্কার সম্পন্ন খৃষ্টীয় যাজক সম্প্রদায় রাজশক্তির সাহায্যে জ্ঞানের পথ কণ্টকিত ও স্বাধীন চিন্তার দ্বার আবরুদ্ধ করিতে যথা সাধ্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন । ইহাদিগেরই জন্য ইউরোপে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে , চিতার অনলে দার্শনিক ও তত্ত্বানুসন্ধাণী দিগের শতসহস্র দেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল , ইতিহাস এ কথার অদ্যাপি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । কিন্তু পুরাতন কথার আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া যদি ইহাদিগের বর্তমান কার্য্য প্রণালীর প্রতি মনোনিবেশ করা যায় , তাহা হইলেও ইহাদিগের উদ্দেশ্যের সাধুতায় সংশয় জন্মে । যে বৈরাগ্য , শান্তি , পাপ , ভীরুতা ও স্বার্থত্যাগ যীশু খ্রীষ্টের প্রধান শিক্ষা বলিয়া ইহারা আমাদিগের নিকট সগৌরবে প্রকাশ করিয়া থাকেন , তাহাদিগের স্বদেশে তাহার একান্ত অভাব দেখিয়াও ইঁহারা বিন্দু মাত্র উদ্বেগ প্রকাশ করেন না । " ৭৩

ভারত পৃথিবীর বাজারে দ্রব্য রপ্তাণী করেও কি ভাবে নিঃশেষিত হয়ে যায় , তার এক নিদারুণ চিত্র দেউস্কর তুলে ধরেছেন । " ভারতে বাণিজ্যে আমদানী ও রপ্তাণীর মিল নাই , বহু বৎসরাবধি আমাদের আমদানি অপেক্ষা রপ্তাণী বেশী হইতেছে । গত পাঁচ বৎসরের আমদানি ও রপ্তাণীর হিসাব দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে , এই ৩৩ বৎসরের মধ্যে আমরা সর্বশুদ্ধ যত মূল্যের পণ্য আমদানি করিয়াছি , তদপেক্ষা ১১১ কোটি ১৩ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা মূল্যের অধিক পণ্য রপ্তাণী করিয়াছি । ..... আমাদের এই উদ্বৃত্ত পণ্য কোথায় যায় ? ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৬৭ বৎসর কাল মধ্যে অন্যূন ৭, 000 , 00 , 000 টাকা মূল্যের উদ্বৃত্ত পণ্য ভারত হইতে বিদেশে গিয়াছে , কিন্তু তাহার বিনিময়ে ভারত এক কর্পদকও প্রাপ্ত হয় নাই । নব নব পণ্য

উৎপাদন করিয়াও ভারতের দারিদ্র ঘুচিতেছে না। যাহারা ধনী, আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে ব্যবসায় বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিতে, প্রধানতঃ ও মুখ্যভাবে, তাহাদেরই ধনাগম হইয়া আসিতেছে। মজুরী করিয়া যাহারা এই সকল ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করে, তাহাদের ধন বৃদ্ধি কখনই হয় না। বরং যাহারা খাটিয়া ধনীর ধন বৃদ্ধি করে, কোনও কোনও স্থলে তাহাদের মজুরি পর্যন্ত পূর্ণ মাত্রায় লাভ হয় না।

আমাদের ব্যবসায়ে ইংরাজ ধনী, সুতরাং লভ্যাংশ সমস্ত তাঁহাদের। দেশে রেলপথের বিস্তারের সহিত ভারতীয় বানিজ্যের যতই বিস্তার হইতেছে, ততই ইংরাজের ধন বাড়িতেছে, আর আমরা ক্রমেই ধনহীন হইতেছি। রেলপথ এ দেশের ধন হরণের একটি প্রধান উপায় হইতেছে।" ৭৩

'মুর্শিদাবাদ' পত্রিকাতে (২৪ই এপ্রিল, ১৯০৬) জনৈক পত্র লেখক লেখেন যে বইখানি পড়লে, ইংরেজদের স্বার্থপরতা নীচতা ও কাপুরুষতা কত নিম্নস্তরে নামতে পারে তার একটা ধারণা করা যায়।" ৭৪

'দেশের কথা' পরবর্তীকালে ইংরেজ সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

অরবিন্দ বলেছেন এই পুস্তক সম্পর্কে, "The word Swaraj was first used by the Bengali Maratha publicist, Sakharam Ganesh Deuskar, the writer of Desher Katha, a book compiling all the details of India's oconomic servitude which has enormous influence on the young men of Bengal and helped to turn them into revolutionaries". ৭৫

অরবিন্দ আরও বলেছেন, This book had immense repercussion in Bengal, captured the mind of young Bengal and assisted more than anything else in the preparation of Swadeshi Movement". ৭৬

রবীন্দ্র নাথ ১৩১১এর শ্রাবণ সংখ্যায় ' বঙ্গদর্শনে ' ' দেশের কথা 'র সমালোচনা করেন । রবীন্দ্র নাথ স্বদেশ প্রেমের সংকীর্ণতাকে সমর্থন করতে পারেন নি ।

' শিবাজীর দীক্ষা ' ও ' শিবাজী ' দুটি পুস্তকই চরিত কথা । তিলকের নেতৃত্বে একদিন ' শিবাজী উৎসবের ' ঢেউ সারা দেশে বয়ে গিয়েছিল , সখারাম সেই ঢেউকে বাংলায় প্লাবিত করেছিলেন । ' শিবাজী উৎসবের ' পটভূমিকায় তিনি এই দুটি বই রচনা করেন । শিবাজীর ভাবাদর্শে জাতিকে সঞ্জীবিত করার আদর্শ ছিল তাঁর পুস্তকের উপজীব্য বিষয় বস্তু । রবীন্দ্র নাথের ' শিবাজী উৎসব ' কবিতাটি শিবাজীর দীক্ষা পুস্তকে সংযোজিত হয় । অরবিন্দ এই প্রসঙ্গে বলেছেন,One of the ablest men in these revolutionary groups was a Mahratta named Sakharam Ganesh Deuskar who was an able writer in Bengali and who had written a popular life of Shivaji in Bengali in which he first brought in the name of Swaraj, afterwards adopted by the Nationalists programme. as their word for independence. Swaraj became one item of the four fold Nationalist programme." ৭৭

' হিন্দু জাতি কি বাস্তবিকই ধ্বংস প্রাপ্ত হচ্ছে ? ' এই প্রশ্ন সেদিন কিছু লোকের মুখে মুখে ফিরত । কিন্তু বাংলার হিন্দুদের প্রকৃত অবস্থা বিশ্লেষণ করার জন্যই তিনি রচনা করেন ' বঙ্গীয় হিন্দু জাতি কি ধ্বংসোন্মুখ ? ' এবং তিনি প্রমান করেন দরিদ্রের পথে বঙ্গ - হিন্দু মোটেই ধাবিত নয় ।

সখারাম গণেশ দেউস্কর ন্যাশনাল কলেজে অধ্যাপনা করতেন । তিনি সরকারের বিধিনিষেধ পড়ার পর তাঁকে ঐ কাজ ছাড়তে হয় । তাঁর সঙ্গে আরও দুজন অধ্যাপক ইস্তফা দেন । তাঁরা হলেন বাবু রাম বিষ্ণু পরাধর ও বাজপাই । সখারাম 'দেশের কথা' বাজেয়াপ্ত করার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেন । গ.র.দাস ———

পেশায় নিয়োজিত থাকলেও ন্যাশনাল কলেজের সভায় সখারামকে সমর্থন করেন।

"In connection with recent government orders proscribing two books S.G.Denskar entitled 'Desher Katha' and 'Tilaker Mokardama', the commissioner of police reports that he has received information that a meeting of National council of Education was held to consider the question of Pandit Sakharam's connection with the Bengal National College of which he is a professor. Babu Hirendra Nath Dutta, Brojendra K.Roy Chowdhury Sir Gurudas Banerjee and T.Palit were among those present. T. Palit, a retired Barrister, suggested that, in the circumstance it was inadvisable that Sukharam should continue to work in the college and proposed that he be granted leave for 6 months on half pay. To this Sukharam did not agree. He said he would resign if the committee so desired. Hirendra Babu approved his resignation and said that if this course was accepted on he would withdraw his donation from the college funds. Brojendra K Kishore supported Hirendrababu. When the question was put to vote, Sir Gurudas Banerjee voted with Hirendrababu and T. Palit's proposal was defeated. ৭৮

পরে সখারাম বাংলা ছেড়ে চলে যান। গোয়েন্দা দপ্তরের রিপোর্টে তার স্বীকৃতি আছে।

বারীন্দ্র কুমার ঘোষ

- - - - - - - - - - -

বারীন্দ্র ছিলেন অরবিন্দের ভাই। অজন্ম বিপ্লবী। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'বর্তমান রণনীতি'। যতীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বারীন্দ্রকে একটি বই দেন। বইটির নাম Modern weapons and Modern Warfare'. বইটি লিখে - ছিলেন J.S. Bloch। আধুনিক নানা ধরণের ছোট বড় মারণ অস্ত্র, সেনা বিভাগের নানা অংশের এবং যুদ্ধে ব্যবহার যোগ্য যন্ত্রপাতির নাম, সৈন্য সজ্জার বিধি ব্যবস্থা, কায়দা কানুন, আক্রমণ ও প্রতিরোধ বিভাগের কার্য্য কলাপ, গেরিলা যুদ্ধের রীতি নীতি এই ধরণের নানা রূপ তথ্য ও ছবির আকর্ষণে বইটি পূর্ণ ছিল। বইটি প্রকাশিত হয় ১৯০৭ এর ৭ই অকটোবর।

'বন্দেমাতরম' পত্রিকা বইটির দীর্ঘ সমালোচনা বার করে। 'বন্দেমাতরম' এর উক্তি 'The book is a small manual which seeks to deseribe for the benefit of those....who are entirely unaquainted with the subject, the nature and use of modern weapons, the meaning of military terms, the use distribution of the various limbs of a modern army, the broad principles of guerilla warfare. These are freely illustrated by detailed references to the latest modern wars, the Boer and the Russo-Japanese, in the first of which many new developments were brought to light or tested and in the second corrected by the experience of a greater field of warfare under modern conditions. This book is a new departure in Bengali literature and one which shows the new trend of national mind"." ৭৯

বর্তমানে বইটির বাংলা কপি দুষ্প্রাপ্য। বইটি ১৯১০ সালের ৩০শে এপ্রিল সরকারী আইনে বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়।

রাইটারস বিল্ডিং এর আর্কাইভস - এ যে বইটি আছে সেটা বাংলার ইংরাজী অনুবাদ। 'বর্তমান রণনীতি'র প্রকাশক ছিলেন অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য (আর তালিয়া, ২৪ পরগণা) এবং মুদ্রক হলেন বিভূতি ভূষণ রায়। প্রকাশনার তারিখ ২০শে আশ্বিন, ১৩১৪।

'বর্তমান রণনীতি' বইটি দুই খণ্ডে লেখা। প্রথম খণ্ডে ছিল ৫টি অধ্যায় এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ৮টি।

প্রথম খণ্ডের অধ্যায় : –

i. War is the rule of creation.
ii. An account of the weapns of this age.
iii. Nomenclature, a nd the Armdry
iv. Body and limbs of the Army.
v. Stategy.

দ্বিতীয় খণ্ডের অধ্যায়গুলি : –

i. Last half of strategy.
ii. Tactices of the offensive side.
iii. The real form of modern Warfare
iv. Attack
v. Tacties of the cavalry
vi. Captains(Officers) are the leaders
vii. Guerills mode of fighting at last turns into regular made of warfare.
viii. Whether fair or unfair (Source Records preserved in State Archives, Writers' Building Calcutta) ৮০

পরবর্তীতে আলিপুর বোমার মামলার কেসে বারীন্দ্র নাথ ঘোষের দ্বীপান্তর ও কারাবাস হয় ।

অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

অবিনাশ ভট্টাচার্য্য ছিলেন বারীন্দ্রের সহযোগী । বিপ্লববাদে বিশ্বাসী । তাঁর লিখিত ' মুক্তি কোন পথে ? ' স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলেও এটা ছিল ' যুগান্তরে ' প্রবন্ধের নির্বাচিত সংকলন । বইটি বর্তমানে কোথাও পাওয়া যায় না । ১৯০৭ সালে জানুয়ারীতে (১৩১৩ এর ১লা মাঘ) এটি প্রকাশিত হয় ।

কালী চরণ ঘোষ এই পুস্তক সম্পর্কে লিখছেন " অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের জন্য মনোবল সৃষ্টি করার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল । বিদেশী রাজা আমাদের আনুগত্য দাবী করতে পারে না । ধমনীতে এক বিন্দু আর্য্য - শোণিত প্রবাহিত থাকলে , অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাকে নিষিক্ত করতে হবে । বিপ্লবের প্রচার - কার্য্যের জন্য সঙ্গীত , সাহিত্য , যাত্রা , কথকতা , গুপ্ত সমিতির স্থাপন প্রয়োজন । অস্ত্র ও ধন সংগ্রহ , যুদ্ধের প্রস্তুতির , অন্য মতবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা , জাতির জাগরণের জন্য বিদেশীর হাতে নির্যাতনের প্রয়োজনীয় - তার কথা লেখা হয়েছে । জীবন উৎসর্গ করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে । আরও বলা হয়েছে বিদেশী সেনা বিভাগ থেকে সৈন্য ভাগিয়ে নেওয়া খুবই কষ্টকর ব্যাপার নয় । যুদ্ধের প্রেরণা , নিশ্চিত জয়ে বাঙালীকে উন্মাদনা পূর্ণ করার নানা প্রবন্ধে বইখানি পূর্ণ ছিল । " ৮১

' মুক্তি কোন পথে ?' সম্পর্কে এক সমালোচক বলছেন , " যুগান্তরের চোখা চোখা লেখা গুলি সংকলন করে বই বেরুলো ' মুক্তি কোন পথে ?' .... বইয়ে জনমত গঠন এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ দ্বারা বৈপ্লবিক পরিকল্পনা ঘোষিত । অস্ত্র সংগ্রহের অর্থ জোগাড় করতে হলে ডাকাতি করতে হবে । সানন্দে জানানো হয় ট্রিগার টেনে কোনো ইউরোপীয়কে নিকেশ করতে তো বেশি গায়ের জোরের দরকার হয় না , বোমা তৈরী করতেই বা অসুবিধা কি ? শাসকগণ চমৎকৃত হয়ে শুনেছিলেন , মুক্তি কোন পথের সন্ধানীরা সৈন্য বাহিনীর কাজেও হাজির হতে ইচ্ছুক । ও ক্ষেত্রে শুভ ফল অবধারিত , কেননা দেশীয় সৈন্যরা পেটের দায়ে সৈনদলে ঢুকলেও এদেশের মানুষ , তাদেরও রক্ত মাংসের শরীর , তাদের যদি স্বদেশের দুঃখ দুর্দশার কথা ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া যায় , তাহলে তারা যথাকালে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে (যেগুলি শাসকেরা সরবরাহ করেছে) স্বাধীনতা যুদ্ধে লেগে পড়তে পারবে । " ৮২

১৯১০ এর ৮ই আগষ্ট বইখানির প্রচার নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয় ।

আবদুল রসুল (১৮৭২ - ১৯১৭)

বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তকে পূর্ব বঙ্গের বিশাল মুসলমান সমাজ যখন স্বাগত জানিয়ে - ছিলেন ঠিক সেই সময় জাতীয়তাবাদী অল্প সংখ্যক মুসলমান নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন - তাঁদের মধ্যে আবদুল রসুল অন্যতম । বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন স্বদেশী বয়কটের ভাবনায় যে সকল মুসলমান নেতৃবৃন্দ হিন্দু মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ স্বরূপ জাতির ও দেশের পক্ষে মঙ্গলময় বলে মনে করতেন তাঁরা হলেন আবুল কাশেম , আবদুল হালিম গজনভী , দীন মোহম্মদ , দেদার বক্স , লিয়া - কত হোসেন , আবদুল গফুর , ইসমাইল হোসেন সিরাজী এবং আবদুল রসুল ।

আবদুল রসুলের জন্ম কুমিল্লায় । পিতা মৌলবী গোলাম রসুল । ঢাকার সরকারী স্কুলেতে এন্ট্রান্স পাশ করে তিনি লিভারপুলে যান , অক্সফোর্ডে বি . এ পাশ করে তিনি ব্যারিস্টারী পড়া শুরু করেন । এই সময় তাঁর অরবিন্দের সঙ্গে পরিচয় । এরপর দেশে প্রত্যাবর্তন ও কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করেন । এই সময় বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলো । রসুল বিরোধিতা করলেন এই সিদ্ধান্তের। স্বদেশী আন্দোলনে জাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে প্রথম সারিতে তিনি এসে দাঁড়ালেন ।

" স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের পিছনে দেশবাসীর অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল । দেশের লোককে শিল্প বানিজ্য গড়ার দিকে উৎসাহ দানের সঙ্গে নিজেও অশ্বিনী দত্তের সঙ্গে একটি কো - অপারেটিভ নেভি - গেশন কোম্পানী খুলেছিলেন । তাতে মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী , সূর্য্যকান্ত আচার্য্য , ব্রজেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী প্রমুখ জমিদারেরা যুক্ত হন । " ৮৩

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যখন বিশাল সংখ্যক ছাত্রেরা অংশ গ্রহণ করতে শুরু করেছে , সেই সময় ছাত্রদের এই আন্দোলন হতে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঘোষিত হলো কার্লাইল সার্কুলার (২২ । ১০ । ১৯০৫) । এর কয়েকদিন পরে প্রতিবাদে হলো বিশাল জন সমাবেশ । বিপিন চন্দ্র পাল , শ্যাম সুন্দর চক্রবর্তী , জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায় এরা বিকল্প দেশীয় বা জাতীয় শিক্ষার প্রস্তাব দেন । এই সভায় সভাপতিত্ব করেন আবদুল রসুল । ৮৪ গঠিত হয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ । রসুল এই পরিষদের সেক্রেটারী ছিলেন । বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের তিনি দুবার সভা - পতিত্ব করেন । ১৯০৬ এ ~~১৯১২~~ (১৯০২) বরিশাল শহরে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয় এবং পরেরটিতে ১৯১২ তে চট্টগ্রামে ।

" মুসলমানদের উদ্দেশ্যে রসুল তাঁর বরিশাল ভাষণে বলেন যে তাঁরা আন্দোলন হতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে সঠিক কাজ করেন নি । বিগত দিনের মুসলমানেরা এর জন্য দায়ী । সরকারের শুভ দৃষ্টিতে থাকার জন্য ও নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তারা মুসলিম জনগণের মধ্যে এই চিন্তাই প্রতিফলিত করেছে যে

বিধিদত্ত ও ন্যায় সঙ্গত সরকারের পরিপন্থী রাজনীতি মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। সরকার যা কিছু নির্দেশ দেয় তা মাথা পেতে মেনে নেওয়ায় উচিত বলে মনে করেন। কারণ তাঁদের ধারণা সরকারের বিরোধীতা করা মানেই সরকারী চাকরী হতে বঞ্চিত হওয়া।" ৮

রসুল তাই আহ্বান জানিয়েছিলেন মুসলমানেরা নিস্পৃহতা ছেড়ে হিন্দুদের সাথে এক হয়ে মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য এগিয়ে আসার। 'Unless you are ready to migrate in a body Arabia, Persia, or Turkey, your political interests will ever be the same as those of the people other denominations in Bengal". ৮৬

রসুল লক্ষ্য করেছিলেন যে বঙ্গের তৎকালীন ইসলাম ধর্মী বাঙালীরা নিজেদের বাঙালী বলে মনে করে না। তাঁরা বাঙালী হিসেবে দেখে কেবল হিন্দুদের আর নিজেদের তাঁরা কেবল মুসলমান বলে পরিচয় দেয়। তিনি বলেন যে এই মনোভাব নিঃসন্দেহে অজ্ঞতা প্রসূত। কারণ বাঙালী মুসলমানেরা যে মাটিতে ভূমিষ্ঠ ও লালিত হয়েছে সে দিকে দৃকপাত না করে তারা কেবল ধর্মটাকেই বড় করে দেখেছে। তারা যে দেশেই জন্মাক বা যে ভাষাতেই কথা বলুক না কেন তারা মনে করেন দুনিয়ার মুসলমানেরা হল একটা 'নেশন'। রসুলের দৃষ্টিতে সেটা বাতুলতা মাত্র। কেন না তাহলে একজন ইংরেজ অন্য এক ফরাসী মানুষকে স্বজাতি ভুক্ত বলে মনে করতে পারে, যেহেতু উভয়েই খ্রীষ্টান। রাজা বাজার ভাষণে রসুল তাই স্পষ্টই বলেন —
"We both Hindus and Mohamedans here belong to the same mother country Bengal. We are all Bengalees, though our different religions make us Hindu, Mahomedan or Christian." ৮৭

রসুল চেয়েছিলেন স্বদেশী শিল্পকে প্রাণবন্ত করতে। তাই স্বদেশী আন্দোলন তিনি মনে করতেন "to promote the industrial development of the country"

রসুল এর বক্তব্য " ভারতের সুতি বস্ত্র এক সময়ে বিদেশে বিপুল পরিমাণে রপ্তাণী করা হতো । ভারতের মসলিন বস্ত্র পরিধান ইউরোপে একদিন গর্বের বিষয় ছিল । কিন্তু নিজেদের উদাসীন অবহেলায় আমরা সে সব ঐতিহ্যকে হারিয়েছি । কারণ নব্য শিক্ষায় বিলাতী সামগ্রীর প্রতি আমাদের মোহ দেশের নিজস্ব শিল্পকে বাজার থেকে হটিয়ে বিদেশী পণ্যের চাহিদা ও আমদানীকে বাড়িয়ে তুলেছে । " ৮৮

তাই তিনি বলছেন , " আইনের সাহায্যে আমরা বিদেশী পণ্যের আমদানী রুখতে অক্ষম অতএব বয়কটই আমাদের আত্ম রক্ষার মোক্ষম হাতিয়ার । তাতে একদিকে দেশের শিল্প বানিজ্য গড়ে উঠবে অন্য দিকে বিদেশী মুদ্রার সাশ্রয় হবে । " ৮৯

সেদিনে বাংলার উদ্বেলিত যুবকের দল রসুলের কথার প্রতিধ্বনি করে বলতো "Our daily bread is dependent upon the Swadeshi Movement"."

• • • • •

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বদেশী যুগ ও সমকালীন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের রচিত সাহিত্য

" তথ্যসূত্র "

১। ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত — স্বামী বিবেকানন্দ , ১৩৬৪ , কলকাতা পৃ : ৩

২। Manabendra Nath Roy, India in Transition, 1922 P 193.

৩। স্বামীজীর বানী ও রচনা (৭) উদ্বোধন , পৃ : ৪৩

৪। ঐ (৮) পৃ : ২৪

৫। Swami Vivekananda,Patriot prophet, Bhupendra Nath Dutta Page -

৬। চিন্তা নায়ক বিবেকানন্দ পৃ :

৭। স্বামীজীর বানী (ষষ্ঠ) পৃ : ১৪৬

৮। পূর্বোক্ত পৃ : ২৪৮ - ৪৯

৯। পূর্বোক্ত ' পরিব্রাজক ' পৃষ্ঠা পরিচয়

১০। পূর্বোক্ত পৃ : ৮২

১১। স্বামীজীর বানী ও রচনা , পঞ্চম খণ্ড , পৃ : ১৯৮ - ১৯৯

১২। ঐ ষষ্ঠ খণ্ড পৃ : ৩৩৯

১৩। পূর্বোক্ত পৃ : ৩৬৭

১৪ । পূর্বোক্ত পৃ : ৩৮৪ - ৮৫

১৫ । পূর্বোক্ত পৃ : ৩৯৪ - ৩৯৫

১৬ । স্বামীজীর বানী ও রচনা , ৫ম খণ্ড , পৃ : ২৩৮

১৭ । Swami Vivekananda : Patriot Prophet Page - 335.

১৮ । পূর্বোক্ত পৃ : ১০২

১৯ । পূর্বোক্ত পৃ : ১০৩

২০ । পূর্বোক্ত Forward P-X X VI

২১ । শঙ্করী প্রসাদ বসু - বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (৪র্থ) পৃ : ১৫

২২ । পূর্বোক্ত পৃ : ১৫

২৩ । পূর্বোক্ত পৃ : ২৫

২৪ । ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই , পৃ : ৯২

২৫ । বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ , (৪) পৃ : ৩৮

২৬ । ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই , পৃ : ৯২

২৭ । Earl Ranaldshay, 'The Heart of Aryavarta' Page 85

২৮ । Sadition Committee's report, 1918, Page 23.

২৯ । (Home (Pol) (Cont) F1 S1 100 FN - 1068/12, 1912, Bengal Govt সূত্র ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই , পৃ : ৯৫

৩০ । পূর্বোক্ত পৃ : ৯৪

৩১ । জাগরণ ও বিস্ফোরণ , ১ম খণ্ড , পৃ : ২৪৪

৩২ । ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই , পৃ : ৯৮

৩৩ । পূর্বোক্ত পৃ : ৯৮

৩৪ ।Militant Nationalism in India, P 62.

৩৫ । পূর্বোক্ত পৃ : ১৮

৩৬ । বিপিন চন্দ্র পাল , জীবন সাহিত্য সাধনা – ড: চক্রবর্তী , পৃ : 'চ' ভূমিকা

৩৭ । বিনয় কুমার সরকারের বৈঠকে , ১ম ভাগ , পৃ : ২২৪

৩৮ । Bipin Chandra Paul, Swadeshi and Swaraj :the rise of New patriotism, 1954, Page 124.

৩৯ । Bipin Chandra Paul and India's stuggle for Swaraj : Prof Haridas Mukherjee & U.Mukherjee P-29.

৪০ । কেদার নাথ দাশগুপ্ত সঙ্কলিত 'শিক্ষার আন্দোলন', ডিসেম্বর , ১৯০৫ , পৃ : খ - ব ।

৪১ । That Sinfol Desire -Swadehi and Swaraj B.C.Paul, P-63.

৪২ । Swaraj : Its Way and Means, Madrass speech, 1907, Swadeshi and Swaraj B.C.Paul P-216.

৪৩ । Verma, Modern Indian Political Thought P-368.

৪৪ । Bipin Chandra Paul, Swadeshi and Swaraj P-201.

৪৫ । বিপিন চন্দ্র পাল : জীবন সাহিত্য সাধনা , পৃ : ২৭২

৪৬ । Swadeshi and Swaraj P-76.

৪৭ । বিনয় সরকারের বৈঠকে , পৃ : ৩৩১ - ৩৩২

৪৮ । বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা , ১ম , পৃ : ২৭৪ - ৫

৪৯ । পূর্বোক্ত পৃ : ২৮৩

৫০ । 'দেশের কথা' দেশবন্ধু রচনা সমগ্র , পৃ : ১৯ -২০

৫১ । Deshbandhu Chitta Ranjan, Hemendra Nath Dasgupta
Introduction by Humayan Kabir, P-Vii (New Delhi 1959)

৫২ । পূর্বোক্ত V-III

৫৩ । বিনয় সরকারের বৈঠকে , ১ম খন্ড , পৃ : ১১ (ভূমিকা)

৫৪ । পূর্বোক্ত পৃ : ১১ (ভূমিকা)

৫৫ । পূর্বোক্ত পৃ : ২২৯

৫৬ । শিক্ষা বিজ্ঞানের ভূমিকা , বিনয় সরকার , পৃ : ১২

৫৭ । পূর্বোক্ত পৃ : ২৪

৫৮ । বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা খন্ড পৃ :

৫৯ । ' অরবিন্দের পত্র' প্রবর্তক , ১৩২৬ , পৃ : ৬ - ১১

৬০ । শ্রী অরবিন্দের বাংলা রচনা – শ্রী অরবিন্দ আশ্রম পন্ডিচেরী – ১৯৯১ ,
পৃ : ১৪৪ - ৪৫

৬১ । পূর্বোক্ত পৃ : ১৪৬ - ৪৭

৬২ । পূর্বোক্ত পৃ : ১৪৯

৬৩ । পূর্বোক্ত পৃ : ১৬৭

৬৪ । পূর্বোক্ত পৃ :

৬৫ । বর্তমান , সমুদ্র গুপ্ত , পৃ : ৭৫

৬৬ । পূর্বোক্ত পৃ : ৭৭

৬৭ । পূর্বোক্ত পৃ : ৭৮ -৭৯

৬৮ । জাগরণ ও বিস্ফোরণ , (১) , পৃ : ২২১ -২২

৬৯ । দেশের কথা পৃ : ৩ - ৪

৭০ । পূর্বোক্ত পৃ : ১০ -১১

৭১ । পূর্বোক্ত পৃ : ১০ -১৪

৭২ । পূর্বোক্ত পৃ : ২৫০

৭৩ । পূর্বোক্ত পৃ : ৯৫ - ৯৬

৭৪ । জাগরণ ও বিস্ফোরণ , ১ম খন্ড , পৃ : ২২১ - ২২

৭৫ । Sri R Aurabinda on himself} P-30

৭৬ । পূর্বোক্ত পৃ : ৪৬

৭৭ । পূর্বোক্ত পৃ : ৪৬

৭৮ । বৃটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই , পৃ : ১৪৬

৭৯ । Bandemataram, 13th October, 1907.

৮০ । Source, Records preserved in State Archives
Writers' Buildings, Calcutta.

৮১ । জাগরণ ও বিস্ফোরণ , (ঐ) পৃ : ২২২ - ২২৩

৮২ । নিবেদিতা ও জাতীয় আন্দোলন , শঙ্করী প্রসাদ বসু , দেশ , ১৫১০ ,
১৯৮২ , পৃ : ১৫

৮৩ । বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা , ১ম খন্ড , পৃ : ২৮৯

৮৪ । অমৃত বাজার পত্রিকা , ২৫ . ১০ . ১৯০৫

৮৫ । Bengal Provincial conference, 1906, Barisal Session,
Compiled by Yatindra Nath Ghosh(1978) P-61.

৮৬ । পূর্বোক্ত পৃ : ৬৬

৮৭ । বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা , ১ম খন্ড , পৃ : ২৯৪

৮৮ । পূর্বোক্ত পৃ : ২৯৫

৮৯ । পূর্বোক্ত পৃ : ২৯৫

॥ সপ্তম অধ্যায় ॥

॥ স্বদেশী যুগ ও সাময়িক পত্রিকা ॥

সাময়িক পত্র ও স্বদেশ ভাবনা

বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টির প্রেরণায় সাময়িক পত্রিকাগুলো ছিল উর্বরা ভূমি। কর্ষিত হয়েছিল মনীষীদের মনীষা। এই ভাবনার ফসল রূপে বাংলা সাহিত্যের ভরা সোনার ফসল উঠেছিল। সাময়িক পত্রিকাগুলো উনিশ শতকের গন্ডী অতিক্রম করল যখন এই চলার পথের গতি প্রবাহে এর মধ্যে এল বৃহৎ আদর্শ বোধ ও রাজনৈতিক চিন্তার সংমিশ্রন।

আমাদের দেশে সাময়িক পত্র প্রকাশের পিছনে দ্বিবিধ প্রেরণা কাজ করেছে। কখনো কখনো সৃষ্টিশীল লেখকরাই মূখ্যত আপন আপন সাহিত্য প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম রূপে স্বীয় পরিকল্পনা প্রসূত পত্রিকা প্রকাশ করেছেন, আবার কখনো বা উৎকৃষ্ট সাহিত্য সঙ্কলন এবং সামগ্রিক ভাবে স্বদেশের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের তাগিদে কোনো কোনো সম্পাদক পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে।" ১

১৮৫৭ সালের মহাবিপ্লবের পর সংবাদ পত্র জগতে এক গতি লক্ষ করা গেছে। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এর ভাবনায় এসেছে ইংরাজ সরকারের প্রতি সরাসরি বিদ্রোহ ও স্বাধীনতার দাবীর কথা। হিন্দু মেলার অধিবেশন (১৮৬৭) হতে জন্ম নিয়েছে নব গোপাল মিত্রের 'ন্যাশনাল পেপার'। স্বদেশের জন্য ভারতবর্ষের জন্য সকলকে মিলিত করাই ছিল মেলার উদ্দেশ্য। এ ছাড়া অর্থনীতি, রাজনীতি শিক্ষা দীক্ষা ক্ষেত্রে নিজের উপর স্বাবলম্বী হওয়া ছিল মেলার অন্যতম উদ্দেশ্য। এই জাতীয় মেলা ১৮৮০ - ৮১ অবধি চলেছিল। এই জাতীয় মেলা বন্ধ হলেও বাংলার বুকে রেখে গিয়েছিল স্বদেশ ভাবনার স্পন্দন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় স্বদেশ ভাবনার কথা লিখিত হতে থাকে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'মূখ্য ও গৌন' নামে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৭৯৪ শকের কার্তিক

অগ্রহায়ণ সংখ্যায় । এই প্রবন্ধে বলা হলো , " আম্র বৃক্ষ যেমন জম্বু বৃক্ষ হইতে ভিন্ন , অথচ উভয়েই বৃক্ষ বটে , সেই রূপ বাঙালী , ইংরাজ , ফরাসিস , সকল জাতীয় মনুষ্যই মনুষ্য বটে , কিন্তু তথাপি তাহাদের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ । আম্র বৃক্ষে যেমন আম্র ফলই শোভা পায় , ইংরাজ জাতির ইংরাজ ভাবই শোভা পায় , জম্বু বৃক্ষে যেমন জম্বু ফলই শোভা পায় , সেইরূপ ফরাসিস জাতির ফরাসী ভাবই শোভা পায় , বাঙালী জাতির বাঙালী ভাবই শোভা পায় । ..... আম্র বৃক্ষের বৃক্ষত্ব রক্ষা করা যেমন আবশ্যক , আম্র বৃক্ষত্ব রক্ষা করাও তেমনি আবশ্যক , জম্বু বৃক্ষের বৃক্ষত্ব রক্ষা করা আবশ্যক , কিন্তু আম্র বৃক্ষত্ব রক্ষা করা আবশ্যক হওয়া দূরে থাকুক তাহা তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক । সেই রূপ ইংরাজের মনুষ্যত্ব রক্ষা করা উচিত , ইংরাজিত্ব রক্ষা করাও উচিত , বাঙালীর মনুষ্যত্ব রক্ষা করা উচিত , কিন্তু ইংরাজিত্ব রক্ষা করা বাঙালীর পক্ষে যেমন অস্বাভাবিক তেমনি উপহাসাস্পদ ।"

তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হলো ' বর্তমান হিন্দু সমাজের ভাবগতি উপলক্ষ্যে দেশানুরাগের প্রকৃত পদ্ধতি কিরূপ ' । প্রকাশ তারিখ ছিল ১৭৯৯ শকের বৈশাখ , আষাঢ় , শ্রাবণ সংখ্যায় । এই প্রবন্ধে স্বদেশ চেতনার অভিব্যক্তি স্পষ্ট ও দৃঢ় ।

" যে ব্যক্তি অন্যান্য গুরুজন অপেক্ষা পিতা মাতাকে অধিক করিয়া না মানে , তাহার পিতৃভক্তি বা মাতৃভক্তি কেবল একটা কথার কথা মাত্র । এই রূপ যদি অন্যান্য জাতি বা দেশ অপেক্ষা আপনার জাতি বা দেশের প্রতি আমাদের অধিক অনুরাগ না থাকে তাহা হইলে আমাদের দেশানুরাগ কেবল একটা কথার কথা মাত্র , তাহা ভিন্ন আর কিছুই নহে । যাঁহারা এই নহে । যাঁহারা এই কথা হৃদয়ের সহিত বলিতে পারেন ' জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী ' । জননী এবং জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও গরীয়সী , তাঁহাদেরই যথার্থ মাতৃভক্তি , তাঁহাদেরই যথার্থ দেশানুরাগ । অতএব স্বদেশের প্রতি সামান্য অনুরাগ থাকিলেই যে দেশানুরাগ হয় তাহা নহে , স্বদেশের প্রতি বিশেষ অনুরাগ চাই , সেই বিশেষ অনুরাগই দেশানুরাগ শব্দের বাচ্য । স্বদেশের প্রতি সামান্য অনুরাগ কি ? না স্বদেশকে অন্যান্য দেশের সহিত সমান ভাবে

ভালবাসা। স্বদেশের প্রতি বিশেষ অনুরাগ কি ? না অন্যান্য দেশ অপেক্ষা স্বদেশকে অধিক করিয়া ভালবাসা। স্বদেশের প্রতি এই যে বিশেষ অনুরাগ ইহার প্রকৃত রূপে দেশানুরাগ শব্দের বাচ্য। "

উনিশ শতকের যে সকল পত্রিকাগুলো নিরবিচ্ছিন্নভাবে স্বদেশ ভাবনার কথা প্রকাশ করে চলেছিল সেই গুলো হলো সুলভ সমাচার (১৮৭০), বঙ্কিম চন্দ্রের 'বঙ্গ দর্শন' (১৮৭২), 'ভারতী' (১৮৭৭), 'আনন্দ বাজার পত্রিকা' সাপ্তাহিক (১৮৭৮), 'বঙ্গবাসী' (১৮৮১), 'সঞ্জীবনী' (১৮৮৩), 'নবজীবন' (১৮৮৪), দৈনিক (১৮৮৫), 'জন্মভূমি' (১৮৯০), 'সাধনা' (১৮৯১), বসুমতী' (সাপ্তাহিক) (১৮৯৬), 'প্রবাসী' (১৯০০)।

বিনয় ঘোষ বলছেন " অধিকাংশ পত্রিকারই স্বদেশ চিন্তার সুর এক রকম। ..... বাংলা দেশের মধ্যস্তর এই সময় যে শুধু প্রসারিত হয়েছিল তা নয়। সুস্থ স্বদেশ চিন্তারও বিকাশ হয়েছিল তাঁদের মধ্যে, এবং এই স্বদেশ চিন্তার বিকাশে বাংলা সাময়িক পত্রের সংগ্রামও ইতিহাসে চির স্মরণীয় হয়ে আছে।" ২

উনবিংশ শতকেই সংবাদ পত্রের ভাষায় একদিকে যেমন দেখা যেতে লাগল স্বদেশ ভাবনায় রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ও স্বাধীনতার সুর স্বাধিকার দাবী আদায়ের জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। অত্যাচারী ইংরেজ শাসনের প্রতি ধিক্কারের ভাষা। আর এই চেতনায় বিংশ শতকে পদার্পণ করা মাত্রই বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলনের তীব্রতায় বাংলা সাময়িক পত্রিকাগুলি স্বদেশ ব্রতের মহান সংকল্প ঐক্যবদ্ধ ভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আঘাত হানল।

সঞ্জীবনী

- - - - - - -

উনবিংশ শতাব্দীর দেশ প্রেমের উৎস উদ্দীপনার ক্ষেত্রে যে সকল পত্রিকা ইংরাজ বিরোধী মানসিকতা সৃষ্টি করে স্বদেশবাসীর হৃদয়কে স্বাদেশিকতার মন্ত্রে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল ' সঞ্জীবনী ' সেই সব পত্রিকার মধ্যে অন্যতম । ১৮৮০ সালে এই পত্রিকার জন্ম । লর্ড লিটনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে রিপনের আমলে যখন দেশীয় সংবাদ পত্র আইন বাতিল করা হলো , তখন আসামের কুলিদের ভয়ংকর জীবনের কাহিনীকে নিয়মিত ভাবে বাংলায় প্রকাশ করার জন্য ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর , কৃষ্ণ - কুমার মিত্র , হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র ও কালী শংকর সুকুলের প্রচেষ্টায় ও মালিকানায় প্রকাশিত হলো ' সঞ্জীবনী ' । সঞ্জীবনী পত্রিকা দীর্ঘদিন তার পত্র পরিক্রমা করে । ১৯০৬ অবধি এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল । এই পত্রিকার উদ্দীপ্ত কাল ছিল ১৮৮০ হতে ১৯০৬ । ব্রাহ্ম আন্দোলন , ভারতসভার প্রতিষ্ঠা , প্রাদেশিক সম্মেলন সমূহ , এবং রাজনৈতিক অধিকারের জন্য আত্ম প্রত্যয়ের সৃষ্টি করা ছিল এই পত্রিকার অনবদ্য অবদান । ' বঙ্গভঙ্গ ' আন্দোলনের সময় ' সঞ্জীবনী ' এক প্রেরণা প্রদানকারী মৃতপ্রায় জাতির কাছে সত্যিকারেরই সঞ্জীবনী হয়ে উঠেছিল । তখন এর প্রাণ পুরুষ ছিলেন কৃষ্ণ কুমার মিত্র ।

স্বদেশ প্রেমের জোয়ার যখন তীব্র , বাংলা যখন দেশাত্মবোধ জাগরণের তীর্থ - ভূমি , বাংলার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বগুলি যখন ভারতবর্ষের শিরোমনি , জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার পৃষ্ঠপোষক বৃন্দ যখন বাংলাকে কেন্দ্র করে সর্ব ভারতে স্বাধীনতার চিন্তা বিস্তারে ব্যস্ত ঠিক সেই সময়েই লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ করলেন ।

এই সময়েই ' সঞ্জীবনী ' জাতির জীবনে স্পন্দন সৃষ্টি করে একদিকে যেমন অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ছড়াচ্ছিল অন্যদিকে জাতীয় জীবনে প্রবল রাজ্য বিমুখ তরঙ্গাভিঘাতে সঠিক নেতৃত্ব দিয়েছিল । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে কৃষ্ণ কুমার মিত্র প্রথম প্রস্তাব করলেন ও সেই প্রস্তাব ' সঞ্জীবনী ' পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় , " বাংলা যতদিন মিলিত না হয় , ততদিন বাঙালী বিলাতী দ্রব্য ক্রয় করিবে না ও বিলাতী সকল দ্রব্য বয়কট করিবে । " কৃষ্ণ কুমার ইংরাজদের আঘাত দিতে চেয়েছিলেন লাভে । [illegible]

টান পড়লে প্রাণের তাগিদে ইংরেজ বাংলার সমস্যার দিকে দৃষ্টি পাত করবে এই উদ্দেশ্যে তিনি লিখলেন , " ল্যাঙ্কাশায়ারের সহস্র সহস্র মজুরের তাত কাপড় বাঙলায় বস্ত্র বিক্রয় করিয়া যোগাড় হইয়া থাকে । তাহাদের বস্ত্র বিক্রয় না হইলে পার্লামেন্ট তাহাদিগের প্রতিনিধিদের দ্বারা নিজেদের ব্যবসায় অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য বঙ্গদেশে বয়কট কেন হইল তাহার কারণ জানিতে চাহিবে এবং সেই কারণের প্রতিকার করিয়া পার্লামেন্ট বাঙালীর এই আন্দোলন বন্ধ করাইয়া দিবে । তাহারা নিজেদের ব্যবসা রাখার জন্য ইহা করিতে বাধ্য হইবে । স্থানীয় শাসন কর্তা যখন বাঙালীর প্রতিবাদে কর্ণপাত করিল না , তখন বৃটিশ পার্লামেন্ট যাহারা নিয়ন্ত্রণ করেন তাহাদের দ্বারাই বাঙালীর প্রতি এই অবিচারের প্রতিকারের জন্য বয়কটই প্রয়োজন । "

স্বদেশী দ্রব্যের প্রতি স্বাভিমান সৃষ্টি করার জন্য ' সঞ্জীবনী ' পত্রিকায় প্রকাশিত হলো " আমরা চিনি খাইব না গুড় খাইব । লিভারপুলের লবণ খাইব না কর্কচ খাইব । " এই মন্তব্যে বাংলার মানুষের মনে একদিকে যেমন এর মধ্যে রসিকতার আমেজ অনুভব করেছিলেন , অন্যদিকে আদর্শবাদী স্বদেশী মন্ত্রে অভিষিক্ত যুবকের দল আগামী দিনের কার্য্য পদ্ধতির প্রেরণা পেয়েছিল ।

১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট কলিকাতার টাউন হলে এক বিশাল জনসভা হয় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে । এই সময় ' সঞ্জীবনী ' পত্রিকার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল । সঞ্জীবনী 'র এই বয়কট প্রস্তাবকে সমগোত্রীয় অনেক পত্রিকা অস্বাভাবিক ও অসম্ভব বলে মনে করেছিল । কৃষ্ণ কুমার মিত্র ' সঞ্জীবনী ' র সম্পাদকীয় স্তম্ভে ' কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ ' শিরোনামে লিখলেন , " বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হইলে বাঙালীর চিরাশৌচ হইবে । যতদিন বঙ্গদেশের ছিন্ন অঙ্গ পুনরায় একত্র না হয় ততদিন বাঙালী শোক চিহ্ন ধারণ করিবে । বাঙালী আমোদ প্রমোদ পায়ে ঠেলিয়া সমস্ত বঙ্গ এক করিবার মহা সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে । যতদিন সাধনায় সিদ্ধ না হইবে ততদিন ভ্রহ্মচর্য্য করিবে । জাতীয় অশৌচের সময় সমস্ত বাঙালী বিদেশী দ্রব্য স্পর্শ করা মহাপাতক মনে করিবে ।

করকচ্ছ খাইবে , তবু বিদেশী লবণ খাইবে না । গুড় খাইবে তবু বিদেশী চিনি খাইবে না । জাতীয় অশৌচের সময় বাঙালী আর মিউনিসিপ্যাল কমিশনার , জেলা বোর্ড বা লোকাল বোর্ডের সভ্য , অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট থাকিতে পারিবে না । জাতীয় অশৌচের সময় বড়লাট , ছোটলাট , কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেটের অনুরোধে কোন কাজের জন্য আর অর্থ দান করা হইবে না । যতদিন জাতীয় শোকের অবসান না হয় ততদিন রাজপুরুষদের আবির্ভাব ও তিরোভাবে আমাদের কেহ যোগ দিতে পারিবে না ।

লর্ড কার্জন বাঙালীর সর্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন যদি তিনি উদ্যত খড়্গ সম্বরণ না করেন , বাঙালী আর রাজপুরুষদিগের সংস্রবে যাইতে পারিবেন না । "

১৯০৫ এর ৭ই আগষ্টের মহতী জনসভায় ' সঞ্জীবনী ' মন্ত্রে ঘোষিত বয়কট প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হলো । বাংলার নেতৃবৃন্দ পেল এক নতুন পথের সন্ধান । ' সঞ্জীবনী ' তে প্রকাশিত হলো " বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ উপলক্ষে আমাদের স্বদেশ ভক্ত , শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা প্রতিজ্ঞা করেন যে তাঁহারা আর বিদেশী জীবন বীমা কোম্পানীতে জীবন বীমা করিবেন না । আমাদিগের নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে হইবে , ঠেক না দিয়া কোন ব্যক্তি বা জাতিকে কেহ দাঁড় করাইয়া রাখিতে পারে না । "

' বয়কট ' আন্দোলন ছিল নেতি বাচক (Negative approach) । বিদেশী দ্রব্য বয়কট করলে কোন দ্রব্য ব্যবহার করবে ? বয়কটের Positive approach হলো স্বদেশী । নিজের দেশের উৎপাদিত দ্রব্য ব্যবহার করা । আপন দেশের জিনিষ ব্যবহারে আছে স্বাভিমান , আছে আত্ম মর্যাদা বোধ । তাই এই আত্ম মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য স্বদেশী বোধ জাগানোর প্রয়োজন আছে । এই মন্ত্রে দীক্ষার অভিষেকের আয়োজন করল ' সঞ্জীবনী ' । ২০শে জুলাই ১৯০৫ এ ' সঞ্জীবনী ' লিখল , " আমরা স্বদেশের কল্যাণের জন্য মাতৃভূমির পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমরা অল্পের দেশজাত দ্রব্য পাইলে কোন বিদেশীয় দ্রব্য ক্রয়

করিব না । এই কার্য্য করিতে যদি আর্থিক বা অন্য কোন প্রকার ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় তাহাও আমরা করিতে প্রস্তুত হইব । আমরা এইরূপ কার্য্য কেবল নিজেরা করি - য়াই ক্ষান্ত হইব না , বন্ধু বান্ধব ও অন্যান্য লোকদিগকেও এই রূপ করিবার যথা - সাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করিব । ভগবান আমাদের এই সংকল্প সহায় হউন । "

' সঞ্জীবনী ' র এই আবেগ পূর্ণ উদাত্ত আহ্বানে দেশ অভূতপূর্ব ভাবে সাড়া দিল । বিভিন্ন স্থানে গ্রহণ করা হলো ' স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার ' প্রতিজ্ঞা । বাগের হাটের জনসভায় মিলিত জনগণ স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করল । মাগুরা জন সভায় ২০শে জুলাই ১৯০৫ , একই অভিব্যক্তি প্রতিধ্বনিত হলো । ২০শে জুলাই কলকাতার ছাত্র সমাজ হিন্দু হস্টেলে একই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করল । ২৪শে জুলাই গোল দিঘীতে এক বিশাল সভায় স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণের সংকল্প গৃহীত হলো । এমন কি পাটনা শহরে ২৩শে জুলাই বিদেশী বস্ত্র ও চিনি পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ।

৩রা আগষ্ট , ১৯০৫ এ ' সঞ্জীবনী ' ঘোষণা করল " স্বদেশে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয় , ইংলন্ডের সে সকল দ্রব্য ব্যবহার করিব না । স্তব স্তুতি অনেক হইয়াছে , আর নয় । এখন আইস , আমরা নিজেরা পায়ে দন্ডায়মান হই । বিদেশী দ্রব্য আর ব্যবহার করিব না । এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি । এবার সকলে মাতৃ - ভূমির নামে প্রতিজ্ঞা করি , ইংলন্ড জাত বস্ত্র ক্রয় করিব না । এবার ছিন্ন বস্ত্র পরিয়া রাজপথে বাহির হইব তবুও বিদেশী বস্ত্র ক্রয় করিব না । আমরা আবার বলি যদি সকলে এই প্রতিজ্ঞা করেন , তবে বঙ্গের ছিন্ন অঙ্গ পুনরায় জোড়া লাগিবে । এস ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া সকলে সপরিবারে প্রতিজ্ঞা করি স্বদেশ জাত দ্রব্য পাইতে বিদেশী দ্রব্য স্পর্শ করিব না । "

' সঞ্জীবনী 'র এই আহ্বান ব্যর্থ হয় নি । যে পূর্ববঙ্গকে হাতে পেয়ে লর্ড কার্জন ভেবেছিলেন দেশাত্ম বোধের জোয়ার বা স্বদেশী আন্দোলন হতে পূর্ববঙ্গ

সম্পূর্ণভাবে নিস্পৃহ থাকবে এবং বাংলার অখণ্ড মানসিকতা বিধ্বস্ত হবে , কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ঘটল ব্যতিক্রম । বঙ্গ বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া ঘটল । এই প্রতিক্রিয়ার চিত্র আমরা ' সঞ্জীবনী ' পৃষ্ঠায় দেখতে পাই । ২রা বৈশাখ ১০১১ ' সঞ্জীবনী 'তে প্রকাশিত হলো , " লর্ড কার্জন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাবে পূর্ববঙ্গ - বাসীদের অভূত পূর্ব তুমুল আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন দেশের অশি - ক্ষিত জনসাধারণের সহিত এই আন্দোলনের কোন সংস্রব নাই , আসামের সামিল হইলে তাহাদের যে কোন লাভ ক্ষতি হইবে , তাহারা তাহা জানেনা বা বোঝে না , কতকগুলি লোক তাহাদের পরামর্শ দিয়া আন্দোলনে যোগ দেওয়াইছে । লর্ড কার্জনের এই উক্তির যে কোন মূল্য নাই , তাহা আমরা বহুবার প্রদর্শন করিয়াছি । অদ্য একটি ঘটনার দ্বারা আমরালর্ড কার্জনের উক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করিব । চৈত্র সংক্রান্তির পূর্ব দিনে ঢাকা শহরে প্রতি বৎসর অনেক সং বাহির হয় । এবারেও অনেক সং বাহির হইয়াছিল । তন্মধ্যে এক সং এইরূপ ছিল — কৈলাসে হর পার্বতীকে ঘেরিয়া দেবগণ বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাবের সমালোচনা করিতেছেন । নারদ বীনা বাদন করিয়া সংগীত করিয়া মহাদেবকে বলিতেছেন , আপনি সকল দেবতার দেবতা , আপনার এ কেমন বিচার ? আপনি কালিঘাটের কালীর অধীশ্বর , তদ্রূপ ঢাকার ঢাকেশ্বরীর এবং কামরূপের কামাখ্যা দেবীরও অধীশ্বর । ঢাকেশ্বরীকে কামাখ্যেশ্বরীর অধীন করিতেছেন কেন ? আপনি সদাই নেশায় বিভোর , সুতরাং কোথায় কি ঘটে , তাদের খোঁজ খবর রাখেন না । যদি আপনি ঢাকা বাসীদের উপর ন্যায় বিচার না করেন , তাহা হইলে আমি বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর নিকট আবেদন করিতে যাইব ।

অজ্ঞ অশিক্ষিত লোকেরাই চৈত্র সংক্রান্তির দিন সং বাহির করিয়া থাকে । বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাবে সাধারণ লোকের মনের ভাব কি , এই ঘটনাতে যাহাই প্রকাশ পাইয়াছে । লর্ড কার্জন বলিয়াছিলেন , কতকগুলি লোক কুপরামর্শ দিয়া দেশের লোককে মাতাইয়া তুলিয়াছে । সই ঘটনা তাদের উক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করিতেছে । পূর্ববঙ্গের লোক কিছুতেই বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে প্রস্তুত নহে । "

'সঞ্জীবনী'র এই প্রচেষ্টায় দ্রুত জনমত গঠিত হলো। 'সঞ্জীবনী'র মধ্যে কিন্তু থেমে থাকার প্রবৃত্তি ছিল না। ধূর্ত ইংরেজ যে কোন মুহূর্তে তাদের সিদ্ধান্ত বহাল রাখতে পিছু পা হবে না এ ভাবনা 'সঞ্জীবনী' র মধ্যে জাগ্রত ছিল। তাই জাতি নিরন্তন সাধান বানী উচ্চারণ করেছে এই পত্রিকা। ১৬ই পৌষ, ১৩১১ এ এক সম্পাদকীয় মন্তব্য বের করল 'সঞ্জীবনী'। সেই মন্তব্যে লেখা হলো "আমরা অনেক দিন হইল এই শুভ সংবাদ প্রকাশ করিয়াছি যে ভারত গর্ভনমেন্ট বঙ্গের অর্ধচ্ছেদের প্রস্তাব আপাততঃ স্থগিত রাখিয়াছেন। পাইওনিয়ার আমাদের প্রকাশিত সেই সংবাদের সমর্থন করিয়া গত শনিবার লিখিয়াছেন যে "The question of the Partition of Bengal will probably be held over now for sometime as the master will have to be referred to the Secretary of State".

ভারত সচিবের অনুমতি না লইয়া বঙ্গের অর্দ্ধচ্ছেদ করা যাইবে না, সুতরাং অর্দ্ধ - চ্ছেদের প্রস্তাব সম্ভবতঃ কিয়ৎকালের জন্য স্থগিত থাকিবে।

" লর্ড কার্জন এদেশে ইংরাজ প্রাধান্য স্থাপন করিতে আসিয়াছেন। ইংরেজ যাহাতে ভারতবাসীর উপর প্রতিষ্ঠিত, লর্ড কার্জন তাহারই ব্যবস্থা করিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। বেসরকারী ইংরাজ অর্থাৎ ইংরাজ চা - কর, কফি - কর, খনি - কর, দোকানদার ও বণিকদিগকে শক্তিশালী করিয়া ভারতবাসীকে সন্ত্রস্ত রাখ। গর্ভনমেন্ট অফিসে শ্বেতাঙ্গ দিগকে সংখ্যায় শক্তিশালী করিয়া ভারতবাসীকে অধীন রাখা পুলিশ বিভাগে শ্বেতাঙ্গ প্রধান্য স্থাপন করিয়া ভারতবাসীকে দমনে রাখা, সৈনিক বিভাগে ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ইংরাজ প্রভুত্ব স্থাপন করা, লর্ড কার্জ্জনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি সেই উদ্দেশ্য সফল করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

" ইংরাজ প্রাধান্য স্থাপনের জন্যই বিশ্ববিদ্যালয় আইন, গুপ্ত সংবাদ প্রকাশ আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে এবং বঙ্গের অর্দ্ধচ্ছেদ করার আয়োজন হইয়াছে।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভক্তির উপর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার আয়োজন করিয়া -

ছিলেন এবং সে আয়োজন সুসিদ্ধ হইয়াছিল । ভারতবর্ষে এমন কে আছে যে ভিক্টোরিয়াকে মাতার ন্যায় শ্রদ্ধা না করিত , কিন্তু লর্ড কার্জন সে নীতির পরিবর্তন করিয়া ভারত - বাসীর দুর্বলতার উপর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প করিয়াছেন । কিন্তু লর্ড কার্জনের জানা উচিৎ , আমরা অরাজক দেশে বাস করি না । আমাদের রাজা আছেন । তিনি আমাদের ভক্তির উপর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে কখনও বিমুখ হইবেন না ।

" বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিলে বাঙ্গালী সকল বিষয়েই দুর্বল হইবে । বাঙ্গালার শিক্ষায় হীনতা হইবে , সমাজ ও ধর্ম সংস্কার শক্তি দুর্বল হইবে , ভাষা ম্লান হইবে সংবাদ পত্র সমূহ সহায়হীন হইবে , রাজনীতিক আন্দোলন খর্ব হইবে , বাঙালী জাতি নগন্য হইবে ।

''লর্ড কার্জন এতদিন আপনার সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতেন , কিন্তু বঙ্গের জমিদার ও কৃষক এক প্রাণ হইয়া বাধা দেওয়াতে সে সংকল্প সিদ্ধ করিতে পারেন নাই ।

'' লর্ড কার্জন ইংলণ্ডে যাইতেছেন ভারত সচিবকে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রয়োজন বুঝা - ইতে ত্রুটি করিবেন না । এমন সংকট কালে কি আমরা নীরব থাকিব ? নদীর কূলে পৌঁছিয়া কি তরী ডুবাইব ?

শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যদি সম্ভব হয় আরও কতিপয় ব্যক্তিকে অবলম্বে ইংলণ্ডে প্রেরণ করা কর্তব্য । এখন যদি আলস্য করি , অর্থ সংগ্রহ করিতে শিথিলতা প্রদর্শন করি , তবে আমাদের এতদিনের সকল চেষ্টা উদ্যম বিফল হইবে । বঙ্গদেশ আসামের কুক্ষিগত হইয়া কতকাল যে অশ্রু সিক্ত হইবে , তাহা জানি না ।

লর্ড কার্জন অদ্য সিমলা হইতে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিবেন । তাঁহার ভারত ত্যাগের পূর্ব্বেই আমাদের প্রতিনিধিদের ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করা উচিত ছিল । সে

যাহা হউক , আর কাল বিলম্ব না করিয়া আমাদের প্রতিনিধি দিগকে ইংলন্ডে প্রেরণ করা উচিত । আমরা আশা করি , এক সপ্তাহের মধ্যে অন্ততঃ ২০ হাজার টাকা বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েসনের সম্পাদকের নিকট বঙ্গের নানা স্থান হইতে প্রেরিত হইবে ।অবিলম্বে ২০ হাজার টাকা চাই । ইহার গুরুত্ব সকলেই উপলব্ধি করিয়া অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইবেন , আমরা এই আশা করিয়াছি । "

প্রস্তাবিত বঙ্গভঙ্গের সম্পর্কে কিছু সংবাদ পত্রের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দিলেও ' সঞ্জীবনী ' একদিকে যেমন সঠিক সংবাদ প্রকাশ করত সেই রূপ অন্যদিকে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তার বলিষ্ঠ মত প্রকাশ করে জন জাগরণেরভূমিকায় দেশকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল । এমন কি সঠিক সময়ে দেশ নেতাদের কর্তব্য পালনেও আগ্রহী করে তুলত 'সঞ্জীবনী ' ।

১৩১১ সালের ৬ই শ্রাবণ পত্রিকা তার সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করল , " বিগত আষাঢ় মাসের প্রথমে কোন কোন সংবাদ পত্র এই কথা প্রচার করিয়াছিলেন , ঢাকা ও ময়মনসিংহ আসামের সামিল হইবে না , কিন্তু চট্টগ্রাম বিভাগ আসামের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে । কে এই সংবাদ প্রচার করিয়াছে তাহা আমরা জানি না । কিন্তু এই সংবাদ প্রচার করিয়া অনিষ্ট করা হইয়াছে । যাঁহারা আন্দোলনের অগ্রণী , তাঁহারা এই সংবাদে আস্থা স্থাপন করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়াছেন । আমরা সে সংবাদে কোনরূপ আস্থা স্থাপন করি নাই । সে জনরবের কথা আমরা ' সঞ্জীবনী 'তে প্রকাশও করি নাই । সংবাদটা যে অমূলক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ।

বঙ্গের ছোট লাট সম্প্রতি পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন । ফরিদপুর , কুমিল্লা , নোয়াখালী ও বরিশালের নগরবাসীগণ বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ছোট লাটকে আমাদের মনোগত ভাব জানাইয়া ছিলেন । ছোট লাট সর্বত্রই এই কথা বলিয়াছেন যে , ' ভারত গভর্নমেন্ট বঙ্গের হিতের জন্যই অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব উপস্থিত

করিয়াছেন । যদি বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করেন , তবে প্রজার হিত হইবে মনে করিয়াই তাহা করিবেন । ' ছোট লাট একথাও প্রকাশ করিয়াছেন যে ' অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব এখন ভারত গভর্নমেন্ট ও ভারত সচিবের বিবেচনাধীন আছে । ছোট লাট সকলকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বলিয়াছেন ' পূর্ববঙ্গের কয়েকটা জেলা আসামের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না । পূর্ববঙ্গের কয়েকটি জেলা ও আসাম লইয়া এক স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করা হইবে । সেই প্রদেশ শাসনের জন্য একজন লেফটেনেন্ট গভর্নর নিযুক্ত হইবেন । তথাকার আইন প্রনয়ণ করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভা হইবে । সে প্রদেশের উপর হাইকোর্ট ও রেভেনিউ বোর্ডের ক্ষমতা থাকিবে । ' কোন নগরবাসী ছোট লাটকে বলিয়াছিলেন , ' বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব শুনিয়া জনসাধারণ ভীত ও শঙ্কাযুক্ত হইয়াছে । ' ছোট লাট নগরবাসীর মুখে জনসাধারণের ভয় ও শঙ্কার কথা শুনিয়া একটু রাগ করিয়াছেন । রাগ করিবার কথাই বটে । ছোট লাট যদি জনসাধারণের মনের অবস্থা বুঝিতে সমর্থ হইতেন , তবে কখনও রাগ করিতেন না । সত্য সত্যই অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাবের কথা শুনিয়া পূর্ববঙ্গ ভীত ও শঙ্কিত হইয়াছে ।

ছোট লাটের কথা শুনিয়া সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন গভর্নমেন্ট অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব পরিহার করেন নাই । ঢাকা ও ময়মনসিংহকেও বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করার প্রস্তাব পরিহার করেন নাই ।

যাঁহারা এক সময় তুমুল আন্দোলন করিয়াছিলেন , যে রূপ আন্দোলন কেহ কখনও দেখে নাই শুনে নাই , সেইরূপ আন্দোলন করিয়াছিলেন — যাঁহারা অসম্ভব সম্ভব করিয়াছিলেন , তাঁহাদিগকে পুনরায় মহান্দোলনে ব্রতী হইতে হইবে ।

এই প্রস্তাব হইয়াছিল যে , গত ফাল্গুন মাসেই কয়েকজন প্রতিনিধিকে ভারত সচিবের নিকট প্রেরণ করা হইবে । প্রতিনিধিগণ অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাবের অনিষ্টকারিতা ভারত সচিব ও তাঁহার সভার সভ্যদিগকে বুঝাইয়া দিবেন । ইংলণ্ডের রাজপুরুষদিগের নিকট বাঙ্গালীর মনোবেদনা প্রকাশ করিবেন ।

লর্ড কার্জন ইংলণ্ডে গিয়াছেন , তিনি অঙ্গচ্ছেদের অনুকূল যত যুক্তিতর্ক আছে তাহা ভারত সচিবকে বুঝাইয়া দিয়াছেন কিন্তু তাহার প্রতিকূলে যে সকল প্রবল যুক্তি তর্ক আছে , তাহা কেহ বুঝাইল না । বাঙ্গালা মহা ভ্রম করিয়াছেন ।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস , যদি শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্ত , শ্রী যুক্ত আনন্দ মোহন বসু , শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় , শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়দের মত লোককে আমাদের প্রতিনিধি পদে বিধি পূর্বক নিযুক্ত করিয়া পাঠাইতে পারিতাম , তবে ভারত সচিব ও তাঁহার সভার সভ্যগণ আমাদের আবেদন উপেক্ষা করিতে পারিতেন না । কিন্তু বাঙ্গালীর শিথিলতায় আমাদের পক্ষ সমর্থন করা হইল না । ভারত সচিব লর্ড কার্জনের উক্তি শুনিয়া এই বিবাদ এক তরফা নিষ্পত্তি করিবেন । আমরা বলি এখনো সময় আছে । .... অচিরে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করুন ।"

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের গতি প্রবাহিত হয়েছিল দীর্ঘদিন ধরে । এই আন্দোলন কখন হয়েছে দুর্বার কখনও বা স্তিমিত । কিছু দিন আন্দোলন করার পর জাতীয় নেতৃবৃন্দের মনে এসেছিল আলস্য ও হতাশা । আন্দোলনের ফল কতদূর সফল হবে এই প্রশ্ন তাঁদের মনে সংশয়ের সৃষ্টি করেছিল । ' সঞ্জীবনী ' কিন্তু ছিল জাতির প্রহরী । ১৮ই কার্তিক , ১৩১১ সালে সম্পাদকীয় মন্তব্যে ' সঞ্জীবনী ' যেন চেতনার চাবুক হানল ।

" বঙ্গভূমি কি জীবিত না মৃতের দেশ ? যাহাদের সর্ব্ববিধ উৎসাহ উদ্যম আতস বাজির অগ্নি স্ফুলিঙ্গবৎ হঠাৎ প্রজ্বলিত হয় এবং অকস্মাৎ লুপ্ত হয় , আরাম ও আত্মসুখের মোহে যাহারা জীবনের সর্ববিধ গুরুতর কর্তব্যকে অক্লেশে লঘুতর করিয়া তোলে এবং নিদারুণ অবহেলা ভরে বিস্মৃত হয় , ব্যক্তিগত সংকীর্ণ স্বার্থের গন্ডি অতিক্রম করিয়া যাহারা কখনও দেশের সেবায় জন্মভূমির কল্যাণে সরলভাবে প্রাণের ব্যগ্রতায় নিযুক্ত হইতে পারে না — বহুমূল্য জাতীয় একতাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট হইতে দেখিয়াও যে জাতি নির্ব্বোধের মত কল্পিত সিদ্ধির প্রত্যাশায় বসিয়া

আলস্যে দিন কাটাইতে পারে , তাহাদের জাতীয় জীবন কি বাস্তবিক উপকথার বিষয় নহে ?

লর্ড কার্জন বলিয়াছিলেন বঙ্গ বিভাগের প্রস্তাবটি নূতন বলিয়া আন্দোলন কারীগণ এক্ষণে উহাকে বিপ্লব জনক মনে করিতেছে । সুতরাং প্রথমতঃ কিছু দিন উহারা খুব হৈচৈ করিবে , কিন্তু ক্রমে যখন সহ্য হইয়া যাইবে তখন বুঝিবে এই বিভাগে তাহাদের কি উপকার হইয়াছে ।

" অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিয়া আমরা পাপগ্রস্ত ও অধঃ পতিত হইয়াছি । পাপের শাস্তি স্বরূপ এক্ষণে আর অন্যায় অত্যাচারে আমাদের প্রাণে তীব্র বেদনা বোধ জন্মে না । বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের আন্দোলনে আমরা কার্য্য দ্বারা দেখাইয়াছি যে আমাদের বেদনা কেবল ওষ্ঠ ধারী — অন্তর্দাহী নহে । অন্তরের বেদনা কেহ এত শীঘ্র ভুলিতে পারে না । অথবা আমরা বাঙালী জাতি নিতান্তই নির্ব্বোধ , নচেৎ এমন বিপদপাতে এরূপ নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিতাম না । "

' বঙ্গবিভাগ ' সম্পর্কে আন্দোলন স্তিমিত করার জন্য সরকার অনেক কিছু সিদ্ধান্ত গোপন করিতেন । জন মন এসব তথ্য না জানার জন্য বিভ্রান্ত বোধ করিতেন । ' সঞ্জীবনী ' ছিল নিয়ত প্রহরী । সরকারের রোষ কষায়িত চক্ষুকে কোনদিনই ভয় করেনি । ২রা অগ্রহায়ণ , ১৩১১ এর সম্পাদকীয় মন্তব্যে প্রকাশিত হলো —

" ভারত গভর্ণমেন্ট বাঙালী জাতিকে দুভাগে বিভক্ত করিতে দৃঢ় সংকল্প হইয়াছেন - আমাদের বড় আপনার হঁস সার এন্ড্রু ফ্রেজারও বাঙ্গালী জাতির এই সর্বনাশ সাধন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন । ভারত গভর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই , কিন্তু এ কথা ঠিক যে উত্তর পূর্ব প্রদেশ নামে এক নূতন প্রদেশ গঠিত হইবে — আসাম , ঢাকা বিভাগ , চট্টগ্রাম বিভাগ ও দার্জ্জিলিং ছাড়া সমস্ত রাজশাহী বিভাগ সেই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইবে । এবং একজন লেফটেনেন্ট গভর্নর সেই প্রদেশের শাসন কর্তা হইবেন ।

" সে নূতন প্রদেশে হাইকোর্ট , রেভেনিউ বোর্ড ও ব্যবস্থাপক সভা যদি প্রতিষ্ঠিত হয় , তবে জেলা বোর্ড প্রভৃতিকে তাহার সভ্য নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হইবে কি না তাহাও কেহ জানে না ।

" গভর্ণমেন্ট সেখানে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন , গভর্ণমেন্ট সংগোপনে ভারত সচিবের নিকট কি লিখিয়াছেন , তাহা কেহ বলিতে পারে না । ভারত গভর্ণমেন্ট যখন চট্টগ্রাম বিভাগ ও ঢাকা ময়মনসিংহ আসামের অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন , তখন বেশ সরল প্রাণে সে কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন । এবার অন্ধকারে কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি হইল কেন ? আমাদের মঙ্গলের জন্য যদি গভর্ণমেন্ট কোন কার্য্য করিতে বাসনা করিয়া থাকেন , তবে আমাদের নিকট তাহা গোপন রাখিবেন কেন ?

" গভর্ণমেন্ট কি মন্ত্রণা করিয়াছেন , আমরা তাহা জানিতে চাই । গভর্ণমেন্টের মন্ত্রণা অবশ্যই আমাদিগকে জানাইতে হইবে । গভর্ণমেন্ট নূতন প্রস্তাব আমাদের মতামত প্রকাশের সুবিধা করিয়া দিন । যদি না দেন , তবে এই গভর্ণমেন্টকে কেহ ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট , বলিবে না , তবে রুষ গভর্ণমেন্ট ও কার্জ্জন গভর্ণমেন্টে কোন বিভিন্নতা থাকিবে না ।

"গভর্ণমেন্টের নূতন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মহা আন্দোলনের সূচনা হইয়াছে । কলি - কাতায় এক সপ্তাহের মধ্যেই ঘণীভূত প্রতিবাদের জন্য এক কমিটি স্থাপিত হইবে — সমস্ত দেশে প্রতিবাদের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে । ইংলণ্ডে সে প্রতিবাদের ধ্বনি পেঁাছিবে - আমরা পড়িয়া পদাঘাত সহিব না । ইংরেজ জাতির নিকট , আমাদের রাজার নিকট রাজপুরুষদের দুর্ব্যবহারের প্রবল প্রতিবাদ করিব । ফল অবশ্যই হইবে । "

বোম্বাইয়ে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধে কলকাতার টাউন হলে এক সভা হবে । এবং এই সভায় স্থির হবে বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে আন্দোলনের কি রূপ পথ অবলম্বন করা বিধেয় হবে । এই সিদ্ধান্ত সভার বর্ণনা

'সঞ্জীবনী'তে প্রকাশিত হয় ২৮শে পৌষ, ১৩১১ সালে।

"যে দিন বোম্বাই হইতে বাঙ্গালার সংবাদ পত্র সমূহে এই খবর প্রকাশিত হয় যে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদে সমন্ধে কর্তব্য নির্ধারণের জন্য টাউন হলে বঙ্গের প্রতিনিধি - দের মন্ত্রণা সভা হইবে এবং সার হেনরী কটন সেই সভার সভাপতি হইবেন, সেইদিন হইতে সমস্ত বঙ্গে আবার তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। সেই দিন হইতে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে প্রকাশ্য সভা হইতেছিল। সেই দিন হইতে মন্ত্রণা সভার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ আরম্ভ হয়। গত সপ্তাহে নানা স্থানে প্রতিনিধি নির্বাচনের ত্বরা পড়িয়াছিল। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান, বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডার্স ও ইন্ডিয়ান এসোসিয়ে - সন মন্ত্রণা সভার আয়োজন প্রবৃত্ত হন।

টাউন হলে মন্ত্রণা সভার জন্য বিপুল আয়োজন হইল। পূর্ববঙ্গ এবং উত্তর বঙ্গ এবং পশ্চিম বঙ্গের কোন কোন স্থান মহোৎসাহে আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েসন, বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েসনের সঙ্গে এবং এই দুই জমিদার সভা ভারতসভার সঙ্গে একপ্রাণ হইয়া মন্ত্রণা সভার উদ্যোগ করি - য়াছিল। উদ্যোগ সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে।

গত্য কল্য বুধবার টাউন হলে বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। সেম ও মঙ্গল বাদ বিবিধ জেলার বহু সংখ্যক প্রতিনিধি কলিকাতায় উপস্থিত হন। ঢাকা, ময় - মন সিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, রাজশাহী, বগুড়া, নদীয়া, বহরমপুর, চট্টগ্রাম, আসাম প্রভৃতি বিবিধ স্থানের প্রতিনিধিগণ বহু অর্থ ব্যয় ও ক্লেশ স্বীকার পূর্বক কলিকাতায় আগমণ করেন।

"অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার কিঞ্চিৎ পূর্বে সার হেনরী কটন সভাস্থলে প্রবেশ করেন। দুই সহস্র লোক দন্ডায়মান হইয়া আনন্দ ধ্বনির সহিত সার হেনরীর অভ্যর্থনা করেন। রাজা প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করেন। বঙ্গদেশ দুইভাগে বিভক্ত হইলে বাঙ্গালী জাতির যে সর্বনাশ হইবে, সংক্ষেপে তাহা প্রকাশ করেন,

বাঙ্গালী জাতি যে অঙ্গচ্ছেদের প্রবল প্রতিবাদ করিতেছে তাহা ব্যক্ত করেন এবং সব শেষে সার হেনরী কটনকে উপস্থিত বিপদে কি করা কর্তব্য তৎসমন্ধে উপদেশ দিবার জন্য অনুরোধ করেন ।

" সার হেনরী দন্ডায়মান হইলেন , আর টাউন হল জয়ধ্বনিতে কাঁপিতে লাগিল । বহুক্ষণ স্রোত প্রবাহিত হইল । তারপর সার হেনরী বলিতে লাগিলেন , বহুকাল পূর্বে একবার চট্টগ্রাম আসামের অন্তর্ভূক্ত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল , কিন্তু তৎ - কালের গভর্ণমেন্ট সে প্রস্তাব যুক্তি সঙ্গত মনে না করিয়া তাহা পরিত্যাগ করেন । তারপর তিনি যখন আসামের প্রধান কমিশনার ছিলেন , তখন ঢাকা ও ময়মনসিংহ এবং চট্টগ্রাম আসামের সামিল করার প্রস্তাব হইয়াছিল । তিনি তখন বলিয়াছিলেন ঢাকা ময়মনসিংহ আসামের অন্তর্ভূক্ত করা হইবে , এ কথা যদি প্রকাশিত হয় , তবে ভয়ংকর প্রতিবাদ হইবে — বঙ্গের শাসন কর্তাও সে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবেন । তারপর সে প্রস্তাব সম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য হয় নাই । তাঁহার কার্য্য ত্যাগের পর পুনরায় সেই প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইয়াছে । সমস্ত বঙ্গদেশ সে প্রস্তাবের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত , বিস্মিত ও বিক্ষুব্ধ হইয়াছে ।

" পূর্বে আসাম বাঙ্গলার অন্তর্ভূক্ত ছিল । সার জন ক্যাম্বেল একমাস ডিব্রুগড় গিয়াছিলেন । এখন আসাম বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে । তবু কি কার্যভার বৃদ্ধি পাইয়াছে ? পূর্বে চট্টগ্রাম যাইতে ৪ দিন লাগিত , এখন তথায় ২৪ ঘন্টায় যাওয়া যায় । পূর্বে পুরী যাইতে হইলে বহুদিন রাস্তায় কাটাইতে হইত , এখন তথায় যাইতে ২৪ ঘন্টা সময়ও লাগে না । সুতরাং কার্যভার বৃদ্ধি না হইয়া বরং লঘুই হইয়াছে ।

" বঙ্গের ছোটলাটের কার্য্য বৃদ্ধি হয় নাই । সুতরাং বাঙ্গালী জাতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করার কোন প্রয়োজন নাই ।

" বাঙ্গালীরা দুই ভাগে বিভক্ত হইতে চায় না। তাঁহারা এক সমাজ বদ্ধ। যাঁহারা এক ভাষা ব্যবহার করেন তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইতে অবশ্যই আপত্তি করিবেন। গভর্ণমেন্ট বলিয়াছেন 'আমরা ও সব ভাবের কথা শুনিতে চাই না।' লর্ড কার্জ্জনের মুখে ভাবের নিন্দা ভাল শুনায় না। লর্ড কার্জ্জন যেমন ভাব প্রধান লোক, এমন আর কে আছে? সুতরাং তাঁহার নিকট ভাবের মূল্য অবশ্যই আছে।

" লর্ড কার্জ্জন ইউনিয়নিস্ট দলের লোক। অর্থাৎ আয়ার ল্যান্ডকে ইংলন্ডর সহিত মিলিত রাখিতে ইচ্ছুক। আয়ার ল্যান্ডের লোক পৃথক হইতে চায়। তবুও তিনি আয়ার ল্যান্ডকে পৃথক হইতে দিবেন না। কিন্তু বঙ্গদেশের বেলায় তাঁদের বিপরীত কার্য্য করা ভাল নয়। বঙ্গদেশ একত্র থাকিতে চায়, তাহাকে পৃথক করিয়া দেওয়া কি তাঁহার মত লোকের কর্ত্তব্য কার্য্য ?

" বঙ্গ বিভাগের কোন প্রয়োজন নাই। যদি করিতে হয়, তবে বিহার ও ছোট-নাগপুর এক প্রধান কমিশনারের অধীন কর। কোন কোন বেহারী বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চান, এ কথা যদি সত্য হয়, তবে বেহার কে বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেই চলিতে পারে।

আসাম বঙ্গদেশের সহিত মিলিত হইয়া থাকিতে চায়। শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের লোক পুনরায় বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত হইলে অত্যন্ত আনন্দিত হইবে। তাহারা বঙ্গদেশের অনেক সুখ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়া আছেন।

লর্ড কার্জ্জন একজন রাজনীতিবিদ পুরুষ। জন সাধারণের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করা যে অনুচিত, তাহা তিনি জানেন। অতএব আপনারা প্রবল প্রতিবাদ করুন, অপুন্ন প্রতিবাদ করুন, নিশ্চয়ই সফলকাম হইবেন। কবডেন ও ব্রাইট কতকাল আন্দোলন করিয়াছিলেন, আশা নিরাশার মধ্যে আন্দোলন করিয়াছিলেন। তারপর তাঁহাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছিল। আপনারা সেইরূপ আন্দোলন করুন, এখানে কিছু না

হয় , ইংলন্ডে আন্দোলন করুন , আপনাদের চেষ্টা বৃথা হইবে না । "

এই সভা ও হেনরী কটনের বক্তৃতা বাংলার মানুষকে উদ্দীপ্ত করে তুলল । কিন্তু বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ছিলেন অনমনীয় । ২৩ শে মাঘ , ১৩১১ তে ' সঞ্জীবনী'র সম্পাদকীয় মন্তব্যে বাস্তব ও তথ্য সংযুক্ত মন্তব্য প্রকাশিত হলো ।

" ভারত সচিবের কাউন্সিলে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব প্রেরিত হয় নাই । ইহা সকলে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করুন । যাহারা মহোৎসাহে পুনরায় আন্দোলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন , তাঁহাদের সহিত একত্র হইয়া পুনরায় মহা আন্দোলন উপস্থিত করুন । এদেশে ও ইংলন্ডে আন্দোলন না করিলে বাঙ্গালী জাতিকে মৃত্যুর মুখ হইতে কখনও রক্ষা করা যাইবে না ।

"আন্দোলন কি রূপে করিতে হয় , পূর্ববঙ্গ তাহা দেখাইয়াছেন । পূর্ববঙ্গে পুনরায় প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইবে । উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ এবার আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইবেন । উত্তর ও পূর্ববঙ্গ যদি বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হয় তবে পশ্চিমবঙ্গের আর থাকিবে কি ?

সমস্ত বঙ্গদেশের অধিবাসীর সংখ্যা ৭ , ৮৪ , ৩৯ , ৪১০ । তন্মধ্যে বৃটিশ অধিকৃত বঙ্গদেশের অধিবাসীর সংখ্যা ৭ , ৪৭ , ৪৪ , ৮৬৬ ।

খাস বঙ্গের অধিবাসীর সংখ্যা এই :

বর্দ্ধমান বিভাগ	৮২ , ৪০ , ৩৭৬
প্রেসিডেন্সী বিভাগ	৮৯ , ৯০ , ৩২৮
রাজশাহী বিভাগ	৮৪ , ৯০ , ১০৯
ঢাকা বিভাগ	১ , ০৭ , ৯০ , ৯৮৮
চট্টগ্রাম বিভাগ	১০ , ৩৩ , ২০০
মোট	৩ , ৭৮ , ৭৩ , ৩৩১

যদি রাজশাহী , ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ বঙ্গদেশ হইতে ছিন্ন হয় তবে বঙ্গ - দেশে ১ , ৭২ , ০০ , ১০৪ জন মাত্র বাঙ্গালী থাকিবে । ২ , ০৬ , ৪২ , ০০৭ জন বাঙ্গালী নূতন প্রদেশে চলিয়া যাইবে । বাঙ্গালী হীনবল হইয়া পড়িবে ।

খাস বঙ্গদেশে বাঙ্গালী বেহারী অপেক্ষা জন সংখ্যায় কম হইবে । বেহারের অধিবাসীর সংখ্যা সকলে লক্ষ্য করুন :

পাটনা বিভাগ	১ , ০০ , ১১ , ৯৮৭
ভাগলপুর বিভাগ	৮৭ , ২৬ , ৩১৮
মোট	২ , ৪২ , ০৮ , ৩০৫

তখন বঙ্গদেশে বাঙ্গালীর সংখ্যা ১ , ৭২ , ০০ , ১০৫ ও বেহারীর সংখ্যা ২ , ৪২ , ০৮ , ৩০৫ থাকিবে । তখন বাংলা গভর্ণমেন্ট ন্যায়তঃ বাংলা অপেক্ষা বেহারীর হিত চিন্তা করিতে অধিকতর বাধ্য হইবে ।

তখন বঙ্গদেশে বেহারীরা অধিক রাজকার্য্য পাইবেন , বেহারীই বাঙ্গলা দেশে প্রাধান্য লাভ করিবেন । বঙ্গের জেলায় জেলায় বেহারী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট , বেহারী মুন্সেফ , বেহারী সাবজজের প্রাদুর্ভাব হইবে । বেহারের উন্নতির জন্য গভর্ণমেন্ট যত চেষ্টা করিবেন , বঙ্গের উন্নতির জন্য তত চেষ্টা করা উচিত মনে করিবেন না । ২ কোটি ৬ লক্ষ বাঙ্গালী নূতন প্রদেশের সামিল হইবে , ১ কোটি ৭২ লক্ষ বাঙ্গালী বঙ্গদেশে থাকিবে । বাঙ্গালী জাতিকি তবে হীনবল হইয়া পড়িবে না ?

বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করিতে হইলে অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গে এ ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিতে কাল বিলম্ব করা উচিত নয় । "

' সঞ্জীবনী ' প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে বাংলার মানুষের প্রতি তীব্র আন্দোলন করার আগ্রহ ও জাতিকে সঞ্জীবনী মন্ত্রে আবাহন করার সকল প্রয়াসকে মথিত করে ইংরাজ সরকার বঙ্গভঙ্গ করলেন । ইংরেজদের এহেন কার্য্যে ' সঞ্জীবনী ' তার লেখনীকে স্তব্ধ করেনি ।

বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলনের পথ ধরে বাংলায় জাগ্রত হলো বিপ্লব বাদ । রক্ত পাগল মুক্তি পথের সন্তান দলের বৈপ্লবিক কার্য্য কলাপের প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিল ' সঞ্জীবনী ' । বিপ্লববাদের পটভূমিকায় এ যুগের বিপ্লবীদের বিভিন্ন ঘটনার বিশদ বিবরণ ' সঞ্জীবনী ' পত্রিকায় আত্ম প্রকাশ করত ।

ম্যাজিস্ট্রেট কিংস ফোর্ডকে হত্যার পরিকল্পনা নিয়ে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী মজফ্ফর পুর গমন করে । প্রফুল্ল চাকীর নাম দীনেশচন্দ্র রায় রূপে ক্ষুদিরামকে জানানো হয়েছিল । বাঙালী পুলিশ সাব - ইনস্পেকটরের বিশ্বাস ঘাতকতায় প্রফুল্ল চাকী মোকামা স্টেশনে পালাতে না পেরে আত্মহত্যা করেন । ' সঞ্জীবনী ' পত্রিকা (১৪ . ৫ . ১৯০৮) এই ঘটনার নিখুঁত বিবরণ প্রকাশ করে ।

দীনেশ চন্দ্র রায় ওরফে প্রফুল্ল চন্দ্র চাকীর আত্মহত্যার বিবরণ —

" ক্ষুদিরাম যে যুবকের মৃতদেহ দেখিয়া পুলিশের নিকট তাহাকে দীনেশ চন্দ্র রায় নামে পরিচিত করিয়াছিল , তাহার প্রকৃত নাম প্রফুল্ল চন্দ্র চাকী ।

মজঃফ্ফরপুর হইতে প্রফুল্ল হাঁটিয়া সমস্তিপুর আসিয়া পৌঁছিয়া সেখান হইতে একখানা নূতন কাপড় ও এক জোড়া নূতন জুতা কিনিয়া বেশ পরিবর্তন করে । সমস্তিপুর হইতে হাওড়ার টিকিট লইয়া রাত্রির গাড়িতে মোকামা ঘাটের দিকে রওনা হয় ।

সমস্তিপুরে প্রফুল্লের নতুন কাপড়, জুতা, ফুলোপা দেখিয়া একজন পুলিশ সাব - ইনসপেকটরের মনে সন্দেহ জন্মিল। ইহার নাম নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মজঃফরপুরের গর্ভণমেন্ট উকিলের নাতি।

নন্দলাল রাঁচিতে কার্যস্থলে যাইতেছিল। প্রফুল্লের প্রতি সন্দেহ হওয়াতে নন্দলাল গাড়িতে তাহার সঙ্গে এক কামরায় উঠিয়া বসিল। এবং পুলিশের চতুরতার সহিত খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে কথাবার্তা বলিতে বলিতে দেশের বর্তমন অবস্থা ও রাজনৈতিক সংবাদ প্রভৃতি সম্বন্ধে এরূপ মত সকল প্রকাশ করিতে লাগিল, যাহাতে প্রফুল্ল নন্দলালকে তাহারই মতাবলম্বী বলিয়া বিশ্বাস করিল।

ফেরি স্টীমারে নন্দলাল ও প্রফুল্ল ঘাটে পেঁ ছিল। প্রফুল্ল তরুণ বয়স্ক বালক। সে তখনও নন্দলালকে কিছুমাত্র চিনিতে পারে নাই। নন্দলাল স্বদেশের জন্য তাহারই মত বেদনা বোধ করে, তাহারই মতাবলম্বী দেখিয়া প্রফুল্ল তাহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল।

স্টীমার হইতে ট্রেনে উঠিবার সময় প্রফুল্ল নন্দলালের জিনিষ পত্র নিজের কাঁধে করিয়া বহিয়া লইল — নন্দলালকে কুলি নিযুক্ত করিতে দিল না। এদিকে নন্দলাল স্টেশন মাস্টারের কাছে যাইয়া তাহাকে সকল কথা জানাইল এবং প্রফুল্ল প্ল্যাটফর্মে আসিবা মাত্র একজন কনেস্টবলকে হুকুম দিল গ্রেপ্তার কর। প্রফুল্ল স্তম্ভিত হইল। তাহার তখনকার মনের অবস্থা বর্ণনা করা অনাবশ্যক। সে চিৎকার করিয়া বলিল, ' তুমি বাঙালী হইয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিতেছ ? '

একজন কনেস্টবল পশ্চাৎদিক হইতে প্রফুল্লকে ধরিয়া ফেলিয়াছিল। প্রফুল্ল সবলে কনেস্টবলকে ভূপাতিত করিল। পর মুহূর্তে পিস্তল বাহির করিয়া প্ল্যাটফর্মের অপর দিকে কয়েক পা হাটিয়া গেল।

তৎক্ষণাৎ অপর দিক হইতে আরেক জন কনেস্টবল আসিয়া পড়িল । প্রফুল্ল এই কনেস্টেবলের দিকে গুলি চালাইল । কিন্তু গুলি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইল ।

এদিকে ভূপতিত কনেস্টবল আবার অগ্রসর হইল । প্রফুল্ল দেখিল আর পালাই - বার উপায় নাই । তখন দৃঢ়পদে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পিস্তল নিজের দিকে বাঁকা - ইয়া ধরিল । পিস্তলের দুইবার আওয়াজ হইল – প্রথম গুলি বক্ষ ও দ্বিতীয় গুলি চিবুকের নিম্নদেশ বিদ্ধ করিল । তৎক্ষণাৎ সেই স্থলেই প্রফুল্লের মৃতদেহ ভূপতিত হইল ।

প্রফুল্লের মৃতদেহ সনাক্ত করিবার জন্য মজঃফরপুরে আনা হইল । বন্ধুর মৃতদেহ দেখিয়া ক্ষুদিরাম শোকাচ্ছন্ন হইল । সে বলিল – ' ইহা আমার বন্ধু দীনেশ চন্দ্র রায়ের মৃতদেহ । ' প্রফুল্ল চাকীর মৃতদেহ সনাক্ত করণের পর বৃটিশ সরকার এক পৈশাচিক কান্ড করে । প্রফুল্লের মাথাটা কেটে বিচ্ছিন্ন করে কলকাতায় পাঠানো হয় । এই জঘন্য কান্ডের প্রতিবাদ করে নির্ভিক ' সঞ্জীবনী ' ।

" প্রফুল্লের ছিন্ন মস্তক
পুলিশের কর্তাদের হুকুমে প্রফুল্লের মৃতদেহ হইতে গলা কাটিয়া ফেলা হইল এবং একটা কেরোসিনের টিনে স্পিরিটে ডুবাইয়া প্রফুল্লের ছিন্ন মস্তক কলিকাতায় আনা হইল । ভাল করিয়া সনাক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই নাকি এরূপ করা হইয়াছে । "

এদিকে ক্ষুদিরাম ধরা পড়ে । ১লা মে ১৯০৮ ওয়াইনি রেল স্টেশনে বন্দী করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. এইচ.সি উডম্যানের কাছে তাঁকে নিয়ে আসা হয় । ক্ষুদিরামের বিবৃতি সঞ্জীবনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ।

" আমার নাম ক্ষুদিরাম বসু । বাড়ী মেদিনীপুর । .... আমি কিংসফোর্ডকে বধ করিবার জন্য আসিয়াছিলাম । তাহার ন্যায় উৎপীড়ক ভারতবর্ষে আর কেহ নাই ।

তাঁহাকে বধ না করিয়া দুইজন নিরপরাধিনী স্ত্রী লোককে হত্যা করিয়াছি বলিয়া আমার মর্মান্তিক যাতনা হইয়াছে। দীনেশের সঙ্গে আমার হাওড়ায় দেখা হয়। তাহার সঙ্গে একটা বোমা ছিল। সে বোমা তৈরী করিতে পারিত। আমার সঙ্গে ২টা রিভলবার ও কতকগুলি গুলি ছিল। উহা আমি কলিকাতায় কিনিয়া ছিলাম। আমরা ৭। ৮ দিন পূর্বে মজঃফরপুর পেঁাছিয়া ধর্মশালায় অবস্থান করিতেছিলাম। ধর্মশালার নিকটে কিশোরী বাবুর বাসায় থাকি।

আমরা সর্বদা কিংস ফোর্ডের খবর লইতাম। আমরা দেখিলাম, কিংস ফোর্ড কুঠি হইতে কয়েক গজ দূরবর্তী ক্লাব ব্যতীত আর কোথাও যান না। একদিন কাছারীতে গিয়া দেখিলাম, তিনি সেসনের বিচার করিতেছেন। একবার মনে হইল, তখনই বোমা নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে সংহার করি, কিন্তু পরক্ষণেই যখন মনে হইল তাহাতে অনেক নির্দোষের মৃত্যু হইবে, তখন শান্ত হইলাম।

" ৩০শে এপ্রিল কিংস ফোর্ডের গাড়ী কখন ক্লাব হইতে ফিরিয়া আসিবে, তাহার প্রতীক্ষায় ছিলাম। একখানি গাড়ী আসিতেছে দেখিয়া আমি বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিলাম।

আমাদের উভয়ের পা খালি ছিল। বোমা নিক্ষেপের পর দীনেশ বাঁকী পুরের দিকে পালাইল, আর আমি সমস্তি পুরের দিকে দৌড়াইয়া গেলাম। ওয়াইনি স্টেশনে এক মুদীর দোকানে যখন আমি জল খাইতেছিলাম, তখন দুইজন কনেস্টবল আসিয়া আমাকে গ্রেপ্তার করে।

কলিকাতায় এক গুপ্ত সমিতি আছে সেই সমিতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া আমি কিংস ফোর্ডকে বধ করিতে আসিয়াছিলাম। আমি সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া ও বক্তৃতা শুনিয়া খুব উত্তেজিত হইয়াছিলাম। যদি ধরা পড়ি, তবে তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করিবার অভিপ্রায়ে পিস্তল সঙ্গে রাখিয়াছিলাম। "

(সঞ্জীবনী, ৭ই মে, ১৯০৮)

১ই জুন ক্ষুদিরামের মামলা শুরু হলো । আদালতের বিচারক ছিলেন এ্যাডিশনাল সেসন জজ মি. কর্ণডফ । সেই আদালত চলাকালীন কিংসফোর্ডের বক্তব্যও ' সঞ্জীবনী ' পত্রিকা প্রকাশ করে ।

" রাজদ্রোহাপরাধে অভিযুক্ত পত্রিকা ' যুগান্তর ' আমার নিকট ৩বার , ' বন্দেমাতরম ' ১ বার ও ' নবশক্তি ' ১ বার অভিযুক্ত হইয়াছিল । এই সকল মোকদ্দমার পূর্বে ও পরে দেশীয় সংবাদ পত্রগুলি আমার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়াছিল । ওই মোকদ্দমার পর আমার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সমালোচনা খুব বৃদ্ধি পায় ।

কলিকাতার ছাত্রগণ আমার প্রতি কি ভাব পোষণ করিত , তাহা আমি জানি না । দুইবার আদালত হইতে বাহির হইবার সময় রাস্তায় কতকগুলি লোক আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল । সেই সব লোকের ভিতর কতকগুলি ছাত্র এবং কতকগুলি অপর লোক তাহা আমি বলিতে পারি না । আমি বাংলা দেশের অন্যান্য জেলাতেও ছিলাম , সেখানে কেহ আমাকে অসম্মান করিয়াছে বলিতে পারি না । "

(সঞ্জীবনী , ১৮ ই জুন , ১৯০৮)

রংপুর থেকে সতীশ চক্রবর্তী ক্ষুদিরামের পক্ষ সমর্থন করার জন্য আসেন । সতীশ চক্রবর্তীর সাথে ক্ষুদিরামের যে কথোপকথন হয় তারও সুন্দর বর্ণনা 'সঞ্জীবনী ' প্রকাশ করে ।

ক্ষুদিরাম তাঁর বক্তব্যে বলছেন " ..... পড়া ছাড়িয়াই স্বদেশী আন্দোলনে কাজ করিতে আরম্ভ করি । সেই সময় হইতে আমার ভগিনীপতি অমৃত বাবু আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন ।

— তুমি কাহাকেও দেখিতে চাও কি ?
— হ্যাঁ , একবার মেদিনীপুর দেখিতে চাই । আমার দিদি ও তাঁর ছেলে মেয়ে - কয়টিকে দেখিতে চাই ।
— তোমার মনে কোন দুঃখ আছে কি ?
— না , কিছু না ।
— তোমার মনে কোন রূপ ভয় হয় কি ?

ভয়ের কথা শুনিয়া ক্ষুদিরাম হাসিয়া ফেলিল । হাসিয়া উত্তর করিল — কেন ভয় করিব ?

— তুমি গীতা পড়িয়াছ ?
— হ্যাঁ , পড়িয়াছি ।
— তুমি কি জান যে , তোমাকে বাঁচাইবার জন্য রংপুর হইতে আমরা কয়েকজন উকিল আসিয়াছি । তুমি তো পূর্বেই তোমাকে অপরাধী বলিয়া স্বীকার করিয়াছ ।

নির্ভিক ক্ষুদিরাম মস্তক উন্নত করিয়া বলিল — কেন স্বীকার করিব না ? সকলেই স্তম্ভিত হইলেন । সতীশ বাবু বলিলেন , ক্ষুদিরাম ভগবানকে স্মরণ কর । "

(সঞ্জীবনী , ১৮ই জুন , ১৯০৮)

ক্ষুদিরামের ফাঁসীর দন্ডাদেশ হলো । দন্ডাদেশ শুনেও ক্ষুদিরামের মুখে হাসি । তাঁর বিচার চলাকালীন তাঁর মনোভাবনার সুন্দর বিবরণ ' সঞ্জীবনী ' প্রকাশ করত ।

" একেবারে নির্বিকার ভাবে ক্ষুদিরাম দন্ডাজ্ঞা শুনিলেন । কি নিম্ন আদালতে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট , কি উচ্চ আদালতে সেসন জজের নিকট , মামলা শুনানী কালে ক্ষুদিরাম অধিকাংশ সময়ই নির্লিপ্ত ভাবে কাটাইতেন । "

" কখনো কখনো তাহাকে আসামীর কাঠগড়ায় নিদ্রিত অবস্থায় দেখা যাইত । আদালতে কি হইতেছে , না হইতেছে সে সম্বন্ধে ক্ষুদিরাম প্রায়ই উদাসীন থাকিতেন ।

প্রাণ দন্ড যোগ্য অপরাধের অভিযোগে বিচারাধীন আসামীর এই নির্লিপ্ত ভাব এবং ঔদাসীন্য আদালতে উপস্থিত ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

মৃত্যু দন্ডাজ্ঞার পর ক্ষুদিরামকে সম্পূর্ণ অবিচলিত দেখিয়া এবং তাহার নির্বিকার লক্ষ্য করিয়া বিদেশী রাজার স্বজাতীয় বিচারকের মনে সম্ভবত এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল যে আসামীর প্রতি যে চরম দন্ড প্রদত্ত হইয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া ফাঁসীর হুকুমের পর জজ ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমার প্রতি যে দন্ডের আদেশ হইল তাহা বুঝিতে পারিয়াছ ?
ক্ষুদিরাম হাস্যমুখে মাথা নাড়িয়া জানাইল – ' বুঝিয়াছি ' ।

(সঞ্জীবনী , ১৮ জুন , ১৯০৮)

' সঞ্জীবনী ' র সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রের এই নির্ভীক প্রতিবেদন ইংরাজ সরকারকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। আলিপুরের বোমার মামলার তদারকী কৃষ্ণকুমার মিত্রও করেছিলেন। অর্থাভাবের জন্য তিনি তরুণ ব্যরিস্টার চিত্তরঞ্জনকে এই মামলা পরিচালনার জন্য আহ্বান জানান। " চিত্ত রঞ্জন এই অনুরোধ শুনিবা মাত্র এক কথায় অরবিন্দের মামলার ভার লইতে রাজী হইয়া গেলেন এবং পারিশ্রমিকের কথা ভুলেও ভাবিলেন না। নিশ্চিন্ত মনে কৃষ্ণ কুমার মিত্র বিদায় লইলেন। এই ঘটনার তিন চার দিন পরে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট কৃষ্ণকুমার মিত্রকে তিন আইনে State Prisoner করিয়া বিনা বিচারে ১৯০৮ হইতে ১৯১০ সাল পর্যন্ত আটক করিয়া রাখেন। •

কৃষ্ণকুমার মিত্রের সাথে ইংরাজ সরকার আটক করলেন অশ্বিনী কুমার দত্ত, সতীশ চ্যাটার্জী, সুবোধ মল্লিক, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, পুলিন বিহারী দাস, ভূপেশ চন্দ্র নাগ, শচীন্দ্র প্রসাদ বসু। এঁদের গ্রেপ্তার বাংলা দেশকে উত্তাল করে তুলেছিল। রমেশ চন্দ্র মজুমদারের ভাষায়, " None of

these could be thought of as associated with any such dangerous terrorist or revolutionary activity which might bring them under the operation of Regulation III of 1818. Their deportation gave a rude shock to the whole of India and its Wisdom orjustice was questioned by even many British Statesmen. Strong indignation wasfelt both in India and Britain. The Secretary of state had to sanction it much against his will, but public criticism at last forced him to change his policy, and deportus were released on 9 February, 1910". ৩ এঁদের সরকার তিন আইনে State Prisoners করিয়া ১৯০৮ হইতে ১৯১০ সাল পর্যন্ত আটক করিয়া রাখেন। ৪

'সঞ্জীবনী' বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় জাতিকে আলোক বর্তিকা প্রদর্শন করেছিল। 'সঞ্জীবনী'র নিষ্ফল সংগ্রাম ব্যর্থ হয় নি। এই পত্রিকার প্রথমেই ছিল "The Sanjibani carried above its editorial a flag with' 'Literty' incribed on it, and its press was the Samya (Equality). ৫

একদিকে এই পত্রিকা যেমন জাতীয়তাবাদ জাগরণের ক্ষেত্রে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল অন্যদিকে হিন্দু মুসলমান উভয়কে এক জাতীয় প্রবাহে এনে স্বাধীনতা আন্দোলনের সার্থক ভূমিকা গঠনে ব্রতী হয়েছিল।

"In a 1909, an official survey of the Indian press remarked that 'ever since the partition of Bengal the influential Hindu papers have tried to win over the Muhamonedans to their side', and it particularly referred to the Sanjibani's endeavour to wild the different nationalities in India, expecially the Hindus and the Mahamedans into one nation". ৬

' সঞ্জীবনী 'র প্রচেষ্টা বিফল হয় নি । বৃটিশ সরকার ১৯১১ তে বঙ্গ বিভাগ রদ করতে বাধ্য হোন ।

সন্ধ্যা
- - - - - - -

১৯০৫ এর অগ্নিঝরা আন্দোলনের মাঝে এক গৈরিক বসনধারী ক্যাথলিক সন্ন্যাসী এসে দাঁড়ালেন যুবকদের চিত্তকে মথিত করা পত্রিকা ' সন্ধ্যা 'কে নিয়ে । তাঁর পূর্ব নাম ছিল ভবাণী চরণ বন্দোপাধ্যায় । অনেক ঘটনা প্রবাহে তিনি হলেন ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায় । ব্রহ্ম বান্ধবের জীবনের ইতিহাসই হচ্ছে ফিরিঙ্গি তাড়িয়ে ভারতের মুক্তির জন্য সংগ্রামের ইতিহাস । তাঁর জীবনে একমাত্র আরাধ্য বিষয় ছিল দেশ মাতৃকা ও চলার পথ ছিল দেশ প্রেমের ।

ব্রহ্ম বান্ধব জানতেন স্বদেশী আন্দোলনকে জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হলে চাই যোদ্ধার মনোবৃত্তি । গোয়ালিয়রে সামরিক শিক্ষা লাভে বঞ্চ ব্রহ্ম বান্ধবের হৃদয় বৃত্তিতে ছিল সৈনিকের তরবারীর আগুন । সেই তরবারী রূপে ইংরেজ এর সাথে যুদ্ধ করার জন্য তুলে নিলেন ' সন্ধ্যা ' পত্রিকা । অরবিন্দ , বিপিন পাল , বা সুরেন্দ্র নাথের বক্তব্য তো আবদ্ধ থাকছে উচ্চ শিক্ষিত মানুষের মধ্যে । আপামর জন সাধারণের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে হবে । তবেই আসবে মুক্তি । ব্রহ্ম বান্ধব নিজেই মন্তব্য করছেন , " আমি চন্দ্র - দিবাকরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে আমি ঐ মুক্তির সমাচার প্রাণে শুনিয়াছি । মলয় পবন স্পর্শে যেমন শীতার্ত তরুর প্রাণে নবরাগের সঞ্চার হয় , প্রিয়জনের সমাগমে যেমন বিরহীর প্রাণে আনন্দ লহরী উথলিয়া উঠে , রণভেরী শুনিলে যেমন বীর হৃদয় তালে তালে নাচিয়া উঠে

ঐ স্বাধীনতার সংবাদ শুনিয়া আমার প্রাণে কি নূতন সাড়া পড়িয়া গেল । " ৭

তিনি বলতেন " আমরা নিজেদের তন্ত্র গড়িব আর ঐ স্বদেশী তন্ত্রের অধীনে মুক্ত ভাবে বিচরণ করিব । "

বিপ্লবী কালিচরণ ঘোষ বলছেন , " যখন অন্য পত্রিকা আবেদন , নিবেদন , স্তুতি , তোষামোদ , সতর্ক আলোচনার সাহায্যে বার্তমানীর অবস্থার উন্নতি সাধনে ব্যস্ত, তখন সে ধারার গতি অন্য পথে পরিচালিত করতে এগিয়ে আসে ' সন্ধ্যা ' । প্রতি বিকালে পত্রিকা প্রকাশিত হত । শুরু থেকেই ব্রহ্ম বান্ধবের সম্পাদনায় ' সন্ধ্যা ' যে হৃদয়গ্রাহী , কৌতুকভরা , শ্লেষপূর্ণ , তেজোব্যঞ্জক , ভাব গম্ভীর ভাষায় সাধারণের ব্যথা বেদনা , আশা আকাঙ্খার কথা বলতো , তাতে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পত্রিকা খানি জনপ্রিয় হয়ে উঠে । " ৭

ব্রহ্ম বান্ধব চাইতেন স্বদেশী আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে হবে জনারণ্যে । এইজন্য গোয়ালিয়রে যে অস্ত্র তিনি ধরতে পারেন নি , ' সন্ধ্যা 'কে সেই অস্ত্রে পরিণত করতে চাইলেন । ২৬শে নভেম্বর , ১৯০৪ এ প্রকাশিত হলো সন্ধ্যা । প্রথমদিকে ' সন্ধ্যা 'য় প্রকাশিত হলো ' ইংরাজেরা আমাদের ভাবে কি ? ' (১৯০৫ , ১১ই জানুয়ারী) , তখন অবধি ' সন্ধ্যা 'র ভাষায় এত আগুন ছিল না ।

লর্ড কার্জনের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণের পর ' সন্ধ্যা ' লিখল " এতদিন যে ইংরেজী বই পত্রে আমাদের সাম্য , মৈত্রী , স্বাধীনতার ধোঁকা দেওয়া হচ্ছিল ,কার্জনের বক্তৃতা সে মোহ দূর করে দিয়েছে । " (৫ই এপ্রিল , ১৯০৫) । এখন আমাদের বিলুপ্ত আত্ম সম্মানবোধ ফিরিয়ে আনতে হবে । মনে রাখতে হবে যে বিদেশী শৃঙ্খল আমাদের কায়িক বন্ধন ঘটিয়েছে বটে , কিন্তু তাই দিয়ে আমাদের মনের দাসত্ব ঘটাতে দেব না । ইংরেজ শাসন সমগ্র ভারতবাসীকে একটা দাস জাতিতে পরিণত করেছে । " (১ - ৭ - ১৯০৫)

শুরু হলো বয়কট আন্দোলন । ' সন্ধ্যা ' র ভাষাও তীব্রতর হলো । অসহযোগের রব তুলল । বিদেশী দ্রব্য বর্জনের আহ্বান তীব্রভাবে শোনা গেল ' সন্ধ্যা ' য় । বরিশাল কন্ফারেন্সে পুলিশের লাঠি চার্জে ' সন্ধ্যা ' লিখল " অত্যাচার সহ্য করা সমস্ত জাতির অপমানের নামান্তর । প্রতিহিংসা সকল সময় পাপ নয় , জীবন সংগ্রামে এর যথেষ্ট মূল্য আছে । বরিশালের তান্ডবের পর আর বাজে বক্তৃতা শোভা পায় না , ' বিষস্য বিষমৌষধম ' । অপমানের প্রতিশোধ নেবার কথা এখন ভাবতে হবে আর ফিরিঙ্গির কাছে দরবার না করে প্রতি বিধানের জন্য গোপনে যে প্রস্তুতি হচ্ছে এটাই বর্তমানে প্রধান লাভ । " (২১ - ৪ - ১৯০৬)

' সন্ধ্যা ' চাইল পূর্ণ স্বাধীনতা । যা সেদিন অন্য কোন রাজনৈতিক বা ব্যক্তির পক্ষে ঘোষণা করার জড়তা ছিল । " পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের পক্ষে সময় যদিবা কোন বাধা থাকে , তবু আমাদের লক্ষ্য যে অন্যকিছু নয় সে সম্বন্ধে সামান্য ভ্রান্ত ধারণা যেন মনের কোণেও স্থান না পায় । " (২০ - ৯ - ০৬)

" বিদেশীর অনুকরণে আমাদের চলবে না , আমরা নিজেদের আদর্শে শাসন ব্যবস্থা ঠিক করবো এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে তাইতে বাস করবো । যদি ইংরেজ তার বিরুদ্ধাচারণ করে আমাদের সমস্ত সুপ্ত শক্তি সঞ্জীবিত করে তার বিরুদ্ধাচারণ করবো । ফিরিঙ্গির সহায়তা বা শত্রুতার প্রতি দৃকপাত না করে আমরা সর্বস্ব পনে অগ্রসর হব । তাই দেখে সমস্ত দেশ স্বাধীনতার লক্ষ্যে এগিয়ে চলবে । ফিরিঙ্গির প্রতি মোহ আমাদের দূর করতেই হবে । ফিরিঙ্গির এই কুহকে অভিভূত হয়ে ভুলে গেছ , তুমি অর্ন্তনিহিত কত বিরাট শক্তির অধিকারী । সিংহ শিশু ক্ষণমাত্রও তার ' সিংহত্ব ' বিস্মৃত হয় না । " (৬ - ১১ - ০৬)

' সন্ধ্যার ভাষায় ছিল যেমন একদিকে উত্তেজনা অন্যদিকে হাস্যরস । এই দুই ভাষায় বাঙালী হিয়া সেদিন মথিত ছিল । ২০শে নভেম্বর , ১৯০৬ এ প্রকাশিত হলো

" ফিরিঙ্গি শব্দের অর্থ কি ? প্রথমেই ফি । — যাহারা সব কথায় ফি (টাকা) চায় — তাহারাই ফিরিঙ্গি । ওরা বাপকে খাওয়াইয়া বিল করে ফি চায় । .... এখন ফি ছেড়ে ধর — ফিরি । এমন ফিরিওয়ালার জাত আর নাই । শুধু যে উঁহারা সওদা ফিরি করিয়া বেড়ায় তাহা নহে । তোমার কাছে ফি লইবে আবার ফিরি করিবে । ... তারপর ধর ফিঙ্গি । এমন ফিঙ্গি বা ফিঙে দুনিয়ায় নাই — ওরা সকলের পিছনে লাগে । ..... ফি গেল — ফিরি গেল — ফিঙ্গি গেল — এখন আছে বাকি রঙ্গী । প্রথমেই রঙটা ত ফ্যাক ফেকে শাদা — রঙ নাই বলিলেই হয় — যেন টব চাপা ঘাস । .... রঙ নাই বলিয়াই ওদের রঙ্গী বলে । আর একটা রঙ্গ আছে । লোককে মেরে ধরে উড়াইয়া দেয় — আর বলে — আলো বিস্তার করিতেছি । মার্কিনের ও অস্ট্রেলিয়ার আদিমবাসীরা ওদের আলো ছড়ানো রঙের চোটে অনন্ত জ্যোতি লাভ করিয়াছে । এমন ওদের রঙ্গ । .....

ওদের শেষ রঙ্গ দেখে কিন্তু হাসি চাপিয়া রাখা যায় না । ওদের বিদ্যা ঐ ধুমো ধুমো কলকব্জা পর্যন্ত কিন্তু ওরা সূক্ষ্ম দর্শী আর্য্য জাতির গুরু সাজিয়া বসিয়াছে । এমন উল্টো রঙ্গ আর কখনও হয় নাই । " ৮–

২০শে নভেম্বর , ১৯০৬ প্রকাশিত হয়েছিল আরেক প্রবন্ধ ' বয়কটের মর্ম ' । ' সন্ধ্যা ' বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বিদেশী দ্রব্য বয়কটের জন্য এক তীব্র মনোভাবের সৃষ্টি করেছিল । অন্যান্য পত্রিকার চাইতে স্বভাব ধর্মী শ্লেষ ও ব্যঙ্গাত্মক রচনায় ' সন্ধ্যা ' লিখল , " বারে বারে বলিয়াছি যে শুধু নুন — চিনি — কাপড়ের স্বদেশী হইলে চলিবে না । বিলাতী বর্জ্জনের অর্থ কেবল ফিরিঙ্গির মাল পত্র বয়কট করা নহে — কিন্তু খাস ফিরিঙ্গিকে বয়কট করা চাই । সে কি রকম । — ফিরিঙ্গি আমাদের শাসন করে । ঐ শাসন কার্য্যে আমরা যাচিয়া সহায়তা করিব না । যেখানে পেটের দায় বা ইজ্জতের দায় সেখানে করিতেই হইবে । .... কিন্তু কোন রকমেই সখ করিয়া গিয়া ফিরিঙ্গির শাসন চক্রে তৈল ঢালিব না । লাট মজলিশে সখের নকিবি করিতে যাইব না — অনাহারী কাজীগিরি করিব না — ফিরিঙ্গি আমাকে ঠেঙ্গাইল — আর

আমি ঠেঙ্গার বদলে ঠেঙ্গা বন্ধ করিয়া ফিরিঙ্গির আদালতে আশ্রয় গ্রহণ করিবার পরামর্শ আঁটিব না। .....

.... যদি সিপাহীরা শমন ধরাইতে আমার মাথা ফাটাইবার বন্দোবস্ত করে — বা আমি চলিয়া যাইতেছি আর আমার উপরে গুণ্ডামি করিয়া লাঠি চালায় — তাহা হইলে আমার লাঠির বদলে লাঠি ধরিবার অধিকার আছে। ইহা বিধাতার দেওয়া অধিকার। যদি দেশীয় রাজার অধীনে এইরূপ অত্যাচার হয় — তাহা হইলেও আমার ঐ রূপ প্রতীকার করিবার অধিকার আছে — ফিরিঙ্গি রাজার অধীনে — কা কথা।

..... ফিরিঙ্গি ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া কর্ত্তামি জুড়িয়া দিয়াছে ..... আর তুমি তার মুখের পানে চাহিয়া হাত জোড় করিয়া বসিয়া আছ। তাহার ঐ কর্ত্তামি ঘুচাইতে হইবে। তাহাকে অতিথি অভ্যাগত রূপে বাহির করাকেই বয়কট বলে। ভাবের কথা ভাবে বুঝিয়া লও। আইন তাহাকে বয়কট বলে না। যাহাতে সেই সনাতন তন্ত্রের অধীনে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে পারি এস তাহারই সাধনা করি — ফিরিঙ্গিকে বয়কট করি।" ১

'সন্ধ্যা'য় প্রকাশিত হয়েছিল 'সে কালি বাড়ীর একশ পাঠা' (২৮শে, ফেব্রুয়ারী, ১৯০৬)। বাঙ্গালীর নির্জীবতায় ব্যথিত হয়েছিলেন ব্রহ্ম বান্ধব। তাই এই প্রবন্ধে তিনি লিখছেন, " বাঙ্গালী তুমি যতদিন অভাগা থাকিবে, ততদিন মর্লী এলিস ত দূরের কথা — সেই দীনবন্ধু ভগবান পর্যন্ত তোমার প্রতি বিমুখ থাকিবেন। যাহার আত্ম প্রত্যয় নাই আপনার শক্তিতে যে বিশ্বাস করে না, কেবল পরের অনুগ্রহ পরের মহানুভবতা যাহার সম্বল কেবল তাহার সহায় হইবে না। আজ আমরা বিলাত আপিসে দাঁড়াইয়া হটিয়া আসিলাম, আজ সেই উদারতার অনন্ত প্রস্রবন মূর্তিমান সাম্য, মৈত্রী মর্লী আমাদিগকে অর্ধচন্দ্র দিলেন, ইহাতে যে আমরা কি পর্যন্ত সুখী হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। তবে কি বর্গীতে আমাদের প্রাণে ব্যথা লাগে নাই? .....

..... নাটোরের প্রাতঃ স্মরণীয় রাজা রামকৃষ্ণ যেই শুনিতেন যে তাঁহার জমিদারী এক এক করিয়া লাটে উঠিতেছে অমনি " জয়কালীর বাড়ী একশ করিয়া বলি দিতেন। আমরাও সেই মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বলি – আজ আমাদের ভূয়া রাজ - নৈতিক আন্দোলন লাটে উঠিয়াছে , আজ আমাদের মরলী প্রীতি ঘুচিয়া গিয়াছে , আজ বাহিরে আমরা সব শূণ্য দেখিতেছি , আজ ইংলন্ডের কুয়াশাবৃত অম্বরে ভারতবাসীর আশা সূর্য্য একেবারে ডুবিয়া গেল , আজ ইংলন্ডের মহাসভার উদার নীতিক মন্ত্রী সমাজের উদারতম সদস্য মরলী আমাদের দরখাস্ত না মঞ্জুর করিলেন – তাই আজ যদি আমাদের চৈতন্য হয় আজ যদি আমরা স্বাবলম্বনের মহিমা বুঝিতে পারি , আজ যদি আমরা আমাদের সামাজিক শক্তি চিনিতে পারি , আজ যদি আমরা মানুষ হইবার পথ খুঁজি , তাই বলি দে জয়কালী বাড়ী একশ পাঠা। " ১০

স্বদেশী দ্রব্যের প্রচার , স্বদেশী শিল্প স্থাপনে ' সন্ধ্যা ' যথেষ্ট গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ' সন্ধ্যা ' আক্ষেপ করে বলতো যে দেশে ছোট ছোট শিল্প কারখানা পতিষ্ঠা করি না অথচ বিদেশ থেকে বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার ধরে নিয়ে এসে শিল্প স্থাপনে আমাদের খুবই আগ্রহ। ' সন্ধ্যা ' ১০ই মার্চ , ১৯০৬ এ প্রকাশ করলো ' কোন কালে নাই মনসা পূজা , একে বারে দশভূজা ' । এই প্রবন্ধে লিখিত হলো , " কোন দিন মনসা পূজা করিলাম না , কিন্তু খেয়াল চাপিল ত একেবারে দূর্গা ঠাকুর ঘরে নিয়ে আসিলাম। আর দেশে আগে ছোট ছোট কাজ আরম্ভ কর , দেশী কারিগর দিয়ে সেইগুলো যতদূর চলে চালাও , তারপর আপনাদের ছেলে পিলেকে সেই গুলির ভার দিয়া , তাহাদিগকে সে বিষয়ে প্রেম জন্মাইতে দাও। তখন ইংলন্ড , জার্ম্মানী , জাপান যাওয়ার কথা উঠিলে তবে বুঝিতে পারি যে যাদের ওদিকে মতিগতি এবং শক্তি আছে , তারা বিদেশ থেকে নতুন হদিস পেয়ে এসে আপনাদের কাজ করাবারের একটা উন্নতি করিতে পারিবে। ....

..... আমাদের মনে হয় বেঙ্গল কেমিকেলের চন্দ্রবাবু (চন্দ্র ভূষণ ভাদুড়ী) বা রাজশেখর বাবু (রাজশেখর বসু) এখান থেকে যা করিবেন কোন লোক বিলাত,

জার্মানী বা জাপান থেকে কারীকুরির বস্তা বস্তা সার্টিফিকেট বেঁধে নিয়ে এসেও, তার সিকির সিকি করিতে পারিবে না।

..... তাই বলি আগে দেশে যে সকল কাজকর্ম চলিতেছে সকলে মিলিয়া সেইগুলি ভাল করিয়া চালাইবার চেষ্টা করা উচিৎ। কেবল হুজুগে পড়িয়া যার প্রাণে যা চায়, তাই করিলে চলিবে কেন? বেঙ্গল কেমিক্যালটির এখন যেমন অবস্থা, তাহাতে প্রাণে বেশ আশা হয় — আনন্দ হয়। যদি সর্বতি পন্দ লোক মাত্রেই এই কারখানার শেয়ার কেনেন, তাহা হইলে এই দেশী লোকের দ্বারাই কতদূর কাজ হয়, তাহা দেখাইয়া দেওয়া যায়।" ১১

রাজনৈতিক নেতাদের ইংরেজ প্রীতিতে ক্ষুব্ধ ছিলেন ব্রহ্ম বান্ধব। ১৬ই মার্চ, ১৯০৬ সালে 'কবে আঁখি ফুটিবে' এই শিরোনামায় সন্ধ্যা লিখলো, "আমরা কেবল শান্তি চাহিনা, কিন্তু শান্তির সঙ্গে সঙ্গে সংযমের ক্ষেত্র চাহি। কারণ যে শান্তি সংযমের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না, তাহা বিষময় ও আত্মঘাতী। তাহাতে মানুষ পশুর অধম হইয়া যায়, তাহাতে তমোগুণ প্রবল হইয়া উঠে। সে শান্তির মৃত্যুর দ্বার, অমৃতের সোপান নহে। আমরা শক্তি চাই, আমরা বীর্য্য চাই — আমরা সাধন চাই, যাহাতে পরমার্থ জাগ্রত হয়। আমাদের বিলাতী বন্ধুগণ কি এ পথে আমাদের সহায় কখনো হইবেন? যতই কেন উদার হউন না — এতটা উদারতা তাঁরা সহিতে পারিবেন না। তাঁদের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়া আমরা কেবলই পদে পদে বিপথগামী হইব, এখনো যদি ইহা বুঝিতে না পারি, তবে আর কবে আমাদের এ চক্ষু ফুটিবে? ১২

বক্রোক্তি ও শ্লেষের মাধ্যমে তিনি, 'সন্ধ্যা'য় যে সাহিত্য রচনা করেছিলেন তা ইংরেজদের নিকট ছিল অসহনীয়। 'সন্ধ্যা' পত্রিকা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে কালিচরণ ঘোষ লিখছেন,

"For sarcastic and vitriolic writings making the objects of his attack look small and worthy of nothing but ridicule, he had no parallel. When necessary, his pen would pour forth flood of burning lava of courage making the timid and the wary forget their weakness. The captions of his editorials would at once catch the imagination and the solid arguments presented in a most enchanting, sometimes poetic style, would seldom fail to carry conviction with his readers". ১৩

স্বদেশী কর্মীদের উপর যত অত্যাচার সংঘটিত হতে লাগলো 'সন্ধ্যা'র ভাষা তত তীব্রতর হয়ে উঠলো। রবীন্দ্র নাথ লিখছেন, "লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ ব্যবচ্ছেদ ব্যাপারে দৃঢ় সঙ্কল্প হলেন। বৈধ আন্দোলনের পন্থায় ফল দেখা গেল না। লর্ড মরলী বললেন, যা স্থির হয়ে গেছে তাকে অস্থির করা চলবে না। সেই সময়ে দেশ ব্যাপী চিত্ত মথনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠলো তারই মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন স্বয়ং বের করলেন 'সন্ধ্যা' কাগজ, তীব্র ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা বইয়ে দিলেন। এই কাগজেই প্রথমে দেখা গেল বাংলা দেশে আভাসে ইঙ্গিতে বিভীষিকা পন্থার সূচনা।" ১৪

এই তীব্র মদির ভাষায় 'সন্ধ্যা' লিখলো "শক্তি সঞ্চয় কর, স্বদেশী যাত্রার পত্তন কর, স্বদেশী আন্দোলন চালিয়ে যাবার এবং ফিরিঙ্গিদের অপচেষ্টা প্রতিরোধের সঙ্কল্প গ্রহণ কর। .... আজ যে লাঠি স্বদেশী দমন কার্যে ব্যবহৃত একদিন সেই লাঠির সাহায্যে সরকারী তোষাখানা লুন্ঠিত হইবে।" (২৭-৪-০৭)

লড়াই এর হাতিয়ার কোথা হতে আসবে এই প্রসঙ্গে 'সন্ধ্যা'র বক্তব্য "মারণাস্ত্র সংগ্রহের সুবিধা আছে নানা রকমের। যে বোমা তৈরী হচ্ছে তাতে আমাদের

সংগ্রামের ধারা ফিরে যাইবে। এ বোমা কেবল সস্তা নয় হাতের মুঠোয়, না হয় পকেটে করে নিয়ে বেড়ানো যাবে। অস্ত্র শস্ত্রই বড় কথা নয়। একদল যুবক চাই যারা নানা অসুবিধা সত্ত্বেও বিশ্বাস করবে যে ভারতের স্বাধীনতা আসন্ন এবং সেটা না দেখে তারা মরতে চাইবে না। নাস্তিক ক্লীবের দল দেশের বিরাট শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। দেশের নিভৃত অঞ্চলে যে শক্তি নিহিত আছে তার দ্বারা মহাবিপ্লব সংগঠিত হবে। জাগ্রত যুব শক্তি ধীর স্থির ভাবে তাদের কাজ করে চলেছে যাতে মহাশক্তি দেশ মাতৃকা আনন্দ মঠের সিংহাসনারূঢ়া হয়ে আবির্ভূতা হবেন। হতাশ হয়ো না। (১০ - ৫ - ০৭) ২৬

শসস্ত্র বিপ্লবের পথে প্রস্তুত হতে 'সন্ধ্যা' আহ্বান করলো দেশবাসীকে। " প্রত্যেক গ্রাম, অঞ্চল, হাট, বাট, আবাস দুর্গে পরিণত করতে হবে। লাঠি, সড়কি, গুপ্তি, ছোরা প্রভৃতি অস্ত্র প্রতি হাতের শোভা বর্দ্ধন করবে। তীর ধনুক এবং 'কালিমায়ির বোমা' প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করতে হবে। এই বোমা আগুন দিয়ে ধরাতে হবে না। গুন্ডাদের মধ্যে সামান্য জোরে ফেলে দিলেই প্রচন্ড শব্দে ফেটে পড়বে, সঙ্গে সঙ্গে দশ বিশ জন ধরাশায়ী হবে। অতি শস্তায় এই অস্ত্র প্রচুর তৈরী হবে, সাবধানে রাখতে বেশী জায়গা নেবে না। দরকার হলেই এই বোমা তৈরী করে নেওয়া যাবে।" (১৪ - ৫ - ০৭) এর পরে 'সন্ধ্যা' 'কালী মায়ির বোমা' নামে এক উত্তেজনাকর প্রবন্ধ প্রকাশ করে ৪ - ৫ - ০৮ এ।

১০ - ৮ - ১৯০৭ এ 'সন্ধ্যা' লিখলো, " আমাদের আকাঙ্খার নিকট হিমালয়ের উচ্চতা খর্ব বলে মনে হবে, আমাদের অন্তরে আগ্নেয়গিরির রুদ্ধ বেদনা। আমরা ভারতের মুক্তি চাই। আমাদের অঙ্গন থেকে কি ভাবে ফিরিঙ্গি, বিতাড়ণ সম্ভব হবে, আমাদের শিক্ষার ধারা কেমন করে রক্ষিত হবে এবং ঋষি আচরিত বিধি কি ভাবে পালিত হবে, এই আমাদের একমাত্র চিন্তা।"

" অন্তরে চিতার আগুন জ্বলে উঠেছে, তার মূল্য আমরা খুঁজে পাইনি। স্বর্গ আমরা চাইনা, মুক্তি আমাদের কাম্য নহে। যতদিন না মায়ের বন্ধন

মুক্তি ঘটছে , ততদিন আমরা বারে বারে ভারতে জন্ম গ্রহণ করবো । তারপর আসবে সংসার বন্ধন থেকে আমাদের মুক্তি । "

" আমরা অতীত গৌরবের অধিকারী , আমরা নিত্য শাশ্বত , অমর । সমর ক্ষেত্রে এসে তোমরা সকলে সমবেত হও । তখন দেশের নানা স্থানে প্রচণ্ড সংগ্রাম বেধে যাবে । মায়ের সন্তান সব আগ্নেয় , বারুদ ও বায়বা অস্ত্র শাণিত করে রণক্ষেত্রে ছুটে আসছে । যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হও , মুক্তি আসন্ন , মৃত্যুর পূর্বে আমরা শৃঙ্খল মুক্ত মাতৃ দর্শন করে যাবো । আমাদের প্রত্যাবর্তনের পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ । " ১৭

১৯০৭ এর ১০ই আগস্ট বেরুলো " এখন ঠেকে মরছি প্রেমের দায়ে " । এই প্রবন্ধের জন্য গ্রেপ্তার করা হলো ব্রহ্ম বান্ধবকে । তিনি অবশ্য জামিন পেলেন । ' সন্ধ্যা ' এবার অগ্নি মূর্তি ধারণ করলো । রাজদ্রোহ মূলক প্রবন্ধ ক্রমাগত প্রকাশিত হতে লাগলো । ' যুগান্তরের রক্তারক্তি ফিরিঙ্গিদের ফাটলো পিত্তি' (৮ - ৮ - ১৯০৭) ' ঢিলের বদলে পাটকেল ' (৯ - ৮ - ০৭) ,' কালি ঘাটে জোড়া পাঁঠা , একটা কালো একটা সাদা ' (১২ - ৮ - ০৭) , ' সিডিসনের হুড়ুম দুড়ুম , ফিরিঙ্গি - দের আক্কেল গুড়ুম ' (২০ - ৮ - ০৭) । ইংরাজ সরকার মামলা শুরু করলে ব্রহ্ম বান্ধব বললেন , "I accept the entire responsibility of the publication, management and conduct of the news paper "Sandhya", and I say that I am the writer of the article 'Ekhan theke gechi premer dai' which appeared in the Sandhya of 13th August, 1907, being one of the articles forming the subject matter of this prosecution. But I do not want to take any part in this trial because I do not believe that in carrying out my humble share of the God-appointed mission of Swaraj, I am in any way accountable ~~to the~~

to the alien people who happen to rule over us and whose interest is and must necessarily be in the way of our true national development". [illegible] . ১৮

এরপরে সারদা সেন ও হরিচরণ দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযোগ ছিল রাজদ্রোহ। এঁরা জামিন পেলেও মুক্তি দেওয়া হলো না। বাংলায় সিডিশান মামলায় ইতিহাসে এই প্রথম। ১৯০৭ এর অক্টোবর ২৭ এ এই অগ্নিক্ষরা লেখক বিপ্লবী ও সন্ন্যাসী আকস্মিক মৃত্যু বরণ করলেন।

তাঁর মৃত্যুতে Bandemataram লিখল (3/11/1907), "The man of faith speaks uncommon thing......he speaks strange truths......for he is a prophet. He knows the will of providence as whose instrument he works. The messengers of Liberty have a despot defying strength which knows no compromise ....knows nodefeat". ১৯

ব্রহ্ম বান্ধবের মৃত্যুর পরও 'সন্ধ্যা' সরকারী দলনে ও পীড়নেও বেশ কিছু বৎসর চলেছিল। জাতীয়তার অমোঘ বানী প্রচার করে 'সন্ধ্যা' যে ভাবনা রেখে গিয়েছিল সেই ভাবনার ধারা অব্যাহত রাখার জন্য আবির্ভাব হয়েছিল আর এক পত্রিকার। তার নাম 'যুগান্তর'।

স্বরাজ

- - - - - - -

ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায় স্বরাজ নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১০ ই মার্চ, ১৯০৭ সালে। "এর ভাষা ছিল উঁচু দরের – ' সন্ধ্যা 'র ভাষার মতো সহজ বোধ্য ছিল না। এটি ছিল বিদগ্ধ মানুষের পাঠ্য। শিরোদেশে ছত্রপতি শিবাজীর আবক্ষ চিত্র নিয়ে এই পত্রিকা আবির্ভূত হত।" ২০

' স্বরাজ ' পত্রিকার অনুষ্ঠান পত্রে ব্রহ্ম বান্ধব লিখেছেন, " আজ - কাল আমাদের দেশে যে রূপ শিক্ষা চলিতেছে, তাহাতে আমরা কেবলই বিয়োগ শাস্ত্রে পটু হইতেছি। ফিরিঙ্গিরা আমাদের সনাতন সমাজতন্ত্র - আমাদের নিবৃত্তিময় সভ্যতা খণ্ড বিখণ্ড করিয়া বিশ্লেষণের ছুরিকা দিয়া চিরিয়া চিরিয়া আমাদের সম্মুখে ফেলিয়া দিতেছে – আর আমরা ভাল মন্দ সমস্তই কুড়াইয়া কুড়াইয়া ঘরে তুলিয়া লইতেছি – আর ঐ সকল টুকরা গুলির সুখ্যাতি ও অখ্যাতির সমালোচনা করিয়া আত্ম প্রসাদ লাভ করিতেছি। এই বিশ্লেষণের প্রকোপে আমরা ভালবাসা হারাইয়া ফেলিয়াছি – সেই সর্বময় মহিমার কথা ভুলিয়া গিয়াছি। ..... যোগ দৃষ্টি হারাইয়া ভেদ দ্বন্দ্বে আমরা অভিভূত হইয়াছি – নিজ মহিমা হইতে বিচ্যুত হইয়াছি – স্বরাজ ভ্রষ্ট হইয়াছি। কি করিয়া সেই যোগদৃষ্টি ফিরিয়া আসিবে, সেই অচল প্রতিষ্ঠ হিন্দু সমাজের মহিমা আবার আমাদের প্রাণমনকে চূর্ণ করিবে। যদিন না এই হিন্দু সমাজ হিমাদ্রির গৌরবে আমরা মাতিয়া উঠি, ততদিন আমাদের শিক্ষা সংস্কার আন্দোলন সমস্তই মিথ্যা হইবে। ঐ যোগ দৃষ্টির পুনরুত্থাবন করিতে ঐ অভেদ মহিমার পুনরুভ্যুদয় সাধিতে আমরা স্বরাজ পত্র প্রকাশ করিতেছি। এই ক্ষুদ্র পত্রে দেশের যত ঐশ্বর্য্য আছে – জয় পরাজয়, মিলন বিরোধ, স্বাদুতা তিক্ততা, কাঠিন্য কারুণ্য, বৈষম্য - সুষমা, অতীত ও বর্তমান যত গৌরব বিকাশ আছে সমস্তই আমরা চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিব। .....

..... এই স্বরাজ পত্র ঐ স্বদেশী গন্ডী আঁকিয়া স্বদেশী কোর্ট প্রস্তুত করিবার উপকরণ যোগাইবে – স্বদেশী ঐশ্বর্যের বিন্যাস করিয়া দিবে – বিদেবষীদের বিয়োগ প্রভাব খর্ব করিবে – অন্তর্মুখী সাধন কল্পে সহায়তা করিবে – স্বরাজ প্রতিষ্ঠা ব্রতে আত্ম সমর্পণ করিবে । ..... ইহাতে দেশের সংবাদ ও দেশের কথার সমালোচনাও থাকিবে । ২০ (ক)

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রথম বারটি সংকলন রক্ষিত আছে – ২৬শে ফাল্গুন, ১৩১৩ হতে ১৫ই আষাঢ় ১৩১৪ অবধি । প্রথম সংখ্যায় বঙ্কিম চন্দ্রের প্রশস্তি আছে । ৮ নং সংখ্যায় রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের উপর দীর্ঘ প্রবন্ধ মুদ্রিত রয়েছে । ৯ নং সংখ্যায় (৫ই জ্যেষ্ঠ , ১৩১৪) ' স্বদেশী থানার ' উপর প্রবন্ধ লেখা । এই প্রবন্ধের মূল কথা হলো , " শাস্ত্র নয় জনজাগরণই আজকের দিনে সব চাইতে বেশী প্রয়োজন । " ২১

যুগান্তর

- - - - - - -

১৯০৫ এর পর বিপ্লবী চিন্তাধারার দ্রুত প্রসারণ হতে লাগল । ' সন্ধ্যা 'র জ্বালাময়ী প্রবন্ধ সাধারণ মানুষকে উদ্দীপ্ত করছিল । বিপ্লবী সংগঠনও গড়ে উঠল দেশে । অনুশীলন সমিতির সাথে সাথে পার্শ্বে গড়ে উঠল ' যুগান্তর ' দল । যুবক - দল যখন বিপ্লবী সত্তায় বিশ্বাসী , মৃত্যু পাগল যুবকেরা যখন আত্ম বিসর্জন দিয়ে দেশকে স্বাধীন করার আকাঙ্খায় উদ্দীপ্ত তখনই প্রকাশিত হলো 'যুগান্তর'।

' যুগান্তরের প্রকাশনার ইতিহাস সম্পর্কে ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত লিখছেন , " এই ' যুগান্তর ' কাগজ বাহির করিবার প্রধান উদ্যোগী বারীন্দ্র , অবিনাশ ও আমি ।

..... এই প্রকারে তিনশত টাকা লইয়া বুক ঠুকিয়া আমরা মাথা গরমের দল ' যুগান্তর ' কাগজ প্রকাশ করিলাম । ... ' যুগান্তর ' নাম আমার মনোনীত । ... এই নামটি " শিব নাথ শাস্ত্রীর ' যুগান্তর ' নামক সামাজিক উপন্যাস হইতে ধার লওয়া হয় । ... শাস্ত্রী মহাশয় যেমন সামাজিক যুগান্তরের চিত্র দেখাইয়াছেন , আমরাও সেই রূপ রাজনৈতিক যুগান্তরের চিত্র দেখাইব এবং বৈপ্লবিক মনোভাব দেশে আনিব ইহাই আমাদের ইচ্ছা ছিল । ' যুগান্তর ' দলের কাগজ ছিল । টাকা সংগ্রহ , মতামত ও প্রবন্ধ লেখা সমস্ত কর্মই পার্টির অভিপ্রায় অনুসারে হইত । কাগজ সম্বন্ধে আমাদের মাথার উপরে ছিলেন — অরবিন্দ ঘোষ , দেউস্কর এবং অবিনাশ চন্দ্র চক্রবর্তী । ২২

' যুগান্তর ' প্রকাশিত হয় ১৯০৬ এর ৩রা মার্চ । এই পত্রিকা প্রকাশের সাথে সাথেই ব্রিটিশ রাজত্বের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল । সাধারণ মানুষ যেন অনুভব করেছিলেন ' তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে ' ।

সমকালীন যত পত্রিকা মারমুখী জাতীয়তা প্রচারে লিপ্ত হয়েছিল তার মধ্যে ' যুগান্তর ' কে শ্রেষ্ঠ আসন ছেড়ে দিতে হয় । অপর সাধারণের কথা বাদ দিয়েও বলা যায় , যারা ঘর ছেড়ে হাতের মুঠোয় জীবন নিয়ে বেড়িয়েছিলেন এবং বড় বড় রাজদ্রোহের মামলায় প্রধান আসামী হয়েছিলেন , তাঁরাও বলছেন — চঞ্চল চিত্তে উৎকর্ণ হয়ে যে বানী শোনার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল ' যুগান্তর ' এসে সেই অভীমন্ত্র শুনিয়েছে , অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করার সময় দেয়নি , অজানার ডাকে কেবল সামনেই টেনে নিয়ে গেছে , কোথাও বা অনির্দিষ্ট কাল কারাবাস ঘটিয়েছে , নির্বাসন , নির্যাতনের চরম ক্লেশ নীরবে সহ্য করতেশিখিয়েছে , আর না হয় ফাঁসীকাঠে ঝুলিয়ে পরজন্মে আবার দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য রণাঙ্গনে এনে উপস্থিত করেছে । " ২৩

কালিচরণ ঘোষ ' যুগান্তর ' সম্পর্কে বলছেন , " নবজাতক ভূমিষ্ঠ হয়েই কেঁদে উঠেনি , ' সূচনায় ' হুঙ্কার দিয়ে বলেছিল " ভারতবাসীর একটা নিরঙ্কুশ স্বদেশ চাই । " এই পত্রিকায় লিখিত হলো — " কোষ মুক্ত তরবারি অত্যাচারী হাতে শক্তিহীন , কিন্তু তারাই আবার ন্যায্য অধিকার বা ধর্ম রক্ষায় দুর্দম দুর্বার অপরিমিত শক্তির আধার ।

' রাজার ভয় কোথায় ? ' প্রবন্ধে যুগান্তর বলছে " অত্যাচার জর্জরিত লোক যদি একবার এই সত্য উপলব্ধি করতে পারে যে , জীবন উৎসর্গ না করলে শত বৎসরের দাসত্ব মোচন হয় না , সেই মনোভাবই শাসক গোষ্ঠীর বিপদের কারণ । " ..... পাঠকের মনে হতে পারে যে , তারা অতি দুর্বল অথচ প্রবল পরাক্রান্ত ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়বার শক্তি তাদের কোথায় ? যুগান্তর এরই উত্তর দিয়ে বলছে , " মা ভৈঃ । ইটালী রক্তস্রোতে আপনার মসীরেখা মুছে ফেলেছে । .... আজ কি দশ হাজার বাঙালীর সন্তান পাওয়া যাবে না , যারা মৃত্যুর আলিঙ্গনে মাতৃভূমির কলঙ্ক মোচন করতে বদ্ধ পরিকর । "

' যুগান্তর জানত এতে লাগবে অর্থ । তাই উত্তর দিয়েছে " এসে যাবে , লুঠ ও ট্যাক্স আদায় করে অভাব মেটাতে পারা যাবে । "

' যুগান্তর ' এর কার্যালয় ছিল ৪১ - এ নং চাঁপাতলা ফার্স্ট লেন । ৩৬ নং বনমালী সরকার স্ট্রীটে কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস - এ মুদ্রিত হতো । উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন বারীন্দ্র ঘোষ , দেবব্রত বসু , অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য , ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত , উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

' যুগান্তরের প্রাথমিক দিকের অবস্থা কালিচরণ ঘোষ এর বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় । " বড় মজার অফিস । পত্রিকা পরিচালনা সংক্রান্ত জন পাঁচ ছয় যুবক ছাড়া

আরও দু চার জন কখনও আসে কখনও যায় , তাদের নিয়ে কারও মাথা ব্যথা নেই । কাগজ বেরুচ্ছে সপ্তাহে মাত্র একদিন । মূল্য এক পয়সা, বাৎসরিক চাঁদা দেড় টাকা মাত্র ।

কাগজ বিক্রী থেকে যা আসে আর তার থেকে যা যায় , তার পরিমাণ হিসাব করার প্রয়োজন হত না । একটা কাঠের বাকস ছিল , কর্ম্ম কর্তাদের ব্যাঙ্ক । প্রায়ই ফাজিল জমা থাকত , তখন বাইরে থেকে কিছু সংগ্রহ করার প্রয়োজনই স্বাভাবিক । .... সেখানে নির্দিষ্ট অংশ , অধিকার , লাভ বন্টন , কর্তৃত্ব সবই ন্যস্ত ছিল একই সময়ে সবার ওপর । রাজদণ্ড ভোগটা উপরন্তু লাভ । " ২৪

' যুগান্তরের সাথে যুক্ত উপেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতি কথাতে বলছেন , " বর্ত্তমানের আন্দোলনের পূর্বে যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার জন্য গুপ্ত সভা সমিতি স্থাপনের চেষ্টা না হইয়াছিল তাহা নহে , কিন্তু তাহা কার্যতঃ বিশেষ ফল - দায়ী হয় নাই । ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে সমস্ত বাংলা দেশ লর্ড কার্জ্জন কৃত অপমানে যে বাত্যা বিক্ষুব্ধ সাগর বক্ষের মত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল , সেই চাঞ্চল্য হইতে প্রকৃত পক্ষে বাংলা বিপ্লববাদের উৎপত্তি দেশের মধ্যে তখন যে প্রবল উত্তেজনার স্রোত বহিতে - ছিল , তাহাই আধার বিশেষে ঘূর্ণাবর্ত্তে পরিণত হইয়া বিপ্লব কেন্দ্রের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল । ' যুগান্তর' ছিল ঐ রূপ একটি বিপ্লব কেন্দ্রের মুখপত্র । ঐ সংবাদ পত্রের পরিচালকগণের সংস্রবে আসিয়াই আমি বিপ্লবী দলে যোগ দিয়াছিলাম । " ২৫

' যুগান্তরের' কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইল । দেখিলাম প্রায় সকলেই জাত কাট ভবঘুরে বটে । দেবব্রত ভবিষ্যতে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন । বি.এ পাস করিয়া আইন পড়িতেছিলেন , হঠাৎ ভারত উদ্ধার হয় হয় দেখিয়া আইন ছাড়িয়া ' যুগান্তরে 'র সম্পাদকতায় লাগিয়া গিয়াছেন । স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই ভূপেনও সম্পাদকের মধ্যে একজন । অবিনাশ এই পাগলদের সংসারে গৃহিণী বিশেষ । ' যুগান্তরের ম্যানেজারি হইতে আরম্ভ করিয়া ঘর সংসারের অনেক কাজের ভারই

তাহার উপর। ..... ভারত উদ্ধারের এমন সুযোগও আর ছাড়া চলে না। আমিও বম্বাহইতে পুটুলি - পাঁটলা গুটাইয়া 'যুগান্তর' অফিসে আসিয়া বসিলাম। .... কিন্তু কিছু দিন পরে দেবব্রত 'নবশক্তি' অফিসে চলিয়া গেল। ভূপেনও পূর্ববর্ৎ ঘুরিতে বাহির হইল। সুতরাং 'যুগান্তর' সম্পাদনার ভার বারীন্দ্র ও আমার উপর আসিয়া পড়িল।" ২৬

'যুগান্তরের ভাষা ছিল অগ্নিস্রাবী। উপেন্দ্র নাথের কথায় "নিজেদের লেখা দেখিয়া নিজেরাই চমকিয়া উঠিতাম, মনে হইত যেন দেশের প্রাণ পুরুষ আমাদের হাত দিয়া তাঁহার অন্তরের নিগূঢ় কথা ব্যক্ত করিতেছেন।" ২৭

'যুগান্তরের' প্রচার সংখ্যা বাড়তে লাগল। একহাজার হতে পাঁচ হাজার, পাঁচ হাজার হতে দশ হাজার। এক বৎসরের মধ্যেই দশ হাজার হতে বিশ হাজারের এসে দাঁড়াল। বিপ্লব বাদের যে জীবন্ত ধারা 'যুগান্তর' প্রকাশ করতে শুরু করেছিল বাংলার যুব সমাজ তাতে পেয়েছিল বারুদের গন্ধ। তাদের মনকে উদ্বেল করে তুলেছিল। তাই 'যুগান্তরের' বানীতে বাংলা যেন নিজের মানস চেতনাকে আবিষ্কার করল। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বলেছিলেন, "The crowds seeking to purchase it formed an obstruction on the street".

১৯০৭ এর ২রা জুন প্রকাশিত হলো দুটি প্রবন্ধ 'লাঠৌষধি' ও 'ভয় ভাঙা'। এই সময় সম্পাদকের নাম পত্রিকায় মুদ্রিত থাকত না। পত্রিকা গোপনে ছাপা হতো ৭ নং শান্তিরাম ঘোষ স্ট্রীট থেকে। 'লাঠৌষধি' প্রবন্ধে লেখক বললেন, "মুষ্টিযোগ লাঠৌষধি অর্থাৎ লগুড় প্রয়োগে সরকারী লোকের মাথা গুড়া হইয়াছে, ঘর - বাড় ভাঙিয়াছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ট্যাকস বৃদ্ধির প্রচেষ্টা পরিত্যক্ত হইয়াছে। 'কাবুলি দাওয়াইয়ের মত সদ্য ফলপ্রসূ হাতিয়ার আর নাই।"

' ভয় ভাঙা ' প্রবন্ধে লেখা হলো " আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথে যখন এত রকম বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হইতেছি , তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় আমাদের মুক্তি অবধারিত । ইংরেজের বিপরীত বুদ্ধি , রাজভক্তদের উন্মত্ত প্রলাপ , অবিশ্বাসীর অর্থহীন পরিহাস হতাশার পরিবর্তে আমাদের উৎসাহের সঞ্চার করিয়া থাকে । যে সকল ঘটনা সাধারণের অন্তরে ভীতি বা নিরাশার উদ্রেক করে । কর্ম্মবীরের নিকট তাহাই আশা উদ্দীপনা বহন করিয়া আনে । আঁধারের শেষে আলোকের প্রকাশ । মৃত্যুর মধ্যেই অনন্ত জীবনের বীজ নিহিত । আর্ত্তের বুকফাটা ক্রন্দনের মধ্যে ভবিষ্যতের চিত্তা কর্ষক সঙ্গীতের সুর বর্তমান । আজিকার ঝঞ্ঝা প্রচণ্ডতর হইয়া রুদ্র রূপ ধারণ করিবে আর তাহার অন্তর দিয়া চিরশান্তির পথ উন্মুক্ত হইবে ।

" অবিনাশী ভক্তের সাধনাকে এই বিপদ সঙ্কুল দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতেই হইবে । শেষ পরিণতির অভিযান এইখানে আরম্ভ । সমস্ত দেশ শ্মশান ভূমিতে পরিণত হইবে , শিবা সারমেয় আনন্দে বিচরণ করিবে , নর কঙ্কাল , নরমুণ্ড ও যত্রতত্র বিক্ষিপ্ত দেখা যাইবে । শ্যামল আস্তরণ আবৃত ভারতভূমি রুধির ধারায় প্লাবিত হইবে রণচণ্ডীর তাণ্ডব নৃত্য প্রতিচিত্তে এক অভূত পূর্ব রনণ সৃষ্টি করিবে । যে অসহ্য ক্ষুধার তাড়নায় বিশ্বামিত্র চণ্ডালের কুটিরে প্রবেশ করিয়া কুক্কুরের মাংসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন , সেই বুভুক্ষা প্রতি নরনারীকে বুদ্ধি ভ্রংশ করিয়া তুলিবে , যখন ধন জন প্রাণের নিরাপত্তা অন্তর্হিত হইবে , পাশবিক শক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বিদেশী সভ্যতা করাল মূর্তিতে আত্ম প্রকাশ করিবে , তখন গো - ব্রাহ্মণ হিতায় ভগবান অমিত তেজে আবির্ভূত হইবেন । যতদিন না ধর্ম্মের অবক্ষয় এবং অধর্ম্মের বিস্তার পরিপূর্ণ ভাবে সংঘটিত হইতেছে ততদিন ভগবান ধরায় অবতীর্ণ হইবেন না । যেহেতু আজ অনাচার, অবিচার , অত্যাচার , অধর্ম্মাচারণের সূত্রপাত হইয়াছে – আমরা ভগবানের অনুকম্পা লাভে আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছি । বাঞ্ছা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা না দেখিলে মানুষ বিপজ্জনক পন্থা অবলম্বনে দ্বিধাগ্রস্ত থাকে । ..... আমরা কেবল বলিতে পারি মাভৈ: । হৃদয় দৌর্বল্য পরিহার কর ।"

যাও সিন্ধুনীরে ভূধর শিখরে ,
গগণের গ্রহ তন্ন তন্ন করে ,

বায়ু উল্কাপাত বজ্র শিখা ধরে ,
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও ।
তবে সে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে ,
প্রতিদ্বন্দ্বী সহ সমকক্ষ হতে ,
স্বাধীনতা - রূপ রতনে মণ্ডিতে
যে শিরে এক্ষণে পাদুকা বও । "

(১৯০৭ এর ২০ শে জুন সংখ্যা)

' যুগান্তরের ' জ্বালাময়ী প্রবন্ধে সরকার হলো বিড়ম্বিত ও বিব্রত । পুলিশ হানা দিল ' যুগান্তর' অফিসে ।

উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন , " ইন্সপেকটর পূর্ণ লাহিড়ী জনকতক কনস্টেবল লইয়া যুগান্তরের অফিসে খানাতল্লাসী করিতে আসিলেন । ' যুগান্তরে'র সম্পাদককে গ্রেপ্তার করিবার পরওয়ানাও তাহার সঙ্গে ছিল । কিন্তু সম্পাদক কে ? এ বলে 'আমি' ও বলে 'আমি' । শেষে ভূপেনই একটু মোটা - সোটা ও তাহার বেশ মানানসই রকমের দাড়ি আছে বলিয়া , তাহাকেই সম্পাদক বলিয়া স্থির করা হইল । ভূপেন যখন আদালতে সাফাই গাহিয়া আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিল না , তখন দেশে ছেলে ছোকরাদের মধ্যে একটা খুব হৈ চৈ পড়িয়া গেল । এ কাণ্ডটা নূতন আজগুবী কাণ্ড বটে । ভূপেন যাহাতে একটি স্বীকার করিয়া নিষ্কৃতি পায় সরকারী পক্ষ হইতে সে চেষ্টা করা হইয়াছিল , কিন্তু ভূপেন রাজী হইল না ফলে ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড তাহাকে এক বৎসরের জন্য জেলে ঠেলিয়া দিলেন । " ২৮

ভূপেন্দ্র নাথের এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডের সাথে সাথে প্রেসও বাজেয়াপ্ত হলো । ভূপেন্দ্র নাথের এই শাস্তিতে বাংলা দেশ গর্জে উঠল । ১৯০৭ এর ২২শে জুলাই এর সংখ্যায় ' সন্ধ্যা ' লিখল ' কেউটের ফোঁস ' । ' সন্ধ্যা ' রাজসত্তাকে

সতর্ক করে দিয়ে বলল এই সব মামলায় দেশে আগুন জ্বলবে । সাজা দিয়ে জাতিকে দমন করা যাবে না । রাজশক্তি কেউটের লেজে পা দিয়েছে । ' বন্দেমাতরম ' এ লিখা হলো , " এ মামলায় আত্মিক বল পাশবিক বলকে অত্যন্ত হেয় করে দেখিয়েছে । মামলায় নিজ পক্ষ সমর্থন না করায় আসামী প্রমাণ করেছেন , দেশের কর্তব্য পালন করবার জন্য কায়িক ক্লেশ অতি সহজে উপেক্ষা করা চলে । " ২৯

এত সহজে ' যুগান্তর ' হার মানার পত্রিকা ছিল না । ১৯০৭ এর ৩০শে জুলাই প্রকাশিত হলো ' মিথ্যা ভয় ' , ৫ই আগষ্ট প্রকাশিত ' মিথ্যা পূজা ' আর ১২ই আগষ্ট প্রকাশ পেল ' সিডিশন ও বিদেশী রাজা ' । যুগান্তরের ম্যানেজার অবিনাশ চক্রবর্তী ও প্রকাশক ও মুদ্রাকর বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য্য কে এই সব প্রবন্ধের জন্য গ্রেপ্তার করা হয় । অবিনাশ মুক্তি পেলেও বসন্ত ভট্টাচার্য্যের হলো কারাদণ্ড । ' সাধনা ' প্রেস বাজেয়াপ্ত হলেও তা পরে রদ হয়ে যায় ।

এর পূর্বেই ' যুগান্তর ' বিপ্লবী মতবাদ প্রচারের এক উদ্দীপনাময় হাতিয়ার হয়ে উঠে । অবিনাশ চক্রবর্তী নিজে মন্তব্য করেছেন , "'যুগান্তর ' আমাদের দেশের কার্য্যের জন্য উৎসর্গীকৃত কাগজ ছিল । ইহা আমাদের বৈপ্লবিক দলের কাগজ ছিল ।" ৩০ ১৯০৭ এর ৩রা মার্চ ' যুগান্তরে ' রক্তাক্ত বিপ্লবকে আহ্বান করে লেখা হলো — ইংরাজ সরকারী অফিসারদের জেলায় জেলায় কত সংখ্যা রহিয়াছে ? তোমরা দৃঢ়চেতা হইয়া একদিনেই বৃটিশ শাসনের অবসান করিতে পার । .... একটি জীবনের পরিবর্তে আরেক জীবন লইতে আরম্ভ কর । "

' যুগান্তর ' অনুভব করতো , "The heroic sacrifice by the few... was the only way to wake the country and convince the people' that they have the power to gain freedom"......

"Without blood, O patriots.

will the country, awake ?" ৩১

ইংরাজ সরকারের তাই দৃঢ় লক্ষ্য ছিল এই ' যুগান্তর ' এর উপর ।

"The Yugantar not surprisingly was the principal target, no less than six cases being launched against it incourse of little more/than a year". ৩২

সরকারী ক্ষিপ্ততা ' যুগান্তর ' কে প্রতিহত করতে পারেনি । দেশকে বিপ্লবী পন্থায় উজ্জীবিত করার বানী ছিল তাঁদের বরাভয় কন্ঠে । ১৯০৭ এর ১৪ ই ডিসেম্বর প্রকাশিত হলো ' হিন্দু বীর্য পঞ্চনদে ' । আবার মামলায় জড়িয়ে পড়লেন বৈকুন্ঠ আচার্য্য । পত্রিকা কি ভাবে বিপ্লবী পন্থাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে তার প্রমাণের জন্য আদালতে পেশ করা হলো ১৯০৭ এর ১৯শে আগষ্টের লেখা প্রবন্ধ , " ইংরাজের স্বরূপ " , " বসন্তের রাজা " , " আমাদের আশা " এবং ৩০শে নভেম্বরের লিখিত প্রবন্ধ " আত্মনির্ভরতা " , " বিধির বিধান " , আর ৭ই ডিসেম্বরের " স্বদেশ ও স্বধর্ম " । মুদ্রাকর বৈকুন্ঠ আচার্য্যের ১৬ই জানুয়ারী , ১৯০৮ সালে আড়াই বছরের সশ্রম কারাদন্ড হলো । এই মামলার রায় কত ভ্রান্ত ও ধিক্কার জনক ছিল যে ১৯০৮ সালের ২১ শে জানুয়ারী সংখ্যায় ' বেঙ্গলী ' পত্রিকা সমালোচনা করে বলল , " এই অভিযোগ যে আসামী রাজার শিখ সৈন্য ভাঙ্গাবার চেষ্টা করেছে । কিন্তু ' যুগান্তর ' বাংলায় লেখা , আর শিখরা এক বর্ণও বাংলা পড়তে জানেনা , সুতরাং এ অজুহাত একান্ত অবাস্তব । "

' যুগান্তর ' বন্ধ হলো না । ফণীন্দ্র নাথ মিত্র যুগান্তরে এসে মুদ্রাকর ও প্রকাশক রূপে যোগ দিলেন । এর পূর্বে তিনি ছিলেন বাঁকিপুরে ' মাদার ল্যান্ড ' পত্রিকার সম্পাদক ।

১৯০৮ এর ৭ ই প্রকাশিত হলো ' আমরা শান্তি চাই না ' , ৪ ঠা এপ্রিল প্রকাশিত হলো ' ইংরেজের যথেচ্ছাচার ' , ১১ই এপ্রিল ' বর্তমান সমস্যা ' , বিপ্লবের আবাহন বা ' এস বিপ্লব ' ও ' নূতন রীতি ' , ১৮ ই এপ্রিল প্রকাশিত হলো

' যুগান্তর ' এর ' নমস্কার ' । প্রতিটি ব্রিটিশ বিদ্বেষে পরিপূর্ণ । তখন যুগান্তরের অফিস মানিক তলায় । ফনীন্দ্র মিত্রের আদালতে বিচার হলো – ২৩ মাসের কারাদন্ড । ' সন্ধ্যা ' র বক্তব্য অনুসারে ' যুগান্তরে ' পুলিশী হামলার সংখ্যা হলো এ যাবৎ পাঁচ বার ।

এর মধ্যে ঘটে গেল এক অঘটন । ১৯০৮ এর ২ রা মে মানিক তলার বাগান বাড়ীতে ধরা পড়লো বিপ্লবী দল । এর মধ্যে যুগান্তরের লেখক গোষ্ঠীও ছিল । গোটা দেশ মানিকতলার ঘটনায় উদ্দীপ্ত । সাজানো হলো মানিকতলার বোমার মামলা । পত্রিকা কিন্তু বন্ধ হলো না । ৯ ই মে , ১৯০৮ এ প্রকাশিত হলো সব জ্বালাময়ী প্রবন্ধ ।

এর পূর্বে ২ রা মে তে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল ' কালের ভেড়ী ' , ' যুগান্তরের প্রাণের কথা ' , ' বলিই বা কি লিখিই বা কি ' । এর জন্য পূর্বের শাস্তির সাথে ফণীন্দ্র মিত্রের শাস্তি আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল ।

১৯০৮ এর ৯ই মে এর প্রবন্ধগুলো হলো – ' উত্তিষ্ঠত ' , ' আমি এসেছি ' , ' বিদ্রোহী কে ? ' , ' পায়ে পিষে শক্ত হত্যা ' , ' সাধের মরণ ' ।

সাধের মরণে বলা হলো , "আমরা দেশকে স্বাধীন করিবার জন্য যে একটা বৃহৎ অনুষ্ঠানের সূচনা করিয়াছি , যে একটা মহাব্রতের আয়োজন করিয়াছি , ইহাতে যদি কোনদিকে অপচয় লক্ষ্য করি , তবে তাহাতে হতাশ হইব না । .... জন্মভূমির কল্যাণ কামনায় যাহারা আত্মদান কামনা করেন তাহাদিগকে প্রথমে আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে । .... যখন প্রয়োজন বিচার করিতে যাইয়া কর্তব্য বুদ্ধি দুর্বল হইয়া পড়ে তখন এক মহা পুরুষের গম্ভীর জ্ঞানের ভান্ডার হইতে এই উত্তেজনা

মন্ত্র উঠিয়াছিল তাহা কর্ম জীবনের মূল সূত্র " কর্ম্মণ্যেবাধিকারাস্তে মা ফলেষু কদাচন । "

এছাড়া নিম্নলিখিত কবিতাটিও প্রকাশিত হয়েছিল ।

" না হইতে মা গো বোধন তোমার
ভাঙ্গিল রাক্ষস মঙ্গল ঘট ,
জাগো রণচন্ডি , জাগো মা আমার –
পূজিব তোমার চরণ তট ।
কর্পূর চন্দন ধূলায় ধূসর
ভূমিতে লুটায় চামর চাঁচর ,
মঙ্গল শিখা গিয়াছে নিভিয়া
হল না বুঝি মা পূজন তোমার ।
ঐ গঙ্গা জল রয়েছে পড়িয়া
জবা বিল্বদল গেল শুকাইয়া ,
পূজার সময় যায় যে বহিয়া
জাগো মা আমার সময় নিকট ।।
দৈত্য - তেজ নহি করি পরাভয়
বিজয় শঙ্খ কেন মা নীরব ?
হুঙ্কারে বিনাশ প্রচন্ড দানব
অট্ট হাসে হাস মা বিকট ।
এস রণচন্ডি , এস রণ সাজে
এস মা নাচিয়া সন্তানের মাঝে ,
মহাশক্তি হৃদে করিয়া প্রচার ,
শিখাও জননী , সমর উৎকট ।
নরমুন্ড ছিঁড়ে পড়াইব গলে ,
সর্বাঙ্গ তোমার সাজাব কঙ্কালে ,

রক্ত মুঠি আজ করিয়া মন্থন
তুলিয়া আনিব স্বাধীনতা ধন ॥
জাগো রণচণ্ডি , জাগো মা আমার
পুজিব তোমার চরণ তট ॥

কবিতাটি লিখেছিলেন ক্ষীরোদ প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় । ' যুগান্তর ' গোষ্ঠীর প্রাণভরা আশা ও বিশ্বাস ছিল বিপ্লববাদের পথে দেশের স্বাধীনতা আনার । মানিক - তলার গ্রেপ্তার বিপ্লবীদের প্রবল ধাক্কা দেয় । তবুও হতোদম হয় নি । ' মা ফলেষু কদাচন ' এর মধ্যে তাঁদের গীতা ছিল প্রেরণার বিষয়বস্তু । এই অপরাধী যুবক দলের প্রেরণা ছিল ' নিষ্কাম কর্মের । '
"...... the participants were is many cases still in their teens. The neotantric rituals affected by the revolutionary groups possibly struck a chord also in the folk memory of Bengal. For the more sophisticated, the Gita provided in those days comfort and courage in the face of adversity, with its creed of ''Nishkama Karma'- inter preted to mean the selfless carrying out of duty for duty's sake, irrespective of consequences, without craving for easy on early success. Thus the Yugantar found solace in the Gita after the disaster of May, 1908." ৩৩

১৯০৮ এর ২৬শে মে বীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মুদ্রাকর ও প্রকাশক রূপে পত্রিকার ভার নেন । পুলিশের বার বার প্রেসকে বিধ্বস্ত করার ফলে , পত্রিকা ছাপানো হলো লিখিলেশ্বর রায় মৌল্লিকের ' সুমতি প্রেস ' থেকে । ১৯০৮ এর

৩০শে মে প্রকাশিত হলো এক জ্বালাময়ী প্রবন্ধ 'শক্তিপূজা' (বাঙালীর বোমা) । বীরেন্দ্র নাথকে গ্রেপ্তার করা হলো ।

এরপর 'যুগান্তর' বাধা প্রাপ্ত হতে থাকে । পুলিশের নজর ছিল তীব্র । কারণ "The Yugantar articles exihibit a burning hatred of the British race, they breathe revolution in every line. 'Khudiram Bose and Prafulla Chaki, the two protomartyrs of the Muzaffarpur bomb incident in April 1908, were praised by the Yugantar as heroes........... the policy of his (Barin Ghosh) was to stir up and recruit young men from all over Bengal to be trained in the use of fire arms and bombs and send then back to their own districts where they were to form agencies for revolutionary work and rise in rebellion". ৩৪

আলিপুরের বোমার মামলার বিচারপতি বীচক্রফট 'যুগান্তরে'র সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে এর প্রবন্ধগুলো ইংরেজ জাতের উপর প্রচণ্ড ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রচার করছে । কেমন করে বিপ্লব সংঘটিত হবে সেই পথের সুস্পষ্ট নির্দেশ দিচ্ছে । 'অস্ত্র শক্তি' প্রবন্ধে (১৯০৭ , ১২ই আগষ্ট) বলা হয়েছে " অস্ত্র শক্তি সংগ্রহের আরও একটি উপায় আছে । রুশ বিদ্রোহে দেখা গেছে যে সৈন্যদের মধ্যে নানা রকম দলের লোক আছে এবং বিপ্লব যখন রূপ গ্রহণ করে , তখন এদের মধ্যে অনেকেই নানারকম অস্ত্র নিয়ে এসে যোগদান করে । ফরাসী বিপ্লবে এই পন্থা খুব সুফল প্রসব করেছিল । শাসক কুল বিদেশী হলে , এসব বিপ্লব সংঘটনের সুযোগ আরও বেশী , কারণ তখন শাসিতের ভিতর থেকে সৈন্য নিয়োগ ছাড়া গত্যন্তর থাকে না । এই সকল দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে সতর্কতার সহিত গোপনে বিদ্রোহ সংক্রান্ত গুপ্ত আলোচনা চলতে পারে । যখন শাসকদের সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘর্ষ আরম্ভ হয় তখন যে কেবল এই সকল সৈন্যদের সাহায্য পাওয়া যায় তা নয় , উপরন্তু তাদের প্রভু কর্তৃক যে সকল অস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে , তারও সুযোগ পাওয়া যায় । বিশেষ

করে এরকম ব্যবস্থায় শাসক গোষ্ঠীর মনে দারুণ ত্রাস উৎপাদন করা সম্ভব হয় ।"
বৃটিশ সরকার এই সব প্রবন্ধে বিপ্লবের দর্শন ও আত্মা খুঁজে পান কারণ ' যুগান্তরে 'র দাবীই ছিল – ভারতবাসীর নিরঙ্কুশ স্বরাজ চাই ।

জীতেন্দ্র নাথ বসু ' যুগান্তর সম্পর্কে একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছেন যে ' যুগান্তর ' ইংরাজীতেও ছাপান হয়েছিল ।

Y U G A N T A R
R E D I V I V U S
An English Edition
More diabolical than before.

If there is anything in a small printed broadside we have received this morning, the Yugantar has clothed itself with a new Avatar more outrageously and diabolically violent than before. The sheet in question is a demiquarto consisting of two colums printed in English on one side and at the top. ৬৫

১৯০৮ এর ৮ই জুন ইংরাজ সরকার পাশ করলো সংবাদ পত্র দমনের আইন News papers(incitement to offetces) Act - এর উদ্দেশ্যই ছিল যুগান্তরকে দমন করা কারণ ' যুগান্তর ' বলত "The Yugantar'is not a paper but a revolutionary idea which however persecuted and prosecbted can never be suppressed". ৬৬

১৯০৮ এর ৫ই নভেম্বর ইংলিশ ম্যান পত্রিকা লিখেছিল যে ' যুগান্তর ' প্রকাশিত হয়েছে যাতে " শত্রুর রক্তপানেচ্ছু বাঙালীকে প্রতিহিংসা গ্রহণে উৎসাহ - নির্বিচারে শত্রুর প্রতি রিভলবার ব্যবহার করতে সাহস দেওয়া হয়েছে , রিভলবার অকৃতকার্য্য হলে বোমা সে অভাব দূর করবে । " ৩৭

বহুদিন পর ১৯১০ সালের জুলাই মাসের এক বিচ্ছিন্ন সংখ্যা ছিল ' যুগান্তরে 'র শেষ সংখ্যা ।

' যুগান্তর ' পত্রিকা গোষ্ঠীর অন্তরে ছিল দেশ প্রেম । পত্রিকা চালানোর জন্য এর চাইতে বড় জিনিষ ছিল না । "The only cementing factor was their zeal for fustering a revolutionary atmosphere". ৩৮
আর ছিল সাহস ও উদ্দীপনা । মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ার ক্ষমতা । সেই সাহস লক্ষ্য করেই ভূপেন্দ্র নাথের কারাবাসের আদেশে ' বন্দেমাতরম ' পত্রিকা লিখেছিল
"For the first time a man has been found who can say to the power of alien imperialism, 'with all they pomp of empire and splendeur and dominion, with all they boast of invincibility and mastery irresistable with all they wreath of men and money and guns and cannon with all they strenghh of law and strength of sword, with all they power to confine, to torture or to stay the body, yet for me, for the spirit, the real man in me thou art not. Thou art only a phase, a phenomenon, a passing illusion and the only lasting realities are my Mother and my Freedom". ৩৯

এই উক্তি প্রযোজ্য ছিল ' যুগান্তর ' পত্রিকার সকলের ক্ষেত্রে ।

নবশক্তি

- - - - - - -

' নবশক্তির প্রকাশ ঘটেছিল ১৯০৬ এর ২০শে মে । সম্পাদক ছিলেন খ্যাতনামা বিপ্লবী মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা । ' যুগান্তর ' পত্রিকা থেকে দেবব্রত বসু ও ' নবশক্তি ' তে যোগ দেন । সন্ধ্যা , যুগান্তর ও ইংরাজী বন্দেমাতরমের সাথে ' নবশক্তি ' ও বিপ্লবী চিন্তাধারা পত্রিকা ছিল । দাম ছিল এক পয়সা । অরবিন্দ ছিলেন বিপ্লবী চিন্তাধারার পোষক ।

To implement his objective of having 'a public propaganda intended to convert the whole nation to the ideal of independence, four papers were started, Bandemataram, Sandhya, Navasakti and Jugantar which were persistently preaching the cult of Indian Independence and of armed revolution. These papers had an informal common editorial board with Aurabinda as its head. These papers were preaching the same gospel of national independence". ৪0

' নবশক্তি ' র ভাষা ছিল উন্নত ও সূক্ষ্ম । সাধারণ লোকের এর প্রতি আকর্ষন কম ছিল । শিক্ষিত লোকের মধ্যে ' নবশক্তি 'র প্রভাব ছিল । বাংলায় আন্দোলনের যুগে ধর্মঘটের কথা খুব চলেছিল । বিপিন চন্দ্র পালের গ্রেপ্তারের ঘটনায় ' নবশক্তি ' মন্তব্য করল (১৪ . ৯ . ০৭) " যারা প্রেসে কাজ করেন তাদের ইউনিয়ন আছে । এই ধরণের অজস্র ইউনিয়ন আছে হাজার হাজার মিল ও কারখানার । যদি এই ইউনিয়ন গুলো তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করতে পারে সক্রিয় পদ্ধতিতে , তাহলে সেই প্রক্রিয়া সমস্ত দেশবাসীকে অনুপ্রেরণা প্রদান করবে এবং দেশের ঐক্যকে সুদৃঢ় করবে ।

আমরা আশা করি যে বাবু অপূর্ব কৃষ্ণ ঘোষ এবং অশ্বিনী কুমার ব্যানার্জি এই ভাবনায় কিছু করবেন । আমাদের দেশের শিকল কোন দিনই ছিঁন হবে না যতদিন আমাদের শ্রমিকেরা এই বিষয়ে আত্মত্যাগের শিক্ষা গ্রহণ করছে । আজ রাশিয়ার শ্রমিকেরা বিশ্বকে শিক্ষা দিচ্ছে অত্যাচারের সময় কি ভাবে সক্রিয় প্রতিরোধ করতে হয় । ভারতের শ্রমিকেরা কি তাদের কাছ হতে কোন শিক্ষা গ্রহণ করবে না ? ..... স্বাধীনতার মূর্ত প্রবক্তা বিপিন চন্দ্রের জন্য এর চাইতে বড় শ্রদ্ধা হতে পারে না । " ৪১

' নবশক্তি 'র রচনা পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষন করল ১৪ই জুন ১৯০৭ সালের রচনায় । সম্পাদক ছিলেন মনো মোহন ঘোষ রুজু হয়েছিল মামলা । হাইকোর্টে বাতিল হয়ে যায় ।

নবশক্তির মামলায় (জানুয়ারী , ১৯০৮) বাংলার চীফ সেক্রেটারী ই.এ. গেট মন্তব্য করেছিলেন , "The punishment of underlings affords no real check on the propagation of sedition by their employees who at present not only enjoy absolute immunity, but benefit by the increased circulation of their papers which a prosecution naturally brings". ৪২

নব্য - ভারত

- - - - - - - - - -

' নব্যভারত ' পত্রিকা স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল । ' নব্য ভারতের ' সম্পাদক ছিলেন দেবু প্রসন্ন রায়চৌধুরী । ছাপাখানার মালিকও তিনি ছিলেন । পত্রিকার মুদ্রাকর ছিলেন ভূতনাথ পালিত । পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৮৩ সালে । ' নব্য ভারতে ' স্বদেশী যুগের বলিষ্ঠ ভাবধারার প্রবন্ধও প্রকাশিত হতো । দেবী প্রসন্ন বিপ্লবী পন্থায় বিশ্বাস করতেন । দেবী প্রসন্ন বিভিন্ন শিরোনামায় সম্পাদকীয় লিখতেন । এই সম্পাদকীয় মন্তব্য হতে পত্রিকার ভাবনা ও কর্ম সূচী জানা যেত ।

ইংরেজদের তোষামোদে বিরত ছিল ' নব্য ভারত ' । যখন আমাদের দেশের নেতারা আলোচনার জন্য বড়লাটের দর্শন প্রা র্থী হয়েও প্রত্যাখ্যাত হচ্ছিলেন , সেই সময়ে নব্য ভারত গর্জে উঠে ।

" আমরা বুঝিতেছিনা , এদেশের শিক্ষিত লোকদিগের চর্মের কত নিম্নে মান - ইজ্জত লুক্কায়িত হইয়াছে । ..... এই যে ইংরেজ দাসত্বের মায়ায় প্রলুব্ধ করিয়া আপনজনকে শত্রুরূপে প্রতিপন্ন করিয়া , অক্লেশে আমাদের দেহে শলাকা বিদ্ধ করিয়া রক্তশোষণ করিয়া সর্বস্বান্ত করিতেছেন , এই ভেদ মূলক পলিসি দুর্গকে চূর্ণ করিয়া বীরের ন্যায় পবিত্র স্বদেশ - সম্মিলন ক্ষেত্রে একাত্ম হইয়া দাঁড়াইতে হইবে । হিন্দু মুসলমানে বিদ্বেষ জন্মান তাহাদের প্রধান নীতি , হিন্দুতে হিন্দুতে বিদ্বেষ জন্মান তাহাদের প্রধানতর নীতি । এই নীতির মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইবে । " (নিরাশার আশা , গোলাম গিরি। পরিণতি , অগ্রহায়ণ , ১৩১২)

স্বদেশী আন্দোলনের উৎসাহ দাতা , প্রবক্তা ও প্রেরণাদাতা ' নব্য ভারত ' তার সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখল , " বরং পার্টিশন চিরতরে থাকুক , তবুও এদেশের

পক্ষে বিদেশী বর্জন নীতি যেন পরিত্যক্ত না হয় , ইহাই আমাদের ব্যাকুল কামনা ।"

(বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ সম্পাদকীয় , আষাঢ় , ১৩১৩)

' নব্য ভারত ' পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন । স্বদেশী ভাবনাকে এর জন্য দ্রুত প্রসার করা ' নব্য ভারতের ' লক্ষ্য ছিল ।

Debi Prasanna Roy Choudhuri's Nabyabharat from 1906 on wards has shown considerable awarness of flagging mass support for swadeshi". ৪৩

দেবী প্রসন্ন আন্দোলনের মধ্যে চেয়েছিলেন তীব্রতা যাতে কোন রূপ ভাবে এই আন্দোলনে আলোচনা জনিত কারণে আমাদের পিছিয়ে আসতে হয় । নেতাদের আন্দোলনের প্রতি গা ছাড়া নির্লিপ্ত ভাব তাঁকে সন্তুষ্ট করে নি । তিনি তাঁর পত্রিকায় লিখলেন , — " নেতারা বলেন 'সাপও মারা চাই , লাঠিকেও বাচান চাই' অথবা মাছও ধরিতে হইবে গায়ে কাদাও না লাগে । ' মন্ত্রটা খুব ভাল নয় কি ? সশরীরে স্বরাজত্বের ষোল আনা সম্মান আকাশ হইতে পড়িবে – অথচ রাজা কিছু করিতে পারিবে না , টলস্টয় মূর্খ , ম্যাটসিনি মূর্খ , ওগার বোকা , তাই নির্বাসন কষ্টে জীবন শেষ করিলেন । জীবন্ত মানুষ দেখিতে চাও যদি তবে আমাদের নেতাদের গভীর গর্জন শ্রবণ কর । "

(স্বপ্ন , চৈত্র , ১০১০)

স্বদেশী আন্দোলনকে ভিত্তি করেই এসেছিল বিপ্লবী আন্দোলন । যে এক অপরের পরিপূরক । ' নব্য ভারত ' এই প্রসঙ্গে লিখল , " সরব আন্দোলনের পরিচ্ছেদ পরিসমাপ্ত হইয়াছে , এখন নীরব আন্দোলনের পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইয়াছে । প্রকাশ্য ভলেন্টিয়ারের রাজত্ব পরিসমাপ্ত হইল , এখন গুপ্ত সমিতি ও নিহিলিষ্টের রাজত্ব আরম্ভ হইল । তুমি ভয়কেও বাঁচাইয়া রাখিবে এবং স্বদেশও জাগিবে , কখনও সম্ভব কি ? তুমি পৈতৃক প্রাণটা এবং সকল স্বার্থকে সংরক্ষিত করিবে , অথচ দেশটা

জাগিয়া উঠিবে ? অসম্ভব তাহা । "   (সমাধান , সম্পাদকীয় , জৈষ্ঠ , ১৩১৪)

এমন কি এই সম্পাদকীয় মন্তব্যে ' নব্য ভারত ' জামালপুরে লাঞ্ছিত হিন্দু রমণীদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ করেন এবং এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতেও আহ্বান জানান ।

' বন্দেমাতরম মন্ত্র , ডেমোক্রেসী ও দারিদ্র সমস্যা ' নামক শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় , পৌষ , ১৩১৩ এর সংখ্যায় । এর পিছনে দেবী প্রসন্নের ফরিদপুর জেলায় সেবা মূলক কাজের অভিজ্ঞতার ভূমিকা আছে । তিনি দীর্ঘদিন গ্রামের মানুষের সাথে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আসেন । দীর্ঘদিন সেই সব এলাকায় ভ্রমণ করেন , তারপর তিনি লিখছেন , " নিম্ন শ্রেণীর পৌনে ষোল আনা লোক স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে উদাসীন । তাহারা বলে আপনারা যখন আমাদের মঙ্গল চান না তখন আমরা আপনাদের দলভুক্ত হইয়া গভর্নমেন্টের বিরাগ ভাজন কেন হইব ? "

এই নব্য ভারতে ধীরেন্দ্র নাথ ঠাকুরের বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এর মধ্যে ' বঙ্গে নব শক্তির উত্থান ' উল্লেখযোগ্য । ভূপেন্দ্র নাথ দত্তের গ্রেপ্তার ও যুগান্তরের মামলার উপর মন্তব্য করে লেখক তাঁর প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন । তিনি প্রবন্ধে লিখছেন , " ভূপেন্দ্র নাথ বলিয়াছেন হে ইংরাজ , আদর্শ ক্ষেত্রে তোমার প্রভুশক্তির উপর আমার 'মা' । " বিপিন চন্দ্র বলিয়াছেন , " হে ইংরাজ , কার্য্য ক্ষেত্রে তোমার প্রভুত্ব শক্তির উপর আমার 'আমি' — সমবেত প্রজা শক্তির প্রতিনিধি আমি । এই আদর্শ ক্ষেত্র ও কর্ম ক্ষেত্র যদি একত্রিত হয় , এই 'মা' ও 'আমি' যদি মিলিত হয় তাহা হইলে মাঝখান হইতে যে আর সব মুছিয়া যাইবে । ইহা যদি ইংরাজের বোধগম্য হয় তবে সে নিশ্চয়ই ভাবিবে , ' স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা ' । "

(বঙ্গে নব শক্তির উত্থান , আশ্বিন , ১৩১৪)

দেবী প্রসন্নের মৃত্যুর পর এই পত্রিকা পরিচালনা করতেন তাঁর পুত্র প্রভাত কুসুম রায়চৌধুরী। প্রভাত কুসুম স্বদেশী যুগে বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন।

দেবী প্রসন্নের 'নব্য ভারত' পত্রিকার প্রেস হতে আপত্তিকর বই ছাপানোর জন্য তিনি ১৯১০ এর মার্চ মাসে অভিযুক্ত হন এবং তার অর্থ দন্ড হয়।

ভান্ডার

- - - - - - - -

পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর। প্রকাশিত হয় বৈশাখ, ১৩১২ (মে, ১৯০৫)। এই পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন কেদার নাথ দাশগুপ্ত। এই পত্রিকায় রবীন্দ্র নাথ দেশের সমস্যা ও সমাধানের প্রকল্প সংক্ষিপ্ত আকারে প্রবন্ধ প্রকাশের ব্যাবস্থা করেছিলেন। 'ভান্ডারে'। রবীন্দ্র জীবনী কারের বক্তব্য " রাজনীতির আলোচনাই মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বঙ্গদেশের যাবতীয় সমস্যাকে রাজনীতির পটভূমিতে সমগ্রভাবে দেখিবার ও বিচার করিবার অবসর পাইলেন।"

এই ভান্ডারেই রবীন্দ্র নাথের সুচিন্তিত মতামত স্বদেশী যুগের পরিপ্রেক্ষিতে সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। 'স্বাধীন শিক্ষা' (আষাঢ়, ১৩১২), 'বঙ্গ ব্যব - চ্ছেদ' (ভাদ্র - আশ্বিন, ১৩১২), 'পার্টিশানের শিক্ষা (ভাদ্র - আশ্বিন, ১২১৩), স্বদেশী আন্দোলনে নিগৃহীতদের প্রতি নিবেদন (ফাল্গুন, ১৩১২), 'স্বদেশী আন্দোলন' (১) (বৈশাখ, ১৩১৩), 'স্বদেশী আন্দোলন' (২) (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩), 'জাতীয় বিদ্যালয়' (আশ্বিন, ১৩১৩) প্রভৃতি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

রবীন্দ্র নাথ 'বঙ্গ ব্যবচ্ছেদে' বলছেন, " যদি স্থির জানি আমাদের চাঞ্চল্য গভর্ণমেন্টকে বিচলিত করিতে পারিবে না, তবে আমাদের এত উৎসাহ কেন ? তাহার

কারণ , এই চাঞ্চল্যই আমাদের লাভ । এই চাঞ্চল্য আমাদের নিজের শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে । নিজের প্রাণশক্তিকে অনুভব করাই যে একটা পরম সফলতা । পার্টিশনের প্রস্তাবে আমাদের সকলের মনে একটা আন্দোলন উঠিয়াছে , তাহাতেই আমরা বুঝিয়াছি , পার্টিশন ঘটিলেও আমাদের তেমন ক্ষতি করিবে না । "

' পার্টিশনের শিক্ষা ' তে তিনি বলছেন " বঙ্গ বিভাগে কি অনিষ্ট হইবে তাহা অনেকেই জানেনা , কিন্তু এক প্রকার গভীর ভাবে অস্পষ্টভাবে আমরা সকলে মিলিয়া বেদনা বোধ করিতেছি । এই বেদনাটা তর্ক বিতর্কের বিষয় নহে বলিয়াই ইহা অনুভবের বিষয় বলিয়াই দেশের স্ত্রী পুরুষ শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলকেই ইহা অধিকার করিয়াছি । "

' স্বদেশী আন্দোলনে নিগৃহীতদের প্রতি নিবেদন ' প্রবন্ধে রবীন্দ্র নাথের মন্তব্য " রাজচক্রের যে অপমান তাহাদের অভিমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল , মাতৃভূমির করস্পর্শে তাহা বরমালা রূপ ধারণ করিয়া তাহাদের ললাটকে আজ ভূষিত করিয়াছে , যাঁহারা মহাব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন বিধাতা জগত সমক্ষে তাঁহাদের অগ্নি পরীক্ষা করাইয়া সেই ব্রতের মহত্বকে উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশ করেন । অদ্য কঠিন ব্রত নিষ্ঠ বঙ্গভূমির প্রতিনিধি - স্বরূপ যে কয়জন এই দুঃসহ অগ্নি পরীক্ষার জন্য বিধাতা কর্তৃক বিশেষ রূপে নির্বাচিত হইয়াছেন , তাহাদের জীবন সার্থক , রাজ রোষ রক্ত অগ্নি শিখা তাঁহাদের জীবনের ইতিহাসে লেশ মাত্র কালিমা পাত না করিয়া বারবার সুবর্ণ অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছে বন্দেমাতরম । "

' ভান্ডারে ' আরও অনেকে লিখতেন । রবীন্দ্র নাথের চিন্তাধারার সাথে তদানীন্তন যুগের ভাবনাকে জানার শ্রেষ্ঠ ফসল এই ভান্ডারের প্রবন্ধ সমূহ ।

সুমিত সরকার বলছেন , "Bhandar, The new monthly started by the poet, carried a stimulating discussion of the problem (posed by Surendra Nath Banerjee)of bridging the gulf between the educated elite and the masses". ৪৪

প্রতিজ্ঞা

- - - - - -

এই যুগের মানসিকতার প্রতিফলন দেখা যায় আরেক পত্রিকায় , নাম তার ' প্রতিজ্ঞা ' । খুব জনপ্রিয় ছিল না । এক রকম অজ্ঞাত ছিল । এই পত্রিকা পরিচালনা করতেন প্রাক্তন পুলিশ সাব - ইনস্পেকটর জ্যোতিলাল মুখার্জী । ১৯০৫ এর প্রচার সংখ্যা ছিল ৭০০ ।

২৬শে জুলাই এই পত্রিকায় দেশের নেতাদের নিকট আহ্বান জানানো হল ' আবেদন পত্র যাতে আর না লেখা হয় । '

এই ২৬শের সংখ্যার প্রতিজ্ঞা এক কবিতা প্রকাশ করে । কবিতাটির ভাববস্তু লিখছেন কালিচরণ ঘোষ , " সূচী ভেদ্য তামসী রজনী সমস্ত নভোমণ্ডল গভীর মেঘা - চ্ছন্ন , আর মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ স্ফুরণ হচ্ছে । গুরু রামদাস স্বামী আর শিষ্য শিবাজী মহারাজ পরস্পরের সম্মুখে দণ্ডায়মান ।

' জাতির ও ব্যষ্টির কল্যাণ কি উপায়ে সম্ভব ? ' জিজ্ঞাসা করলেন শিবাজী । গুরুর অঙ্গুলি নির্দেশে শিষ্য উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলেন , উম্মুক্ত কৃপাণ হস্তে ভারত মাতা দণ্ডায়মানা , আ মৃদু হাস্য , ইঙ্গিতে অসি দেখিয়া বলছেন , ' জগতের মাঝে এই এক বস্তু সনাতন সত্য । '

শিবাজী শুনলেন বহু দেববালা কণ্ঠে সমবেত সঙ্গীত । তার ভাষায় রয়েছে তরবারির অজস্র গুন গান : " সকল অত্যাচার হতে মুক্তি সাধনে , দেশের শান্তি রক্ষায় , শ্রী সম্পদ বৃদ্ধির সহায়তায় , মানুষের সকল কামনা বাসনা পূর্ণ করতে এই তরবারিই একমাত্র আশ্রয় স্থল । " ১৯০৫ এর ৩০শে আগষ্টের এক কবিতায়

বলছে " কেবল প্রার্থনা দ্বারা ও অপরের দাক্ষিণ্যে দেশের দুর্দশা দূর হবে না। শক্তির আরাধনাই স্বাধীনতার একমাত্র পথ। অতএব অস্ত্র ধারণ কর এবং দেশ মাতৃকার ঋণ পরিশোধে কৃত সঙ্কল্প হও। অনাহারে ধীরে ধীরে যখন মৃত্যু অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছ, তখন রণভূমিতে তরবারি হস্তে মরণে আর ভয় কেন ? এ মৃত্যু স্বর্গে তোমার অমৃতত্ব দান করবে। বিদেশী শত্রুর রক্তপাতে প্রতিহিংসা গ্রহণ গ্রহণ কর, যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হও, প্রচন্ড নিনাদে যুদ্ধ ঘোষণা করে ত্বরিতে রণ ক্ষেত্রে উপস্থিত হও।" ৪৫

২৩শে আগস্ট ১৯০৫ এ পত্রিকা বিপিন চন্দ্র পালের দাবী সম্পূর্ণ জাতীয় সরকারের দাবীকে স্বাগত জানাল। বিপিন পালের বক্তব্য ছিল, "Our ideal is freedom, which means absence of all foreign control." বিপিন পালই চেয়েছিলেন, 'Complete national self government'.

৩০শে আগস্ট ১৯০৫ 'প্রতিজ্ঞা' এক প্রবন্ধ প্রকাশ করল। 'আঘাতের প্রতি আবেদন'। পুলিশ অন্যান্য সন্ধানী চাই যাদের ভাল মতো আঘাত দেওয়া যাবে। প্রতিজ্ঞা আরও লিখল " যখন অপর সকল প্রক্রিয়া বিফল হয়, তখন এক প্রহারই বাঞ্ছিত ফল প্রদানে সমর্থ। অন্য কোন ব্যবস্থাই ইহার সমকক্ষ নয়।"

বিপিন পালের বক্তৃতা চলাকালীন এক পুলিশ সাধারণ পোষাকে সেই বক্তৃতার নোট নিচ্ছিল। 'প্রতিজ্ঞা' প্রবন্ধ বলছে " পুলিশ যখন সাধারণ নাগরিক পরিচ্ছদে এসেছে, তখন তাদের উত্তম মধ্যম কয়েক ঘা দেওয়া উচিত ছিল।"

এই পত্রিকা স্বদেশী যুগে ছিল উগ্র পন্থার সমর্থক। সন্ধ্যা বা যুগান্তরের মতো অতপরিচিত না হলেও বহু মানুষের মনের মধ্যে এঁদের দুঃসাহসিক রচনার জন্য এঁরা শ্রদ্ধার আসনে চিহ্নিত হয়েছিলেন।

চারু মিহির

- - - - - - -

চারু মিহির প্রকাশিত হতো মৈমনসিং থেকে। সম্পাদক ছিলেন স্থানীয় উকিল বৈকুণ্ঠ নাথ সোম। বাংলা ভাগের ষড়যন্ত্রকে 'চারু মিহির' প্রথম থেকেই বিরোধিতা করে আসছিল। চারু মিহিরের উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারকে বাংলার প্রতিটি প্রান্তরে প্লাবিত করে দেওয়া। স্বদেশী গান তখন সর্বত্র গীত হতো।

১৯০৫ এর ২৫ শে জুলাই সংখ্যায় 'চারু মিহির' মন্তব্য প্রকাশ করল, "আমরা স্বদেশী সংগীত রচনা করিব গ্রামের সরল সাধারণ ভাষায় এবং এই সংগীত গুলিতে গ্রাম্য বালকদের শিক্ষিত করিব। এই সংগীত গুলিই হইবে বাংলার জাতীয় সংগীত।

'চারু মিহিরে' সেই সময় হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের কিছু চিত্র পাওয়া যায়। বর্ধিষ্ণু স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কিছু কিছু স্থানে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক তিক্ত হয়। সৃষ্টি হয় সাম্প্রদায়িকতার পরিবেশ। 'চারু মিহির' ১৯০৬ এর ২২শে লিখল যে মৌলভীরা সকলের মধ্যে প্রচার করছে যে বৃটিশ রাজত্বের সীমা শেষ এবং মুসলমানের উত্থানের দিন আগত প্রায়। লেফটেনান্ট গভর্ণর বি. ফুলার বাধ্য হয়েছে ঢাকার নবাবের সাথে মিত্রতা স্থাপন করতে।"

এক লাল ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়েছিল তাতে লেখা হয় "একদিনেই হিন্দুকে জাহান্নামে পাঠাতে পারি। দেখ, বাংলা দেশে তোমাদের সংখ্যা অধিক, তোমরা কৃষক, কৃষি কাজেই ধন উৎপত্তির বীজ। হিন্দু ধন কোথা পাইল। হিন্দুর ধন বিন্দু মাত্রই নেই। হিন্দু কৌশলে তোমাদের ধন নিয়া ধনী হইয়াছে। ..... আমরা স্বজাতি আন্দোলন করিয়া আত্মোন্নতি করিব।"

১৯০৭ সালের মে মাসে ' লিয়াকত হোসের ব্রিটিশ বিরোধী আবেদন ' চারু মিহিরে ' প্রকাশিত হয় । এর ফল স্বরূপ ইংরেজ সরকার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে । এর পূর্ব হতে ' চারু মিহিরে 'র উপর সরকারের বিষদৃষ্টি ছিল । এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার ফলে পত্রিকার প্রেসের উপর সরকারের আক্রমণ অনুষ্ঠিত হয় ।

বরিশাল হিতৈষী

- - - - - - - - - -

এই কাগজ প্রকাশিত হতো বরিশাল হতে । মালিক ছিলেন দুর্গামোহন সেন । মুদ্রকের ও প্রকাশনার কাজ করতেন আশুতোষ বাগচী । দুর্গা মোহন সেন ছিলেন ব্রজ মোহন ইনস্টিটিউসনের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক। অশ্বিনী কুমার দত্তের স্বদেশ বান্ধব সমিতির সাথে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত ছিলেন ।

১৯০৬ সালের এপ্রিল - মে সংখ্যায় এই সমিতির কথা ও নিয়মাবলী প্রকাশিত হয় । গ্রামে গ্রামে সংগঠনের শাখা বিস্তারের কথা বলা হয় । গ্রাম্য সংগঠন বিস্তারের সাথে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের প্রতিজ্ঞাও গৃহীত হয় । দৈনন্দিন সভা অনুষ্ঠান , স্বদেশী দ্রব্যের যোগান , স্থানীয় হস্ত শিল্পকে উৎসাহ দান এবং বিদেশী দ্রব্যকে বর্জনের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষিত হয় । গ্রাম্য উন্নয়ন , পরিচ্ছন্নতা , নৈতিক শিক্ষা এবং শিক্ষা বিস্তারের ভূমিকা ও গ্রহণ করা হয় ।

এই পত্রিকাও ইংরেজদের হাত হতে রেহাই পায়ে নি । ১৯০৭ এর ৬ই সেপ্টেম্বর মামলা শুরু হয় মুদ্রাকর , প্রকাশক ও সম্পাদকের বিরুদ্ধে । দুর্গামোহন এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন । এই পত্রিকা মফস্বলে প্রকাশিত হলেও অত্যন্ত প্রভাবী ও উদ্দীপন কারী পত্রিকা রূপে বিবেচিত হয়েছিল ।

"Its(Barishal Hitaishi)militancy earned for it the distinction of being the first mufassial journal to be proseented for sedition". ৪১

বিজলি

- - - - -

স্বদেশী ও বিপ্লব পন্থার পটভূমিতে ' বিজলি ' র আত্মপ্রকাশ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা । বিপ্লব পন্থা ও তীব্র জাতীয়তাবোধের যে ধারা ' সন্ধ্যা ' ও ' যুগান্তর ' সৃষ্টি করেছিল সেই ধারা স্মানে ' বিজলি ' র আগমণ । সম্পাদক ছিলেন সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় । প্রকাশিত হয় ১৯১১ সালে । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমাপ্তি প্রায় । পরে এই পত্রিকার দায়িত্বে ছিলেন বারীন্দ্র কুমার ঘোষ ও নলিনী কান্ত সরকার ।

এই পত্রিকা প্রকাশের পিছনে সম্পাদকের অভিপ্রায় ' বিজলি ' তে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলা হলো –

" ' বিজলি ' র কর্মভার গ্রহণ করিবার আগে মনে পড়ে আজ ৪ বৎসর আগে - কার কথা । দ্বীপান্তর প্রত্যাগত বারীন্দ্র , উপেন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে কোনও এক মহা - নুযোগে আমার পরিচয় হয় । দেশের সত্যকার অবস্থা , সমাজের দুর্দশা , শাসক ও শোষক সম্প্রদায়ের অত্যাচার , বাঙালী জীবনের দুর্নীতি ও কলঙ্ক , জাতীয় চরিত্রের দুর্বলতা , এক কথায় জাতীয় জীবনের মধ্যে ধর্ম , সমাজ , রাষ্ট্র প্রভৃতির সমস্যাগুলি কি প্রকারে দেশের সর্বসাধারণকে বুঝান যায় এ লইয়া তখন ইঁহাদের মধ্যে খুব জল্পনা কল্পনা চলিতেছে । এই সমস্ত চিন্তার মধ্যে বারীন্দ্র কুমার তাঁহার স্বভাব স্নিগ্ধ তেজের সহিত বলিলেন , " এই পচা গলা সমাজটার গতি বিধি

না করিতে পারিলে দেশ দেশ বলে চীৎকার করিলে কিছুই হবে না । " তদানীন্তন সাময়িক পত্রের ভাষা অর্ধ শিক্ষিত , অল্প শিক্ষিত বা যৎ সামান্য লেখা পড়া জানা লোকের পক্ষে বিশেষ বোধগম্য নয় এই বিবেচনায় বারীন্দ্র কুমার স্থির করিলেন যে অতি সহজ ও সরল ভাষায় বাঙালীর জাতীয় সমস্যাগুলি একে একে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে হইবে এবং শুধু বক্তৃতায় নয় , কাজে এই সব সমস্যার নিরসন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে । এই উদ্দেশ্য লইয়াই ' বিজলি ' র সৃষ্টি হইয়াছিল ।" ৪৭

' বিজলি ' তে লেখা হলো " ভারতবর্ষের যা দাবী তাহা সহযোগী অসহযোগী এবং স্বরাজী সকলেই তাহা এক বাক্যে প্রচার করিয়াছেন । দলের বিভিন্ন মত ও কর্ম পদ্ধতিকে ছাড়িয়া সমগ্র দেশের অন্তর থেকে আজ স্বাধীনতার দাবী অকুতোভয়ে আত্ম প্রকাশ করিয়াছে । নিত্য নতুনের নাগপাশে আজ অদম্য ইচ্ছাকে বাঁধিয়া রাখা চলিবে না । "

এই ' বিজলি ' পত্রিকা ছিল বিপ্লববাদে বিশ্বাসী । ১৯০৩ - ৭ সাল যে বিপ্লব বাদের শুরু হয়েছিল সেই বিপ্লববাদ যে দেশের মানুষকে স্বাধীনতার প্রতি তীব্র আকাঙ্খিত করে ' বিজলি ' তা বিশ্বাস করতো ।

ভারতী

- - - - - - -

দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় এই পত্রিকা প্রকাশিত হয় । প্রকাশ সাল ছিল ১২৮৪ এর শ্রাবণ । পরবর্তীতে পরিচালনা করেন সরলা দেবী । ১৯০৭ এর পর পরিচালনা করেন তাঁর মা স্বর্ণকুমারী দেবী ।

' ভারতী ' তে বহু যশস্বী সাহিত্যিকের স্বাদেশিক ভাবনায় সমৃদ্ধ রচনা প্রকাশিত হয় । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে রবীন্দ্র নাথের প্রবন্ধ ' কন্ঠরোধ ' (বৈশাখ , ১৩০৩) ' ভাষা বিচ্ছেদ ' (শ্রাবণ , ১৩০৩) , ' ইম্পিরিয়ালিজম ' (বৈশাখ , ১৩১২) ,

প্রকাশিত হয় । সরলা দেবীর ' বাঙালী পরীক্ষা ' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় আশ্বিন , ১৩১২ তে ।

হিরন্ময়ী দেবীর মাতৃপূজা (মাঘ , ১৩১২) , প্রমথ চৌধুরীর বয়কট ও স্বদেশীয়তা (আশ্বিন , ১৩১২) , তেল নুন লকড়ি (মাঘ , ১৩১২) তে প্রকাশিত হয় । বিজয় চন্দ্র মজুমদারের বঙ্গ ধর্মী হাসির রচনা ' বঙ্গচ্ছেদে লক্ষ্মী বিষ্ণু সংবাদ ' প্রকাশিত হয় আশ্বিন , ১৩১২ তে ।

স্বর্ণ কুমারী দেবীর ' লর্ড কার্জন ও বর্তমান অরাজকতা ' (জ্যৈষ্ঠ , ১৩১৩) , ' আমাদের কর্তব্য ' (ভাদ্র , ১৩১৩) , কর্তব্য কোন পথে ? ' (পৌষ , ১৩১৩) প্রকাশিত হয় ।

রাজনীতি, তদানীন্তন স্বদেশী আন্দোলনের উপর প্রবন্ধ , বিপ্লব পন্থা , বিপ্লবীদের বিপ্লব কার্যে অংশ গ্রহণ সংবাদ , কবিতা , কাব্য গ্রন্থ , রাজনৈতিক প্রতিবেদন ভারতীর পাতায় সমৃদ্ধ ছিল ।

প্রবাসী

- - - - - -

সম্পাদক ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় । প্রথম প্রকাশ বৈশাখ , ১৩০৮ । প্রথমে প্রকাশিত হত এলাহাবাদ হতে ।

' এ বিদেশে , এ প্রবাসে , আমি গো প্রবাসী ,
প্রাণ কাঁদে , হতাশে নিরাশে , হে ভারতী ,
এস এস আজি । ' (প্রথম সংখ্যা , বৈশাখ , ১৩০৮)

১৯০৬ এ কলকাতায় স্থানান্তরিত হয় । তদানীন্তন বহু সাহিত্যিকের রচনা প্রকাশিত হয় । রবীন্দ্র নাথের প্রবন্ধ 'ব্যাধি ও প্রতিকার' (শ্রাবণ , ১০১৪), 'যজ্ঞ ভঙ্গ' (মাঘ , ১০১৪) , পৃথ্বিশ চন্দ্র রায়ের 'স্বদেশী সমাজ — ব্যাধি ও চিকিৎসা' (শ্রাবণ ১০১১) তে প্রকাশিত হয় । ধীরেন্দ্র নাথ চৌধুরীর 'ভারতের স্বরাষ্ট্র' (বৈশাখ , ১০১৪) , 'স্বদেশী ও বহিষ্কার' (জ্যৈষ্ঠ , ১০১৪) , এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । বিজয় চন্দ্র মজুমদারের 'ক্যানিডম' নামে এক প্রহসন ধর্মী রচনা প্রকাশিত হয়েছিল কার্তিক ১০১২ এর সংখ্যায় ।

শঙ্করী প্রসাদ বসু বলছেন , " রাজনীতির নানা তরঙ্গে রেখাঙ্কিত প্রবাসীর শত শত পৃষ্ঠার পাঠ সংকলন করলে ভারতের গোটা স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনপঞ্জী তৈরী হয়ে যায় । " ৪৮

• • • •

সপ্তম অধ্যায়

স্বদেশী যুগ ও সাময়িক পত্রিকা

১ । দেশ সাহিত্য সংখ্যা , ১৩৯৭ , সম্পাদকীয়

২ । বাংলা সাময়িক পত্রে স্বদেশ চিন্তা , দেশ , ১১। ৫। ১৯৬৩

৩ । বিপ্লবী নিকেতন : দেশবন্ধু শতবার্ষিকী সংখ্যা – সূর্য্য কুমার মিত্র

৪ । History of Freedom Movement VolII P 243-44.

৫ । The Swadeshi Movement in Bengal P-308.

৬ । Annual Report on Indian Papers in the Bengal Presidency Vol IV(1909) Pg 155-58.

৭ । জাগরণ ও বিস্ফোরণ পৃ : ১৬৬

৮ । ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায়ের রচনা সংগ্রহ , ৯৭ - ৯৮

৯ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৯৯ - ১০০

১০ । পূর্বোক্ত , পৃ : ১০১ - ১০৩

১১ । পূর্বোক্ত , পৃ : ১০৫ - ১০৭

১২ । পূর্বোক্ত , পৃ : ১১১

১৩ । The Roll of Honour P 146 - 145

১৪ । ভূমিকা , ' চার অধ্যায় ' রবীন্দ্র রচনাবলী (৮)

১৬ । সূত্র জাগরণ ও বিস্ফোরণ , পৃ : ১৬৮ - ৬৯

১৭ । পূর্বোক্ত , পৃ : ১৬৯ - ৭০

১৮ । The Roll of Honour P-145.

১৯ । পূর্বোক্ত , পৃ : ১৪৮

২০ । ব্রহ্ম বান্ধব রচনা ... ভূমিকা (২০) ক , ব্রহ্ম বান্ধব পৃ : ৩২ - ৩৪

২১ । The Swadeshi Movement P 260

২২ । দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম , পৃ : ২৪ - ২৫

২৩ । জাগরণ ও বিস্ফোরণ , পৃ : ১৭৪ - ১৭৫
২৪ । পূর্বোক্ত , পৃ : ১৭৬
২৫ । নির্বাসিতের আত্মকথা , বসুমতী , ভূমিকা

২৬ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৪

২৭ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৪

২৮ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৪ - ৫

২৯ । জাগরণ ও বিস্ফোরণ , পৃ : ১৯৭

৩০ । দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম , পৃ : ১৯৬

৩১ । The Swadeshi Movement in Bengal P 262

৩২ । পূর্বোক্ত , পৃ : ২৬৪

৩৩ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৩১৪

৩৪ । Political pootest in Bengal :Boycott and Terrorism P -53-54.

৩৫ । মহাবিপ্লব ও বাংলা সংবাদ পত্রের জন্মান্তর , পৃ : ৩৩

৩৬ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৩৩

৩৭ । জাগরণ ও বিস্ফোরণ , পৃ : ১৮৫

৩৮ । Aurabinda and Yugantar P-29

৩৯ । The Roll of Honour P - 140.

৪০ । Aurabinda and Yugantar P - 20

৪১ । The Swadeshi Movement in Bengal P - 251.

৪২ । পূর্বোক্ত , পৃ : ২৬৪

৪৩ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৮৪

৪৪ । পূর্বোক্ত , পৃ : ১০৮

৪৫ । জাগরণ ও বিস্ফোরণ , পৃ : ২০৬

৪৬ । The Swadeshi Movement 262.

৪৭ । মহাবিপ্লব ও বাংলা সংবাদ পত্রের রূপান্তর , পৃ : ৩৬

৪৮ । রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও প্রবাসী , শঙ্করী প্রসাদ বসু , দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯৭

।। অষ্টম অধ্যায় ।।

।। স্বদেশী আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য ।।

- -

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও বাঙলার মুসলিম মানসিকতা

১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন জাতীয় ইতিহাসে সংগ্রাম মুখর ধারার একদিকে যেমন এক উজ্জ্বল বৎসর অন্যদিকে এই বৎসর থেকেই হিন্দু - মুসলমান ক্ষেত্র পৃথক হতে থাকে । বঙ্গভঙ্গ ছিল ইংরেজ সরকারের এক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত । কিন্তু কারণ ছিল অনেক । মুসলিম সমাজকে পৃথক করে জাতীয় আন্দোলনের তীব্র ধারাকে অচল করা ছিল ইংরেজদের এক লক্ষ্য । তাই পূর্ব বঙ্গে সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমান সমাজ এই আন্দোলনের পক্ষে যায় নি । সমর্থন করেছিল ইংরেজদের । ১৯০৫ এর মুসলিম মানস বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তে অবিচলতায় সমর্থক থাকার জন্য যে সকল কারণ ছিল তা পর্যালোচনার পূর্বে প্রাক স্বদেশী যুগের কিছু চিত্র স্মরণ করার প্রয়োজনীয়তা আছে ।

প্রাক স্বদেশী যুগে ১৮৮৫ তে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয় । ১৮৮৫ হতে ১৯০৫ অবধি মুসলিম মানসিকতার দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছিল । এবং এই কালখণ্ডের পরিবেশে ১৯০৫ হতে ১৯১১ অবধি স্বদেশী যুগে মুসলিম মানসিকতার মুখ্য প্রকাশ ঘটেছিল । এই মুখ্যতার পিছনে ছিল এক সামাজিক , অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাতাবরণ ।

বাংলার মুসলমান সমাজ বিশ্বের মুসলিম জগতের সাথে পরিচিতি লাভ করেছিল মুসলিম বাংলা সাহিত্য হতে । সাহিত্য হতেই তাদের ধারণা জন্মেছিল আরব , ইরাণ , তুরাণ , খোরাসান , সিরিয়া , মিশর ইত্যাদি দেশের ও তাদের পীর পয়গম্বরদের কাহিনী সম্পর্কে । সুকুমার সেন বলেছেন , " ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝখানের এক লেখক ইসলামী বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট প্রণয় কাহিনী গুলির একটি ফিরিস্তি দিয়েছেন ।

খারাব করিল কত আশকের তরে
জেলেখা খারাব হৈল ইউসুফ উপরে ।
লায়লি উপরে মজনু হৈল আশক
সংসার বিখ্যাত যার আশকি সাদক ।
কামকলা লাগি হৈল কুঙার বেহাল
সয়ফুল - মুলুক পরে বদিউজ্জামাল
মেহের নেগার পরে আশক অমীর
লড়াই করিল হৃদ এশকের খাতির ।

আজ আমরা ভুলে গিয়েছি যে আমাদের প্রপিতামহরা এই সব আশকে খারাবির গল্পেই মশগুল হতেন । " ১

এই বাংলার মুসলমানেরা মধ্য প্রাচ্য বা আরব দুনিয়ার ইতিহাস , কিংবদন্তী বা কাহিনী সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং তাদের সাথে সম্পর্ক রাখার গর্ব অনুভব করতেন । এইভাবে প্যানইসলামীয় দৃষ্টিকোনের সাথে তারা যুক্ত হোন । ২

ইংরাজ শাসনের প্রবর্তনে মুসলিম সমাজ কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল । কারণ তাদের ধারণা ছিল ইংরেজ শাসন না প্রবর্তিত হলে মারাঠা ও শিখ সাম্রাজ্য সারা ভারতে প্রতিষ্ঠিত হতো যেটা হতো হিন্দু আধিপত্যের লক্ষণ । মুসলিম মানসের এই চিত্র তদানীন্তন বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । ১৩০৬ (১৮৯৯) এর পৌষ সংখ্যায় ' মিহির ও সুধাকর ' পত্রিকা মন্তব্য করে যে বুওর যুদ্ধে ইংরাজদের সাফল্য আসুক । তারা ব্রিটিশ পতাকার বিজয় চেয়েছিল । বাংলা ১৩১০ (১৯০৩) এর শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যায় মুসলিম পত্রিকা ' ইসলাম প্রচারক ' মন্তব্য করে যে ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় তারা আনন্দিত কারণ এর ফলে মারাঠা শিখদের আগ্রাসন হতে মুসলিম সমাজ নিরাপত্তায় অধিষ্ঠিত ।

ঊনবিংশ শতকের শেষে কংগ্রেস প্রভাবশালী হয়ে উঠে । তবুও মুসলিম সমাজ কংগ্রেসকে আপন করতে পারেনি । ফলে তারা কংগ্রেস হতে নিজেদের সরিয়ে রাখতে প্রবৃত্ত হয়েছিল । কংগ্রেস বৃটিশ সরকারের বিরোধিতা করছিল এটি একটি কারণ ছিল । অন্য কারণ ছিল কংগ্রেস কোন রাজনৈতিক বা আর্থিক সুবিধা লাভ করলে সেই সুবিধা পাবে হিন্দু শ্রেনী । মুসলমানদের এই ভাবনা ১৮৯৭ সালে ' হাফেজ ' পত্রিকার মন্তব্য ধরা পড়ে ।

" ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম কংগ্রেস অধিবেশনে ৭২ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন , তার মধ্যে দুজন মাত্র মুসলমান ছিলেন । দ্বিতীয় অধিবেশনে ৪৩১ জন প্রতিনিধি যোগ-দান করেন , তার মধ্যে ৩৩ জন মুসলমান ছিলেন । ১৮৮৯ খৃঃ অধিবেশনে ১৮৮৯ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন , তার মধ্যে ২৫৮ জন মুসলমান ছিলেন । ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যত প্রতিনিধি কংগ্রেস অধিবেশনে সমূহে যোগ - দান করেন তার মধ্যে শতকরা দশভাগ প্রতিনিধি ছিলেন মুসলমান । আবার তার মধ্যে বাঙালী মুসলমানের প্রতিনিধি সংখ্যা ছিল খুবই নগন্য । " ৩

ফলে মুসলমান জগতের অন্যান্য নেতার কথাই সমাজের সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণ যোগ্য ছিল বেশী । কংগ্রেসের প্রথম সারির যে সব মুসলমান নেতা ছিলেন তাঁদের সামগ্রিক দৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোন থাকা সত্ত্বেও তাঁরা মুসলমান সমাজকে কংগ্রেসের প্রতি বা আন্দোলনের প্রতি প্রভাবান্বিত করতে পারেন নি ।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের পটভূমিতে হিন্দু সমাজের অগ্রগতি মুসলমান সমাজের চাইতে বেশী হয়েছিল । মুসলিম সমাজ হিন্দুদের এই অগ্রগতির জন্য হিন্দু সমাজকেই ঈর্ষা ছাড়া স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখেনি । ১৩১০ এর জ্যৈষ্ঠ - আষাঢ় সংখ্যায় ' ইসলাম প্রচারক ' অভিমত প্রকাশ করে যে হিন্দুরা অকৃতজ্ঞ উদ্ধত । মুসলিম শাসনের আমলে তারা মুসলমানের আনুকূল্য লাভ করেন তা তারা ভুলে গেছেন । হিন্দুরা মুসলমানদের ঘৃণা করেন এবং কংগ্রেসও তাই করে ।

এছাড়া ইংরাজী শাসনের গোড়ায় ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দু সমাজ চাকুরীতে যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল । কর্ম ভাবনায় বেক্যারত্ব মুসলিম সমাজকে হিন্দু সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন করে তোলে । ' কোহিনুর ' পত্রিকা (১৩০৩ , ভাদ্র) ও ' নবনুর ' পত্রিকা (১৩১০ , শ্রাবণ) মন্তব্য করে যে সরকারী পদে হিন্দুদেরই প্রাধান্য । এরা মুসলিমদের প্রমোশনে বাধা দেয় ।

উনবিংশ শতক ও বিংশ শতকের প্রথম ভাগ ছিল বাংলা সাহিত্যের চরম বিকাশের ক্ষণ । বাংলা সাহিত্যের এই উর্বরা ভূমিতে মুসলমান সমাজ অনুভব করলো তারা যেন বাংলা সাহিত্যের এই পৃষ্ঠভূমিতে অপাঙক্তেয় । এর ফল স্বরূপ ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ নবাব আলি চৌধুরী ' মুসলিম এডুকেশন সোসাইটির ' সভায় এক প্রস্তাব ক্ষোভ প্রকাশ করেন যে বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন করা হয়ে থাকে । কিন্তু তদানীন্তন সাহিত্যিক জগৎ তাঁদের এই ক্ষোভকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হোন ।
' ইসলাম প্রচারক ' (১৩১০ এর অগ্রহায়ণ - পৌষ সংখ্যায়)মন্তব্য করে যে ঈশ্বর গুপ্ত , রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় , বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় , হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় , নবীন চন্দ্র সেন থেকে আরম্ভ করে তাঁদের শিষ্য প্রশিষ্য সকলেই তাঁদের রচনায় মুসলমান সমাজকে নিন্দা ও অবজ্ঞা করেন । তাঁদের গৌরব ম্লান করে দেখানো হয় । মুসলমান মেয়েদের পর্দা হতে বাইরে আনার চেষ্টা চলে । হিন্দু পুরুষের সাথে মুসলমান রমণীর সাথে প্রেমের চিত্র কল্পনা করা হয় । আর সব মুসলমানেরাই ' যবন ' । হিন্দু লেখক যেন ' যবনের শত্রু । '

এই যুগে মুসলমান সমাজের দারিদ্র প্রকট ছিল । কর্ম হীনতা তীব্র ছিল । ব্রিটিশ ভারতে শোষণ ছিল তীব্র । এই শোষণে হিন্দু মুসলমানে ভেদ ছিল না । ভারতের সম্পদ ইংলণ্ডে স্থানান্তরিত হতো । ভারত হতো নিঃশোষিত । দাদাভাই নৌরোজী ও রমেশ চন্দ্র দত্তের মতো ব্যক্তিরা একে 'Economic drain' বলতেন । উনিশ শতকের শেষে ও বিংশ শতকের প্রথমে গরীব মুসলমান চাষী হিন্দু আইনজীবীদের আশ্রয় নিত । মুসলমানেরা মামলা মোকদ্দমায় জর্জরিত ছিল বলে আর্থিক দিক দিয়ে

তারা বিধ্বস্ত ছিল । তাদের সঞ্চিত অর্থ যাও থাকত তা শিক্ষিত হিন্দুদের নিকট চলে যেত । এই ধারণার বশবর্তী হয়ে মুসলিম লেখকরা এর নাম দিয়েছিলেন 'Economic Drain' অর্থাৎ মুসলমান সমাজের নিকট হতে হিন্দু সমাজের দিকে তাদের অর্থ নিঃশেষিত হওয়া ।

সামাজিক পরিকাঠামোতে মুসলমান মানসিকতা যখন এই ভাবে মূর্ত রূপ লাভ করেছে তখন লর্ড কার্জন ভারতে এলেন এবং তিনি বঙ্গভঙ্গের কথা ঘোষণা করলেন । বাংলাকে কেন্দ্র করে ভারতে যে নব জাগ্রত জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছিল তাকে আঘাত হানারও একান্ত দরকার ছিল ।এই জাতীয়তাবাদকে প্রতিহত করার একটি মাত্রই তখন অস্ত্র ইংরেজের কাছে বিবেচিত হয়েছিল 'Divide and rule' । এবং ক্ষুব্ধ মুসলিম মানসকে কাছে টানার প্রচেষ্টায় ব্রতী হলেন কার্জন । তিনি ব্রডরিককে এক চিঠি লেখেন (১৭ ই ফেব্রুয়ারী , ১৯০৪) তাতে কার্জনের মানসিকতা প্রকাশিত ।
"The Bengalis, who like to think themselves a nation, and who dream of a future when the English will have been turned out and Bengali Babu will be installed in Government House, Calcutta, of course bitterly resent any disruption that will be likely to interfere with the realisation of this dream. If we are weak enough to yield do their clamour now we shall not be able to dismember or reduce Bengal again, and you will be cementing and solidifying, On the eastern flank of India, a force already formidable, and certain to be a source of increasing trouble in future". ৪

ঢাকায় গিয়ে কার্জন মুসলমান সমাজের প্রতি ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহকে দলে টানলেন । কারণ ইংরেজ জানত "it is only the Hindu population.... which constitutes the political voice of the province". ৫

কার্জন ঢাকায় বললেন মুসলিমদের , "The scheme 'would invest the Mohammedans in Eastern Bengal with a unity which they have not enjoyed since the days of the old Mussalman viceroys and kings'." ৬

শুধু তাই নয় ইংরেজ সরকার আরও ঘোষণা করল , "what was really the final draft of the partition plan, emphasised that Dacca in course of time would acquire"the special character of a provincial capital where Mohammedan interests would be strongly represented if not predominant"." ৭

১৯০৫ এর ১৬ ই অক্টোবর বাংলা বিভাগ হলো । বিভাগ হলো বাংলা সংস্কৃতিরও । বাংলার খণ্ডিত অবস্থায় ফরাজী নেতা মৌলবী কফিল আলদিন ও খান বাহাদুর সৈয়দ আলদিন বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে ও স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ঢাকার সলিমুল্লার সাথে একত্রিত হলেন । ওয়াহাবি ও তাঐউনি দলের সদস্যরা ও সমর্থকেরাও বঙ্গভঙ্গের পক্ষে গেলেন । ৮ এই সকল মুসলমান নেতা ও মৌলবী - মোল্লায় সাথে গ্রাম বাংলার সাধারণ মুসলমানদের প্রত্যক্ষভাবে যোগ ছিল , তাই এরা বিশাল সংখ্যায় স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে গেল ।

কিন্তু মুসলিম মানসের এটি হলো একটি চিত্র । কিন্তু এই আন্দোলনে হিন্দু মুসলমান " ঐক্যের অনেক হৃদয় উষ্ণকারী দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল , বিশেষ করে প্রথম দিনগুলিতে , এবং সেই আন্দোলনে বেশকিছু সংখ্যক মুসলমান স্বদেশী নেতাকে সামনে নিয়ে এসেছিল , যাঁরা ছিলেন তাঁদের হিন্দু পক্ষের নেতাদের মতোই সমান দেশ প্রেমিক ও সদিচ্ছা প্রণোদিত যাঁদেরকে এখন যে ভাবে স্মরণ রাখা হয় , তার থেকে অনেক বেশী তাঁরা স্মরণযোগ্য । এঁদের মধ্যে যাঁদের নাম উল্লেখ করা

যেতে পারে তাঁরা হলেন আবুল কাসেম , গজনাভী , রসুল , আবুল হোসেন দীন মোহাম্মদ , দেদার বক্স , লিয়াকত হোসেন , আবদুল গফুর এবং ইসমাইল হোসেন সিরাজী । " ৯

বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলনে মুসলিম সমাজের দ্বিমুখী প্রবাহই কাজ করেছিল । একদল বিরুদ্ধে ও একদল পক্ষে । প্রচারও হয়েছিল সেইরূপ বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গনে ।

মীর মশাররফ হোসেন

- - - - - - - - - - - -

মীর মশাররফ হোসেন বাংলা সাহিত্যের এক অন্যতম গুনধর মুসলমান লেখক । তাঁর রচনার ভাষা ও শিল্প সৌন্দর্য্যের রীতি অভিনব । সাহিত্য সৃষ্টিতে তিনি আত্মজীবনী ও ইসলাম ধর্মের রচনায় ব্যাপৃত । মশারক উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন না । নগর কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক শহরের বহুদূরে তাঁর ছিল অবস্থান । তবুও যুগ চেতনা তাঁর সাহিত্যে সমৃদ্ধ ছিল । " ব্যক্তি ও ব্যষ্টির সংকট , উনিশ শতকের রেনেসাঁসের ফলে উদ্ভূত সংকট , বাঙালী মধ্যবিত্ত মুসলমানের সংকট , রূপ প্রতীকের ধারার সংকট – সমস্ত কিছুই তাঁর গদ্য রচনায় কম বেশী চেতন - অবচেতন ভাবে মূর্ত , একজন শিল্পী কোন ভাবেই সমাজ বিচ্ছিন্ন নন কী লেখনীতে কী তুলিতে , কী সঙ্গীতে , কী স্থাপত্যে , সমাজের চার পাশের জমি ক্রিয়াশীল হয়ে উঠে । এই ক্রিয়াশীলতা সমাজের প্রেক্ষাপট , পটভূমিকে প্রকাশ করে সত্য , কিন্তু তার চেয়েও যা বেশী প্রকাশ করে , তা হচ্ছে সমাজের অন্তর্নিহিত গতিকে – সমাজের চলমান মূলধারাকে । " ১০ এই ধারাতেই মশারকের আবির্ভাব ।

মশারফ জন্মে ছিলেন ১৮৪৮ । এক দশক পরেই ভারত দেখেছিল সিপাহী বিদ্রোহ । মশারকের মৃত্যু ১৯১২ । বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলন তখন স্তব্ধ । মৃত্যুর

পূর্বেই বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলন দানা বাঁধে। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন মশাররফ প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভব করেছেন। ১৮৬৩ তে গঠিত হয়েছে Mahamedan Literary Society, ১৮৭৮'এ National Mahamedan Association।
মুসলিম সমাজ তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ধরে রাখায় আগ্রহী। নবাব আবদুল লতীফের নেতৃত্বে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় Mahamedan Literary Society এবং ১৮৭৮ এ আমীর আলীর উদ্যোগে National Mahamedan Association এর জন্ম হয়। কিন্তু এই দুটো প্রতিষ্ঠানই বাংলা ভাষা বা সংস্কৃতির কোন চর্চাই করেনি। এইরূপ এক শূন্যতার মধ্যে মশাররফের আবির্ভাব।

তাঁর প্রথম রচনা 'রত্নবতী' (১৮৬৯)। লেখক গ্রন্থটিকে কৌতুকাবহ উপন্যাস রূপে দেখেছেন। বিষয় বস্তু রাজপুত্র সুকুমার ও মন্ত্রীপুত্র সুমন্তের মধ্যে 'ধন বড় না বিদ্যা বড়' – এ বিতর্ক বিষয় ও তার শেষ পরিণতি 'রত্নবতী'র উপজীব্য বিষয়। রাজকুমার মন্ত্রীপুত্রের উত্তরে মন্তব্য করছেন, "এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজনন্দন বিরক্ত হইয়া কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, না তাহা কখনই হইতে পারে না। আমরা সচরাচর দেখিতেছি ধনবানেরা জগজ্জন মধ্যে বিশেষ গণ্য ও আদরণীয় হন। তাহারা কোন বিষয়ে নির্ধন লোকের ন্যায় চিন্তাজ্বরে জর্জরীভূত হন না, বিপদেও চিত্ত সুখ সন্তোষ করিয়া নিশ্চিন্তে কাল যাপন করেন। এমন কি তিলার্ধ কালের জন্য দুঃখিত থাকেন না। নির্ধন ব্যক্তি যতই কেন বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন হউন না, তাহাদিগকে চিরদিন ধনী দিগের পদানত ভৃত্য থাকিতে হয়।" ১১

কিন্তু মন্ত্রী পুত্রের উক্তি – "বন্ধো, পরম কারুণিক পরমেশ্বরের যে সমুদয় বৃত্তি প্রদান করিয়া মানব কুলের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, বিদ্যা ভিন্ন তাহা পরিমার্জিত হয় না। যে জ্ঞানের নিমিত্ত, মনুষ্যেরা সকল প্রকার জীব জন্তুর উপর একাধিপত্য স্থাপন ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাহাও বিদ্যা ব্যতীত লব্ধ হয় নাই।"

'রত্নবতী'কে বিবাহ লাভের জন্য রাজকুমারের বিপদে পড়ে বন্দী হওয়া ও পরে মন্ত্রী পুত্রের সহায়তায় মুক্তি লাভে এই উপন্যাস শেষ হয়েছে। মন্ত্রীপুত্র, বুদ্ধি ও

বিদায় বলে কিভাবে সকলকে উদ্ধার করলেন 'রত্নবতী'তে তারই বিবরণ। "বন্ধুর সহিত মিলিত হওয়ার ভাষা বড় অপূর্ব। " তৎক্ষণাৎ তিনি হর্ষ বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া সাশ্রু নয়নে বন্ধুকে আলিঙ্গন পূর্বক উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। আনন্দে তাহার মন এমনি বিহ্বল হইয়াছিল যে পুনঃ বন্ধু বন্ধু শব্দ উচ্চারণ করিয়া চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় অনিমিষ লোচনে বন্ধুর মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। দৃষ্টি আর ফিরিল না। উভয়ের চিত্তে জলধিতরঙ্গের ন্যায় প্রণয় হিল্লোল বহিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে সাগর যেমন বায়ু প্রতিঘাতে বেলাকে আঘাত করে সেইরূপ তাহাদিগের দুঃখ জলধি চিন্তার বায়ুর প্রতিঘাতে সঞ্চালিত হইয়া হৃদয়কে আঘাত করিতে লাগিল। " ১২

'বিষাদ সিন্ধু' তাঁর অন্যতম রচনা। মুসলিম ধর্মের কাহিনী অবলম্বনে লেখা। মুসলমানদের কোনো উল্লেখযোগ্য 'মিথলজি' নাই। মিথলজির আশ্রয়ে হিন্দু ধর্মে দেবদেবীর মহিমা প্রচারিত হয়। নিরক্ষর, অল্প শিক্ষিত সাধারণ হিন্দুরা নানা পার্বনে, রামায়ণ, মহাভারত, পাঁচালি, কথকতার মাধ্যমে সাহিত্য রস আস্বাদনের সঙ্গে ধর্ম পালনের তৃপ্তি আদায় করতে পারে সহজেই। তুলনায় মুসলমানদের নিরাকার চেতনাবাহী ধর্মীয় কাঠামো অন্তত নিরক্ষর, স্বল্প শিক্ষিত এবং ইসলাম ধর্মান্তরিতদের কাছে দুর্বোধ হওয়ার কথা। আর এ দেশে " লোক শ্রুতি ও আউলিয়া দরবেশ ফকিরদের কেরামতি, সামাজিক সাম্য ও ভাবালুতা সম্বল করে প্রচারিত হয়েছিল ইসলাম। ১৩ মশাররফ হোসেন 'বিষাদ সিন্ধু' লিখবার পশ্চাতে স্বধর্মের মহিমা জ্ঞাপনেচ্ছা হয়তো ছিল না। " মহরমের মূল ঘটনাটি বঙ্গভাষা প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়াই ছিল তার উদ্দেশ্য।"১৪

'বিষাদ সিন্ধু'তে মুসলমান পাঠকের অত্যন্ত স্মরণীয় ঘটনাকে তিনি বাংলা সাহিত্যে উপস্থাপন করে একে উপন্যাসের মতো বেগবান করেছেন। একদিকে পুঁথির অলৌকিকতা অন্যদিকে বীরত্বে উদ্ভাবন তাঁর সৃষ্টির মূল প্রেরণা ছিল। আবেগ জড়িত হৃদয়ে মশাররফ সাবলীল ভাষার ব্যবহার করেছেন।

" সীমার , একটু দাঁড়াও । আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া যাও । কার সাধ্য তোমার গমনে বাধা দেয় । কার ক্ষমতা তোমাকে কিছু বলে ? একটু দাঁড়াও । এশিরে তোমার স্বার্থ কি ? খণ্ডিত শিরে প্রয়োজন কি ? অর্থ ? হায় রে অর্থ । হায় রে পাতকী অর্থ । তুই জগতের সকল অনর্থের মূল । জীবের জীবন ধ্বংস , সম্পত্তির বিনাশ , পিতা পুত্রে শত্রুতা , সকল স্বামী স্ত্রীতে মনোমালিন্য , ভ্রাতা ভগ্নিতে কলহ , রাজা প্রজায় বৈরীভাব , বন্ধু বান্ধব বিচ্ছেদ , বিবাদ , বিসম্বাদ , কলহ , বিরহ , বিসর্জ্জন , বিনাশ এ সকল তোমারই জন্য । " ১৫

মশাররফ হোসেনের স্বাধীনতা ছিল আকাঙ্খিত বস্তু । ' বিষাদ সিন্ধু ' র উদ্ধার পর্বে স্বাধীনতা সম্পর্কে মশারফ হোসেন বলছেন , " স্বাধীনতা কি মধুমাখা কথা , স্বাধীন জীবন কি আনন্দময় । স্বাধীন দেশ কি আরামের স্থান । স্বাধীন ভাবের কথাগুলি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে হৃদয়ের সুক্ষ শিরা পর্য্যন্ত আনন্দোচ্ছ্বাসে স্ফীত হইয়া উঠে এবং অন্তরে বিবিধ ভাবের উদয় হয় । " ১৬

মশাররফের ' গোজীবন ' প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ সালে । এই প্রবন্ধ যুক্তি তর্কের জোরে প্রতিষ্ঠিত । লেখকের বক্তব্য , পাঠক , মোসলমান কবিগণ পারস্য ভাষায় কসাইয়ের বর্ণনা কিরূপ করিয়াছেন ? যে গো - হত্যা করে তাহাকেই কি কসাই বলিয়া - ছেন ? তাহা নহে । যাহার অন্তরে দয়ামায়া , মমতা কিছুই নাই পর দুঃখে যাহার হৃদয় কাতর নহে , ব্যথা বোধ না করে তাহাকেই কসাই বলিয়াছেন , সে সঙ্গেই পাপ হৃদয়ের , কসাই হৃদয়ের তুলনা করিয়াছেন । মোসলমান কবিদিগকে সহস্র ধন্যবাদ শাস্ত্র সঙ্গত কার্য্য বলিয়া তাহারা কসাইকে উচ্চাসনে বসাইয়া যান নাই । মহা ঋষি , যোগী , ঘোর তপস্বী বলিয়া সম্ভাষণ করেন নাই । কসাই নীচ , অতি জঘন্য , কসাইকে মনুষ্য দলের মধ্যে পরিগণিত করেন নাই । গো - জীবন হত্যা করে বলিয়া এত অপমান , এত শাস্তি আজ পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হইতেছে । কিন্তু গো খাদককে কেহ কিছু বলেন নাই , কি ভ্রম , কিভ্রম । " তিনি এই প্রবন্ধে আরও বলছেন , " ..... ধর্ম্মে আঘাত লাগে না , গোমাংস পরিত্যাগ করিলে ঘরকন্নারও ব্যাঘাত জন্মে না । উন্নতি পথে কাঁটা পড়ে না । প্রাণের হানিও বোধহয় হয় না । এ অবস্থায় গো হিংসা পরিত্যাগ করিলে হানি কি ? পরিত্যাগে নিজের কোন ক্ষতি

নাই , অথচ চির সহযোগী ভ্রাতার মন রক্ষা , ধর্ম রক্ষা , আর যাহা রক্ষা , তাহা বার বার বলিব না । যাহাতে সকল দিক রক্ষা হয় সে ত্যাগে ক্ষতি কি ?" ১৭

' গো জীবন ' প্রকাশ সেদিন মুসলমান সমাজে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল । লেখক মুসলমান নয় হিন্দু এ ধরণের কটু মন্তব্যও বর্ষিত হয়েছিল । প্রচণ্ড বিতর্ক শুরু হয় । "এর পরিণামে তাঁকে ' তওবা ' পড়ে ' গো জীবন ' প্রকাশ বন্ধের অঙ্গীকার করতে হয় । " ১৮

মীর মশাররফের ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত হয় ' সঙ্গীত লহরী ' । মশাররফের জীবনে সাহিত্য ধর্ম সমাজ তাঁর বিশ্বাসের বলিষ্ঠতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল । এই কবিতায় তিনি জাতীয় ঐক্যের প্রসঙ্গে চিন্তা করে হিন্দু মুসলমান মিলনের ডাক দিয়েছেন –

" ওরে ভারত জাগ জাগ দিন গেল
ঘুমের ঘোরে থেকে তোমার সর্বনাশ হইল ।"

১৮৮৯ এ প্রকাশিত ' বেহুলা গীতাভিনয় ' এর মধ্যে মশাররফ হোসেন ইংরেজদের অত্যাচারের প্রকৃত স্বরূপ উম্মোচন করে এই রাজ শক্তিকে প্রতিরোধ করতে আহ্বান জানিয়েছেন ।

' বঙ্গভঙ্গ ' কালে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রসারিত হয়েছে । তাঁর শেষের দিকে রচনা মুসলমান ধর্মানুযায়ী বিষয়ে প্রকাশিত হয়েছে । মৌলুদ শরীর (১৯০৩) , ' বিবি খাদেজার বিবাহ ' (১৯০৫) , ' হজরত ওমর মহম্মদের ধর্ম্ম জীবন লাভ ' (১৯০৫) , ' মদিনার গৌরব ' (১৯০৬) , ' মোস্লেম বীরত্ব ' (১৯০৮) , ' হজরত ইউসুফ ' (১৯০৮) এই সব গ্রন্থ মুসলমান মানসিকতার ফসল । এই সকল গ্রন্থে হিন্দুদের অপদস্থ করে মুসলিম গৌরবের কথা প্রকাশিত না হলেও লেখক ~~হিন্দুদের~~ হিন্দুদের উন্নতি ও মুসলমানের অবনতিতে ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন । তিনি বলছেন –

৫৫ । বর্গের বুনেদী দল গেছে সব রসাতল ,
কেহ মরা কেহ আধমরা ।

৫৬ । গেছে সব হিন্দু ঘরে কেহ না তা দৃষ্টি করে
আরও মুখে বলে ভাল তারা ॥

৫৭ । এক বার মাথা তুলে দেখ ভাই চক্ষু মেলে
মুসলমান কিসে হল সারা ।

৫৮ । জমিদারী কোথায় গেল সোনা রূপা কি হইল
এত ঘর কিসে গেল মারা ॥

৫৯ । চিরকাল হিন্দুগণ করিতেছে নির্যাতন
তবু জ্ঞান হলনারে হায় ।

৬০ । নিতেছে সকল টেনে তবু তারে নাহি চিনে
চক্ষে ধাঁধা এমনি লাগায় ॥

দেখ যত হিন্দু ঘর কিসে হল ধনেশ্বর
খোঁজ দেখি কারণ ইহার ।

প্রতি মুসলমান ঘরে চাকুরীর সাজঘরে
সর্বনাশ করিল সবার ॥ ১৯

১৯১০ এ প্রকাশিত হলো মশাররফ হোসেনের আত্মকাহিনী ' বিবিকুলসুম ' বা কুলসুম জীবনী । স্ত্রীর সম্পর্কে এই জীবনী গ্রন্থে লেখক বলছেন , " বিবি কুলসুম আমার জীবনীর জীবনী , জীবনের জীবনী , নয়নমন রঞ্জিনী , চিত্ত হারিণী , চিন্তা কর্ষিণী , আমার কানের মধুর ভাষিণী , সুহাসিণী , আমার সম্পূর্ণ ভালবাসার অধিকারিণী , সমভাবে সুখ দুঃখ ভোগিণী , মম চক্ষে কমল সদৃশ্য কমলা , সরলা , সতী সাধ্বী , বুদ্ধিমতী , বিদ্যাবতী , দয়াবতী ও সর্বকার্যে সুমতি । " ২০

এই আত্ম জীবনীতে স্বদেশী আন্দোলনের উল্লেখ আছে । পূর্ব ও পশ্চিম বাঙ্গা

যখন জাতীয় আন্দোলনে তোলপাড় , সকলেই অংশ গ্রহণ করছেন , মুসলিম সম্প্রদায় এই আন্দোলন হতে বিচ্ছিন্ন । মীর মশাররফ হোসেনও উদ্যমহীন । এই উদ্যমহীনতা বিবি কুলসুম সমর্থন করেছেন । তিনি বলছেন , " ঘরে তণ্ডুল নাস্তি , ওদিকে ধন কুবের অদ্বিতীয় রাজশক্তি সম্পন্ন বৃটিশ জাতি , বিদ্যাবুদ্ধিতে জগৎ শ্রেষ্ঠ । ... এমন নিরপেক্ষ রাজার অসন্তোষের কারণ , বিরক্তির কারণ করিয়া কি লাভ হইবে ? " ২১ তবু ১৯১০ সালে লেখা বঙ্গভঙ্গ কালে এই ধরণের ইংরেজ প্রশস্তিতে ইংরেজদের প্রতি বঙ্গভঙ্গ জনিত কারণে মুসলমান সমাজের কৃতজ্ঞতা বোধও হয়তো বা প্রকাশ পেয়েছে । ২২

মশাররফের রচনায় জাতীয়ভাবে বদলে আছে ধর্মভাব । তিনি রাজনীতির আবর্তে উগ্র জাতীয়তাবাদী বা সমর্থক ছিলেন না । তাঁর শেষের রচনায় হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষ তদানীন্তন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যে এক ঝড়ের সংকেত দেখা যাচ্ছিল তার ইঙ্গিত এখানেই মিলে ।

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০ - ১৯৩১)

স্বদেশী যুগের জাতীয়তাবাদী কবি ছিলেন সিরাজী । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বহু মুসলিম সাহিত্যিক পৃথকীকরণের পরিবেশে নিজেকে সরিয়ে রাখলেও সিরাজী নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন দেশের কাজে । শিশির কর বলছেন , " ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ – এই মনোভাব নিয়ে সে যুগে যে কজন মুসলিম লেখক সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন , সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী তাঁদের অগ্রগণ্য । তাঁর লেখার ভিত্তি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি , আদর্শ , এক জাতি এক প্রাণ । তাঁর লেখায় আছে হিন্দু মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের আহ্বান । তিনি লিখেছিলেন , এই

ঐক্য বলে ' বহিবে ভারতে বিপুব প্লাবন , যাইয়া ভাসিয়া জঞ্জাল দূরে । " ২৩

এই যুগে মুসলিম সমাজকে জাগরণের বানী বহন করেছিলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে সিরাজী অন্যতম । সিরাজী জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হলেও নিজস্ব ধর্ম নিজের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি তিনি অনুরক্ত ছিলেন । সেই ভাবে তিনি মুসলমান সমাজকে জাগরণেরও গান শুনিয়েছেন । মুসলমান জাগরণ ও বিদেশীর হাত হতে ভারত উদ্ধার দুটোই তাঁর কাম্য ছিল ।

তাঁর প্রতিভা বহুমুখী ছিল । একাধারে বাগ্মী অন্যধারে কবি ও সাহিত্যিক , ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক – সকল প্রতিভা তাঁকে আশ্রয় করে বৃদ্ধি পেয়েছিল । তাঁর রচিত গ্রন্থ গুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য – কাব্য ' অনল প্রবাহ ' (১৯০৭) , ' নবউদ্দীপনা ' (১৯০৭) , ' উচ্ছ্বাস ' (১৯০৭) , ' উদ্বোধন ' (১৯০৭) , সঙ্গীত সঞ্জীবনী ' (১৯১৬) , উপন্যাস ' তারাবাঈ ' (১৯০৮) , ' রায় নন্দিনী ' (১৯১৮) , ' ফিরোজা বেগম ' (১৯২৩) , ' নুরুদ্দীন ' (১৯২৩) ।

তিনি যে কারণে সাহিত্য সেবায় কলম ধারণ করেছিলেন সেই প্রসঙ্গে বলেছেন , " বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সেবকগণ , সাবধান ও সতর্ক হও । অনুকরণ করিতে যাইয়া একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িও না । ইসলামের পবিত্রতা ও প্রাচীরের বাইরে যাইয়া ভ্রমেও সাহিত্য সেবা করিও না । যদি বঙ্গ সাহিত্যকে জাতীয় সাহিত্যে পরিণত করিতে চাও , যদি সাহিত্য শক্তি প্রভাবে জাতীয় জীবন তরীকে গন্তব্যের দিকে পরিচালিত করিতে চাও – যদি বঙ্গ সাহিত্যের দ্বারা জাতীয় কল্যাণ ও কুশল কামনা কর , তাহা হইলে সর্বপ্রকারের কুচিন্তা কু কল্পনা ভীরুতা ও দীনতার হস্ত হইতে ইহাকে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হও – বদ্ধ পরিকর হও । সুচিন্তার উদ্যানে উচ্চ কল্পনার স্বাস্থ্যকর উন্মুক্ত বায়ুতে ইহাকে বিচরণ করিতে দাও । জগতের যাবতীয় ধর্মবীরদিগের পবিত্র জীবনীর সৌন্দর্যরাশি সাহিত্যে প্রতিফলিত কর । পুরাবৃত্তের দৃশ্য প্রকটন করিয়া মানব জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি কোন কোন গুণে উন্নতি এবং কোন

কোন দোষে অধঃপতিত বা ধ্বংসের আবর্তে পতিত হইয়াছে তৎ সমুদায় দেখাইয়া দাও। প্রাণের উচ্ছ্বাসে হৃদয়ের তেজে, সত্যের প্রচারে সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমগ্র দেশকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ কর। দেখিবে সাহিত্য শক্তির ঝটিকা প্রবাহে অচিরেই জাতীয় জীবন মেঘোমুক্ত হইয়া সৌভাগ্য শশীর অমল ধবল কৌমুদী ছটায় আলোকিত এবং স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে সুশোভিত রহিয়াছে।" ২৪

সিরাজীর প্রাথমিক চিন্তায় একদিকে মুসলমান জাগরণ — ও তার জন্য মুসলমানদের পৃথক সত্ত্বা বজায় রাখতে বলেছেন, "তোমরা সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন জাতি এবং ধর্মাবলম্বী পরন্তু তোমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও ভিন্ন রূপ।" ২৫ ১৯০৩ এর নভেম্বর ডিসেম্বর সংখ্যা সিরাজী 'নবনূরে' এক প্রবন্ধ লেখেন 'নবনূর ও জেহাদ'। তাতে তিনি মন্তব্য করেছেন, "যে পর্যান্ত সমগ্র পৃথিবীর মানব মণ্ডলী এসলাম ধর্মে দীক্ষিত না হইবে, সে পর্যন্ত মুসলমানদিগের প্রতি জেহাদ করা আল্লাহতায়ালা নির্ধারিত করিয়াছেন।" ২৬

১৯০০ খৃষ্টাব্দে রাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু ঘটল। সিরাজী 'শোক লহরী'তে লিখলেন —

> "অয়ি মাতঃ ভিক্টোরিয়া ভারত জননি,
> তব সম পুন্যবতী কে হয়েছে কবে,
> জগতের ছিলে তুমি মাতৃ - স্বরূপিণী,
> তোমার সৌভাগ্য সম কার আর ভবে ?"

কবিতাটির পাদটীকায় সম্পাদক লিখেছেন, "আমাদের মাতৃস্বরূপিণী মহারাণী ভারতেশ্বরীর আধিপত্য কালে, ভারতীয় মুসলমানগণ উন্নতির পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন, এজন্য মুসলমান জাতি তাহাদের স্বর্গীয় মাতার প্রতি হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞ। মুসলমানগণ ভিক্টোরিয়ার আধিপত্যকালেই ইংরাজী শিক্ষার দিকে

মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং তাহার ফল স্বরূপ বিশ্ব বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ লোক অনেক দেখা যাইতেছে। ২৭

সিরাজীর প্রথম রচনাগুলিতে এই ধরণের আনুগত্যবোধ মুসলমান লেখক রূপে তাঁর ছিল। ১৯০৬ এর 'অনল প্রবাহে'র প্রথম সংস্করণ বের হলো। প্রেরণাদাতা ছিলেন মুনশী মেহেরুল্লা। ১৯০৭ প্রকাশিত হলো 'অনল প্রবাহে'র দ্বিতীয় সংস্করণ। এতে মুসলমান জাগরণের সাথে ইংরেজ বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়েছে। 'অনল প্রবাহে'র উৎসর্গে কবি বলছেন —

ইসলামের গৌরবের বিজয় কেতন,
হে মোর আশার দীপ নবযুবগণ।
মোসলেমের অভ্যুত্থানে
ইসলামের জয়গানে
আবার লভুক বিশ্ব নূতন জীবন।

কবি মুসলিম চেতনার জড়তায় আঘাত হেনেছেন —

" তবু কি তোরা এইরূপ, অজ্ঞান,
আলস্য শয্যায় নিদ্রিত হইয়া ?
দেখরে চাহিয়া কত নীচ জাতি,
তারাও জ্বালিছে উন্নতির বাতি
তারাও ছুটিছে কি বা দ্রুতগতি
নবীন উৎসাহে প্রমত্ত হইয়া।

কবির বক্তব্য --

সহস্র বর্ষের পতিত দলিত
শতধা বিচ্ছিন্ন ঘোর অবনত,

ঐই হিন্দু জাতি হয়ে একমত
সাধিতেছে কি বা মহা অভ্যুত্থান ।

দীন দরিদ্র ভারতকে উদ্ধারের মানস ব্রতে তিনি মুসলমান সমাজকে আহ্বান জানাচ্ছেন —

পতিত ভারতে করিতে উদ্ধার ,
ঘুচাতে দাসত্ব কলঙ্কের ভার ,
আনিতে ভারতে স্বাধীন জীবন
জাতীয় কলঙ্ক করিতে মোচন
কয়েছে সকলে কি পণ কঠিন ।
কিন্তু হয়ে তোরা বীর কুলোদ্ভব ,
আজি যেন হায় , মৃত প্রায় সব
উচ্চ লক্ষ্য আশা উন্নত ধারণা
বিসর্জন দিয়া উন্নত কল্পনা
হয়েছ অধম ঘৃণিত হীন ।

বেদনার সাথে কবি অনুভব করেছেন —

যে জাতি জগতে আলো জ্বালাইল ,
বীর দাপে যার ভুবন কাঁপিল ,
জগৎ যাদের চরণে লুঠিল ,
তারা আজি বিশ্বে ঘোর হতমান ।

কবি যেন বেদনার জ্বালায় মগ্ন —

সিংহের ঔরসে লভিয়া জনম
হয়েছিস হায় , শৃগাল অধম
হায় রে কি কব , বিদরে মরম ,
এ কোমল প্রাণ সতত জ্বলে ।
' অনলের জাতি ' তোরা যে অনল
তবে কেন আজি অলস , দুর্ব্বল ?
জাগরে সকলে ধরি পূর্ব্ব বল ,
আলস্য জড়তা চরণে দলে ।

কবি আত্ম সমালোচনার শেষে দেশের উন্নতির জন্য সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন —

যাক সে সকল দাওরে ছাড়িয়া ,
ভারতেই দেখ নয়ন মেলিয়া ,
অযোধ্যা পাঞ্জাব বোম্বাই যুড়িয়া ,
যত মুসলমান ঐক্যেতে মিলিয়া
অতীত গৌরবে প্রলুব্ধ হইয়া
ছুটিছে কেমন উন্নতি পথে ।
লিখরে জীবনী লিখ ইতিহাস
লিখ বীর গাথা করহ প্রকাশ ,
জাতীয় চিত্রের জ্বলন্ত আভাস
সবার নয়নে করহ ধারণ ।
স্ত্রী জাতি তরে দাও শিক্ষা দাও
জাতীয় উত্থানে তাদের মাতাও ।
বাল্য পরিণয় উঠাইয়া দাও ,
সাম্য স্বাধীনতা তাহাদের দাও ,
উদিবে অচিরে সৌভাগ্য তপন ।

' নব উদ্দীপনা ' স্বদেশী যুগের উত্তাল তরঙ্গে লেখা । ' নব উদ্দীপনা ' ব্রিটিশ বিরোধী , হিন্দু - মুসলমান সম্প্রীতির কাব্য । এই কাব্য গ্রন্থে তিনি ভারত মাতার সন্তান হিন্দু মুসলমানকে একত্রিত হয়ে বিদেশীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন । কাব্যের কিছু কবিতা ' নব্য ভারতে ' প্রকাশিত হয়েছিল । কবি বলছেন —

" নেটিভ নিগার সদা খাই গালি
আপত্তি করিলে বন্দুকের গুলি
ভাঙ্গিয়া দিতেছে মস্তকের খুলি
অহো কি ভীষণ অত্যাচার হায় ।
পেটে নাই অন্ন পরিধানে বাস ,
অর্থবল বিনা মানস উদাস ।
কেবলি অভাব , কেবলি হতাশ ॥
ফিরিয়া চাহে না কেহই ঘৃণায় ॥

সোনার ভারতবর্ষ , জন্মভূমি ভারতবর্ষ বণিকের কুক্ষিগত হয়েছে । তাই সিরাজী ' নব উদ্দীপনায় ' দেশ ভক্ত সন্তানদের প্রাণ বলিদানের জন্য উৎসাহিত করেছেন —

' ভারত সন্তান কর আজি পন
প্রাণ দিয়া আজ লভিব জীবন ,
সাধন করিতে মায়ের কল্যাণ ,
মহোল্লাসে দিব প্রাণ বলিদান ,
তথাপি রব না এমনি পড়ে ।

কারণ ইংরেজ শাসকের অত্যাচারে দেশ আজ নিঃস্ব , জর্জরিত —

সোনার ভারত হয়ে গেল ছাই
বল বীর্য ধন কিছু আর নাই
শিল্প বানিজ্য লুপ্ত সব ভাই ।

স্বদেশী যুগে সিরাজীর উদ্দেশ্য ছিল ভারত জননীর গৌরব গানে সকলকে উদ্বোধিত করা ।

" হায় , এ সিংহের দেশে এবে শৃগালের দল ,
নির্বিরোধে বিচরিছে করি মহা কোলাহল । (অমীরের আগমণ)

ভারতের শোভা বর্ণনা করে সিরাজী বলছেন —

বিশাল ভারতবর্ষ প্রকৃতির রম্য উপবন ,
সুজলা সুফলা ভূমি ঐশ্বর্য্যের মহা নিকেতন ।
সহস্র বরষ যথা উড়েছিল তোমার কেতন
অনুগ্রহ ভিক্ষা আশে ইংরেজ ফরাসীস্ গণ
যেদেশে আসিয়া আহা হেরি তোমা গৌরবে উন্নত ,
নমে ছিল তব পদে করি শির আভূমি বিণত ,
স্বর্গাদপি গরীয়সী হায় সেই সোনার ভারত
বণিক জাতির এবে হইয়াছে পূর্ণ কুক্ষিগত । (তূর্য্যধ্বনি)

এরপর সিরাজী উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন । যদিও সিরাজী নাটক নভেল পছন্দ করতেন না । " সিরাজী লঘু সাহিত্য পাঠের বিরুদ্ধে ছিলেন । অধঃপতিত জাতি নাটক নভেল প্রেম সঙ্গীত ' যাত্রা থিয়েটার ' এর মাধ্যমে কোনদিন উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হয় না এই ছিল তার মত । " ২৮

কিন্তু সিরাজী উপন্যাস রচনা করলেন । উপন্যাস রচনা করার পিছনে কারণ ছিল । তাঁর মতে , " নীচ মতি বঙ্কিম চন্দ্র এবং বর্তমান মুখোপাধ্যায় বন্দ্যো হইতে

আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক উদ্ভট ঔপন্যাসিক লেখকই অতি জঘন্য চিত্র অঙ্কিত করিয়া বিশ্বপূজ্য মুসলমানের মুন্ডপাত এবং মর্ম্ম বিদ্ধ করিতে অসাধারণ প্রয়াস স্বীকার করিয়া আসিতেছেন । আমি নিজে এবং আরও কতিপয় মুসলমান লেখক এ সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ নানা পত্র পত্রিকায় তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন । কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ফলোদয় হয় নাই । " সেই জন্যই দেশ মাতৃকার কল্যাণের নিমিত্ত তাহাদের সাবধান - তার জন্য এবং মুসলমানের আত্মবোধ জন্মাইবার জন্যই উপন্যাসের ঘোর বিরোধী আমি , কর্ত্তব্যের তাড়নায় ' রায় নন্দিনী 'র রচনা করিয়াছি । " ২২

সিরাজী এই উক্তি করলেও তিনি ' তারাবাঈ ' রচনা করেন ১৩০৮ সালে । ' রায় নন্দিনী ' ১৩১৩ , ' নূরউদ্দীন ' ১৩১৬ ও ' ফিরোজা বেগমে 'র রচনা কাল ১৩১৮ । প্রত্যেকটি উদ্দেশ্য মূলক উপন্যাস । এই সব উপন্যাসের সঙ্গে ইতিহাসের সাদৃশ্য নেই । কিন্তু ইসলামের গৌরব কে তুলে ধরার জন্য এই উপন্যাসগুলিতে কয়েকটি দৃষ্টি কোন তুলে ধরা হয়েছে । (১) হিন্দু যুবতী বা রাজকন্যা মুসলমান যুবক বা মুসলমান রাজপুত্রের নিকট প্রেম নিবেদন করছে । অনেকটা যেন উপযাচিকার মত । (২) অভিজাত বংশীয়া মুসলিম কন্যারা বা রাজপুত্রী তাচ্ছিল্য ও সদম্ভের সাথে হিন্দু রাজাদের নিবেদিত প্রেমকে প্রত্যাখান করছে । (৩) বঙ্কিম কে অনুসরণ করে সেই style এ রাজাদের সাথে মুসলমান নবাব সেনাপতির দ্বন্দ্ব । (৪) উপন্যাস - গুলিতে হিন্দু ধর্মের একটি বিচ্যুতি দেখানো । (৫) উপন্যাসে চরিত্র সৃষ্টিতে মুসলিম সভ্যতা র গৌরবময় দিক প্রদর্শন করা বা তুলে ধরা । (৬) ইসলাম ধর্মের মহিমায় আকৃষ্ট হয়ে বহু সংখ্যক হিন্দুর মুসলমান ধর্ম গ্রহণ । (৭) হিন্দু দেব দেবীদের প্রতি বিরূপ মন্তব্য । এই সব উপাদান দিয়ে হিন্দু ঔপন্যাসিকদের যোগ্য জবাব দেওয়া ।

' তারাবাঈ ' উপন্যাসে তারাবাঈ কে শিবাজীর কন্যারূপে দেখানো হয়েছে । ' তারাবাঈ ' এর নায়ক আফজল খাঁ । আসলে তারাবাঈ একজন অমাত্য কন্যা । শিবাজীর

কন্যার সাথে আফজল খাঁর প্রেম প্রদর্শিত হলে শিবাজীর গৌরব ক্ষুন্ন হবে , ইসলামের গৌরব বৃদ্ধি পাবে । সেই জন্য সিরাজী শিবাজীর কন্যা তারাবাঈকে দিয়ে আফজল খাঁকে প্রেম নিবেদন করিয়েছেন , এর ফলে বিয়ের মজলিসে চণ্ডীদের চক্রান্তে তারাবাঈ নিহত হয়েছে ।

' রায় নন্দিনী 'র স্বর্ণময়ী কেদার রায়ের কন্যা নন । চাঁদ রায়ের কন্যা । এই কন্যাকে অপহরণ করে ঈশা খাঁ বিয়ে করেছেন । এই দুঃখে ও অপমানে চাঁদ রায় আত্মহত্যা করেন । রায় নন্দিনীতে রোমান্টিক পরিবেশ তৈরী করা ও সূক্ষ্ম - সূক্ষ বিবরণ দেওয়া সিরাজীর স্টাইল ছিল । ' রায় নন্দিনী ' উপন্যাসে ঈশা খাঁর পান চিবানো ও ছিবড়ে ফেলার বর্ণনা , স্বর্ণময়ীর ঈশা খাঁর পারস্য ভাষায় পত্র লেখা এবং তাতে আতর মাখানো , ঈশা খাঁর সৈন্য বাহিনী ও সম্পত্তির বিশদ বিবরণ যেমন তার পচানব্বই জন জমিদার , দুই হাজার পুষ্করিণী , তিন হাজার ইঁদারা , দুইশত পান্থশালা , ষাটটি মাদ্রাসার বিবরণ পাওয়া যায় । এই উপন্যাসে হাজার হাজার হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে ।

' ফিরোজা বেগম ' উপন্যাসে মুসলিম রাজ পরিবারের কন্যা ফিরোজা বেগমের সাথে জনৈক মারাঠা যুবকের প্রেমের চিত্র রয়েছে । কিন্তু প্রেম এক তরফা । মারাঠা যুবক বিভিন্ন প্রচেষ্টায় ফিরোজাকে পেতে চেয়েছে । কিন্তু ফিরোজার দৃঢ়তার জন্য মারাঠা যুবক ব্যর্থ হয়েছে । এই উপন্যাসে সিরাজী মুসলিম ও মারাঠার দ্বন্দ্ব সংগ্রামে মুসলিম ললনা ফিরোজাকে অনন্ত বুদ্ধি বিদ্যা ও মহাশক্তির উৎস রূপে অঙ্কিত করেছেন । এই উপন্যাস গুলিতে " যুগ - বিগ্রহ , প্রেম - প্রণয় , কূটনীতি , কলা কৌশল , প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা সবই রয়েছে সিরাজীর .... নেই শুধু রক্ত মাংসের সজীব মানুষ । " ৩০

সিরাজী বঙ্কিম মানসিকতার বিরোধী হলেও তার উপন্যাস বঙ্কিমী স্টাইলে লেখা ।

" তাঁর লক্ষ্য স্থল যে বঙ্কিম চন্দ্র এ কথা এ সব উপন্যাস পড়লেই বোঝা যাবে । তিনি ভাবের ক্ষেত্রে বঙ্কিম চন্দ্রের বিরোধিতা করেছেন বটে , কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে পনের আনা বঙ্কিমানুসারী । এক আধখানা আরবি ফার্সী শব্দ দিলে বাকিটাই বঙ্কিমানুকরণ ।" ৩১

সিরাজী চরিত্রে দ্বিবিধ সত্তা দেখা যায় । প্রধান বৈশিষ্ট্য মুসলমানত্ব , দ্বিতীয় বাঙালীত্ব । মুসলমান সত্তায় তিনি হিন্দুর প্রতিপক্ষ । দ্বিতীয় সত্তায় অর্থাৎ বাঙালীত্বে তিনি বৃটিশ বিরোধী । তাই হিন্দু প্রতিপক্ষ রূপে মুসলিম জাগরণের উপন্যাস লিখেছেন বাঙালী রূপে বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলনে বৃটিশ সাম্রাজ্য বাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন

বৃটিশ বিরোধী মনোভাব পাওয়া গেছে তাঁর রচিত কাব্য ' অনল প্রবাহ ', ' নব উদ্দীপনা ' ও ' উচ্ছ্বাসে ' । অনল প্রবাহের জন্য তাঁর কারাবাস ঘটেছে । বাংলা সরকারের সেক্রেটারী A.W.Duke I.C.S ভারত সরকারকে ১৯১০ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তে একটি চিঠি পাঠান । তাতে লেখা আছে ," I am directed to report for the information of the Government of India, that the attention of the Government has been drawn to four sedious books named in margin, which has been written by Ismail Hussain Siraji and printed and published by Bhut Nath Palit at the Navya Bharat Press.

1. Amal Prabaha
2. Udbodhan
3. Naba Uddipana
4. Uchhas

201-5 connwalis street, Calcutta. The author Ismail Siraji, is a native of Searaj Ganj in Eastern Bengal and Assam and a well known Muhammadan agitation of the province. His persecution under the criminal law is considered very unncessary by Sri Lanulot Hare". ৩২

চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট D. Swinho রায় দিলেন "In this accused Mohammed Ismail Hussain Seraji charged under sections 124 A and 153A, Indian Penal Code. with reference to a Book entitled Anal Prabaha which means a stream of fire......
I find the accused quality under sections 124A and 153A Indian Penal Code, I convict him under those two sections and sentence him two years rigorous impronment.

D. Swinho

14th Sept, 1910. Chief Presidency Magistrate

সিরাজী স্বদেশী যুগে সর্ব প্রথম দন্ডিত মুসলমান কবি। তাঁর সম্পর্কে নবভারত পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল, "সিরাজীর লেখায় ছিল দেশ প্রেম, ভারতীয় মুসলিমদের অতীত শৌর্য - বীর্যের কথা, আবেগ হৃদয়ের উষ্ণতা। কিন্তু তেমন সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন নি। তাই তাঁর প্রতিভা সর্বত্র গামিনী হলেও (কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী, নাটক সব কিছুই তিনি লিখেছেন) তাঁকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্থায়ী আসন দিতে পারে নি। তাঁর একটি বড় গুণ দূরদর্শিতা - অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ছিল তার জীবন। .... কলমকেই করেছিলেন তাঁর অস্ত্র। সেই দিয়েই সংগ্রাম করে গেছেন জাতির কল্যাণে, সমাজের কল্যাণের জন্য — নিপীড়নের

বিরুদেধ , অত্যাচারের বিরুদেধ । তাঁর সমকালীন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তিনি দেখেছিলেন আশার আলো । তাঁর কথা " সম্প্রতি নববর্ষে বিধাতার বিশেষ আশীর্বাদ এবং ইঙ্গিতে স্বদেশ প্রেমের যে তুমুল আন্দোলন প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছে , এই প্রবাহ প্লাবনে দেশের নেতৃবৃন্দের মধ্যে একজনও ম্যাটসিনি , ওয়াশিংটন বা ওয়ালেসের মত আত্মোৎসর্গ করিতেন তাহা হইলে সত্য সত্যই এদেশ নব - জীবনের পথে অগ্রসর হইত । " ৩৪

কারণ সিরাজীর ' আকাঙ্খা ' (স্বরাজ , ৩রা চৈত্র , ১০১০) ছিল

আমি চাহিনা সভ্যতা (ভন্ডামীর কথা)
চাহি না সুন্দর বেশ ,
আমি চাহি শুধু এই অধিকার ,
ভারত আমার দেশ ।
আমি চাহি না দর্শন, চাহি না কাব্য
চাহি শুধু আমি এই ,
ভারতবর্ষে ভারতবাসীর
পর অধিকার নেই ।

অন্যান্য মুসলিম উপন্যাসিক বৃন্দ

মুসলিম মানসিকতায় বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত সাদরে গৃহীত হয়েছিল । হিন্দুদের উন্নতির সাথে মুসলমানদের পশ্চাৎপদ জীবনে পৃথক প্রদেশ হওয়ায় তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল । তাদের ধারণা ছিল এই শাসনতান্ত্রিক বিভাজনে তারা মুসলমান জাতি রূপে পৃথক সত্তা রাখতে পারবে ও এই পৃথক প্রদেশে সকল প্রকার সুবিধা ও সুযোগের মূলভাগী হবে তারা ।

স্বাভাবিক ভাবেই এই রাজনৈতিক বিভাজন তাদের মানসিকতাকে সাহিত্যের তীর্থপথেও এনে দিয়েছিল। হিন্দু কাছ হতে আলাদা হয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার জন্য তারা সাহিত্য রচনায়ও পৃথক ভাবে ব্রতী হয়েছিল।

" ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ হবার পূর্ব পর্যন্ত স্বতন্ত্র ভাবে ইসলামী সাহিত্য রচনা করার প্রয়াস সত্ত্বেও মুসলমানদের দিক থেকে হিন্দুদের সঙ্গে মিলে মিশে একটা সমন্বয় ধর্মী সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস চলছিল। বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্যে বাংলার হিন্দুরা যে ভূমিকায় অবতীর্ণ করলো, তাতে এ প্রয়াসের ভিত্তিমূলে এ শতকের গোড়াতে প্রথমবারের জন্য প্রচন্ড আঘাত লাগলো। মুসলমানদের মধ্যে এমন কেউ কেউ এ কথা বুঝতে পারলেন যে হিন্দু মুসলমানদের রাজনীতিতে যেমন, সাহিত্যেও তেমনি এক নয়। মুসলমানকে বাঁচতে হলে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র পথ ধরেই এদেশে তাকে এগিয়ে যেতে হবে। এ দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই এই শতকের প্রথম দশকে (১৯০৬) যেমন বাংলা দেশেই ঢাকা নগরীতে মুসলীম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়, সাহিত্যেও তেমনি এ সময় থেকে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রচেষ্টা হয়।"৩৩

হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ উপন্যাস রচিত হতে শুরু করে, যে উপন্যাসগুলিতে প্রতিক্রিয়া শীলতা লক্ষ্য করা যায়।

হিন্দু বিদ্বেষী এই রূপ এক মুসলিম উপন্যাসিক হলেন মতীয়র রহমান খান (১৮৭২ - ১৯৩৭)। এই বিদ্বেষ প্রচারিত হলো তাঁর সাহিত্য কর্মের মাধ্যমে। দুটো উপন্যাসে তিনি এই ভাবনাকে ব্যক্ত করলেন। প্রথমটা 'যমুনা'। প্রকাশকাল ১৯০৪। উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় বন্ধু মুসলমান বীরের সাথে হিন্দু যুবতীর প্রেম। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ এই উপন্যাসের পটভূমি। উপন্যাসের নায়ক আহম্মদ শাহ আবদালী। 'যমুনা' নামে একটি ব্রাহ্মণ কন্যা তাঁর প্রতি আসক্তা হলেন। এই প্রেম কাহিনীই উপন্যাসের বিষয়।

বাংলা সাহিত্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' (১৮৫৭) এ শিবাজীর সাথে ঔরঙ্গজেবের কন্যা রোশেনারার ব্যর্থ প্রেমের চিত্র অঙ্কন করেন। এটি ছিল অনুবাদ গ্রন্থ। মুসলিম মানসিকতায় প্রতিক্রিয়াশীল ভাবনা দানা বাঁধতে থাকে।

মতীয়ুর রহমানের অন্য একটি উপন্যাস 'মোক্ষ প্রাপ্তি' (১৯১৪)। পূর্বের মতো জাতি বিদ্বেষ এই উপন্যাসে না থাকলেও এতে এক পণ্ডিতের ধর্মান্তকরণের বিশদ চিত্র আঁকা হয়েছে। যদি পুরো ব্যাপারটাই ইতিহাসের সাথে সামঞ্জস্যহীন তেমনি সামঞ্জস্য নাই ধর্মান্তকরণের ব্যাপারেও।

মোজাম্মেল হক[3] (১৮৬০ - ১৯৩৪) এই মানসিকতারই উপন্যাসিক। তাঁর রচিত উপন্যাসের নাম 'দরাফ খাঁ গাজী' (১৯১১)। হিন্দু বিদ্বেষ নীতি এই উপন্যাসেও দেখা গেছে। নায়িকা লীলাবতী নামে এক ব্রাহ্মণ কন্যা। নায়ক মোস্তাক বোখারী। এই মুসলিম যুবকের সাথে লীলাবতীর প্রণয় কাহিনীর আনুসঙ্গিক বর্ণনা এই উপন্যাসের বিষয়। এই উপন্যাসে হিন্দু সন্ন্যাসীদের হীনতা, মুসলমানদের পোষাকে তাদের মুগ্ধতা, মুসলমানদের দাড়ির প্রতি আকর্ষণ, হিন্দু দের মুসলমান ধর্ম গ্রহণের জন্য অপরাধীর মতো দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে থাকা এর মধ্যে প্রকাশিত। এখানেই সীমাবদ্ধ নয়, হিন্দুদের কাছে আজানের ধ্বনি মধুর এর তুলনায় 'দেবালয়ের মুখরিত করা শঙ্খ, কাঁসর ঘন্টার কর্কশ কোলাহল' বিরক্তিকর। মুসলমানদের অলৌকিক ক্রিয়া কান্ডে উপন্যাস পূর্ণ। লীলাবতীর মা এই বিয়েতে উৎসাহী এবং মেয়েকে রাজী করানোর দায়িত্ব লীলাবতীর মায়ের।

সৈয়দ আবু হোসেন বঙ্কিম বিরোধী উপন্যাসিক রূপেই পরিচিত। বঙ্কিমী স্টাইলকে অনুসরণ করে বঙ্কিমী বিকৃতি এই উপন্যাসগুলির মূল লক্ষ্য। তাঁর রচিত উপন্যাস গুলো 'দুর্গেশ নন্দিনী বা জিজারজা', 'কপালকুন্ডলা বা সখের সতীন', 'যুগলাঙ্গুরীয় বা সতী সাধ্বী', 'ইন্দিরা বা ডাকিণী', ইন্দুর নাম বিষবৃক্ষ', কৃষ্ণকান্তের উইল বা বিধবা বিবাহ', 'আনন্দ মঠ বা নন্দের বন্দী', 'সীতারাম বা কাগজ রাজা'। লেখক এই সব উপন্যাসকে "দেশ হিতৈষণায় জ্ঞানোদয়ী গ্রন্থ"

বলে অভিহিত করেছেন । শুধু মাত্র বঙ্কিমের বিরুদ্ধাচারণেই এই গ্রন্থ শেষ হয়েছে । লেখক অনুকরণের বিকৃতি না ঘটিয়ে মৌলিক প্রতিভায় উপন্যাস রচনা করলে তিনি ভাল উপন্যাসিক হতে পারতেন ।

আরেক উপন্যাসিক মোহাম্মদ ইদরিস আলী (১৮৯৫ - ১৯৪০) তিনিও একই মানসিকতায় । তাঁর রচিত উপন্যাস দুটির নাম ' দনুজ দুহিতা ' ও ' বঙ্কিম দুহিতা ' । হিন্দু বিদ্বেষী প্রতি ক্রিয়া এখানেও ব্যক্ত ।

প্রতিক্রিয়া ধর্মী এই সব উপন্যাসে কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় । প্রতিটি উপন্যাসে হিন্দু নারীর সাথে মুসলমান যুবকের প্রেম । যেন অন্য ধর্মের নারীর সাথে প্রেম করা গৌরবের বস্তু । আর নারী যে ধর্মাবলম্বী সে ধর্মের এই প্রেমে যেন গ্লানির পরিচয় । এ ছাড়া হিন্দু নারীরা মুসলিম যুবকের প্রতি আসক্ত । এবং এর জন্য গৃহত্যাগেও রাজী । পিতা মাতাও যেন এই কার্যে সহায়তা করছেন । সিরাজীর ' রায় নন্দিনী ' তে প্রতাপাদিত্যের কন্যা অরুণাবতীর সাথে সেনাপতি মাহতাব খাঁর প্রেমে সাহায্যকারিণী প্রতাপাদিত্যের স্ত্রী । ' দরাফ খাগাজী ' তে লীলাবতীর মা সাহায্যকারিণী ।

ধর্মান্তকরণ এই সব উপন্যাসের আরেক বৈশিষ্ট্য । প্রতিটি প্রেমে প্রেমিকা নিজের হিন্দু ধর্ম বিসর্জন দিয়ে মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিতা হয়েছে । শুধু প্রেমিকা নয় বহু হিন্দুর এবং সন্ন্যাসীর ধর্মান্তরিত হওয়ার বিবরণ আছে । আর আছে হিন্দু ধর্মের , সংস্কারের , আচরণের তীব্র সমালোচনা । সমালোচনায় তিনটি স্বরূপ (১) নায়ক নায়িকা সংলাপ বা কথোপকথনের চলে হিন্দু ধর্মের সমালোচনা করছে । (২) যে কোন উপন্যাসিক চরিত্র পুরুষই হোক বা নারীই হোক – হিন্দুদের অনুষ্ঠান বা ধর্মকে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ , দেব দেবীকে নিয়ে অপমান ও মস্করা করা যেন স্বাভাবিক ঘটনা । (৩) কখনো কখনো সাম্প্রদায়িক বিতর্কের সূচনা উপস্থাপিত করা হয়েছে উপন্যাসে । এই বিতর্কে হিন্দুদের পরাজয় ও মুসলমানের জয় সুনিশ্চিত ।

উপন্যাসগুলিতে আছে মুসলিম অলৌকিকতাকে উপস্থাপনের চেষ্টা। ঝাড় ফুক দিয়ে রোগ প্রশমিত করার বহু ঘটনা এই সব উপন্যাসে সবলীলভাবে লিখিত। ইতিহাস বিকৃত, কোথাও অস্বীকৃত। কোথাও উদ্ভট। যেমন "প্রাচীন হিন্দুরা নাকি মুসলমান ছিলেন।" ৩৬

মুসলিম উপন্যাসিকের মধ্যে কায়কোবাদ রচনা করেছিলেন 'মহাশ্মশান' (১৯০৪)। এই উপন্যাসে তিনি হিন্দুদের হীনমন্য করেন নি। তিনি মুসলমানদের হিন্দু জাতির সমকক্ষ করতে চেয়েছিলেন। বাংলার হিন্দু উপন্যাসিকরা হিন্দু বীরদের খুঁজে পেয়েছিল ভারতের মাটিতে -- রাজস্থানে, মহারাষ্ট্রে কিংবা বাঙলায়। মুসলমান সাহিত্যিকেরাও খুঁজল তাদের বীর। "তখন বাঙালী মাত্রই স্বাজাতির অতীত ঐতিহ্য ও গৌরবাপ্রয়ী। হিন্দু অনুধ্যানে এল আর্য, রাজপুত ও মারাঠা গৌরব বৃত্ত। মুসলিমের চিত্ত পরিক্রমার ক্ষেত্র হল আরব, ইরাণ ও মধ্য এশিয়া। কায়কোবাদেও এই চেতনা প্রকট।" ৩৭

কায়কোবাদ তাঁর 'মহাশ্মশানে' নায়ক করলেন আহম্মদ শাহ দুররাণীকে। মারাঠা পরাজিত হল পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে। কায়কোবাদ এই জয়ে অনুভব করলেন, "মুসলমানগণ যদিও এই যুদ্ধে জয় লাভ করেছিলেন বটে, তথাপি তাহারা এত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে আহম্মদ শাহ দোরাণী কাবুলে চলিয়া যাওয়ার পর বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে ভারত সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার শক্তি আর তাহাদের ছিল না।" ৩৮

কারণ কায়কোবাদ অদ্বিতীয় বীর সৃষ্টি করলেও ইংরেজদের প্রতি মানসিকতা তাঁর ভূমিকায় লিখে রেখেছিলেন "মুসলমানদের সৌভাগ্য বশতঃই ইংরেজগণ ভারতে আগমণ করিয়া তাহাদের সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।" ৩৯

বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলন একদিকে মুসলিম সমাজ নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। অন্যদিকে এই আন্দোলনের প্রভাবও তারা অস্বীকার করতে পারে নি।

ফলে এই অবস্থায় উপন্যাসে সামাজিক সমস্যা , শিক্ষা চেতনা ও উন্নত মানসিকতা বোধের লক্ষণ দেখা দিতে লাগল । দেখা দিতে লাগল ধর্ম নিরপেক্ষ চেতনাবোধ ও উদার সংবেদনশীল ভাবধারা ।

মহম্মদ নুরুল হক চৌধুরীর ' আকর্ষণ ' (১৯১৬) ও ' বঙ্গের জমিদার ' (১৯২৫) এই চেতনায় লেখা উপন্যাস । হক চৌধুরী এই উপন্যাসে কিছু কিছু চরিত্রের সৃষ্টি করলেন তাদের মাহাত্ম্য অক্ষুন্ন রইলো । শুধু তাই নয় তিনি এই হিন্দু চরিত্র - গুলির মধ্যে মানবিক অনুভূতি আরোপ করলেন । ' আকর্ষণে ' হিন্দু চরিত্র নরেন্দ্র কিশোর চক্রবর্তী এবং ' বঙ্গের জমিদার ' এর মৃণাল এই ধর্ম নিরপেক্ষ ও উদার সংবেদনশীল ভাবনার পরিচয় দেয় ।

মোহম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯ - ১৯৩৬) সৃষ্টি করলেন ' সরলা ' (১৯১৮) উপন্যাস । এই উপন্যাসে হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টান চরিত্রের সংমিশ্রণ ঘটেছে । হিন্দু ও খ্রীষ্টান পেয়েছে যোগ্য মর্যাদা । সরলাও ফ্লোরা চরিত্রের সুন্দর বিকাশের মধ্য দিয়ে ঘটনার গতি সাবলীল হয়েছে । সরলা নায়িকা । কিন্তু বার বার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে ধর্মান্তরিতা হতে হয়েছে । এতেই তার উপলব্ধি " সব ধর্মেই মানুষ আছে । " এ অনুভূতি পরোক্ষে লেখকেরও । লুৎফর রহমানের আরেক উপন্যাস ' রায়হান ' (১৯১৮) । এই উপন্যাসে ব্যবসাকে মর্য্যাদার পেশা বলে উপস্থাপিত করা হয়েছে । সুদ ব্যবসাতে মুসলমানদের আকৃষ্ট করা হয়েছে ।

ধর্মনিরপেক্ষ ভাবের অন্যতম উপন্যাসিক ছিলেন মোহাম্মদ নাজিবর রহমান সাহিত্য রত্ন (১৮৭৮ - ১৯২৩) । তাঁর রচিত বিখ্যাত উপন্যাস ' আনোয়ারা ' (১৯১৪) , গরীবের মেয়ে । তিনি উপন্যাসে দেখিয়েছেন সামাজিক দিক দিয়ে হিন্দু মুসলমানের সহযোগিতা কতখানি প্রয়োজন । এই উপন্যাসে তা ভাবগত দিক দিয়ে উপস্থাপন করা হয় নি । হয়েছে বাস্তবেও । তিনি বলতে চেয়েছেন হিন্দু মুসলমানের বিভেদের জন্য সাম্প্রদায়িকতার বদলে শ্রেনী চেতনার আরোপ বেশী । তাঁর উপন্যাসে ' শিক্ষক ' এক

পবিত্র ও মর্য্যাদার অধিকারী। " এই বোধের পিছনে হিন্দুদের শিক্ষা ও শিক্ষানুরাগ বহুলাংশে কাজ করেছে বলে মনে হয়। " ৪০

মোজাম্মেল হক (১৮৬০ - ১৯০০) ছিলেন আর একজন উদার পন্থী উপন্যাসিক। তাঁর রচিত ' জোহরা ' (১৯১৭) উপন্যাসে হিন্দু মুসলমান চরিত্রের সংমিশ্রন ঘটেছে। এই হিন্দু চরিত্রগুলি মুসলমানের চরিত্রের সাথে একই মাহাত্ম্যে একই অনুভূতি ও একই সুরে গাঁথা। প্রত্যেকটি চরিত্রে আছে মানবিক গুণের আবেদন।

মোহাম্মদ আবদুল হাকিম রচনা করেন ' পল্লীসংসার ' (১৯১৮) ধর্মীয় ভিত্তি বোধের উপর রচিত উপন্যাস। নায়ক ধর্মীয় নেতা মুর্শেদ এ রূপায়িত হয়েছেন। নায়কের পিতৃ বন্ধু রায় বাহাদুর জারিণী চরণ, রায় বাহাদুরের পুত্র সতীশ চরিত্র অঙ্কনে আবদুল হাকিম দরদী মন নিয়ে দেখেছেন। সম্ভ্রান্ত হিন্দু রূপেই তারা চিত্রিত।

পরবর্তীকালে মোহাম্মদ গোলাম জিলানির ' বরখিতের ডায়েরী ' (১৯২৬) ও ' ভুলের বাঁধন ' (১৯২৭) এ আছে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে স্থাপিত মৈত্রী সম্পর্কের পরিণতি ও এই মিলনের জয়গানেই উপন্যাস সমাপ্ত। ঠিক তেমনি কাজী ইমদাদুল হকের (১৮৮২ - ১৯২৭) ' আবদুল্লা ' উপন্যাসে হিন্দুদের উদার চরিত্র, সরলতা বন্ধুপ্রীতি ও মানবিক কল্যাণ বোধের ধারণায় উজ্জ্বল।

উচ্চ উদার চেতনার পরশ পরবর্তীতে যে সব সাহিত্যিক পেয়েছিল তাঁদের উপন্যাসের চরিত্রগুলো ধর্মীয় আবেগের গন্ডী পেরিয়ে মানবীয় গুণের কসলে পরিণত হয়ে উঠেছে। আর এই ভাবে উদার রূপে গড়ে উঠার পিছনে বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলনের শেষে হিন্দু মুসলমান একতার চিন্তার প্রভাব পড়েছিল এই সব সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে।

মুসলিম সাময়িক পত্রিকা

উনিশ শতকে বাংলাদেশে মুসলমানদের ইংরেজী ভাষা শিক্ষার এক আন্দোলন হয়। মুসলমানদের উচ্চ বর্ণ আসরাফ গোষ্ঠীর হাতেই এর নেতৃত্ব ছিল। এঁদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয় 'মহামেডান লিটারারী সোসাইটি'। আবদুল লতিফ ছিলেন এঁদের মুখপাত্র কিন্তু এই সোসাইটিতে বাংলা ভাষার চর্চা হয় নি। তিনিটি ভাষায় আলোচনা হতো – উর্দু, ফারসী ও ইংরেজী।

কিন্তু লতিফ গোষ্ঠীর ভাবনায় মুসলিম সমাজ আবদ্ধ থাকেনি। বাংলা ভাষার প্রতি তাদের আকর্ষণ বাড়তে থাকে। মুসলমান সমাজের বাংলা ভাষা সম্পর্কে তখন কি ধরণের ভাবনা ছিল তা প্রকাশিত হয় 'নবনূরে' (১৩১০)। " বঙ্গভাষা ব্যতীত বঙ্গীয় মুসলমানের মাতৃভাষা আর কি হইতে পারে? যাঁহারা জোর করিয়া উর্দুকে বঙ্গীয় মুসলমানের মাতৃভাষার আসন প্রদান করিয়া সমগ্র ভারতে মুসলমানের একই মাতৃভাষা করিতে চান, তাঁহারা কেবল অসাধ্য সাধনের জন্য প্রয়াস করেন মাত্র।"

আরও ভাবনার কথা প্রকাশিত হয়েছিল, " মাতৃভাষার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা বাঙালী হইয়া নিজেদের মাতৃভাষা উর্দু ও আরবী বলিয়া পরিচয় দেওয়া, কিংবা বাংলা জানি না, ভুলিয়া গিয়াছি, এরূপ বলা – এই মারাত্মক রোগ কেবল এক শ্রেনীর মুসলমানের মধ্যেই দেখা যায়। তাঁহাদের এই রূপ নীতি অবলম্বন করা কি বাস্তবিক পক্ষে নিতান্ত লজ্জাজনক নহে? যাহারা এরূপ আচরণ করে তাহারা যে আপন মাতা ও মাতৃভূমির নিন্দা প্রকাশ করে এবং নিজ মুখে নিজের মায়ের এবং দেশের দীনতা হীনতা জ্ঞাপন করে তাহাতে বিন্দু মাত্র সংশয় নাই।" ৪১

উনবিংশ শতকে বাংলার জাগরণের প্রভাব মুসলমানদের মধ্যেও ধীরে ধীরে বিস্তৃত হতে থাকে। এই প্রভাব শিক্ষা, বিজ্ঞান, ধর্ম, সাহিত্য সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

কালক্রমে বাংলা ভাষায় মুসলিম লেখকরা সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। সাহিত্য ভাবনার শ্রেষ্ঠ মুকুর সাময়িক পত্র বা পত্রিকা। স্বাভাবিক ভাবেই ধর্মালোচনা ও সাহিত্য রচনার তাগিদে মুসলমান সাহিত্যিকদের দ্বারা উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯০৫ এ যখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হলে মুসলিম লেখকের পরিচালিত পত্রিকা গুলিতে দ্বিবিধ মনোভাবের প্রকাশ দেখা দেয়। এক দল বিরোধী অন্য দল হিন্দু মুসলমান ঐক্য বার্তা তুলে ধরার পক্ষপাতী।

ধর্মীয় ও স্বাতন্ত্র বোধ ও রক্ষণশীল ভাবনাকে যারা আশ্রয় করে পত্রিকা প্রকাশ করলেন তাদের পত্রিকা গুলো হলো 'বাসনা' (১৯০৮ - ৯) মাসিক পত্রিকা, প্রকাশিত হতো রংপুর থেকে, 'হিতকরী' (১৮৯০- ১৮৯২) পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো কুষ্ঠিয়া থেকে। 'নবনূর' (১৯০৩ - ১৯০৬) মাসিক পত্রিকা কলকাতা হতে প্রকাশিত হতো, 'সুধাকর' (১৮৮৯ - ১৮৯১) সাপ্তাহিক পত্রিকা, প্রকাশ কলকাতা।

ইসলাম ধর্মের ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে যারা ভাবনা প্রকাশ করতো — 'আহমদী' (১৮৮৬ - ১৮৮৯) পাক্ষিক প্রকাশ স্থান মৈমনসিংহ, 'হিন্দু মুসলমান সম্মিলনী' (১৮৮৭) মাসিক পত্রিকা, প্রকাশ স্থান মাগুরা, যশোহর, 'বালক' (১৯০১) সাপ্তাহিক, বরিশাল, 'ভারত সুহৃদ' (১৯০১) মাসিক, বরিশাল, 'প্রচারক' (১৮৯৯ - ১৯০২) মাসিক কলকাতা হতে প্রকাশিত, 'কোহিনূর' (১৮৯৮) মাসিক, প্রকাশ কুমার খালি পরে ফরিদপুর।

একদিকে নিজের রক্ষণশীলতা অন্যদিকে হিন্দু-কংগ্রেস বিরোধী — 'আখবারে এসলামিয়া' (১৮৮৪ - ১৯০৫) মাসিক পত্রিকা, মৈমনসিংহ, 'হাফেজ' (১৮৯৭) মাসিক, কলকাতা, 'হানিফি' (১৯০৩ - ১৯০৫) মাসিক, মৈমনসিংহ, 'ইসলাম' (১৯০০ - ১৯০১), মাসিক কলকাতা, 'ইসলাম প্রচারক' (১৮৯১ -

– ১৯১০) মাসিক , কলকাতা , ' মিহির ' (১৮৯২ - ৯৩) মাসিক কলকাতা , এই কাগজ পরে ' সুধাকর ' এর সাথে মিলিত হওয়ায় এর নাম হয় ' মিহির ও সুধাকর ' (১৮৯৩ - ১৯১০) সাপ্তাহিক কলকাতা ।

' ইসলাম প্রচারক ' ১৮৯১ এ যখন প্রতিষ্ঠিত হলো তখন তাদের ভাবনা ছিল বাঙলা ভাষায় পত্র পত্রিকা প্রকাশ ও সাহিত্য চর্চা করার মধ্যে জাতীয় কল্যাণের পথ নিহিত । ইসলাম প্রচারকের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান সমাজের ধর্ম কথা প্রকাশ করা এবং ইসলাম ধর্ম প্রসার করার বাতাবরণ সৃষ্টি করা । " তাঁদের পত্রিকায় প্রকাশিত সব লেখারই মূল লক্ষ্য ছিল ধর্মের রজ্জুকে শক্ত করে ধরা এবং অন্যকে ধরতে উৎসাহিত করা । তাঁদের সমাজ বোধ বা জাতীয়তাবোধেরও মূল উৎস ছিল ধর্ম । তাঁরা ইতিহাস চর্চা করেছেন , ভেবেছেন ইতিহাস জাতীয় জীবন রক্ষার প্রধান অবলম্বন । তবে সে ইতিহাস ইসলাম ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের ইতিহাস । " ৪২

১৯০০ খৃষ্টাব্দের মে - জুন সংখ্যায় ' ইসলাম দর্শন ' নামে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । এতে বলা হয়েছে " আমাদিগের ভারতীয় ভ্রাতাগণ – যাঁহারা প্রাথমিক শিক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই অথবা দুই একটি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং কিছু ইংরেজী ও দুই এক খানি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন , তাঁহারাও উথলিয়া উঠিয়া আগ্রহ সহকারে বলিয়া ফেলেন যে , নতুন দর্শনই দর্শন , পুরাতন দর্শন কিছুই না , অজ্ঞানতা অন্ধকার মাত্র ।"

১৯০১ এ ' প্রদীপ পত্রিকা 'র বিরুদ্ধে ইসলাম প্রচারকের নভেম্বর - ডিসেম্বর সংখ্যায় একটি প্রতিবাদ প্রকাশিত হয় । " তাহারা যেরূপ নানাবিধ প্রবন্ধে মাসিক পত্রিকাচয়ের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া হিন্দু মুসলমানের বিদ্বেষ জাগাইতেছেন , তৎ পরিবর্তে তাহারা যদি এই উভয় জাতির একতা পথ অবলম্বন করিয়া লেখনী চালনা করিতে পারেন তবে সমাজের উপর বিষ বর্ষন স্থলে অমৃত বর্ষিত হয় । ..... বঙ্কিমবাবু যদি মোসলমানের কলঙ্ক অঙ্কনে মনোযোগী না হইয়া , তাহাদিগকে হিন্দুর সহিত প্রেমপাশে

বাঁধিতে চেষ্টিত হইতেন তবে কি আজ মোসলমান সমাজকে তাঁহার নামে মুখ ফিরাইতে দেখিতে পাইতাম । .... মোসলমানের হিংসা করিলে দেশের ক্ষতি ব্যতীত লাভ নাই । অতএব সকলের উচিৎ অন্তরের বিদ্বেষ চিরতরে মুছিয়া ফেলিয়া সরল হৃদয়ে মোসলমানকে স্নেহ করা । "

' ইসলাম প্রচারক ' কতখানি ধর্মীয় বিষয়ে উগ্র ছিল , তার একটি চিত্র । ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ' মিহির ও সুধাকর ' পত্রিকা যা মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত হতো সেই পত্রিকায় নাটকের বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা প্রকাশিত হয় । তার বিরুদ্ধে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ - এপ্রিল মাসে মন্তব্য করা হলো , " আজ আমরা নিতান্ত আক্ষেপের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের মুখপত্র ' মিহির ও সুধাকর ' আপনার চিরন্তন পবিত্র প্রথার ব্যতিক্রম করিয়া থিয়েটারের কলুষিত বিজ্ঞাপন বক্ষে ধারণ পূর্বক , আমাদের স্তম্ভিত করিয়াছে । কেবল তাহাই নহে থিয়েটারের লম্বা চওড়া সমালোচনা বাহির করিয়া , মুসলমান গ্রাহক পাঠকদিগকে ভীষণ নরকের দিকে আহ্বান করিতেছে । .... এইরূপ থিয়েটারের বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা প্রকাশ দ্বারা যদি একটি মাত্র মুসলমানের দেহ কলঙ্কিত হয় , আধ্যাত্মিক অবণতি ঘটে , তবে কি স্বত্বাধিকারী এবং সম্পাদক সাহেব তজ্জন্য দায়ী হইবেন না । পাপের প্রশ্রয় দান করা কি রূপ মহাপাপ , আমরা মৌলবী সাহেবদিগের নিকট তাহার ফতোয়া তলব করি । "

১৯০৫ এ ঘটল বঙ্গভঙ্গ । ' ইসলাম প্রচারক ' রাজনৈতিক ভূমিকায় সক্রিয় হয়ে উঠল । এই সময় কুমিল্লায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ হয় । এই প্রসঙ্গে ১৩১৩ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপারে মন্তব্য করা হয় , " কুমিল্লায় এবার যে ভীষণ কান্ড ঘটিয়াছে , তাহা বোধহয় কাহারও অবিদিত নাই । হিন্দুর বিকৃত স্বদেশী আন্দোলনের কুফল এমন ফলিতেছে । বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধবাদী বিকৃত স্বদেশী আন্দোলনকারী হিন্দু নেতৃবৃন্দের বিদ্রোহ মূলক বক্তৃতায় দেশে অশান্তির আগুন জ্বলিয়াছে । ঢাকার সর্বজন মান্য নবাব খাজা সলিমুল্লা বাহাদুর , অনারেবল মৌলবী

সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী খান বাহাদুর , মৌলবী সৈয়দ হোসাম হায়দার চৌধুরী সাহেব প্রভৃতি মুসলমান নবাব ও জমিদারদিগকে মুসলমান সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে দেখিয়া ইঁহাদের গাত্র জ্বালা উপস্থিত হইয়াছে — হৃদপিন্ড বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে । ইঁহারা ধোকা দিয়া মুসলমানদিগকে বোকা বানাইয়া স্বদেশে আনয়নের চেষ্টা করিয়াছিল , কিন্তু হঠাৎ মুসলমান দলপতিগণ সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করাতে তাহাদের বড় সাধে বাদ পড়িল , সকল আশা ভরসা মিটিয়া যাইবার উপক্রম হইল । পাল - ব্যানার্জি ও তাঁহাদের চেলা গণ বঙ্গের চতুর্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া সভা সমিতি করিতেছেন , তাহাতে কোন মুসলমান কখনও বাধা প্রদান করেন নাই । কিন্তু যেই মাত্র নবাব বাহাদুর কুমিল্লায় গিয়া সভা করিবেন বলিয়া প্রচারিত হইল , অমনি ' বন্দেমাতরম ' এর চেলাগণ নতুন ফিকির ঘটাইল । ..... হিন্দুর এত বাড়াবাড়ি মুসলমানগণ অকাতরে সহ্য করিতেছেন , ইহা মুসলমান নেতাদিগের শান্তিপ্রিয়তা ও উদারতার ফল । নচেৎ নেতাগণ একটু মাত্র ইঁ করিলে হিন্দুদিগের আর নিস্তার ছিল না । .... হিন্দু মুসলমানের এ ভীষণ সংঘর্ষের ফল বড়ই শোচণীয় হইবে — ভারতের উন্নতির শত বৎসর পিছাইয়া পড়িবে । " ৪৩

১৩১৪ এর মাঘ সংখ্যায় ' ইসলাম প্রচারক ' মন্তব্য করছে , " হিন্দু গণ এক দিকে মুসলমানদিগকে ' ভাই ভাই ' বলিয়া সাদরে আহ্বান করিতেছেন , অন্যদিকে হিন্দু জমীদার ও অপরাপর শ্রেনীর হিন্দুদিগের ভীষণ অত্যাচারে দারিদ্র মুসলমানগণ জর্জরিত । প্রত্যহই নূতন নূতন অত্যাচার কাহিনী আমাদের শ্রবণ গোচর হইয়া , আমাদিগকে মর্মাহত করিয়া তুলিয়াছে । কোরবানী কার্য্যে এখনও বহু সংখ্যক অত্যাচারী দুর্দান্ত হিন্দু জমিদার মুসলমানদিগকে প্রবল রূপে বাধা দিতেছেন । স্বজাতি আন্দোলনে মুসলমানগণ পদে পদে হিন্দুদিগের হস্তে বাধা প্রাপ্ত হইতেছেন । এই জাতিই কোন প্রাণে ও কোন মুখে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একতা স্থাপনের কথা বলেন , আমরা বুঝিতে অক্ষম ।

মুসলমানগণ এক্ষণে তাঁহাদের কপট বন্ধুত্ব ও ভাতৃভাব বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন । এই কপটতার জন্যই মহা বিচারক খোদাতাআলা তাঁহাদের ২২ বৎসরের কংগ্রেসকে

এ বৎসর সুরাট নগরে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন । তাপ্তী নদীর পানিতে কংগ্রেসের চিতা ভস্ম বিধৌত হইয়াছে । "

কংগ্রেসের প্রতি আরও মন্তব্য " ২২ বৎসরের কংগ্রেস ২৩শে পা দিয়া যমের বাড়ী গিয়াছে । সুখের বিষয় ২। ৪ টা নগন্য মুসলমান নামধারী বিকৃত স্বদেশী পান্ডা ব্যতীত কোন নামজাদা মুসলমান কংগ্রেসের সেই মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন না ।" ৪৪

' নবনূর ' এর প্রকাশ ১৩১০ । নবনূরের উদ্দেশ্য ছিল মাতৃরূপিণী মাতৃভাষা সেবাকে পুন্যব্রত জ্ঞানে এই ব্রতে অংশ গ্রহণ করা । " বঙ্গভাষাকে একটা নূতন মূর্তি প্রদান করিয়া ' মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্যের ' শক্তি সঞ্চয় করা প্রত্যেক বঙ্গীয় মুসলমানেরই অবশ্য কর্তব্য কর্ম্ম বলিয়া আমাদের বিশ্বাস । ইহাতে বঙ্গভাষারও অঙ্গ বৃদ্ধি হইবে এবং আরবী পারসী প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্য হইতে কত অমূল্য রত্ন ভাষা - ন্তরিত হইয়া বঙ্গ সাহিত্যের বক্ষে মনিমালার ন্যায় দীপ্তি বিকাশ করিবে । " ৪৫

' নবনূরে ' একদিকে হিন্দু লেখকের প্রতি যেমন আক্রমণ ছিল তেমনি হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতিও তাদের কাম্য ছিল । ১৩১০ এর পৌষ সংখ্যায় নবনূর ' মাতৃ - ভাষা ' ও বঙ্গীয় মুসলমান প্রবন্ধে লিখছে , " যে শিক্ষিত হিন্দু সমাজ কংগ্রেস করেন কনফারেন্স এবং বক্তৃতা মঞ্চে মুসলমানকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়া স্বীয় দল - ভুক্ত করিতে চেষ্টা করেন , তাঁহারাই আবার গৃহে আসিয়া শান্ত সমাহিত চিত্তে মুসলমানের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেন । গাছের গোড়া কাটিয়া আগায় জল দেওয়া যাঁহাদের স্বভাব , তাহাদের প্রতি মুসলমান সমাজ কোন সাহসে বিশ্বাস স্থাপন করিবে ? ..... কেবল বাক্য নহে কার্য্য দ্বারা প্রমাণ করুন আপনারা মুসলমানের শুভাকাঙ্খী আপনারা মুসলমানের প্রতি ন্যায্য বিচার করিতে অকুন্ঠিত চিত্ত ..... যদি তাহা সম্ভব হয় , তবে কংগ্রেস ও কনফারেন্স সবই বৃথা , সবই বালকের ক্রীড়া মাত্র – তাহা দেশের দুই বিভিন্ন জাতির পুরাতন সদ্ভাব সংহার করিয়া শত্রুতা বৃদ্ধি করিবার যন্ত্র বিশেষ । " ৪৬

' নবনূরে ' ১৩১১ সালে ওসমান আলী রচিত ' দুমুখো ' নামে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । দুমুখো সাপের সাথে তিনি হিন্দুদের তুলনা করেছেন । তিনি উদাহরণ সহযোগে বলছেন , " দেশে কংগ্রেস হইতেছে , ভারতে এক বিরাট জাতি সংগঠনের জল্পনা কল্পনা , উদ্যম উদ্যোগ হইতেছে , মুসলমানগণ কিন্তু উহাতে যোগ দিতেছেন না । দুমুখো অমনি সুধাবর্ষণ করতঃ বলিতে লাগিল – ভারতে হিন্দু মুসলমান ভ্রাতৃগণ আমাদের সহিত কংগ্রেসে যোগ দাও , দেখিবে সত্বর রাজনীতি সোপান টকাটক অতিক্রম করিয়া ফেলিব , আপন আপন স্বত্ত্বাধিকার বুঝিয়া লইব , দেশের দারিদ্র্যতা ও দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে , সকলেই পরম সুখে জীবন যাপন করি । .... বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ব্যাপারেও বলিতে লাগিল , " বাঙ্গালী জাতি বিভক্ত হইতে চলিয়াছে , বাঙালীর ধর্ম কর্ম আচার ব্যবহার , ভাষা সাহিত্য সমস্তই বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে , অতএব ভাই বঙ্গবাসী মুসলমানগণ তোমরা চুপ করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিও না , আইস আমাদের সহিত মিলিত হও , গভর্ণমেন্টের কার্যের প্রতিবাদ কর নতুবা সমূহ অনিষ্ট পাতের সম্ভাবনা । পাঠক এই সব সুধা মাখা কথাগুলির ভিতর কতটুকু স্বার্থপরতা , কতটুকু খলতা বা কপটতা বিদ্যমান আছে তাহা বুঝিতে পারেন কি ? " ৪৭

' নবনূর ' কংগ্রেসের বিরোধিতা করেছে । আবার বঙ্গভঙ্গ বিরোধী রচনাও পত্রিকায় প্রকাশিত করেছে । ১৩১২ এর আশ্বিন সংখ্যায় এমিন উদ্দীন আহম্মদের ' বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । প্রবন্ধে লেখক বলছেন , " লর্ড কার্জ্জন বাহাদুর বিনা কারণে হঠাৎ এই সৃষ্টি ছাড়া প্রস্তাবের প্রবর্তন করিয়া দেশের শান্তি অপহরণ করিয়াছেন । ..... আমাদের মুসলমান দলপতিগণের সাধারণ মত কি , তাহা এখনও আমরা জানিতে পারি নাই । দেশের মুসলমানগণ অধিকাংশ স্থানেই নূতন প্রদেশ সৃষ্টির প্রতিবাদ করিয়াছেন । সে জন্য মুসলমান সাধারণের মত যে নূতন প্রদেশ সৃষ্টির বিপক্ষে তাহা নিশ্চিত । " ৪৮

১৩১১ সালে ' নবনূরে ' জীবেন্দ্র কুমার দত্ত ' ' হিন্দু মুসলমান মিলন কি

সম্ভব ?' নামে এক প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি বহু যুক্তি উপস্থাপিত করে অন্তিমে এক মিলনের কবিতা লেখেন —

জয় ভারতের জয়,
হিন্দু মুসলমান ভারতের সন্তান
কখনি ভিন্ন নয়
একই মার শোণিত ধার
সৌহার্দ্যে বক্ষে বয়।

'আল এসলাম' পত্রিকাও হিন্দু সমাজ কর্তৃক মুসলমানদের অবহেলায় অসন্তুষ্ট ছিল। আকবর উদ্দীনের 'বর্তমান বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের স্থান' প্রকাশিত হয় ১৩২৩ মাঘ সংখ্যায়। লেখক বলছেন, "বাঙালীর Nationality প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, বাঙালীর গৌরব বর্দ্ধিত করিতে হইলে, কেবল হিন্দুদের ভিতর জাতীয় প্রেরণা দিলেই চলিবে না। মুসলমানের প্রাণের তারের তারে ঝঙ্কার দিতে হইবে তাহাদের মনপ্রাণ মাতাইয়া তুলিতে হইবে। তাহা না করিয়া তোমরা, হিন্দু লেখক-গণ, কেবল নিজের টুকুই বোঝ, নিজেকে লইয়াই ব্যস্ত থাক এবং সেই সঙ্গে আমাদিগকে উপর হইতে বলপূর্বক টানিয়া নীচে নামাইয়া দাও কেন?"

এই কেন র উত্তর খুঁজতে গিয়েই বোধহয় বহু মুসলিম পত্রিকা স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন। ১৩১৩ এর ফাল্গুন সংখ্যায় 'ইসলাম প্রচারক' এক প্রবন্ধ প্রকাশ করে। প্রবন্ধটিতে বিপথগামী হিন্দুদের স্বদেশী আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করা হয়। পত্রিকা মন্তব্য করা হয়, "স্বদেশী ওঁাদের শক্ত স্তব্ধ হইয়াছে। বিলাতী দ্রব্যে দেশ ভরিয়া গিয়াছে। কেবল মাত্র কাগজের প্রপাগান্ডায় ও নেতাদের শুষ্ক বক্তৃতায় স্বদেশী আন্দোলন টিকিয়া আছে। অলীক হিন্দু স্বদেশী আন্দোলন ওঁাহাদের দেবতারই মতো দেখিতে। বাহিরে চাকচিক্য রহিয়াছে, কিন্তু নির্জীব।"

১৩১৪ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ইসলাম প্রচারক লিখল, "বাঙালী হিন্দুরা স্বদেশী আন্দোলনের নামে দরিদ্র ও সরল মুসলমানদের নিপীড়ন করেন। তাঁরা বিলাতী বস্ত্র, চিনি ও লবণ নষ্ট করে ফেলায় মুসলমানদের অনেক বেশী দামে এই সব জিনিষ কিনতে হয়। বাধ্য হয়েই এই কষ্ট তাঁদের স্বীকার করতে হয়। কিন্তু আর কত কাল মুসলমানেরা এই দুর্ভোগ ভুগবেন? জোর করে 'হিন্দু লাইন' অনুসরণ করতে বাধ্য করার ফলেই কুমিল্লা, ত্রিপুরার মগরা ও ছাতিয়ারা, ময়মনসিংহের জামালপুর, দেওয়ান গঞ্জ ও বখসিগঞ্জ অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে।"

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে (বাংলা ১৩১৪ সাল, মাঘ) 'ইসলাম প্রচারক' লেখে, "ন্যায় পথ ভ্রষ্ট হিন্দু স্বদেশী আন্দোলন ইসলামের বিরোধী। ইসলাম ধর্ম কি এই নির্দেশ দেয় যে বিদেশী দ্রব্য আমদানীতে বা বৈদেশিক বানিজ্যে বাধা দাও? না কখনই নয়। এই ধরণের অস্বাভাবিক নির্দেশ ইসলাম ধর্মের পক্ষে দেওয়া কখনই সম্ভব নয়। বরঞ্চ এই ধরণের আচরণ ইসলাম ধর্মের নিকট পাপ বলেই গণ্য।" ৪৯

মুসলিম পত্রিকা 'সোলতান' ও 'দি মুসলমান' (ইংরাজী) বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ছিল। 'ইসলাম প্রচারক' এই দুটো পত্রিকাকে কংগ্রেসের মুখপত্র বলে প্রচার চালাত। কারণ 'সোলতান' তার মুসলমান পাঠকের কাছে বক্তব্য তুলে-ধরেছিল যে হিন্দুদের আর্থিক জীবনে ও শিক্ষায় আত্ম নির্ভরতার উদাহরণ তারাও যেন গ্রহণ করে। "স্বাবলম্বন ও স্বনির্ভরতা ছাড়া মানুষ বড় হতে পারে না। .... আমরা যেন কোন মতেই দেশীয় শিল্প সংস্কৃতিকে না ত্যাগ করি। হিন্দু কিংবা ইংরেজ কেউ আমাদের অগ্রগতিকে বাধা দিতে পারবে না। .... নিজের পায়ে দাঁড়াও ও প্রচেষ্টিত হও উচ্চ শিক্ষার জন্য।" ৫০

" 'The Soltan' stood for a rather different and more qualified kind of support for nationalism. Emphasising quite as much as any communalist the special position and claims of the Muslims, often sharply critical of certain aspects of Hindu behaviour, it at the same time totally rejected the pro-British Political line being put forward from Aligarh and Dacca....... It was a warm supporter of Swadeshi and boycott, though in part it seems because it felt that otherwise the Hindus would steal a march over the Muslims". ৫১

সোলতান ১৯১০ অবধি চলে এবং পরে বন্ধ হয়ে যায়। ১৯২৩ এর এপ্রিল আবার প্রকাশিত হয় ' সোলতান ' । তখন দেখা যায় এই পত্রিকার দৃষ্টি ভঙ্গীতে পার্থক্য দেখা দিয়েছে। ১৯২৩ এর এপ্রিলে ' সোলতান ' মন্তব্য করে " স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে রাজনৈতিক হত্যার সূত্রপাত হয় এবং একদল ভদ্র দস্যুর আবির্ভাব ঘটে। সৌভাগ্য বশতঃ তরুণ মুসলমানেরা এই দস্যুতা , নর হত্যা ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। " ৫২

স্বদেশী আন্দোলনের পরেই বাংলায় এল বিপ্লববাদ। বাংলার দামাল কিশোরের দল সর্বভারতীয় স্তরে পরিকল্পনা রচনা করল দেশকে মুক্ত করতে। পথ ছিল সশস্ত্র। এই বিপ্লবাত্মক আন্দোলন হতেও মুসলিম সমাজ ও পত্র পত্রিকা নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল। তার কারণও ছিল। (১) এরা সরকার বিরোধী যে কোন আন্দোলন এর বিরোধী ছিল। (২) তারা মনে করত সরকার বিরোধী কার্যকলাপ মুসলিম বিরোধী কার্যকলাপ। (৩) তারা মনে করত বিপ্লবী আন্দোলন বা এই উগ্রপন্থা উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদেরই নামান্তর। তাদের ধারণা ছিল তিলক , অরবিন্দ , বঙ্কিমচন্দ্র বা ব্রহ্ম বান্ধবের জাতীয়তায় যে সূত্র তা মুসলমান বিরোধী। যার জন্য ' ইসলাম প্রচারক ' (জ্যৈষ্ঠ , ১৩১৪) মুসলমান যুবকদের হিন্দু সন্ত্রাসবাদীদের সাথে যোগ দিতে নিষেধ করে।

" স্বদেশী আন্দোলনের সময়েই মুসলমানেরা শিল্প বানিজ্য ও কৃষিতে অংশ গ্রহণ করে নিজেদের অবস্থা উন্নত করতে উদ্যোগী হন । এমনকি ' ইসলাম প্রচারক ' আধুনিক শিল্প বিজ্ঞান ও কৃষি সম্পর্কে দক্ষতা অর্জনের জন্য মুসলমান ছাত্রদের ইউরোপ আমেরিকা ও জাপানদেশে প্রেরণের কথাও আলোচনা আলোচনা করে । এই ভাবে স্বদেশী আন্দোলনের অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম মুসলমানদের আর্থিক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র পথে চলতে উৎসাহিত করে । " ৫৩

' মুসলমান ' পত্রিকা চালাতেন মৌলভী মুজিবর রহমান । তাঁর জাতীয়বাদী দৃষ্টি ভঙ্গী ছিল । ' মুসলমান ' ছিল ইংরেজী পত্রিকা । কিন্তু মুসলিম মানসিকতার তিন রূপের উদাহরণের জন্য এই পত্রিকা হতে কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করলাম ।
"The 'Mussalman' was founded with a view to organise Muslim public opinion against the partition of Bengal." ....
The interest of our complex and composite Indian Nationality- a nationality still in the making and therefore requiring delicate nurture and handling on our part, this has been and will continue to be the first interest of the Mussalmans. But we shall be equally zealous, vigilant and in asserting, upholding and safe guarding the rights, privileges and interest of the Mussalman as a community. Nor do we think that there is anything incongruous or mentally contradictory in this our two fold claim." ৫৪

' মুসলমানে ' প্রকাশিত হলো বঙ্গভঙ্গের বিমুদ্ধে প্রতিবাদ , "The ...... inhabitants of district of Faridpur in the new province of Eastern Bengal and Assam respectfully sheweth - that your memorialists feel aggrieved at the partition of Bengal as carried out by the Government Of India by a proclamation of the Ist September, 1905, and earnestly pray that it be

modified or withdrawn" (8/2/1907). ৫৫

কংগ্রেস প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে 'মুসলমান' মন্তব্য করছে, 'The twenty-second Indian National Congress has come and gone. It was the largest National Assembly that has ever been in this country. It is most gratifying to see that the people in general and our co-religionists in particular are taking greater interest in this great Institution year after year. This year the Mahomedans who joined it either as delegates or as visitors were not insignificant and we are glad to note this political awakening on the part of the Indian Mussalmans" (18. 1. 1907) ৫৬

স্বদেশী যুগে বহু উদ্যোক্তাদের বিদেশী দ্রব্য ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়েছিল 'মুসলমান'। তাই তাদের ক্ষোভের কথা প্রকাশ করে মন্তব্য করছে, That example is more potent than precept is well known to all and it is a matter of considerable regret that many people who advocate or preach Swadeshi are not themselves so scrupulous about Swadeshism as they ought to be. They appear to think that their duties lies in advocating or supporting the case only and it does not matter as to what they practise privatly. This smacks of duplicity and insincerety, nay more, if it be judged from strictly moral point of view, it will be found to be more or less dishonesty."(10.5.1907). ৫৭

এই যুগের আরেক পত্রিকা ছিল 'নূর - অল - ইমান'। পত্রিকায় সাহিত্য চর্চা হতো। ১৩০৮ সালের আষাঢ় সংখ্যায় নাছিরুদ্দিন আহম্মদ নামে রাজশাহীর এক কবি 'আবেদন' নামে এক কবিতা লেখেন। ইসলামের মানসিকতা এই কবিতায় একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কবি হিন্দু মুসলমানকে দেশমাতার দুটি চরণ রূপে কল্পনা করেছেন —

" এ ভারত হিন্দুস্থান যেন একজন।
হিন্দু মুসলমান তার দুই পদ হন ॥
এই দুই জাতির উপর ভর দিয়া।
দেশ মাতা উন্নতিতে যাবেন ধাইয়া ॥
এর মাঝে এক পদ খোঁড়া যদি হয়।
আছাড় খাইয়া মাতা পড়িবে নিশ্চয় ॥
উন্নতির পথে চলা বিফল হইবে।
আছাড়ের চোটে মাতা জ্ঞান হারা হবে ॥
শিয়ালে কুকুরে তার মাংস খুলি খাবে।
দেশবন্ধু হিন্দুরা কি খেয়াল করিবে ॥

• • • • •

অষ্টম অধ্যায়

স্বদেশী আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য

১। ইসলামী বাঙলা সাহিত্য — সুকুমার সেন, পৃ: ভূমিকা

২। Mustafa Nurul Islam, Bengali Muslim Public opinion As reflected in Bengali Press 1901 – 1930, Bangla Academy, Dacca, Chapter I.

৩। বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, অমলেন্দু দে, পৃ: ১৭৭ - ৭৮

৪। The Swadeshi Movement in Bengal P –19–20.

৫। পূর্বোক্ত, পৃ: ১৮

৬। পূর্বোক্ত, পৃ: ১৮

৭। পূর্বোক্ত, পৃ: ১৯

৮। কৃষ্ণ কুমার মিত্র – 'আত্ম চরিত', পৃ: ২০৬

৯। বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি – বদরুদ্দিন উমর, পৃ: ১৪

১০। গদ্য শিল্পী মীর মশাররফ – সৌমিত্র শেখর, পৃ: ১৪ - ১৫

১১। রত্নবতী – মীর মশাররফ, রিপ্রেন্ট, পৃ: ১১০

১২। পূর্বোক্ত, পৃ: ১২৪

১৩। আহম্মদ শরীফ, ইংরাজ আমলে মুসলিম মানসের পরিচয়ে সূত্র, সাহিত্য সংস্কৃতি চিন্তা' (ঢাকা ১০৭৬) পৃ: ৪০

১৪। বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি – নাজমা জেসমিন চৌধুরী, পৃ: ২০৭

১৫ । মীর মশাররফ রচনা সম্ভার , ২য় খন্ড , পৃ : ২০৬

১৬ । পূর্বোক্ত , পৃ : ২৮২

১৭ । পূর্বোক্ত , ১ম খন্ড , পৃ : ৩১৯ - ২০

১৮ । গদ্যশিল্পী মীর মশাররফ , পৃ : ২৫

১৯ । আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা , পৃ : ২৪২ - ৪৩

২০ । মীর মশাররফ রচনা সম্ভার , ৫ম খন্ড , পৃ : ৭৩

২১ । মুনীর চৌধুরী ' মীর মানস ' পৃ : ১৮৪

২২ । বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি , পৃ : ২৩৯

২৩ । স্বদেশী যুগে কারা দন্ডিত কবি সিরাজী , শিশির কর , পৃ : ২

২৪ । আল এসলাম , বৈশাখ , ১৩১৭ , পৃ : ৫৩

২৫ । বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা , পৃ : ৩৬০

২৬ । পূর্বোক্ত , পৃ : ১৮৬

২৭ । পূর্বোক্ত , পৃ : ১৯৭ - ৮

২৮ । বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি , পৃ : ২৬০

২৯ । আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা , পৃ : ২৮৬

৩০ । বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি , পৃ : ২৬৭

৩১ । মুসলিম মানস : সংঘাত ও প্রতিক্রিয়া , পৃ : ৪৭

৩২ । Proceedings of the Home Department, October, 1910
সূত্র স্বদেশী যুগে কারাদন্ডিত কবি সিরাজী , পৃ : ১১-১৬

৩৩ । পূর্বোক্ত , পৃ : ১৪ - ১৬

৩৪ । নব্য ভারত , ফাল্গুন , ১৩১২ , ' জ্বলন্ত প্রাণ ' প্রবন্ধ

৩৫ । বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত আধুনিক যুগ , ১৯৫৬ , ঢাকা

৩৬ । মুসলিম মানস : সংঘাত ও প্রতিক্রিয়া , পৃ : ৪৪

৩৭ । আহম্মদ শরীফ ' কালিক ভাবনা ' ঢাকা (১৯৭৪) , পৃ : ১২৪

৩৮ । মহা শ্মশান কাব্য (২য় সংস্করণ) ঢাকা , ১৯৪০ , পৃ : ৮০৩

৩৯ । পূর্বোক্ত , (৩য় সংস্করণ) ভূমিকা , পৃ : ৬২০ - ৬২১

৪০ । মুসলিম মানস : সংঘাত ও প্রতিক্রিয়া , পৃ : ৬৬

৪১ । খাদে আল এসলাম বঙ্গভাষী , বাঙালীর মাতৃভাষা , আল এসলাম , কার্তিক ১৩২২

৪২ । আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা , পৃ : ১৭৮

৪৩ । পূর্বোক্ত , পৃ : ২০৯ - ১০

৪৪ । পূর্বোক্ত , পৃ : ২২১

৪৫ । পূর্বোক্ত , পৃ : ২৭১ - ৭২

৪৬ । পূর্বোক্ত , পৃ : ২৭৭

৪৭ । পূর্বোক্ত , পৃ : ২৭৭ - ৭৮

৪৮ । পূর্বোক্ত , পৃ : ২৮১

৪৯ । বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ , পৃ : ১৮৯

৫০ । সোলতান , ১৩ই সেপ্টেম্বর , ১৯০৭

৫১ । The Swadeshi Movement in Bengal P 438-39.

৫২ । Mustafa Nazrul Islam Bengal Muslim Public Opinion
P - 309 - 310.

৫৩ । বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ , পৃ : ১৯২

৫৪ । Selections from 'The Mussalman' ed. by
Bhuiyan Iqbal - Forward Page.

৫৫ । পূর্বোক্ত , পৃ : ১০৯

০৬ । পূর্বোক্ত , পৃ : ২০

০৭ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৩৩ - ৩৪

।। নবম অধ্যায় ।।

উপসংহার

স্বদেশী যুগের সাহিত্যে আদর্শ প্রেরণা ও জীবন বোধ

সাহিত্য ও আদর্শবোধ

- - - - - - - - - - - - -

যে কোন দেশেই বন্ধ্যা যুগ অতিক্রম করে সেই দেশে আসে নতুন জীবন বোধ এই জীবন বোধ স্বদেশ ও সমাজকে আলোড়িত করে। স্বাভাবিক ভাবে এর প্রভাব প্রতিফলিত হয় সাহিত্যে। জীবন বোধ বা আদর্শ প্রেরণাকে চিরস্থায়ী ধরে রাখার ক্ষেত্রই হচ্ছে সাহিত্য। বাংলায় উনিশ শতকের শেষ ভাগ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের সাহিত্যের ক্ষেত্রগুলি অবলোকন করলে দেখতে পাওয়া যাবে এই জীবন বোধের স্বরূপ। আর এই জীবন বোধের বিকাশ লাভ ঘটেছিল পাশ্চাত্য শাসন ও সংস্কৃতির চেতনায়। এই চেতনায় বাংলার মানুষ নিজেকে উপলব্ধি করতে শিখেছে। এই উপলব্ধি তাদের দিয়েছে আত্ম মর্য্যাদা বোধ। এই আত্ম মর্যাদা যেমন সাহিত্যিকদের নিজস্ব ভাষা ও ভাবনার মাধ্যমে নিজের কথা অন্যকে শোনাতে উৎসাহিত করেছে ঠিক সেইরূপ অন্যের কথা বা অনুভূতির প্রতি এই কথাকারদের জন্মেছে আত্ম প্রত্যয় ও প্রকাশ করার ভাবনা। সেই প্রেরণা স্বদেশ ও স্বরাজ প্রীতি হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। ব্যক্তি চেতনা সম্প্রসারিত হয়ে সমাজ চেতনায় মিশে গেছে, সমাজ চেতনা মিশেছে দেশ চেতনায়।

দেশ তখন পরাধীন। শৃঙ্খলে আবদ্ধ জাতির মনে থাকে মুক্তির বাসনা। সাহিত্যিকের কলম ও দেশ দুটোই যখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিষ্পেষণে বন্দী থাকে তখনই ঘটে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষায় জীবন ও সাহিত্য এক সাথে মিশে যায়। জীবনই হয় সাহিত্য, সাহিত্যই হয় জীবন। এই অনুভবের কালছিল বঙ্গ-ভঙ্গের যুগে স্বদেশী সাহিত্যে।

রবীন্দ্র নাথ বলছেন, " যথার্থ সাহিত্যে যেমন যথার্থ জাতীয় ঐক্যের ফল, তেমনি জাতীয় ঐক্য সাধনের প্রধানতম উপায় সাহিত্য। পরস্পর পরস্পরকে পরিপুষ্ট

করিয়া তোলে যাহা অনুভব করিতেছি তাহা প্রকাশ করিতে পারিব, যাহা শিক্ষা করিতেছি তাহা রক্ষা করিতে পারিব, যাহা লাভ করিতেছি তাহা বিতরণ করিতে পারিব, এমন একটা ক্ষমতার অভ্যুদয় হইলে তাহা সমস্ত জাতির উল্লাসের কারণ হয়।" ১

স্বদেশী যুগে বিভিন্ন ধরণের মানুষ এই মহতী যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের নিজস্ব রুচি অনুযায়ী তাঁরা কর্ম প্রবাহ সৃষ্টি করেছিলেন। বহির্জগতে যখন কোন আন্দোলন ঘটে, তা মানুষের অন্তঃকরণকেও প্লাবিত করে। তাই এই যুগে নিজস্ব বুদ্ধি বিচার অনুযায়ী সকল মানুষ বিভিন্ন কর্মে নিজেদের নিয়োগ করেছিল। যারা একনিষ্ঠ আদর্শবাদী তাঁরা জীবন বোধ বলতে আদর্শই বুঝেছিলেন। সাহিত্যিকেরা চেয়েছিলেন সাহিত্যের অঙ্গনে আদর্শ স্থাপন করতে। কুণ্ঠিতা ভণ্ডামীকে এর সাথে সাথে উন্মোচন করতে। আরেক দল সাহিত্য হতে প্রেরণা পেয়ে সাহিত্যের আদর্শই জীবন গড়ে তুলেছিল। জীবনের সম্পর্ক যেন সাহিত্যের আদলে সম্পর্কিত হয়ে উঠেছিল।

রবীন্দ্র নাথ মন্তব্য করছেন, " সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে মানব জীবন সম্পর্ক। মানুষের মানসিক জীবনটা কোন খানে? যেখানে আমাদের বুদ্ধি এবং হৃদয়, বাসনা এবং অভিজ্ঞতা সবগুলি গলে গিয়ে মিশে একটি সম্পূর্ণ ঐক্য লাভ করেছে। যেখানে আমাদের বুদ্ধি প্রবৃত্তি এবং রুচি সম্মিলিত ভাবে কাজ করে। এক কথায়, যেখানে আসত মানুষটি আছে। সেইখানেই সাহিত্যের জন্ম লাভ হয়।" ২

বঙ্গ সাহিত্যে তথা রাজনৈতিক ইতিহাসের কালখণ্ডে একটি মানুষ স্বকীয় ভাবনায় একটি আদর্শে মানুষে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। তাদের সাহিত্যে হয়তো সাহিত্য গুণ, ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার কাব্যের অভাব থাকতে পারে, কিন্তু যার অভাব ছিল না কোন দিন তা হলো 'আবেগ প্রবণতা' (emotionality) আর এই আবেগ প্রবণতার কারণই ছিল আদর্শ বোধ। যে দেশ পরাধীন থাকে সেই দেশের এক সার্বজনীন আদর্শ বোধ থাকে তা হচ্ছে স্বাধীনতা। এই যুগ সন্ধিক্ষণে এই 'স্বাধীনতা' তাঁদের

আদর্শমুখী জীবন বোধ রচনা করেছিল । কারণ ' স্বাধীনতা ' ছিল তাঁদের জীবন বেদ ।

১৯০৬ সালের ১লা জানুয়ারীতে কলকাতায় যুবরাজের সম্মানে এক ভোজ সভা হয় । সেই সভায় মহামতী গোখলে উপস্থিত ছিলেন । সেই সভাতে যুবরাজ গোখলেকে জিজ্ঞেস করেন , 'Would the peoples of India be happier if you ran country ?" "No, Sir", Mahatma Gandhi's guru replied, "I do not say they would be happier but they would have move sef - respect". ৩

' আত্মসম্মান ' তো স্বাধীনতা ছাড়া আসেনা । বিবেকহীন ভীরুরা স্বাধীনতার মূল্য বোঝে না । কিন্তু যারা স্বাধীনতার মর্ম বোঝে তারা তো জীবন দিতেই প্রস্তুত । স্বাধীনতার স্বর্ণ কমল আত্মত্যাগের রক্ত সরোবরেই প্রস্ফুটিত হয় ।

" স্বাধীনতা বিনিময়ে কি হবে সেই প্রাণ নয়ে
যে ধরে এমন প্রাণ
ধিক বলি তারে
যায় যাক প্রাণ থাক স্বাধীনতা বেঁচে থাক
বেঁচে থাক চিরকাল দেশের গৌরব । "

ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলছেন , "......it should be remembered that sentiment always plays a large part in a revolutionary movement,as the anti-partition agitation undoubtedly was. All revolutions proceed from discontent and grievances, which may be real and resonable or fanciful and imaginary, though more often than not the two elements are mixed in varying proportions. But the depth and sincerity of the discontent and sense of injury is the

real basis of all revolutions, and it is the only instrument which, under capable leaders ensures success in revolution/any struggle." ৪

এই অনুভূতি , এই মানসিকতা স্বদেশী সাহিত্যের এক উদ্দীপনকারী বিষয়বস্তু ছিল । আর এই বিষয়ে যুক্ত হয়েছিল আত্মোৎসর্গের ভাবনা ।

"True literature is a reflex of the mind. There is no doubt that the poems and songs with which Bengal was flooded after 1905 were inspired by the new spirit of sacrifice". ৫

এই ত্যাগের জীবন ব্রতের সাধক ছিলেন তাঁরা । সাহিত্য সাধক ও দেশ সাধকের মধ্যে প্রভেদ ছিল না । " রাজনীতিক বুঝিতে পারেন – দেশকে স্বাধীন না করিতে পারিলে দেশবাসীর কল্যাণ নেই , দেশ প্রেমিক প্রিয় স্বদেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইতে পারেন । কিন্তু সাহিত্যিক তাহারও বড় , কারণ সাহিত্যিক আনিয়া দেন দেশ ভক্তির দর্শন । দেশ প্রাণ সত্যানন্দ বলিতে পারেন , দেশের মুক্তির জন্য জীবন সর্বস্ব বলি দিব । কিন্তু দেশ ভক্তির স্রষ্টা যে সাহিত্যিক তিনিই বলিতে পারেন - জীবন দিলেই হইবে না আরও চাই-ভক্তি । " ৬

" জাতীয় সাহিত্য জাতির আত্মার বানী । জাতীয় সাহিত্য জাতির জাগরণের , জাতির জীবনের পশ্চাতে পশ্চাতে চলে না – জাতিকে আগাইয়া লইয়া যায় । অথবা বলা চলে , জাতির জীবন লইয়া সাহিত্য চলে বটে , কিন্তু সেই জীবনটি যেমন তেমন হওয়া চাই – তাহারই আদর্শ অগ্রে অগ্রে পরিবেষণ করিতে করিতে সাহিত্য আগাইয়া যায় , সেই ঊর্ধ্ব যাত্রার সংকেতে – শঙ্খ ধ্বনির পশ্চাতে পশ্চাতে উজান বাহিয়া লাগে জাতীয় জীবনের ভাব গঙ্গা , জাতির মরা গাঙে বান ডাকে – মৃত

সগর বংশ সঞ্জীবিত হইয়া উঠে । বাঙ্গা সাহিত্যিকদের সাহিত্য সাধনায় অন্ততঃ ঐ যুগে আমরা তাহাই প্রত্যক্ষ করিয়াছি – কিসে আমার জীবন ধন্য হইবে ? " ৭

এই জীবন ধন্য তো মায়ের মুক্তি সাধনার তপস্যায় । এই তপ্যার নামই তো আন্দোলন । " দেশে জাতীয় আন্দোলন চলিতেছে অথচ সাহিত্যে তাহার ছাপ নাই, ইহা বস্তুতঃই অস্বাভাবিক । হয় জাতীয় আন্দোলন মিথ্যা , নয়তো সাহিত্যিক উদাসীন । একটা জাতি রাজনৈতিক মুক্তি চাহিতেছে – চলিয়াছে সংগ্রাম – দুঃখ , কষ্ট , লাঞ্ছনা , মৃত্যু , তথাপি সংগ্রামের শেষ নাই । সাহিত্য সৃষ্টির এইরূপ শ্রেষ্ঠ উপাদান থাকা সত্ত্বেও যদি সাহিত্যিক সেই উপাদান যথাযথ ভাবে কাজে না লাগান , অথবা রাজ শক্তির শাসন দণ্ডের ভয়ে তাহার সাহিত্যিক উদ্যম বাধা পড়ে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে জাতির রাজনৈতিক আশা আকাঙ্খার সঙ্গে সাহিত্যের যে যোগ বাঞ্ছনীয় সাহিত্যিক তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই । স্বদেশী যুগ প্রকৃত পক্ষে স্বদেশী শিল্পের যুগ , স্বদেশী সাহিত্যের যুগ – স্বদেশী সংগীতের যুগ – স্বদেশী দর্শনের যুগ । " ৮ এই যুগ দিয়েই শুরু হয়েছিল প্রকৃত পক্ষে স্বাধীনতার পথ পরিক্রমা ।

স্বদেশী সঙ্গীত ও জীবন বোধ

সঙ্গীত মানুষের আত্মার ধন । সুর মানুষের ইন্দ্রিয় গ্রাহী চেতনার স্রোত । সঙ্গীতের কথা , লয় , সুর , ছন্দ মানুষের জীবনকে গেঁথে দেয় একই সূত্রে । স্বদেশী যুগে দেশকে মাতোয়ারা করেছিল এই স্বদেশী গীতি । " ১৯০৫ সালেই স্বদেশী সংগীতের চূড়ান্ত বিকাশ দেখা যায় । এই গান গুলি কেবল জনপ্রিয় নয় দেশ প্রেমের সাময়িক আবেদন নিবেদনের গন্ডি ছাড়িয়ে গানগুলির কাব্য মূল্য সর্ব দেশের এবং সর্বকালের । " ৯

১৯০৫ এর ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ হলো । সারাদেশ শোকে স্তব্ধ । দেশজুড়ে অরন্ধন । প্রাতঃকালে স্নান করেই শুরু হলো ' রাখি বন্ধন ' । রাখী বন্ধন হয় শ্রাবণী পূর্ণিমায় । কিন্তু জাতি যখন বিপদগ্রস্ত তখন যে কোন দিনই ঐক্যের উৎসব রাখী বন্ধন পালন করা যায় । এই ভাবনায় রবীন্দ্র নাথ রাখী বন্ধনের সূচনা করলেন । ভোরে গঙ্গার ঘাটে স্নান করে সকলেই রঙিন সুতোর রাখি দিয়ে পরস্পরকে বেধে দিতে লাগল । ' রাখি - সংক্রান্তি ' এক পুস্তিকা প্রকাশিত হলো । যামিনী প্রকাশ গাঙ্গুলীর নামে প্রণীত লেখা , দাম দেড় আনা । প্রচ্ছদের ভিতরে দুটি গান বাংলার মাটি বাংলার জল , আরেকটি ' বান ' ' এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে । '

১৬ অক্টোবর , বাংলায় ৩০শে আশ্বিন । অবনীন্দ্র নাথ তাঁর স্মৃতি চারণে লিখছেন , " রওনা হলুম সবাই গঙ্গা স্নানের উদ্দেশ্যে । রাস্তার দুধারে বাড়ির ছাদ থেকে আরম্ভ করে ফুটপাত অবধি লোক দাঁড়িয়ে গেছে — মেয়েরা খৈ ছড়াচ্ছে , শাঁখ বাজাচ্ছে , মহাধুমধাম — যেন এক শোভাযাত্রা । ..... গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে মিছিল চলল —

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুন্য হউক পুন্য হউক পুন্য হউক হে ভগবান ।

এই আন্দোলনে , মিছিলে গীত হতে লাগলো স্বদেশী গানগুলো । ১৯০৫ এর অক্টোবরে জারি হলো কার্লাইল সার্কুলার । ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগ নিষিদ্ধ হলো । ' বন্দেমাতরম ' ধ্বনিও নিষিদ্ধ হলো ।

১৯০৬ এ বরিশালে কংগ্রেসের অধিবেশন বসল । সেই অধিবেশনের স্টেজে মনোরঞ্জন গুহ তাঁর পুত্র চিত্তরঞ্জন গুহকে উপস্থিত করলেন । কপালে তার ব্যান্ডেজ বাঁধা । মনোরঞ্জন গুহ বললেন কি ভাবে পুলিশ তাঁর পুত্রকে ' বন্দেমাতরম ' ধ্বনি দেওয়ার জন্য মেগুলেশন লাঠি দিয়ে প্রহার করেছে ।

"The assult was continued not with standing the helpless condition of the boys who offered no resistance of any kind, but shouted Bandemataram with every stroke of lathi". ১০

পরে চিত্তরঞ্জনের শিল্পীর কল্পনায় এই চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল । ১৯০৬ এর কলকাতা প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছিল । এই প্রদর্শনী উদ্বোধন করেছিলেন লর্ড মিন্টো ।

কালীপ্রসন্নের লেখনীতে হতে নির্গত হলো ' বেত মেরে কি মা ভুলাবি আমরা কি মার সেই ছেলে ' । বাংলার আকাশ বাতাসে এরই সুর । কত না অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর এই গান । ১৯০৭ এর ২৬শে আগষ্ট । বিপিন চন্দ্র পালের বিচার চলছে । আদালতে প্রচন্ড ভীড় । ভীড় সামলাতে শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্ট হুয়ে অকারণ লাঠি চার্জ করছেন । সহ্য করতে না পেরে বিপ্লবী সুশীল সেন হুয়েকে তারই বেটন দিয়ে আঘাত করল । বিচার চলছিল কিংসফোর্ডের আদালতে । ২৭শে আগষ্ট পনের ঘা বেত মারা হলো সুশীল সেনকে । "Each stroke of the whip was resounded with a cry of Bandemataram". । সমগ্র বাংলা যেন গর্জে উঠল এই ঘটনায় । ২৮শে আগষ্ট বিরাট প্রতিবাদ সভা হলো কলেজ স্কোয়ারে । রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথ সম্মান দেখালেন সুশীলের প্রতি স্বর্ণ পদক দিয়ে । সভা শেষে বিরাট মিছিল । সকলের কন্ঠে কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদের গান —

যায় যাবে জীবন চলে
জগৎ মাঝে তোমার কাজে বন্দেমাতরম বলে ।
বেত মেরে কি মা ভোলাবি ,
আমরা কি মার সেই ছেলে ? ১১

শুরু হলো ইংরাজের অত্যাচার । নির্যাতন । হাসিমুখে স্বদেশী যুবকেরা গাইত " বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান " অথবা " ওদের বাধন যতই শক্ত হবে " , কিংবা " এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে জয় মা বলে ভাসা তরী " ।

নলিনী কিশোর গুহ লিখছেন , " বঙ্গভঙ্গ রদ করিতে যখন বিদেশী বর্জনের দারুণ প্রতিজ্ঞা লইয়া পল্লীতে পল্লীতে , নগরে নগরে বাঙলার ছাত্রগণ জোর পিকেটিং চালাইতেছিল , আর প্রৌঢ়গণ বক্তৃতা দ্বারা তাহাতে ইন্ধন যোগাইতেছিলেন , তখনও কিন্তু বাহির-নিরপেক্ষ হইয়া বাঙালী দেশাত্মবোধকে একান্তভাবে আশ্রয় করে নাই — তখনও লর্ড কার্জনের হঠকারিতাই ছিল তাহাদের দেশ সেবার প্রধান উপকরণ । তখন বাঙালী উন্মাদ কন্ঠে গাহিত —

' সাত কোটি লোকের করুণ ক্রন্দন ,
শুনে না শুনিল কুর্জন দুর্জন
তাই , নিতে প্রতিশোধ মনের মতন
করিলাম রাখি বন্ধন । '

তারপর গাহিল —

' নগরে নগরে জ্বালরে আগুন
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ ,
বিদেশী বানিজ্যে কর পদাঘাত
মায়ের দুর্দশা ঘুচাবে তাই । '

শুধু বিদেশী বানিজ্যে পদাঘাত করিলেই যে মায়ের দুর্দশা ঘোচে না — একথা বাঙালীর কাছে তখনও সত্য হইয়া উঠে নাই । কিন্তু দিন দুই যাইতে না যাইতেই বাংলার প্রাণে স্বদেশীর যে শুভ্র ধারা বহিতেছিল , কবি ও সাহিত্যিকদের কন্ঠে তাহা মূর্ত হইয়া উঠিল । .... দেশাত্মবোধের নূতন ধারায় অবগাহন করিয়া গাহিলেন —

' ওগো মা , তোমায় দেখে দেখে
আঁখি না ফিরে
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে । ' ১২

স্বদেশী যুগে রজনীকান্তের ' মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় ' গান-ভাবনা ও জীবনে মোটা কাপড়ের আদর্শ স্বদেশী যুবকদের পেয়ে বসেছিল । তাদের পরণের পোষাক দেখেই বোঝা যেত স্বদেশী বা বিপ্লবী । এ গান ছিল তাদের হৃদয়ের গান । ' সাহিত্য ' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি বলছেন , " কান্ত কবির ' মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় ' নামক প্রাণপূর্ণ গানটি স্বদেশী সংগীতের সাহিত্যের ভালে পবিত্র তিলকের ন্যায় চিরদিন বিরাজ করিবে । বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে আর প্রান্ত পর্যন্ত এই গান গীত হইয়াছে । ইহা সফল গান । যে সকল ক্ষুদ্র প্রাণ প্রজাপতির ন্যায় কিয়ৎকাল ফুলবাগানে প্রাতে সূর্যের মৃদু কিরণ উপভোগ করিয়া মধ্যাহ্নে পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া যায় , ইহা সে শ্রেনীর অন্তর্গত নহে । যে গান দৈববানীর ন্যায় আদেশ করে এবং ভবিষ্যৎ বানীর মতো সফল হয় , ইহা সেই শ্রেনীর গান । " ১৩

স্বদেশী যুগে সংগীতের প্রভাতী জাগরণের কথা স্মরণ করতে গিয়ে নলিনী কিশোর গুহ বলছেন , " গানের অভাব কবি ও গায়কগণ পূরণ করিতে লাগিলেন । ভাব সম্পদে তাহা অতুলনীয় । রবীন্দ্র নাথের তো কথাই নাই , এছাড়া কামিনী ভট্টাচার্য্যের ' জাগো ওগো কাঙালিনী জননী ' , ' অবনত ভারত চাহে তোমারে ' , ' এসো সুদর্শনধারী মুরারী ' .... রজনী কান্তের ' সেথা আমি কি গাহিব গান ' , কাব্য বিশারদের ' স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেনু বলি – রেখো রেখো হৃদে এ ধ্রুব জ্ঞান ' সত্যেন দত্তের ' কোন দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল ? ' একজন অজ্ঞাত নামা কবির ' ভুলো না ভুলো না এদেশের কথা ' , অপর এক অজ্ঞাত কবির ' মেরে সোনেকা হিন্দুস্থান ' আচার্য্য মনোমোহনের ' চলরে চলরে চলরে ও ভাই , জীবন আহবে চল ' , কবি অতুল প্রসাদের ' বল বল বল সবে শত বীনা বেনু রবে ' .... সুন্দরী মোহনের ' চাই না ভব ভিক্ষা , আমরা পেয়েছি নব দীক্ষা ' , দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের ' বঙ্গ আমার জননী আমার ' প্রভৃতি " ১৪

স্বদেশী আন্দোলনের পথ ধরেই এল বিপ্লববাদ । মৃত্যুপাগল দামাল ছেলের দল স্বদেশী গানেই জীবনাদর্শ ও চলার পথ খুঁজে পেয়েছিল । এক বিপ্লবী স্মৃতিচারণ

করছেন , " ক্ষুদিরামের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে । কিন্তু অজ্ঞাত কবির দল — জনগণের চিত্তলোকে ক্ষুদিরামকে বাঁচাইয়া রাখিতে চায় ।

' এবার বিদায় দে মা - ঘুরে আসি —

এই গানটির প্রচলন ছিল খুব । .... ক্ষুদিরাম সম্পর্কে আগরতলার সভাকবি মদন মোহন মিত্রের গানটি উল্লেখযোগ্য । পুলিশ তখন স্বদেশী গানেও বাধা দিতেছে । সভা সমিতি যেমন নিষিদ্ধ — দশজনকে শুনাইয়া স্বদেশী সঙ্গীত করাও তেমনি অসাধ্য , কিন্তু পল্লীর দুইটি কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত ছেলে স্বদেশী গান করিয়াই ভিক্ষা করিত । পুলিশ তাহাদেরও ধমক ধামক দিয়াছে । পুলিশের সাড়া পাইলে ওরা তখন খঞ্জনী বাজাইয়া আবার নিমাই সন্ন্যাসে সুর তুলিয়াছে —

' আমার নিমাই সন্ন্যাসে গেল ভারতীর সনে । '

এ ছাড়া ব্যাধি গ্রস্ত বলিয়াই পুলিশ বেশী কিছু বলিত না । মদন বাবুর রচিত গান গুলি ওরা গাহিয়াছে । তাঁহার রচিত ক্ষুদিরামের গান যে টুকু মনে আছে লিপিবদ্ধ করিতেছি —

' ও ভাই ক্ষুদিরাম , সকলকে ছেড়ে গেলিরে ,
ও ভাই ক্ষুদিরাম ।
গেলিরে স্বর্গপুরে না জানি কত দূরে
ভবসিন্ধুর ওই পারে করিলি বিশ্রাম ।

• • • •

ক্ষুদি তুই প্রাণ দেলি , যে পথ দেখায়ে গেলি
সে পথ বিনে বাঙ্গালী পাবে না আরাম । ' ১০

ক্ষুদিরাম , প্রফুল্ল চাকী চলে গেলেন । চলে গেলেন কানাই লাল । ১৯০৮ এর ১০ই নভেম্বর । কানাই লালের ফাঁসী হলো । " ফাঁসীর দড়ি যে গলায়

পরাইয়া দেয় , সেই সাহেব বলিল , এমন লোক দেখি নাই , কানাইয়ের মৃত দেহ লইয়া শোভা যাত্রা হইল । কানাইয়ের ভস্ম পবিত্র বলিয়া অনেকে গৃহে স্থান দিল । সেই মৃত্যু বাসরে বাঙালী কলিকাতার রাস্তায় কাব্য বিশারদের গানের পদ পরিবর্তন করিয়া গাহিল –

' আমায় ফাঁসী দিয়ে কি মা ভুলাবি
আমি মার সেই ছেলে ? '

এ সমস্ত মরণের কথায় এমন একটা উন্মাদনা তখন সৃষ্টি করিল যে , অনেক যুবক জীবনকে তেমন মরণের জন্যই তৈয়ারী করিতে পারিলে কৃতার্থ হয় । " ১৬

বিপ্লবীরা যেন মহামন্ত্রের গান রচনা করেছিল । " কিন্তু যাহাদের বিপ্লবে পাইয়া বসিয়াছিল ' দেবী আমার , সাধনা আমার , স্বর্গ আমার আমার দেশ ' ইহাই ... মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন । " ১৭

নলিনী কিশোর গুহ তখন ঢাকা জেলে । বিপ্লবীদের দ্বারা ৪০টি সেল পূর্ণ হয়ে গেল । এই জেলে ছিল একটি বালক , ১৪।১৫ বছর বয়স । নাম অবনী গাঙ্গুলী । সে ছিল আদাবাড়ী অস্ত্র আইন মামলায় দণ্ডিত । তবুও তার হাসি মুখ।" এ বয়সে ২।৪ বৎসরের কঠোর কারাবাস , আরো ৫।৭ বৎসর মাথার উপর ঝুলিতেছে , কিন্তু তবু গমদিয়ে , ... গান গায় , কোন স্পেশাল ডায়েট নহে , একেবারে খাসা জেল ডায়েট রোজ খায় , বাড়ী হইতে কোনো তদ্বির তল্লাস নেই , কিন্তু তবু মুখের হাসি বুকের আনন্দ কমে নাই । .... অবনী আমাকে মুকুন্দ দাসের গানটি গাহিতে বলিত এবং শিখিত :

" ভয় কি মরণে – রাখিতে সন্তানে
মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে । " ১৮

উল্লাসকর দত্তর জেল হলো আলিপুরের মামলায়। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। তরুণ উল্লাসকর এজলাসেই গান ধরলেন —

' সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে। '

সমস্ত এজলাস স্তব্ধ। "even the judges and prosecution lawyers paid their respects to the young hero by pausing at the threshold of the court room to let him complete his song".[১২]

দ্বীপান্তর হয়েছিল হেমচন্দ্র কানুনগোর। জীবনের মূল্য স্বাধীনতা, স্বাধীনতা ছাড়া কিছুই জানে না। দেশকে স্বাধীন করার ব্রতে বিঘ্ন ঘটল। দেবীর পূজা সাঙ্গ হলো না।

' না হতে মা বোধন তোমার ভাঙিল রাক্ষস মঙ্গল ঘট,
জাগো রণচণ্ডী জাগো মা আবার, আবার পূজিব চরণ তট। '

হেমচন্দ্র নির্ভীক ভাবে চললেন দ্বীপান্তরের পথে। মুখে গান. —

" বিদায় দয়ে এবে যেতেছি চলিয়া ভাই
কর্ম ক্ষেত্রে শিশু মোরা, ক্ষম যত দোষ তাই।
কত যে রহিল আশা
না পূরিল কর্ম তৃষা,
হৃদয় লুকায়ে জ্বালা কারাবাসে চলে যাই।

ভারতের ছবি আঁকি
হৃদয়ে মাঝারে রাখি
কারাগারে দ্বীপান্তরে পড়িব যেথায় যাই ।
ভারত উদ্ধার ব্রতে ,
না ভুলিব দীক্ষা দিতে
বনের বিহগে ধরি যদি না মানুষ পাই ।
বিধি যদি আসে নিজে
বাধা দিতে হেন কাজে ,
নির্ভয়ে বলিব তারে হেন বিধি নাহি চাই ।
ভারতের নাম করি ,
যাচি দুটি কর ধরি ,
প্রাণ পণে সাধ সবে যাহা মোরা পারি নাই ।
স্বাধীনতা তৃষানল
জ্বলেছে এবে কেবল
প্রজ্বলিত কর তারে স্বার্থাহুতি দিয়ে তায় ।
এ অনল নিভাইতে ,
পারে শুধু এ জগতে
মৃত্যু কিম্বা স্বাধীনতা , জেন অন্য কিছু নাই ।"

হেমচন্দ্র গান গাইতে গাইতে চলেছিলেন আন্দামানের পথে ।
"Hemchandra ..... was singing this song as the prison van carried him with his fellow prisoners down to the riverside where the ship for Andaman awaited them". ২০

চারণ কবি মুকুন্দ দাস গান গাইতেন তাঁর যাত্রার আসরে । মনোমোহন বসুর ' ছেড়ে দাও রেশমী চুড়ি বঙ্গ নারী ' বা ' দশ হাজার প্রাণ যদি আমি

পেতাম ' কিংবা ' সাবধান সাবধান আসিছে নামিয়া ' , মুকুন্দ দাসের গলায় অগ্নিবর্ষী প্লাবনের মতো জনতাকে উদ্দীপ্ত করতো । মুকুন্দ দাসের গান শুনে কত নারী যাত্রার আসরে ' কাচের চুড়ি ভেঙে ' দেশভক্তির নিদর্শন রেখেছিল । মুহূর্তের মধ্যে মুকুন্দ দাসের গানগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলার প্রান্তরে প্রান্তরে । মুকুন্দ দাসের গান "had a tremendous impact even on the hitherto apathetic Muslim masses, and it became a common sight to see the rustic Mohomedans pass the streets of the town with one of Mukunda Babu's song upon their lips". ২১

স্বদেশী যুগের অন্তর ও বাহির একই উদ্দীপনায় মথিত হয়েছিল । ফলে অন্তর প্লাবী এক অপূর্ব কবিত্ব যেন তৎক্ষণাৎ সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণায় আলোকিত করত ।

রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র নাথের ' অয়ি ভুবন মন মোহিনী ' গানটি রচনার প্রেক্ষাপট রবীন্দ্র নাথের বক্তব্য অনুযায়ী তুলে ধরেছেন ,

" একদিন আমার পরলোক গত বন্ধু হেমচন্দ্র মল্লিক বিপিন পাল মহাশয়কে সঙ্গে করে একটি অনুরোধ নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন । তাঁদের কথা ছিল এই যে , বিশেষ ভাবে দুর্গামূর্তির সঙ্গে মাতৃভূমির দেবী রূপ মিলিয়ে দিয়ে তাঁরা শারদীয়া পূজার অনুষ্ঠানকে নূতন ভাবে দেশে প্রবর্তিত করতে চান , তার উপযুক্ত ভক্তি ও উদ্দীপনা মিশ্রিত স্তবের গান রচনা করবার জন্যে আমার প্রতি তাঁদের ছিল বিশেষ অনুরোধ । আমি অস্বীকার করে বলেছিলুম এ ভক্তি আমার আন্তরিক হতে পারে না , সুতরাং এতে আমার অপরাধের কারণ ঘটবে । বিষয়টা যদি কেবলমাত্র সাহিত্য ক্ষেত্রের অধিকার গত হতো তাহলে আমার ধর্ম বিশ্বাস যাই হোক আমার পক্ষে তাতে সংকোচের কারণ থাকত না , কিন্তু ভক্তির ক্ষেত্রে , পূজার ক্ষেত্রে , অনধিকার প্রবেশ গর্হনীয় । .... আমি রচনা করেছিলাম ' ভুবনমন মোহিনী ' । ২২

ভাবের আবেগে তৎক্ষণাৎ গান রচনা করার মতো পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল স্বদেশী যুগে । দ্বিজেন্দ্র লালের জীবনের ক্ষেত্রেও এই উদাহরণ দেখি । " সেদিন ১৬ই

অকটোবর , ৩০শে আশ্বিন , বাঙালীর সেই চির স্মরণীয় অরন্ধন ও রাখী বন্ধনের পুন্যাহ । সকাল বেলায় সাড়ে নটা কি দশটা বাজিয়াছে , এমন সময় কুন্তলীনের হেমমোহন বাবু (এইচ পাল) মহাশয় হঠাৎ দ্বিজেন্দ্র লালের কাছে আসিয়া তাহাকে বলিলেন ' আজ সকালে গোল দীঘিতে একটা প্রকান্ড সভা হবে । সেখানকার জন্য একটা গান লিখে দিন । এখনি চাই । ছাপাতে হবে । ' বসু মহাশয়কে বিদায় দিয়া দ্বিজেন্দ্র লাল তদ্দন্ডেই আমার সম্মুখে বসিয়া অনধিক দশ পনের মিনিটের মধ্যে একটি আশ্চর্য্য রকমের উৎকৃষ্ট অগ্নিগর্ভ গান ঠিক যেন খেলার ছলে রচনা করিয়া ফেলিলেন । " ২৩

এই হৃদয় আবেগ রজনীকান্তেরও ছিল । স্বদেশানুরাগে তাঁর হৃদয় ছিল উদ্দীপ্ত । একবারের ঘটনা , রাজশাহী লাইব্রেরীতে একটি সভা হবে । তার প্রায় এক ঘন্টা পূর্বে কি ভাবে শান্ত কবি রজনীকান্ত গান রচনা করেছিলেন তার বিবরণ জলধর সেন তাঁর স্মৃতি চারণে দিয়েছেন ।

" অক্ষয় বলিল , ' রজনী ভায়া , খালি হাতে সভায় যাইবে । একটা গান বাঁধিয়া লও না । ' রজনী যে গান বাঁধিতে পারিত আমি তাহা জানিতাম না । আমিজানিতাম সে গান গাহিতে পারে । আমি বলিলাম , ' এক ঘন্টা পরে সভা হইবে , এখন কি আর গান বাঁধিবার সময় আছে । অক্ষয় বলিল ' রজনী একটু বলিলেই গান বাঁধিতে পারে । ' রজনী অক্ষয়কে বড় ভক্তি করিত । সে তখন এক - খানি চেয়ার টানিয়া লইয়া অল্পক্ষণের জন্য চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল । তাহার পরেই একখানি গান লিখিয়া ফেলিল । আমি তো অবাক । গানটি চাহিয়া লইয়া পড়িয়া দেখি অতি সুন্দর রচনা । গানটি এখন সর্বজন পরিচিত — ' তব চরণ নিম্নে উৎসব মরী শ্যাম ধরণী সরসা '। " ২৪

কবিরা যেমন আদর্শ নিষ্ঠ ও দেশভক্তির পুন্য প্রবাহে ভাবান্বিত হয়ে ফল্গুধারার মতো লেখনীর মধ্যে দিয়ে জাতীয় ও স্বদেশী গান রচনা করেছিলেন । স্বদেশী ও বিপ্লবী যুবকের দল তাকে আদর্শ করে প্রেরণা গ্রহণ করত এই সঙ্গীত ভাবনা হতে ।

একদিকে বাঙালীর বিলাতী বর্জনের উগ্র চেষ্টা , অপর দিকে লাট ফুলার প্রভৃতির লাঠির আগায় বিলাতী প্রচলনের প্রয়াস — এক দল লোক ' স্বদেশী' অর্থ নূতন করিয়াই বুঝিতে চাহিল । স্বদেশী অপেক্ষা ' স্বদেশী' লাঠিতে আস্থা যেন তাহাদের কিছু বেশী । ' জুড়ে দে ঘরেতে তাঁত , সাজা দোকান , বিদেশে না যায় ভাই গোলারি ধান ' প্রভৃতি স্বদেশ সেবা ও সংগঠন মূলক গান ও উক্তি বাঙালীর প্রাণে তখন আর ভাবের সাড়া তুলিতে পারিল না । কিন্তু ' আয় আজি আয় মরিবি কে ' — আহ্বানে বাঙালীর প্রাণে উন্মাদনা জাগাইল । মরণের কথায় কি রস আছে কে জানে , কিন্তু সেই মরণের ধ্বংসের রুদ্রতালে তরুণ বাঙালীর হৃদয় যন্ত্র নূতন ছন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল । " ২৫

এই মরণ পাগল যুবকের দল দেশ মাতৃকাকে স্বাধীন করতে চেয়েছিল । [illegible] তাদের জীবন রচনা করেছিল । রবীন্দ্র নাথের কবিতায় তারা খুঁজে পেয়েছিল তাদের পথ । বোধহয় রবীন্দ্র নাথ চেয়েছিলেন বিপ্লবীদের পথের এক টি চিত্র আঁকতে —

ঘরের মঙ্গল শঙ্খ , নহে তোর তরে
নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক ,
নহে প্রেয়সীর অশ্রু চোখ ।
পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ ,
শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা
পথে পথে গুপ্ত সর্প গূঢ় ফনা ।
নিন্দা দিবে জয় শঙ্খনাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ । (বলাকা)

বিপ্লবী চিন্মোহন সেহানবীশ বলছেন , বিপ্লবীরা রবীন্দ্র নাথের কাছ থেকে জপমন্ত্র পেয়েছিল ' ঘরের মঙ্গল শঙ্খ তোর তরে নহে ' ..... ।

বিপ্লবীদের পথে পথে ছিল ব্যর্থতা , দ:খের পরিবেশ । মৃত্যুর হাতছানি । " ১৯১০ সালের পর বিপ্লববাদীর পথ বদলে গেল । যশ , প্রতিপত্তি কোন সুধা বা সুবিধা থাকল না । থাকল শুধু নির্যাতন , দ:খ নিন্দা , দারিদ্র । রাজশক্তি পিষে মারতে চেষ্টা করে , আবার নিজের দেশবাসী বলে খুনে ডাকাত । ..... চারিদিকে রুদ্ধদ্বার । তখন বিপ্লবীরা রবীন্দ্র নাথকে স্মরণ করত :

" যদি কেউ আলো না ধরে
ঝড় বাদলে আঁধার রাতে
দুয়ার দেয় ঘরে ,
তবে বজ্রানলে , আপন বুকের পাঁজর
জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চল রে । " ২৬

অনেকে দল ছেড়ে চলে গেল । তবুও বিপ্লবী দল গাইত –

' যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক
আমি তোমায় ছাড়ব না মা । '

" এমনি করিয়াই বিপ্লববাদীরা বল পাইয়াছে ভরসা পাইয়াছে । বাহির হইতে কোন বল কেহ দেয় নাই , তাই এমন করিয়াই কাব্য গাথা , সাহিত্য ধর্ম হইতে তাহারা নিজেদের সান্ত্বনা , সহায় শক্তি সংগ্রহ করিয়াছে । " ২৭

রবীন্দ্র নাথের একটি গান আছে — ' লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া ' । কবি কি উদ্দেশ্যে গানটি লিখিয়াছিলেন কবিই বলিতে পারিতেন , কিন্তু বিপ্লববাদীরা সেই গানের মধ্য দিয়া তাহাদের কথাই শুনিল । কোন কোন বিপ্লব বাদীর মুখে ব্যাখ্যা শুনিয়াছি যে রবীন্দ্র নাথ গানটি লিখিয়াছিলেন নবীন বাঙলার

এই নূতন বিপ্লব পথের যাত্রাকে লক্ষ্য করিয়া। এমনটি দেশে আর হয় নাই, একেবারেই নূতন, তাই কবি লিখিয়াছেন —

' দেখি নাই, কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া।' ২৮

এই ' তরণী বাওয়া ' তে বহু যুবক চিত্তের মনে আন্দোলন আসে। তারাও চেয়েছেন গতিহীনতার কূল ছেড়ে দিয়ে সেই দুর্দম অভিযানে যোগ দিতে। তাদের জীবনের হিসেব মিলুক আর নাই মিলুক তা এই নব অভিযানে সাড়া দিতে চেয়েছে —

' কোন সাগরের পার হতে আনে
কোন সুদূরের ধন।
ভেসে যেতে চায় মন,
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়
সব চাওয়া পাওয়া।'

বিপ্লববাদের পথে রাজশক্তির গর্জন আছে, আছে নিপীড়ন। বিপদের মেঘ সঞ্চিত হয়, তাদের মাথার উপর তবুও তারা ছিন্ন মেঘের মধ্যে হতে সূর্য কিরণের প্রতীক্ষায় থেকেছে —

' দিকে দিকে ঝরিছে ঝর ঝর জল
গুরু গুরু দেয়া ডাকে
মুখে এসে পড়ে অরুণ কিরণ
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।'

গৃহত্যাগী বিপ্লবীর দলকে ভাগ্য বিধাতা কোন পথে দিশা দেবে —

' ওগো শান্তারী , কে গো তুমি , কার
হাসি কান্নার ধন
ভেবে মোর মন
কোন সুরে আজ বাধিবে যন্ত্র
কি মন্ত্র হবে গাওয়া । '

নলিনী কিশোর গুহ বিপ্লবীদের সঙ্গে এই স্বদেশী গান ও কাব্যের যোগ সম্পর্কে বলছেন , " দেশের কাব্য,সাহিত্য , সকলই তাহারা তাহাদের বিপ্লবের দিক হইতে বুঝিতে চাহিত । রবীন্দ্র নাথ তাঁহার গানের বিকৃত অর্থ দেখিয়া হয়তো হাসিতেন , কিন্তু বিপ্লববাদীরা তাহাদের প্রয়োজনে এমন করিয়াই অনেক জিনিস বুঝিয়াছে । " ২৯

নলিনী কিশোর গুহ যখন ' বাংলায় বিপ্লববাদে 'র প্রথম সংস্করণে রবীন্দ্র নাথের গানের ব্যাখ্যা করেছিলেন তা বিশ্ব কবি নিজে দেখেছিলেন । নলিনী কিশোর গুহ সেই প্রসঙ্গ তুলে কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করলে কবি হেসে বলেন ' তোমার ব্যাখ্যা দেখিয়াছি ' । ' ব্যাখ্যা ঠিক হইয়াও বলেন নাই ব্যাখ্যা ভুল হইয়াও বলেন নাই । " ৩০

রবীন্দ্র নাথের ' মরা গাঙে বান এসেছে ' এই গান শুনে রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর মতো মানুষও বলেছেন ' এবার মরা গাঙে বান এসেছে গানটি শুনিয়া তরী ভাসাইব কি , গঙ্গা গর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িতে অনেকের প্রবৃত্তি হইয়াছে । " ৩১

এই স্বদেশী গান জীবনের একাত্ম ভাবে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল । পৃথিবীর বিভিন্ন আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে সঙ্গীত রচিত হয়েছে । কিন্তু সঙ্গীত ও জীবন বোধ এমন ভাবে আর কোথাও যুক্ত হয় নি । গানগুলো যাঁরা গাইতেন তাঁরা অনুভব করতেন কবিরা যেন আমাদের জীবনের জন্য এই গান রচনা করেছেন । সকল কর্মের ও পেশার লোকেরা এই গানে নিজেদের অভিব্যক্তি খুঁজে পেতেন । এবং অভিব্যক্তি ই তাঁদের জীবন বিসর্জনে বিন্দু মাত্র বিচলিত করতো না ।

" আর সত্যই কি এই আত্ম বিসর্জন একেবারেই অকারণ ? নিরর্থক ? বীরের এই রক্ত স্রোত শুধু ধুলায় হারাবার জন্য তো নয় । শত শত শহীদের আত্মাহুতির কথা গুঞ্জরিত হয়েছে দেশবাসীর স্মৃতিতে । ক্ষুদিরামের ফাঁসীর বেদনা বিদ্ধ কাহিনী নিঃসঙ্গ বাউলের কণ্ঠে গান হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে পথে প্রান্তরে । সাধারণ মানুষের অক্ষম রোষতপ্ত অশ্রুজল ঝরেছে বহুকাল । সত্যেন আর কানাই যে ফাঁসীর দড়িটাকে বরমাল্যর মতোই গলায় পরেছিলেন – সে কথা কেই বা ভুলতে পেরেছে ? তাঁদের আত্মোৎসর্গ দেশবাসীর শত শতাব্দীর তন্দ্রা ভেঙে গেছে । শক্তিমান আশায় বুক বেঁধেছে , বীরদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার দুঃসাহস যাদের ছিল না , সেই সব দুর্বল মানুষকেও হতাশায় ভেঙে পড়তে দেয়নি অখ্যাত অবজ্ঞাত চাষী মজুর , কেরানি , শিক্ষক , ছাত্র আর উকিলের দুঃখ বরণের অবিশ্বাস্য কাহিনী । মৃত্যু ভয় আর তাদের কাউকে কাতর করতে পারেনি , কেন না ইতিমধ্যে , ১৯০৫ - ১০ এই বছরগুলিতে , অমৃত - পথ - যাত্রীদের কাছ থেকে জীবন মৃত্যুর গোপন রহস্যটা তারা শিখে নিয়েছিল । " ৩২

তাই কবি ইয়েটস বোধহয় এই বিপ্লবীদেরই দেশের প্রতি অপূর্ব প্রেম ও গানের সাথে প্রেমের আতিশয্যের প্রকাশ দেখে বলেছিলেন –

"And what if excess of love
Bewildered them till they died".

স্বদেশী যুগের শিল্প

স্বদেশী যুগের প্রথম সংকল্পই ছিল নিজের দেশের শিল্প কলকারখানার উৎপাদিত দ্রব্য ব্যবহার করা। স্বদেশী শিল্প গড়ে তুলতে গেলে চাই একদিকে গঠন মূলক মনোভাব অন্যদিকে বিদেশী দ্রব্যের পথ বন্ধ করা। বিদেশী দ্রব্যের পথ বন্ধ করার জন্য শুরু হয়েছিল বয়কট আন্দোলন। ১৯০৫ এর ১৩ই জুলাই ' সঞ্জীবনী ' প্রস্তাব করেছিল ".....in view of the attitude of the government, people should boycott all British goods, observe mournig, and shun all contacts with the officials and official bodies".[৩৩]

দেশের শিল্প কি ভাবে ধ্বংস হচ্ছে কি ভাবে দেশের সম্পদ বিদেশে চলে যাচ্ছে তার চিত্র ও কবির দল আগেই অঙ্কিত করেছিলেন —

(ভাই সব) দেখ বাজার ছেয়ে
আসতেছে মাল বিদেশ হতে,
আমাদের বেচা কেনা পাওনা দেনা
অভাব মোচন পরের হাতে
আমাদের পিতল কাঁসা ছিল খাসা
কাজ চালাতাম কলার পাতে
এখন এনামেলে মাথা খেলে
কলাই করার ব্যবসাতে। (কালীপ্রসন্ন)

কিম্বা মনোমোহন বসুর আঁকা চিত্র —

তাঁতি কর্ম্মকার করে হাহাকার
সূতা যাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার
দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাক আর
হ'ল দেশের কি দুর্দ্দিন।

• • • • •

ছুঁচ সূতা পর্যন্ত আসে তুর্ক হতে
দিয়াশালাই কাঠি তাও আসে পোতে
প্রদীপটি জ্বালিয়ে খেতে শুতে যেতে
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন।'

তাই বয়কটের সাথে বাংলা যেন সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিল —

' এই ভিক্ষা চাই সদনে তোমার
স্বদেশের বস্ত্র কর ব্যবহার
বিদেশীর কিছু করো না গ্রহণ
যদি তুল্য তার দেশে পাওয়া যায়।' (কালীপ্রসন্ন)

এই বয়কটের সাথে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের ফল হলো তীব্র।

"The Swadeshi movement did not come into birth with the agitation for the reversal of the partition of Bengal. It was synchronous with the national awakening which the political movement in Bengal has created. The human mind is not divided into watertight compartments, but is a living organism, and when a new impulse is felt in one particular direction, it affects the whole organism and manifest through out the entire sphere of human activities"." ৩৪

বয়কটের ভাবনায় উদ্দীপ্ত যবকের দল নগ্ন পায়ে শোভা যাত্রা করল। ছাত্রেরা পিকেটিং শুরু করল বিদেশী দ্রব্যের দোকানে। পুলিশের চলল লাঠিচার্জ। বাংলার জনস্রোত এই অত্যাচারে স্তব্ধ হলো না। 'A new spirit was manifested all over the country. It was marked by a high degree of patriotic fervour and religious devotion to motherland..... the spirit of boycott moved the people, both high and law". ৬৫

সর্বত্র দেখা দিল বিদেশী দ্রব্যের প্রতি বিতৃষ্ণা। মৈমনসিংহের মুচিরা সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিল বিটেনের জুতো স্পর্শ করবে না। বরিশালে ওড়িয়া ঠাকুরেরা বা পাচকের দল শপথ গ্রহণ করল বিদেশী দ্রব্য তাদের প্রভুদের দেবে না, রান্না করবে না বিদেশী নুন দিয়ে। কালিঘাটের ধোপারা একযোগে সভা করে প্রস্তাব গ্রহণ করল তারা বিদেশী বস্ত্র ধোবে না। ফরিদপুরেও একই ঘটনা ঘটল।

সুরেন্দ্র নাথ তাঁর স্মৃতি চারণ করে বলছেন, " তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা এতটা বর্ধিত হয়েছিল যে ইতিপূর্বে আমি আর কখনও সেরকম দেখিনি। .... তখন কোন স্কুলে বা কলেজের ছাত্রের পক্ষে ক্লাশে বা কোন বক্তৃতা কক্ষে বিদেশী তৈরী কাপড় পরে যাওয়া ছিল বিপজ্জনক। বিদেশী কাগজে তৈরী কোন খাতা পরীক্ষা গ্রহনের জন্য বিতরণ করা হলে ছাত্ররা তা গ্রহণ করত না। আমার মনে আছে রিপন কলেজিয়েট স্কুলের একটি চতুর্থ শ্রেনীর ছাত্র বিদেশী কাপড়ে তৈরী একটি সার্ট পরে স্কুলে এসেছিল। যেই মাত্র তা অন্য ছাত্রদের নজরে পড়ল সেই মাত্রই তা পিছন দিক থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। ..... এই রকম আরো একটা ঘটনার কথা বলছি। রিপন কলেজের ছাত্রদের পরীক্ষা হচ্ছে, কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের মধ্যে বিদেশী কাগজে তৈরী উত্তর পত্র বিতরণ করেন, কিন্তু ছাত্ররা সে কাগজ স্পর্শও করল না। এত প্রবল ছিল তাদের মনোভাব যে তাকে উপেক্ষা করাও বিপজ্জনক বলে মনে হল। তাই দেশে প্রস্তুত কাগজের ব্যবস্থা করতে হল। তার-পরে যথারীতি পরীক্ষা চলতে থাকে।

"..... ছাত্রদের এই উৎসাহই ক্রমে জনসাধারণের মধ্যে পরিব্যপ্ত হয়ে তাদের মধ্যেও উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলল । এ রকমটি ইতিপূর্বে আর কখনও অনুভূত হয় নি । স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ আমাদের গৃহাঙ্গনেও গিয়ে পৌঁছেছিল । মহিলাদের হৃদয় তা জয় করে ফেলল । মহিলাদের মধ্যে উৎসাহের মাত্রা পুরুষের চেয়ে বেশী করে দেখা দিল । আমার একটি ছোট্ট নাতনীর কথা বলছি , বয়স তার মাত্র পাঁচ বছর । আমার এক আত্মীয় তাকে এক জোড়া জুতো কিনে দিয়েছিল । কিন্তু সে গ্রহণ করল না , কারণ জুতো ছিল বিদেশী । স্বদেশী , স্বদেশী , স্বদেশী , তার আকাশ বাতাস ছেয়ে ফেলল ।

" আমার জীবনে আমি বিপ্লব দেখিনি । ..... কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল বন্যার মধ্যে মনে হয় যেন আমি বিপ্লবী আন্দোলন দেখা দেওয়ার পূর্বে গণ চেতনার মধ্যে যে বিরাট পরিবর্তন ও প্রবল উত্তেজনা দেখা দেয় তার কিছু ধারণা করতে পেরেছি । সে এক অদ্ভুত বিস্ময়কর পরিস্থিতি । বৃদ্ধা যুবা ধনী দরিদ্র , শিক্ষিত - অশিক্ষিত সকলেই সেই উত্তেজনায় ফেলতে দুলতে লাগল , ছটফট করতে লাগল । এমন কি , যেন কি এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ল । কোন যুক্তি নেই , বিচার বিবেচনার বালাই নেই , কেবল মাত্র একটি প্রবল , শক্তি-শালী আবেগ গোটা সমাজের হৃদয়কে আন্দোলিত করে চলল । জীবনের সবকিছুকেই যেন সেই আবেগের দিকে টেনে নিয়ে গেল । একজন খ্যাত নামা ডাক্তার তার এক ছোট্ট রোগিণীর কথা বললেন । মেয়েটির বয়স ৫ বছরের বেশী হবে না । ' স্বদেশী ' আন্দোলনের জোয়ারের সময় রোগের ঘোরে প্রলাপের মধ্যে মেয়েটি চিৎকার করে বলল যে সে কোন বিদেশী ওষুধ খাবে না । ৩৬

শুধু তাই নয় ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা সেই বিবাহে পুরোহিতগিরি বন্ধ করে দিল যেখানে বিদেশী বস্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে । গোঁড়া পণ্ডিতের দল ঘোষণা করল বিদেশী চিনি বিদেশী নুন ভারতের হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে । বিদেশী চিনির প্রসাদ ঠাকুরের

ভোগে চলবে না । বাংলার সংবাদ পত্র বয়কট আন্দোলনকে প্রাণ দিয়ে সাড়া যোগাল । গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ল বয়কট আন্দোলন । মানুষের মুখে মুখে গান ' সেই মোটা সূতোর সঙ্গে মায়ের অপার স্নেহ দেখতে পাই ' । তাই গ্রাম গঞ্জ শহরের প্রতিজ্ঞা " মায়ের নামে এই প্রতিজ্ঞা করবো ভাই , পরের জিনিস কিনবো না , যদি মায়ের ঘরের জিনিস পাই । "এই গানের সুরে যেন আগুন জ্বলে উঠল ।

' নগরে নগরে জ্বালারে আগুন
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ
বিদেশী বানিজ্যে কর পদাঘাত
মায়ের দুর্দশা ঘুচারে ভাই । '

বয়কটের ফলে বিদেশী বানিজ্য আঘাত পেল । ১৯০৫ এর ১৬ ই অক্টোবর বাংলা বিভাগ হয় । সেই সময় আশ্বিন মাস । বাংলায় শারদীয়া উৎসবের ঢেউ থাকে । কিন্তু এবার মায়ের নামে প্রতিজ্ঞা । সুতরাং বিদেশী বস্ত্র বন্ধ । স্টেটসম্যান পত্রিকা মফস্বল শহর গুলোর একটি চিত্র অঙ্কিত করেছিল যাতে দেখা যায় কি ভাবে বিদেশী বস্ত্রের চাহিদা কমেছে : –

জেলা	১৯০৪ এর সেপ্টেম্বর সালে ক্রীত দ্রব্য	১৯০৫ এর সেপ্টেম্বর ক্রীত দ্রব্য
যশোর	৩০ , ০০০ টাকা	২ , ০০০ টাকা
বগুড়া	১ , ৭০০ ,,	২০০ ,,
ঢাকা	১ , ৩০০ ,,	২০০০ ,,
আরা	১ , ৩০০ ,,	২০০ ,,
হাজারীবাগ	১০ , ০০০ ,,	৩০০ ,,

জেলা	১৯০৪ এর সেপ্টেম্বর সালে ক্রীত দ্রব্য	১৯০৫ এর সেপ্টেম্বর ক্রীত দ্রব্য
নদীয়া	১৫, ০০০ টাকা	২, ০০০ টাকা
মালদহ	৪, ০০০ „	১, ৩০০ „
বর্ধমান	৬, ০০০ „	১, ০০০ „

স্টেটসম্যানের বর্ণনা অনুযায়ী কলকাতায় হাটখোলা, শোভাবাজার স্ট্রীট প্রভৃতি অঞ্চলে ১৯০৫ এর সেপ্টেম্বরে বিদেশী লবণের বিক্রী শোচণীয় হয়ে উঠেছিল। কলুটোলা ও ক্যানিং স্ট্রীটের মারওয়াড়ী ও মুসলমান ব্যবসায়ীরা বলেছিলেন যে তাদের ব্রিটেনের সিগারেট ও তামাকের বিক্রী ভীষণ ভাবে কমে গিয়েছিল। জুতো বিক্রেতা ও বিদেশী বস্ত্র নির্মাণের দর্জিদেরও একই অনুভূতি ছিল। যারা গর্বে দোকানের সামনে লিখে রেখেছিল '*এইখানে বিদেশী দ্রব্য পাওয়া যায়*', তারাও স্বদেশী বিক্রী করতে শুরু করে। বিদেশী আমদানী দ্রব্য যাতে ভারতে না আসে তাই বনিকের দল টেলিগ্রাম মারফৎ বার্তা পাঠিয়ে মালের অর্ডার বাতিল করছিল। মারওয়ারী বনিকেরাই বিদেশী বস্ত্র আমদানী করত। অবস্থার পরিবর্তনে 'মারওয়ারী চেম্বারর্স অফ কমার্স' 'ম্যাঞ্চেস্টার চেম্বার্স অফ কমার্সকে' এক তার বার্তা পাঠিয়ে বলল :

We appeal to you to intervene and persuade the Secretary of State o for India do prevent the partition of Bengal which has created a great tension of feeling here. The Bengalees have resolved in numerous public meetings to boycott British goods. The sale of Manchester goods has been practically stopped. We shall be ruined and shall not be able to make future contacts unless the Secretary of State withdraws the partition and the Boycott cases. The matters is very urgent.

Unless the cause is removed in three or four days by countermanding the partition, goods for the puja will remain unsold and the 'Lucky Day' sales will become impossible. Pray help us"."৩৮

এই অবস্থায় ইংরেজরা নিজেদের দ্রব্য জার্মানীতে তৈরী এই ভাবে বিক্রী করার চেষ্টা করেছিল। একটি ইউরোপীয়ান বানিজ্য প্রতিষ্ঠান টেলিগ্রাম বার্তায় বলছে — "Boycott result is disastrous. Boots are not salable : the busy season has closed ; hosiery, hats and waist bangles are also affected. A distinction is being made between English and contenental goods. Japanese imports are doing very well at low prices. One firm has marked their English goods" Made in Germany" and succeeded in selling them"."৩৯

এই অবস্থায় জাগল স্বদেশী শিল্প স্থাপনের ভাবনা। সুরেন্দ্র নাথের ভাষায়, " এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ শিল্পেরও পুনরুজ্জীবন দেখা দিল। নিষ্ঠাবান কর্মীরা নতুন ভাবনা নিয়ে দেশীয় শিল্পের উন্নয়নের কাজে আত্ম - নিয়োগ করলেন। ....' স্বদেশী' আন্দোলনের জমি প্রস্তুত হয়েই রয়েছিল এবং জনগণের মধ্যে যে রাজনৈতিক উদ্দীপনা জেগে উঠে তা স্বদেশী শিল্পের উন্নয়নের জন্য যে উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছিল, তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। ভাবের দিক থেকে স্বদেশী আন্দোলন ছিল আমাদের শিল্পকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার আন্দোলন।

কোন আইন প্রনয়নের ক্ষমতা আমাদের ছিল না , সে ক্ষমতা ছিল অন্যের হাতে । সুতরাং আমাদের গৃহ শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তার চারদিকে শুল্ক প্রাচীর গড়ে তোলার প্রয়োজন হল । " ৪০

ভারতের স্বদেশী বানিজ্যকে ব্রিটেন বহুদিন হতে ধ্বংস করায় প্রবৃত্ত হয়েছিল । রমেশ চন্দ্র দত্ত তার চিত্র এঁকেছেন , "The British manufacturer....... employed the arm of poltical injustice to keep down and ultimately strangle a competition with whom he could not haye contended on equal terms", millions of Indian artisans lost their earnings, the population of India lost one great source of their wealth. It is a painful episode in the history of British rule in India, but is is a story which has to be told to explain the economic condition of the Indian people, and their present helpless dependence on agriculture. The invention of the powerloom in Europe completed and decline of the Indian Industries ; & when in recent years the power-loom was set up in India, England once more acted towards India with unfair jealousy. An excise duty has been imposed on the production of cotton fabrics in Indian which disables the Indian manufacturer from competing with the manufacturer of Japan and China, and which stifles the new steam mills of India"." ৪১

সুতরাং জাতীয় চেতনার সাথে জাতীয় শিল্পও চাই । স্বদেশী আন্দোলন গড়ে তুলল সেই শিল্প । বস্ত্র থেকে আরম্ভ করে প্রসাধন শিল্প গড়ার প্রচেষ্টা চলেছিল ।

বস্ত্র শিল্পে উল্লেখযোগ্য কারখানার নাম হলো বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস (শ্রীরামপুর ও কলকাতায় কারখানা ছিল) , স্বদেশী মিলস (বোম্বাই) , কৃষ্ণ মিলস লিঃ (রাজস্থান , অফিস কলকাতা) , পুনা সিল্কস (পুনা , অফিস কলকাতা) , বেঙ্গল সিল্কস (উল্টাডাঙ্গা, কলকাতা) আসাম ভেলি ট্রেডিং (তেজপুর , আসাম), গোকুল চন্দ্র বসাক (ঢাকা , মসলিন ও শাড়ী) , এম. এল. রক্ষিত (কলকাতা তাঁতের কাপড়) , বয়নাজী ব্রাদার্স (নদীয়া , মসলিন) , বটকৃষ্ণ মান্ এন্ড সন্স (মুর্শিদাবাদ) সিল্কবস্ত্র , বেঙ্গল হোসিয়ারী (কলকাতা) , পি. সি. বোস এবং কোং (কলকাতা) , ন্যাশনাল হোসিয়ারী (কলকাতা) , ক্যালকাটা হোসিয়ারী. স্বদেশী বস্ত্র প্রচারিণী সভা (বারানসী) ইত্যাদি । অন্যান্য প্রসাধন দ্রব্যের কারখানা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম — পি. এম . বাগচী (কলকাতা , কালি , কেশতেল ইত্যাদি) , ইন্ডিয়ান মানুফ্যাকচারিং কোং (কলকাতা , কালি , কেশতেল) , এইচ. এম. নাগ এন্ড সোং (কেশতেল , পাউডার) , ঘোষ ব্রাদার্স (কলকাতা) , প্রসাধন দ্রব্য , এইচ বোস (কলকাতা, দেলখোস ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য) । সাবানের শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল – ওরিয়েন্ট সোপ ফ্যাক্টরী , বীনা সোপ ফ্যাকটরী , দে ব্রাদার্স , ইষ্ট বেঙ্গল সোপ ফ্যাকটরী ইত্যাদি । ঔষধ ও ভেষজ দ্রব্য – বেঙ্গল কেমিক্যল , ইন্ডিয়ান ফার্মাসিউটিক্যল ওয়ার্কস । কাঁচের শিল্প – আপার ইন্ডিয়া গ্লাস ওয়ার্কস , ওরিয়েন্ট গ্লাস ওয়ার্কস , ক্যালকাটা পটারি , পোর্সিলেনের দ্রব্য । জুতোর ও পালিশের কারখানাও গড়ে উঠল । এন. ডি. সরকার এ্যান্ড কোং (কলকাতা), এম. হোসেন এন্ড সন্স (কলকাতা) , বেঙ্গল লেদার ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (কলকাতা) , এস. বোস. এ্যান্ড কোং , ইকুইপমেন্ট ফ্যাকটরী (রাণীগঞ্জ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । দেশলাই এর কারখানার মধ্যে পূর্ণচন্দ্র বসু (হুগলী) , জ্ঞানেন্দ্র নাথ ঘোষ গঙ্গীমাতা দেশলাই (কলকাতা) সিগারেটের কারখানার মধ্যে হিন্দুস্থান সিগারেট সোং (মাদ্রাজ) , গ্লোব সিগারেট কোং (কলকাতা) , স্বদেশী সিগারেট কোম্পানী (কলকাতা) উল্লেখযোগ্য । এছাড়াও বার্লি , বিস্কুট , আটা , দুধ ইত্যাদিরও স্বদেশী কারখানা গড়ে উঠেছিল ।

স্বদেশী ভাবনায় নিজেদের প্রচেষ্টায় কলকারখানা গড়ে তোলার মানসিকতা দেখা দেয়। এই ভাবনার মধ্যে দেশ প্রেমের তীব্রতা ছিল। ছিল দেশ গড়ার আহ্বান। কারণ ইংরেজ শাসনে শোষিত ভারতবাসীর পুঁজিতে গড়া দ্রব্য স্বদেশী বলে চিহ্নিত হতো। " ভারতীয় পুঁজির উদ্যোগে পরিচালিত অর্থনীতির বিকাশে উৎসাহ নিয়ে দেশী পণ্যদ্রব্যের কেনাবেচার অর্থনীতিকে স্বদেশী বলা হত। উনিশ শতকের সাতের দশকে থেকে ব্রিটিশ পুঁজির উদ্যোগে শিল্প-বাণিজ্য ও ব্যবসা প্রসারের দাবি মুখর হতে থাকে। স্বদেশী চিন্তার সূত্রপাত এখান থেকে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় অর্থনৈতিক স্বদেশী চিন্তা রাজনৈতিক চিন্তায় রূপান্তরিত হয়। " ৪২

স্বদেশী যুগের ভাবনা প্রসার করাও ছিল এই স্বদেশী কোম্পানীগুলির লক্ষ্য। শুধুমাত্র তারা যে দ্রব্য বিক্রী করে লাভবান হবে এই উদ্দেশ্য তাদের ছিল না। এইচ বোস এন্ড কোং ছিল এ ধরণের এক প্রতিষ্ঠান। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্র নাথ দ্বিজেন্দ্র লাল, রজনীকান্ত, কালী প্রসন্নের গান হেমেন্দ্র মোহন বোস মোমের তৈরী চোঙা রেকর্ডে (ফনোগ্রাফের সিলিন ড্রিকাল রেকর্ড) ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়ে ছিলেন।

" স্বদেশী গান প্রচার করে হেমেন্দ্র মোহনের মোমের রেকর্ডগুলি এ দেশে প্রথম মুদ্রন ব্যবস্থার আরেকটি জনপ্রিয় জনসংযোগ মাধ্যমকে প্রতিষ্ঠা করেছিল। .... অমৃতলাল বসুর ' সাবাস বাঙালী ' .... সামাজিক নকসায় স্বদেশী জিনিষের প্রচলনকে উৎসাহিত করে একটি গীত বাঁধা হয়েছিল —

" আমার এমন চিকন কেশে
মাখতে মানা মাকেসর।
বিলাতী তেলে চুল ভিজুলে
চোটে যান যে প্রাণেশ্বর।

আমার গাল ধরে আদর কোরে
বলেন ডিয়ার বিনো ,
কিনো না পিয়ারস , পাউডার
ক্রিমেল , গসনেল , পিনো ,
জানিস বিষ বলে বিদেশী জিনিস
ঘর থেকে তফাৎ কর ।।
সোহাগ করে বলে তোমার
থাকবে না আপশোস ,
চুলে দেব কুন্তলীন , রুমালে দেলখোস ,
হবে প্রাণ পরিতোষ , মেখে দিশী
বোসের এসেন্স মনোহর । '

বেঙ্গল কেমিক্যাল , বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল , প্রভৃতির পূর্ববর্তী " দিশী বোসে 'র প্রয়াস সত্যিই অনন্য । সে শুধু দিশী পাগলের দলের দেখতে খারাপ , টিকবে কম , আর দামটা একটু বেশী , এমন জিনিস নিয়ে সাধ্য - বিহীন মহান সাধের স্বপ্ন চারণা নয় । দ্বারকা নাথ ঠাকুরের পর পার ফিউমার এইচ. বোসের রাসায়নিক কারখানাই উৎপাদন কারী হিসাবে বাঙালির প্রথম বড় আকারের ব্যবসা । (সি.কে. সেন , বটকৃষ্ণ পাল ও শিবপুর আয়রণ ওয়ার্কস ইত্যাদির অস্তিত্ব স্বীকার করেও) । " ৪৩

স্বদেশী ব্যবসায়ীরাও ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ দিনে কি ভাবে সাড়া দিয়েছিল অমৃত বাজার পত্রিকার (১৩।১০।১৯০৫) বিজ্ঞাপন দেখে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে —

SIXTEENTH OCTOBER

All my Departments will remain closed on

Tuesday the 16th October

THE TALKING MACHINE HALL

Marble House, Dhurmotolla

KUNTALINE OFFICE

62 Bowbazar

THE BICYCLE OFFICE

65 - 1 Harrison Road

THE KUNTALINE PRESS

5, Shibnarayan Das Lane

H. Bose, Calcutta.

এই বিজ্ঞাপনের সাথে সাথে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি যে তাদের গভীর সমর্থন ছিল তাও প্রকাশ পেত।

এইচ বোসের বাড়ীতেই রবীন্দ্র নাথ গানের রেকর্ড করতে আসতেন। " মনে পড়ে শিব নারায়ণ দাস লেনে হেমেন্দ্র মোহনের বাসভবনে কবি যেদিন রেকর্ডে গান দিতে আসতেন, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের মুখ থেকে সে সরু গলির দুধারে লোক দাঁড়িয়ে যেত। আর আমরা ছেলে বসু মহাশয়ের বাড়িতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম। রেকর্ড নিখুঁত করার জন্য কখনো কখনো রবীন্দ্র নাথ যখন একটি গান দুবার গাইতেন তখন আমাদের সে অপ্রত্যাশিত আনন্দের সীমা থাকত না। ' বন্দেমাতরম ' গানও তিনি রেকর্ড দিয়েছিলেন। বড় দুঃখের কথা স্বদেশী যুগে রবীন্দ্র নাথের তেজদৃপ্ত কণ্ঠের সে উদ্দীপ্ত সংগীতের রেকর্ড প্রায় সবই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। " ৪৪

স্বদেশী আন্দোলনের ভাবনা পৌঁছানোতে এইচ. বোসের অবদান অনেক। " ১৯০৫ এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জোয়ার আসার ঠিক পরেই বোসেস রেকর্ডস ' বন্দেমাতরম ' গান সমেত মূলতঃ দেশাত্মবোধক গান প্রচার করেছে। ... তখন প্রকাশ্যে ' বন্দেমাতরম ' শ্লোগান পুলিশের লাঠি ও কারাবাসের পুরস্কার লাভ করত। ... এই সব ' সিডিশাস ' গান সে যুগে গ্রামোফোন কোম্পানী নিশ্চয়ই প্রচার করতে রাজী হতে পারে না। এমন কি তখন রবীন্দ্র নাথের নিজের গাওয়া স্বদেশী গানগুলির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

" এই বহির্বাস্তবতাই সম্ভবত যন্ত্র কুশলী সংগীত রসিক হেমেন্দ্র মোহনকে স্বদেশী উদ্যোগ হিসাবে রেকর্ডের ব্যবসা শুরু করার প্রাথমিক অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।"

স্বদেশী যুগের বিজ্ঞাপন ও আকর্ষিত করতো সকলকে। দ্রব্যের আগে ' স্বদেশী ' শব্দ ব্যবহার করার প্রচলন তীব্র ছিল। যেমন ' স্বদেশী আলতা ', ' স্বদেশী পাউডার ', ' স্বদেশী কাল স্লেট ' বা ' স্বদেশী বিস্কুট ', ' স্বদেশী সিগারেট ' ইত্যাদি। যেন ' স্বদেশী ' শব্দের মধ্যেই দেশাত্মবোধ লুকিয়ে থাকত। স্বদেশী শিল্পের মধ্যেই মানুষ খুঁজে পেত দেশ প্রেম তৈরীর কারখানা। স্বদেশী শিল্প শুধু স্বদেশী দ্রব্যই উৎপন্ন করেনি, করেছে দেশ-ধর্মে উদ্দীপ্ত ' স্বদেশী মানুষ '। এখানেই স্বদেশী শিল্পের বড় কৃতিত্ব। স্বদেশী শিল্পের উদ্যোক্তারাও একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। স্বদেশী ঢেউ এক বৎসর পর স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। সরকারী অত্যাচার ছিল এর অন্যতম প্রধান কারণ। তবুও সেই বন্ধ কারখানাগুলির নাম আজও লোক দেশপ্রেমের কারখানা বলে মনে করে।

"Swadeshi completely outgrew the original conception of promoting Indian Industry. It assumed a new form based upon the literatconnotation of the word Swadeshi, namely attachment to everything Indian. This development was undoubtedly the result of the newly awakened partitiem and nationalism". ৪৮

এই স্বদেশী জাগরণের ক্ষেত্রে দেশের নেতাদের অবদান ছিল বিশাল। কংগ্রেস তখন দ্বিধা বিভক্ত। নরম পন্থী বা মডারেটদের সাথে চরম পন্থীদের বিরোধ প্রায় সর্বত্র। কিন্তু 'স্বদেশী' সম্পর্কে সকল নেতৃবৃন্দের ভাবনায় অপূর্ব সংহতি ছিল। তাই ১৯০৫ এর বারানসী অধিবেশনে 'স্বদেশী' সকলের সমর্থন পেয়েছিল। জাতীয় স্তরের নেতারা জনগণকে স্বদেশী ভাবনায় দীক্ষিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিপিন চন্দ্র বলছেন, "The accomplishments of the national leaders of this period are many... They made the people of India conscious of the bond of common economic interests and of the existence of a common enemy and thus helped to weld them in a common nationalism. They made the people conscious of their economically precarious and degraded position and the posibility of improvement. They gave a precise nationalist form to in coherent economic aspirations of the people and spread ideas of economic development". ৪৭

তাই স্বদেশী শিল্প উদ্যোগের সাথে ছিল আদর্শ ভাবনা। এই আদর্শ ভাবনা জন্ম গ্রহণ করেছিল সাহিত্য হতে। সেই সাহিত্য স্বদেশী যুগের। কোন কোন ক্ষেত্রে বা তার পূর্ববর্তী রচয়িতাদের। যাঁদের মানস স্বপ্ন ছিল দেশের স্বাধীনতা।

উপসংহার

- - - - - - -

স্বদেশী আন্দোলন এক ঐতিহাসিক ঘটনা। পরাধীন ভারতে দেশকে স্বাধীন করার আকাঙ্খায় বহু আন্দোলন ঘটেছে। আজকের পরিস্থিতিতে এই সব আন্দোলন ইতিহাসের বিষয় বস্তু রূপেই পরিচিত। স্বদেশী যুগে রচিত সাহিত্য কিন্তু আজও অমলিন। একটি যুগকে বিচার করা যায় তার সাহিত্য ভাবনা হতে। সেদিক দিয়ে ইতিহাস ও সাহিত্যের এক সম্পর্ক আছে। স্বদেশী আন্দোলন মানুষের সহজাত আন্দোলন।

এই আন্দোলনের কয়েকটি স্বরূপ আছে । এর মধ্যে আছে আদর্শ বোধ , আছে আদর্শ ভাবনায় ব্যস্ত মানুষ । এই মানুষই স্বদেশী আন্দোলন করেছে । বিপ্লবী হয়ে জীবন বিসর্জন দিয়েছে । আবার সাহিত্যিক হয়ে অনুপ্রেরণায় সাহিত্য রচনা করেছে ।

" মানুষ যখন সত্যকার একলা , ইতিহাস তাকে ছুঁতে পারে না । একক মানুষের অস্তিত্ব আছে , ইতিহাস নেই । মানুষ সামাজিক হলে পরেই ইতিহাস হয় । সামাজিক মানুষও জীবনে যখন নিঃসঙ্গ তখন সে ইতিহাসের বাইরে । " ৪৮ স্বদেশী আন্দোলনে যেমন সামাজিক মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ ভূমিকার ইতিহাস রচনা করেছে তেমনই নিঃসঙ্গ বিপ্লবী কারাগারের প্রকোষ্ঠে এক চিলতে ফোকর দিয়ে নীল আকাশ দেখে মুক্তি বা স্বাধীনতার কথা ভেবে যে আদর্শ বোধ তৈরী করেছে তাও ইতিহাসে রূপান্তরিত হয়েছে ।

জীবনের এক দার্শনিক দৃষ্টি কোন আছে । আছে সামাজিক দৃষ্টি ভঙ্গীও । " জীবন বস্তুটাই বাঁচে বিশেষকে নিয়ে , বিশিষ্টকে ঘিরে । আপনি জন্মস্থানটিকে ভালবাসেন । মা বললে বিশেষ মানুষটিকে মনে পড়ে , তবেই প্রাণ আনচান করে । হিন্দু শাস্ত্রকারেরা ঠিকই বলেছেন : এই বস্তুই মায়া । কিন্তু বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ভয়াল শীতল , নীরবতা থেকে এই ছোট খাট ভালোবাসাগুলিই আপনার ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করে । রাগ অনুরাগের মধ্যে দিয়েই জীবন তৈরী হয় । কিন্তু এই জীবনের মধ্যেই জীবনকে ছড়িয়ে চলার একটা প্রেরণা থাকে ভালবাসা জুড়ায় । সেটাও ভালবাসারই ধর্ম । কিন্তু সেই ছড়িয়ে যাওয়াটুকু আমরা সন্তর্পনে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখি । কৃপনের মতো আপন পর হিসেব করি । এই কার্পন্যের মধ্যে জীবনের প্রতি গভীর আকর্ষণ কাজ করে । মনের সম্বন্ধ গুলি বিস্তার পেলে ব্যক্তিত্বের কেন্দ্র আলগা হয়ে যায় । এই অতি বিস্তারই মৃত্যু । জীবন থেকে এটাই পরবর্তী জন্মের ধাপ । .... এই অন্তর্দৃষ্টি সাহিত্যের । " ৪৯

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাহিত্যিক উপাদানগুলি এই সত্যকে জানান দিয়েছে শুধু মাত্র একটি ঘটনা বা একটি যুদ্ধ বা কোন বিপ্লবকে কেন্দ্র করে । কিন্তু

স্বদেশী যুগের সাহিত্য ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। সাহিত্য সৃষ্টি করেছিল জীবন বোধ। জীবন বোধ সৃষ্টি করেছিল সাহিত্য।

পৃথিবীতে বহু যুগান্তকারী ঘটনা নিয়ে সাহিত্য রচিত হয়েছে। বা সাহিত্যের প্রভাবে যুগান্তকারী ঘটনা সৃষ্টি হয়েছে। ইউরোপীয় বিপ্লবের ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই দৃশ্য দেখা গেছে। ১৭৮৯ এর ফরাসী বিপ্লব বিশ্ব ইতিহাসের এব যুগান্তকারী ঘটনা। এই বিপ্লব পৃথিবীতে প্রচলিত অনেক ধ্যান ধারণার মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। দনিস দিদরো, বুফোঁ, মঁতেস্কু, ভঁ, জ্যাক, রুশো, কিংবা ভলতেয়ার এর রাজনৈতিক চিন্তাধারা সাহিত্যে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই দার্শনিক সাহিত্য রচনা ফরাসী বিপ্লবের বহু আগের ঘটনা। এঁদের রচনা বিপ্লবের কারণ ছিল। একদিন ফরাসী বিপ্লবের প্রাককালে বা পরবর্তী কালে ফরাসী বিপ্লবের সাহিত্য ফেরিওয়ালাদের মাধ্যমে আর জনতার সামনে পাঠের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল। ফরাসী বিপ্লবের গানের বই বেরিয়েছিল ১৭৯২ সালে নাম 'শঁসোনিয়ে পাত্রিয়ত' কিংবা 'শঁসোনিয়ে দ লা মোন্তাই', প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৯৩ এ। ফরাসী বিপ্লবের সময় ফ্রান্সে রাজনৈতিক গান রচনা ঢেউ বয়েছিল। ১৭৮৩ তে ১১৩টি, ১৭৯০ এ ২৬১, ১৭৯১ এ ৩০৮ টি, ১৭৯২ এ ৩২৫ টি, ১৭৯৩ এ ৫৯০ টি, ১৭৯৪ এ ৭০১। সুরে বাঁধা এ সব পরিশীলিত বা অপরিশীলিত কবিতা কাগজে ছাপা হয়ে ও জনসভায় গীত হয়ে, বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে।" ৩৩

নাটকের ক্ষেত্রও ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তীতে জোয়ার আসে। যেমন লুভে দ কুভের 'শার্ল এ কারোলিন'। প্রকাশ ১৭৯০। পিগো লাব্রুঁর কয়েকটি নাটক এবং পিলর্তাঁ মারেশালের 'দ্য জুজম দেরনিয়ে দেরোয়া' প্রকাশিত হয় ১৭৯৩ এ। এমন কি ফেমিনিস্ট লেখিকা ওলাঁপ দ গুজ এর 'মিরাবো ও শঁজেলিজে প্রকাশিত হয় ১৭৯১ এ। প্রায় সব সাহিত্য রচনা বিপ্লবের পরবর্তী কালে। এমন কি গানের দিকে তাকালেও দেখতে পাব বিপ্লবকে অনুপ্রাণিত করে যে সকল গান রচনা হয়েছে তা বিপ্লো - ত্তর কালের। ১৭৮৯ এ গানের তালিকা নেই। বা খোঁজ পাওয়া যায় নি। অর্থাৎ

ফরাসী বিপ্লবের সাহিত্য বিপ্লবের পরবর্তী যুগের। কিছু বা পূর্বর্তী কালের। কিন্তু বিপ্লবের সময়ের সাহিত্য নেই। হয়তো বা সাহিত্য রচনার উপযোগী ক্ষেত্র ছিল না। মিশেল কারিয়ের বলছেন, " বোধহয় সেই টালমাটাল সময় মহান সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে উপযুক্ত ছিল না। হয়ত সাহিত্য সৃষ্টির অবকাশ ছিল না, রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের মধ্যে মনন, মেধা পেয়েছিল তার যথেষ্ট খোরাক। বা এও সম্ভব যে সাহিত্য সৃষ্টি কাজের টেবিলের শান্ত পরিবেশ দাবী করে। যাই হোক ১৭৮৯ এর প্রথা জেনেরো থেকে ১৭৯৯ সালের নেপোলিয়ন বোনাপার্টি এর সামরিক ক্যু পর্যন্ত, নতুন ফ্রান্স প্রসবের চেষ্টায় এই দশ বছর ফরাসী দেশ কোনও উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি করেনি।" ৫১

স্বদেশী সাহিত্যের গতি ছিল ধারাবাহিক। ইংরেজদের যত অত্যাচার বেড়েছে সাহিত্যের পরিধি তত বেড়েছে। জীবন কে মূল্যহীন ভেবে স্বদেশীর চিন্তায় বিভোর সাহিত্যিক দল একদিকে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছেন, সমাজকে পরিচালনা করেছেন অন্যদিকে সাহিত্য রচনা করেছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচার বাংলায় লেখকদের স্তব্ধ করতে পারেনি।

সব দেশেই সাহিত্য সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক উপাদান এর সাথে এসে মিলিত হয়। এবং সাহিত্য দেশ, সমাজ, অর্থনীতি সকল ক্ষেত্রেরই বিবরণ তার প্রভাবে আসে। "The most striking feature of the literature....was its pre occupation with social and national problems in all their complexity, with social criticism and the impact of new ideas on human problems. There was little new in the concern of nineteenth century novelists and poets with social and national problems......But the concern of literature with the predicaments of man in society was not greatly depended, became more widespread throughout the countries of Europe". ৫২

যে কোন দেশের সাহিত্য মানুষকে জাগায় । কিন্তু জাগরণ আত্মিক ও আন্তরিক না হলে মানুষের জাগরণ বুদবুদের মতো মিলিয়ে যায় । " অনেক সময় বাহিরের কোন ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া মানুষ ও জাতি জাগে — কিন্তু যদি সে জাগরণের উপকরণ শেষে নিজের মধ্যেই সে একান্ত করিয়া না পায় তবে তাহার জাগরণ কখনো স্থায়ী হয় না । কারণ বাহিরের তাগিদ , আঘাত তাহাকে বরাবর সজাগ রাখিতে পারে না , কর্মে প্রেরণা দিতে পারে না , তাগিদ আসা চাই ভিতর হইতে , অন্তরের মনিকোঠায় যে আত্ম দেবতা রহিয়াছেন সেইখান হইতে-তবেই তাহা স্বাভাবিক হয় , সত্য হয় , সুতরাং স্থায়ী হয় । " ৩৩

তাই বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলন ছিল , " গোটা জাতির আন্দোলন — গণ আন্দোলন । তাই রবীন্দ্র নাথ হইতে আরম্ভ করিয়া পল্লীর অখ্যাত কবিও সার্থক রচনায় মাতৃ অর্ঘ সাজাইয়াছেন , মিথ্যা যশের জন্য নয় — অন্তর প্রেরণায় । যার যা শক্তি সবই যে দিতে হইবে এই মাতৃ পূজায় । " ৩৪

ভারতবর্ষ পরাধীন কালে বিভিন্ন আন্দোলনাত্মক ঘটনা ঘটেছে । ১৮৫৭ এর সিপাহী বিদ্রোহ (প্রথম জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম) , পরবর্তীতে নীল বিদ্রোহ , বিভিন্ন স্থানে কৃষক বিদ্রোহ , শ্রমিক বিদ্রোহ , গান্ধীজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১ - ২২) , আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০) , ভারত ছাড় আন্দোলন (১৯৪২) , নৌ বিদ্রোহ (১৯৪৬) , নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের আন্দোলন (১৯৪৩ - ৪৫) । এই সব আন্দোলনকে নিয়ে বিভিন্ন ভাবে কিছু সাহিত্য রচিত হয়েছে । কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপ্তি ছিল বিশাল ।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পটভূমিকায় বিভিন্ন উপন্যাস রচিত হয়েছে । মারাঠী ঔপন্যাসিক হরিনারায়ণ আপ্টে রচনা করলেন ' আজচ ' (আজই) । উপন্যাসের সূত্র ছিল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা ও ১৯০১ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন থেকে শুরু হয়েছিল এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু । উপন্যাসে প্রধান চারটি চরিত্রের আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল

কংগ্রেসের মত ও কর্ম পথ। গুজরাতী উপন্যাসিক গোবর্ধন রাম মাধব রাম ত্রিপাঠী উনবিংশ শতকের রাজনৈতিক পরিমন্ডল নিয়ে রচনা করেছিলেন চার খন্ডের ' সরস্বতী চন্দ্র ' (১৮৮৭ - ১৯০১)। সিপাহী বিদ্রোহের চিত্র এতে অঙ্কিত হয়েছে। কন্নাড়া সাহিত্যের বিখ্যাত উপন্যাসিক শিবরাম কারন্থের উপন্যাস ' ঔদার্য উর্ লাললি ' তে আছে বিয়াল্লিশের ভারত ছাড় আন্দোলনের ঢেউ। সমকালীন রাজনৈতিক পরিমন্ডলের বিশাল ক্যানভাসে কে.এম. মুন্সী রচনা করেছেন ' স্বপ্ন দ্রষ্টা ' (১৯২৪ - ২০)। সিন্ধী সাহিত্যের বিখ্যাত উপন্যাসিক সেবক ভোজরাজের উপন্যাস ' আশীর্বাদে ' (১৯০২) এক রাজনৈতিক কর্মীর জীবনের উপর সাহিত্য রচনা করেছেন। বোধহয় লেখকের জীবনের কাহিনীই চিত্রিত। তামিল সাহিত্যে এস পানাই আপ্পা চেট্টিয়ার ' কান্তিমতী ' (১৯২৬) এবং কে.এস ভেঙ্কটরামনের 'দেশভক্ত কুন্দন'এ বিপ্লবী জীবনের চিত্র এসেছে। অসমীয়া সাহিত্যে লক্ষীনাথ বেজবড়ুয়ার ' পদুম কুয়ারী ' (১৯০০), ও রজনী কান্ত বরদলোই এর ' দানদোয়া দ্রোহ ' দুটি উপন্যাসের বিষয় বস্তু মায় মারিয়া বিদ্রোহ ও দানদোয়া বিদ্রোহ। মায় মারিয়া বিদ্রোহের উপর পদ্মনাথ গোহাঁই লিখেছিলেন ' ভানুমতী ' (১৮৯১)। গুজরাতী সাহিত্যে মহিপায়েম নীলকন্ঠ লিখে - ছিলেন ' সধারা জেসাঙ ' (১৮৮০), এবং ' বনরাজ ছাওড়া ' (১৮৮১)। দেশ প্রেম, দেশের প্রতি ঐক্য বোধ, দেশের প্রতি স্বাভিমান জাগানো ছিল লেখকের মনোভাবনা। অকালী আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত হয়েছিল, ভরা সিং এর 'প্রেম নগর ' (১৯০৪)। কিন্তু কোন আন্দোলন সম্পর্কে ধারাবাহিক বিশাল অনু - প্রেরণা মূলক সাহিত্য স্বদেশী যুগের সাহিত্যের মতো গড়ে উঠেনি।

ভারতীয় স্বাধীনতার প্রাণ পুরুষ ছিলেন গান্ধী। গান্ধীকে নিয়ে বহু উপন্যাস বা গ্রন্থ রচিত হয়েছে, গান্ধীবাদের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে। মারাঠা লোটো নিকায়ের ' দড়পশাহী ' (১৯২৬), শিবরামের ' বিষ প্রয়োগ ' (১৯২৮), এক নাথ শিরুড় - কারের ' মহাত্মা গান্ধী শয়তান কি সাধু ' (১৯৩০), কন্কির ' বিমলা ' (১৯২৩), ভাগভূমি ' (১৯৩১), তেলেগু সাহিত্যিক বিশ্বনাথ সত্য নারায়ণের ' বেই পদাবিল্ ' (১৯৩৫) উপন্যাস বা সাহিত্যে গান্ধী জীবন, গান্ধী চরিত্র,

গান্ধী আদর্শের প্রভাব পড়েছে । বাংলার কথা সাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' (১৯৪৬) , তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এর ' মাটি ' তে গান্ধীবাদের দর্শন এসেছে । তবে গান্ধীর জীবন প্রবাহের বা রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই সব সাহিত্যের পরিধি দীর্ঘকালের । গান্ধীজীর যে কোন সত্যাগ্রহ বা আন্দোলনের উম্মাদনায় তাৎ - ক্ষণিক সাহিত্য রচিত হচ্ছে বা ভারতের কোন রাজনৈতিক ঘটনাকে অবলম্বন করে বিশাল সাহিত্য ক্ষেত্রে সাহিত্যিকেরা ঝাঁপ দিয়েছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের সাহিত্যের মতো এ জিনিষ ঘটেনি ।

১৯৪২ এর ঘটনার প্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে সিন্ধী ঔপন্যাসিক ওলি সদার - গ্নীনীর ' ইতিহাদ ' (১৯৪২) , তামিল লেখক কল্কি র ' দেলেমালৈ ইড়াওয়াসি ' (১৯৪২) , মারাঠা ঔপন্যাসিক এস. বি. শাস্ত্রীর ' অমাবস্যা ' (১৯৪২) , এন.এস . কাড়কের ' শকুন্তলা ' (১৯৪৩) , বিয়াল্লিশের পটভূমিতে রচিত হলেও এর বিষয় ছিল জন জাগরণ ও সমাজ পরিবর্তন । ১৯০৫ এর স্বদেশী ভাবনার মতো জীবন প্রভাবী সাহিত্য আর কোন আন্দোলনে দেখা দেয় নি ।

এই স্বদেশী আন্দোলনে " জাতীয় আন্দোলনের কর্মী ও আন্দোলনের চারণ হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছেন । কোথাও বিপ্লবীদের এক পা আগে আসিয়া সাহিত্যিকেরা ক্ষেত্রে পথ দেখাইতেছেন , আবার কোথাও বা বিপ্লবীদের জীবন দানের তপস্যা , দেশ - জননীকে ভালবাসায় শ্রেষ্ঠ মূল্য দানের মহিমা — সাহিত্যিক কে প্রেরণা দিতেছে , বিপ্লবীদের জীবন সাহিত্য সৃষ্টির উপাদান হইয়া উঠিতেছে । কল্পনাকে হার মানাইয়া চলিয়াছে বাস্তব ঘটনা । বাংলার বিপ্লবীদের অভূতোভয় প্রতিমাদের চরণ ছন্দে — সাহিত্যের শতদল ফুটিতে লাগিল । তাই না কবি বলেন : ' দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া । '

" পরবর্তীকালে এমন টি হয় নাই । ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে মহাত্মাজীর আবির্ভাব এবং তাঁহার আন্দোলন - শুধু ভারতে নয় — সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে এক মহান গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন । মহাত্মাজী স্বয়ং তাঁহার আদর্শ ও নীতির জীবন্ত বিগ্রহ । এ ছাড়াও তাঁহার কর্ম ও আদর্শের দর্শন তিনি দান করিয়াছেন , তাঁহার অগ্র

কবির অংশ উহাতে কতটুকু ? এমন যে বাংলা সাহিত্য তাহারও মধ্যে বিরাট অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের রাজনৈতিক সংগ্রাম পদ্ধতি লইয়া সাহিত্য সৃষ্টির তেমন প্রয়াস নাই। স্বদেশী ও বিপ্লব আন্দোলনে বাংলার সাহিত্য - সৃষ্টিতে সাহিত্যের যে চিরন্তন আবেদন দেখি, ছোট বড় অসংখ্য কবি ও সাহিত্যিকের মর্মস্পর্শ লক্ষ্য করি পরবর্তী কালে তেমন দেখি না।" ৩৩

বরং বঙ্গভঙ্গের ও স্বদেশী বিপ্লববাদের প্রেরণায় ভারতের অন্যত্র সাহিত্য গড়ে উঠেছে। কে. নারায়ণ কুরুক্কুল এর মালয়ালম উপন্যাস 'উদয় ভানু' (১৯০৩ - ০৯) 'পরশুরম' (১৯০৭)। এই উপন্যাস লেখাও বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন কালে। দেশীয় রাজ্যের রাজনীতির চিত্র এতে সুন্দর ভাবে প্রকাশিত। মারাঠী ঔপন্যাসিক মাধব যোশীর উপন্যাস 'নলিনী' (১৯২০) উপন্যাসের উদ্দীপনা ও প্রেরণা ছিল বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন। উন্নত লক্ষ্মীনারায়ণের তেলেগু উপন্যাস 'মালপল্লী' (১৯২২) তে আছে বঙ্গভঙ্গ জনিত স্বদেশী যুবকদের চরম পন্থী কার্যকলাপের বিবরণ। মালপল্লী' উন্নত নারায়ণ জেলে বসেই লিখেছিলেন। তাঁর 'সর্ব বিজয়ম' ও হরিজনদের উপর শতাব্দী ব্যাপী অত্যাচারের অবসান ঘটাবার ইতিহাস। মারাঠা ঔপন্যাসিক এস. ভি. কেটকার তাঁর 'পরাগনদা' (রাজনৈতিক পলাতক) (১৯২৬), ও 'আশাবাদী' (১৯২৭) উপন্যাসে স্বদেশী আন্দোলন জনিত পটভূমি হতে উদ্ভূত বিপ্লববাদের সুর ধ্বনিত করেছিলেন। এই সব লেখক যাঁরা বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলন ও বিপ্লববাদ হতে প্রেরণা পেয়েছিলেন তাঁরা সকলেই কোন না কোন আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে জেলে গেছেন। এঁদের সাহিত্য ও জীবন দুটো পরস্পরের পরিপূরক ছিল। যা অন্যত্র দেখা যায় নি।

স্বদেশী যুগের সাহিত্য প্রতিফলিত হয়েছিল জাতির আত্মার বানী। স্বদেশী ও বিপ্লব ভাবনা গোটা জাতির মর্মস্থলকে অধিকার করেছিল। মনিষী বা সাহিত্যিক কেউ নেই প্রাণ প্রবাহী স্রোতধারাতে অবগাহন না করে থাকতে পারেন নি।

এই খানেই স্বদেশী সাহিত্যের সার্বজনীতা । অন্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সাহিত্য রচিত হলেও মানুষের জীবন বোধ রচিত হয় নি । স্বদেশী আন্দোলন মানুষের জীবন বোধ রচনা করেছিল তেমনি জীবনের আদর্শ বোধ হতে সাহিত্য রচিত হয়েছিল ।

রমেশ চন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন "The fight which began on that day never ceased until the British sheathed their sword and granted freedom to India on 15 August, 1947. The history of forty two years centred round the two folds aspects of Swadeshi movement - Boycott and Swadeshi - is one form and another......The begining of the Swadeshi movement marked the end of Pax - Britanaica".[৫৬]

কারণ স্বদেশ অনুপ্রাণিত হয়েছিল স্বদেশী সাহিত্যে । সাহিত্যের অনুপ্রেরণা সার্বজনীন ও চিরন্তন । এই প্রেরণায় প্রস্ফুটিত হয় স্বাধীনতার স্বর্ণ কমল, প্রথমে হৃদ সরোবরে , পরে জাতীয় সরোবরে । এখানেই সাহিত্যের সার্থকতা ।

• • • •

নবম অধ্যায়

উপসংহার

১ । সাহিত্য - রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর , দশম খন্ড , প: সরকার , পৃ : ৪১৩

২ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৩১৪

৩ । Stanley, Wolport, Morley and India 1906-10 California 1967. P - 39.

৪ । History of Freedom Movement Vol II P - 23.

৫ । পূর্বোক্ত , পৃ : ১৩৩

৬ । বাংলার বিপ্লববাদ - নলিনী কিশোর গুহ , পৃ : ১৯

৭ । পূর্বোক্ত , পৃ : ২৮

৮ । পূর্বোক্ত , পৃ : ২৬

৯ । সমকালের বাংলা গান , পৃ : ৩২

১০ । A Nation in Making P - 215.

১১ । ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব - রক্ষিত , পৃ : ২৯

১২ । বাংলার বিপ্লববাদ - পৃ : ২৩ - ২৪

১৩ । কান্ত কবি রজনী কান্ত - নলিনী রঞ্জন পন্ডিত , পৃ : ৭৩ - ৭৪

১৪ । বাংলার বিপ্লববাদ , পৃ : ৩২ - ৩৩

১৫ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৩৩ - ৩৪

১৬ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৪২

১৭ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৩৬

১৮ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৩৮

১৯ । The Swadeshi Movement is Bengal P - 293.

২০ । পূর্বোক্ত , পৃ : ২৯০

২১ । Bengalee , 30 March 1907.

২২ । রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর - সঙ্গীত চিন্তা, পৃ : ২৪০

২৩ । ' দ্বিজেন্দ্র লাল ' - দেবকুমার রায় চৌধুরী , পৃ : ৩৯৯

২৪ । কান্ত কবি রজনী কান্ত - নলিনী রঞ্জন পণ্ডিত , পৃ : ৩৯

২৫ । বাংলার বিপ্লববাদ , পৃ : ৪০

২৬ । নির্বাসিত সাহিত্য - (১ম) পৃ : ১৯

২৭ । বাংলার বিপ্লববাদ , পৃ : ৬৯

২৮ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৭২

২৯ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৭০

৩০ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৭০

৩১ । সুরের গুরু রবীন্দ্র নাথ — কালিদাস নাগ , পৃ : ৩৮

৩২ । ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরম পন্থী পর্ব , পৃ : ১০০ - ৩১

৩৩ । History of Freedom Movement (II) P - 11

৩৪ । A Nation is Making P - 197.
৩৫ । History of Freedom Movement P 15-16.
৩৬ । রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা , পৃ : ২০৫ - ২০৬

৩৭ । History of Freedom Movement P - 55.

৩৮ । Mukherjees Magazine quoted is B. Majumder in his book P - 61-62.

৩৯ । History of Freedom Movement (II) P - 57

৪০ । রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা , পৃ : ২০৭ - ২০৮

৪১ । Economic History of India R. Dutta P - VII

৪২ । ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ – সরল চট্টোপাধ্যায় , পৃ : ১০৭

৪৩ । কারিগরী কল্পনা ও বাঙালী উদ্যোগ – সিদ্ধার্থ ঘোষ , পৃ : ৮৯

৪৪ । অমল হোম - রবীন্দ্র সংগীত স্মৃতি কথা (এক - দুই - তিন) ১০৬৫ , পৃ : ৮৯

৪৫ । কারিগরী কল্পনা ও বাঙালী উদ্যোগ , পৃ : ২০৭

৪৬ । Histry of Freedom Movement P - 36.

৪৭ । The Rise and growth of Economic Nationalism in India P.758.

৪৮ । ইতিহাস ও সাহিত্য – প্রবীন দাশগুপ্ত , পৃ : ১৮

৪৯ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৬০

৫০ । বিপ্লবের সাহিত্য , মিশেল কারিয়ার , দেশ (১৩।৭।৮৯) পৃ : ১১৬

৫১ । পূর্বোক্ত , পৃ : ২১৫

৫২ । Europe Since Nepoleon, David Thomson P 449-50

৫৩ । বাংলার বিপ্লববাদ , পৃ : ২৫

৫৪ । পূর্বোক্ত , পৃ : ২৫

৫৫ । পূর্বোক্ত , পৃ : ২৯

৫৬ । History of Freedom Movement Page - 30.

সংযোজন/ বি

বঙ্গভঙ্গ - স্বদেশী যুগে রাজনৈতিক কারণে নিষিদ্ধ পুস্তকের তালিকা

॥ রাজনৈতিক পুস্তক ॥

লেখকের নাম	পুস্তকের নাম	নিষিদ্ধ নং ও সাল
১। সখারাম দেউস্কর	দেশের কথা	
	তিলকের মোকদ্দমা	২৮৪০ পি . ডি , ২২।৯।১৯১০
২। বারীন্দ্র কুমার ঘোষ	বর্তমান রণনীতি	৪০৮ পি . ডি , ৩০।৪।১৯১০
৩। অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য	মুক্তি কোন পথে ?	২৯৬০ পি , ৮। ৮। ১৯১০
৪। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস	৬৯৬ সি . ডি , ১৭। ৫।১৯১১
৫। দেবী প্রসন্ন রায়চৌধুরী	প্রণব	১১৮০ পি . ডি , ২। ৬।১৯১১
	প্রসূন	বি ১৬৬(৮৬। ১) ২৬।১০।১৯১০
৬। অম্বিকা চরণ গুপ্ত	সুরলোকে স্বদেশ কথা	১৯১১
৭। ভুবন মোহন দাশগুপ্ত	আমরা কোথায় ?	১৯১১
৮। উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ান	ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন	পি . পি .বেন ৬২ , ১৯১০
৯। কানাই দত্ত	সনাতন শিক্ষা	১০৪ - ১০৯ এস . এ .আই/ ৫ , ১৯০৯

অজানা লেখকের পুস্তিকা

লেখকের নাম	পুস্তকের নাম	নিষিদ্ধ নং ও সাল
১০ ।	ওম বন্দেমাতরম	১১৬৯ পি, ১ . ৩ . ১৯১০
১১ ।	' বিদায় দাও মা ' কবিতা লেখা ধুতি	১২. ৩ . ১৯১০
১২ ।	স্বাধীন ভারত	২৪ . ৩ . ১৯১০
১৩ ।	হত্যা নয় যজ্ঞ	২৪ . ৩ . ১৯১০
১৪ ।	ওম বন্দেমাতরম স্বাধীন ভারত	১৩২০ পি.ডি, ২.৬.১৯১১
১৫ ।	ওম বন্দেমাতরম	১৭৩৩ পি.ডি, ১২.১০.১৯১০
১৬ ।	ওম বন্দেমাতরম স্বাধীন ভারত	২২৪ পি.ডি, ২২.৪.১৯১১
১৭ ।	ওম বন্দেমাতরম স্বাধীন ভারত	১৭০০ পি ২৪.৩.১৯১০
১৮ ।	আবার ঘুমাইলে	৭.৩.১৯১১
১৯ ।	ওম বন্দেমাতরম স্বাধীন ভারত মহাকালের আহ্বান	৭.৩.১৯১১
২০ ।	বন্দেমাতরম মা ভাই ! মা ভাই ! মা ভাই !	৭.৩.১৯১১
২১ ।	ওম বন্দেমাতরম স্বাধীন ভারত	১১০৪ পি, ২০.১১.১৯১৫
২২ ।	বন্দে মাতরম	৩১০ পি ১৬.১.১৯১২ (অরিজিনাল)

লেখকের নাম	পুস্তকের নাম	নিষিদ্ধ নং ও সাল	
২৩ ।	বন্দেমাতরম যুগান্তর ও স্বাক্ষরিত বন্দেমাতরম	৬৩৮ পি	১৬.১২.১৯১২
২৪ ।	ওম স্বাধীন ভারত	১৮১৭ পি	৭.৩.১৯১১
২৫ ।	ওম বন্দেমাতরম স্বাধীন ভারত	১৫১৬ পি	২১.২.১৯১৩
২৬ ।	বন্দেমাতরম হরি ওম		২৩.৩.১৯১৩
২৭ ।	মুক্তি মন্ত্র	১২৮৮ পি.ডি	২.৬.১৯১৩
২৮ ।	মহাশক্তি	বি ২২২ - ২৯	২২.১০.১৯১৩
২৯ ।	যুগান্তর , যুগান্তর, যুগান্তর তোমা সবাই মানুষ হ		সেপ্টেম্বর ১৯১৪
৩০ ।	বন্দেমাতরম স্বাক্ষর যুগান্তর	৩১০ পি	১৬.১.১৯১২
৩১ ।	বন্দেমাতরম যুগান্তর	৬৬০৫ পি	১৬.১২.১৯১২
৩২ ।	ওঁম বন্দেমাতরম	১০৬৫ পি	৪.২.১৯১৪
৩৩ ।	জয় বন্দেমাতরম যুগান্তর	২৯৫ পি.ডি	২৬.৪.১৯১৩
৩৪ ।	যুগান্তর	১৭৯৬ পি	১৯.৩.১৯১৩

॥ নিষিদ্ধ নাটকাবলী ॥

লেখকের নাম	পুস্তকের নাম	নিষিদ্ধ নং ও সাল	
১ । গিরিশ চন্দ্র ঘোষ	ছত্রপতি শিবাজী মীর কাসিম সিরাজদৌল্লা	৫৫৯ পি	২৩.১১.১৯১১

লেখকের নাম	নাটকের নাম	নিষিদ্ধ নং ও সাল
৪ । দ্বিজেন্দ্র লাল রায়	রানা প্রতাপ	
৫।	মেবার পতন	১০.৬.১৯১০
৬ ।	দুর্গাদাস	
৭ । ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	দাদাদিদি	১৯১০
৮ । মুকুন্দ দাস	মাতৃপূজা	১১২-১০১ এন.এ.আই জুন, ১৯০৯
৯ । মনো মোহন বসু	হরিশ্চন্দ্র	১০৭ পি.ডি ২.৫.১৯১৬
১০ । হরিপদ চট্টোপাধ্যায়	রণজিতের জীবন যজ্ঞ	৭.৮.১৯১১
১১ । বিদগ্ধশূন্য ভট্টাচার্য্য	একেই বলে বাঙালী সাহেব	
১২ । মনো মোহন গোস্বামী (ছদ্মনাম)	কর্মফল	৭.৮.১৯১১
১৩ । কুঞ্জবিহারী গাঙ্গুলী	মাতৃপূজা	৮০ এন ৭.৮.১৯১১
১৪ । হারাধন রায়	মীরা উদ্ধার	৭৯ এন ১৮.১.১৯১১
১৫ । হারাধন বসু	সুরথ উদ্ধার	৭.৮.১৯১১
১৬ । অতুল কৃষ্ণ মিত্র	পশু শাসন	১৯০৯
১৭ । দাশরথী মুখোপাধ্যায়	সোমনাথ	১৯১০
১৮ । মৃন্ময় নাথ নিয়োগী	চিত্রের ধ্বংস	১৯১২
১৯ । নীলকান্ত রায়	হাম্বির সিংহ	১৯১৫
২০ । মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়	বাঙালীর কথা	১৯১০

স্বদেশী গানের বই বা কাব্য

বইয়ের নাম	লেখক | সম্পাদক	প্রকাশ স্থান	নিষিদ্ধ তারিখ
১। বন্দনা (১) খণ্ড	পূর্ণচন্দ্র দাস	কলকাতা	৮.৮.১৯১০
২। বন্দনা (২) খণ্ড	হরিচরণ মান্না	কলকাতা	৮.৮.১৯১০
৩। স্বদেশ গাথা	কামিনী কুমার ভট্টাচার্য্য	চট্টগ্রাম	৭.৩.১৯১১
৪। অনল প্রবাহ	সৈয়দ মহঃ ইসমাইল হোসেন সিরাজী	কলকাতা	১৯৬০ পি ৮.৮.১৯১০
৫। স্বদেশ গাথা	বিহারী লাল	কলকাতা	বাজেয়াপ্ত হয় নি কিন্তু রোষ নজরে পতিত হয়
৬। স্বদেশ সঙ্গীত	যোগেন্দ্র নাথ শর্মা	কলকাতা	249 AGWB ,,
৭। জাতীয় সঙ্গীত	বি.এন. ঘোষ	কলকাতা	1911 AGWB ,,
৮। দেশের গান	জ্ঞানেন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত	গোয়ালপাড়া, আসাম	,,
৯। জাতীয় সঙ্গীত	এন্টি সার্কুলার সোসাইটি	কলকাতা	,,

বইয়ের নাম	লেখক / সম্পাদক	প্রকাশ স্থান	নিষিদ্ধ তারিখ
১০ । স্বদেশী গান	হিন্দু মেলা	কলকাতা	বোধ সগরে পড়িত
১১ । স্বদেশী সঙ্গীত	চিপিন চন্দ্র চক্রবর্তী	বরিশাল	"
১২ । দেশের গান	নলিনী রঞ্জন ঘোষ	মেদিনীপুর	"
১০ । বন্দেমাতরম	রমনী মোহন দাস	কলকাতা	নিষিদ্ধ নং ৪০ - ০১ এন.এ.আ জুলাই , ১৯০৯
১৪ । বন্দনা (১ম ও ২য় খন্ড)	নলিনী রঞ্জন সরকার	কলকাতা	২৯৬০ পি ৮.১০.১৯১০

উপন্যাস / কথা সাহিত্য

বইয়ের নাম	লেখক	নিষিদ্ধ নং ও সাল
১ । সোফিয়া বেগম	মনীন্দ্র নাথ বসু	১৯৮ পি.ডি ২০.৩.১৯১০
২ । রাখী কঙ্কন	গঙ্গাচরণ নাগ	২৪৬৬ পি.ডি ৩.৯.১৯১০

পত্র পত্রিকা ও অন্যান্য

পত্রিকার নাম	প্রবন্ধ	নিক্ষিপ্ত নং ও সাল
১। সন্ধ্যা, চতুর্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা	সাধের ঘুম কি আর ভাঙ্গিবে না	৪৬৪৮ পি ৭.৮.১৯১১
২। সন্ধ্যা	রামঠেলা	বি ৪৮৪ - ৯ ২৫.১১.১৯১৬
৩। সন্ধ্যা	আবার যাই উঠা ভাই	৭.১.১৯০৮
৪। স্বাধীন ভারত		বি ৬২ - ৬৪ জানুয়ারী ১৯১০
৫। ,,		বি ২২৫ - ৬ জানুয়ারী, ১৯১০
৬। ,,		বি ৩১৪ এপ্রিল, ১৯১০
৭। ,,		বি ১৯৩-৪ মে, ১৯১০
৮। ,,		বি ১৯৯ মে, ১৯১০
৯। ,,		জুলাই ৩৪৭ পার্ট বি ১৯১৪
১০। ,,		সেপ্টেম্বর ৪৭২ পার্ট বি ১৯১৪

পত্রিকার নাম — নিষিদ্ধ নং ও সাল

১১ ! স্বাধীন ভারত — নভেম্বর ২১৮ | ১৯ পার্ট বি ১৯১৪

১২ । ফটোগ্রাফ 'আর্য্যমাতা' এতে ছিল কৃষ্ণবর্মার ও অন্যান্যদের ছবি। রূপক রূপে ব্যবহৃত হয়েছিল ২০০ | পি.ডি ২০.৪

১৩ । ফটোগ্রাফ 'আর্য্যমাতা' নানাফড়ণবিশের ও অন্যান্যদের ছবি, তার সঙ্গে বন্দেমাতরম লিখা। ২০০ পি.ডি ২০.৪.১৯১০

১৪ । কানাইলালের ছবি ১৯০৮ এর ১১ নভেম্বর সংখ্যায় K.V. Seynne & Bros (Bechu Chatterjee Stree
হতে পাঁচ হাজার কপি বাজেয়াপ্ত হয় ।

সংযোজন/খ

বঙ্গভঙ্গ-স্বদেশী যুগে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকদের নির্বাচিত প্রবন্ধ তালিকা

লেখকের নাম	প্রবন্ধের নাম	পত্রিকা । প্রকাশকাল
উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব	তিনশত্রু	বঙ্গদর্শন (শ্রাবণ, ১৩০৮)
	ভারতের অধঃপতন	,, (মাঘ, ১৩০৮)
	হিন্দু জাতির একনিষ্ঠতা	,, (বৈশাখ, ১৩০৮)
চৌধুরী ধীরেন্দ্র নাথ	ভারতের স্বরাষ্ট্র	প্রবাসী (বৈশাখ, ১৩১৪)
	স্বদেশী ও বহিষ্কার	,, (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪)
	প্রজাশক্তির অভিব্যক্তি	,, (আষাঢ়, ১৩১৪)
	ভারতে বৃটিশ শান্তি	,, (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩)
	নব ভারতের স্বদেশ প্রীতি	নব্য ভারত (বৈশাখ, ১৩১২)
	ভারতের রাজনীতি	,, (শ্রাবণ, ১৩১২)
	জয়কালে ক্ষয় নাই মরণ কালে ওষুধ নাই	,, (অগ্রহায়ণ, ১৩১২)
	বঙ্গে নবশক্তির অভ্যুত্থান	,, (আশ্বিন, ১৩১৪)
চৌধুরী প্রমথ	বয়কট ও স্বাধীনতা	ভারতী (আশ্বিন, ১৩১২)
	তেল নুন লকড়ি	,, (মাঘ, ১৩১২)
ঠাকুর জ্যোতিরিন্দ্র নাথ	আবেদন না আত্মহত্যা	ভারতী (আশ্বিন, ১৩১১)
	বিলাতী ভাব ও বিলাতী শিক্ষা	প্রবাসী (ফাল্গুন, ১৩১৪)
	সমসাময়িক ভারত	,, (ক্রমান্বয়ে, ১৩১৪)
	রাষ্ট্রীয় মহাসভা	,, (আষাঢ়, শ্রাবণ ১৩১৩)

লেখকের নাম	প্রবন্ধের নাম	পত্রিকা । প্রকাশকাল
ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ	প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য	
	সভ্যতার আদর্শ	বঙ্গদর্শন (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮)
	হিন্দুত্ব	,, (শ্রাবণ, ১৩০৮)
	ব্যাধি ও প্রতিকার	,, (বৈশাখ, ১৩০৮)
	বর্ণ বিভাগ	,, (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১)
	স্বদেশী সমাজ	,, (ভাদ্র, ১৩১১)
	ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ	,, (বৈশাখ, ১৩১২)
	ব্রত ধারণ	,, (ভাদ্র, ১৩১২)
	রাখী বন্ধন উৎসব	,, (কার্তিক, ১৩১২)
	দেশ নায়ক	,, (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩)
	জাতীয় বিদ্যালয়	,, (ভাদ্র, ১৩১৩)
	দেশহিত	,, (আশ্বিন, ১৩১৩)
	ঘুষাঘুষি	,, (ভাদ্র, ১৩১৩)
দেবী সরলা	সাদা কাজীর বিচার	ভারতী (কার্তিক, ১৩০৯)
	কংগ্রেস ও স্বায়ত্ত শাসন	,, (বৈশাখ, ১৩১২)
	বাঙালীর পরীক্ষা	,, (আশ্বিন, ১৩১২)
দেবী হিরন্ময়ী	মাতৃপূজা	ভারতী (মাঘ, ১৩১২)
দেবী স্বর্ণকুমারী	লর্ড কার্জন ও বর্তমান অরাজকতা	ভারতী (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩)
	আমাদের কর্তব্য	,, (ভাদ্র, ১৩১৩)
	কর্তব্য কোন পথে	,, (পৌষ, ১৩১৩)

লেখকের নাম	প্রবন্ধের নাম	পত্রিকা । প্রকাশকাল
দেউস্কর সখারাম গণেশ	দেশের কথা	হিতবাদী (১৩১১)
	শিবাজীর দীক্ষা	,, (১৩১১)
	শিবাজী	,, (১৩১০)
	বঙ্গীয় হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্মুখ	,, (১৩১৭)
	তিলকের মোকদ্দমা	,, (আশ্বিন, ১৩১৫
পাল বিপিন চন্দ্র	রাজা ও প্রজা	বঙ্গদর্শন (আশ্বিন, ১৩১২)
	বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের অবস্থা	,, (কার্তিক, অগ্রহায়ণ ১৩১২)
	নেশান বা জাতি	,, (শ্রাবণ, ১৩১৩)
	শিবাজী উৎসব	,, (ভাদ্র, ১৩১৩)
	শিবাজী উৎসব ও ভবানী মূর্তি	,, (আশ্বিন, ১৩১৩)
	রাজভক্তি	,, (শ্রাবণ, ১৩১৪)
	কংগ্রেসী কথা	,, (বৈশাখ, ১৩১৩)
	আদর্শ শিক্ষা আদর্শ ও জনবসতির লোক শিক্ষা	,, (শ্রাবণ, ১৩১৯)
	স্বদেশী বা পেট্রিয়টিজম	,, (চৈত্র, ১৩১২)
	ঐক্য	,, (শ্রাবণ, ১৩১৩)
বসু রমেশ চন্দ্র	বিলাতী বুটের আত্মকাহিনী	ভারতী (মাঘ, ১৩০৯)
	কিঞ্চিৎ উত্তম মধ্যম (বিলাতী ঘুষি বনাম দেশী কিল)	,, (কার্তিক, ১৩১৩)

লেখকের নাম	প্রবন্ধের নাম	পত্রিকা । প্রকাশকাল
বসু রাধাকান্ত	কার্তিকেয়ের বক্তৃতা	ভারতী (পৌষ, ১৩১০)
মজুমদার বিজয়চন্দ্র	ইংরেজ স্বার্থ ও দেশের হিত	ভারতী (শ্রাবণ, ১৩১২)
	বঙ্গচ্ছেদে লক্ষ্মী বিষ্ণু সংবাদ	,, (আশ্বিন, ১৩১২)
মুখোপাধ্যায় প্রভাত কুমার	সর্ব বিষয়ে স্বদেশী	প্রবাসী (কার্তিক, ১৩১০)
রায় পৃথ্বীশ চন্দ্র	স্বদেশী সমাজ	
	ব্যাধি ও চিকিৎসা	প্রবাসী (শ্রাবণ, ১৩১১)
রায়চৌধুরী দেবীপ্রসন্ন	গোলামগিরির পরিণতি	নব্যভারত (অগ্রহায়ণ, ১৩১২
	বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ	,, (আষাঢ়, ১৩১০)
	বন্দেমাতরম, ডেমক্রেসি ও দারিদ্র্য সমস্যা	,, (মাঘ, ১৩১০)
	'৭ই আগষ্ট'	,, (আশ্বিন, ১৩১৮)
	৩০শে আশ্বিন	,, (অগ্রহায়ণ, ১৩১৯)
রায় চৌধুরী প্রমথনাথ	কাজ বনাম কথা	প্রবাসী (অশ্বিন, ১৩১২)
শাস্ত্রী শিবনাথ	অনুকরণ ও অনুসরণ	ভারতী (কার্তিক, ১৩১১)

সংযোজন - গ

স্বদেশী ও বিপ্লবী-বিপ্লবকেন্দ্রিক সাহিত্য

উনবিংশ - বিংশ শতকের সাময়িক - পত্র - এর নির্বাচিত তালিকা

সময়কাল

বাংলা - ১২৮৭ - ১৩২২ ইংরাজী - ১৮৮০ - ১৯১৫

১২৮৭ (ইং ১৮৮০)

নাম	প্রকৃতি
১। অপূর্ব রহস্য (মাসিক), সম্পাদক - হরিহর নন্দী	
২। কল্পনা (মাসিক), সম্পাদক - হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	(সাহিত্য পত্রিকা)
৩। কুসুম (মাসিক), সম্পাদক - রাধামাধব হালদার	
৪। কৃতজ্ঞতা-কাব্য (ত্রৈমাসিক), সম্পাদক - অঘোর নাথ ঘোষ - কুসুমোপহার	(সাহিত্য পত্রিকা)
৫। জ্ঞানপ্রভা (মাসিক), সম্পাদক - কুমার উমেশচন্দ্র রায় এবং শ্যামলাল চক্রবর্তী	(সাহিত্য পত্রিকা)
৬। নবতারাবতী (মাসিক), সম্পাদক - ধরণীধর সরকার	
৭। নলিনী (মাসিক), সম্পাদক - নরেন্দ্রনাথ বসু	
৮। নক্ষত্র (মাসিক) , সম্পাদক - বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী	
৯। প্রকৃতি (মাসিক) , সম্পাদক - কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ	
১০। বঙ্গরহস্য (সাপ্তাহিক), পরিচালক - দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়	(সামাজিক পত্রিকা)

নাম	প্রকৃতি
১১। বিষ - বৈরী (মাসিক), সম্পাদক - নন্দলাল সেন	
১২। রহস্য - মঞ্জরী (মাসিক), পরিচালক - কেদার নাথ চট্টোপাধ্যায়	
১৩। পরিদর্শক (সাপ্তাহিক), সম্পাদক - বিপিন চন্দ্র পাল	সাহিত্য

১২৮৮ (ইং ১৮৮১)

১। হালিসহর প্রকাশিকা (সাপ্তাহিক), সম্পাদক - নবীনচন্দ্র মিত্র	(সামাজিক ও রাজনৈতিক পত্রিকা)
২। সদানন্দ (মাসিক), সম্পাদক - হরিহর নন্দী	(সাহিত্য পত্রিকা)
৩। রসিকরাজ (মাসিক)	(সাহিত্য পত্রিকা)
৪। চারুবার্তা (সাপ্তাহিক), সম্পাদক - দীনেশচরণ বসু	
৫। বঙ্গবাসী (সাপ্তাহিক), সম্পাদক - জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়	(সামাজিক ও রাজনৈতিক পত্রিকা)
৬। উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা (মাসিক), প্রকাশক - রাজেন্দ্রলাল দাস-ঘোষ	(সাহিত্য পত্রিকা)
৭। সাহিত্য দর্পন (মাসিক)	
৮। বালক হিতৈষী (মাসিক), পরিচালক - জানকী প্রসাদ দে	(সাহিত্য পত্রিকা)
৯। বঙ্গ - সুহৃদ (মাসিক) , সম্পাদক - অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়	
১০। আর্য্য কাহিনী (সাপ্তাহিক) সম্পাদক - সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়	

১২৮৯ (ইং ১৮৮২)

নাম	প্রকৃতি
১। চিত্তরঞ্জিনী (দ্বৈমাসিক), সম্পাদক - রাজরাজেন্দ্র বসু	(সামাজিক পত্রিকা)
২। অতিথি (মাসিক), প্রকাশক - রায় এন্ড ফ্রেন্ডস	(সামাজিক পত্রিকা)
৩। সুরভি (সাপ্তাহিক), সম্পাদক- যোগীন্দ্রনাথ বসু	(রাজনৈতিক ও সামাজিক পত্রিকা)
৪। বিদুপ (সাপ্তাহিক), সম্পাদক - কালীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	(সাহিত্য ও সামাজিক পত্রিকা)
৫। গোপাল ভাঁড় (মাসিক), সম্পাদক - কিষণলাল বর্ম্মণ	(সামাজিক পত্রিকা)
৬। রামধনু (সাপ্তাহিক), সম্পাদক - সূর্য্যনারায়ণ ঘোষ	(সাংস্কৃতিক পত্রিকা)
৭। সুখসরোজ (মাসিক), পরিচালক - সরোজনাথ মুখোপাধ্যায়	(সাহিত্য পত্রিকা)
৮। বঙ্গবিলাস (মাসিক), পরিচালক - কাশীনাথ চৌধুরী	
৯। সাহিত্য দর্শন (মাসিক)	
১০। দর্পন (মাসিক)	(সামাজিক পত্রিকা)
১১। ভারতবাসী (সাপ্তাহিক)	

১২৯০ (ইং ১৮৮৩)

১। সখা (মাসিক), সম্পাদক- প্রমদাচরণ সেন	(সাহিত্য পত্রিকা)
২। সময় (সাপ্তাহিক), সম্পাদক - জ্ঞানেন্দ্র নাথ দাস	(সাহিত্য রাজনীতি ও সামাজিক পত্রিকা)

নাম	প্রকৃতি
৩। কিরণ (মাসিক), পরিচালক - কালীশচন্দ্র দে	(সাহিত্য পত্রিকা)
৪। নবভারত (মাসিক), সম্পাদক - দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী	(সাহিত্য, সামাজিক ও রাজনৈতিক)
৫। সচিত্র বঙ্গীয় (পাক্ষিক), স্বত্বাধিকারী - তারকনাথ বিশ্বাস রহস্য	(সাহিত্য পত্রিকা)
৬। নন্দের চাঁদ (মাসিক), পরিচালক - পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত	(সাহিত্য পত্রিকা)
৭। ভারত ভূমি (সাপ্তাহিক)	
৮। আন্দোলন (মাসিক), সম্পাদক - শম্ভুনাথকৃষ্ণ মিত্র	
৯। সারস্বত পত্র (সাপ্তাহিক), সম্পাদক - রাজবিহারী দাস	(সামাজিক পত্রিকা)
১০। সঞ্জীবনী (সাপ্তাহিক), দ্বারকা নাথ গাঙ্গুলী কৃষ্ণকুমার মিত্র	সাহিত্য, সামাজিক রাজনৈতিক
১১। আলোচনা (মাসিক)	(সাহিত্য পত্রিকা)

১২৯১ (ইং ১৮৮৪)

১। বৌদ্ধবন্ধু (মাসিক), সম্পাদক - কালীকিঙ্কর মুখুজ্জী	(সামাজিক পত্রিকা)
২। ভুষন্ডী কাকের নক্সা (মাসিক) , প্রকাশক - অম্বিকাচরণ ঘোষক	(সাহিত্য পত্রিকা)
৩। আলোচনা (মাসিক), সম্পাদক - যোগেশচন্দ্র ঘোষ	(সামাজিক পত্রিকা)

নাম	প্রকৃতি
৪। পতাকা (সাপ্তাহিক), সম্পাদক - জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়	
৫। সমাজ সংস্কার (মাসিক), সম্পাদক - বিহারীলাল দাশগুপ্ত	(সামাজিক পত্রিকা)
৬। নবজীবন (মাসিক), সম্পাদক - অক্ষয়চন্দ্র সরকার	(সাহিত্য পত্রিকা)
৭। প্রচার (মাসিক), উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	
৮। কালভৈরব (মাসিক), সম্পাদক - মাখন লাল চক্রবর্তী	(সাহিত্য পত্রিকা)
৯। ভূত (মাসিক)	(সাহিত্য পত্রিকা)

১২৯২ (খৃঃ ১৮৮৫)

নাম	প্রকৃতি
১। ভারত (মাসিক), সম্পাদক - রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	(সামাজিক পত্রিকা)
২। শিল্প পুষ্পাঞ্জলি (মাসিক), সম্পাদক - অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	(সাহিত্য সাংস্কৃতিক পত্রিকা)
৩। সমাজ দীপিকা (মাসিক), সম্পাদক - অক্ষয় কুমার বিদ্যাবিনোদ	(সামাজিক পত্রিকা)
৪। ভক্ত মঞ্জুরী (মাসিক), সম্পাদক - রামচন্দ্র দত্ত	(সামাজিক পত্রিকা)
৫। ভারত - শ্রমজীবী (মাসিক), সম্পাদক - শশিভূষণ বিশ্বাস	(সাহিত্য পত্রিকা)
৬। দৈনিক (প্রাত্যহিক) কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	সংবাদ ও সাহিত্য
৭। কুমারী পত্রিকা (সাপ্তাহিক)	(সাহিত্য সামাজিক পত্রিকা)

নাম	প্রকৃতি
৮। পূর্ব্ববঙ্গবাসী (সাপ্তাহিক)	
৯। ভারত মিহির (মাসিক)	
১০। পল্লীগ্রাম (মাসিক), সম্পাদক - ডঃ যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	
১১। বালক সম্পাদিকা - জ্ঞানদা নন্দিনী দেবী	(সাহিত্য পত্রিকা)

১২৯৩ (ইং ১৮৮৬)

১। উপন্যাস লহরী (মাসিক), সম্পাদক - তারকনাথ বিশ্বাস	(সাহিত্য পত্রিকা)
২। গ্রামবাসী (পাক্ষিক)	(রাজনৈতিক পত্রিকা)
৩। আহমদী (পাক্ষিক), সম্পাদক - আবদুল হামিদ খান আহমদী ইউসুফজয়ী	(সামাজিক পত্রিকা)
৪। বিদূষক (মাসিক), সম্পাদক - কালীকিঙ্কর আর্য্যরত্ন	
৫। দ্বৈভাষিকী (মাসিক), সম্পাদক -	(রাজনৈতিক ও সাহিত্য পত্রিকা)
৬। বাসন্তী (মাসিক), সম্পাদক - ব্রজনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	

নাম	প্রকৃতি

১২৯৪ (ইং ১৮৮৭)

১। গান ও গল্প (পাক্ষিক), সম্পাদক - মতিলাল বসু (সাহিত্য সংস্কৃতি পত্রিকা)

২। বিভা (মাসিক), চারুচন্দ্র ঘোষ (সাহিত্য পত্রিকা)

৩। সংসার দর্পন (মাসিক), সম্পাদক - কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্য ও সামাজিক পত্রিকা)

৪। জগৎবাসী (সাপ্তাহিক), সম্পাদক - রাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ

৫। অনুসন্ধান (পাক্ষিক), সম্পাদক - দুর্গাদাস লাহিড়ী (সামাজিক পত্রিকা)

৬। কর্ণধার (মাসিক), সম্পাদক - হারাণ রক্ষিত ,,

৭। সাধারণী (সাপ্তাহিক), সম্পাদক - অক্ষয় চন্দ্র সরকার ,,

১২৯৫ (ইং ১৮৮৮)

১। পাগলিনী (মাসিক), প্রকাশক - লালমোহন বিশ্বাস (সাহিত্য পত্রিকা)

২। বিরহিণী (মাসিক), সম্পাদিকা - শৈলবালা দেবী (সাহিত্য পত্রিকা)

৩। শিক্ষা (মাসিক) , সম্পাদক - প্রিয়নাথ বসু

৪। বিবেক (পাক্ষিক), (সামাজিক পত্রিকা)

৫। সারস্বত প্রসূনাঞ্জলি (মাসিক), সম্পাদক - অঘোরনাথ ঘোষ (সামাজিক পত্রিকা)

নাম	প্রকৃতি

১২৯৬ (ইং ১৮৮৯)

১। সাহিত্য রত্ন ভান্ডার(মাসিক), সম্পাদক - কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সাহিত্য পত্রিকা)

২। পরীক্ষা (মাসিক), সম্পাদক - হৃদয়নাথ মৈত্র ও পন্ডিত বৈদ্যনাথ বিদ্যানিধি (সাহিত্য রাজনীতি পত্রিকা)

৩। সাহিত্য কল্পদ্রুম(মাসিক), সম্পাদক - শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য (সাহিত্য পত্রিকা)

৪। দরিদ্র রঞ্জন (মাসিক), সম্পাদক - চুনীলাল মিত্র (সাহিত্য পত্রিকা)

৫। আনন্দ (মাসিক), সম্পাদক - কেদারনাথ ঘোষ

৬। শিক্ষা প্রচার (মাসিক), সম্পাদক - শরৎ চন্দ্র চৌধুরী (শিক্ষা ও সাহিত্য পত্রিকা)

১২৯৭ (ইং ১৮৯০)

১। সাহিত্য (মাসিক), সম্পাদক - সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (সাহিত্য পত্রিকা)

২। আশালতা(মাসিক), সম্পাদক - কুঞ্জবিহারী দে (সাহিত্য পত্রিকা)

৩। মজলিস (মাসিক), সম্পাদক - দুর্গাদাস দে (সাহিত্য সাংস্কৃতিক পত্রিকা)

৪। জন্মভূমি (মাসিক), সম্পাদক - পন্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন

নাম	প্রকৃতি
৫। বঙ্গনিবাসী (মাসিক), সম্পাদক - বামদেব দত্ত	

১২৯৮ (ইং ১৮৯১)

১। ইসলাম প্রচারক (মাসিক), সম্পাদক - মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন	(সামাজিক ও সাহিত্য পত্রিকা)
২। হিতবাদী (সাপ্তাহিক), সম্পাদক - আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য	(সাহিত্য পত্রিকা)
৩। সাধনা (মাসিক), সম্পাদক - সুধীন্দ্র নাথ ঠাকুর	(সাহিত্য পত্রিকা)
৪। সাহিত্য ও বিজ্ঞান (মাসিক), সম্পাদক - যোগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র	
৫। বঙ্গপ্রভা (মাসিক), প্রকাশক - বিপিন বিহারী কোলে	
৬। উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি (মাসিক), সম্পাদক - শ্রীশচন্দ্র ত্রা	(সামাজিক পত্রিকা)

১২৯৯ (ইং ১৮৯২)

১। মাসিক উপন্যাস (মাসিক)	(সাহিত্য পত্রিকা)
২। দাসী : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (এলাহাবাদ)	(সাহিত্য পত্রিকা)
৩। অনুশীলন (মসিক)	

নাম	প্রকৃতি
৪। প্রতিভা (মাসিক)	
৫। বাঁকুড়া দর্পন (পাক্ষিক), সম্পাদক - রামানন্দ মুখোপাধ্যায়	(সাহিত্য ও সমাজ)
৬। অনুসন্ধান (পাক্ষিক)	

১৩০০ (ইং ১৮৯৩)

১। নব্যবঙ্গদর্শন (মাসিক), সম্পাদক - চন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	(সাহিত্য সংস্কৃতি পত্রিকা)
২। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (মাসিক) সম্পাদক -রজনীকান্ত গুপ্ত	(সাহিত্য পত্রিকা)
৩। সমাজ ও সাহিত্য (সাপ্তাহিক), সম্পাদক - গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়	(সামাজিক ও সাহিত্য পত্রিকা)
৪। নববিধান (মাসিক), সম্পাদক - চিরঞ্জীব শর্মা	
৫। মুর্শিদাবাদ হিতৈষী (সাপ্তাহিক) সম্পাদক - বৈকুণ্ঠ নাথ সেন	

নাম		প্রকৃতি

১৩০১ (ইং ১৮৯৪)

১। সুহৃদ (মাসিক), সম্পাদক - রমণীমোহন ঘোষ (সাহিত্য পত্রিকা)

২। সাহিত্য - পরিষৎ পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)

৩। নন্দী (মাসিক), সম্পাদক - অযোধ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্য পত্রিকা)

৪। পূর্ণিমা (মাসিক), সম্পাদক - বিহারী লাল চক্রবর্তী (সাহিত্য পত্রিকা)

৫। গৃহস্থ সুহৃদ (ত্রৈমাসিক), পরিচালক - রামকুমার নাথ

৬। হিন্দু পত্রিকা (মাসিক), সম্পাদক - যদুনাথ মজুমদার (সাহিত্য পত্রিকা)

৭। মুকুল (মাসিক), সম্পাদক - শিবনাথ শাস্ত্রী (সাহিত্য পত্রিকা)

৮। আলোচনা (মাসিক), সম্পাদক - যোগেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সাহিত্য পত্রিকা)

১৩০২ (ইং ১৮৯৫)

১। চিকিৎসক ও সমালোচক (মাসিক), সম্পাদক - ড. সত্যকৃষ্ণ রায় (সাহিত্য পত্রিকা)

২। ধরণী (মাসিক), সম্পাদক - ইন্দুনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

নাম	প্রকৃতি
৩। প্রতিধ্বনি (মাসিক), স্বত্বাধিকারী - রাধাগোবিন্দ প্রামানিক	
৪। শিক্ষা দর্পন (মাসিক), সম্পাদক - দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন	
৫। সৌরভ (মাসিক), সম্পাদক - নটগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ	
৬। মহিমা (মাসিক), সম্পাদক - গিরিশচন্দ্র সেন	
৭। সাহিত্য সেবক (মাসিক), সম্পাদক - হরিচরণ সেন	(সাহিত্য পত্রিকা)

১৩০৩ (ইং ১৮৯৬)

১। সাহিত্য সেবক (মাসিক), [illegible] - [illegible] দাস	(সাহিত্য পত্রিকা)
২। সচিত্র গান ও গল্প (মাসিক), সম্পাদক - বঙ্কুবিহারী দাস	(সাহিত্য ও সংস্কৃতিক পত্রিকা)
৩। বসুমতী (সাপ্তাহিক), সম্পাদক - শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ব্যোমকেশ মুস্তাফী,	(সাহিত্য পত্রিকা)
৪। জোৎস্না (মাসিক)	(সাহিত্য পত্রিকা)
৫। পল্লীবাসী (কালনা হতে)	

নাম	প্রকৃতি

১৩০৪ (ইং ১৮৯৭)

১। শিল্পতত্ত্ব ও পুষ্পাঞ্জলি (মাসিক), সম্পাদক - শরৎচন্দ্র দেব ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (সাহিত্য সংস্কৃতি পত্রিকা)

২। পন্থা (মাসিক), সম্পাদক - বরদাকান্ত মজুমদার ও পন্ডিত শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্ত বাচস্পতি (সামাজিক পত্রিকা)

৩। উৎসাহ (মাসিক), সম্পাদক - সুরেশচন্দ্র সাহা (সাহিত্য পত্রিকা)

৪। বীনা - বাদিণী (মাসিক), সম্পাদক - জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর (সাংস্কৃতিক পত্রিকা)

৫। নদীয়া দর্পন (মাসিক), সম্পাদক - পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় (সামাজিক পত্রিকা)

৬। পুণ্য (মাসিক), সম্পাদিকা - প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী (সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পত্রিকা)

৭। প্রদীপ (মাসিক), সম্পাদক - রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য

১৩০৫ (ইং ১৮৯৮)

১। কোহিনুর (মাসিক), সম্পাদক - এস.কে.এমমহম্মদ আলী (সামাজিক পত্রিকা)

২। শিল্প শিক্ষা (মাসিক), সম্পাদক - উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নাম	প্রকৃতি
৩। দৈনিক চন্দ্রিকা (প্রাত্যহিক), সম্পাদক - শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	(সাহিত্য পত্রিকা)
৪। ভারতশ্রী (মাসিক), পরিচালক - বামাচরণ বাবু ও মহানন্দ চক্রবর্তী	(সাহিত্য সংস্কৃতি পত্রিকা)
৫। বঙ্গগৃহ (মাসিক), সম্পাদক - অবিনাশ চন্দ্র বসু	
৬। আলাপিনী (পাক্ষিক), সম্পাদক - মন্মথনাথ দে	(সাহিত্য সাংস্কৃতিক পত্রিকা)
৭। সংসার (সাপ্তাহিক), সম্পাদক - কালিন্দ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	

১৩০৬ (ইং ১৮৯৯)

নাম	প্রকৃতি
১। প্রয়াস (মাসিক), সম্পাদক - শৈলেন্দ্র নাথ সরকার	
২। উদ্বোধন (পাক্ষিক), সম্পাদক - স্বামী ত্রিগুণাতীত	(সাহিত্য সংস্কৃতি রাজনীতিক ও সামাজিক পত্রিকা)
৩। বিকাশ (মাসিক), সম্পাদক - ড. রসিক মোহন চক্রবর্তী	

নাম	প্রকৃতি
৪। সাধনা - প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক - সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর	(সাহিত্য পত্রিকা)
৫। বিশ্বদূত (সাপ্তাহিক)	
৬। ঐতিহাসিক চিত্র , সম্পাদক - অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়	(ইতিহাস)

১৩০৭ (ইং ১৯০০)

১। সাহিত্য - সংহিতা (মাসিক), সম্পাদক - নৃসিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	(সাহিত্য পত্রিকা)
২। প্রভৃতি (মাসিক), প্রকাশক - বসন্তকুমার বসু	(সামাজিক ও সাহিত্য পত্রিকা)
৩। আরতি (মাসিক), সম্পাদক - উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন	(সাহিত্য পত্রিকা)
৪। বঙ্গীয় রহস্য (মাসিক)	(সামাজিক পত্রিকা)
৫। কৃষক (সাপ্তাহিক), সম্পাদক - নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার	(সাহিত্য পত্রিকা)
৬। ছায়া (মাসিক)	
৭। উদ্ধার ও উত্থান (মাসিক)	(সামাজিক পত্রিকা)
৮। প্রভাত (সাপ্তাহিক), সম্পাদক - নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত	
৯। শিল্প ও সাহিত্য (মাসিক), সম্পাদক - মন্মথনাথ চক্রবর্তী	(সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পত্রিকা)

নাম	প্রকৃতি
১০। ত্রিস্রোতা (মাসিক), সম্পাদক - শশিকুমার নিয়োগী	(সাহিত্য পত্রিকা)
১১। প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী (দ্বৈমাসিক), সম্পাদক - হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	
১২। নবপ্রভা (মাসিক), সম্পাদক - জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় ও হরেন্দ্রলাল রায়	
১৩। অরুণোদয় (মাসিক)	(সাহিত্য পত্রিকা)

১৩০৮ (ইং ১৯০১)

নাম	প্রকৃতি
১। বঙ্গদর্শন (মাসিক), সম্পাদক - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	(সামাজিক পত্রিকা)
২। প্রবাসী (সাপ্তাহিক), সম্পাদক - রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	(সাহিত্য পত্রিকা)
৩। বসুধা (মাসিক), সম্পাদক - রাজকৃষ্ণ তত্ত্ববাগীশ	
৪। বঙ্গালয় (সাপ্তাহিক), সম্পাদক - পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	
৫। সমালোচনী (মাসিক), সম্পাদক - শৈলেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার	
৬। নবপ্রতিভা (মাসিক), সম্পাদক - মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	
৭। নব্যবঙ্গ (মাসিক), সম্পাদক - আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও পাঁচকড়ি রায়	
৮। শিল্প ও সাহিত্য (মাসিক), সম্পাদক - মন্মথনাথ চক্রবর্তী ও সতীশচন্দ্র মিত্র	(সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পত্রিকা)

নাম	প্রকৃতি
৯। সঙ্গীত প্রবেশিকা (মাসিক), সম্পাদক - জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর	(সাংস্কৃতিক পত্রিকা)
১০। সুধা (মাসিক), সম্পাদক - কেদার নাথ তর্কতীর্থ ও কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত	

১৩০৯ (ইং ১৯০২)

১। আশা (মাসিক), সম্পাদক - হেমন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩১০ (ইং ১৯০৩)

১। নবনূর (মাসিক), সম্পাদক - সৈয়দ এমদাদ আলী (সাহিত্য, সামাজিক, রাজনৈতিক)

২। ধূমকেতু (মাসিক), সম্পাদক - নীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

৩। অর্চ্চনা (মাসিক), সম্পাদক - জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

৪। যমুনা (মাসিক), সম্পাদক - ধীরেন্দ্রনাথ পাল (সাহিত্য)

১৩১১ (ইং ১৯০৪)

১। যোগীসখা (মাসিক), সম্পাদক - অধরচন্দ্র নাথ

২। উপাসনা (মাসিক), সম্পাদক - চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

নাম	প্রকৃতি
৩। সন্ধ্যা , সম্পাদক - ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায়	(সাহিত্য ও রাজনৈতিক পত্রিকা)
৪। করবী (দ্বিসাপ্তাহিক), সন্ধ্যার গোষ্ঠীর	
৫। জাহ্নবী (মাসিক), সম্পাদক - নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	
৬। উপাসনা (মাসিক), সম্পাদক - চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়	
৭। মোহম্মদী (দ্বিসাপ্তাহিক)	

১৩১২ (ইং ১৯০৫)

১। বন্দী (মাসিক), সম্পাদক - অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

২। ভাণ্ডার (মাসিক), সম্পাদক - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩। ভারত - মহিলা (মাসিক), সম্পাদক - সরযূবালা দত্ত

৪। ইন্দিরা (মাসিক), সম্পাদক - বারেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়

৫। স্বদেশী (মাসিক), সম্পাদক - দেবেন্দ্র নাথ ঘোষাল

১৩১৩ (ইং ১৯০৬)

১। অঙ্কুর (মাসিক), সম্পাদক - কালীবর বেদান্তবাগীশ

২। রঙ্গপুর - সাহিত্য পরিষৎ (ত্রৈমাসিক), সম্পাদক - পঞ্চানন সরকার

নাম	প্রকৃতি
৩। সুপ্রভাত (মাসিক), সম্পাদক - কুমুদিনী মিত্র	
৪। নবশক্তি (সাপ্তাহিক), সম্পাদক - মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা	(রাজনৈতিক পত্রিকা)
৫। যুগান্তর (সাপ্তাহিক), প্রতিষ্ঠাতা বারীন্দ্র কুমার ঘোষ	,,

১৩১৪ (ইং ১৯০৭)

১। অবসর (মাসিক), সম্পাদক - নবকুমার দত্ত

২। পথিক (মাসিক), সম্পাদক - শচীশ চন্দ্র ঘোষ

৩। সুপ্রভাত (মাসিক), সম্পাদিকা - কুমুদিনী মিত্র

১৩১৫ (ইং ১৯০৮)

১। হিন্দু - সখা (মাসিক), সম্পাদক - কালীপদ মিত্র

২। মানসী (মাসিক), সম্পাদক - ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় শিবরতন মিত্র, সুবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩। আর্য্য দর্পন (মাসিক), সম্পাদক - স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী

৪। নায়ক (দৈনিক), সম্পাদক - পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

নাম　　　　　　　　　　　　　　　　　　　প্রকৃতি

১৩১৬ (ইং ১৯০৯)

১। ত্রিশূল (মাসিক), সম্পাদক - ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য

২। নবদর্শন (মাসিক), সম্পাদক - অমূল্যচরণ সেন

৩। দেবালয় (মাসিক), সম্পাদক - নগেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত

৪। পল্লীচিত্র (সাপ্তাহিক), সম্পাদক - বিধুভূষণ বসু

৫। নৈবেদ্য (মাসিক), সম্পাদক - উপেন্দ্র মোহন চৌধুরী

৬। নির্মাল্য (মাসিক), সম্পাদক - বসন্তকুমার বসু

৭। প্রজাপতি (মাসিক), সম্পাদক - জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার

৮। অলৌকিক (মাসিক), সম্পাদক - ক্ষিরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
রহস্য

৯। ধর্ম (সাপ্তাহিক), সম্পাদক - অরবিন্দ ঘোষ

১০। মানসী ও মর্মবানী (মাসিক)

১৩১৭ (ইং ১৯১০)

১। রঙ্গমঞ্চ (মাসিক), সম্পাদক - মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়　　　(সাংস্কৃতিক পত্রিকা)

২। পথ (মাসিক), সম্পাদক - বীরেন্দ্র নাথ দে

৩। নাট্য - মন্দির (মাসিক), সম্পাদক - মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

নাম　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　প্রকৃতি

৪। অর্ঘ্য (মাসিক), সম্পাদক - অমূল্যচরণ সেন

৫। আর্যাবর্ত (মাসিক), সম্পাদক - হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

৬। বীরভূমি (মাসিক), সম্পাদক - কুলপ্রসাদ মল্লিক

১৩১৮ (ইং ১৯১১)

১। প্রতিবাসী (মাসিক), সম্পাদক - আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

২। বিজয়া (মাসিক), সম্পাদক - কুমার বিপ্রনারায়ণ

৩। সাহিত্য - সংবাদ (মাসিক), সম্পাদক - প্রমথনাথ সান্যাল

৪। পতাকা (মাসিক), সম্পাদক - হরিচরণ দাস

৫। ঢাকা - রিভিউ ও সম্মিলন (মাসিক), সম্পাদক - বিধুভূষণ গোস্বামী ও সত্যেন্দ্র নাথ ভদ্র

৬। প্রতিভা (ত্রৈমাসিক), সম্পাদক - হীরেন্দ্র লাল গঙ্গোপাধ্যায়

১৩১৯ (ইং ১৯১২)

১। সৌরভ (মাসিক), সম্পাদক - কেদারনাথ মজুমদার

২। নন্দিনী (মাসিক), সম্পাদক - যুগোলকিশোর মজুমদার

৩। অতিথি (মাসিক), সম্পাদক - সত্যসাধন সেন ও ভবতারণ দাস

নাম	প্রকৃতি
৪। কাদম্বরী (মাসিক), সম্পাদক - মন্মথনাথ নাগ	সাহিত্য
৫। বালক (মাসিক), সম্পাদক - জে.এম.বি	
৬। গল্প লহরী (মাসিক), সম্পাদক - উনক্রমন জ্ঞানেন্দ্র নাথ বসু	

১৩২০ (ইং ১৯১৩)

১। নাট্য পত্রিকা (মাসিক), সম্পাদক - নারায়ণ চন্দ্র সেন

২। কল্যাণী (মাসিক), সম্পাদক - শশীকান্ত ভট্টাচার্য্য

৩। প্রবাহিণী (সাপ্তাহিক), সম্পাদক - পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় ও অমরেন্দ্র নাথ রায়

৪। ভারতবর্ষ (মাসিক), সম্পাদক - অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও জলধর সেন

৫। বিদূষক (মাসিক), সম্পাদক - ক্ষেত্রনাথ বন্দোপাধ্যায়

৬। শাশ্বতী (মাসিক), সম্পাদক - নিখিলনাথ রায়

১৩২১ (ইং ১৯১৪)

১। সবুজ পত্র (মাসিক), সম্পাদক - প্রমথ চৌধুরী

নাম	প্রকৃতি
২। সঙ্কল্প (মাসিক), সম্পাদক - অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও চারুচন্দ্র মিত্র	সাহিত্য, সাময়িক
৩। ভারত - নারী (মাসিক), সম্পাদক - আনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত ও গৌরীশঙ্কর দাশগুপ্ত	
৪। নারায়ণ (মাসিক), সম্পাদক - চিত্তরঞ্জন দাস	
৫। গম্ভীরা (মাসিক), সম্পাদক - কৃষ্ণচরণ সরকার	
৬। বসুমতী (দৈনিক), সম্পাদক - হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ	

১০২২ (ইং ১৯১৫)

১। গল্প - ভারতী (মাসিক), সম্পাদক - উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	(সাহিত্য পত্রিকা)
২। অঙ্কুর (মাসিক), সম্পাদক - সতীন্দ্রনাথ পাল ও সত্যচারণ চক্রবর্তী	(সাংস্কৃতিক পত্রিকা)
৩। প্রতিধ্বনি (মাসিক), সম্পাদক - জগন্নাথ মজুমদার	
৪। প্রবর্তক (মাসিক), সম্পাদক - মনীন্দ্রনাথ নায়েক	
৫। বেদনা (মাসিক), সম্পাদক - প্রকাশচন্দ্র প্রধান	
৬। মর্মবানী (সাপ্তাহিক), সম্পাদক - জগদিন্দ্র নাথ রায় ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	

॥ সংযোজন 'ঘ' কিছু দুষ্প্রাপ্য ছবি ॥

চিত্র ক্রমাঙ্ক - ১

- - - - - - - - - -

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন। ১৯০৫ সাল। একটি টেবিলে উঠে বক্তৃতা করছেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মাইক্রোফোন ছাড়াই বজ্র কন্ঠের আওয়াজ। উদ্দীপ্ত জনতা গাছের উপর ও প্রাচীরে। পিছনে দুটো ব্যানার। একটি ইংরাজীতে লেখা 'Bengal shall never be reconciled to Partition' অন্যটিতে লেখা আছে "দেবী আমার সাধনা আমার স্বর্গ আমার আমার দেশ।"

চিত্র ঃ মাঙ্ক — ২
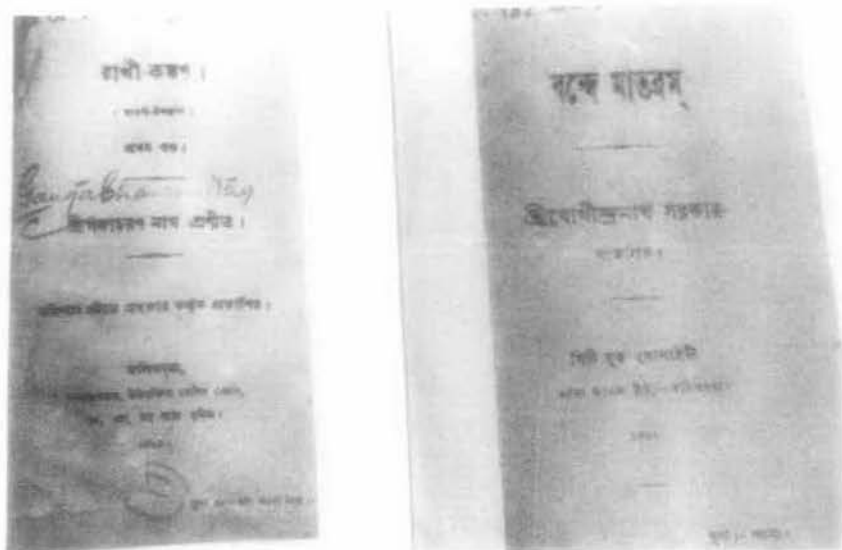
' রাখী কঙ্কণ ' উপন্যাস ও ' বন্দেমাতরম ' কাব্যের প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা। বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী যুগে ইংরেজ সরকার কর্তৃক দুটো গ্রন্থই নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়।

চিত্র ক্রমাঙ্ক – ৩

- - - - - - - - - - - -
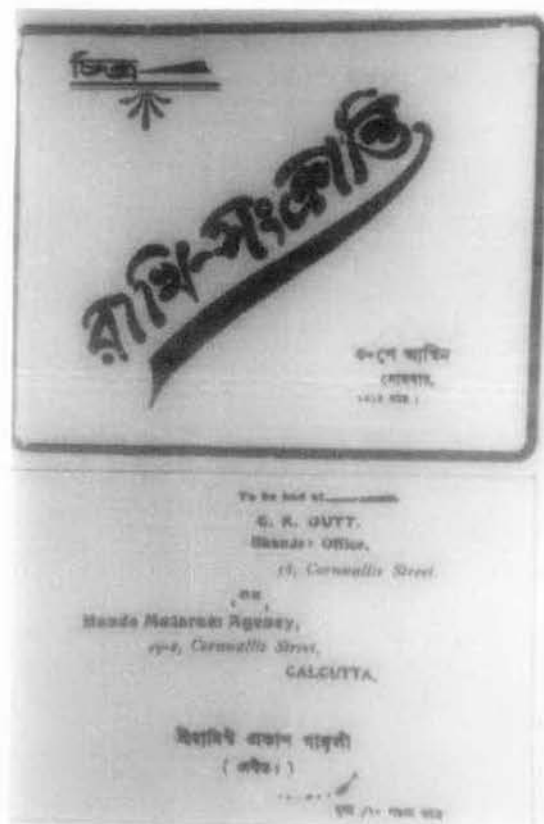
বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয় ৩০শে আশ্বিন , ১৩১২ । সেদিনের ঘটনা উপলক্ষে কয়েকটি ফটো সহ একটি এ্যালবাম প্রকাশিত হয় । এরই নাম ' চিত্র - রাখী সংক্রান্তি '। প্রথম পৃষ্ঠায় ' বন্দেমাতরম ' মন্ত্রের নীচে রবীন্দ্রনাথের ' বাংলার মাটি বাংলার জল ' আর তোর মরা গাঙে বান এসেছে ' – দুটো গান । এই পুস্তিকারই প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা ।

চিত্র ক্রমাঙ্ক - ৪

- - - - - - - - - - -

স্বদেশী যুগের সাড়া জাগানো বিজ্ঞাপন। এইচ বোসের সুগন্ধি দ্রব্য 'দেলখোস'। স্বদেশী কারখানায় তৈরী।
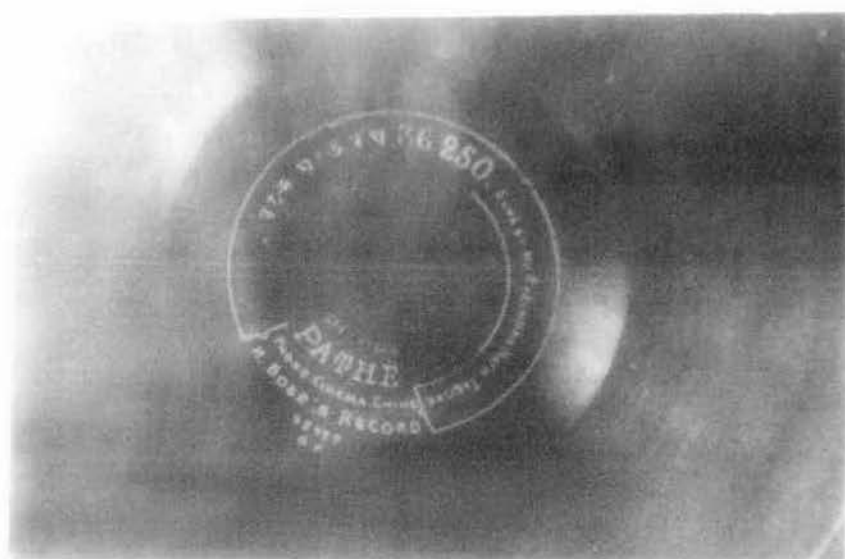
চিত্র ক্রমাঙ্ক – ৫

রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের গাওয়া 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের রেকর্ড। এইচ বোসের স্বদেশী গ্রামোফোন কোম্পানীতে তোলা।

চিত্র ক্রমাঙ্ক — ৬
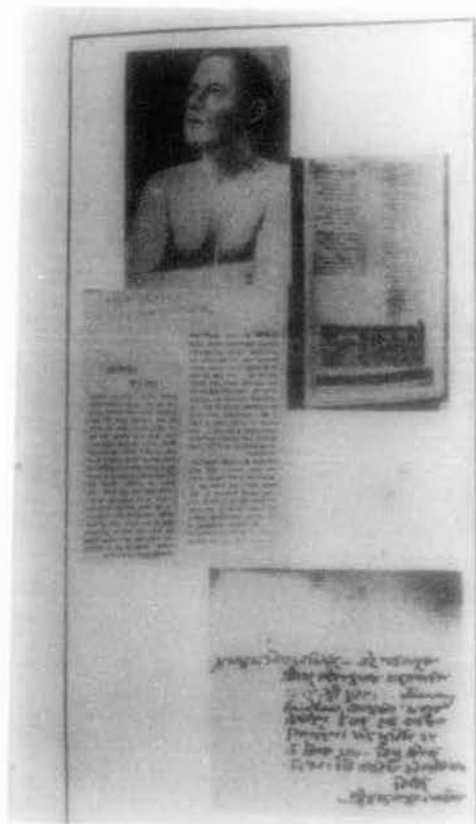
ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায়ের ' সন্ধ্যা ' পত্রিকার প্রচ্ছদ ও কাটিং । উপরে ব্রহ্ম বান্ধবের ছবি । নীচে তাঁরই লেখা চিঠি ।

চিত্র ক্রমাঙ্ক — ৭

যুগান্তর।

সোণার বাঙ্গলা।
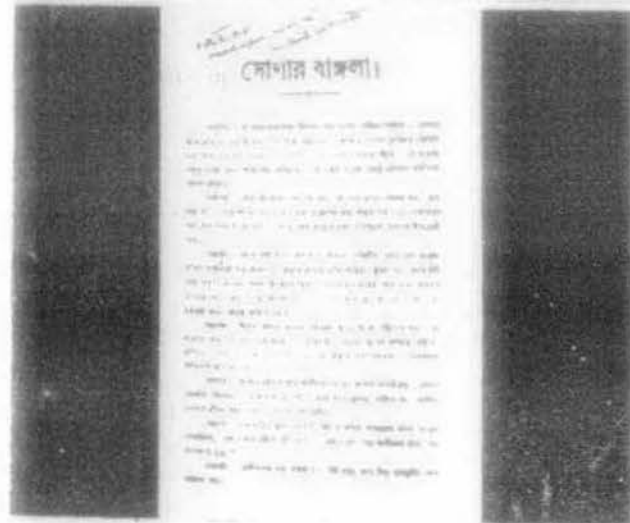
'যুগান্তর' পত্রিকার একটি অংশের ছবি। নীচে 'সোনার বাংলা' ইস্তাহার। ইংরেজ সরকার এই ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত করে।

চিত্র ক্রমাঙ্ক — ৮

- - - - - - - - - - -

নবনূর।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

স্বদেশী যুগের মুসলিম সাময়িক পত্রিকা 'নবনূর'এর প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা ।
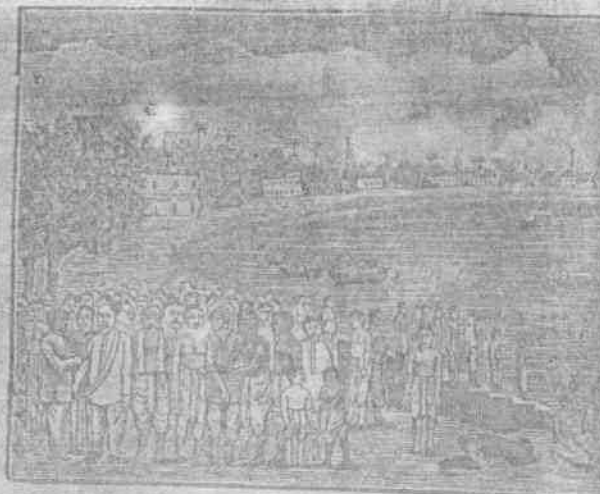
চিত্র ক্রমাঙ্ক — ১

- - - - - - - - - - - -

ইস্‌লাম-প্রচারক।

ইস্‌লাম ধর্ম-নীতি, সমাজ-নীতি, ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।

মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহ্‌মদ সম্পাদিত।

সূচীপত্র।

স্বদেশী যুগে আরেক মুসলিম পত্রিকা 'ইসলাম প্রচারকে'র প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা।

চিত্র ক্রমাঙ্ক — ১০

৩০শে আশ্বিন বুধবার জাতীয় রাখীবন্ধন ও অরন্ধন।

জাতীয় রাখীবন্ধন ও অরন্ধন।

কার্ত্তিক মাসের জলবিষুব সংক্রান্তির সংক্রান্তি গণনা।

১৩১২ (১৯০৫) এর ৩০শে আশ্বিন (১৬ই অক্টোবার) বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হয়। জাতীয় নেতারা এই দিনটিকে 'জাতীয় রাখীবন্ধন ও অরন্ধন' দিবস রূপে পালন করেন। তদানীন্তন পঞ্জিকা প্রণেতারাও এই দিনের অনুষ্ঠান রূপে ৩০শে আশ্বিনকে পালন করতে নির্দ্দেশ দেন। ১৩১২ হতে ১৩১৯ অবধি এই বিধান চলেছিল। বঙ্গভঙ্গ রদ হলে পঞ্জিকায় এই বিধানও উঠে যায়। পঞ্জিকার বিধানের একটি চিত্র।

চিত্র ক্রমাঙ্ক — ১১

এ স্বদেশী যুগে আন্দোলন রত সন্দেহ ভাজনদের তালিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামও লিখিত ছিল। এই সার্কুলারের ২৩ পাতায় ৬ নং এ রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর (জমিদার) এর নাম মুদ্রিত। তারই প্রতিচ্ছবি ।

ব্যবহৃত গ্রন্থ তালিকা (বাংলা)

১। উমর বদরুদ্দীন – ভারতের জাতীয় আন্দোলন , কলকাতা , ১৯৮৪

২। উদ্বোধন কার্যালয় – চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ , কলকাতা , ১৯

৩। উমর বদরুদ্দীন – বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি , কলকাতা , ১৯৮৭

৪। কবিরাজ নরহরি – স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা , কলকাতা , ১৯৬১

৫। কর শিশির – ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই , কলকাতা , ১৯৮৮

৬। কর শিশির – স্বদেশী যুগে কারাদণ্ডিত কবি সিরাজী , কলকাতা , ১৩৯৭

৭। কায়কোবাদ – মহা শ্মশান কাব্য , ঢাকা , ১৯৪০

৮। কানুনগো হেমচন্দ্র – বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা , কলকাতা ১৯২৮

৯। গঙ্গোপাধ্যায় সৌমেন্দ্র – বাংলা কবিতা ও গানে স্বাদেশিকতা , কলকাতা , ১৩৮৪

১০। গঙ্গোপাধ্যায় সৌরেন্দ্র মোহন – বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা , (১ম ও ২য় খণ্ড) কলকাতা , ১৯৯০

১১। গুপ্ত সুশীল কুমার – উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর নব জাগরণ , কলকাতা , ১৯৬৯

১২। গুপ্ত যোগেন্দ্র নাথ – মহাকবি গিরিশচন্দ্র , কলকাতা

১৩। গঙ্গোপাধ্যায় প্রভাত – ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া , কলকাতা ১৯৮১

১৪। গুহ নলিনী কিশোর – বাংলার বিপ্লববাদ , কলকাতা , ১৩৮১

১৫। ঘোষ বিনয় – বাংলার নবজাগৃতি , কলকাতা , ১৯৯০

১৬। ঘোষ কালিচরণ – জাগরণ ও বিস্ফোরণ , কলকাতা , ১৩৭৯

১৭। ঘোষ প্রদ্যোৎ – লোক সংস্কৃতি : গম্ভীরা , কলকাতা , ১৯৮২

১৮ । ঘোষ সিদ্ধার্থ — কারিগরী কল্পনা ও বাঙালী উদ্যোগ , কলকাতা , ১৯৮৮

১৯ । চক্রবর্তী রথীন — মহাবিপ্লব ও বাংলা সংবাদ পত্রের রূপান্তর , কলকাতা , ১৯৮৯

২০ । চক্রবর্তী সুবোধ — চারণ কবি মুকুন্দ দাস , কলকাতা , ১৩৯০

২১ । চক্রবর্তী বরুণ — বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃত অধ্যায় , কলকাতা , ১৯৮৯

২২ । চট্টোপাধ্যায় শিবেশ কুমার — প্রভাত কুমার জীবন ও সাহিত্য , কলকাতা , ১৯৭০

২৩ । চট্টোপাধ্যায় সরল — ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ , কলকাতা , ১৯৯০

২৪ । চক্রবর্তী শিবদাস — বিপিন চন্দ্র পাল , জীবন ও সাহিত্য সাধনা , কলকাতা , ১৯৮২

২৫ । চৌধুরী নাজমা জেসমিন — বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি , কলকাতা , ১৯৮৩

২৬ । চৌধুরী মুনীর — আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা , ঢাকা , ১৯৬৯

২৭ । চৌধুরী মুনীর — মীর মানস , ঢাকা

২৮ । জানা প্রিয়নাথ — জাতীয়তার মন্ত্রগুরু যাঁরা , কলকাতা , ১৯৭২

২৯ । জানা শ্রীমন্ত — রবীন্দ্র নাথের স্বদেশ চিন্তা , কলকাতা , ১৯৮৬

৩০ । ঠাকুর রবীন্দ্র নাথ — রচনাবলী (ষষ্ঠ , অষ্টম , দশম খণ্ড) পশ্চিম বঙ্গ সরকার , কলকাতা

৩১ । ঠাকুর সত্যেন্দ্র নাথ — আমার বাল্যকাল ও আমার বোম্বাই প্রবাস , কলকাতা

৩২ । ত্রিপাঠী অমলেশ — ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরম পন্থী পর্ব , কলকাতা , ১৯৮৭

৩৩ । ত্রিপাঠী অমলেশ — স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস , কলকাতা , ১৩৯৭

৩৪ । দত্ত অক্ষয় কুমার — ভারতবর্ষ উপাসক সম্প্রদায় উপক্রমনিকা , কলকাতা

৩৫ । দাশগুপ্ত অশীন — ইতিহাস ও সাহিত্য , কলকাতা , ১৯৮৯

৩৬ । দাশগুপ্ত শশীভূষণ — ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য , কলকাতা , ১৩৯৯

৩৭ । দাশগুপ্ত হেমেন্দ্র নাথ — ভারতীয় নাট্যমঞ্চ , কলকাতা

৩৮ । দত্ত ভূপেন্দ্র নাথ — স্বামী বিবেকানন্দ , কলকাতা , ১৩৬৪

৩৯ । দত্ত ভূপেন্দ্র নাথ — ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম , কলকাতা , ১৯৮৩

৪০ । দে অমলেন্দু — বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ , কলকাতা , ১৯৯১

৪১ । দে শৈলেশ — মৃত্যুর চেয়ে বড় , কলকাতা , ১৩৯২

৪২ । দে শৈলেশ — অগ্নিযুগ , কলকাতা , ১৯৮৬

৪৩ । দেউস্কর সখারাম গণেশ — দেশের কথা , কলকাতা , ১৯৮৭

৪৪ । নন্দী সোমেন্দ্র চন্দ্র — বাংলা ঐতিহাসিক নাট্য সমালোচনা , কলকাতা , ১৯৮১

৪৫ । নাথ সুনীতি — প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য , কলকাতা , ১৯৮৭

৪৬ । নাগ কালিদাস — সুরের গুরু রবীন্দ্র নাথ , কলকাতা , ১৩৯৩

৪৭ । পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ — সুরেন্দ্র নাথের আত্মকথা , ১৯৮৯

৪৮ । পোদ্দার অরবিন্দ — রেনেসাঁস ও সমাজ মানস , কলকাতা ১৩৬১

৪৯ । পণ্ডিত নলিনী রঞ্জন — কান্তকবি রজনী কান্ত , কলকাতা

৫০ । পাল বিপিন চন্দ্র — চরিত্র চিত্র , কলকাতা

৫১ । ফারুকী রসিদ আল — মুসলিম মানস - সংঘাত ও প্রতিক্রিয়া , কলকাতা , ১৯৮১

৫২ । বসু শঙ্করী প্রসাদ — বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (১ - ৬ খন্ড)
কলকাতা

৫৩ । বসু অরুণ কুমার — অতুল প্রসাদের গান , কলকাতা

৫৪ । বসুমতী সাহিত্য মন্দির — সঙ্গীত চয়ন (মুকুন্দ দাস) কলকাতা , ১৩৯২

৫৫। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ – সাহিত্য সাধক চরিত মালা (১ - ১০ম খণ্ড) কলকাতা

৫৬। বন্দ্যোপাধ্যায় স্বপ্না – সমকালের বাংলা গান ও রবীন্দ্র সংগীত, কলকাতা ১৩৯৮

৫৭। বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার – বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কলকাতা, ১৩৭২

৫৮। বন্দ্যোপাধ্যায় উপেন্দ্র নাথ – নির্বাসিতের আত্মকথা, কলকাতা, ১৯৯৩

৫৯। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ) – বাংলা একাডেমী, ঢাকা

৬০। বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ — বাংলা সাময়িক পত্র (২য় খণ্ড) কলকাতা, ১৩৮৫

৬১। ভট্টাচার্য্য কুমুদ — রামমোহন ডিরোজিও মূল্যায়ণ, কলকাতা, ১৯৮৫

৬২। ভট্টাচার্য্য হিরন্ময় — নির্বাসিত সাহিত্য (১ম ও ২য় খণ্ড) ১৩৮৮, ১৩৯৩

৬৩। ভট্টাচার্য্য আশুতোষ — বাংলার লোকসাহিত্য (৩য় খণ্ড) কলকাতা, ১৯৬৫

৬৪। ভট্টাচার্য্য জগদীশ — বন্দেমাতরম, কলকাতা, ১৯৭৮

৬৫। ভট্টাচার্য্য প্রভাত কুমার — বাংলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব, কলকাতা, ১৩৮৫

৬৬। ভট্টাচার্য্য আশুতোষ — বাংলার নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৭১

৬৭। মজুমদার মোহিত লাল — বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, কলকাতা

৬৮। মজুমদার রমেশচন্দ্র — বাংলা দেশের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা

৬৯। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন — ঠাকুরমার ঝুলি, কলকাতা, ১৪০০

৭০। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন — ঠাকুরদার ঝুলি, কলকাতা, ১৩৯৮

৭১। মিত্র অরুণ কুমার — অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৭০

৭২। মজুমদার অর্চনা — রবীন্দ্র উপন্যাস পরিক্রমা, কলকাতা, ১৯৭০

৭৩। মুখোপাধ্যায় অরুণ — উনবিংশ শতাব্দী বাংলা গীতিকাব্য, কলকাতা, ১৩৭৭

৭৪ । মুখোপাধ্যায় প্রভাত কুমার — রবীন্দ্র জীবন কথা , কলকাতা

৭৫ । মুখোপাধ্যায় প্রভাত কুমার — গল্প সংগ্রহ (১ -৪ খন্ড) কলকাতা ১৯৯২

৭৬ । মুখোপাধ্যায় হরিদাস — বিনয় সরকারের বৈঠকে , ১ম খন্ড কলকাতা ১৯৩৪

৭৭ । মুখোপাধ্যায় হরিদাস ও উমা — স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ , কলকাতা

৭৮ । মান্না গুনময় — রবীন্দ্র নাথের দর্শনভূমি , কলকাতা , ১৯৯৩

৭৯ । মিত্র কৃষ্ণ কুমার — আত্ম চরিত , কলকাতা

৮০ । রায় মতিলাল — স্বদেশী যুগের স্মৃতি , কলকাতা

৮১ । রায় রথীন্দ্র নাথ — দ্বিজেন্দ্র লাল , কলকাতা , ১৯৬০

৮২ । রায় চৌধুরী গিরিজাশঙ্কর — অরবিন্দ ও বাংলার স্বদেশীযুগ , কলকাতা

৮৩ । রায় চৌধুরী দেবকুমার — দ্বিজেন্দ্র লাল , কলকাতা

৮৪ । রায় রক্ষিত ভূপেন্দ্র কিশোর — ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব , কলকাতা , ১৯৯২

৮৫ । শীল বৈদ্যনাথ — বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা , কলকাতা

৮৬ । শরীফ আহম্মদ — বাঙালি ভাবনা , ঢাকা , ১৯৭৪

৮৭ । শাস্ত্রী শিবনাথ — রামতনু লাহিড়ী ও তদানীন্তন বঙ্গ সমাজ , কলকাতা , ১৯৮৩

৮৮ । শেখর সৌমিত্র — গদ্য শিল্পী বীর বলাহক , কলকাতা , ১৯৯৬

৮৯ । শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম — শ্রী অরবিন্দের বাংলা রচনা — পন্ডীচেরী , ১৯৯১

৯০ । সরকার প্রফুল্লকুমার — জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ , কলকাতা

৯১ । সমুদ্র গুপ্ত — বর্গভঙ্গ , কলকাতা , ১৩৭৫

৯২ । সরকার বিনয় — শিক্ষা বিজ্ঞানের ভূমিকা , কলকাতা , ১৯১০

৯৩ । সুর নিখিল — ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পৃষ্ঠভূমি , কলকাতা , ১৯৮৯

৯৪ । সান্যাল কমলকুমার — বাংলা নাটক সমীক্ষা , কলকাতা , ১৯৭৬

৯৫ । সিংহ শান্তি — স্বদেশ আমার , কলকাতা , ১৯৮৮

৯৬ । সেন সুকুমার — বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খন্ড) কলকাতা , ১৩৮৬

৯৭ । সেন কুমুদবন্ধু — গিরিশচন্দ্র ও নাট্য সাহিত্য , কলকাতা

৯৮ । সেন সুকুমার — ইসলামী বাংলা সাহিত্য , কলকাতা , ১৯৯৫

৯৯ । সেনগুপ্ত নীহার রঞ্জন — বিদ্রোহী ভারত , কলকাতা , ১৩৯৫

১০০ । সেন শাস্ত্রী ত্রিপুরা শঙ্কর — উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য , কলকাতা

১০১ । হাসান বদরুল — উনিশ শতক : নবজাগরণ ও বাংলা উপন্যাস , কলকাতা , ১৯৯০

১০২ । হোসেন মীর মশারফ — রত্নাবতী , কলকাতা , ১৯৯৫

১০৩ । হোম অমল — রবীন্দ্র সঙ্গীত স্মৃতি কথা , কলকাতা

ব্যবহৃত পত্র পত্রিকা

১ । অনুষ্টুপ , শারদীয়া সংখ্যা , ১৯৮৬ , শিশির দাসের প্রবন্ধ

২ । এক্ষণ , শারদীয়া সংখ্যা , ১৩৮৮ , কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ

৩ । দেশ সাহিত্য সংখ্যা , ১৩৯৭

৪ । দেশ (১১ , ৫ , ১৯৬৩)

৫ । দেশ ফরাসী বিপ্লবে দ্বিশতবার্ষিকী সংখ্যা , ১৫ . ৭ . ১৯৮৯

৬ । দেশ (২৯ . ১ . ১৯৯৪)

৭ । প্রবাসী (কিছু বিচ্ছিন্ন সংখ্যা)

৮। লোক শ্রুতি , সেপ্টেম্বর , ১৯৯০

৯। বিশ্বভারতী পত্রিকা , মাঘ - চৈত্র , ১৩৭০

১০। বসুমতী , আষাঢ় , ১৩১৩

১১। বঙ্গদর্শন (১ - ৯ম খন্ড) রিফ্লেক্ট প্রকাশন

১২। ভারতী (কিছু বিচ্ছিন্ন সংখ্যা)

১৩। সোনার বাংলা , ১৩৩৩

১৪। সঞ্জীবনী (কিছু বিচ্ছিন্ন সংখ্যা)

১৫। সন্ধ্যা (কিছু বিচ্ছিন্ন সংখ্যা)

রচনাবলী ও সংকলন

১। ইতিহাস অনুসন্ধান - চতুর্থ ও পঞ্চম খন্ড , কে . পি. বাগচী এন্ড কোং , কলকাতা

২। গিরিশ রচনাবলী (১ম , ২য় , ৩য় খন্ড) সাহিত্য সংসদ কলকাতা

৩। দক্ষিণা রঞ্জন রচনা সমগ্র (১ম , ২য় খন্ড) মিত্র ও ঘোষ , কলকাতা

৪। দেশবন্ধু রচনা সম্ভার , তুলিকলম , কলকাতা

৫। দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী (১ম ও ২য় খন্ড) , হরফ প্রকাশনী , কলকাতা

৬। বিবেকানন্দ রচনাবলী (৫ম , ষষ্ঠ , ৭ম ও ৮ম খন্ড) , উদ্বোধন রামকৃষ্ণ মিশন , কলকাতা

৭। ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায় রচনা সংগ্রহ - কলেজ স্ট্রীট প্রকাশন , কলকাতা ১৯৯৫

৮। রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ , অষ্টম , দশম খন্ড) পশ্চিমবঙ্গ সরকার , কলকাতা

ENGLISH SECTION

1. Aurabinda Ashram - Sri Aurabinda on Himself Pondichery 1953.

2. Bhuiyan Iqbal - Selections from the Mussalman 1906-1908, Calcutta, 1994.

3. Banerjee Surendra Nath - A Nation in Making London 1931

4. Bharatiya Vidyabhavan - British Paramountcy and Indian Renaissance Vol II Bombay 1981.

5. Chakraborty Smarajit - The Bengal Press Calcutta - 1976.

6. Chandra Bipan - The Rise and Growth of Economic Nationalism in India, New Delhi, 1991.

7. Chakraborty Hiren - Political Protest in Bengal Boycott and Terrorism, Calcutta, 1992.

8. Dasgupta Hemendra Nath - Indian Stage Vol IV, Calcutta.

9. Datta Bhupendra Nath - Swami Vivekananda, Patriot-Prophet, Calcutta 1993.

10. Dasgupta Hemendra Nath - Deshbandu Chitta Ranjan, New Delhi, 1959.

11. Datta Romesh - Economic History of India, London, 1902.

12. Datta R.P. - India To-day, New Delhi, 1992.

13. Ghosh Binay Jiban - Revolt of 1905 in Bengal, Calcutta-1987.

14. Ghosh Hemendra Prasad - Congress, Calcutta.

15. Ghosh Kalicharan - The Roll of Honour, Calcutta - 1964.

16. Islam Mustafa Nurul - Bengali Muslim Public opinion As reflected in Bengali Press 1901-1903, Bangla Academy, Dacca.

17. Kabir Humayun, Muslim Politics, Calcutta, 1969.

18. Majumder Ramesh Chandra - History of Bengal Vol - II Dacca.

19. Majumder Ramesh Chandra - History of Freedom Movement Vol-I-III Calcutta,1975, 1977.

20. Majumder Ramesh Chandra - Three Phases of India's Struggle for Freedom, Bombay.

21. Majumder Biman Behari - Militant Nationalism Calcutta.

22. Majumder Biman Behari - History of Political Thought Calcutta,1934.

23. Mukherjee Haridas & Mukherjee Uma - Bipin Chandra Paul and India's struggle for Swaraj Calcutta.

24. Paul Bipin Chandra - Swadeshi and Swaraj the rise of new Patriotism, Calcutta -1954.

25. Pattavi Sitaramaiya - History of Indian National Congress Delhi.

26. Roy Prithwish Chandra - Life and times of C.R.Das Story of Bengal's Self Expression,Calcutta.

27. Ram Shiv - Story of a Song, Bangalore, 1972.

28. Sarkar Susobhan - On the Bengal Renaissance Calcutta,1985.

29. Sarkar Sumit - Modern India, Calcutta.

30. Sarkar Sumit - The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908, New Delhi,1977.

31. Sengupta Subodh Chandra - Swami Vivekananda and Indian Nationalism, Calcutta.

32. Sengupta S.C. - Aurabinda and Indian Nationalism Calcutta.

33. Sinha N.K. - Economic History of Bengal Vol II, Calcutta.

34. Thomson David - Europe Since Napoleon, London 1975.

35. The Golden Book of Tagore - Tagore as a political thinker.

36. Verma - Modern India's political thought New Delhi.

37. Will Durant - The Case of India

38. Wolport Stanely - Morley and India 1906-10 California,1967.

39. Yatindra Nath Ghosh- Bengal Provincial Conference 1906, Basisal, Calcutta.

PERIODICALS

1. Statesman - Centenary Volume, Calcutta

2. Some Extract copies of " BENGALEE"

3. Some Extract copies of "BANDEMATARAM"

--------- x ---------